ইতিহাস অনুসন্ধান ১৭

সম্পাদনা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা * * * * * ২০০৩

ITIHAS ANUSANDHAN - 17

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০৩, কলকাতা

প্রকাশক ঃ ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০১২

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ ঃ
জেনিথ অফসেট
২০বি, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০১৪

সূচীপত্র

বিভাগীয় সভাপতিদের অভিভাষণ

বিভাগ ঃ প্রাচীন ভারত

সারাংশ ঃ

বিভাগ ঃ মধ্যযুগের ভারত

সারাংশ ঃ

বিভাগ ঃ আধুনিক ভারত

আর্থ সামাজিক - রাজনৈতিক ইতিহাস ঃ

সারাংশ ঃ

আঞ্চলিক ইতিহাস ঃ

সারাংশ ঃ

নারী ইতিহাস ঃ

সারাংশ ঃ

চিন্তা-চেতনা ঃ

সারাংশ ঃ

সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য কেন্দ্রিক ঃ

সারাংশ ঃ

আন্দোলন ও সমাবেশের ইতিহাস

ঔপনিবেশিকতা, সংস্কৃতি এবং পুনরুত্থানবাদ

কে এন পানিক্কর

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের এই বছর বার্ষিক অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ পেশ করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি সংসদের উদ্যোক্তাদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। অতীতে এই সংসদ বরাবরই ইতিহাস বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এসেছেন এবং যখনই এই ধরণের ইতিহাসচর্চা হুমকি বা সঙ্কটের সম্মুক্ষীণ হয়েছে, তখনই ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চাকে প্রবলভাবে সমর্থন করেছেন। ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ যখন 'টুয়ার্ডস ফ্রিডম' শীর্ষক প্রকল্পের দুটি খন্ডের প্রকাশ বন্ধ করে দেয়, তখন আপনারা আমার ও অন্যান্য সমমতাবলম্বী ঐতিহাসিকদের প্রতি যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তা আমি স্মরণ করি। ইতিহাস গবেষণা ও রচনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সেই থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে; এতটাই যে, ইতিহাস বিষয়টিই তার বিজ্ঞানসম্মত চরিত্র হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শুধু মাত্র লোকপ্রিয় গ্রন্থাদিতে নয়, অ্যাকাডেমিক ইতিহাস গবেষণা - অনুসন্ধানেও। এই হস্তক্ষেপ বর্তমানে সারাদেশে যে সাম্প্রদায়িক - রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্মকান্ড চলছে তারই অংশ, যে কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতির সংজ্ঞা নতুন করে তৈরি করা বা জাতির চরিত্র নতুন করে রূপান্তর ঘটানো যাতে ধর্মনিরপেক্ষ প্রেক্ষিতের বদলে ধর্মীয় প্রেক্ষিত দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যায়। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বা দৃষ্টান্তের মধ্য থেকে ঐ কর্মকান্ডের বৈধতা খোঁজার কাজ চলছে। ধর্মীয় মোড়কে তাই অতীতকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো এবং নতুন ব্যাখ্যায় হাজির করানোর চেষ্টা চলছে। এই কাজে ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর বা ঘটনাবলীকে ইচ্ছামতন সাজানো হচ্ছে, এমনকি মিথ্যের আশ্রয়ও নেওয়া হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ইতিহাসকে অতিকথন বা মিথে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।

তথ্যগত সমৃদ্ধি এবং পদ্ধতিগত অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে ইতিহাসের পুনর্লিখন এক অব্যাহত প্রক্রিয়া, যার মধ্যে দিয়ে ইতিহাস বিষয়টি জ্ঞানের নবতম সীমায় পৌঁছে যায়। এই কথা কিন্তু বর্তমানে যে প্রচেষ্টা চলছে সে সম্পর্কে বলা চলে না, যে প্রচেষ্টার পিছনে আছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমর্থন। এই প্রচেষ্টা বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। বাইরে থেকে ধার করা, সুতরাং এই কাজকারবার যে তথ্যগতভাবে দুর্বল এবং পদ্ধতিগতভাবে অবৈজ্ঞানিক হবে তা খুব স্বাভাবিক।

ইতিহাসের পুনর্লিখন নিয়ে অধুনা যে বিতর্ক তা কিন্তু বিভিন্ন ব্যাখার মধ্যে সংঘাত নয়। কিংবা এটি কেবলমাত্র কিছু ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর বাদ দেওয়া বা বিকৃতি ঘটানোর ব্যাপার নয়। একথা তো ঠিকই যে ইতিহাস মোটের উপর নির্বাচিত বিষয়। যা বিপন্ন হয়েছে তা হলো বিষয়টির চর্চার বিষয়ে যা আমাদের অবহিত করে সেই পদ্ধতি। যেমন ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকের কৃত্যকে সম্মান জানায় না, এমনকি সাধারণভাবে ইতিহাসের স্বীকৃত রূপকেই অস্বীকার করে। আমি এই সম্মান না জানানো বা অস্বীকৃতিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপায় বলে মেনে নিতে অপারগ। এর ফলে তো ইতিহাসচর্চা বিষয়টিই বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। খ্যাতনামা হিন্দি লেখক মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দেই আমাদের সর্তক করে দিয়ে বলেছিলেন, "আমরা স্বাধীনতা হারিয়েও ফেলি তাহলেও যেন আমাদের ইতিহাস হারিয়ে না যায়। কারণ যদি ইতিহাস ঠিকঠাক থাকে তাহলে হারানো স্বাধীনতা আবার জিতে নেওয়া যায়, কিন্তু যদি ইতিহাস নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে যদি আমরা স্বাধীনতা পুনরূদ্ধারও করি, তবে তা করতে হবে দারুণ অসুবিধার মধ্যে দিয়ে।" ভারতবর্ষের ইতিহাস বর্তমানে এমনই এক সঙ্কটকালের মধ্যে দিয়ে চলেছে, কারণ আমাদের ইতিহাসের কতিপয় বিষয়কে একেবারে প্রান্তিক বা অপাংক্তেয় করে দেওয়া হচ্ছে অথবা রাজনৈতিক অসুবিধার দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে। আবার একই সঙ্গে নতুন তত্ত্বগুলির সহায়ক হিসেবে কিছু নতুন জিনিস আবিষ্কার করে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে হস্তক্ষেপ তথা বিকৃতি এবং পাঠ্যক্রমে পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র ইতিহাস বিষয়ের ক্ষতিব মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; তা একটি জাতির চরিত্র, রাষ্ট্রনীতি এবং সংস্কৃতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক ভাবনাই প্রতিফলিত করে, জাতির চরিত্রকে মূলত ধর্মীয় বলে গণ-চেতন্য সৃষ্টি করার ভাবনা। অতীত যা ছিল তার দৃশ্যরূপ সর্বদাই ভবিষ্যৎ গঠনের ক্ষেত্রে এক জোরালো শক্তি হিসেবে কাজ করে। ধর্মনিরপেক্ষ অতীতের ভিত্তির উপর একটি ধর্মীয় জাতিসত্তা দাঁড় করানো কঠিন। সুতরাং ইতিহাসচর্চায় সাম্প্রদায়িক হস্তক্ষেপ তাই ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধানে কোনও অ্যাকাডেমিক প্রচেষ্টা নয়। এটি স্পষ্টতই রাজনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ, যাতে অরুণ শৌরী, এন এস রাজারাম প্রমুখের হাতধরে ইতিহাসের ন্যূনতম প্রকরণের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হয়েছে। যাইহোক, সরকারি মদতপুষ্ট এই প্রচেষ্ঠা ইতিহাসকে সাধারণের নানা চর্চিত অভিসন্দর্ভ বা বিষয়গুলির মধ্যে একটি বির্তকমূলক ইস্যুতে পরিণত করেছে। এই প্রক্রিয়ার ফলে সমাজের ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাসচেতনা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে। আর্যদের আগমণের বিষয়েই হোক বা প্রাচীন ভারতের খ্যাদ্যভ্যাস বিষয়েই হোক, সরস্বতী সভ্যতা বা

বৈদিকযুগ বিষয়েই হোক কিংবা জাতীয় আন্দোলনে হেডগেওয়ার - এর ভূমিকাই হোক, তুলে ধরা হচ্ছে এক বিকল্প ইতিহাস — প্রামাণিক তথ্য-ভিত্তিক ইতিহাসের থেকে সেগুলি যতই দূরবর্তী হোক না কেন।

এই বিকল্প ইতিহাসের উদ্দেশ্য হলো জাতিকে হিন্দু হিসেবে সংজ্ঞায়িত এবং স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করা। এই লক্ষ্যে, প্রথমত, জাতিকে ধর্মীয় ধারণার দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টাকে বৈধতা দান করা হয়। কারণ এর ফলে অতীতে 'স্বর্ণযুগ' ও সমুজ্জ্বল হিন্দুসভ্যতার নিরবিচ্ছিন্ন ধারা দেখানো হয়। কালপরম্পরাকে পিছিয়ে দিয়ে এবং এর কৃতিত্বগুলিকে গৌরবান্বিত করে, ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীনতম বলে দাবি করা হয়। যা অন্যান্য সভাতার চেয়ে অগ্রগামী বলে দেখানো হয়। দ্বিতীয়ত, এর ফলে হিন্দুদের 'বহিরাগত'দের থেকে পৃথক করা হয়, যে বহিরাগতদের আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সুতরাং বহিরাগতরা জাতির শত্রুস্বরূপ। বস্তুতপক্ষে বিনায়ক দামোদর সাভারকর সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসকেই হিন্দুদের সঙ্গে বহিরাগত আক্রমণকারীদের মধ্যে সংগ্রামের মিলিত বিবরণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তৃতীয়ত, যা ভারতীয় জীবনচর্চার মৌলিক বা প্রধান বলে ধরা হয়, তা বস্তুতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক বিষয় নয়, তা ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ধারণা, যা সাম্প্রদায়িকতা তার রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই আত্মপরিচয় থেকেই প্রেরণা গ্রহণ করেছে।

সাম্প্রদায়িক ইতিহাস যে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ প্রচার করে তা হচ্ছে আবশ্যিকভাবে চরিত্রে পুনরুত্থানবাদী। জনগণের সাংস্কৃতিক আচরণের মধ্যে নানা পার্থক্যগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকেই ভারতীয় সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করে এবং বৈদিক যুগের অতীতে তার ভিত্তি সন্ধান করে। এইভাবে সাংস্কৃতিক চিরবিচ্ছিন্ন বহমানতা জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে এক ধরণের কালোত্তীর্ণ ব্যাপার বলে ধরে নেওয়া হয়, সাম্প্রদায়িক অভিসন্দর্ভ যে চেতনাকে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ভুত মনে করে। কিন্তু ধর্মীয় কিংবা পুনরুত্থানবাদী থেকে ভিন্ন এক রকমের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ধারণা ঔপনিবেশিক যুগে উদ্ভব হয়েছিল, যা পুনরুত্থানবাদী না হয়েও জাতির সাংস্কৃতিক সম্পদগুলিকে কাজে লাগিয়েছিল। ভারতীয় বুদ্ধিজীবী এবং সক্রিয় কর্মিবৃন্দের বহুধা-বিস্তৃত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে, ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতেই, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই প্রবণতা পরিস্ফুট।

ঔপনিবেশিক এবং ঐতিহ্যশালী এই দুধরণের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক বিকল্প সংস্কৃতির আদি প্রচেষ্টার উদ্ভব নবজাগরণের মধ্যে বেড়ে উঠলেও, তা আবার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতার দ্বারা কমজোরি হয়েছিল। রেনেশাঁসের অন্তঃস্থল থেকেই তাই বিকল্প

হিসেবে পুনরুত্থানবাদ উঠে এসেছে। যেহেতু ঔপনিবেশিকতার ফলে যে সাংস্কৃতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল তার সমাধান আধুনিকতা করতে সমর্থ হয়নি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই পুনরুত্থানবাদী সংস্কৃতি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এডওয়ার্ড সৈদ মন্তব্য করেছেন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ অনেক সময়েই রূপ নেয় এমন জিনিসে, তাকে আমরা বলি দেশীয়বাদে অন্তরঙ্গ প্রবেশ, ...নিজেদের আত্মপরিচয়ের উপর যে সব বিকৃতি আরোপিত হয়েছে, তা এইভাবে দুর করে 'খাঁটি' দেশীয় সংস্কৃতির প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী যুগে ফিরে যাওয়া।" অন্যান্য অনেক দেশের মতোই ভারতেও পুনরুত্থানবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদ এক ধরণের সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতা থেকে জন্ম নিয়েছে। যদি এগুলি কালক্রমে অভ্যন্তরীণে বিরোধ থেকে অধিকতর রসদ লাভ করেছে।

কখন প্রকৃত ঔপনিবেশিকতায় উত্তরণ ঘটেছে সে বিষয়ে বিভিন্ন মতকে দূরে সরিয়ে রেখে যদি আমরা ভারতে ঔপনিবেশিকতার সূত্রপাত ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজদের আগমণ থেকে ধরে নিই, তাহলে ভারতীয় সমাজের উপর এর প্রভাব চারশো বছরেরও বেশি কাল ধরে ছিল। ঔপনিবেশিকতা বহু দিকেই অনুঘটকের কাজ করেছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা কম নয়। রাজনৈতিক আধিপত্য দৃশ্যতই বাস্তব; ভারতীয় অর্থনীতি কিভাবে বিশ্ববাজারের দ্বারা অধীনস্থ তা পরিস্কার বোঝা যায়। কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন যদিও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত তবু তা স্বভাবতই আণবিক এবং তাই কম প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সব পরিবর্তনের বহুবিধ প্রেরণার উৎস — ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যাবলীর কথা বলা যায়। তাদের হস্তক্ষেপের পদ্ধতিও নানা ধরণের, তাদের মধ্যে প্রধান অবশ্যই আত্মসাৎ এবং আধিপত্যবাদ। ক্ষমতার সম্প্রসারণ ও কার্যকারিতায় ঔপনিবেশিক কৌশলের সঙ্গে তা যুক্ত এবং পরিপূরক। এর ফলে দেশীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক প্রথাগুলিকে সমালোচনা করা হয়েছিল এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অননুমোদিত ও বাতিল করা হয়েছিল। ঐগুলির মধ্যে কিছু কিছু ঔপনিবেশিক প্রথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। বাকিগুলি এতটাই রূপান্তরিত হয়েছিল যে তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে গিয়েছিল। এই জটিল টানাপোড়েন জনগণের অন্তত একটি অংশের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে বিশেষভাবে রূপান্তরিত করেছিল এবং এর ফলেই পুনরুত্থানবাদী আদর্শ ও আচরণ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন ঘটেছিল।

ভারতের ঔপনিবেশিকতার জয়যাত্রা এক দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া। আফ্রিকা কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার মতো নয়। এই দীর্ঘসূত্রিতা শুধুমাত্র ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষিব ফলেই হয়েছিল, এমন নয়; যদিও ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চায়

প্রায়শই তেমনভাবে দেখানো হয়। মধ্যযুগের ভারতীয় রাজ্যগুলি সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী সরকারগুলি দ্বারা পরিচালিত হত, যে সরকারগুলির অশ্বারোহী সৈন্যদের দক্ষতা ছিল উচ্চমানের, তাছাড়া গোলোন্দাজ বাহিনীর কিছু পারদর্শিতা ছিল। যদিও ইয়োরোপীয় শক্তিগুলি উন্নততর সামরিক প্রযুক্তির জ্ঞান নিয়েই এসেছিল, তবু যারা সীমিত লোকশক্তি জড়ো করতে পেরেছিল, তার দ্বারা ভারতীয়দের প্রতিরোধ অতিক্রম করা সবসময় সহজসাধ্য ছিল না। যা পর্তুগিজ, ফরাসি এবং ইংরেজদের নানা সময়ে চুক্তিবদ্ধ হতে প্রণোদিত করেছিল এবং ভারতীয় শক্তিগুলিকে অধীনস্থ সহযোগী হিসেবে ব্যবহার করতে বাধ্য করেছিল, তা হলো ঠিক এই কারণটি। ব্রিটিশরা মহীশূরের এবং মারাঠাদের অশ্বারোহী বাহিনীকে পরাজিত করতে বেগ পেতে হয়েছিল এবং উভয়ের বিরুদ্ধেই তিনটি করে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। প্রথমোক্ত শক্তির বিরুদ্ধে স্যর আয়ার কূট-এর কঠোর পরিশ্রম এবং শেষোক্ত শক্তির বিরুদ্ধে লর্ড লেক-এর কঠিন লড়াই ব্রিটিশদের সামরিক ইতিহাসে শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, এই ঔপনিবেশিক বিজয় ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা এবং মধ্যযুগের রাজনৈতিক শক্তির চেয়ে তা গুণগতভাবে ভিন্ন এক রাজনৈতিক শক্তিবিন্যাসের সৃষ্টি করেছিল। যদিও আগেকার সাম্রাজ্যগুলি ভারতে যারা বহিরাগত তেমন ব্যক্তি বা তাদের উত্তরসূরিরাই প্রতিষ্ঠা এবং শাসন করেছিলেন তবু তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র এক যুগ ভারতের ইতিহাসে সূচনা হলো, যে শাসন চরিত্রগতভাবে ঔপনিবেশিক।

ঔপনিবেশিক মানুষজনকে দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে দিয়ে বিশাল এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখা অবশ্য ঔপনিবেশিক বিজয় থেকে অনেক কঠিন কাজ। এই নিয়ন্ত্রণ আরও কঠিন হয়েছিল এজন্য যে মাতৃভূমি এবং উপনিবেশের মধ্যে ছিল বিশাল দূরত্ব এবং দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থারও অভাব ছিল। এর ফলেই নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা এনে দিয়েছিল। অবশ্যই ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগের ভূমিকাই ছিল প্রধান, বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসনের আদি পর্বে, যখন রাষ্ট্রের মতাদর্শগত যন্ত্রের গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। কিন্তু কেবল শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা দীর্ঘকালীন আধিপত্য নিশ্চিত করা যায় না। তা সম্ভবও নয়। সুতরাং এর বিকল্প হলো অধীনস্ত মানুষদের দিয়েই আধিপত্যকে স্বীকার করিয়ে দিয়ে আধিপত্য চালিয়ে যাওয়া এবং এর পথ হলো আধিপত্যবাদের মধ্যেই 'গুণাবলী'র আন্তর্জাতিকরণ। উপনিবেশিক সংস্পর্শের ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে যে ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, তারা এই প্রক্রিয়ায় ছিল অনেক সময় সক্রিয় সহযোগী, যদিও উত্তরকালে তাঁরা এটা মেনে নেয় নি। এই প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিক নীতি ছিল দু'মুখো : একদিকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিন্দাবাদ ও ধ্বংসসাধন এবং অন্যদিকে আধিপত্যবাদ।

আফ্রিকার ঔপন্যাসিক Ngugi Wa Thiongo, ভাষার রাজনীতি বিষয়ে এক প্রণিধানযোগ্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং মত প্রকাশ করেছেন যে 'সাংস্কৃতিক বোমা' হলো ঔপনিবেশিকতার সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। তাঁর যুক্তি হলো, সাংস্কৃতিক বোমার উদ্দেশ্য হলো অধীনস্ত মানুষদের 'তাঁদের নামের প্রতি বিশ্বাস, ভাষার প্রতি মমত্ব, পরিবেশ, লড়াইয়ের ঐতিহ্য, তাদের ঐক্যবোধ, তাদের ক্ষমতা ইত্যাদি ধ্বংস করে জনগণকে হীনবল করে দেওয়া।'"[১]

দেশীয় ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উপর যে ওয়া থিয়োনগো জোর দিয়েছেন, কারণ সারা পৃথিবীতেই এটাই ঔপনিবেশিকতার অন্তরঙ্গ অংশ এবং এর দ্বারা উপনিবেশে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। এর বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র ধ্বংস এবং লুণ্ঠন নয়, যদিও তা ভালো মাত্রায় ঘটেছিল। দক্ষিণ আমেরিকার মায়া সভ্যতার আমলের পিরামিডগুলির উপরিভাগ ধ্বংস করা হয়েছিল; ভারতের সৌধগুলির মণিমাণিক্য খুলে নেওয়া হয়েছিল — এগুলি থেকেই ঔপনিবেশিক আগ্রাসন ও সম্প্রসারণবাদের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয়দের মতন, গোয়াতে পর্তুগিজরাও উপাসনাস্থল বিনষ্ট করেছিল। এগুলি নিছক ধর্মীয় ব্যাপার নয়, মধ্যযুগে এমন ব্যাপার ছিল রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনেরও অঙ্গ।

বলা হয়ে থাকে যে ঔপনিবেশিকতা অধীনস্থ মানুষজনকে ইতিহাস থেকে বঞ্চিত করে — কথাটির অর্থ এই যে ঔপনিবেশিকতা অধীনস্থ জনগণকে তাদের সাংস্কৃতিক অধিকার. আত্ম-পরিচয় এবং বিকাশের গতি থেকে বঞ্চিত করে। উপনিবেশভুক্ত দেশগুলি তাদের সাংস্কৃতিক হস্তশিল্পকর্ম প্রচুর হারিয়েছে। ইয়োরোপের অনেক যাদুঘরেই তার চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। এইসব সাংস্কৃতিক হস্তশিল্পকর্মের হস্তান্তর যা ঔপনিবেশিকতার ফলে ঘটেছিল তা শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের নমুনা নয়, তার চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ও নতুন সাংস্কৃতিক সৃজন থেকে এর দ্বারা তারা বঞ্চিত হয়। ঔপনিবেশিক আমলে স্থান নামের পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতন। এর দ্বারা পুরাতন চিহ্ন লুপ্ত করে বলপূর্বক নতুন চিহ্ন আরোপ করা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে দেশীয় বিদ্যাকে প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়, কখনও কখনও তা অপূরণীয় ক্ষতির পর্যায়ে চলে যায়।

তাদের সাংস্কৃতিক বিজয় অভিযানে ঔপনিবেশিকতা শুধুমাত্র দেশীয় সংস্কৃতিবে বাতিল বা ধ্বংস করার পদ্ধতিই গ্রহণ করেছে এমন নয়। ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক তৎপরতার মধ্যে ছিল উপনিবেশের অধীনস্থ জনগণের সাংস্কৃতিক আচরণকে গ্রাস করে তাতে নতুন অর্থ আরোপ করে দিয়ে ঔপনিবেশিক জনগণের নতুন এক পরিচয় গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাপারটির এক ভালো উদাহরণ ব্রিটিশরা যেভাবে

শাসকদের দরবারে, অথবা গৃহের অভ্যন্তরে অথবা উপাসনাস্থলে প্রবেশ করতে হলে ভারতীয়দের জুতো খুলে রেখে ঢোকার যে ঐতিহ্যগত অভ্যাস ছিল। তা গ্রহণ করার মধ্যে পাওয়া যায়।

যে সমস্ত ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারী ভারতীয় শাসকদের সঙ্গে কর্মরত ছিলেন তাদেরও এই আচরণ পালন করতে হত সম্মান জানানোর অঙ্গ হিসেবে, অনেকটা ইয়োরোপীয়গণ যেমন টুপি খুলে সম্মান জানায়। ব্রিটিশ কর্মচারীবৃন্দ এই বিদেশী প্রথা ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সম্মানের পক্ষে হানিকর মনে করে বাতিল করেছিলেন। যাইহোক, কিন্তু সেই ব্রিটিশরাই যখন সার্বভৌম ক্ষমতায় শক্তিধর হয়ে উঠলো। তারা এই প্রথাটিই তাদের উচ্চক্ষমতা দেখাতে গ্রহণ করেছিল। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের এক ঘোষণায় বলা হলো যে, "যে কোনও দেশীয় ভদ্রলোক যদি সরকারি ভবনে কিংবা বিচারালয়ে দরবারে যায়, তাহলে তাদের দেশীয় প্রথা বলে মেনে চলতে হবে এবং দরোজার সামনে জুতো খুলে ঢুকতে হবে।" আমোদ-প্রমোদের পার্টিতে ব্যতিক্রম হতে পারে বটে, তবে যদি ভারতীয়রা ইয়োরোপীয় জুতো-মোজা পরে যায়। ভারতীয়রা এটিকে ব্রিটিশ কর্তৃক সাংস্কৃতিক প্রথা চাপিয়ে দেওয়া বলে ব্যাখ্যা করেছিল। যদিও গোড়াতে এই আইন শুধু গভর্নর জেনারেলের দরবারে যাওয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল, কিন্তু ক্রমে আমলাতন্ত্র এটি সাধারণ প্রথা বানিয়ে ফেলে, কারণ ততদিনে ব্রিটিশ রাজ্যের সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে 'জুতো খুলে সম্মান জানানো', হিসেবে পরিচিত হয়। যেহেতু এই প্রথার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সমস্ত সরকারি অফিসে এবং বিচারালয়ে প্রয়োগের আইনকে ভারতীয়রা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। সেজন্য আইনটি শুধুমাত্র ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারীর কাছে সরকারি ও আধাসরকারি অনুষ্ঠানে যে সমস্ত ভারতীয় যাবেন, তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হল।[২]

'জুতো খুলে সম্মান জানানো'র প্রথা গ্রহণ করার পিছনে যৌক্তিকতা ছিল এটি নতুন কোনও উদ্ভাবন নয়, বরং দেশীয় অভ্যাস। ব্রিটিশরা দাবি করেছিল যে অতীতে শাসকশ্রেণীর লোকজন ও প্রজারা যে প্রথা ব্যাপকভাবে মেনে চলতেন, তারা সেই প্রথাই গ্রহণ করেছে মাত্র। কিন্তু এই ধরণের আত্মসাৎ করার কোনও প্রকৃত ভিত্তি নেই। কারণ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাশীল ছিল না। উপনিবেশের অধীনস্থ মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার কারণ ভিন্ন, দেশীয় মানুষদের সংস্কৃতির, অন্তত আংশিকভাবে সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে শাসনের বৈধতা লাভ। অদৃষ্টের পরিহাসে, এর দ্বারা ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে শাসিতদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য কমে না এসে বরং বেড়ে গিয়েছিল।

ঔপনিবেশিকতার সাংস্কৃতিক প্রকল্পের প্রধানতম প্রণোদনা অবশ্যই সংস্কৃতি মেনে

নেওয়া নয়, পরিবর্তন করা, এজন্য সাংস্কৃতিক বোধবুদ্ধি এবং বুদ্ধিবৃত্তিগত মানসিকতা জড়িয়ে নেওয়ার দরকার ছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তার মতাদর্শগত পরিকাঠামোর মধ্যে কাজ করতে করতে এই পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন করেছিল অন্যান্য এজেন্সিগুলি এবং অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যাতে ভারতীয়রাও অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতীয়দের সহযোগিতা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে তত্ত্ব এবং আচরণ আঙ্গীকরণ সহজতর হয়েছিল। এই যৌথ প্রচেষ্টার ফলে এক ঔপনিবেশিক মন্ময়তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল যার মাধ্যমে এক আত্মদর্শন বেরিয়ে আসে যা উপনিবেশিকতা গ্রহণ করতে চেয়েছিল। এ প্রক্রিয়ার এক চিত্তাকর্ষক আলোচনা পাওয়া যায় মালয়েশিয়ার শ্রমজীবীদের মানসিক জগৎ নিয়ে লেখা এক উপন্যাসে। যার নাম 'দ্য মিথ অফ্ দ্য লেজি নেটিভ', লেখকের নাম সৈয়দ হুসেন আলাতাস। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন কী করে ঔপনিবেশিক প্রভাবে রবার চাষে নিযুক্ত শ্রমিকগণ তাদের নিজেদের আলস্যে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল।[৩] ঔপনিবেশিক প্রভাবে জাতীয় চরিত্রের গঠন কিংবা পুনর্গঠন বিচার-বিশ্লেষণের এক চিত্তাকর্ষক ক্ষেত্র। যেমন ছিল তাঁর ঔপনিবেশিক অভিসন্দর্ভে যেমন চিরায়ত চরিত্রায়ন করেছিলেন, বিশ্বের সর্বত্র ভারতীয়রা এখন যা বিশ্বাস করে সেই ছলনাময় এবং প্রতারক চরিত্র ঔপনিবেশিকতারই সৃষ্টি কিনা, তা বিচার করে, দেখার মতো।[৪] অন্তত সাধারণভাবে যাকে 'আধুনিক ভারতের জনক' বলে স্বীকার করা হয়, সেই রামমোহন রায় বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় চরিত্রে অনেক বৈশিষ্ট্যই ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াকলাপ থেকে জন্ম নিয়েছে।[৫] উপনিবেশের প্রজারা যে এক ধরণের হীনমন্যতা এবং পরনির্ভরশীলতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, তা সাধারণভাবে স্বীকৃত। কী করে ভারতীয়রা এগুলি আয়ত্ব করল, তা যতখানি মনস্তত্ত্বের বিষয় ততখানিই সংস্কৃতির। এই বিষয়েও ম্যানোনি এবং ফ্রান্জ ফ্যানন-এর মধ্যে আদানপ্রধান যথেষ্ট কৌতূহলের উদ্রেক করে। ম্যানোনি যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অবস্থা বলে পরিত্যাগ করা ঠিক নয়। যদিও অবশ্যই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক। কিন্তু কিভাবে সেই অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট তার খুঁটিনাটিও ভালো করে বিচার করা দরকার। যেমন বলা যেতে পারে এটি সম্মানের জন্য লড়াই, বিচ্ছিন্নতাবোধ, পদ নিয়ে দরকষাকষি, কৃতজ্ঞতার ঋণ। নতুন অতিকথন আবিষ্কার এবং নতুন ধরণের ব্যক্তিত্বের সৃজনের মধ্যে লক্ষণীয়।"[৬]

যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঔপনিবেশিকতা ঘটাতে চেয়েছিল তার ভিত্তিভূমি ছিল দেশীয় সংস্কৃতির হীনমন্যতা, যে সংস্কৃতি আধিপত্যবাদের প্রক্রিয়ার দাপটে হয় প্রান্তিক হয়ে পড়েছিল অথবা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিকে সুবিধে

পাইয়ে দেবার ব্যাপারে কোনও পদ্ধতিই বাদ দেওয়া হয়নি। শিক্ষা, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, বস্তুত জ্ঞানের প্রতি শাখাতেই এই স্থানচ্যুতি ঘটেছিল। ভারতীয় সাংস্কৃতিক কৃতিত্বকে মেকলে যে বাতিল করে দিয়েছিল, তা কোনও বিকৃত বা অজ্ঞতাপ্রসূত ছিল না, এটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদকে মদত দেওয়ার প্রতিফলন মাত্র। নতুন সাংস্কৃতিক নীতির ফলে যে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হলো, তাঁরা মেকলে যেমন চেয়েছিলেন, তেমন 'তাদের এবং আমাদের মধ্যে দোভাষী' তো হলোই, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতির বাহক এবং ধারক হলো। ঔপনিবেশিব সংস্কৃতিকে বৈধতা দেওয়ার ব্যাপারে এবং এই ভাবে তাকে অধীনস্থ মানুষদের কাঙ্খিত লক্ষ্য করে দেওয়ার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

যাঁরা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির মহিমায় বিভোর ছিলেন তাদের মানসিকতায় ঔপনিবেশিক বৃহৎ নগরী সংস্কৃতির পীঠভূমি হিসেবে প্রতিভাত হলো। এডওয়ার্ড শীলস্ যেমন দেখিয়েছেন, তারা এক সাংস্কৃতিক প্রাদেশিকরণ করে তুললো এবং নিজেদের জীবনে ধার করা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং আচার-আচরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে নিতে চাইলো।[৭] অনেকে এই দূরবর্তী ও অনেক সময় বাস্তবে অগম্য আদর্শকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইলেন। যদিও এই প্রক্রিয়ার ফলে শেষপর্যন্ত ব্যাপারটি কিম্ভূতকিমাকার হয়ে দাঁড়ালো। এটিই ছিল সম্ভবত ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সবচেয়ে করুণ পরিণতি, যার ফলে অধীনস্থ তাদের নিজেদের সংস্কৃতির ঘনিষ্ট থাকার অধিকারও হারালো, আবার অপরেরটিও পূর্ণভাবে লাভ করতে পারলো না। এটি ছিল এক সাংস্কৃতিক ট্রাজেডি এবং এর থেকে পরাধীন প্রজারা মুক্তি পেতে পারত কেবলমাত্র স্বাধীনতার দ্বারা। কিন্তু তখন ঔপনিবেশিক মতাদর্শের এতই প্রবল যে, তাদের এক বড়ো সংখ্যার মানুষই শেষ পর্যন্ত চরম হতাশায় ভুগলো, যেমন আমরা দেখি এম. মুকুন্দন এর লেখা মালয়ালাম উপন্যাস 'মায়ালি নদীর তীরে' (Mayyazhi Puzhayude Thirangali) বইতে।[৮]

ঔপনিবেশিক ভারতে যে সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বিকাশ লাভ করেছিল, তা অবশ্য এক উৎসজাত নয়। এটির উৎপত্তি দেশীয় এবং ঔপনিবেশিক উভয়বিধ উর্মিমালা থেকে। বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এক নতুন আধুনিক সাংস্কৃতিক চেতনা মূল্যবোধ ও সংবেদনশীলতা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল, যে মূল্যবোধ ঔপনিবেশিকতার মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে আসা পাশ্চাত্যের আদর্শ ও মূল্যবোধ সঞ্জাত, যদিও তা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়। এটি এক জটিল আদান প্রদান, যা ১৮৯২-তে প্রকাশিত 'ইন্দুলেখা' উপন্যাসে অত্যন্ত সৃজনশীলভাবে আত্মস্থ করেছিলেন ও চান্দু মেনন। এটি এক আশ্চর্য দলিল। উনিশ শতকের মালাবার অঞ্চলে সামাজিক ও মতাদর্শগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে যে সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার পরিচয় এতে বিধৃত। উপন্যাসটির আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু

থেকে বোঝা যায় কী ভাবে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ঔপনিবেশিক অধীনতার থেকে আধুনিকতার সঙ্গে বোঝাপড়া করছিল অথচ ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করেনি। উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র মাধবন এবং ইন্দুলেখা এই নবোত্থিত সংস্কৃতির ধারণার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইন্দুলেখার সাংস্কৃতিক বুদ্ধিবৃত্তিগত গুণাবলী এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

> ইন্দুলেখা ছিল ইংরেজিতে খুবই পারঙ্গম, তার সংস্কৃত পড়াশুনোর মধ্যে ছিল নাট্যধর্মী লেখকদের রচনা, গানবাজনার ক্ষেত্রে সে শুধুমাত্র ঐকতানের তত্ত্ব শিখেছিল এমন নয়। নিজেও ভালো পিয়ানো, বেহালা এবং ভারতীয় বাঁশি বাজাতে পারত। একই সঙ্গে তাঁর কাকা সুন্দরী ভাইঝিকে সূচীকর্ম শিক্ষাদিতেও ভোলেন নি, যেমন অঙ্কনবিদ্যা ও অন্যান্য শিল্পকর্মে, যাতে ইয়োরোপীয় মহিলারা প্রশিক্ষিত। বস্তুত, তাঁর প্রাণের সাধ ছিল যে ইন্দুলেখা ইংরেজ মহিলাদের মতন গুণাবলী ও সুরুচি লাভ করুন। তাঁর এই অভীষ্ঠ সিদ্ধ হয়েছিল তাঁর মতন উদার ও সঠিক বিবেচনার মানুষের জন্যই ষোল বছর বয়সের মধ্যেই ইন্দুলেখা সব আয়ত্ত করেছিল।[৯]

চান্দু মেনন যে এই সাংস্কৃতিক আদর্শ আনলেন, তা অনেকটাই নির্মাণ করা কেন তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে উনিশ শতকের মালাবারে ঐ ধরণের গুণাবলী সঙ্কলিত মহিলা আদৌ ছিল কিনা সন্দেহ। তবু, এটা ছিল তারই নিদর্শন যা বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আকাঙ্ক্ষা করত এবং ঔপনিবেশিক উপস্থিতি থেকে তারা এটি প্রত্যাশাও করত। বাস্তবজীবনে যদিও আকাঙ্ক্ষা ও পাওয়ার মধ্যে ছিল অনেক ফারাক।

সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের এমন কোনও ক্ষেত্র ছিল না যা ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। তথাপি ভারতীয় সভ্যতার সমৃদ্ধ ও জটিল সমাজের জন্য ও এব স্থিতিস্থাপকতার জন্য ঔপনিবেশিকতা যা করতে পেরেছিল, তা আংশিক রূপান্তর মাত্র, সম্পূর্ণ পুনর্গঠন নয়। তাছাড়া এটি ভারতে ঔপনিবেশিক নীতির বিষয়সূচীর মধ্যে ছিল না, কারণ ঔপনিবেশিকদের সাংস্কৃতিক নীতি দ্রুত পরিবর্তনের বদলে 'ধীরে চলো' পদ্ধতিতে প্রভাবিত ছিল। এই জন্যই অন্যান্য বাধ্যবাধকতা ছাড়াও, রাষ্ট্র একদিকে যেমন ধর্মান্তকরণে মদত দেয় নি, তেমনি দেশটিকে ইয়োরোপীয়দের বসতি হিসেবে গড়ে তোলেনি। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের বিষয়টি মাথায় রেখে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসাবে আত্মসাৎ এবং সৌহার্দ্যকেই অগ্রাধিকার দিত। তবু সংস্কৃতি বিষয়টি দ্বন্দ্ব এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্র হয়ে দাড়াল কেননা কিছু কিছু নীতি অধীনস্থ জনগণের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের উপর আঘাত করেছিল। এই প্রতিরোধ নিজেদের নতুন করে শক্তিশালী হয়ে ওঠার সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা এবং এই প্রচেষ্টা থেকেই পুনরুত্থানবাদের জন্ম।

ধর্মীয় সুদৃঢ়করণ এবং পুনরুত্থানবাদে ঔপনিবেশিকতার অনুঘটকের ভূমিকা তেমনভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে স্বাজাত্যবোধের বিকাশ হয়। তার উৎস জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ঔপনিবেশিকদের হস্তক্ষেপ। অতীতের সংস্কৃতি অনুসন্ধান, যাকে আমিলকার কারবাল বলেছেন, 'উৎসমূলে ফিরে যাওয়া', তাই সম্প্রদায়গত চেতনার সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং বিশেষভাবে হিন্দুদের মধ্যে এক ধরণের সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে। তারা যে তত্ত্বের জন্ম দেয় তা সকলের ব্যবহৃত এক সর্বজনগ্রাহ্য প্রবচনের মধ্যে দিয়ে চালু হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সতীদাহ দমন কিংবা বাল্যবিবাহ রোধ অথবা বিবাহের জন্য ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের উদ্‌যোগ, হিন্দুদের অতীতের প্রকৃত সাংস্কৃতিক আচরণ নিয়ে এক ধরণের বিতর্কের সৃষ্টি করে। যারা পক্ষে এবং যারা বিপক্ষে ছিলেন উভয় পক্ষই একই ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রহকে সাক্ষী মেনেছিল এবং ধর্ম-জাত চৈতন্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। এমনকি যারা বিরোধীপক্ষ তারাও।

সম্প্রদায়গত ঐক্য গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে, বিশেষত হিন্দুদের মধ্যে, একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরের লক্ষ্যে ক্রিয়াকলাপ। এটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল কারণ সরকারি উচ্চ পদাধিকারীদের সঙ্গে মিশনারীদের যোগাযোগ লক্ষ্য করা যেত। যদিও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কখনও তেমনভাবে রাজনৈতিক সমাধান হিসেবে ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়ার কথা বিবেচনা করেনি, তবুও অনেকের কাছে ধর্ম হারিয়ে ফেলার ভয় ছিল এক বাস্তব সত্য, বিশেষত দেশের নানা স্থানে মিশনারীদের আগ্রাসী প্রচারকার্যের কারণে। এই শঙ্কার প্রথম বহি:প্রকাশ আমরা দেখি তত্ত্ববোধনী পত্রিকার বিভিন্ন লেখায়, যে লেখাগুলি শতকব্যাপী প্রকাশিত হয়েছিল নানাভাবে, কখনও রক্ষণমূলক কখনও আক্রমণাত্মকভাবে। পশ্চিমভারতে বিষ্ণু বাওরা ব্রহ্মচারীর মিশনারী প্রচারের বিরুদ্ধে তৎপরতা এই প্রবনতার আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[১১] চীন কিংবা অন্যান্য অনেক দেশের মতো মিশনারী-বিরোধী চেতনা ভারতবর্ষে জঙ্গী রূপ নেয়নি, এটা কেবল ধর্মীয় সংরক্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছিল যার ফলে অভ্যান্তরীণ ক্ষেত্রে কতিপয় সুদৃঢ়করণ বৃদ্ধি পায়।

ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু এবং মুসলমানদের উভয়ের প্রতিক্রিয়াই ছিল মূলত অভ্যান্তরীণ দৃষ্টিকোণ থেকে, অতীতের সাংস্কৃতিক সমাজের বিষয়ে এক বিচার-বিশ্লেষণী আত্মসমীক্ষা করে যার উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় সাংস্কৃতিক প্রথাগুলিকে শক্তিশালী করা। হিন্দুদের মধ্যে এই আত্মসমীক্ষায়, সংস্কৃতি ছিল প্রাচীন হিন্দু অতীতের সমার্থক। এই প্রক্রিয়ার ফলে হিন্দুদের মনে অতীতের কৃতিত্বগুলি স্বর্ণযুগের ধারণা সৃষ্টি করে তাতে সর্ববোধ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দয়ানন্দ সরস্বতী, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ

ঘোষ এবং অনেকের বক্তব্যেই উনিশ শতকের হিন্দু ধর্মচিন্তার মধ্যে এই ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে। সর্বজনীনতাকে তুলে ধরার পরিবর্তে, আধ্যাত্মিকতা এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তাঁদের অনুরাগ তাদের হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল।

এই ধরণের সংকীর্ণ চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সাম্প্রদায়িক ইতিহাসের মধ্যস্থতা। ঔপনিবেশিক প্রবক্তারা ভারতের অতীতের এক সম্প্রদায়গত দৃষ্টিকোণ তৈরি করেছিল, যার খুব সুন্দর উদাহরণ হলো জেমস মিল কর্তৃক ভারতীয় ইতিহাসকে হিন্দু এবং মুসলিম যুগে বিভক্ত করা, যা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধর্মভাবাপন্ন সদস্যগণ আত্মস্থ এবং সম্প্রসারিত করে নিয়েছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিগত কয়েক শতকের হিন্দুদের অধঃপতনের জন্য দায়ী করেছিল অন্যদের তৈরি অনুপ্রবেশকে। তাদের মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যতের ব্যাপারে অনুমান করে নিয়েছিল — এর পরিচয় পাওয়া যাবে ইউ এন মুখার্জির "*আ ডাইয়িং রেস*" বইতে, যেখানে পুনরুত্থানের মধ্যে এই বিপদের সমাধান খোঁজা হয়েছে।[১২]

ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে চলমান আলোচনার মধ্যে ঔপনিবেশিকতার সাংস্কৃতিক ফলাফলের কিছু প্রাসঙ্গিকতা আছে। র‍্যাডিক্যাল থেকে নয়া - ঔপনিবেশিক নানা ধরণের পন্ডিতগণ তাদের আগেকার জাতীয়তাবাদী এবং মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে করা ঔপনিবেশিকতার সমালোচনার মত পুনর্বিবেচনা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ মানব জাতির পক্ষে কল্যাণজনক এই পুরানো তত্ত্ব। বিশেষকরে এর শিকার যারা তাদের পক্ষে এটি ভালো, এই মত আবার সম্প্রতি নতুন করে উঠে এসেছে। একথা বলা হয়েছে যে ঔপনিবেশিকতা হচ্ছে 'সামাজিক রূপান্তর এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির এক প্রবল শক্তি এবং এর প্রভাবে উপনিবেশগুলিতে অধিকতর বিকাশ সম্ভব হয়েছিল যা এটি ছাড়া অন্যভাবে সম্ভবপর ছিল না। ঔপনিবেশিকতার প্রগতিশীল চরিত্রের উপর জোর দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে মার্কসের ভারত বিষয়ক প্রসঙ্গাবলীর উপরে, যেখানে মার্কস ভারতে এক সামাজিক বিপ্লব ঘটানোর পিছনে ইংল্যান্ডকে 'ইতিহাসের এক অচেতন হাতিয়ার' বলে উল্লেখ করেছেন এবং এটাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা অবশ্য মার্কস কর্তৃক ইয়োরোপের ঔপনিবেশিকতাকে যে 'রক্তক্ষয়ী প্রক্রিয়া' বলা হয়েছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়া হয়নি।[১৩]

ভারত ইতিহাসের সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা বলবার চেষ্টা করে যে ঔপনিবেশিক শাসন নতুন কোনও মৌলিক বিচ্ছেদ ঘটায় নি, বরং একাধিক দিক থেকে তা পূববর্তী দেশীয় যুগগুলিরই অব্যাহত প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। নিরবিচ্ছিন্নতা দু'দিক থেকে চিহ্নিত। প্রথমত, ব্রিটিশরা ক্ষমতার জন্য লড়াইতে অংশ নিয়েছিল "নতুন পদ্ধতিগত নীতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে বহিরাগত হিসেবে নয়, বরং উপমহাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ

হিসেবে সমষ্টিগতভাবে। একাজে তারা অন্যাদের চেয়ে বিজয়াভিযানে অধিক সম্পদের অধিকারী ছিল।" দ্বিতীয়ত, ইয়োরোপীয়রা তাই লাভ করেছিল, "যা ভারতীয় শাসকবৃন্দ বিগত একশো বছর ধরে চেষ্টা করে আসছিল, তবে তা ইয়োরোপীয়রা পেল অনেক বড়ো এবং সর্বগ্রাসী ভাবে। এই বিজয়ের অভীপ্সার ধাক্কায় সাড়া দিয়ে ভারতীয়রা হলে 'সক্রিয় এজেন্ট। শুধু ঔপনিবেশিক ভারত প্রতিষ্ঠায় নিষ্ক্রিয় দণ্ডায়মান দর্শক বা বিজয়ের বলি হিসেবে নয়।" এই যুক্তিগুলিই ভারতের আদি যুগের পুঁজিবাদী গোষ্ঠীগুলি 'অধিকতর ভারি প্রমাণ' হিসেবে মেনে নিয়ে সমর্থন করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় শাসনকে ভাঙার কাজে কোম্পানির কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশায়। এর থেকে মনে হয় "ঔপনিবেশিকতা ছিল দক্ষিণ এশিয়ার নিজের পুঁজিবাদী বিকাশের ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতি।" পার্থ চট্টোপাধ্যায় যেমন লিখেছেন :

> এক সময় অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গঠন হিসেবে ঔপনিবেশিকতাকে দেখা হত পুঁজিবাদের বিকাশের দেশীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। একই দেশীয় ইতিহাসের অন্তরঙ্গ অংশ হিসেবে, 'ঐতিহাসিক তত্ত্বের' অপরিহার্য যুক্তি রূপে যা কিছু ঔপনিবেশিক শাসনকে অনুসরণ করেছিল সবকিছুকেই ধরা হত। এই ভাবে ১৮২০ থেকে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন যখন আধুনিক শিল্পায়নে উত্তরণের সম্ভাবনা চিরতরে বন্ধ করার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক অববিকাশের সমস্ত রকম বৈশিষ্ট দেখা দেয়। তখন তা বহিরাগত শোষণমূলক শক্তির প্রক্রিয়া সঞ্জাত না ধরে, ভারতীয় পুঁজিবাদের নিজস্ব ইতিহাসের অঙ্গ হিসেবেই ধরতে হবে।[১৪]

মূল প্রশ্নটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান ছিল কি ছিল না, তা নয়। সেগুলি না থাকাটাই আশ্চর্যজনক। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কিছু কিছু প্রবাহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান ছিল। ঔপনিবেশিকতা সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার সবকিছুরই রূপান্তর ঘটায় নি। বস্তুতপক্ষে ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ তাদের অনেক কিছুতে অংশও নিয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে তারা দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ করত বা সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ চালানোর জোরদার প্রবনতা পরিত্যাগ করেছিল। নিরবিচ্ছিন্নতার উপর জোর দিয়ে এবং 'ঐতিহাসিক তত্ত্ব' খাড়া করে সংশোধনবাদী ইতিহাসচর্চা ঔপনিবেশিকতাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যেন পূর্বেকার রাজনৈতিক কাঠামোর মতোই এটি আর একটি রাজনৈতিক কাঠামো মাত্র। ঔপনিবেশিকতা সহ বৃহৎ আখ্যানগুলি সম্পর্কে উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের সংশয় এর উদ্দেশ্য অনুসন্ধানমূলক এবং এই প্রবনতার কিছু পরিমাণে সংশোধনবাদী ইতিহাসচর্চার সঙ্গে মিল আছে। ঔপনিবেশিকতার মধ্যে থেকে তার শোষণ মূলক চরিত্রকে বাদ

দিয়ে দেওয়া উভয়েই তাকে বৈধতা দান করে, যদি ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। বিশ্বায়নের নয়া ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো এই বৈধতা দানের কিছু মতাদর্শগত কার্যকারিতা আছে।

সংশোধনবাদী ইতিহাস সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক হস্তক্ষেপ ঐতিহ্যগত জীবনযাত্রার ধরণ থেকে বিচ্ছেদ, অন্তত যারা ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে পড়েছিল তাঁদের কাছে। প্রত্যুত্তর ছিল বহুমুখী, তার মধ্যে উনিশ শতকের শেষের দিকে পুনরুত্থানবাদী প্রতিক্রিয়া বিশেষ মাত্রা পায়। এই পুনরুত্থানবাদ রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, বস্তুত সংস্কৃতিকে সুবিধা করে দিয়েছিল এবং এক ধর্মাশ্রয়ী সাংস্কৃতিক অতীতকে নতুন করে তুলে ধরেছিল। এই প্রক্রিয়ায় জাতীয় সংস্কৃতির পূর্বসূরী হিসেবে ইতিহাসকে ব্যবহার করা হয়েছিল। এর ফলে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ সংস্কৃতি সম্পর্কে এক স্থবির ধারণা করে নিয়েছিল যার দ্বারা শুধুমাত্র ভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার অস্তিত্বই যে উপেক্ষা করেছিল এমন নয়, নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবনের চলমানতাও তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে নিয়েছিল। আরও খারাপ ব্যাপার হলো, পাশ্চাত্যের প্রতিপদ্ধাকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মোকাবিলা করতে পারার ব্যাপারে অক্ষমতা। এজন্য তারা বাইরের কারণকে দায়ী করেছিল। ভারতীয় সভ্যতার নানা কৃতিত্বগুলির ধ্বংসের জন্য তারা দায়ী করেছিল বহিরাগত অনুপ্রবেশকে, বিশেষভাবে মুসলমানদের যারা মধ্যযুগে দেশ শাসন করেছিল। এর ফলে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিকভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে ইন্ধন যুগিয়েছে।

আত্মপরিচয়ের সন্ধানে নবজাগরণ এবং পুনরুত্থানবাদ উভয়ই অন্তরঙ্গ অংশ। ঔপনিবেশিকতা সেগুলির আত্মপ্রকাশের সাংস্কৃতিক পটভূমি তৈরি করেছিল। কিন্তু সেদুটির কোনটিই প্রত্যক্ষভাবে ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতা করেনি। নবজাগরণের ক্ষেত্রে অবশ্য অতীত ছিল বলবর্ধক শক্তি, অপরপক্ষে পুনরুত্থানকদের ক্ষেত্রে অতীত ছিল শেষ লক্ষ্য। প্রথমটির উপাদানগুলি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের ভিত্তিভূমি তৈরি করেছিল। আর শেষেরটি থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ তার রসদ লাভ করেছিল। সুতরাং সাম্প্রতিক ভারতবর্ষ যে সাংস্কৃতিক বিকল্পের সন্ধান করছে তা নবজাগরণ এবং পুনরুত্থানবাদ এই উপাদানের মধ্যে বেছে নেওয়ার উপর নির্ভর করছে। এমন একটা সময়ে জাতির পরিচয় নতুনভাবে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। যখন এই বেছে নেওয়া শুধু সাংস্কৃতিক দিক থেকে নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও অর্থবহ।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১. Ngugi Wa Thiog'o *ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড ঃ দ্য পলিটিক্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন আফ্রিকান লিটারেচার*, লন্ডন, ১৯৮৬. পৃ. ২।

২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. কে. এন. পানিক্কর, 'গ্রেট শু কোয়েশেন : ট্রাডিশন, লিজিটিমেসি অ্যান্ড পাওয়ার ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, *স্টাডিজ ইন হিস্ট্রি*, ৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, ১৯৯৮।

৩. সৈয়দ হুসেন আলাতাস, *দ্য মিথ অফ দ্য লেজি নেটিভ*, লন্ডন, ১৯৭৭।

৪. জেমস্ মিল বলেছিলেন যদি একটি ঘরের মাঝখানে রাখা স্বর্ণমুদ্রা নেওয়ার সুযোগ একজন ভারতীয় ও একজন ইংরেজকে দেওয়া হয়, তাহলে ভারতীয়রা সবগুলি লাভ করবে, কারণ এজন্য নয় ভারতীয়ের শারীরিক শক্তি বেশি, সে লাভ করবে প্রতারণার সাহায্যে।

৫. জে. সি. ঘোষ (সম্পা), দ্য ইংলিশ ওয়ার্কস অফ রাজা রামমোহন রায়, এলাহাবাদ, ১৯০৬, পৃ. ২৪১-৪২।

৬. ও ম্যানোনি, *ক্যালিবান অ্যান্ড প্রোপেরো ঃ দ্যা সাইকোলজি অফ কলোনাইজেশন*, অ্যান আরবর, ১৯৯০, পৃ. ৮।

৭. এডওয়ার্ড সীলস্, দ্য ইন্টালেকচুয়াল বিটুইন ট্র্যাডিশন অ্যান মডার্নিটি, দ্য ইন্ডিয়ান সিচুয়েশন, দ্য হেগ, ১৯৬১, পৃ. ২৭-২৮।

৮. এই সূত্রটি বিস্তারিত আলোচনার জন্য কে এন পানিক্কর 'নভেল অ্যান ইমাজিনড হিস্ট্রি', *মালয়ালাম লিটারারি সারভে*, কেরলা সাহিত্য আকাদামি, ত্রিচুর, ২০০০।

৯. ও চান্দু মেনন, *ইন্দুলেখা*, ইংরেজি ভাষার W. Dumergue কালিকট, ১৯৬৫, পৃ. ১০।

১০. আমিলকার কাবরাল, রিটার্ণ টু দ্য সোর্সেস : সিলেকটেড স্পিচেস অফ আমিলকার কাবরাল, নিউইয়র্ক, ১৯৭৩, পৃ. ৬৩।

১১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য ফ্রাঙ্ক এফ কনলন, 'দ্য পোলেমিক প্রসেস ইন নাইনটিনথ সেঞ্চুরি মহারাষ্ট্র : বিষ্ণুবাওরা ব্রহ্মচারী অ্যান্ড হিন্দু রিভাইভাল, দ্র কেনেথ ডবলু জোনস, *রিলিজিয়াস কন্ট্রোভার্সি ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া*, নিউইয়র্ক, ১৯৯২।

১২. ১৮৭১ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত সেনশাসের তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে মুখার্জী দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে এবং ভবিষ্যতে 'সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন' হওয়ার পথে। 'তাদের নিজেদের দেশেই জনগণ বিপন্ন হয়েছে। পরিশেষে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে - এই ঘটনার অনেক কারণেই হতে পারে। আমাদের ভাগ্যেও তেমন ঘটার সম্ভাবনা।" ইউ এন মুখার্জী, *আ ডাইয়িং রেস*, কলকাতা, ১৯১০, পৃ. ১-৩, আরও দ্র. প্রদীপকুমার দত্ত। 'ডাইয়িং হিন্দুজঃ প্রোডাকশন অফ্ হিন্দু কমিউনাল কমন সেন্স ইন আর্লি টুয়েনটিথ সেঞ্চুরি *বেঙ্গল, ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, ১৯ জুন, ১৯৯৩ এবং *কার্ভিং ব্লকস্ . কমিউনাল আইডিয়োলজি ইন আর্লি টুয়েনটিথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল*, নতুন দিল্লী, ১৯৯৯

১৩. এই সংশোধনবাদী ব্যাখার সমালোচনার জন্য দ্র. আইজাজ আহমেদ, *লিনিয়েজেস অফ দ্য পাস্ট* নতুন দিল্লী, ১৯৯৬, পৃ. ১-৪৩।

১৪. পার্থ চ্যাটার্জী, *দ্য নেশন অ্যান্ড ইটস্ ফ্র্যাগমেন্টস্*, দিল্লী, ১৯৯৫, পৃ. ২৭-২৮।

[২০০০ এর ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের বার্ষিক অধিবেশনে মূল নিবন্ধ হিসেবে পঠিত। মূল ইংরেজি থেকে ভাষান্তর গৌতম নিয়োগী]

প্রাচীন ভারত বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ

সামন্ততান্ত্রিক জটিলতার প্রেক্ষিতে বাণিজ্য : আদি মধ্যযুগের বাংলার একটি উদাহরণ

বিজয় কুমার ঠাকুর

মাননীয় সভাপতি এবং উপস্থিত প্রতিনিধিগণ,

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের কলকাতা অধিবেশনের প্রাচীন ভারত বিভাগের সভাপতিত্ব করার জন্য যে আমন্ত্রণ আমাকে জানানো হয়েছে, তা শুধু সম্মানজনকই নয়, এই উপলক্ষে আমার যে গবেষণাগত নির্দিষ্টতা রয়েছে, তাও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এর জন্য আমি সংসদের কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এ বিষয়ে যে অল্প গবেষণা আমি করেছি, তা প্রধানত প্রাচীন ভারতের সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন ধারাগুলিকে নিয়েই নির্ণীত। সেই প্রেক্ষিতেই আমি এখানে আদি মধ্যযুগের বঙ্গ, ক্রমশ উদীয়মান যৌগিক সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোয় এই অঞ্চলের স্থান এবং এই ঘটনার সঙ্গে তৎকালীন নাগরিক পরিকাঠামোর সংযোগ ও সঙ্গতি — এই বিষয়ের দিকেই আলোকপাত করব।

আদি মধ্যযুগীয় বাংলার বাণিজ্যিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত্র গবেষণা শুরু করতে হবে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও এ বিষয়ে যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্মিত হয়েছে, তার মূল্যায়ন দিয়ে। এই অঞ্চলের সামাজিক বিন্যাসের ধারাগুলিকে সামগ্রিক ভাবে মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকা বিস্তৃত বা সমপ্রকৃতির সামাজিক গতিশীলতার সঙ্গে যে ভাবে মেলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, তাতে গুরুতরভাবে দৃষ্টিভঙ্গিজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরণের ভুল সূত্রবদ্ধ বর্ণনা প্রত্যক্ষ করার কারণ লুকিয়ে রয়েছে আমাদের গুপ্ত পরবর্তী যুগের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির স্থান পরিবর্তনের পরিকাঠামোগত গুরুত্বকে সঠিকরূপে মূল্যায়ন করার অনাগ্রহের মধ্যে। সংস্কৃতি/সভ্যতার মূল অঞ্চল অর্থাৎ মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় বস্তুগত বুনিয়াদ নিঃশেষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে আঞ্চলিক শাখাপ্রশাখার বুনোট ও বিস্তৃতির প্রক্রিয়া দানা বাঁধতে থাকে।

অন্য কথায়, এই যুগে বাংলার মত প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে রাষ্ট্রগঠনের বিকাশ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পর্যায়গুলির উদ্ভব প্রত্যক্ষ করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই মূল অঞ্চলের সামাজিক বিবর্তনের গতিকে বোঝার জন্য যে তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করা

হয়েছে। তার সঙ্গে এই নবউদ্ভূত আঞ্চলিক সংস্কৃতিগুলির সম্পূর্ণ সাযুজ্য থাকবে না। আদি মধ্যযুগীয় ভারতের ঐতিহাসিক বিন্যাসের প্রক্রিয়াতে এই স্থানজনিত বা ভৌগোলিক জটিলতার দিকটি প্রচ্ছন্নভাবে উপেক্ষিত হয়, বিশেষ করে বর্তমানের আদি মধ্যযুগের বঙ্গীয় বাণিজ্য বিষয়ক গবেষণায় তা উপেক্ষিত। তার কারণ এই সব প্রচেষ্টাগুলির বেশির ভাগই আর. এস. শর্মার লিখিত 'ভারতীয় সামন্ত্রতন্ত্র'র বিষয়সূচী বা নির্দেশিত প্রণালীকে লক্ষ্য করেই রচিত। এই তত্ত্বেরই আর একটি দিক হল এই সময়ের প্রেক্ষিতে বাণিজ্যের অস্তিত্বের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি। এই তত্ত্বের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রতিপক্ষদের এই একটি বিষয়কে লক্ষ্য করেই সমস্ত আলোচনা নির্দিষ্ট করার প্রবণতা সামগ্রিক আলোচনার ধারাকে বিক্ষিপ্ত করেছে। প্রতিপক্ষদের আলোচনায় বিশিষ্ট আঞ্চলিক উপকরণগুলিকে মৌলিক বলে দেখানো হয় এমনকি বিক্ষিপ্ত উদাহরণগুলিকে বিষয় আন্দাজে বিরাটাকার করে তুলে ধরা হয় সামন্ততন্ত্রের তত্ত্বকে ধ্বংস করার জন্য। বর্তমানের এই প্রচেষ্টাটি আদি মধ্যযুগে বঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের বুনোটকে তার যথার্থ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থিত করার প্রয়াস, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ অঞ্চল সম্বন্ধীয় মৌলিক ও পরোক্ষ উপাদানের ভিত্তিতে এই সমগ্র অঞ্চলটির বাণিজ্যিক বিন্যাসের ধারাটিকে সঠিকরূপে সনাক্ত করায় নিয়োজিত।

গুপ্ত পরবর্তী যুগের বাণিজ্যের লক্ষণীয় হ্রাস ঘটার তথ্যটির বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ পরীক্ষিত প্রমাণাদি একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রায়শই এই সত্যকে উপেক্ষা করা হয়। সম্প্রতি এম. আর. তরফদার, আদি মধ্যযুগীয় বঙ্গের বিভিন্ন ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থানের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে দক্ষিশ-পূর্ব বঙ্গের বিষয়ে এইরূপ একটি অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই অঞ্চলটিতে একটি সুবিন্যস্ত মুদ্রা-নির্ভর অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেছিল, যার পশ্চাতে ছিল সুসংবদ্ধ বিশদ মুদ্রাব্যবস্থা, উন্নতিশীল নগরকেন্দ্র ও উন্নত বাণিজ্যিক যোগাযোগের ব্যবস্থা।[১] এই মতের স্বপক্ষে যে তথ্যপ্রমাণগুলি তিনি তুলে ধরেছেন, তা অবশ্যই বিতর্কের অবকাশ রাখে। তিনি গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী যুগের ৩৫০টি মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলি ময়নামতী - লালমাই পর্বতাঞ্চলের খননকার্যের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রাপ্ত। তিনি আরও মনে করেন যে এই নকল মুদ্রাগুলি একাদশ শতাব্দী অবধি মুদ্রিত হতে থাকে।[২] এই মুদ্রা ব্যবস্থার বিকাশের মূলে ছিল চীন ও আরবের সঙ্গে বাণিজ্যের সংযোগ এবং দক্ষিণ চীন, বর্মা, পেগু ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আমদানি করা সোনা ও রূপা।[৩] তিনি আরও বলেছেন যে ময়নামতী - লালমাই অঞ্চলের নগরকেন্দ্রগুলি অষ্টম শতাব্দী অবধি[৪] গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এবং এগুলি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান ছিল।

তরফদারের প্রমাণাদি ও যুক্তিগুলি প্রত্যয়যোগ্য নয়। প্রথমেই বলতে হয় যে (তরফদারের নিজেরই নির্ধারিত কালক্রম অনুসারে) দীর্ঘ আটশত বছর ধরে মাত্র ৩৫০টি মুদ্রার অবস্থিতি বিশেষ কোন তাৎপর্য রাখেনা। মনে হয় যে তিনি নিজেই তাঁর মুদ্রা প্রমাণের স্বল্পতার কথা ভেবে আর একটি তথ্য পেশ করেছেন যে এই অঞ্চলটিতে একটি পরিবর্তনশীল, অস্থির, তরঙ্গায়িত মুদ্রা অর্থনীতি পরিলক্ষিত হয়।[৫] কিন্তু এই বিবৃতিটিও তাঁর দৃষ্ট প্রমাণের সঙ্গে মেলে না। তরফদারের নিজের বিবৃত কালক্রম অনুসারে বিচার করলেও দেখা যায় যে এই অঞ্চলে মোট ৪৪টি মুদ্রা প্রত্যেক একশত বছরে মুদ্রিত ও প্রচলিত হয়েছে, যা কিনা এমনকি একটি অস্থির মুদ্রা অর্থনীতির তত্ত্বটির লক্ষণও মেটায় না। তরফদারের যুক্তিতে এই একটি নয়, আরও সমস্যা রয়েছে, এমনকি মুদ্রাগুলির তারিখ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর মতামত অসম্ভবভাবে প্রকল্পিত। যদিও তিনি ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর গুপ্তযুগের মুদ্রার নকলগুলির প্রচলন হওয়ার তত্ত্বটিকে অস্বীকার করেন,[৬] তিনি তাঁর নিজের মতটির স্বপক্ষেও কোন যোগ্য প্রমাণ দিতে পারেননি, যা প্রমাণ করবে যে এই মুদ্রাগুলির প্রচলন একাদশ শতাব্দী অবধি ঘটেছিল।[৭] শুধু একটিমাত্র নকল গুপ্ত 'তীরন্দাজ' স্বর্ণমুদ্রাকে অষ্টম শতাব্দীর বলা যেতে পারে, যেটি সম্ভবত কোন এক দেব বংশীয় শাসকের দ্বারা প্রচলিত হয়েছিল[৮] এবং এটির সঙ্গেই এই অঞ্চলের মুদ্রা ব্যবস্থার সমাপ্তিকাল নির্দেশিত হয়, যন্ড ও ত্রিসংকেত বা 'ত্রিনকশা' ধরণের রূপার যে মুদ্রাগুলি বেশির ভাগই ময়নামতী অঞ্চলে প্রাপ্ত, তার সঙ্গে দশম ও একাদশ শতকের বঙ্গ সমতট অঞ্চলের চন্দ্র রাজাদের সম্পর্ক স্থাপন করার যে প্রচেষ্টা তরফদার করেছেন, তা মোটেই অনুধাবনযোগ্য নয়। এই তত্ত্বটির মূলে রয়েছে 'মুদ্রা-ঐতিহ্যের' বিষয়টি,[৯] কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। যদি লালমাই পাহাড়ের শালবন বিহারের সাম্প্রতিক কালের খননকার্যে উদঘাটিত স্তরগুলির কথা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এই মুদ্রাগুলির সময়কাল কোনভাবেই অষ্টম শতাব্দীর পরে বলে ধরা যেতে পারেনা।[১০] প্রাক্ ভৌগলিক প্রমাণসাপেক্ষেও এই মুদ্রাগুলিকে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর বলে গণ্য করতে হয়।[১১] এছাড়া বলতে হয় যে ময়নামতীতে প্রাপ্ত কোন মুদ্রারই যথার্থরূপে সনাক্তকরণ হয় নি। সুতরাং আমাদের কাছে তরফদার প্রকল্পিত দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের মুদ্রাঅর্থনীতির একাদশ শতাব্দী অবধি স্থায়িত্ব সম্পর্কিত তত্ত্বটি অস্বীকার করার মত যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ রয়েছে। খ্রিস্টিয় নবম শতাব্দীর পর থেকে এই অঞ্চলে মুদ্রার প্রচলন সম্পর্কে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১২] বোঝাই যায় তরফদারের তত্ত্বটি গোড়াতেই একটি ভুল পুর্বানুমানের উপর স্থিত, যার জন্য তার পরের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রভূতভাবে হ্রাস পেয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে বি. এন. মুখার্জীর গবেষণাসমূহ বঙ্গে একটি ধারাবাহিক এবং

উল্লেখযোগ্য মুদ্রাব্যবস্থার উপস্থিতির কথা তুলে ধরেছে।[১৩] তিনি এই অঞ্চলের যে সুবর্ণমুদ্রাগুলি ভুলবশত নকল গুপ্ত মুদ্রারূপে গণ্য হোত. তার সঙ্গে শশাঙ্কর মুদ্রার সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়াস করেছেন। এই ধারাটি পরে দেববর্মা ও বসুবর্মা. শ্রীকুমার, রাট বংশের শেষ দুই শাসক জীবধরণরাট এবং শ্রীধরণরাট, খড়গবংশের তিন শাসক দেবখড়গ, রাজভট ও বলভট এবং পৃথুবীর চালু রাখেন। খ্রিস্টিয় সপ্তম-অষ্টম শতকের গোড়ায় এই প্রথাটির সমাপ্তি ঘটে।[১৪] যাই হোক, তিনি, এই মুদ্রাগুলি যে পরে পট্টিকেডা অঞ্চলের নামাঙ্কিত একধরণের রূপার মুদ্রা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, সেই কথাটি তুলে ধরেছেন। এই পট্টিকেডা রৌপ্যমুদ্রাগুলি নমুনাগত ভাবে এবং পরিমাণগত ভাবে হরিকেল রৌপ্যমুদ্রাগুলির প্রভাবাপন্ন। এই ধরণের কিছু রৌপ্যমুদ্রা, যা ললিতাকার ইত্যাদি নামাঙ্কিত, সম্ভবত দেবশাসকদের পরবর্তীকালের ময়নামতী অঞ্চলের 'আকার' বংশের শাসকদের দ্বারা প্রচলিত বলে মনে করা হয়। একই ধরণের কিছু মুদ্রা, যার উপর ভেরাক অক্ষরাঙ্কিত রয়েছে, সেগুলি মুখার্জী শেষের দিকের হরিকেল মুদ্রার (দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচুমানের মুদ্রার) সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। এই সমস্ত মুদ্রাগুলির তারিখ নির্ণয়গুলি দেখলে বোঝা যাবে যে এগুলিকে কোনভাবেই অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তীকালের বলে মেনে নেওয়া যায় না। যদিও এই গোটা যুগটা ধরে মুখার্জী নিজে মুদ্রাব্যবস্থার একটি স্থায়ী, অবিরাম উপস্থিতির কালক্রম নির্দিষ্ট করেছেন।

দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের ধাতব মুদ্রাব্যবস্থার এই প্রসারণের পিছনে এই অঞ্চলের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থাটিকে কার্যকারণ রূপে দেখানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তরফদার যে বহির্দেশটির কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন, তা হল আরব অঞ্চল, কিন্তু তাঁর উপাদান গুলি এতই অল্প যে তারদ্বারা কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায়না। বস্তুত গোটা আলোচনাটাই ইন্দো-আরব বাণিজ্যে ময়নামতী অঞ্চলের নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে একটি প্রকল্পিত পূর্বানুমানের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং এই অঞ্চলে প্রাপ্ত খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের কিছু আব্বাসিড মুদ্রা ও ষণ্ড ও 'ত্রিনকশা' খোদিত মুদ্রাগুলির ভুল তারিখ নির্ণয়ের উপর ভিত্তি করে তরফদার ইন্দো-আরব বাণিজ্যের বিন্যাস এবং মুসলমান জয়ের পূর্বকাল অবধি মুদ্রার অবিরাম উপস্থিতির তত্ত্ব তুলে ধরেছেন।[১৫]

যদিও বোঝাই যায় যে তিনি সম্ভবত তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত, যা কিনা তার নিজেরই নির্ণীত মুদ্রার কালক্রম, তাঁর অনুমতি ইন্দো-আরব বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রকল্পন ইত্যাদির উপর স্থিত, তা যে যথেষ্ট প্রত্যয় সাপেক্ষ নয় তা বুঝেই মন্তব্য করেছেন : "একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর কোন দেশজ মুদ্রা পাওয়া যায় নি"[১৬] কিন্তু তার ব্যাখ্যা "....একের বেশি খলিফা দ্বারা প্রচলিত আব্বাসিড সুবর্ণ ও রজত মুদ্রাগুলিই দক্ষিণ - পশ্চিম বঙ্গের সামুদ্রিক বাণিজ্যের অবিরাম ইতিহাসের কথা নির্দেশ করে."[১৭] কোন

মতেই প্রত্যয়যোগ্য নয় বরং এই ব্যাখায় তাঁর প্রকল্পের সম্পূর্ণরূপে অনুমানমূলকতার দিকটি ধরা পড়ে।

একাদশ শতক অবধি এই অঞ্চলে মুদ্রার অবিরাম উপস্থিতির এই তাত্ত্বিক নির্মাণটির আর একটি সংযোজন হিসাবে তরফদার বহির্দেশ থেকে আগত সোনা ও রূপার অবিরাম আমদানির কথাও বলেছেন। কোন সম্ভাব্য প্রমাণ ছাড়াই তিনি ঘোষণা করেছেন যে যেহেতু ত্রিপুরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন সোনা বা রূপার খনি বা ভান্ডার ছিল না তাই এই ধাতুগুলি দক্ষিণ চীন, পেগু, বর্মা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে আমদানি হোত।[১৮] বলাই বাহুল্য যে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গে প্রাপ্ত মুদ্রার সংখ্যা এতই কম যে তার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য বর্হিদেশ থেকে নিয়মিত ধাতুর আমদানি সংক্রান্ত তত্ত্বটির উদ্ভাবন অপ্রয়োজনীয় বিশেষ করে যখন সত্যই এ সম্বন্ধে তৎকালীন কোন প্রসঙ্গ নির্দেশ নেই। তবুও তরফদার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ চীন, পেগু, বর্মা ও দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্কের তত্ত্বটিকে জোরদার করার জন্য প্রাক ইসলামিক যুগে[১৯] বঙ্গের এই অঞ্চলে মৃৎপাত্র ও বস্ত্র শিল্পের প্রচলন ও উল্লেখিত বহির্দেশগুলির তার রপ্তানির কথা তুলে ধরেছেন।[২০]

তরফদার তাঁর যুক্তিবিচারের প্রথমার্ধের ক্ষেত্রে পুনরায় সে প্রমাণের উপর নির্ভর করেছেন সেগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী কালের; যখন কিনা তাঁর যুক্তির দ্বিতীয়ার্ধ্ব - যা বস্তু বিনিময় সংক্রান্ত আলোচনা - সে ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রমাণই দিতে পারেন নি। ইন্দো-চীন বাণিজ্যিক সংযোগের দিকে তাকালে এই ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন দেখা যায় খানিকটা অত্যধিক রূপেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ইন্দো-চীন দৌত্য সম্পর্কের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে ডি. সি. সরকারও নিম্নোক্ত কতগুলি দৌত্য সম্পর্কও ব্যক্তিবিশেষের উল্লেখ করেছেন ঃ[২১]

১) ভারত থেকে চীন প্রেরিত চারটি দৌত্য, একটি করে, যথাক্রমে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (খ্রিস্টীয় ৭২৪-৭৫৯ শতক) তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রাপীড়, যশোবর্মন (খ্রিস্টীয় ৭২৫-৭৫৩ শতক) এবং দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মন (খ্রিস্টীয় ৭০০ - ৭২৫ শতক) কর্তৃক প্রেরিত;

২) বোধিরুচী, শুভকর সিংহ, বজ্রবোধি, অমোঘবর্য, ধর্মদেব, মঞ্জুশ্রী (এঁরা প্রত্যেকেই বৌদ্ধ ভিক্ষু) এবং আরও ৪৩ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু যাঁরা চীনে যথাক্রমে ৬৯৩ সন, ৭১৬ সন, ৭২০ সন, ৭২৪ সন, ৯৭৪ সন, ৯৭১ এবং ৯৭২ সনে যাত্রা করেন।

৩) চীনে ভারতীয় ভিক্ষুদের ১০০৪ সন, ১০০৫ সন, ১০১০, ১০১৬, ১০২৪, ১০২৭ এবং ১০৩৬ সনে আগমন।

৪) ১০১৫ এবং ১০৩৩ সালে চীন সম্রাটের দরবারে প্রথম রাজ রাজ ও প্রথম রাজেন্দ্র চোল প্রেরিত দুটি বাণিজ্যিক দূত বর্গ।

৫) ভারতীয় রাজসভায় ৬৯২ সালে চীন দূতবর্গের উপস্থিতি।

৬) খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে ৬০ জন চৈনিক ভিক্ষুর ভারত পরিক্রমণ।

৭) খ্রিস্টীয় ৯৫০ সালে ও ১০৩৯ সালের মধ্যে কিছু সংখ্যক চৈনিক ভিক্ষুর ভারতে আগমন।

উপরোক্ত তালিকাটি ভারত - চীন সম্পর্কের কালক্রম পর্যালোচনার ক্ষেত্রে স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে আদি মধ্যযুগে এই সম্পর্কটি তিনটি পৃথক পর্যায়ে বিন্যস্ত ছিল। সবশুদ্ধ মোট চারটি দৌত্য এবং সমসংখ্যক ভিক্ষু ভারত থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে চীনে গমন করেন, অপর দিকে একটি চৈনিক দৌত্য ও ষাটজন চৈনিক ভিক্ষু ভারতে এই একই সময়ে আসেন। তার পর প্রায় ২৭৫ বছর ধরে এই ধরণের যাতায়াত বন্ধ ছিল। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ দিকে আবার এই সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে — এবং ৪৫ জন ভারতীয় ভিক্ষু খ্রিস্টীয় ৯৭১-৯৭৪ এর মধ্যে চীন পরিক্রমণে যান। তার পর আরও কিছু ভিক্ষু খ্রিস্টীয় ১০০৯-১০৩৬ এর মধ্যে চীনে যান। এছাড়া দুটি বাণিজ্যিক দৌত্যও প্রেরিত হয় ভারত থেকে চীনে খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে। বহু সংখ্যক চৈনিক ভিক্ষুও এই সময়ে ভারতে আসেন। ডি. সি. সরকারও স্বীকার করেছেন যে ভারত-চীন সংযোগের সুবর্ণ যুগটির অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাপ্তি ঘটে।[২২] ভারত-চীন সংযোগের এই চিত্রটি তবু যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আরও পূর্ণ চিত্র পেলে বর্তমান যুক্তিটি আরও দৃঢ় হয়। পূর্বেই বহাল ভারত-চীন সম্পর্কের বাণিজ্যিক দিকটি খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তা সর্বোচ্চ সীমা লাভ করে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। ''ভারত থেকে চীনে মোট ৬৮টি দৌত্য প্রেরিত হয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে, সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ্বে এর সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৫টি, আবার খ্রিস্টীয় ৭১০ এবং ৭৫৮ সালের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৪টি, এবং তার পর ৭৫৮ থেকে ৯৫২ অবধি সংযোগের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ৯৫২ তে সংযোগ পুনরায় স্থাপিত হলে ৯৫২ থেকে ৯৯৬ এর মধ্যে মাত্র ৫টি দৌত্য ভারত থেকে চীনে প্রেরিত হয় বলে তথ্য রয়েছে''[২৩] যার সাথে যোগ করা যায় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রেরিত আরও কিছু দৌত্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারত চীন সম্পর্কের ইতিহাসে সপ্তম শতাব্দী প্রায় একটি অন্ধকার যুগ।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই অবস্থার তুলনামূলকভাবে উন্নতি ঘটে এবং এর পরে প্রায় ২০০ বছর ধরে কোন রকম সংযোগের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এর পরের

পঞ্চাশ বছরে সামান্য সংযোগ স্থাপনের প্রমাণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে অবশ্য দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে ও একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সংযোগ ক্রিয়ার বৃদ্ধি ঘটে তার পুরোপুরি অবসান হওয়ার ঠিক পূর্বে। ডি. সি. সরকার সংগৃহীত তথ্যও এ কথাই প্রমাণ করে। পরে লালনজী গোপালও এই তথ্যের সমর্থন করেন। গোপালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত চীন সংযোগের সবথেকে ব্যস্ত যুগটির অষ্টম শতাব্দীতে অবসান ঘটে এবং এরপর তা কিছুটা সক্রিয় হয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে। তবে তা পঞ্চাশ বছরের বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।[২৪] বঙ্গ-চৈনিক বাণিজ্যের তত্ত্বটি আরও বেশি অপ্রমাণিত অস্থাপিত বলে দেখা যায় কারণ সমকালীন দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গ বা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও চৈনিক কোন দ্রব্য বা মুদ্রা লক্ষণীয় মাত্রায় আবিষ্কৃত হয় নি। এই কথাটি আরও স্পষ্ট হয় যখন আমরা এর সঙ্গে পূর্বকালীন খ্রিস্টীয় শতকগুলিতে ভারত রোম বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে প্রাপ্ত রোমান মুদ্রা ও পণ্যবস্তুর আবিষ্কারের দিকে লক্ষ্য করি। ভারত-চীন বাণিজ্যের সংকীর্ণতা তখনই বোঝা যায়, যখন দেখি যে কেবলমাত্র ১৫টি মুদ্রা পাওয়া গেছে তাঞ্জোর থেকে গোটা 'সুং' যুগের সময়কালে।[২৫] চীনে প্রাপ্ত ভারতীয় প্রত্নবস্তুর সংখ্যা আরও কম লক্ষণীয়। সুতরাং যদি দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ চীন, পেগু, বর্মা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঘটেও থাকে, তা অত্যন্ত প্রান্তিক এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থানকে তা লক্ষণীয় রূপে প্রভাবিত করে নি। তরফদার নিজেই স্বীকার করেছেন যে দেব, চন্দ্র এবং বর্মন শাসকদের শিলাবিবরণীতে বাণিজ্যেব কোন নির্দেশ নেই, যা তৎকালীন সমাজে বিস্তৃত বাণিজ্যিকরণের অনুমানকে নস্যাৎ করে।[২৬] যদিও এই শিলালেখাগুলি বণিক বা প্রশিক্ষিত কারিগর বা তাদের প্রতিনিধি, যথা - সার্থবাহ, নগরশ্রেষ্ঠী এবং কুলিক, যাদের আমরা গুপ্তযুগের ভূমিদান সংক্রান্ত শিলালেখে পাই, তাদের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করে না, তবুও তাম্র লেখগুলির রীতিগত অংশগুলিতে নিয়মিত ভাবেই উচ্চ পদস্থ ও নিম্নবর্গের রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ও তাদের অনুচর বৃন্দের উল্লেখ রয়েছে — যার দ্বারা বোঝা যায় সে একটি স্থায়ী আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল এবং এটাও বোঝা যায় যে এই ধরণের আমলাতন্ত্র সমাজের কোন লক্ষণীয় বাণিজ্যিকরণ ছাড়াও স্থায়ী হতে পারে (যা কিনা কেবলমাত্র পরিমাণ সংখ্যক মুদ্রা প্রচলনের মাধ্যমেই প্রতিবিম্বিত হয়)। বস্তুত ব্যাপক হারে ধর্মীয় প্রাপকদের মধ্যে ভূমিদানের রীতি, যার ফলে এই প্রাপকগণ মালাকার, তৈলিক, শঙ্খ-বাদক, কর্মকার (লোহার কারিগর), কর্মকার (অন্যান্য কারিগর), চর্মকার, সূত্রধার, স্থপতি, নাপিত, রজক, বৈদ্য এবং অন্যান্য[২৭] শ্রেণীর ব্যক্তি বর্গের সেবারও প্রাপক হবে এবং এই সকল রাজস্বদায় মুক্ত ভূমিদান যা কিনা গ্রহীতাদের হাতে রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্বের একটা মোটা অংশ এবং ভূমিজাত দ্রব্যের উদ্বৃত্তের একটি সমপরিমাণ অংশ তুলে দেবে এবং 'পিদম'

নামে অভিহিত বেগার ভোগের অধিকারও দেবে সবটাই ক্রমশ সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের দিকেই নির্দেশ করে শুধু তাই নয় এ তথ্যগুলি সামন্ততান্ত্রিক একটি অর্থনৈতিক অবস্থার কথাও সূচিত করে। তরফদারও স্বীকার করেছেন যে "যদিও ধরে নেওয়া যায় যে তাম্রলেখগুলি সমাজের বিভিন্ন আর্থসামাজিক গোষ্ঠীর উল্লেখ করে নি, তবুও বোঝাই যায় যে আপাত ভাবে সমাজ কৃষি-নির্ভর ছিল এবং রাজা ও কৃষকদের মধ্যে মধ্যসত্ত্বভোগীদের দীর্ঘ তালিকা ছিল। লেখগুলিতে যে আমলাদের নাম পাওয়া যায় তারা এই সামন্ততান্ত্রিক প্রবাহে সংযুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।[২৮] বোঝাই যাচ্ছে যে তাঁর মনে আদি মধ্যযুগীয় দক্ষিণপূর্ব বঙ্গের একটি গ্রাম সমাজের ধারণাই রয়েছে।[২৯] এই ধারণা তাঁর পূর্বে প্রদর্শিত এই সময়ে মুদ্রার অবিরাম প্রচলন এবং বাণিজ্য ও নগর সংক্রান্ত[৩০] তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে। কৌতূহলপ্রদভাবে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেন যে এই সময় বিভিন্ন গোষ্ঠীর কারিগর দেবত্র সম্পত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ার দরুণ কেবলমাত্র স্থানীয় ব্যবহারের জন্যই উৎপাদন করতে থাকে, বণিজ্যিক লেনদেনের[৩১] জন্য নয়। সুতরাং তরফদার অন্য যুক্তি দেখালেও জোরের সঙ্গে বলা যায় যে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গে একটি বাণিজ্য ও নগরকেন্দ্রিকতা বর্জিত অর্থনৈতিক অবস্থাই লক্ষ্য করা যায়।

আদি-মধ্যযুগীয় দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের ন্যায় এই চিত্রটি সমগ্র বঙ্গের ক্ষেত্রেই সত্য। গুপ্ত পরবর্তী যুগের বঙ্গে মুদ্রা ব্যবস্থার দিকে তাকালে এই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ. এস আলটেকার এ যুগের কিছু শাসকদ্বারা (খ্রিস্টীয় ৫২৫-৬৭৫ সালে) প্রচলিত গুপ্ত মুদ্রার অনুকরণে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাগুলির দিকে নির্দেশ করেছেন এই শাসকদের মধ্যে ছিলেন ভীমরাজা, হরিগুপ্ত, হরিকান্ত, জয়গুপ্ত, বীরসেন, সমাচারদেব, শশাঙ্ক ও জয়নাগ। ভীমরাজ, বুধগুপ্তের প্রচলিত 'পুচ্ছ বিস্তৃত ময়ূর' এবং 'আবক্ষ প্রতিমূর্তি' ছাপযুক্ত মুদ্রাগুলির অনুকরণে কিছু রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। হরিগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের 'ছত্র' ধরণের তাম্রমুদ্রা ও 'কলস' ধরণের তাম্র মুদ্রার অনুকরণে কিছু তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। জয়গুপ্ত এবং হরিকান্ত উভয়ে যথাক্রমে কিছু তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রার সংস্করণ প্রচলিত করেন। সমাচারদেব, বীরসেন, জয়নাগ ও শশাঙ্ক সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলন করেন এবং শশাঙ্ক নিজে কিছু রৌপ মুদ্রাও প্রচলিত করেন।[৩২] কিন্তু এই ধাতব অপকৃষ্টতা ও সংখ্যার স্বল্পতা — এই মুদ্রাগুলির আদৌ সাধারণভাবে প্রচলিত হওয়ার ধারণাটি সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করে।[৩৩] সম্ভবত এই মুদ্রাগুলি ব্যক্তিগত ও বেসরকারী ব্যবহারের জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল, বাজারে চালু হওয়ার জন্য নয়। পরবর্তীকালে পাল বংশের রাজনৈতিক উত্থানের কালেও ব্যপক মুদ্রা ব্যবস্থার কোনও উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। অঙ্কিত মুদ্রা তৈরি ও তার প্রচলন করার যে প্রচেষ্টা পাল শাসকগণ করেছিলেন

তা সফল হয় নি। অপকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ নয় এমন কিছু তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা পাল শাসকদের দ্বারা প্রচলিত বলে বলা হয়।[৩৪] সেগুলিও আবার খুবই স্বল্প পরিমাণে প্রাপ্ত। স্বয়ং দেবপালও সম্ভবত নিজস্ব কোন মুদ্রা প্রচলনের বিচক্ষণতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। অবশ্য কিছু তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা তাঁর দ্বারা প্রচলিত বলে বলা হয়েছে যার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে। তাঁর নামাঙ্কিত একটি সুবর্ণ মুদ্রা পাওয়া গেছে বলে বিবৃত হয়েছে। তবে তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যদি এই মুদ্রাটি যথার্থই দেবপাল দ্বারা প্রচলিত বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি সম্ভবত হয়েছিল তাঁর রাষ্ট্রকূট বিজয় বা জাভাদ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশীয় শাসকদের সঙ্গে পুনরায় সম্পর্কস্থাপনের ঘটনার স্মারক রূপে।[৩৫] সামগ্রিক ভাবে পাল বংশের ইতিহাস ও তাঁদের রাজ্যসীমার বিস্তৃতির দিকে তাকালে তাঁদের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থার অভাবের ব্যাপারটিই লক্ষণীয় রূপে চোখে পড়ে।

এর পরে দেখা যাক সামগ্রিকভাবে মুদ্রাগুলির প্রাপ্তিস্থান ও এগুলির প্রচলন পথের সূত্রগুলির অবস্থান। তিনটি বহুল-প্রচারিত মুদ্রাশ্রেণী গাঙ্গেয় উপত্যকায় খ্রিস্টীয় সাতশো থেকে দ্বাদশ শতক অবধি প্রচলিত ছিল, যথা ঃ (১) ইন্দো-সাসানিয় (২) শ্রী বিগ্র (হ) এবং শ্রী বি, এবং (৩) শ্রী আদিবরাহ ও বিণায়কপাল নামাঙ্কিত। এর মধ্যে প্রতিপাল ভাটিয়া কেবল মাত্র একটি মুদ্রাই বঙ্গে পেয়েছেন যখন কিনা ১৬,৬৩৩ টি উত্তরপ্রদেশ এবং ১০৮৪ টি বিহারে পাওয়া যায়।[৩৬] এই চিত্রটি এই অঞ্চলের মুদ্রা ব্যবস্থার ঐতিহ্যের তত্ত্বটিকে নস্যাৎ করে। বস্তুত এই যুগে বঙ্গে অঙ্কিত মুদ্রার পরিবর্তে ক্রমশ কড়ি প্রচলনের তত্ত্বটি সাধারণভাবে গ্রাহ্য হয়েছে।[৩৭] মুদ্রা ব্যবস্থার মাত্রা বা সর্বনিম্ন পূর্ণসংখ্যা হিসাবে গুপ্ত লেখে উল্লেখিত সুবর্ণ দিনারের পরিবর্তে কর্পদক পুরাণ বা কড়ির উদ্ভব ঘটে।[৩৮] মুসলমানগণ যখন প্রথম বঙ্গে আসেন তাঁরা বিনিময়ের মাধ্যম রূপে কড়ির প্রচলনই লক্ষ্য করেছিলেন।[৩৯] বি. এন. মুখার্জি এই অবস্থাটিকে তাঁর মুদ্রা সংক্রান্ত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্তিসম্মত রূপে মেলাতে গিয়ে 'চুর্ন্নি' বা 'চুর্নি' যা কিনা মুদ্রারূপে ব্যবহৃত চূর্ন রূপা তাকেই একটি মূল্যবান ও বিশুদ্ধ মুদ্রা মাধ্যম রূপে নির্দেশ করেছেন।[৪০] অবশ্য তিনি এরকম একটি ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে অসুবিধার কথা ভাবেন নি কিংবা কেনই বা এই ধরণের গুঁড়া হঠাৎ অঙ্কিত মুদ্রার পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে সে বিষয়ে কোন যুক্তিও দর্শান নি। মুখার্জী তবুও জোরের সঙ্গেই পূর্বকালীন বঙ্গে মুদ্রা ব্যবস্থার ঐতিহ্যের কথা আলোচনা করেন এবং তথ্যের দিকে তাকিয়ে এই অঞ্চলটিকে চারটি ভিন্ন মুদ্রাগত অনু-অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। অবশ্য তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে গুপ্ত পরবর্তী যুগে এগুলির মধ্যে কেবল একটি অঞ্চলেই একটি মুদ্রা ব্যবস্থার রীতি প্রচলিত ছিল — যদিও সেটি কড়ি মাধ্যম নির্ভর ছিল। এই অঞ্চলটি সমতট হরিকেল বলে নির্দেশিত হয়েছে।[৪২] উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে স্পষ্ট আসা যায় যে এই সময় সাধারণভাবে

মুদ্রা ব্যবস্থার অতি স্বল্প পরিমাণ প্রচলিত ছিল যা কিনা একটি ক্রমবর্ধমান সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও তার পরিণতি স্বরূপ বাণিজ্যের অবনতির তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে।

আদি-মধ্যযুগের বঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের এই অনুন্নত অবস্থার প্রতি আরও নির্দেশ রয়েছে। প্রাচীন কালে উত্তর মিথিলা অঞ্চলটিকে আটটি বিভিন্ন বাণিজ্যিক পথ ছুঁয়ে যেত — এর মধ্যে একটি মিথিলা - তাম্রলিপ্তি পথ।[৪৩] কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে আদি-মধ্যযুগের কোন বিবরণীতে এই পথটির কোনও উল্লেখ নেই। মনে হয় এই যুগে এই পথটি আর চালু ছিল না। এই যুগের বঙ্গীয় সাহিত্য বা লেখেও অভন্ত্যরীণ বাণিজ্যের প্রসঙ্গ খুবই অল্প পাওয়া যায়। একমাত্র পর্যাবৃত্ত গ্রামীণ বা আঞ্চলিক হাটের কথাই প্রধানত এই সূত্রে উল্লেখিত হয়েছে।[৪৪] আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অবনতির ফলেই উক্ত বাণিজ্যিক পথগুলি ক্রমশ অচল হতে থাকে। এই অবস্থার ঈঙ্গিত আরও পাওয়া যায় ধর্মপালের লেখে যেখানে ভূমিদান সংক্রান্ত নথি উল্লেখ করছে ভূমির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম সংশ্লিষ্ট হাটগুলিরও হাত বদল হয়ে দান গ্রহীতার অধিকারভুক্ত হওয়ার কথা।[৪৫] স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকলে বণিকরা যতটা স্বাধীনভাবে চলতে পারত তা এই দানগ্রহীতাদের অধীনে সম্ভব ছিল না। বস্তুত গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাটের এলাকাগুলিও দান করার ব্যবস্থাটি এই যুগের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের আঞ্চলিক রূপটির উদ্ভবের কথাই নির্দেশ করে।[৪৬]

বঙ্গের বহির্বাণিজ্য, যা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ধীরে ধীরে এই শতাব্দীর মধ্যভাগে যথেষ্ট ক্ষীণ হয়ে পড়ে[৪৭] এবং সমস্ত বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপও এই শতাব্দীর শেষদিকে সংকুচিত হয়ে পড়ে। হিউয়েন সাং ও ইৎসিং, যাঁরা সপ্তম শতকে ভারতে এসেছিলেন, তাঁরা তাম্রলিপ্তি বন্দরের সাফল্য ও গৌরবের কথা বলেছেন। কিন্তু খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে এটি একটি সামুদ্রিক বন্দর রূপে আর উল্লেখিত হচ্ছে না।[৪৮] অষ্টম ও ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে আর একটিও উল্লেখযোগ্য নতুন বাণিজ্যিক কেন্দ্রের উদ্ভব ঘটতে দেখা যায় না। মনে হয় বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলটির প্রায় পাঁচশো বছর ধরে কোন ভূমিকা ছিল না।[৪৯] সাম্প্রতিক কালে বঙ্গের বহির্বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই এই অঞ্চলটি তার বাণিজ্যিক গুরুত্ব সক্ষমতা হারিয়েছিল।

ঠিক এই সময় আরব ও মুসলমান অধিকৃত অঞ্চল এবং শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমশ পরিমাণে ও বৈচিত্র্যে বিস্তৃতি লাভ করছিল। কিন্তু এই বাণিজ্যে বঙ্গ অঞ্চলের কোন লক্ষণীয় ভূমিকা ছিল না। তাহাই বা ভারতীয় উপমহাসাগর অঞ্চলের বিস্তৃত বাণিজ্যিক পরিমণ্ডল থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ তা নির্দেশ করে। সাবায়রা, সিরীয়, গ্রীক, রোমান, পার্শী, আরব বণিকগণ এবং শ্রীলঙ্কা ও পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতের বণিকেরা এই বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছিল।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্যের বিন্যাস বঙ্গ অঞ্চলের পক্ষে সুবিধাজনক হয়নি। "যদিও পূর্ব ভারতে ৭৫০ সাল থেকে পাল শাসকগণ একটি স্থায়ী শাসন জারি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।"[৫০] এই অঞ্চলের সমকালীন নাগরিক সংস্কৃতিও এই সময়ে একটি পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। এই খানেই দেখা যায় যে নাগরিক অবক্ষয়ের সামগ্রিক সমরূপীয় ধারণাটির তাত্ত্বিক নির্মাণ তার যৌক্তিকতা হারায়, বিশেষ করে যখন সংস্কৃতির মূল অঞ্চল থেকে আমরা সরে আসি। নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় কালক্রমিক চিত্রটি ভিন্ন। এই অঞ্চলটিতে গুপ্ত যুগ থেকে কৃষিকরণের একটি পর্যায় উদ্ভব হয়।[৫১] এর পরে ক্রমশ এখানে একটি জটিল / যৌগিক বস্তু সংস্কৃতির উদ্ভব হয় যা কিনা সমসাময়িক মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার সংস্কৃতির থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতার কারণ এই দুই অঞ্চলের সামাজিক গঠনের বিভিন্ন ধারার বিন্যাস। গুপ্তযুগের শেষভাগে / গুপ্ত পরবর্তী যুগে বঙ্গে যখন বহুল পরিমাণ কৃষিকরণ এবং সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সংযুক্তরূপে প্রকাশিত হচ্ছে, তখন মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা এই প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল। এর থেকেই এই অঞ্চলের নগরায়নের বিভিন্নতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৫২]

প্রাচীন / পূর্বকালীন বঙ্গে নগরের কালক্রম

ক্রমিক সংখ্যা	নগর/স্থানের নাম	প্রাক-কুষাণ	কুষান	গুপ্ত	গুপ্ত পরবর্তী যুগ
১.	মঙ্গলকোট	নগর	নগর	নগর	অবক্ষয়
২.	গোস্বামীখণ্ড	—	—	নগর	নগর
৩.	ভরতপুর	—	—	নগর	নগর
৪.	খনা মিহিরের ঢিপি	নগর	নগর	নগর	নগর
৫.	ইটখোলা	নগর	নগর	নগর	বিশৃঙ্খল অবস্থা
৬.	পাণ্ডু রাজার ঢিবি	—	নগর	পরিত্যক্ত	
৭.	ফরাক্কা	—	নগর	পরিত্যক্ত	
৮.	ডিহার	—	নগর	পরিত্যক্ত	
৯.	তাম্রলিপ্তি	নগর	নগর	অবক্ষয়	পরিত্যক্ত
১০.	সপ্তগ্রাম	নগর	নগর	অবক্ষয়	পরিত্যক্ত
১১.	নান্নুর	নগর	নগর	নগর	নগর
১২.	রাজবাড়িডাঙ্গা	—	—	নগর	নগর
১৩.	মহাস্থান	নগর	নগর	নগর	নগর
১৪.	বাণগড়	নগর	নগর	নগর	নগর

ক্রমিক সংখ্যা	নগর/স্থানের নাম	প্রাক-কুষাণ	কুষান	গুপ্ত	গুপ্ত পরবর্তী যুগ
১৫.	ময়নামতী লালমাই	—	—	নগর	নগর
১৬.	কোটালিপাড়া	—	—	নগর	নগর

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গুপ্ত যুগের নগরগুলির কালক্রম/ক্রমবিকাশ ও বসবাসের নমুনা অনুযায়ী এই সময়ে নগরের পরিমাণ হ্রাস পায় নি বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল বলেই দেখা যাচ্ছে।

গুপ্তযুগে বঙ্গের নাগরিক কেন্দ্রে অবস্থান

নাগরিক কেন্দ্রের মোট সংখ্যা	স্থায়ী নাগরিক কেন্দ্রের সংখ্যা	অবক্ষয় প্রাপ্ত নগরের সংখ্যা	পরিত্যক্ত নগরের সংখ্যা
১৬	১১	২	৩

মোট ১৬টির মধ্যে ১১ নগরের স্থায়ী উপস্থিতি ও মাত্র ২টি পরিত্যক্ত নগর এবং ঠিক তার পরেই মাত্র একটি নগরের অবক্ষয় নগরায়ন প্রক্রিয়ার স্থায়ী ও পরিসর প্রক্রিয়া ও তার পশ্চাতে একটি অবলম্বনের ভিত্তির অস্তিত্বের দিকে ঈঙ্গিত করে। এই সিদ্ধান্তর সঙ্গে আরও পাঁচটি নগরের গুপ্তযুগে উত্থানের ঘটনাটি যুক্ত করলে সিদ্ধান্তটি আরও দৃঢ় হয়।

প্রাচীন বঙ্গে নগরের উদ্ভবের কালক্রম / কাল নির্ঘন্ট

মোট নগরের সংখ্যা	প্রাক-গুপ্ত	গুপ্ত	গুপ্ত পরবর্তী
১৬	১১	৫	০

গুপ্ত যুগে উদ্ভূত কোন নগরেরই পরবর্তীকালে অবক্ষয় ঘটেনি, বরং এর মধ্যে চারটি নগর, যথা - খনা মিহিরের ঢিপি, রাজবাড়িডাঙ্গা, মহাস্থান এবং বাণগড়, আয়তনে বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং আরো বেশি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। গুপ্ত পরবর্তী যুগে এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান কৃষি অর্থনীতিই এই আঞ্চলিক নগরায়নের স্থায়ী ধারাটির পিছনে কাজ করেছে। তবে এই তথ্যগুলির থেকে এ কথা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে এই অঞ্চলে আদিমধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক কোন অবস্থা সংগঠিত হয় নি। এই ধারণাটি আরও প্রচ্ছন্ন হবে যদি আমরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত নগরগুলির কার্যকারণ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তিত রূপের দিকে তাকাই ঃ

কুষাণ যুগের বঙ্গীয় নগরগুলির কার্যকরণ প্রকৃতি

ক্রমিক সংখ্যা	নাগরিক অঞ্চলের নাম	নাগরিক অঞ্চলের ক্রিয়া মূল বৈশিষ্ট্য
১.	মঙ্গলকোট	বাণিজ্যিক
২.	খনা মিহিরের ঢিপি	বাণিজ্যিক
৩.	ইটখোলা	বাণিজ্যিক
৪.	পাণ্ডু রাজার ঢিপি	বাণিজ্যিক
৫.	ফরাক্কা	বাণিজ্যিক
৬.	ডিহার	বাণিজ্যিক
৭.	তাম্রলিপ্তি	বাণিজ্যিক
৮.	সপ্তগ্রাম	বাণিজ্যিক
৯.	নান্নুর	বাণিজ্যিক
১০.	মহাস্থান	বাণিজ্যিক
১১.	বাণগড়	বাণিজ্যিক

চরিত্র মোটের উপর বাণিজ্যিক ছিল, যে কথাটি এই অঞ্চলের মূল উপাদান মুদ্রা বিনিময়ের উপর স্থিত বলেই নির্দেশ করে। লক্ষণীয় এই যে এই এগারোটির মধ্যে আটটি কুষাণ নগরী-কেন্দ্রের গোড়াপত্তন হয় প্রাক কুষাণ যুগে। এ বিষয়ে প্রাপ্ত সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি, এই নগরায়নের অর্থপূর্ণ সূচনা যে মৌর্য যুগে এই অঞ্চলে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রসারের জন্যই ঘটেছিল তা সূচীত করে। কুষাণ যুগের দূরবর্তী বাণিজ্যিক বুনোটে অংশগ্রহণ করায় এই অঞ্চলের তৎকালীন নগরগুলির বাণিজ্যিক ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়েছিল। নগরের সংখ্যাও বেড়েছিল এই সময়। কিন্তু গুপ্তযুগে এই নগর অঞ্চলগুলির কার্যকরণ চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছিল — যা নাগরিক ভিত্তির লক্ষণীয় পরিবর্তন নির্দেশ করে।

গুপ্তযুগে বঙ্গীয় নগরের কার্যকরণ প্রকৃতি

ক্রমিক সংখ্যা	নাগরিক অঞ্চলের নাম	নাগরিক অঞ্চলের প্রকৃতি
১.	মঙ্গলকোট	বাণিজ্যিক
২.	গোস্বামীখন্ড	ধর্মীয়
৩.	ভরতপুর	ধর্মীয়
৪.	খনা মিহিরের ঢিপি	ধর্মীয়

ক্রমিক সংখ্যা	নাগরিক অঞ্চলের নাম	নাগরিক অঞ্চলের প্রকৃতি
৫.	ইটখোলা	স্পষ্টরূপে নির্ধারিত নয়
৬.	নান্নুর	ধর্মীয়
৭.	রাজবাড়িডাঙ্গা	ধর্মীয়
৮.	মহাস্থান	ধর্মীয়
৯.	বাণগড়	শাসন মূলক/ধর্মীয়
১০.	ময়নামতী-লালমাই	ধর্মীয়
১১.	কোটালিপাড়া	স্পষ্টরূপে নির্ধারিত নয়

কুষাণ যুগের নগরীগুলির সামগ্রিক বাণিজ্যিক প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ধারায় গুপ্তযুগের নগরীগুলি ছিল প্রধানত ধর্মীয় প্রকৃতির। আটটি ধর্মীয় ও একটি বাণিজ্যিক এবং দুটির প্রকৃতি স্পষ্ট নির্ধারণ করা যায় না। তাম্রলিপ্তি ও সপ্তগ্রাম এই দুটি নগর অঞ্চলের অবনতি বাণিজ্যের অবনতিই সূচীত করে; আপাত ভাবেই বোঝা যায় যে ক্রমবর্ধমান কৃষি অর্থনীতি এবং এর পাশাপাশি রাষ্ট্র সংগঠনের প্রসারণ এই অঞ্চলের নগর কেন্দ্রগুলির স্থায়ী ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। এই নগর কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন উপঅঞ্চলে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যকলাপেরও কেন্দ্র রূপে বিকশিত হয়।[৫৩]

উপরোক্ত বিশ্লেষণ আদি মধ্যযুগীয় বঙ্গে বিকশিত অর্থনীতি সংক্রান্ত তত্ত্বটি প্রমাণ করা যে কঠিন, তাই ইঙ্গিত করে। এর অর্থ এই নয় যে বাণিজ্য সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়েছিল। এই বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য, শুধু ক্রমশ প্রসারিত কৃষি অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে মুদ্রা অর্থনীতির প্রান্তিক অবস্থানটি তুলে ধরা। এর সঙ্গে এই কথাও উল্লেখ করতে হয় যে এই অঞ্চলের সমাজগঠনের বিন্যাস পূর্ববর্তী মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকার সংস্কৃতির মূল অঞ্চলের বিন্যাস থেকে পৃথক ছিল — যার থেকে বোঝাই যায় যে একটি সর্বভারতীয় সমরূপীয় কাঠামো সৃষ্টি করার প্রয়াস, বিশেষ করে আদি মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে কতটা দুর্বল ছিল। ভারতের সামন্ততান্ত্রিকতা বিন্যাসের তত্ত্বটি আদি মধ্যযুগের সামাজিক গঠনের চরিত্র অনুধাবনে অর্থপূর্ণ প্রেক্ষিত এনে দেয় ঠিকই, কিন্তু এই তত্ত্বটি আঞ্চলিক ইতিহাস, যেমন বঙ্গের ক্ষেত্রে যদি সম্পূর্ণরূপে আরোপ করা হয়, তাহলে পূর্বের তুলনায় আরও অনেক বেশি পদ্ধতিগত অনুশীলন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই অঞ্চলগুলিতে রাষ্ট্রসংগঠনের প্রক্রিয়া তখনও তার প্রাথমিক অবস্থায় বিরাজ করছিল।

সূত্র নির্দেশ :—

১। 'ট্রেড এ্যাণ্ড সোসাইটি ইন আর্লি মিডিয়ভেল বেঙ্গল', *ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল রিভিউ*, Vol. IV নং ২, পৃ: ২৭৫-৮৪।

২। তদেব, পৃ: ২২৫।

৩। তদেব, পৃ: ২৭৭-৮১।

৪। তদেব, পৃ: ২৭৭।

৫। তদেব, পৃ: ২৭৫।

৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পা), *বাংলার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৪৩, পৃ: ৬৬৬-৬৭।

৭। এম. আর. তরফদার, তদেব, পৃ: ২৭৫।

৮। তদেব।

৯। তদেব, পৃ: ২৭৫-৭৭।

১০। এম. এইচ. রসিদ — "দ্য ময়নামতী গোল্ড কয়েন"। বাংলাদেশ ললিত কলা, Vol I, No. I, পৃ: ৪৫।

১১। এফ.এ. খান, ময়নামতী, করাচি, ১৯৬৩, পৃ: ২৫।

১২। তরফদার — আমলাতন্ত্র ও মুদ্রাব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করেছেন। (তদেব - ২৭৫-৭৭) এবং তিনি একথা উল্লেখ করেননি যে জমিভিত্তিক সমাজে আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব মুদ্রায় প্রকাশিত না হলেও থাকতে পারে।

১৩। উল্লেখ্য - "So called Siher Coinage of Sasanka". The Journal of the Numismatic Society of India., Vol XLVI, pp 98-100, item "The Coinage of the Pal Families of Samantate', Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol XXI, pp. 41-43, idem "A variety of Gold Coinage of Bengal', Vol XXI, pp. 41-43, idem "A variety of Gold Coinage of Samantata". Op. Cit., Vol XXVI, PP 5-8, idem "Some observation of the coins of Pattikede (Pattikede or Pattikeda), Journal of the Varendra Research Museum, Vol IV, pp. 19-28; idem, "Bearing of the Excavation at Mainamati, Vol IV, pp. 19-28. idem "Bearing of the Excavation of Mainamati (Bangladesh) on the Local Silver Coinage, in P.L. Gupta & A-Jha(ed) Numismatics and Archeaolgy, Nasik, 1987, pp 66-70, idem, Post Gupta Coinage of Bengal, Calcutta, 1989, Coins and Currency system of Post-Gupta Bengal (A.D. 550-750), New Delhi, 1991.

১৪। *কয়েনস্ এন্ড কারেন্সি সিস্টেম অফ পোষ্ট গুপ্ত বেঙ্গল*।(A.D. ৫৫০ - ৭৫০), pp 51-52।

১৫। তদেব, পৃ: ২৭৭-৭৮।

১৬। তদেব পৃ: ২৭৮।

১৭। তদেব।

১৮। তদেব, এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে তরফদার যে সকল তথ্য দেখেছিলেন সেগুলির অধিকাংশই পরবর্তীযুগের বিষয়। (বিশেষত দ্বাদশ শতাব্দীর)।

১৯। তদেব, পৃ: ২৭৪- ৭৯।

২০। তরফদারের দক্ষিণ পূর্ব বাংলার রপ্তানি বিষয়ক কোন তথ্য নেই।

২১। Numismatic and Empigraphic Notes, কলকাতা ১৯৭৭, পৃ: ১৯-২২১।

২২। তদেব, পৃ: ২১।

২৩। তথ্যগুলি এইচ. এস. ভাটিয়া ও তানচুং সম্পাদিত "Land nd Political System in China", Vol-I, নিউ দিল্লী, ১৯৭৬, পৃ: ৬৭৩ পাওয়া যায়।

২৪। ইকোনমিক লাইফ্ অফ্ নর্দান ইন্ডিয়া', দিল্লী, ১৯৬৫, পৃ: ১৩১-৩২।

২৫। SIS, iP ১৬৪, এ. গোপালএর গ্রন্থে উল্লিখিত, তদেব, পৃ: ১৩৫।

২৬। তদেব পৃ: ২৮১।

২৭। এই অর্থনৈতিক-সামাজিক গোষ্ঠীগুলি, কপার-প্লেট গ্রান্টে টার্সিয়ারী যুগে উল্লেখ - পশ্চিমবঙ্গ কপার প্লেট (শ্রীখন্ডের ৯২৫-৯৭৫), নলিনীকান্ত ভট্টশালী কমেমোরাসন ভল্যুম (সম্পাদক এ.বি.এম, হাবিবুল্লা), ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ: ১৭৯-১৮০, ১৮০-৮৭, কে.কে. গুপ্ত, কপার প্লেট অফ্ সিলেট, সিলেট, ১৯৬৭, পৃ: ৯২, ৯৯, ১০৬-০৭।

২৮। তদেব পৃ: ২৪২।

২৯। বেবি. এম. মরিসন ময়নামতী লালমাইয়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকটির উল্লেখ করেছেন। 'পলিটিকাল রিজিয়নস ইন আরলি বেঙ্গল', টাসকন, ১৯৭০, পৃ: ১৫৩।

৩০। তরফদার নগরগুলি উল্লেখ করলেও তা সুস্পষ্টভাবে লেখেননি। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে নামগুলির উল্লেখ করেন নি। ময়নামতী, লালমাই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখ করলে একাদশ শতক পর্যন্ত নগরায়নের যে ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন, তা ভ্রান্ত।

৩১। তদেব, পৃ: ২৮৪।

৩২। এ. এস অলটেকার — "দ্য কয়েনেজ অব গুপ্ত এমপারার। বারাণসী, ১৯৫৭, পৃ: ৩১৭-৩৩, ধীরা সেন, "পোষ্ট গুপ্ত কয়েন অফ বেঙ্গল", নেচার এন্ড সিগনিফেকেন্স, 'দ্য জার্নাল অফ্ নিউমিসমেটিক সোসাইটি অফ্ — বেঙ্গল Vo LI, পৃ: ৬২-৬৭।

৩৩। ইউ. ঠাকুর - "মিনিট এন্ড মিন্টিং" ইন ইণ্ডিয়া বারাণসী, ১৯৭২, পৃ: ৯০।

৩৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, তদেব পৃ: ৬৬৭-৬৮।

৩৫। ইউ. ঠাকুর, তদেব, পৃ: ৯১।

৩৬। 'নোট অন দি ফিজিকাল ডিষ্ট্রিবিউশন অফ দ্য ইন্ডো আরানিয়ান', শ্রী গিবহো দ্য, শ্রী ডি চন্দ্র শ্রী অভিবাহার কয়েনস্ অফ্ গঙ্গপা ভ্যালী, এ.ডি. ৭০০-১২০০, দ্য জার্নাল অফ্ নিউমিসমেটিক সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া, Vol L, পৃ: ৯৯-১০৪।

৩৭। আর. সি. মজুমদার, তদেব পৃ: ৬৬৭।

৩৮। বি. এস. মরিসন, তদেব, পৃ: ৯৯।

৩৯। তক্ত ই নাসিরি অফ্ মিয়া উদ্দিন (এইচ. জি. বেভারেগু, কলকাতা, ১৮৭৯-৯৭, পৃ: ৫৫৬।

৪০। 'মিডিয়া অব্ এক্সচেঞ্জ অফ ট্রেড ইন মিড ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া (AD ৭৫০-১২০০, দ্য জার্নাল অফ নিউমিসমেটিক সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া, Vol XVL, পৃ: ১৬১।

৪১। কয়েনস্ এন্ড কারেন্সি সিষ্টেম অফ পোষ্ট গুপ্ত বেঙ্গল। (AD ৫৫০-৭৫০), পৃ: ৫৫।

৪২। বিস্তৃতভাবে V.K. Thakar, Beginning of Feudalism in Bengal', Social Scientist পৃ: ৬৬-৬৭, পৃ: ৬৮-৮২।

৪৩। ম: থানিষ্ক — "ইকোনোমিক হিষ্ট্রি অফ মিথিলা" (C600B.C., 1097 A.D) নিউ দিল্লী, ১৯৭৪, পৃ: ১৪১-৪৪।

৪৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, তদেব, পৃ: ৬৫৯-৬৬০।

৪৫। এপিগ্রাপিক ইন্ডিকা, Vol-IV, নং ৩৪, পৃ: ৫২-৫৩।

৪৬। সামন্ত প্রভুদের রাজস্বক্ষেত্রে শোষণ, সামন্তপ্রভুদের সময় লুঠ এর জন্য বণিকদের অসুবিধা (তদেব পৃ: ১০২-১০৩) সামন্তযুদ্ধ (তদেব পৃ: ২৫৪-৫৬), ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পতনের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

৪৭। এন. আর. রায়-, বাঙ্গালার ইতিহাস (আদি পর্ব), কলকাতা ১৯৪৮, পৃ: ১৯৮।

৪৮। তদেব, পৃ: ১৯৯।

৪৯। তদেব।

৫০। এইচ. বি. সরকার, "এক্সপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট' ট্রেড অফ বেঙ্গল', জার্নাল অফ এসিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল, Vol XV, পৃ: ১৯৫-৯৮।

৫১। বিস্তৃতভাবে বি.ডি. চট্টোপাধ্যায় - "আসপেকটস্ অফ বুরাল সেটেলমেন্ট এন্ড রুরাল সোসাইটি ইন আরলি মেডিয়েভাল ইন্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৯০। বি.সি.সেন, "সাম হিস্টোটরিকাল আসপেক্টস অফ দি ইনস্ক্রিপসন অফ্ বেঙ্গল', বি. এস. মবিসন, তদেব, পৃ: ১৪-১৫, ঠাকুর "সাম আস্পেক্টস অফ ব্রাহ্মনাইজেসন অফ বেঙ্গল ইন দাঁ গুপ্ত পিরিয়ড !" কোয়াটারলি রিভিউ অফ্ হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ, Vol.XVII., No. 3 ও পৃ: ১৭৬-১৮১।

৫২। ডি. কে ঠাকুর-"বিগিনিং অফ্ ফিউডালিজম অব ইন বেঙ্গল', সোসাল সায়েন্টিষ্ট, নং ৬৬-৬৭, পৃ: ৬৮-৮৫।

৫৩। কোটাসুরের তথ্যগুলি এক্ষেত্রে যোগ করা যায়।

আধুনিক ভারত বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ

উপজাতি বা আদিবাসী ইতিহাস অনুসন্ধান প্রসঙ্গ

মহাদেব চক্রবর্তী

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয়, মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও সম্মানিত অতিথিবর্গ, সংগঠনের বিদগ্ধ সদস্যবৃন্দ, সুধী-সজ্জনমন্ডলী,

প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ-এর অষ্টাদশ সম্মেলনের সাফল্য আন্তরিকভাবে কামনা করি। আমার মত অত্যন্ত সাধারণ একজন ব্যক্তিকে আধুনিক ইতিহাস বিভাগের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। আসলে, অত্যন্ত সাধারণ মানুষের কিছু কথা বলাই আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু। জীবনের দীর্ঘ সময় আদিবাসী অঞ্চলে থাকার ফলে অনুভব করেছি যে, একটা অভিমান ঐ অঞ্চলের মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করেছে এবং বারবার প্রশ্ন উঠেছে : ''সমগ্র ভারত ইতিহাসে আমাদের স্থান কোথায়?''

আমার বক্তব্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি : (এক) ভৌগলিক, নরতত্ত্ব, ভাষাগত গোষ্ঠী, জীবিকা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি করে একটি উপজাতি মানচিত্র তৈরির প্রয়াস, (দুই) 'ট্রাইব' 'উপজাতি' এবং সাম্প্রতিক 'ইন্ডিজেনাস' শব্দগুলির ব্যঞ্জনা ও বিতর্ক, (তিন) আদিবাসী ইতিহাসের উপাদান এবং মৌখিক ইতিহাস প্রসঙ্গ ও গবেষকদের কিছু অসুবিধা।

অনেক বছর আগে স্যার আরথার কীথ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ *Antiquity of Man* গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন, প্রাচীন মানুষের সম্বন্ধে যাঁরা অনুসন্ধান করেন, তাঁরা ভারতের দিকেই আশার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁদের নিরাশ হতে হয়েছে। কীথ এর এই উক্তির পর অনুসন্ধান যে কিছু হয়নি তা নয়, কিন্তু মোটেই পর্যাপ্ত নয়। ভারতে আদিম মানবের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু কিছু আদিবাসী সমাজে। কয়েক শতাব্দীর সহাবস্থান-এর জন্য পূর্বকালের অনেক কিছুই আজও খুঁজে বের করা সম্ভব। নানা কারণে আদিবাসী ইতিহাস রচনার কাজটা আজ জরুরি।

।।এক।।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমীক্ষা অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীর পাঁচ ভাগের চার ভাগ আদিবাসীর বর্তমান বাসস্থান এশিয়া ও আফ্রিকায়। আসলে, আফ্রিকার পরেই ভারতের স্থান। 'ভারতের নৃ-বিদ্যা সর্বেক্ষণ-এর 'ভারতের আধিবাসী' প্রকল্পে তফসিলভুক্ত উপজাতিদের ৪৬১টি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে ভাগ করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতের প্রায় ৮ শতাংশ মানুষ উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত, অর্থাৎ জনগণনা অনুযায়ী আজ যদি দেশের জনসংখ্যা ১০০ কোটির বেশি হয় তাহ'লে উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৮ কোটির কম নয়। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রকৃত ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। শুধুমাত্র নৃতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্বের উপর নির্ভর করেই এই জনগোষ্ঠীর কিছু পরিচয় আমরা পাই। আলোচনার সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারে।[১] ভৌগলিকভাবে ৬ টি :

(১) উত্তর পূর্বাঞ্চল — স্বাধীনতার সময় এই অঞ্চলে বিশাল আসাম ছাড়া দুটি রাজন্য শাসিত রাজ্যও ছিল — মণিপুর ও ত্রিপুরা। সমগ্র ভারতের তথাকথিত 'মূলস্রোত' থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসকরা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাকে 'বহির্ভূত এলাকা' 'আংশিক ভাবে বহির্ভূত এলাকা', 'সীমান্ত এলাকা', 'নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সী' বা 'নেফা' ইত্যাদিতে চিহ্নিত করেছিলেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে আসামকে কেটে চারটি উপজাতি রাজ্যের জন্ম হল—নাগাল্যান্ড (১৯৬৩), মেঘালয় (১৯৭২), মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশ (১৯৮৭)। পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার সাথে সংযোগবাহী এই উত্তর পূর্বাঞ্চল একটি ক্ষুদ্রকায় ভারত যেখানে ৭৫টি বড় জনগোষ্ঠী এবং ৪০০ - 'র উপর স্থানিক ভাষা আছে। এখানেই গারো, নাগা, মিজো, ত্রিপুরী, রিয়াং, মিস্‌মি, কুকী প্রভৃতি উপজাতির বাসস্থান তাদের মধ্যে মঙ্গোলীয় প্রভাব বর্তমান।

(২) হিমালয় অঞ্চল অর্থাৎ সিকিম, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাঞ্চল প্রভৃতি রাজ্য এবং উত্তরবঙ্গের কিয়দংশ যেখানে লেপচা, রাভা, ভুটিয়া, গারু ইত্যাদির অবস্থান। এদের বেশিরভাগই মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) মধ্যাঞ্চল অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খন্ড সহ পশ্চিমবঙ্গেরও কিছুটা যেখানে গোন্দ্‌, হো, ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বাস, নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাদের অধিকাংশতেই 'প্রোটো - অস্ট্রালয়েড' বা আদি - অস্ত্রালদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৪) পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, গোয়া প্রভৃতি রাজ্যে করকরিয়া, সেহারিয়া, কোলঘা, ওয়ারলি ইত্যাদির মধ্যে ভীলরা গুরুত্বপূর্ণ এবং আদি - অস্ত্রালদের সাথে সম্পর্কিত।

(৫) দক্ষিণাঞ্চলের চারটি রাজ্যে চেঞ্চু, গদবা, কোলম, কোট্টুনাইকন, ইরুল, কুরুবা প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে নৃতাত্ত্বিক বিচারে ভূমধ্যসাগরীয়, নেগ্রিটো, ককেশীয়, আদি-অস্ট্রাল প্রভৃতি নানা নরজাতির প্রভাব আছে। নরতত্ত্বের বিচারে নীলগিরি পর্বতের টোডা-দের মত এমন অনেক জনগোষ্ঠী আছে যাদের গায়ে কোনও বিশেষ জাতির ছাপ আজও দেওয়া সম্ভব হয়নি।

(৬) দ্বীপাঞ্চল অর্থাৎ আন্দামান, নিকোবর, লাক্ষাদ্বীপে যেসব আদিবাসীর আবাসস্থল —যেমন জারোয়া, ওংগি, সেন্টিনেলি, জুয়াই ইত্যাদি, যাদের মধ্যে নেগ্রিটো সহ-অন্যান্য প্রভাব বর্তমান।

যেমন ভৌগলিক ও নৃতত্ত্বের বিচারে উপজাতি অঞ্চলকে চিহ্নিত করা যায়, ঠিক তেমনি ভাষাগত ভাবেও বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর — যেমন ইন্দো-ইউরোপীয়, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, তিব্বতী - চীনা ইত্যাদির প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়।

জীবিকার ভিত্তিতে ভারতীয় উপজাতিকে নির্মলকুমার বসু[২] পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন: (ক) খাদ্য - সংগ্রহকারী ও শিকারী যারা উৎপাদনের সাথে জড়িত নয়, (খ) স্থান পরিবর্তনকারী বা ভ্রাম্যমাণ কৃষক বা জুমিয়া, (গ) লাঙ্গল - ভিত্তিক স্থায়ী কৃষক, (ঘ) মেষপালক, কারিগর, কৃষি শ্রমিক, (ঙ) বাগিচা ও শিল্প শ্রমিক। বিভিন্ন উপজাতির অর্থনৈতিক অবস্থান বিভিন্ন রকমের।

ধর্মীয় আঙ্গিকে animism বা সর্বপ্রাণবাদ ছিল উপজাতিদের ধর্ম। পরবর্তী সময়ে হিন্দুয়ানি বা সংস্কৃতায়নের এবং খৃষ্টধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়।

উপজাতিদের মধ্যে একটা ছোট অংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। আবার লাক্ষাদ্বীপ, হিমাচল প্রদেশ কিংবা উত্তর-পশ্চিমের কিছু অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে ইসলামের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের উপজাতি মানচিত্রে নানা রং-এর ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র ছবিটি উপস্থিত করা যায়। ১৯৯১ - এর জনগণনায় সমগ্র ভারতে উপজাতির সংখ্যা ছিল ৬.৭৮ কোটি। এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশেই সবচেয়ে বেশি — ১ কোটি ৫৪ লক্ষ। অন্যদিকে উত্তর - পূর্ব ভারতের তথাকথিত 'সাত-বোনের' রাজ্য এবং সাথে যদি সিকিমকেও যুক্ত করা হয় তাহলে মোট উপজাতির সংখ্যা ১ কোটিও হয় না, অথচ এখানে ৪টি পুরোপুরি উপজাতি রাজ্য আছে এবং এই উত্তর পূর্বাঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি উপজাতি উত্তেজনা। ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষেই এই উত্তেজনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান সম্ভব, অথচ এই দিকটি আজও যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না। বিচ্ছিন্ন বা খন্ডিত দৃষ্টিতে নয়, সামগ্রিকভাবে সমস্যাটিকে দেখলে এবং নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা সহ অন্যান্য বিদ্যার সাহায্য নিয়ে উপজাতি ইতিহাস রচনার

কাজে হাত দিলে হয়তো বা ভারত ইতিহাসের অপূর্ণতা কিছুটা মিটতে পারে। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ৭৫টি উপজাতি গোষ্ঠী আজও 'প্রিমিটিভ' বা আদিম হিসাবে চিহ্নিত। প্রাক্ - কৃষি বা পুরোপুরিই জুম - ভিত্তিক অর্থনীতি, অত্যন্ত নিম্নহার সাক্ষরতা, ক্রমহ্রাসমান বা নিশ্চল জনসংখ্যা ইত্যাদির নিরিখেই এই আদিমতা নির্ধারণের রীতি আছে। হয়তো বা উপজাতি উন্নয়নের নানা প্রকল্প আছে, ১৯৯৯ - এর অক্টোবরে 'কেন্দ্রীয় স্তরে আলাদাভাবে' একটি উপজাতি মন্ত্রকও গঠিত হয়েছে, সমগ্র দেশে ১৪ টি 'ট্রাইব্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট' আছে, কিন্তু উপজাতি ইতিহাস রচনায় আগ্রহী গবেষক তেমন নেই। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির নানা সীমাবদ্ধতা থাকে। ইতিহাসেও এক সময় অনেক অনুশাসন মানতে হ'ত, অন্যান্য বিদ্যা থেকে গ্রহণের ব্যাপারেও কিছুটা সংকোচ বা দ্বিধাও ছিল, আজ কিন্তু অতীত দিনের অনেক বাধা থেকে ইতিহাস অনেকটা মুক্ত। আর. জি. কলিংউড, পি. গার্ডিনার, ই. এইচ. কার বা মার্ক ব্লক প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত গন্ডী আজ কিছুটা হলেও শিথিল হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠেছে ঃ এই সবের ফলে ইতিহাস রচনার নামে কি বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে না? সত্য অনুসন্ধান যদি ইতিহাসের অভীষ্ট হয়, তাহলে তা হবে কেন। উপজাতি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক যুগকে যথাযথভাবে আলাদা করা নানা কারণে কঠিন, সেজন্য ইতিহাসের সব যুগ সম্পর্কেই কিছুটা ধারণা থাকতে হবে। আসলে, আমাদের তথাকথিত আধুনিক জীবন ও সমাজের মধ্যেও কত প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা লুকিয়ে আছে, প্রতি মুহূর্তে আমরা টের পাই। চিরায়ত ও আধুনিকতার সম্পর্কে নিয়ে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইতিমধ্যে কত আলোচনা হয়েছে। আসলে, সমগ্র ভারত ইতিহাসে এক যুগ থেকে আর এক যুগে উত্তরণের পর্যায়কে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এক জটিল বিষয়বস্তু।[৮] এটা যদি সামগ্রিক ভারত ইতিহাসের ক্ষেত্রে সত্য হয়, তাহ'লে আদিবাসী ইতিহাসের ক্ষেত্রে দারুণভাবে সত্য।

।।দুই।।

ট্রাইব, উপজাতি, ইন্ডিজেনাস ইত্যাদি শব্দ নিয়ে বিতর্ক

ইংরেজী 'ট্রাইব' শব্দটি ভারতের জনগণনায় কি অর্থে ব্রিটিশরা ব্যবহার করেছিলেন সেটা ঠিক স্পষ্ট নয়। ১৮৮১ তে 'ফরেস্ট ট্রাইব' কথাটি দিয়েই যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯০১ এবং ১৯১১ - 'র আদমশুমারিতে এই জনগোষ্ঠীকে 'animist' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৯২১ - এ 'হিল্' কথাটি যুক্ত করে 'হিল্ এ্যান্ড ফরেস্ট ট্রাইব' নাম দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩১ - এর লোকগণনায় 'প্রিমিটিভ ট্রাইব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৩৫ - এর ভারত শাসন আইনে 'ব্যাক্ওয়ার্ড ট্রাইব' এবং ১৯৪১ - এর

জনগণনায় শুধুমাত্র 'ট্রাইব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতের সংবিধানে 'সিডিউলড্ ট্রাইব' শব্দটি স্থান পায়। সংবিধান প্রণয়নের সময় সংবিধান সভায় জয়পাল সিংহ 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অন্যদিকে সভাপতি বি. আর আম্বেদকর - এর বক্তব্য ছিল যে, আইনের দৃষ্টিতে 'সিডিউলড্ ট্রাইব' শব্দটি অনেক বেশি বলিষ্ঠ। সংবিধান সভার এই বিতর্ক[8] নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ দলিল।

'ট্রাইব' শব্দের পাশাপাশি 'স্যাভেজ', 'বারবারিক', 'জঙ্গলী' এ্যাবঅরিজিনাল সহ নানা ধরণের অবমাননাকর শব্দ ব্রিটিশ যুগে ব্যবহৃত হ'ত। এর থেকেই শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি আন্দাজ করা যায়। 'ট্রাইব' শব্দটি একটি ঔপনিবেশিক অবদান হলেও, ভারতে সরকারিভাবে কিন্তু এই শব্দটির সংজ্ঞা আজও দেওয়া হয়নি। নানা জনে নানা সময়ে 'ট্রাইব' - এর কিছু বৈশিষ্ট্যের দিকে শুধু অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। কিন্তু ঐসব বৈশিষ্ট আবার সকল 'ট্রাইব' - এর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। এরই জন্য কেউ কেউ মন্তব্য করছেন যে, তত্ত্বগত ভাবে আজকের পৃথিবীতে 'ট্রাইব' ধারণাটি অচল, যদিও রাজনৈতিকভাবে এটিকে ব্যবহার করা হয়।[৫] বিমলা চরণ ল তাঁর 'ট্রাইবস্ ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া' (পুনা, ১৯৪৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কিভাবে তথাকথিত অনার্যগোষ্ঠীভুক্ত শবর, নিষাদ, কিবাতদের মত তথাকথিত আর্যগোষ্ঠীভুক্ত কুরু বা পাঞ্চাল রাও আজকের অভিধায় 'ট্রাইব' ছিল। কি প্রাচীন কি মধ্যযুগের ভারতে, আজকে যাদের 'ট্রাইব' বলা হয়, সেই ভীল, কোল, মীণা, ভূমিষ্ঠ, মুন্ডা, গোন্দ, বিনঝল, চুটিয়া, কাছাড়ী, খাসী, চেরো, ত্রিপুরী, ডিমাসা বা কোচ - দের নিজস্ব রাজ্য ও রাজতন্ত্র এবং প্রতিবেশীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও ছিল। 'ট্রাইব' চরিত্র নিরূপণের অন্যতম মাপকাঠি হল অসংযোগ, বিচ্ছিন্নতা, যোগাযোগহীনতা। কিন্তু আজ থেকে প্রায় চারদশক আগে বি. কে. রায়বর্মণ তাঁর 'ব্রিজ এ্যান্ড বাফার' মডেল[৬] দিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন 'ট্রাইব'-এর অবস্থান নির্ণয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যেমন সীমান্তবর্তী নেফার মিরি জনগোষ্ঠী একদিকে অবর ট্রাইব এবং অন্যদিকে অহম রাজাদের মধ্যে কিভাবে সেতুবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করেছিল, কিংবা কুকীরা কিভাবে দু'দিকে দুই প্রতিপত্তিশালী প্রতিবেশী — একদিকে নাগা এবং অন্যদিকে মণিপুরের মৈত্রৈদের মধ্যে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক 'বাফার' - এর ভূমিকা পালন করেছিল। এ রকম আরও কত উদাহরণ এবং সবই অতীত থেকে।

অশিক্ষা অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিরোধিতা ইত্যাদিও 'ট্রাইব' চরিত্র স্থিরীকরণে একটা ভূমিকা পালন করে। ১৯৯১ - এর জনগণনায় দেখা যায়। সমগ্র ভারতবর্ষে যেখানে ৫২% মানুষ সাক্ষর, সেখানে ট্রাইব্যালদের মধ্যে সাক্ষরতার

হার ৩০% - এও পৌঁছয়নি। আবার অন্যদিকে সাক্ষরতার প্রশ্নে আর একটি ট্রাইব্যাল রাজ্য মিজোরাম সমগ্র দেশের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী। এক সময়, সমগ্র ট্রাইব্যাল সমাজকে স্থির, অচঞ্চল, গতিহীন হিসাবে চিত্রিত করা হ'ত, কিন্তু এটি যে সর্বত্র সমানভাবে সত্য নয় তা নানাভাবে প্রমাণ করা যায়। সমাজের অভ্যন্তরে যে পরিবর্তনের গতি অব্যাহত তাকে সঠিকভাবে সমীক্ষা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারলে এই ইতিহাস রচনার উদ্যোগ সার্থক হতে পারে। ঔপনিবেশিক লেখকরা প্রথম দিকে 'ট্রাইব' ও 'কাস্ট' বা জাত-পাত বা বর্ণভিত্তিক ব্যবস্থাকে প্রায় সমপর্যায় ভুক্ত করতেন। ই. থার্স্টনের বিখ্যাত বইটির নাম ছিল 'কাস্ট এ্যান্ড ট্রাইবস্ ইন সাদার্ন ইন্ডিয়া'। যাই হোক্ পরবর্তী সময়ে তাঁরা ভিন্নরকম মূল্যায়ন করেছেন। আজকের প্রেক্ষিতে এইসব মূল্যায়নের যথার্থতা কতটুকু ছিল তাও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

'ট্রাইব্যাল' শব্দের বাংলা হিসাবে 'উপজাতি' প্রতিশব্দটি চালু আছে। গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে 'উপজাতি' শব্দটির প্রতি কিছু আপত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশের ঢাকায় ১৯৯৭ - এ 'জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠক' - এর রিপোর্টে দেখা যায় যে, প্রতিনিধিরা 'উপজাতি' শব্দটি প্রত্যাখান করেন, কারণ ওই শব্দটি অবমাননাকর। তাঁরা বলেন এই শব্দ আদিবাসীদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা প্রদান করে। সরকার বৈষম্যমূলকভাবে শব্দটি আদিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে। ...'উপজাতি' যার অর্থ অপূর্ণাঙ্গ জাতি বা ঊনজাতি অথবা পূর্ণ জাতি হিসাবে যাদের এখনো বিকাশ ঘটেনি। এই ধরণের বৈষম্যের রাজনৈতিক ফলাফল খুবই মারাত্মক। কারণ এর ফলে সংখ্যাগুরুর সংস্কৃতিকে সংখ্যালঘুর সংস্কৃতি থেকে উন্নততর অবস্থানে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[৭] প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের সরকারি জরিপে ২৯টি উপজাতি জনগোষ্ঠী এবং ১৯৯১ সালের জনসংখ্যা জরিপ অনুযায়ী উপজাতি জনসংখ্যা ১২,০৫,৯৭৮ যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১.১৩। 'উপজাতি' শব্দটি সত্যিই অকীর্তিকর, অমর্যাদা বা অপমানসূচক কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তবে একট জনগোষ্ঠীর চেতনায় যখন আঘাত এসেছে, তখন বিকল্প শব্দের অনুসন্ধান করলে ক্ষতি কি। উপজাতি ইতিহাস রচনার সময় এই শব্দ চয়নের দিকটির প্রতি আমাদের অবশ্যই সাবধানী হতে হবে।

যে শব্দটির প্রতি ঝোঁক বা আকর্ষণ ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেটি 'ইন্ডিজেনাস পিউপিল'। মানবাধিকার ইত্যাদির প্রশ্নে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মঞ্চে শব্দটি ব্যবহার করে আসছে।

১৯৮৮তে ক্যাপ্টেন কুক - এর অস্ট্রেলিয়া অভিযানের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে, কিংবা ১৯৯২ - এ কলম্বাস এর আমেরিকা 'আবিষ্কার' - এর ৫০০ বছর সম্পূরণ উপলক্ষে পাশ্চাত্ত্য দেশে যে জাঁকজমক পূর্ণ উৎসবের আয়োজন চলছিল — সেই

সময় 'ইন্ডিজেনাস পিউপিল' - এর প্রশ্নটি আবার সামনে আসে। কলম্বাস বা কুকরা এক পক্ষের দৃষ্টিতে দুঃসাহসিক নাবিক হলেও, 'ইন্ডিজেনাস' - দের দৃষ্টিতে তাঁরা মানবতার দুষমণ ছাড়া কিছু নয়। এইসব পূর্তি উৎসবের অর্থ হল 'ইন্ডিজেনাস'-দের গণহত্যা করা কিংবা মায়া - আজটেক - ইন্কা সভ্যতাকে ধ্বংস করার কাহিনীকে মহিমান্বিত করার অপচেষ্টা মাত্র। তথা কথিত 'আবিষ্কার' - এর কাহিনীর দাপটে স্থানীয় আদিবাসীদের কাহিনী ধুলায় — মাটিতে চাপা পড়ে গেছে। এই রকম একটা উত্তেজনার মুহূর্তে রাষ্ট্রসংঘ থেকে ১৯৯৩ সালটাকে 'ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিজেনাস ইয়ার' হিসাবে পালনের ডাক এল। 'ইন্ডিজেনাস' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে দেশীয়, দেশজ, জনজাতি, আদিবাসী, আদি জনজাতি স্বাজাতিক ইত্যাদি - সেটি ঠিক নির্ধারিত হয় নি, তবে শব্দটিকে ঐভাবে অবিকৃত রাখাই কেউ কেউ পছন্দ করেন। যেমন ত্রিপুরায় উপজাতি সংগঠনগুলির নামকরণ ছিল - 'ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ' (আজও আছে), 'ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি' ইত্যাদি। কিন্তু ইদানিং বাংলা ভাষা বা সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত হওয়ার ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং 'ইন্ডিজেনাস' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে 'ইন্ডিজেনাস পিউপিলস্ ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা' (আই.পি.এফ.টি.) নামে একটি রাজনৈতিক দলেরও জন্ম হয়েছে এবং প্রায় রাতারাতি। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ' (টি.টি.এ.এ.ডি.সি.) - এর ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে। শুধু ত্রিপুরাই নয়, অন্যত্রও 'ইন্ডিজেনাস' শব্দটি উপজাতি - মননে গভীরভাবে দাগ কেটেছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকেও সমর্থন আসছে। একসময় 'ট্রাইব্যাল ওয়ার্ল্ড' কে 'Fourth World' বা 'চতুর্থ ভুবন' বা 'First Nation' বা 'প্রথম জাতি' ইত্যাদি মন ভোলানো নামে চিত্রায়িত করা হ'ত। এখন চলছে 'ইন্ডিজেনাস' শব্দটি নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে, কারণ এর পক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। এই 'ইন্ডিজেনাস' শব্দের মধ্যে কি 'ভূমিপুত্র'র বীজ ছদ্মভাবে লুকিয়ে নেই?

ভারতের মাটিতে 'ইন্ডিজেনাস্' তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করার প্রধান অসুবিধে হল আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে আদিবাসী - নিধনের যে কাহিনী সত্য, ভারতে তা সত্য নয়। তাছাড়া জাতি গঠনের প্রশ্নে ভারতের কাহিনী ইউরোপের অনেক দেশ থেকেই স্বতন্ত্র। সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল, 'টাইম এ্যান্ড স্পেস্' অর্থাৎ সময় এবং স্থান। কে কত পুরুষ কোন জায়গায় থাকলে 'ইন্ডিজেনাস্' বলে গণ্য হবে? যারা উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত নয়, তারা কি 'ইন্ডিজেনাস্' হতে পারে না? উপজাতি মানেই কি 'ইন্ডিজেনাস্'? এক অঞ্চলের 'ইন্ডিজেনাস্' অন্য অঞ্চলে 'ইন্ডিজেনাস্' বলে গণ্য নাও হতে পারে। ত্রিপুরাতে ১৯টি তফসিল ভুক্ত উপজাতির মধ্যে ১১টি গোষ্ঠীই বহিরাগত। শুধু ১১টি কেন, প্রতিটি উপজাতি ইতিহাসেরই প্রথম অধ্যায়ের নাম

'মাইগ্রেশন' বা প্রচরণ বা পরিব্রাজন। একদিকে মাইগ্রেশন, অন্যদিকে 'অরিজিন্যাল ইনহ্যাবিটেন্ট' - পরস্পর বিরোধী। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালী ছাড়াও সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, ভূমিজ, কোরা, লোধা সহ চল্লিশ - বিয়াল্লিশটি উপজাতি জনগোষ্ঠী আছে — কে এই রাজ্যে 'ইন্ডিজেনাস্' কে আগন্তুক? - সুতরাং প্রশ্নটি জটিল। এই প্রসঙ্গে ১৯৮৩ সালে রাষ্ট্রসংঘের 'ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ইন্ডিজেনাস পপুলেশন' — এর কাছে ভারত সরকারের বিবৃতিটি উল্লেখযোগ্য ঃ

"It will be appreciated that in an ancient racial melting-pot like India, no sociologist, historian or anthropologist are in a position to say with any degree of certainty that the scheduled tribes are the only indigenous populations. Further, there is no certainty as to who displaced whom and which of the races in India are today descendants of the conquered or the Conqueror"[৮]

।।তিন।।

উপাদান সহ অন্য কিছু প্রশ্ন

উপজাতি বা আদিবাসী ইতিহাস চর্চায় উপাদানের প্রশ্নটি অনেক সময় মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান প্রায় নেই বললেই চলে। পর্যটকদের বিবরণে বা পুরনো লিখিত উপাদানে মাঝে মাঝে কিছুটা আভাস হয়তো পাওয়া যায়। মহাফেজখানাও তেমন সাহায্যে আসে না। শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকেই আদিবাসীদের সম্পর্কে লিখিত তথ্য পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক লেখকদের চোখে, ভাষা যেমন পশু ও মানুষের মধ্যে ভেদরেখা আনে। তেমনি লেখা বা লিপি অসভ্য ও সভ্যের মধ্যে পৃথকত্ব সূচিত করে। আসলে, অধিকাংশ আদিবাসীর নিজস্ব ভাষা আছে, কিন্তু লিপি নেই। তাদের কথা অন্যরা যেভাবে লিখে গেছেন সেইভাবেই তারা এতদিন পরিচিত। এই প্রচলিত পরিচয়কে নতুন এবং ভিন্নভাবে সাজানোর উদ্যোগ ইদানীং উপজাতি বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে, একদিকে যেমন অতীতে অবমূল্যায়ন হয়েছে, তেমনি আবার বর্তমানে অতিমূল্যায়ন বা 'ট্রাইব্যালিজিম' বা উপজাতিসর্বস্বতা বা সবকিছু গৌরবান্বিত করাব প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই দুটি পরস্পরবিরোধী এবং বিপরীতমুখী স্রোতের মাঝে দাঁড়িয়ে উপজাতি ইতিহাস রচনা খুব একটা সহজ কাজ নয়। আদিবাসী ইতিহাস ছিল, কিন্তু আজও ঠিক লেখা হয়নি। তাদের 'history less' বা ইতিহাসবিহীন বলা মোটেই যথার্থ নয়। লেখা হয়নি বলে ইতিহাস ছিল না বলার অর্থ তথাকথিত 'আবিষ্কার' হয়নি বলে সেখানে মানুষ ছিল না। মহারাষ্ট্রের ওরলি'দের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ডেভিড হার্ডিমান মন্তব্য করেছেন ঃ

"The fact that they practised so many different methods of cultivation, that they are known to have migrated from one area to another, and that they were in some cases a regionally dominant power - all indicate that their history was every bit as full and complex as that of the rulers whose deeds fill medieval ballads and chronicles."[৯]

প্রচলিত উপাদানের যখন এতই অভাব, তখন Oral hostory বা মৌখিক ইতিহাসের শরণাপন্ন আমাদের হতেই হবে। মৌখিক ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেটি ইতিহাস পদবাচ্য নয় — এই রকম মন্তব্যের সাথে নিশ্চয়ই অনেকে একমত পোষণ করবেন না। উপজাতি জীবন ও সমাজকে দূর থেকে চোখে দেখেই ঔপনিবেশিক যুগে ডাব্লু রবিনসন, জন বাটলার, বি. এইচ. হডসন, এ. ক্যাম্পবেল, ই. টি. ডাল্টন, এইচ. এইচ. রিজলে, জে. এইচ. হাটন, জে. সেকস্‌পীয়র, এন. ই. পেরী, এ. প্লে-ফেয়ার সহ আরও কত সাহেব তাঁদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এই সব গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই আমাদের অনেকের অনেক কিছু ধারণা, অথচ সবই ছিল মৌখিক উপাদান। অন্যদিকে পোলিশ নৃতত্ত্ববিদ ম্যালিনোস্কি-র 'participant observation' মডেলে অনুপ্রাণিত হয়ে ভেরিয়ার এলউইন - এর মত গবেষকরা জীবনটাই কাটিয়ে দিয়ে গেলেন যাদের জন্য কাজ করেছেন তাদেরই মধ্যে থেকে, তাদেরই একজন হয়ে। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু উপজাতি — প্রশ্নে প্রথমে এলউইন - এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভেরিয়ার এলউইন - এর চিন্তা নিয়ে হয়তো অনেকের দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর কোনও 'শৌখিন মজদুরী' ছিল না, আসলে 'participant observation' মডেলে আরামকেদারা বুদ্ধিজীবী-দের স্থান নেই। এই মডেল অনুসরণ করলে এবং উপজাতি ভাষা আয়ত্ত্ব করলে শ্রুতি-স্মৃতি থেকে ইতিহাসের কত বিচিত্র উপাদান পাওয়া যায়, সেটি লোককথা, লোকসাহিত্য, প্রবাদ-প্রবচন, ছাড়া সহ কত কি হ'তে পারে। সাবলটার্ণ বা নিম্নবর্গের ইতিহাস রচয়িতারা নানা কারণে একাধারে প্রশংসিত এবং সমালোচিত। সাবলটার্ন ইতিহাসবিদদের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ না করলেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে, ইতিহাসের কত বিচিত্র উপাদান তাঁরা ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে মৌখিক ইতিহাসের সংখ্যাই বেশি। অবশ্য নিম্নবর্গের এই গবেষকরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতিদের প্রশ্নে তেমন আগ্রহ দেখান নি। আমরা অনেক সময় তথ্যের অপ্রতুলতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে থাকি। কিন্তু আমাদের এই প্রত্যাশা কি যথার্থ যে, ইতিহাস রচনার জন্য আমাদের সব প্রয়োজনীয় তথ্য ঔপনিবেশিক প্রভুরা সাজিয়ে দিয়ে যাবেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত আধুনিকোত্তর তিন জন নারীবাদী ঐতিহাসিক[১০] সম্প্রতি *Telling the Truth at out History* গ্রন্থে মৌখিক ইতিহাসের নতুন নতুন উপাদানের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছেন। এই নারীবাদীদের মূল বক্তব্যের সাথে একমত না হলেও তাঁদের নির্দেশিত উপাদানের দিকে নজর দিলে ক্ষতি কি। আসলে, মৌখিক ইতিহাসের মূল কথা সমীক্ষা এবং সেটি সবকিছুর। অবশ্য সাথে সাথে আর একটি কথাও বলতে হবে, আজকে আর ভেরিয়ার এলউন-এর সেই যুগ নেই। উপজাতি অঞ্চলে কোনও অ-উপজাতি গবেষকের পক্ষে সমীক্ষা করা, বিশেষত উত্তর-পূর্ব ভারতে, খুবই দুরুহ কাজ। অ-উপজাতি মানেই 'বহিরাগত', বিদেশী, 'শোষক' — উদ্দেশ্য তার যতই মহৎ থাক। উপজাতি মননের এই ভাবনা স্বাধীনোত্তর ভারত ইতিহাসের একটি বিশেষ দিক, যেটি অবশ্য ব্রিটিশ ভারতে সাঁওতাল · বিদ্রোহের সময়ও দেখা গিয়েছিল। সম্প্রতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এইসব বহিরাগতকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয় — যেমন মিজোরামে 'ভাই', মেঘালয়ে 'উধকার', মণিপুরে 'মায়াং' বোড়ো - ভূমিতে 'হাসা' ইত্যাদি। সুতরাং উপজাতি ইতিহাস রচনার জন্য 'participant observation' মুখে সহজ হলেও কাজে কিন্তু খুবই কঠিন। অনেক গবেষক লাঞ্ছিত হয়েছেন এবং আজও হচ্ছেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রায় চারদশক উত্তর-পূর্বাঞ্চলে থাকা সত্ত্বেও আমি আজও বহিরাগত। অবশ্য এজন্য আমরা চুপচাপ বসে নেই, আমাদের 'নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া হিস্ট্রি এসোসিয়েশন' (নীহা) বা 'ত্রিপুরা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি'-এর মঞ্চ থেকেই আমরা আমাদের বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং ইদানীং বহু উপজাতি গবেষক আমাদের অনেক প্রকল্পের শরিক হয়ে কাজটি ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছেন।

উপজাতি জগৎ এক বিস্ময়ের জগৎ—জীবনে কত ছন্দ! হয়তো বা শহুরে দৃষ্টিতে সবকিছু উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আজকের 'সভ্য' পৃথিবীতে শুধু পরিবেশবিদই নন, সকলেই এক বাক্যে জুম-চাষকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দেন। পাহাড় পুড়িয়ে ছাই এর উপর ফসল ফলাবার এই আদিম পদ্ধতি আজও উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ দেশের কিছু জায়গায় টিকে আছে। জুম আবার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত — 'আদি-আরিক', 'টেকংগলু', 'পদু' 'হুকনিসমাং' সহ আরো কত নাম। কিন্তু পাহাড়ে উপজাতি অঞ্চলে গেলেই বোঝা যায় জুম শুধু একটি অর্থনীতিরই নাম নয়, এটি একটি সংস্কৃতিরও নাম। জুম নাচ, জুম গান, জুম বাদ্য থেকে শুরু করে প্রেম, বিবাহ, লোক-কথা, দেব-দেবী সবই জুম-কেন্দ্রিক। উপজাতি সংস্কৃতির ইতিহাসে জুমের আছে এক অনবদ্য ভূমিকা। সহ-মর্মিতার সাথে সমগ্র বিষয়টি চিন্তায় না আনলে উপজাতি ইতিহাস রচনার উদ্যোগটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। আজকের এই জটিল - কঠিন পৃথিবীতে একদিকে উপজাতি জীবনের সারল্য, প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক এবং অন্যদিকে আধুনিকতার স্পর্শ, আত্ম-পরিচয়ের প্রশ্ন, স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আওয়াজ, উগ্রপন্থা ইত্যাদি সমাজ-জীবনেও নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এরই জন্য বলছিলাম, উপজাতি জীবনের

বৈচিত্র ও প্রাণ দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এই বিস্ময়ের কথা গ্রীণব্ল্যাট তাঁর *'মারভেলাস্ পসেসান্সস্ : দ্যা ওয়ান্ডার অব দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড'* গ্রন্থে অন্য এক প্রেক্ষিতে বলতে গিয়ে এইরকম মন্তব্য করেছেন : "...the experience of wonder continually reminds us that our grasp of the world is incomplete"[১১] ঘুরে-ফিরে সেই রবীন্দ্রনাথেরই কথা : "বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।" আসলে, ইতিহাসই পারে একটা সামগ্রিক ছবি আঁকতে। নৃ-বিদ্যা বা সমাজতত্ত্ব বিদ্যায় উপজাতি জীবন-চর্চা হয়তো আছে, কিন্তু নানা কারণে সেটি সীমাবদ্ধ এবং কেউ কেউ 'whiteman's Science' বলে মন্তব্য করেন। বিখ্যাত নৃবিদ্যা বিশারদ টি. এন. মদন স্বীকার করেছেন যে, ইতিহাসের উপর নির্ভর না করে প্রকৃতি ও জীব বিজ্ঞানের উপর প্রথমদিকে নির্ভর করে তিনি ভুল করেছিলেন এবং সেটি তিনি পরে উপলব্ধি করতে পারেন, কারণ তাঁর ভাষায় "... found social history and literature richer sources of inspiration in my anthropological work than the natural or biological science."[১২]

ভারত ইতিহাসে এই জনগোষ্ঠী, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী,[১৩] 'জন' নামেই পরিচিত ছিল এবং প্রথমদিকে নদীরপাড়ে ও সমতলেই এদের বাসস্থান ছিল। ক্রমে সময়ের সাথে সাথে ঐতিহাসিক নানা কারণে এদের স্থানান্তর শুরু হয় এবং বনে-জঙ্গলে, দূরে পাহাড়ে এবং সীমান্তে অর্থাৎ 'আটবিক রাজ্য', 'মহাকান্তার' বা 'প্রত্যন্তদেশ' অঞ্চলে এই 'জন'রা তাদের বাসভূমি তৈরি করে। এই অবহেলিত জনগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্যযুগে 'হীন-জাতি', কিংবা সমাজতত্ত্ববিদ জি. এস. ঘুড়ী'র ভাষায় 'backword Hindus', অর্থাৎ হিন্দু সমাজের আঙ্গিনায় হয়তো বা ছিল যদিও তারা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। নিজেদের আলাদা পরিচিতি এই আদিবাসীরা যুগে যুগে রক্ষা করতে পেরেছিল, কারণ শাসকরা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি। ইসলাম যেহেতু মূলত নগর কেন্দ্রিক, এজন্য মধ্যযুগেও নবাব বাদশাহ'রা এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে উদাসীনতা দেখিয়েছেন। Haimendorf - এর ভাষায় প্রাক্—ব্রিটিশযুগে আদিবাসীদের সঙ্গে রাষ্ট্রের এই সম্পর্ক ছিল 'frictionless', কিন্তু পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ ও আধিপত্য সর্বত্র প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে এই জনগোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কও ভিন্ন রূপ নেয়। প্রাক্-গান্ধী যুগের ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই প্রশ্নে কোন আগ্রহ দেখায়নি, ফলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। আজকের উপজাতি পরিচয় সত্তা, উপজাতি উত্তেজনা বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনার সময় ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটটি আমাদের মনে রাখতেই হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য জনগোষ্ঠীর নানা প্রশ্ন নিয়ে জাতীয় আলোচনা - চক্র স্বাধীন ভারতে প্রথম এই কলকাতা শহরেই হয়েছিল ১৯৬৬ (৩-৬ ডিসেম্বর) এবং রথীন মিত্র ও বরুণ দাশগুপ্ত সম্পাদিত একটি

বই ও প্রকাশিত হয়েছিল (*A Common Perspective for North-East India*) ১৯৬৭ সালে। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ - এর বিদগ্ধ সভ্য ও গবেষকদের কাছ থেকে স্বাভাবিক কারণেই তাই প্রত্যাশা বিরাট।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১. বুদ্ধদেব চৌধুরী সম্পাদিত, *ট্রাইব্যাল ট্রান্সফরমেশন ইন ইন্ডিয়া*, ৩য় খন্ড, নতুন দিল্লী, ১৯৯২, পৃ. viii - x.

২. এন কে. বসু, *ট্রাইব্যাল লাইফ ইন ইন্ডিয়া*, এন. বি. টি., নতুন দিল্লী, ১৯৭১, পৃ. ৪-৫।

৩. "The transition from primitiveness to modernity in India is often abrupt and generally ungraded". – Moonis Raza *et. al.*, "Tribal population of India : Spatial patterns of Clustering and concentration". *Occasional Paper* No. 5 1977. Centre for the Study of Regional Development, JNU, New Delhi.

৪. (ক) এইচ. এস. সাক্সেনা, *সেফ্‌গার্ডস্‌ ফর সিডিউলড্‌ কাস্টস্‌ এ্যান্ড ট্রাইবস্‌ — এ্যান একস্‌প্লোরেশন অব দ্য কন্‌স্টিটিউন্ট এ্যাসেম্বলী ডিবেটস্‌*, উপ্পল পাবলিশিং হাউস, নতুন দিল্লী, ১৯৮১।

(খ) *কনস্টিটিউন্ট এ্যাসেম্বলী*, ভারত সরকার, নতুন দিল্লী, ৭ম খন্ড, ১৯৪৯।

৫. বুদ্ধদেব চৌধুরী সম্পাদিত, *তদেব*, পৃ. ৫৩।

৬. বি. কে. রায়বর্মণ, 'স্ট্রাক্‌চার অব ব্রিজ এ্যান্ড বাফার কমিউনিটিস্‌ ইন দ্য বর্ডার এরিয়াস্‌, *ম্যান ইন ইন্ডিয়া* ৪৬ খন্ড, সংখ্যা ২, ১৯৬৬, পৃ. ১০৩-০৭।

৭. ফিলিপ গাইন সম্পাদিত, 'রিপোর্ট জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল বৈঠক, ডিসেম্বর ১৮-২০, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ৪-৫।

৮. সি. এল. ইমচেন, 'দ্য ইনডিজেনাস আদার ইন ইন্ডিয়া', এম. কে রাহা ও এ. কে. ঘোষ সম্পাদিত *নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া : দ্য ইউম্যান ইন্টারফেস্‌*, জ্ঞান পাবলিসিং, নতুন দিল্লী, ১৯৯৮, পৃ. ২০৩-০৪।

৯. উদ্ধৃতি : *'ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি'* মুম্বাই, ৩৫ খন্ড, ১৮ নং, ২৯ এপ্রিল - ৫মে, ২০০০, পৃ. ১৫২৩।

১০. জয়েস এ্যাপেলবি, লিন হান্ট, মার্গারেট জ্যাকব, *টেলিং দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট হিস্ট্রি*, নিউইয়র্ক, ১৯৯৪।

১১. এস. গ্রীনব্ল্যাট, *মারভেলাস্‌ পসেসান্সস্‌ : দ্য ওয়ান্ডার অব দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড*, চিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস, চিকাগো, ১৯৯১, পৃ. ২৫।

১২. মীণাক্ষী থাপার সম্পাদিত, *এ্যানথ্রোপলজিক্যাল জার্নিস : রিফ্লেকসনস্‌ অন ফিল্ড ওয়ার্ক*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, নতুন দিল্লী, ১৯৯৮, পৃ. ১৫৯-৬০।

১৩. নীহাররঞ্জন রায়, প্রারম্ভিক ভাষণ, কে. এস. সিং সম্পাদিত, *দ্য ট্রাইব্যাল সিচুয়েশন ইন ইন্ডিয়া*, দিল্লী, ১৯৮৬, পৃ ৩-২৪।

বহির্বিশ্ব বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ

সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসের পশ্চাদ্‌গতি

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাসবিজ্ঞানী শুধুমাত্র ইতিহাসের ধারার একজন উদাসীন পর্যবেক্ষক নন। তিনি ইতিহাসের একজন ভাষ্যকারের ভূমিকাও পালন করেন। আর এই ভাষ্য রচনার মধ্যে অনিবার্যভাবেই তার নিজস্ব মূল্যবোধ এবং চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে। এমনকি শুধুমাত্র বিনা মন্তব্যে ঘটনাপ্রবাহ নথিবদ্ধ করতে গেলেও অনেক ঘটনার মধ্য থেকে কিছু ঘটনা বেছে নিতে হয়। আর এই বেছে নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যেই প্রতিফলিত হয় ইতিহাসকারের নিজস্ব চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ। ইতিহাস ও ইতিহাসবিজ্ঞানীর সম্পর্ক নিয়ে এই সামান্য মুখবন্ধের কারণ এই যে সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে এই পন্ডিতসভায় আমি যে বক্তব্য রাখতে যাচ্ছি তাতে যে অনিবার্য ভাবে আমার নিজস্ব মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। আর এই ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও বিচারধারার নিরিখেই অন্য সব ইতিহাসবিজ্ঞানীর মতো আমিও বিশ্ব ইতিহাসের প্রগতি অথবা পশ্চাদ্‌গতি নির্ণয় করে থাকি। আর আমার ইতিহাস চেতনা যে প্রচ্ছন্ন মূল্যবোধ ও মতাদর্শে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রভাবেই আমি আপনাদের সামনে সবিনয়ে নিবেদন করছি যে ইতিহাস সব সময় শুধুমাত্র সরলরেখায় সামনের দিকে চলেনা। মাঝে মাঝে ইতিহাসের পশ্চাদ্‌গতি হয়। আর আমার মতে সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসের পশ্চাদ্‌গতি অনস্বীকার্য। এ বিষয়েই আমি আজ আপনাদের সামনে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করবো।

আমার মতে সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়। কারণ আমি মনে করি সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থার যত দোষই থাকুক, আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের চেয়ে উন্নত। সোভিয়েত রাষ্ট্র ভেঙে না গিয়ে, সেখানে উন্নততর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই বিশ্ব ইতিহাসের অগ্রগতি সূচিত হতো। বিশেষত, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে

সোভিয়েত ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি ইতিবাচক অবদান ছিল। প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদকে পর্যুদস্ত করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির পরেই বর্তমানে আবার রাশিয়া সহ ইউরোপের অনেক দেশে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির কমবেশি প্রত্যাবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়ন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করে তৃতীয় বিশ্বের উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পরেই আমেরিকার নেতৃত্বে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ আবার তৃতীয় বিশ্বে নূতন করে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। পশ্চিম এশিয়ায় ঘটে চলেছে যার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। আর সেই সঙ্গে নাটো সামরিক চুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিকারে আনার সুপরিকল্পিত চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

একই সঙ্গে বিপ্লবোত্তর চিনের সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধী প্রতিশ্রুতিও অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। মাও সে তুং-এর আন্তর্জাতিক রাজনীতির তত্ত্বে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দুর্জয় ঘাঁটি নির্মাণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদকে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করবার শপথ ছিল। আর সেই সঙ্গে ছিল চিনকে স্বয়ম্ভর সমাজতান্ত্রিক আর্থিক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার ভাবনা। কিন্তু মাও পরবর্তী চিনা নেতৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পুঁজি ও কারিগরি বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীলতার পথ বেছে নিয়ে যুগপৎ আর্থিক স্বয়ম্ভরতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং প্রকৃত সমাজতন্ত্রের পথ থেকে অন্তত আংশিক পশ্চাদপসরণ করেছে। সেই সঙ্গে ত্যাগ করেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্রান্তিকারি পরিবর্তনের সংকল্প। এমনকি সামরিক বাহিনী শাসিত পাকিস্তান ও মায়ানমারের সঙ্গে গড়ে তুলেছে নিবিড় সামরিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক। ভিয়েতনামের পরিণতিও পশ্চাদ্‌গতিরই নামান্তর।

সাম্রাজবাদ বিরোধী প্রধান সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির এহেন গ্লানির ফলে অনিবার্য ভাবেই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে। আর সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের ফলে মতাদর্শ হিসেবে ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে আপাতদৃষ্টিতে প্রায় অপ্রতিরোধ্য আন্তর্জাতিক মতাদর্শের রূপ নিতে চলেছে। এই ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান রূপ তথাকথিত বিশ্বায়ন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বায়নের উদ্যোগ এই প্রথম নয়। অতীতে ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদেব যুগে একবার এ ধরণের বিশ্বায়ন ঘটেছিল। কার্ল মার্কস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতন্ত্রের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ আবার নব বিশ্বায়নের রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। যার মূল লক্ষ্য আপাতদৃষ্টিতে পশ্চাদপসরণকারী সমাজতন্ত্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে সারা

পৃথিবীতে, বিশেষত তৃতীয় বিশ্ব ও রাশিয়া সহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে এমন এক ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, যা হবে সাম্রাজ্যবাদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। আর সেই সঙ্গে দেশে দেশে শাসকশ্রেণী রূপান্তরিত হবে সাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দি শ্রেণীতে।

ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কাছে বিশ্বায়নের প্রথম অর্থ এই যে পুঁজি, পণ্যদ্রব্য আমদানির উপরে সবরকমের শুল্ক সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা তুলে দিতে হবে। এটা কিন্তু শুধু পুঁজি, প্রযুক্তি এবং পণ্যদ্রব্যের ওপরেই প্রযোজ্য, শ্রমের ওপরে নয়। অথচ অর্থনীতির স্কুলের ছাত্ররাও জানেন যে উৎপাদনে পুঁজির যেমন ভূমিকা আছে, অন্তত সমান ভূমিকা আছে শ্রমশক্তির। কাজেই অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন করতে গেলে শ্রমশক্তিরও বিশ্বায়ন প্রয়োজন। যদি পুঁজি ও প্রযুক্তি যে কোন দেশে যেতে পারে, তবে শ্রমশক্তিরও যে কোন দেশে যাবার অধিকার থাকা উচিত, তবেই প্রকৃত বিশ্বায়ন হতে পারে। কিন্তু উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তো একজন তৃতীয় বিশ্বের শ্রমিককেও সেখানে ঢুকতে দেবে না। অর্থাৎ শুধু FDI (Foreign Direct Investment) র নামে তাদের পুঁজি এবং তাদের দ্বিতীয় স্তরের প্রযুক্তি, তাদের ম্যানেজমেন্ট যা পরিচালন ব্যবস্থা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ, এগুলো তৃতীয় বিশ্বে চলে আসবে। সেই হলো বিশ্বায়ন। আর আমরা সে গুলোকে স্বাগত জানাবো, আমাদের রাষ্ট্রীয় আর্থিক ক্ষেত্র তুলে দেবো, আর সমাজতন্ত্রের নাম উচ্চারণ করবো না, ধনতন্ত্রকে স্বাগত জানাবো। যে ধনতন্ত্র কোন স্বাধীন ধনতন্ত্র নয়, পরাধীন ধনতন্ত্র বা dependent capitalism ।

এক সময় উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি প্রচার করেছিলো এশিয়াতে কতগুলি অর্থনৈতিক টাইগার তৈরি হয়েছে, যেমন ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া। আপনারা জানেন এখন এই দেশগুলি আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। আগে শোনা যেতো এবং তৃতীয় বিশ্বের অনেক অর্থনীতিবিদও বলে এসেছেন, যে ব্রাজিল একটা মস্ত বড় বিশ্বায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের উদাহরণ, একটা তৃতীয় বিশ্বের দেশ কিভাবে প্রথম বিশ্বে এসে পৌঁছেছে। সেই ব্রাজিল আজ ধ্বংসের মুখে চলে যাচ্ছে। সেখানকার অর্থনীতি আজ যেন পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। তার থেকেও বেশি ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়েছে আর্জেন্টিনায়। ব্রাজিলের অবস্থাও খুব শিগগিরই আর্জেন্টিনার মতো হবে। এ সবই বিশ্বায়নের ফল। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়নি, যে কোন তৃতীয় বিশ্বের দেশ বিশ্বায়নের ফলে উন্নতি করেছে, বা নিজেদের স্বাধীন বিদেশনীতি গড়েছে বা স্বাধীন বৈদেশিক অর্থনীতি নির্মাণ করেছে, বা প্রথম বিশ্বের কোন দেশের সমান হয়েছে। অতএব বিশ্বায়ন হলো নয়া সাম্রাজ্যবাদের যে বিশ্লেষণ আমি আগে করেছি, তার একটা পরিচয়। প্রকৃতপক্ষেই G7ই পৃথিবীতে আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্তা। তারা World Bank, I.M.F., W.T.O. এ সবগুলিকে হাতিয়ার

হিসাবে ব্যবহার করে সমগ্র পৃথিবীর উপর বিশ্বায়নের নামে ধনতন্ত্রবাদ এবং নয়া সাম্রাজ্যবাদ চাপিয়ে দিতে সংঘবদ্ধ ভাবে সচেষ্ট হয়েছে।

অনেকে বলে থাকেন যে একথা সম্পূর্ণ সত্যি নয়, কারণ এখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর্থিক দিক দিয়ে বেশ শক্তিশালী, এবং আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের আর্থিক সংঘাত দেখা দিয়েছে। সুতরাং G7 সারা পৃথিবীতে নয়া সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারে সচেষ্ট, তা সত্যি নয়। কিন্তু এ বক্তব্য অতি সামান্য সত্যি। অর্ধসত্যেরও কম। কারণ পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ দেশ ও মানুষ যে তৃতীয় বিশ্বে বাস করে, সেখান আমেরিকার নেতৃত্বে এরা যৌথভাবে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। গ্লোবালাইজেশনের নামে সমগ্র পৃথিবীতে পরনির্ভরশীল ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা যৌথ কৌশল গ্রহণ করেছে। আর যতক্ষণ এই যৌথ শোষণ বলবৎ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই আপাত সংঘাতকে বলা যেতে পারে Secondary Contradiction বা মুখ্য দ্বন্দ্ব; Primary Contradiction বা গৌণদ্বন্দ্ব রয়েছে তাদের ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে। অতএব এই যুক্তিতে বলা যায় না যে ইতিহাসের অগ্রগতি হচ্ছে, ইতিহাসের পশ্চাৎগতি থেমে গেছে।

আমরা আজকে যে সন্ত্রাসবাদ এবং পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট নিয়ে শংকিত ও চিন্তিত, সে বিষয়েও এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। আমরা এখানেও ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ ও প্রকোপই দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিমী এশিয়ায় তেলভান্ডার ও অন্যান্য স্ট্র্যাটেজিক কারণে আমেরিকা সহ পাশ্চাত্য শক্তিগুলি চিরকাল চেষ্টা করেছে এখানে একটা ঘাঁটি রাখতে এবং সামরিকভাবে ঐ অঞ্চলে নিজ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে। একারণে যখন সুয়েজ ক্যানেলকে জাতীয়করণ করা হয়। তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্স যৌথভাবে ইজিপ্টকে আক্রমণ করেছিল। নিজেদের স্বার্থে পশ্চিমী শক্তিগুলি প্যালেস্টাইন ভূখন্ডের মধ্যে ইজরায়েলকে সৃষ্টি করেছে। সে ইতিহাসে যাবার আমার সময় নেই। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ইচ্ছাকৃতভাবে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ প্যালেস্টাইন অঞ্চলে ইজরায়েলকে সৃষ্টি করেছে। ইউরোপ থেকে পরিকল্পিত ভাবে ইহুদীদের নিয়ে এসে জোর করে আরব ভুখন্ডে ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠন করেছে। এর পরে ইজরায়েলকে আণবিক শক্তিতে পরিণত করেছে, আর সমগ্র আরব ভূখন্ডে ইজরায়েলকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে আগ্রাসন চালিয়ে যেতে মদত দিয়েছে। আজও ইজরায়েলকে একটি পাশ্চাত্য ফাঁড়ি হিসাবে তেল এবং অন্যান্য স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্য পরিপুষ্ট করে চলেছে। তেমনি তুরস্ক ও পাকিস্তানকে এবং সৌদি আরবকেও ফাঁড়ি হিসাবে গড়ে তোলা হয় তথাকথিত ঠান্ডা লড়াইয়ের সময়ে। কারণ এখানকার তেল সরবরাহ বন্ধ হলে জাপান ও পশ্চিম ইওরোপ ভেঙে পড়বে। যা পাশ্চাত্য

শক্তিরাও কখনও বরদাস্ত করবে না। একারণে এ অঞ্চলে তারা যেভাবে হোক নিজ আধিপত্য বজায় রাখবে। আগে একারণেই তারা ইরাক - ইরান যুদ্ধকে উৎসাহিত করছে, ইরাককে অস্ত্রশস্ত্র জুগিয়েছে, ইরাক তখন ব্যাপক মারণাস্ত্র তৈরি করেছে। অকাট্য প্রমাণ আছে, ইরাক, ইজরায়েল ও পাকিস্তানের আণবিক অস্ত্র নির্মাণ সম্বন্ধে আমেরিকা জেনেও কিছু বলেনি। বিশ্বস্ট্র্যাটেজির অন্তর্ভুক্ত ছিল এ দেশগুলি। আবার যখন নিজেদের স্বার্থ ফুরিয়ে গেছে, তখন এই ইরাককেই মারাত্মক ও ভয়াবহভাবে ধ্বংস করে ফেলেছে। এখন নিজেদের হাতে মারাত্মক অস্ত্রভান্ডার থাকা সত্ত্বেও তারা ইরাককে অস্ত্র নির্মাণে বাধা দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বা অন্তর্দেশীয় সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করা যায় না, কারণ তা কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেনা। সমাধান করতে পারে একমাত্র লোকশক্তির সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। আফগানিস্তানের উপর আক্রমণের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে ওসামা বিন লাদেনের পন্থা ভুল। কিন্তু তিনি আরবদের ঐতিহাসিক বিক্ষোভকে যেভাবে তুলে ধরেছেন তার অনেক যৌক্তিকতা আছে, এবং সে কারণেই আরব দুনিয়াতে তার ব্যাপক সমর্থন ছিল এবং আছে। ইজরায়েলের সহায়তা ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতায় আরবদের স্বার্থকে যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, তার সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। সন্ত্রাসবাদ একটা বেপরোয়া রাজনৈতিক প্রতিরোধ। অত্যাচার অবিচার অসহ্য হয়ে উঠলে সন্ত্রাস প্রতিকারহীন মানুষের বেপরোয়া প্রতিআক্রমণ হিসাবে গড়ে ওঠে। যদিও আমেরিকা বলে যে তারা গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক, তবুও বাস্তবে সৌদিআরব হলো পৃথিবীর নিকৃষ্টতম রাজতন্ত্র, কারণ সমস্ত সম্পদই রাজপরিবারের কিছু লোকের হাতে সীমাবদ্ধ। পশ্চিম এশিয়ার অনেক রাষ্ট্রই এ অবস্থায় আছে। এখানে জনগণের শিক্ষা নেই। রাষ্ট্র কোন আর্থ-সামাজিক সংস্কার করেনা। সেখানে মোল্লা-উলেমা শক্তি; সামন্তশক্তি, আমলাশক্তি, সক্রিয় ভাবে ধর্মীয় মৌলবাদকে ব্যবহার করে জনগণকে মোহাচ্ছন্ন করে বশে রাখে। ঐ অঞ্চলে মানবিক ওগণতান্ত্রিক অধিকার, শিক্ষা, সচেতনতা সবকিছুরই অভাব। এই অঞ্চলেই রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় গড়ে ওঠে সন্ত্রাসবাদ। একারণেই পশ্চিম এশিয়ায় ধর্মীয় মৌলবাদ ও তারদ্বারা সমর্থিত সন্ত্রাসবাদ দানা বেঁধে উটেছে। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নয়া সাম্রাজ্যবাদ ইতিহাসকে পেছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর তারই প্রকাশ দেখি পশ্চিম এশিয়া ও আফগানিস্তানে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত-পাক সম্পর্ক নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন, কারণ আফগানিস্তানের যুদ্ধের ফলে ভারত-পাক সম্পর্ক উত্তেজিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আরো আলোচনা চলতে থাকুক, শুধুমাত্র এ জাতীয় মন্তব্য হাস্যকর। আমাদের দেখতে হবে যে ভারত-পাক সংঘাতের কাঠামোগত উৎস কোথায়। একটা দেশের বিদেশনীতি

কেবল দু দেশের তর্কাতর্কি কি আক্রোশ বশত বা ভাববাদী বন্ধুত্ব বশত হয় না। পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরি হবার পর থেকে ক্রমশ সেখানে সামন্ততন্ত্র চিরস্থায়ী হয়ে গেছে। কোন ভূমিসংস্কার আজ পর্যন্ত হয় নি। যেটুকু অল্প শিল্পায়ন হয়েছে তা অল্প কয়েকটি বড় বড় বিজনেস হাউসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেখানে সৈন্যবাহিনী সবচেয়ে বড় শক্তি। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় জীবনের অধিকাংশই সৈন্যবাহিনী ক্ষমতায় আসীন ছিল। আর আছে মোল্লাতন্ত্র এবং মাদ্রাসা। একটা মাদ্রাসার নেটওয়ার্ক আছে, সেটাকে নিয়ন্ত্রিত করছে উলেমা, মোল্লা ইত্যাদির এবং তাদের সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে। এখন এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের একটা জাতীয় আত্মপরিচয় কিছু নেই এবং এই আত্মপরিচয় তারা খুঁজে পায়, আর জনসাধারণকে অশিক্ষা, অবিচারের অন্ধকারের মধ্যে মোহাচ্ছন্ন করে রাখার একটা হাতিয়ার পায় দুইভাবে প্রথমত - একটা চিরন্তন বাইরের শত্রু ভারতবর্ষকে দেখিয়ে, আর দ্বিতীয়ত ধর্মের জিগির তুলে।

পাকিস্তানের এই কাঠামোর যদি পরিবর্তন না হয়, সেখানে যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হয়, যদি সামন্ততন্ত্র বিলুপ্ত না হয়, যদি ভূমিসংস্কার না হয়, যদি গণজাগরণ না হয়, যদি গণশিক্ষার প্রসার না হয়, জনসাধারণের যদি ক্ষমতায়ন না হয়, তাহলে আশা করা যায়না যে শুধুমাত্র একজন বিদেশমন্ত্রী কি একজন প্রেসিডেন্টের জায়গায় আরেকজন এলে পাকিস্তানের বিদেশনীতির কোন বিশেষ পরিবর্তন হবে।

আমাদের দেশকেও আমি বাদ দিচ্ছিনা, আমাদের দেশেও অনেক কাঠামোগত পরিবর্তন অপরিহার্য। একসময় এক ধরণের ধর্মনিরপেক্ষতা হয়তো ছিল, যদিও আমার ধর্ম নিরপেক্ষতার সংজ্ঞা আলাদা। কারণ আমি মনে করিনা যে, সব ধর্মকে সমান ভাবে উৎসাহ দেওয়ার নাম ধর্মনিরপেক্ষতা। যদিও সেটাই ভারতীয় সংবিধানে এবং সরকারী নীতিতে প্রতিফলিত। ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির প্রকৃত অর্থ ধর্মহীনতা। Religious শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ হলো Secular, আপনারা যে কোন ইংরেজী অভিধান দেখবেন, Secular অর্থ হলে ধর্ম বিবর্জিত, ইহজাগতিক ইশ্বরের সঙ্গে পরলোকের সঙ্গে স্বর্গ নরকের সঙ্গে, আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। যাই হোক, এক ধরণের ধর্মনিরপেক্ষতা বা Secularism ছিল আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে তাও উঠে যাবার মুখে। পাকিস্থানে কিংবা পশ্চিম এশিয়ায় যে ধরণের ধর্মীয় মৌলবাদকে আমরা সমালোচনা করছি, অন্তত ততখানি - তার চেয়ে বেশি যদি নাও হয় — সে ধরণের ধর্মীয় মৌলবাদ, হিন্দু জাতীয়তাবাদ, ধর্মরাষ্টের আদর্শ এই দেশে খুব বলবান হয়ে উঠেছে। যারা এই মতবাদের ধারক ও বাহক তারা রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করেছে। কাজেই আমরাও বলতে পারিনা যে এখানে যদি গণতন্ত্রের আরো নবরূপায়ণ না হয়, এখানে যদি জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন না হয়, যদি সত্যিকারের Secularism বা ধর্মহীন রাষ্ট্র

তৈরি না হয় যদি ভূমিসংস্কার সারাদেশে না হয়, তথাপি আমরা একটি আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্র। কয়েকটি রাজ্য সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে জাত পাত, ধর্মান্ধতা, রামরাজ্য এইসমস্ত দানা বেধে উঠেছে অনেকটা এই কারণে যে, সেখানে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষার প্রসার হয়নি এবং গণচেতনার বিকাশ হয়নি। কাজেই এসব যদি আমাদের দেশে না হয়, দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটা ব্যাপক পরিবর্তন না হয়, তাহলে আমরাও জোর দিয়ে বলতে পারব যে আমরা শান্তিপূর্ণ বিদেশনীতি অনুধাবণ করি এবং পাকিস্তানের প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষভাব নেই। দুদিকেই অভ্যন্তরীণ কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

শেষ করবার আগে চিন সম্বন্ধে আরেকটু বলতে চাই। কারণ চিন একটা বিরাট দেশ পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশেরও বেশি মানুষ সেদেশে বাস করেন। এতবড় একটা দেশের একটা বিরাট ভূমিকা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রয়েছে। চিনে যখন কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হয় সেটা রুশ বিপ্লবের মতোই ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তনের দিশারী ছিল। এই চিন আগে ওয়াবলর্ডদের দ্বারা পরিচালিত হত। সেই চিনকে ইউরোপীয় ও আমেরিকান শক্তিরা পদদলিত করতে, যাকে সব সময় যেকোন মানুষকে সব সময় অপমান করত, সেই চিনই বিপ্লবের পরে মাথা তুলে দাড়িয়ে ছিল শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে। পৃথিবীতে একটা বিরাট পরিবর্তনকামী রাষ্ট্র হিসাবে এক সময় তার আন্তর্জাতিক বিপ্লবের পরিকল্পনা ছিল। যেকোন কারণেই হোক সেই পথ চিন সম্পূর্ণ বজায় রাখতে পারেনি — অভ্যন্তরীণ কারণে তথা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কারণে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও যে ধরণের বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে চিন যাত্রা শুরু করেছিল, সেখান থেকে অনেকখানি পিছিয়ে গেছে, মূলত এই কারণে যে আগের ব্যবস্থায় উৎপাদন বাড়ানো যাচ্ছিল না। উৎপাদন বাড়িয়ে সম্পদ সৃষ্টি করাকে তারা প্রাধান্য দিয়েছে। এই কারণে অনেকখানি সেই চরম সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে তারা সরে এসে পাশ্চাত্য দুনিয়ার পুঁজি এবং কারিগরী শক্তির সাহায্য নিচ্ছে এবং দেশের ভেতরেও অনেকখানি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে উৎসাহিত করে চলেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা বাধা প্রতিবন্ধের ফলে তাদের ফলে তাদের সেই বৈপ্লবিক ভূমিকা আর নেই। ফলস্বরূপ আমরা নয়া সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে একটা আঘাত হানবার জন্য, তার পরিবর্তনের জন্য চিনের কাছে যে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ আশা করেছিলাম, সেটা দেখতে পাচ্ছিনা। কিন্তু তথাপি চিন একটা প্রতিশ্রুতিমান শক্তি ভবিষ্যতে যে চিন এবং ভারত যুগ্ম ভাবে উদ্যোগী হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং বিশ্ব ইতিহাসে একটা ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি বিশ্বাস করি যে একদিন এই সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠবে।

পরিশেষে আমি জিজ্ঞেস করব, ইতিহাসের যে পশ্চাদ্‌গতি অল্প কয়েকটি নজিরের মাধ্যমে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছি, সেটা কি অপ্রতিরোধ্য? আমরা কি ইতিহাসের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি? এখানে সবাই ইতিহাস বিজ্ঞানী। আপনারা জানেন যে একজন জাপানী আমেরিকান কয়েকবছর আগে এই তত্ত্ব প্রচার করেছেন, যে ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে। ইতিহাস শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পরে। তার মতে পাশ্চাত্য ধনতন্ত্র এবং গণতন্ত্রই সমগ্র পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। এই পাশ্চাত্য ধনতন্ত্র এবং গণতন্ত্রই এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। এটাই ইতিহাসের শেষ।

ইতিহাস বিজ্ঞানীরা জানেন যে, ইতিহাসের কখনো শেষ হতে পারেনা। মানুষের বিবর্তন গতিশীল, ইতিহাস থেমে নেই, কখনও থেমে থাকতে পারেনা। ইতিহাস নিজে নিজে পরিবর্তিত হয়না, মানুষ তাকে পরিবর্তন করে। মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ইতিহাসকে আবারো পরিবর্তিত করবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের এই প্রবাহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। অবশ্যই এই নয়া সাম্রাজ্যবাদ, আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে ইতিহাসের যে পশ্চাদ্‌গতি আমরা লক্ষ্য করছি, তাকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করবার প্রয়োজন আছে। ঐতিহাসিকের ভূমিকা সম্পর্কে আমি মনে করি, যে আমরা শুধুমাত্র ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা নই। ইতিহাসের এবং পৃথিবীকে পরিবর্তন করবার দিগ্‌দর্শনের দায়িত্বও আমাদের আছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন ভেঙে গেল? সমাজতন্ত্রের কি কারণে এ বিপর্যয় হলো? আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে যে সাম্রাজবাদের প্রত্যাবর্তন দেখা যাচ্ছে, তাকে কি করে বিপরীতমুখী করা যায়, কিভাবে সারা পৃথিবীর জনগণকে ক্ষমতায়িত করা যায়, কোন ধরণের গণতন্ত্র সারা পৃথিবীর মানুষের পক্ষে ভবিষ্যতের দিশারী এবং পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ ও রাষ্ট্র যে তৃতীয় বিশ্বে অবস্থিত, সেই তৃতীয় বিশ্বের ক্ষমতায়ন এবং সমগ্র বিশ্বের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তা নিয়ে ইতিহাস বিজ্ঞানীদের চিন্তা ও গবেষণা করা প্রয়োজন। তাই মনে করি এই যে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর রাজনৈতিক কাঠামোগত এবং আদর্শগত পরিবর্তনের প্রয়োজন আমরা উপলব্ধি করবো এবং উপস্থিত বিশিষ্ট ইতিহাস বিজ্ঞানীরা তাদের ভবিষ্যৎ গবেষণায় এই দিকে মনোনিবেশ করবেন। অন্তত একজন ভারতীয় হিসাবে আমাদের মনে হয় যে এই হবে আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব এবং আমাদের মানবতা ও সংবেদনশীলতার পরিচয়।

ভারতীয় ঐতিহ্য বনাম আর্য চাতুর্য

কল্যাণী মন্ডল

বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলির একটির উৎপত্তি ঘটেছিল এই ভারতে। এখানেই গড়ে উঠেছিল অত্যন্ত উঁচুস্তরের এক সংস্কৃতি যা পরবর্তীকালে সমগ্রভাবে গোটা প্রাচ্যের, মধ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এবং দূরপ্রাচ্যের বহু জাতির সংস্কৃতির অগ্রগতিতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, মানব সমাজের একেবারে আদিতম কাল থেকেই ভারতে জনবসতি বর্তমান ছিল। এ দেশের বহু অঞ্চল থেকেই প্রত্মপ্রস্তর যুগের নিম্নতর ভূ-স্তরের আমলে তৈরি পাথরের হাতিয়ার ইত্যাদি পাওয়া গেছে। পরস্পর নিরপেক্ষভাবে নিম্নতর প্রত্নপ্রস্তর যুগে সংস্কৃতির দুটি কেন্দ্র উদ্ভূত হয়েছিল — (১) উত্তরে শোন নদী তীরবর্তী সংস্কৃতি (বর্তমানে পাকিস্তানের শোন নদীর তীর বরাবর) এবং (২) দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের সংস্কৃতি, যাকে মাদ্রাজি সংস্কৃতি বলা হয়।

ভারতে মধ্যপ্রস্তর যুগের সবচেয়ে পরিচিত নিদর্শনক্ষেত্র হল গুজরাটের লাঙ্খনাজ বসতি। এই বসতিতে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা দ্রব্যসামগ্রী থেকে জানা গেছে মধ্যপ্রস্তর এবং নবপ্রস্তর যুগের প্রাথমিক পর্যায়ের আদিকালের মানুষের জীবনযাপন কেমন ছিল। প্রত্মতত্ত্ববিদেরা লাঙ্খনাজের ইতিহাসে দুটি স্বতন্ত্র পর্যায় চিহ্নিত করেছেন — এর প্রথম পর্যায়ের শেষদিকে হাতে গড়া মাটির বাসনের উদ্ভব ঘটে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তৈরি হয় কুমোরের চাকে-গড়া ও অলঙ্করণ করা তৈজস পত্র। প্রথম পর্যায়ে পশুশিকার ও মাছধরা ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকা আর দ্বিতীয় পর্যায়ে কৃষিকাজ ক্রমশ জীবিকা হয়ে উঠতে থাকে।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও, যেমন দাক্ষ্যিণাত্যে ও পূর্বভারতে মধ্যপ্রস্তর যুগের বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। মধ্যপ্রস্তর যুগথেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল অসমান গতিতে। খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রাব্দের সূচনায় দক্ষিণ ভারতের মধ্যপ্রস্তর যুগীয় বসতিগুলির অধিবাসীরা যখন নিয়োজিত ছিল পশু শিকারে ও মাছ ধরায়; তখনই উত্তরে সিন্ধুদেশে স্থায়ী কৃষিভিত্তিক বসতিগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল দ্রুতগতিতে।

নবপ্রস্তর যুগে কৃষিকাজ ও পশুপালন আরও উন্নত হয়ে ওঠে এবং মানুষ ক্রমশ যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বসবাসের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। এই ধরণের সব চেয়ে উন্নত নবপ্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতির প্রমাণ মেলে বেলুচিস্তানে ও সিন্ধুদেশে।

মনে হয়, এগুলি সিন্ধু উপত্যকার নগর সভ্যতারই ইঙ্গিত দিচ্ছিল। এই অঞ্চলের বসবাসকারীরা খ্রিঃপূঃ চতুর্থ সহস্রাব্দের গোড়ার দিকেই ঘর বানাত রোদে পোড়া ইঁট দিয়ে, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি জীবজন্তুকেও তারা পোষ মানিয়েছিল। ধাতুর ব্যবহার অবশ্য তখনও অজ্ঞাত ছিল। অধিবাসীরা হাতিয়ার বানাত প্রধানত পাথর দিয়ে, তবে তার সঙ্গে মিশেল দিত দামী জ্যাস্‌পার ও কালসেজনি মনির টুকরো আর চক্‌মকি পাথর। পরবর্তী যুগে এখানে মৃৎপাত্রের উদ্ভব ঘটে এবং শেষে ধাতুর ব্যবহারেরও প্রথম লক্ষণ দেখা যায়।

ভারতের উত্তরাঞ্চলে কাশ্মীরের শ্রীনগরের কাছে বুর্জাহোম বসতিতে আদিম ধরণের কিছুকিছু নবপ্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। ভারতের দক্ষিণাংশে সবচেয়ে সুপরিচিত নবপ্রস্তর যুগীয় বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে সাঙ্গনাকাল্লু ও পিক্‌লিহালে। পূর্বভারতের নবপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতিগুলির মধ্যে দুটি সুনির্দিষ্ট আঞ্চলিক ধারা স্পষ্ট— একটি বিহার-উড়িষ্যার অপরটি আসামের ধারা। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণভারতে যখন এই নবপ্রস্তর ও প্রাথমিক তাম্রপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতিগুলি বিকশিত হয়ে উঠছিল তখনই সিন্ধু উপত্যকায় বিরাজমান ছিল ব্রোঞ্জযুগের এক উন্নত নগর সভ্যতা।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার আবিষ্কার ও তা নিয়ে গবেষণার ফলে এখন ভারতীয় সভ্যতার সুপ্রাচীনত্ব সম্পর্কে নিসন্দেহ হওয়া গেছে। ১৮৭৫ খ্রিঃ ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ আলেকজান্ডার কানিংহাম হরপ্পায় অপরিচিত লিপি খোদাই করা একখানি পঞ্জা আবিষ্কার করেন। সে সময় দুই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ডি .আর. সাহানি এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় খননকার্য চালিয়ে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোয় দুটি প্রাচীন নগর আবিষ্কার করেন।

সিন্ধুনদের উপত্যকায় হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর এই বসতিগুলি রাতারাতি আবির্ভূত হয়নি, সবকয়টি বসতিও একসঙ্গে আবির্ভূত হয়নি। স্পষ্টতই একটি বিশেষ কেন্দ্রে নগর সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। তারপর সেখান থেকেই লোকজন ক্রমশ বাইরে ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য বসতি গড়ে তোলে। এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সিন্ধুনদের উপত্যকার কৃষিভিত্তিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করেই, যদিও ব্রোঞ্জযুগের এক অভিনব নগর সভ্যতা ছিল — এ।

প্রত্নতাত্বিক গবেষণার ফলে জানাগেছে যে, হরপ্পা সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল বিশাল এক ভুখন্ড জুড়ে, উত্তর ও দক্ষিণে যার বিস্তার ছিল ১.১০০ কি.মি-র বেশি ও পূর্ব-পশ্চিমে ১.৬০০ কি.মি.র বেশি। কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপে খনন কার্য-চালানোর ফলে জানাগেছে যে, সিন্ধু উপত্যকা থেকে জনগোষ্ঠীর একেকটি দল ক্রমশ দাক্ষিণে চলে গিয়ে নতুন-নতুন এলাকায় জন বসতি গড়ে তুলেছিল। বর্তমানে হরপ্পাযুগের সবচেয়ে দক্ষিণের যে সমস্ত বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি পাওয়া গেছে নর্মদানদীর মোহনার

কাছে। তারা দেশের পূর্বাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল, যাত্রাপথে নতুন-নতুন ভূ-খন্ড 'অধিকার' করতে করতে। এর ফলে হরপ্পা সংস্কৃতির কিছুকিছু রকমফের গজিয়ে উঠেছিল এখানে-ওখানে। যদিও, মোটের উপর এগুলি সবই ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী একটিই অখন্ড সংস্কৃতির নিদর্শন।

সিন্ধু উপত্যকায় বড়বড় শহর এবং নগর পরিকল্পনা ও নগর স্থাপত্যের সযত্ন ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাদির অস্তিত্ব প্রমাণ দেয় যে, হরপ্পা সভ্যতা একদা উন্নতির এক উচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল। এই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত যে শহরগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে বৃহত্তম হল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো।

মহেঞ্জোদারো শহরটি আনুমানিক আড়াই বর্গ কি.মি স্থান জুড়ে ছিল আর জনসংখ্যা ছিল ৩৫ হাজারের মত বলে অনুমান করা হয়, কোন কোন গবেষকের মতে জনসংখ্যা ছিল এক লক্ষের মত। কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বলা হয় হরপ্পা যুগের সংস্কৃতির প্রাথমিক স্তরগুলি খ্রিঃপূঃ বাইশ শতকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং সেই সংস্কৃতির শেষ স্তরটি বর্তমান ছিল খ্রিঃপূঃ আঠের শতক জুড়ে, মহেঞ্জোদারোর খননক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদি থেকেও একই ধরণের সনতারিখের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

তামা ও ব্রোঞ্জই ছিল তখন প্রধান ধাতু যা দিয়ে যন্ত্রপাতি তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা হত। ধাতু গলিয়ে আকরিক থেকে পৃথক করা, ধাতুকে ছাঁচে ঢালাই করা এবং আগুনে পুড়িয়ে ও পিটিয়ে ঢালাই করার কৃৎকৌশল তখনই প্রয়োগ করা হচ্ছিল। পাথর কেটে দৈনন্দিনের ব্যবহার্য নানাবিধ জিনিসপত্র ও অলঙ্কারাদি বানানো হত। এই সভ্যতার অভিজাত সম্প্রদায়গণ দামী অলঙ্কার — রূপার ও সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করতেন তারা, প্রলেপ দেওয়া জেল্লা ধরানো মৃৎপাত্রও তারা ব্যবহার করতেন।

নগর নির্মাণের ক্ষেত্রে বিকাশের উন্নত স্তরে পৌঁছেছিল এই সভ্যতা, যদিও সিন্ধু উপত্যকার জনসংখ্যার অধিকাংশই বাস করত গ্রামের বসতিগুলিতে এবং ব্যাপৃত থাকত পশুপালন ও চাষ আবাদে।

এই সভ্যতার আবিষ্কৃত সমস্ত শহরে অবস্থিত নগর দুর্গগুলিতে খুব সম্ভব নগর শাসকের দপ্তর ও তাঁর প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। অনুমান করা হয় শহরগুলির প্রধান শাসনকেন্দ্রগুলিও অবস্থিত ছিল এই নগরদুর্গে এবং এইসব কেন্দ্র থেকেই শহরগুলির জল সরবরাহ ও আবর্জনা নিষ্কাশনের জটিল ব্যবস্থাগুলি নিয়ন্ত্রিত হত। আবার পৌরশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলিই গণখাদ্য গোলাসমূহের ভারপ্রাপ্ত ছিল। প্রতিটি শহরে একটি করে বিশেষ নগর পরিষদের অস্তিত্ব ছিল। এই পরিষদের সদস্যরা এক ধরণের সম্মেলন মন্ডপে মিলিত হতেন।

হরপ্পা সভ্যতার বর্ণলিপির পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি। তবে এই লিপির অস্তিত্বই প্রমাণ দেয় এই সভ্যতা কত উন্নতস্তরের ছিল। এ পর্যন্ত খোদাই করা লিপিসহ এক

হাজারেরও বেশি পঞ্জা আবিষ্কৃত হয়েছে আর এছাড়াও পাওয়া গেছে মৃৎপাত্র ও ধাতুর তৈরি জিনিস পত্রের উপর খোদাই করা বেশকিছু লিপি।

এই উন্নত সভ্যতার পতন ঘটেছিল ভারতে ইন্দোআর্যদের অনুপ্রবেশের কয়েক শতাব্দী আগেই।

'আর্য' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে 'অরি' শব্দ থেকে। বৈদিকযুগে 'অরি' অর্থে বোঝাত 'পরদেশী' কিংবা 'বিদেশী' আর 'আর্য' অর্থে নবাগত বা নবাগতের প্রতি পক্ষপাতী। পরবর্তীকালে অবশ্য আর্য শব্দের অর্থ দাঁড়িয়ে যায় 'মহৎ বংশোদ্ভূত ব্যক্তি'।

'আর্য' নামক এই 'বিদেশী' বা 'নবাগত' দের যাযাবর বৃত্তি ব্যতীত সেই অর্থে কোন নিজস্ব সভ্যতা বা সংস্কৃতি ছিল না। আর্যগণ ছিল মূলত পশুপালনকারী যারা ভারতে আগমনের পর স্থিতিশীল জনগণের শিক্ষা এবং কারিগরী দক্ষতা গ্রহণ করেছিল।

এমন একটা ধারণা চারিয়ে গেছে, যে, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য মানেই আর্যকৃত ঐতিহ্য, ভারতীয় সংস্কৃতি মানেই আর্যদের দ্বারা সৃষ্ট সংস্কৃতি। অথচ ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে জানা গেছে, যে, আর্য উপজাতির আগমনের কয়েক শতাব্দী আগেই হরপ্পা মহেঞ্জোদারো ও নর্মদা উপত্যকায় উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। তাদের হাতিয়ার, গৃহনির্মাণ প্রণালী, নগর পরিকল্পনা ও নগর বিন্যাস, বয়নশিল্প, অঙ্কন, লিপি, ভাস্কর্য প্রত্যেকটিই ছিল উন্নত পর্যায়ের। প্রাক্ আর্যযুগের এই সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। যাযাবর আর্য উপজাতি এই সভ্যতা থেকে বহু বিষয়ে শিক্ষা নিয়েছিল, তবুও আর্যরা নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে তুলতে পারেনি। যাযাবর আর্য উপজাতির সেই অর্থে নিজস্ব কোন সভ্যতা ছিলনা যা দিয়ে ভারতীয় সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। প্রাক্ আর্যযুগের উন্নত সভ্যতা এবং লোকায়ত সংস্কৃতি ও জীবনবোধই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। যাযাবর অনুপ্রবেশকারী আর্যদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি না থাকলেও চাতুর্য ছিল ষোল আনা। এই চাতুর্য দিয়েই তারা ভারতের উন্নত সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। বর্ণবিভাজনের যে বীজ প্রাক্-আর্য ভারতীয় সমাজে সুপ্ত অবস্থায় ছিল, তাকে লালন করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়ে অঙ্কুরিত অবস্থা থেকে ভারতীয় সমাজে মহীরুহরূপে প্রোথিত করতে পেরেছিল। বর্ণভেদের সাহায্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায়কে নিয়ে ব্রাহ্মণ বর্ণ, যোদ্ধ সম্প্রদায়কে নিয়ে ক্ষত্রিয় বর্ণ, ব্যবসায়ী-কারিগর ইত্যাদিদের নিয়ে বৈশ্যবর্ণ এবং বাকিদের নিয়ে শূদ্রবর্ণ — এই চতুবর্ণে তারা সামাজিক বিন্যাস করেছিল। এর মধ্যে শূদ্ররাই ছিল সামাজিক বিন্যাসের সর্বনিম্নস্তরে। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের 'পুরুষ সূক্ত' তে বলা হয়েছে, এই চতুর্বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে 'পুরুষ' থেকে। 'পুরুষ' এর মুখগহ্বর থেকে উৎপন্ন হয়েছে ব্রাহ্মণেরা, ক্ষত্রিয়রা বাহুদ্বয় থেকে, উরুদ্বয়

থেকে বৈশ্যরা এবং পদদ্বয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে শূদ্ররা। বৈদিক সাহিত্যে এই পুরুষকেই 'ব্রহ্মা' বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ও তাদের সামাজিক পদে দেবভাব আরোপের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল সেই আদিকাল থেকেই। তাই দেখা যায় প্রায় সব বৈদিক সাহিত্যে অপর তিনবর্ণের নাম উল্লেখের আগে ব্রাহ্মণের নাম উল্লেখিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পূজা-অর্চনা, যাগ-যজ্ঞ, পৌরহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র পাঠে তাদের একক অধিকার ও আধিপত্যকে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষণ করেছিল। এই ধরণের বর্ণভেদের সাহায্যেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে তাদের জাতিগত বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ ও স্থানীয় অধিবাসীদের শূদ্রবর্ণের স্তরে অধঃপতিত করে রেখে বংশানুক্রমিকভাবে ক্রীতদাসে পরিণত করে রাখার সুবন্দোবস্ত করেছিল আর্যরা। ক্রমশ বর্ণগুলির মধ্যে আবার বিশেষকরে শূদ্রবর্ণের মধ্যে পেশাভিত্তিক আরও ছোট ছোট বিভাগ করে তাদের মধ্যে অনৈক্যের ক্ষেত্রগুলিকে প্রশস্ত করে রেখে তাদের কাছ থেকে চিরকালীনভাবে সেবাগ্রহণ, শাসন ও শোষণ করার সু-ব্যবস্থাটিও করে রেখেছিল আর্যরা।

তাদের উত্তরসূরী আজকের বর্ণহিন্দুরা সেই একই পন্থায় ভারতবর্ষের দলিতদের মধ্যে ধর্মীয় সন্ত্রাস ও বিভাজন সৃষ্টি করে একটি অনৈক্যের প্রাচীর তুলে সেটিকে চিরকালীনভাবে সুরক্ষিত করতে চায়। কারণ সেই একই সেবাগ্রহণ, শাসন ও শোষণ। ভারতবর্ষে দলিতরাই সংখ্যাগুরু (৮৫ %)। সংখ্যালঘু বর্ণহিন্দুরা বিভিন্ন রকম প্ররোচনায় তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে সদা তৎপর। দলিতদের মধ্যে যত বিচ্ছিন্নতা আসবে। বর্ণহিন্দুদের সিংহাসনটি ততই পাকা হবে।

প্রাচীন আর্যদের বর্তমান উত্তরসূরীরা দেশজুড়ে একটা উগ্রহিন্দুজাতীয়তাবাদের সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। তারা ভারতীয় সভ্যতা ও আর্যসংস্কৃতিকে (?) গুলিয়ে ফেলে। আর্যদের এদেশে আগমনের বহুপূর্বে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যে ধর্মীয় চেতনা বিকশিত হয়েছিল চতুর আর্যরা সেই ধর্মীয় চেতনায় নিজেদের পরিকল্পিত বহু ঈশ্বরবাদের 'মিশেল' দিয়ে সেই ঈশ্বরদের প্রতিভূ পুরোহিত তথা ব্রাহ্মণরূপে সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। তখন থেকেই তারা ভারতীয় সভ্যতার 'ঠিকা' নিয়ে বসেছে। ব্যাধ, কিরাত, নিষাধরাই ভারতের আদি বাসিন্দা। এই ভূমি পুত্রদের সঙ্গে বহিরাগত আর্যসমেত শক, হুন, পাঠান, তুর্কি, পারসিক প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে আজকের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

অপরের ভূমি দখল করে বসতিস্থাপন করা, অন্যের ধর্মস্থান ধ্বংস করা অথবা দখল করে নিজেদের দেবদেবীর মূর্তিস্থাপন করা আর্যদের নিজস্ব সংস্কৃতি। আর প্রথম থেকেই তারা তা করে আসছে। বহু বৌদ্ধ বিহার তারা ধ্বংস করেছে, কোথাও বা নিজেদের দেবদেবীর মূর্তি স্থাপন করেছে। বহু বৌদ্ধ ও শাক্তকে তারা দেশছাড়া করেছে।

যুগের পর যুগ তারা ধর্মীয় সন্ত্রাস চালিয়ে আসছে।

বহিরাগত আর্যদের এদেশে আগমনের বহু শতাব্দী আগেই এদেশের ভূমিপুত্রদের দ্বারা হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো এবং নর্মদা উপত্যকায় যে উন্নত এবং সুবিশাল সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটেছিল তার ঐতিহ্য ও প্রবহমানতাকে অস্বীকার করে আর্যরাই এদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির সৃষ্টিকর্তা এবং ধারক-বাহক এমন অনৈতিহাসিক মতবাদ তৈরি করা এবং বলপূর্বক সেই মতবাদকে গলাধঃকরণ করানোর প্রচেষ্টার মধ্যে পরিকল্পিত চাতুর্যই আছে, ঐতিহাসিক সত্যতা নেই।

সূত্র -নির্দেশ ঃ—

১। Ancient History - F. Korovkin .

২। ভারতবর্ষের ইতিহাস - গ্রি. বোনগার্দ - লেভিন।

৩। গৌতম রায় (আনন্দবাজার পত্রিকা) ।

৪। আলোকতাপ পত্রিকা।

৫। আর্যদের ভারতে আগমন - রামশরণ শর্মা ।

বৈদিক ভারতে বর্ণাশ্রম

চিরকিশোর ভাদুড়ী

ঋগবেদের পুরুষ সূক্তে সর্ব প্রথম মানব জাতির চতুর্বর্ণে বিভক্ত হওয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। উদ্ধৃতিটি এই রকম ঃ—

ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীদ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ ।[১]
উরু তদস্য যদ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাম্ শূদ্রো তাজায়ত ।।

[তাঁর মুখমন্ডল পরিবর্তিত হল ব্রাহ্মণে। তাঁর বাহুযুগল থেকে সৃষ্টি হল ক্ষত্রিয়। তাঁর উরু দুটি রূপান্তরিত হল বৈশ্যে, তাঁর পদযুগল থেকে শূদ্র উৎপন্ন হল।।]

দুর্ভাগ্যবশত মানব জাতির চতুর্বর্ণে বিভক্ত হওয়ার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত নন। *The Vedic Indu*[২] এর মাননীয় সম্পাদক মন্ডলী এই ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। জিমার মনে করেন, অন্তিম বৈদিক যুগে (Later Vidic age) বৈদিক আর্যদের মধ্যে বর্ণাশ্রম প্রথা উদ্ভুত হয়েছিল। তাঁর মতে আর্যরা বৈদিক যুগে যখন সিন্ধু এবং পাঞ্জাব অঞ্চলে বসবাস করছিলেন, তখন বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু যখন তাঁরা ক্রমে ক্রমে আরও পূর্বদিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন, তখনই তাঁদের মধ্যে বর্ণাশ্রম প্রথা আকার লাভ করল। তিনি এবং মুর,[৩] এই ব্যাপারে একমত যে, ব্রাহ্মণ (কবি দার্শনিক এবং পুরোহিত) ঋগবেদে কদাচিৎ উল্লিখিত। ক্ষত্রিয় খুব কমই উল্লেখের মধ্যে আসে। রাজন্য (রাজা এবং যোদ্ধা) বৈশ্য (কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী পণ্যপালক) এবং শূদ্র (সেবক সম্প্রদায়) শুধুমাত্র পুরুষ সূক্তেই উল্লেখিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ব্রাহ্মণ শব্দটি প্রথমে বুঝিয়েছে কবি এবং তারপরে ঋষি এবং তার ওপরে কার্যনির্বাহী পুরোহিতকে কিংবা বিশেষ এক শ্রেণীর পুরোহিতকে। কখনও কখনও এই ব্রাহ্মণ শব্দটি বৃত্তিগত ভাবে পুরোহিতকেই বুঝিয়েছে। তাঁর ধারণায় ব্রাহ্মণ তার মেধা অথবা অসামান্য প্রতিভাবলে দৈব সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয়েছে। (এই ব্যাপারে অবশ্য মুর সম্পূর্ণ আলাদা মতামত পোষণ করেন) তিনি আরও মনে করেন ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম প্রথা ঋগবেদের প্রাথমিক পারিকাঠামোগত যুগ থেকে যজুর্বেদীয় যুগের সুসংবদ্ধ অবস্থায় পৌঁছানোর সময় পর্যন্ত ভারতীয় আর্যরা ক্রমশ পূর্বদিকেই এগিয়ে গিয়েছেন।

জিমার[৪] এবং তাঁর অনুগামীদের মতামত অবশ্য হগ, লুডভিগ, কার্ণ, গোল্ডনার, অল্ডেনবার্গ প্রমুখ পণ্ডিতেরা অস্বীকার করে এসেছেন।

এইবারে বৈদিক যুগের শেষের দিকে ভারতীয় আর্যদের মধ্যে বর্ণাশ্রম গড়ে উঠেছিল বলে জিমার এবং তাঁর অনুগামীদের মতামত খন্ডন করবার চেষ্টা করব। তাঁদের মতামত

যথেষ্ট যুক্তিনির্ভর নয়। যদি বর্ণাশ্রম আদি বৈদিক যুগে প্রচলিত না থেকে থাকে, তাহলে ঋগবেদে (যে বেদকে সকল বিশেষজ্ঞই আদিমতম বলে মেনে নিয়েছেন) আমরা তার উল্লেখ কেন দেখতে পেলাম। তাছাড়া, শুধুমাত্র পুরুষ সূক্তেই নয়, ঋগবেদের অন্যান্য অধ্যায়ে ও চারিবর্ণের আলাদা আলাদা ভাবে উল্লেখ আছে।

বৈদিক যুগের গোড়াতে বর্ণাশ্রম যে প্রচলিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে প্রথমেই বলব যে ব্রাহ্মণ[৫] শব্দটি (যে শব্দ ব্রাহ্মণ অথবা পুরোহিত[৬] শব্দের সমার্থক) ঋগবেদের প্রথম দিকের কিংবা শেষের দিকের অধ্যায়গুলিতেও দেখতে পাওয়া যায়। উপরিউক্ত পণ্ডিতদের মতে, যদিও ব্রাহ্মণ শব্দটি কখনও কখনও গায়ককে চিহ্নিত করেছে, কিন্তু, আবার কখনও কখনও ঐ শব্দটি একজন পুরোহিতদেরও সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ইঙ্গিত ঋগবেদের[৭] বিভিন্ন অধ্যায় থেকে পাওয়া গিয়েছে। আসলে এই ব্রাহ্মণ শব্দটি পুরোহিত[৮] পদাধিকারীর প্রতিই অঙ্গুলিনির্দেশ করেছে। প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্মের সম্পাদনা করতেন এবং তাঁরা পুরোহিত পদের অধিকারী ছিলেন আর ব্রাহ্মণের সন্তানই রাজা কর্তৃক পুরোহিত পদে নির্বাচিত হতেন। অর্থাৎ কিনা ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিত শব্দটি পুরুষ সূক্ত ছাড়া ও ঋগবেদের বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লিখিত হওয়ার অর্থ একমাত্র এই যে পুরোহিত পদটি ব্রাহ্মণদের জন্যে আদি বৈদিক যুগ থেকেই বংশানুক্রমিক হয়ে গিয়েছিল। এই সম্বন্ধে মূর খুব[৯] জোরালো ভাবেই তাঁর ইতিবাচক বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। বি.এম. আপ্তের[১০] অভিমতও আমাদের উপরের মতামতকে পুরোপুরি সমর্থন করে।

ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর তিন বর্ণ ও (রাজন্য, বৈশ্য এবং শূদ্র) শুধুমাত্র পুরুষ সূক্তেই উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য ঐ তিন বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয়[১১] বর্ণ, ক্ষত্র অথবা ক্ষত্রম্ নামে ঋগবেদের প্রথম দিকের অধ্যায়গুলিতে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। অধিকন্তু ঐ ক্ষত্র এবং ক্ষত্রম্ শব্দ দ্বারা ক্ষত্রিয় বর্ণের অথবা যোদ্ধা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বর্ণকেই প্রকৃত অর্থে বোঝান হয়েছে। তাছাড়া যদি রাজন্য শব্দটির বিশ্লেষণ করতে চাওয়া হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি ঋগবেদের আগের বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লিখিত রাজন[১২] শব্দ রাজন্যর সমার্থক এবং বিকল্প এবং আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি এই রাজন শব্দই বিকল্পে রাজন্য শব্দ হিসেবে পুরুষ সূক্তে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকন্তু এই দুটি শব্দই রাজা এবং সংগ্রামী শ্রেণীকে বোঝানোর জন্যেই ব্যবহার কার হয়েছে।

অনুরূপ ভাবে বৈশ্য শুধুমাত্র পুরুষ সূক্তে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ঋগবেদের বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা বিশ[১৩] এবং বিশঃ[১৪] শব্দ দুটির উল্লেখ দেখতে পাই। ঐ দুটি শব্দই সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করে থাকেন। বিশেষজ্ঞরা আরও অভিমত প্রকাশ করেছেন, বিশ এবং বিশঃ- ঋগবেদের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে উল্লিখিত এই যুগল শব্দ সেই সব সাধারণ মানুষের বিকল্প

হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যারা পশুপালন, কৃষিকার্য ইত্যাদিকে (অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণর পেশাগত বৃত্তি) পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। বি.এম.আপ্তের[১৫] মতে বিশঃ শব্দটি সাধারণ মানুষদের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশঃ শব্দেরই অপর বিকল্প পুরুষ সূক্তের - বৈশ্য। ঐ সাধারণ জনতা পশুপালন এবং কৃষিকার্যকে ইতিমধ্যেই পেশাহিসেবে গ্রহণ করেছে। পুরুষ সূক্ত ছাড়া শূদ্র শব্দটির উল্লেখ ঋগবেদের আগের দিকের কিংবা পরের দিকের কোন অধ্যায়েই দেখতে পাওয়া যায় না। বি.এম.আপ্তের[১৬] এই প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ব্রাহ্মণ্য সমাজে শূদ্রদের ততটা উল্লেখ্য বিবেচনা করা হতনা। সেই কারণেই তারা ঋগবেদে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়নি। বি.এম.আপ্তে[১৭] আরও মনে করেন যে ঋগবেদের ১.১১৩.৬ নং অধ্যায়টি বৈদিক আর্যদের চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজের প্রতিটি বর্ণকে আলাদা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করেছে। অধিকন্তু, তাঁর[১৮] মতে ঋগবেদের ১০.৩৪.১১নং অধ্যায়টিতে চতুর্থবর্ণকে নির্দিষ্ট করে দেখান হয়েছে। এ ছাড়া *The Vedic Index* [১৯] এর মাননীয় সম্পাদকমন্ডলীর ধারণায় শূদ্ররা বন্য পার্বত্য উপজাতির ও প্রতিনিধিত্ব করত যারা মৎস্য এবং পশু শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত।

ব্রাহ্মণ্য সমাজের ত্রি-বর্ণর অথবা চতুর্বর্ণের অস্তিত্ব ঋগবেদের কয়েকটি অধ্যায়ে সুনির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। আমরা প্রথমে তিনটি বর্ণের অস্তিত্ব চিহ্নিত করা হয়েছে যে অধ্যায়ে সেই ৮.৩৫.১৬-১৮ নং অধ্যায়টি সম্বন্ধে বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করব। ঋগবেদের ঐ অধ্যায়টি নিচে উধৃত করা হল ঃ—

৮.৩৫ ১৬-১৮ অধ্যায় ঃ—

ব্রহ্ম জিন্বত মুত জিন্বতম্ ধিয়ো হতম্ রক্ষাম্সি সেধতমমীবাঃ।

সজোষসা উষসা সূর্যেনা চ সোমম্ সুন্বতো অশ্বিনা।।

ক্ষত্রম্ জিন্বতমুত জিন্বতম্ নৃন্‌হতম্ রক্ষাংসি সেধতমমীবাঃ[১৬]

সজোষসা উষসা সূর্যেন চ সোমম্ সুন্বতো অশ্বিনা।।

ধেনূ র্জিন্বততমুত জিন্বতম্ বিশো হতম্ সেধতমমীবা ঃ।[১৭]

সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমম্ সুন্বতো অশ্বিনা।।[১৮]

অধ্যায়টির বাংলা রূপান্তর এই রকম দাঁড়ায় ঃ—

৮. ৩৫ .১৬ = আমাদের প্রার্থনা উজ্জীবিত কর, শক্তি দাও আমাদের চিন্তায়, ভাবনায়। রাক্ষসদের বিনাশ কর, অসুখ দূর কর, সূর্য এবং উষার সঙ্গে একাত্ম হও। অশ্বিনগণ! সোমরস পান কর।।

৮.৩৫ .১৭ = রাজকীয় শক্তিকে বলশালী কর। যোদ্ধাদের বলশালী কর।

রাক্ষসদের বিনাশ কর অসুখ দূর কর। সূর্য এবং উষার সহিত একাত্ম হও ইত্যাদি।

৮.৩৫.১৮ = গোপালককে শক্তি দাও। সাধারণ মানুষকে (বিশঃ) শক্তি দাও। রাক্ষসদের বিনাশ কর। অসুখ দূর কর। সূর্য এবং উষার সহিত একাত্ম্য হও ইত্যাদি।

ওপরের (৮.৩৫.১৬-১৮) অধ্যায়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যায় উল্লিখিত অধ্যায়টি ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রথম তিনটি বর্ণের অস্বিত্বকে চিহ্নিত করছে। তাছাড়া আরও বুঝতে পারা যায় যে ঐ দ্বিজ সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের নিজ নিজ বর্ণের বৃত্তিকে বংশানুক্রমিক করে নিয়েছে। বি.এম .আপ্তে[২০] এই প্রসঙ্গে বলেন উল্লিখিত অধ্যায়টিতে তিন উচ্চ বর্ণের মানুষদের যে কর্ম বিভাজন দেখান হয়েছে সেই বিভাজন পুরুষ সূক্তে ব্যাখ্যা করা চতুর্বর্ণের মানুষদের কর্ম-সংস্কৃতি নির্দেশ থেকে পৃথক নয়। উল্লিখিত অধ্যায় দুটিতে (৮.৩৫.১৬-১৮ এবং ১০.৯০. ১২) বিভিন্ন বর্ণকে আলাদা আলাদা নামে সম্বোধন করার প্রবণতার মধ্যে তিনি কোন আশ্চর্য হবার কারণ খুঁজে পাননি। তাঁর[২১] মতে বেদ পরবর্তী সাহিত্যেও এই একই ধরণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ঋগবেদের আরও একটি অধ্যায়ের আমরা মুখোমুখি হই যেখানে চতুর্বর্ণের মানুষদের ক্রমপরম্পরা অনুসারে বৃত্তির ইঙ্গিত নির্দেশ করা হয়েছে। ঋগবেদের ঐ অধ্যায়টি (১.১১ ৩.৬) নিচে উধৃত করা হল।

ক্ষত্রায় ত্বং শ্রবসে ত্বং মহীয়া ইষ্টয়ে ত্বমর্থমিব ত্বমিত্যৈ।
বিসদৃশা জীবিতাভিপ্রচক্ষ উষা অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা।।

বাংলা অনুবাদ এই রকম দাঁড়ায় ঃ—

"একজন উচ্চতম মহিমার দিকে অনুপ্রাণিত. আবার আর একজন অনুপ্রাণিত উচ্চতম আদর্শের দিকে। আবার আর একজন তার লাভালাভের দিকে তাকিয়ে, আবার অন্যজন চিন্তিত তার শ্রমের তারতম্যে।

প্রতিটি বর্ণের মানুষই তার নির্দিষ্ট বৃত্তিকে সম্মান করে চলবে। সকল প্রাণীর চোখের সামনেই প্রভাত হয়েছে।"

একটু গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যাবে চতুর্বর্ণের ক্রম পরম্পরা অনুসারে এই অধ্যায়ে, বৃত্তি বংশগতভাবে নির্দিষ্ট করে বোঝান হয়েছে। আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি বৈদিক সভ্যতার শুরুতেই চতুর্বর্ণের মানুষদের জন্যে পেশা এবং বৃত্তি উত্তরাধিকার সুত্রে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বি.এম.আপ্তের[২২] বক্তব্যেও আমরা এই একই সুরের অনুরণন শুনতে পাই। আধিকন্তু তাঁর[২৩] মতে ঋগবেদের জুয়াড়ী সূক্তে (১০.৩৪.১১) বৃপালা, একজন শূদ্র ছাড়া আর কিছু নয়।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আদি বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ্য চতুর্বর্ণ পেশা এবং বৃত্তিগত ভাবে উত্তরাধিকার লাভ করেছে। এবারে রাজতন্ত্রর ওপরে পুরোহিতের প্রভাব নিয়ে দুএক কথা বলা যেতে পারে। ঋগবেদের (৪.৫০.৭-৯) অধ্যায়টি পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায় আদি বৈদিক যুগে রাজার ওপরে পুরোহিতের প্রভাব অন্তিম বৈদিক যুগের মতই ব্যাপক ছিল। সুবিধার জন্য ঋগবেদের উল্লিখিত অধ্যায়টির (৪.৫০.৭-৯) উদ্ধৃতি নিচে সন্নিবেশিত করা হল ঃ —

স ইদ্রাজা প্রতিজন্যানি বিশ্বা শুষ্মেণ তস্থাবভি বীর্যেণ।
বৃহস্পতিং যঃ সুভৃতং বিভর্তি বল্গুয়তি বন্দতে পূর্বভাজং ।। ৭
স ইৎক্ষেতি সুধিত ওকাসি স্বে তস্মা ইলা পিন্বতে বিশ্বদানীং।
তস্মৈ বিশঃ স্বয়মেবা নমন্তে যস্মিন্ব্রহ্মা রাজনি পূর্বএতি।। ৮
অপ্রতীতো জয়তি সং ধনানি প্রতিজন্যান্যত যা সজন্যা।
অবস্যবে যো বরিবঃ কৃণোতি ব্রহ্মাণে রাজা তমবংতি দেবাঃ। ৯

বাংলা অনুবাদ ৪.৫০ ৭-৯

৭ অবশ্যই এই রাজা তাঁর শক্তি এবং বুদ্ধির প্রভাবে তাঁর সকল শত্রুদের ওপরে প্রভুত্ব বিস্তার করতে পেরেছেন। তিনি খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে বৃহস্পতি উপাসনা করেন। বৃহস্পতিও তাঁকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন। (সমৃদ্ধি কামনা করছেন ব্রাহ্মণও।)

৮ রাজা নিজ প্রাসাদে শান্তি এবং সমৃদ্ধিতে দিন অতিবাহিত করেন। পবিত্র খাদ্য দ্রব্যাদি তাঁর জন্য সর্বদা সুলভ। তাঁকে প্রজারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শ্রদ্ধা করে। রাজার প্রতি ব্রহ্মাণ (ব্রাহ্মণ) বিনয় প্রকাশ করেন।

৯ তাঁর প্রজাদের কিংবা শত্রুদের সমৃদ্ধি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পারে না। দেবতারা এই রাজার সহায় রয়েছেন। দেবতাদের সহায়তা পুষ্ট ঐ রাজা ব্রহ্মাণের (ব্রাহ্মণ) পক্ষে রয়েছেন।

বি. এম. আপ্তে[২৪] মনে করেন ঋগবেদের উল্লিখিত অধ্যায়টি (৪.৫০ .৭-৯) রাজার ওপরে ব্রাহ্মণের অথবা পুরোহিতের যে ব্যাপক প্রভাব নির্দিষ্ট করে দেখায়, ঠিক ঐ ধরণের ব্যাপক প্রভাবই বৈদিক যুগের শেষের দিকেও রাজার ওপরে পুরোহিত বিস্তার করে থাকতেন। এবং এটা স্বীকৃত সত্য, যে বৈদিক যুগের অন্তিমে ব্রাহ্মণ্য সমাজে সুশৃংখল এবং সুসংবদ্ধ বর্ণাশ্রম আসন পেতে বসেছিল।

ঋগবেদের ১০.১৭৩ নং অধ্যায়টিও পুরোহিতের রাজার ওপরে প্রভাব বিস্তৃতি বাতাবরণ নিয়ে আলোচনা করেছে। এই অধ্যায়টি পর্যালোচনা করে আমরা বুঝতে পারি পুরোহিত রাজার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন এবং রাজাকে যুদ্ধজয়ে উৎসাহিত করছেন। অধ্যায়টির বাংলা অনুবাদ এই রকম দাঁড়ায় ঃ- (১০.১৭ ৩.১)

-" আমার সঙ্গে থাক ।আমি তোমাকে (রাজা হিসেবে) বেছে নিয়েছি। দৃঢ় এবং অবিচলিত থাক তোমার প্রজারা যেন তোমার সঙ্গে থাকে। তোমার রাজ্য যেন তোমার হস্তচ্যুত না হয়।"

বি. এম. আপ্তে[২৫] প্রমুখ ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ঋগবেদের উল্লিখিত ৪ ৫০.৭-৯ এবং ১০.১৭৩.১ বা সমগ্র ১০.১৭৩ নং অধ্যায়টি পড়লে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে আদি বৈদিক যুগে পুরোহিত রাজার ওপরে বৈদিক যুগের অন্তিম কালের মতই সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করেছিলেন।

এছাড়া ঋগবেদের ১০.১০৯ নং অধ্যায় ভাল করে বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে বৈদিক পরবর্তী যুগে যেমন ব্রহ্মহত্যা খুবই জঘন্য অপরাধ বলে বিবেচিত হত। ব্রাহ্মণের প্রতি গর্হিত আচরণ আদি বৈদিক যুগে ঠিক তেমনি অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হত।

অসবর্ণ বিবাহ বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল বলে অনেকে দাবি করে থাকেন। তথ্য প্রমাণাদির দ্বারা তাঁদের এই বক্তব্য সমর্থিত হয়না। বেদ পরবর্তী সাহিত্যে বিশেষত মহাভারতে এবং পুরাণে মিশ্র বিবাহ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা গিয়াছে। দেখা যায় যে, রাজা যেখানে এগিয়ে এসে কোন ঋষি কন্যাকে বিবাহ করতেন কিংবা প্রেমজ বিবাহের ক্ষেত্রে, অসবর্ণ বিবাহ কিছু পরিমাণে সামাজিক স্বীকৃতি আদায় করে নিত।

রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য বিশ্বামিত্র এবং দেবাপি সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে দু এক কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। মহাকাব্য এবং পুরাণে বিশ্বামিত্রকে কান্যকুব্জ্যরাজ বলে অভিহিত করে ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য তাঁর দীর্ঘ তপশ্চর্যার উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত গ্রন্থাদিতে[২৬] দেবাপিকে রাজা শান্তনুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে আখ্যাত করা হয়েছে। তিনি বনে গমন করে তপশ্চর্যায় জীবনের বাকি দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন অবশ্য ঋগবেদে এঁদের সরাসরি ব্রাহ্মণ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অবশ্য তাতে করে তাঁদের ক্ষত্রিয় অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না কিংবা *The Vedic Index*[২৭] এর মাননীয় সম্পাদক মণ্ডলীর মতামত ও গ্রহণ যোগ্য বিবেচিত হয় না।

বস্তুত পক্ষে সেই প্রাচীন কালে রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করে বাকি জীবন রাজর্ষি হিসেবে যাগযজ্ঞাদি সম্পাদন করতে পারতেন। ক্ষত্রিয় রাজাদের একাংশ ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হতে পেরেছেন এবং বংশানুক্রমিকভাবে সেই মর্যাদা উপভোগ করে গিয়েছেন। এই রকম ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত নরপতিদের তালিকা মহাকাব্যে এবং পুরাণে উল্লেখ্য হয়ে রয়েছে। মহাভারতে এই রকম একজন ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত নরপতি বীতহব্য সম্বন্ধে উল্লেখ দেখতে পাই। মহাভারত[২৮] পড়ে জানতে পারা যায় হৈহয় বংশীয় রাজা বীতহব্য কাশীর পরাক্রমশালী নরপতি প্রতদর্নের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পালিয়ে এসে মহর্ষি

ভৃগুর শরণাপন্ন হলে ভৃগু তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করেন।

ভৃগোর্বচনমাত্রেণ স চ ব্রহ্মর্ষিতাম্ গতঃ।
বীতহব্যো মহারাজ ব্রহ্মবাদিত্বমেব চ ।।

মহাভারতে ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত রাজার বংশধরদের নামের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। বিখ্যাত বৈদিক ভাষ্যকার যৌনকের নামও এই তালিকায় দেখতে পাওয়া যায়। সৈনিক রাজা বীতহব্যর বংশধর।

এছাড়াও আর্যবর্ণ এবং দাসবর্ণ সম্বন্ধেও দুএক কথা বলা যেতে পারে। তথ্য প্রমাণাদি থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় আর্যবর্ণ বলতে বোঝান হত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য অথবা দ্বিজ সম্প্রদায়কে। আর দাস বর্ণ দ্বারা বোঝান হত আর্য সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষরা ছাড়া শূদ্রদের এবং একই সঙ্গে আদিম পার্বত্য উপজাতি এবং বন্য সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষদের। এই বন্য আদিম পাবর্ত্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা আর্যদের বরাবর বিরোধিতা করত এবং তাঁদের যাগ যজ্ঞাদিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। আর্যরা এদের দস্যু, রাক্ষস ইত্যাদি বলে সম্বোধন করতেন।

অধিকন্তু একদল পণ্ডিত মনে করেন আর্যরা মধ্য এশিয়া অঞ্চল থেকে ভারতে এসেছিলেন এবং বৈদিক সভ্যতার উন্মেষের সময় সিন্ধু এবং তৎসন্নিহিত উপত্যকায় বসবাস করছিলেন অন্য একদল পণ্ডিত ভারতকেই আর্যদের আদিম বাসস্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে আর্যরা বৈদিক যুগের সূচনায় তাঁদের বাসস্থান মধ্য ভারত থেকে আরও পূর্বদিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। শেষোক্ত পণ্ডিতদের বক্তব্য অবশ্য প্রত্নতাত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় না। বি. এম. আপ্তে মনে করেন, আর্যরা ইরাণীয়দের সঙ্গে মিলিত ভাবে মধ্য এশিয়ায় আদিম কালে বসবাস করছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা বৈদিক সভ্যতার ঊষাকালে ভারতে প্রবেশ করেন। ঐ সময় তাঁরা ইরাণীয়দের মতই পুরোহিত যোদ্ধৃবর্গ, ভূমি কর্ষণকারী এবং শ্রমিক এই চতুর্বর্ণে বিভক্ত ছিলেন।

এতক্ষণ ধরে আমরা বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদি উপস্থিত করে এই কথাই বলতে চেয়েছি, আদি বৈদিক যুগে ভারতে চতুর্বর্ণ প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে হয়ত, বর্ণাশ্রম ঋগবেদের যুগ থেকে যতই দিনে দিনে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, ততই ক্রমে ক্রমে দৃঢ় সুসংবদ্ধ এবং সুস্থিত হয়েছে। শুধুমাত্র পুরুষ সূক্তে একবার একই সংগে উল্লিখিত হয়েছে বলে আদি বৈদিক যুগে চতুর্বর্ণ একই সঙ্গে বিদ্যমান ছিলনা, এই যুক্তি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। বর্ণাশ্রম কবে থেকে শুরু হয়েছিল, তার কোন সঠিক তারিখ বলতে পারা যায় না। তবে, এটি একটি অতি প্রাচীন প্রথা, মানব সভ্যতার ঊষাকালে যার অস্তিত্বর ইতিবাচক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে এবং যে প্রথা আজও বজায় রাখতে পেরেছে।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। ঋগবেদ — ১০.৯০.১২

২। Kith and Mackdonell (Ed) – *The Vedic Index of Names and Subjects* Vol-II (London 1912) PP 248-50.

৩। *Murj - Original Sanskrit Tuxts* - 2nd Ed. London 1868 , Vol -I, Ch-III P-258.

৪। The Vedic Index of Nams & Subjects -- Vol--II. P - 250

৫। Ibid - 80 - 81

Muirj – *Original Sanskrit Texts* Vol-I, PP-251-57.

৬। পুরোহিত — ১.১.১ , ৪৪.১০.১২ , ২.৪৪.৯ , ৩.২, ৮.৩.২, ৫.১১.২, ৬.৭০.৪ ইত্যাদি। তৎসহ - The Vedic Index of Nams & Subjects Vol–I PP–5–8

৭। ১.১৬৪.৩৪, ২২. ৬ , ৬.২৬.৭, ৭.৩৩.১১, ৮.১৬.৭৭১, ৮৫.৩, ১৬.৩৪ , ১৫৭.৬, ১১৭.৭ ইত্যাদি। তৎসহ Muirj *Original Sankrit Texts* Vol-I, PP- 244-46

৮। ঋগবেদ - ১.১০.১ , ২৩.৯ , ১০১.৫, ১০৩.৭, ১৫৮.৬, ২.৫৯.১, ৪.৫০.৮, ৫.২৯৩, ৩১.৪, ৩২.১২, ৪০.৮, ৫৮.২, ৭.৭৫, ৪২.১, ৮.১৭.২ , ৩১.১, ৩২ .১৬, ৪৩.১৯, ৪৫.৩৯, ৭৭৫, ৩২ .৩০ , ৯৬৫, ৯.৯৬.৬, ১১২.১, ১১৩ .৬, ১০.২৩.১১, ৭১.১১ , ৫৫.২৯, ১৪৫ .৩ ইত্যাদি। তৎসহ Original *Sanstrik Texts* Vol-I , P-6-51

৯। *Muirj - Original Snaskrit Texts* Vol-I P–259.

১০। Apte V.M - *Wire Castes Formulated in the age of the Rgveda* ? Riprinted from the Bulletin of the Diccan College Research instt (1933) Vol-II , P-10

১১। ঋগবেদ — ৪.৪২১, ৭.৬৪.২, ৮.২৫.৮, ১০.১০৯৩ ইত্যাদি। Also See *Wire Casts formullated in the age of the Rgveda* ? PP-15 -16

১২। ঋগবেদ — ১.৪০.৮ , ৫.৫৪.৭ , ১০.৪২, ১০

১৩। ঐ ৪.৪৩, ৪.৩৭.১, ৫.৩৫, ৬.২১.৪, ৪৩.৫, ৭. ৫৬ .২২, ৬১.৩, ৭০.৩, ১০৪.১৩ , ১০ .৯১.২ ইত্যাদি।

১৪। ঐ ৪ .৫০.৮, ৬.৮.৪, ৭.৩৫.১৮, ১০.১২৪.৮ , ১৭৩.৬।

অথর্ববেদ — ২.৪.২ , ৪.৮.৪, ২২.১. ৩

১৫। Apte V. M - Wire Castes formulated in the age of the Rgveda ? P- 10

১৬। Ibid ,P 2 and 13.

১৭। Ibid P-14 , ১৮। Ileid P-14

১৯। Mackdonnell and Keith (Ed)- *The Vedic Index of Names and Subjects* Vol-2 P

২০। -To my opinion this passage mentions the first three classes with the same differntiation of privilege and duties that is implied in the **Purusa sukta** which mentions all the four clsses. Apte V. M - *Wire Castes formulated in the age of the RgVeda* ? P-II

২১। Ileid P-II

২২। = "The four different marns of life referred to here are evedintly those of the **Rajanya**, the **Brahmana**, the **Vaisya**, and the **Sudra**, respectively - "V .M.Apte - *"Wire castes formulated in the age of the Rgveda* ? P-14

২৩। Ibid P-14

২৪। Ibid P-13, ২৫। Ibid P- 13

২৬। **Mahabharata** (Haridessiddhanta Vagis ed, Calcutta) 1 .90.56

২৭। Mackdonnell and Keithed - *The Vedic Index of Names and Subjects* Vol-III , PP-410-2

২৮। Mahabharata (H.S.Ed, Calcutta) Anusasana Parvan -III 39.57-58

২৯। ঋগবেদ - ৩.৩৪.৯।

৩০। তদেব - ৬.২৫.২।

বৈদিক ' সহধর্মচারিণী' থেকে মহাকাব্যিক 'পতিব্রতা': প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর চালচিত্র

তপতী মুখোপাধ্যায়

যদিও প্রাচীন ভারতীয় ঔপনিষদিক দর্শনে উদ্‌ঘোষিত ব্রহ্মৈকাত্ম্যের থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদেও জাতি ধর্ম স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মনুষ্যমাত্রের সমমর্যাদা স্বীকৃত, তবু মানতেই হয়, কোন একটি বিশেষ সমাজে লিঙ্গভিত্তিক পরিচয় অধিকাংশ সময় ব্যক্তির ধ্যান, ধারণা ও বিশ্বাসের নিয়ামক হয়ে ওঠে। নারীকেন্দ্রিক রূপে বিশেষ বস্তু, স্থান ও ব্যবহারের চিহ্নিতকরণ এবং সেই সঙ্গে একটু স্বতন্ত্র ভঙ্গীতে পুরুষ-প্রাধান্য ধারণায় কোন লিঙ্গবৈষম্য ভিত্তিক আলোচনার দুটি মুখ্য বিন্দু হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, শারীরিক পুংস্ত্ব অথবা স্ত্রীত্বের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শ্রেণী, বর্ণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরস্পর অন্তঃসংঘাতে নির্ধারিত পুরুষত্ব অথবা নারীত্বের সীমানা। আবার এই জাতীয় তাত্ত্বিক আলোচনার গুরুত্বে সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে কোন একটি বিশেষ সমাজের সার্বিক অবস্থার মূল্যায়নে নারীর প্রতি অবলম্বিত দৃষ্টিভঙ্গি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে নারী তার এবং সমাজবলয়ে তার অবস্থান সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য, কারণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে শুরু করে সুনির্দিষ্ট নৈতিকতার তত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থান শতাব্দীর স্রোতোপরম্পরায় নিয়তই নির্ধারক রূপে সক্রিয় থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের চালচিত্র উল্লেখের দাবি রাখে এই কারণে যে নারীর সামাজিক অবস্থানের নাতিদ্রুত অথচ ধারাবাহিক অবনমনের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৈদিক যুগেব আদিপর্বে যে সামাজিকভাবে সম্মানিতা, পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে চলা নারীকে দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, শতাব্দীর পরিবর্তনে তারই বর্ণহীন, 'পতিব্রতা' এই আপাত গৌরবদ্যোতক অভিধার আড়ালে পুরুষের দাস্যক্লিষ্ট প্রতিমা আমাদের পীড়িত করে।

প্রাচীন ভারতে নারী অবস্থান প্রসঙ্গে আলোচনায় শুরুতেই কয়েকটি বিষয় আমাদের প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন করে, প্রথমত নির্ভরযোগ্য তথ্যের অপ্রতুলতা, এবং যেটুকু তথ্য হাতে এসে পৌঁছায় তাও অধিকাংশ সময়ই অসম্পূর্ণ। তবে সবচেয়ে বড় প্রতিকূলতা হচ্ছে, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এত বিপুল মাত্রায় পরস্পরবিরোধী মত দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। প্রাচীন ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থানের প্রশ্নটিও এর ব্যতিক্রম নয় এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রে সমস্যার পরিধি আরো ব্যাপক কারণ অন্যান্য যে কোন দেশের

সংস্কৃতির তুলনায় ভারতীয় নারীর মানসকল্পনা প্রোথিত হয়ে আছে অজস্র আখ্যান, উপাখ্যান ও ধর্মীয় ভাবধারার মধ্যে। প্রতীচ্যে কুমারী মেরীকে যতটা আদর্শ প্রতিমা রূপে দেখা হয় তার থেকে অনেক বেশি মাত্রায় সীতা সনাতন ভারতীয়, আদর্শে অনুকরণযোগ্য এক রূপছবি। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, ভারতীয় সমাজে নারীর ভূমিকাটি একই সঙ্গে অভিনব ও তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে, পুরুষ-প্রশংসিত নারীর এই আদর্শ ভাবমূর্তি যেমন একদিকে প্রত্যক্ষ সত্য, তেমনি আরো বাস্তববেদ্য কঠোর সত্য হচ্ছে এইটি যে ভারতীয় সমাজে আবহমান কাল ধরে পুরুষ তার নিজের সুবিধেমত শাস্ত্র বা জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই নারী তার নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জীবন সত্যকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ভাবাদর্শে নারী সংক্রান্ত ধারণাটিই দ্বৈতবাচী, একদিকে সে দয়াময়ী, উর্বরা ও ত্রাণকর্ত্রী, অন্যদিকে সে ভয়ঙ্করী এবং বিনাশিকা। নারীর এই দ্বৈত রূপের দুটি প্রকাশ-প্রথমত, সে শক্তি, জগতের উদ্দীপনা , দ্বিতীয়ত, সে প্রকৃতি-অখন্ড শক্তির প্রকাশ। অর্থাৎ শক্তি ও প্রকৃতির যুগলবন্দী এই নারী। নারীত্বের এই দুই রূপের সমন্বয়ের সমীকরণ দাঁড়ায় নারী শক্তি ও প্রকৃতি যার পরিণতি সঙ্কটের জনয়িত্রী বা ভয়ঙ্করী রূপে। নারীর এই দ্বৈতরূপের কল্পনা ভারতীয় ভাবাদর্শে তার সঠিক রূপটিকে চিনে নিতে সাহায্য করে, এখানেও এক ধরণের বিস্ময়কর বৈপরীত্য চোখে পড়েঃ পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত ধ্রুপদী সাহিত্যের মূলমন্ত্র হচ্ছে পুরুষের নারী শাসন, বিপ্রতীপ ভাবে লোককথায় নারীর স্বাতন্ত্র স্বীকৃত, সেখানে পত্নী রূপে সে শান্ত, বশ্য এবং সেবাময়ী হলেও মাতৃরূপে উর্বরা কিন্তু একই সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিতা। মনে রাখতে হবে, ভারতীয় ধারণায় নারী পত্নীরূপে যে কোন অবস্থায় প্রশ্নহীন আনুগত্যের প্রতিমা বলে অপেক্ষাকৃত আদরণীয়, নারীর মাতৃরূপ, যা শেষ পর্যন্ত দেবী মূর্তিতে পর্যবসিত, একই সঙ্গে পালিকা ও সংহারিকা। এই স্ত্রী ও মাতৃভাবনার সঙ্গমেই গড়ে উঠেছে ভারতীয় নারীর ভাবাদর্শ।

এই জাতীয় তাত্ত্বিক আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অর্থাৎ সুদূর অতীতে নারীকে কি চোখে দেখা হত, সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। সমাজ তাত্ত্বিক অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, আর্যদের ভারত ভূমিতে পা রাখার আগে (যদিও আর্যদের ভারত আক্রমণের বিষয়টি বর্তমানে বিতর্কিত) অর্থাৎ প্রাগার্য ভারতে মাতৃতন্ত্র পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় ছিল এবং পশুপালক আর্যরা পিতৃতন্ত্রের প্রতি তাদের আনুগত্য সত্ত্বেও অনার্যদের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নারীকে তাৎপর্যময় জায়গায় বসাতে অকুণ্ঠিত ছিল। বৈদিক সভ্যতার উষালগ্নে পুরুষের সঙ্গে সমান মাত্রায় নারী যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক সুযোগ লাভ করত। এর ব্যতিক্রম যে একেবারে ছিল না এমন নয় এবং যে কোন প্রাচীন সমাজে থাকাটই

স্বাভাবিক, তবু মানতেই হয়, বৈদিক যুগের প্রাক্ পর্বে নারীকে সশ্রদ্ধ সম্মান ও স্নিগ্ধ অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখা হত। আমরা সসম্ভ্রম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি, বৈদিক নারী ঋষি বিশ্ববারাকে যিনি সম্পূর্ণ পুরুষবর্জিত ও একক মন্ত্রোচ্চারণে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের সাহস দেখান। নারীর শিক্ষার অধিকার যে স্বীকৃত ছিল তার প্রমাণ মেলে অথর্ববেদের মন্ত্রে, যেখানে দাম্পত্য জীবনে সাফল্যের পূর্বশর্তরূপে নারীকে শৈশবে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া হয়।

'ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম'।। (অথর্ববেদ ১০.৫.৮)

বৈদিক সমাজে নারী পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত ছিল বলেই বৈদিক বিবাহ মন্ত্রে স্বামীর প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতার পরিবর্তে আত্মিক মিলনকেই আদর্শ বিবাহের শর্তরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। দম্পতির শারীরিক মানসিক চূড়ান্ত মিলনের ধারণার উৎস রূপে সংসারে উভয়ের পরিপূরক ভূমিকার স্বীকৃতিকে মানতেই হয়। একমাত্র জায়াই পারে স্বামীর জীবনকে পরিপূর্ণভাবে অর্থবহ ও মঙ্গলময় করে তুলতে—

"অর্ধো হ বৈষা আত্মনঃ, তস্মাৎ যাবৎ জায়াং ন বিন্দতে অর্ধো হি তাবদ ভবতি,
অথো যদেব জায়াং বিন্দতে, অথো প্রজায়তে তর্হি সবো ভবতি।"

শতপথ ব্রাহ্মণ ৫.১.৬.১০

নারী পুরুষ উভয়ের কাছেই বিবাহ একটি ধর্মীয় প্রায়োজন, একের সঙ্গ ছাড়া অন্যের পক্ষে স্বর্গে উত্তরণ সম্ভব নয়।

বৈদিক সমাজে নারীর এই সম্মানিত ভূমিকার অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে স্ত্রী প্রায় তুল্যমূল্য ভাবে স্বামীর সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করত। স্বামী ও স্ত্রী যেহেতু এক অবিচ্ছেদ্য সত্তার অর্ধাংশ সুতরাং তাদের সমানাধিকারও অবিসংবাদিত এবং সামাজিক তথা ধর্মীয় সব ক্ষেত্রেই নারী প্রবল উৎসাহে অংশগ্রহণ করত। এমনকি স্বামীর সঙ্গে তুলনামূলক বিচারেও স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ঋগ্বেদের যুগে স্বীকৃত ছিল। সহৃদয়া দাত্রী এবং দেবতাদের আরাধয়িত্রী রূপে তরতের পত্নী শশীয়সী যে স্বামীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ, এই ঘোষণা স্ত্রীর যোগ্যতার উপযুক্ত স্বীকৃতি রূপে গ্রহণীয়।

"উত ত্বা স্ত্রী শশীয়সী পুংসো ভবতি বস্যসী।
অদেবত্রাদরাধসঃ।।" (ঋগ্বেদ ৬.৬১.৬,৭)

স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে আত্মদীপা বৈদিক নারী পুরুষের নীরব অনুগামিনীমাত্র নয়, বরং তার কথা অন্যকে শুনতে বাধ্য করে। ঋষি অসঙ্গের পত্নী শাশ্বতী স্বামীকে তিরস্কার করে তার শক্তিহীনতার জন্য, অন্যদিকে নিজেকে স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনীরূপে প্রতিষ্ঠা করে যখন স্বামীর হৃত শক্তি পুনরুদ্ধারে তাকে অভিনন্দনে অকুণ্ঠ হয়।। সুতরাং বৈদিক সভ্যতার প্রথম যুগে নারী পুরুষের বোঝা নয়, বরং তার শক্তি এবং সেই

কারণেই পুরুষ তাকে সমান মর্যাদা দিয়েছে। পরবর্তী ব্রাহ্মণ যুগেও স্ত্রীকে সমমর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

" সখা হ জায়া" ।(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭.৩.১৩)

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই , জিগীষু ও যুধ্যমান বৈদিক আর্যের পক্ষে যুগপৎ ঘরকন্না ও বহির্মুখী কাজে নারীর সহায়তা অপরিহার্য ছিল, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও যে নারী অগ্রণী ছিল, অন্তত একটি ঋগ্বেদীয় শ্লোকে তার প্রমাণ মেলে। মুদ্গলিনী তার একক শক্তিতেই যুদ্ধ জয় করার শপথ করেছে।

(ঋগ্বেদ ১০.১০২.২)

যেহেতু সে যুগে স্ত্রী স্বামীর নিছক অলঙ্করণমাত্র নয়, বরং যথার্থ অর্থে জীবনসঙ্গিনী, তাই জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার অজস্র চিত্র আমাদের প্রাণিত করে। বৈদিক পুরুষের পক্ষে স্ত্রী সব অর্থেই সহধর্মচারিণী, দৈনন্দিন জীবনবৃত্তে সে যেমন অপরিহার্য তেমনি ইহলোকে তথা জন্মান্তরীণ ভাবনাতেও স্ত্রী অবিসংবাদিত এক অস্তিত্ব ও সেই কারণেই পর্যাপ্ত সম্মান ও অনুরাগের সযত্ন আচ্ছাদনে আবৃত ছিল এই মহিমময়ী। তাই বৈদিক ঋষির কণ্ঠে অনুরণিত হয়-

"ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকে হ্যরিষ্টাং ত্বা সহ পত্যা দধামি"।।

(ঋগ্বেদ ১৩.৮৫.২৪)

যা সত্যের আধার, যা সৎকর্মের আবাসস্থানস্বরূপ, এরূপ স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সঙ্গে স্থাপন করছি।

ক্রমশ সমাজ বিবর্তনে নারীর এই শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন গেল হারিয়ে। যাযাবর আর্যরা যখন ভারতভূমিতে তাদের আধিপত্য উত্তরোত্তর দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে লাগল, তখন পরাজিত অনার্য বা দাসরা ক্রমশ আর্যদের সেবায় নিয়োজিত হল। ফলে গার্হস্থ্যে ও বহিরঙ্গ জীবনে নারীর গুরুত্ব কমতে লাগল। নারীর বিবাহযোগ্য বয়সের সীমা কমানোর সঙ্গে সঙ্গে বেদপাঠে তাদের অনীহা এবং পরে অনধিকার ক্রমশ সামাদিক ভাবে স্বীকৃত হয়ে গেল। আর্য অনার্য সংমিশ্রণের ফলে যে শূদ্রা নারী আর্য গার্হস্থ্যে স্থান পেল, সে যজ্ঞে নিরুৎসাহ হওয়ায় ক্রমশ তার অনুষঙ্গে সামগ্রিকভাবে মেয়েদের যজ্ঞে অনধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। ক্রমশ মেয়েরা কামনা পরিতৃপ্তি তথা সন্তান ধারণের যন্ত্রে রূপান্তরিত হল। প্রশ্নহীন আনুগত্যে নতমস্তক এই মানহারা মানবীদের লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত স্থান পেয়েছে দুটি মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণে।

একথা অনস্বীকার্য, বেদ ও উপনিষদ বাদ দিলে মহাভারত ও রামায়ণ যে কোন বিচারে আমাদের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কাব্য। প্রাচীন ভারতীয় জীবনের সারাৎসার ধারণ করে আছে এই দুটি মহাকাব্য। আকারে মহাভারত রামায়ণের চেয়ে চারগুণ বড়।

মহাভারত আন্তঃগোষ্ঠী সংগ্রামের ইতিবৃত্ত, পক্ষান্তরে রামায়ণ আর্যদের অনার্যবিজয়ের গৌরবগাথা। অতি বিচিত্র তথা বর্ণাঢ্য এক সমাজের ছবি চিত্রিত হয়েছে মহাভারতে যেখানে পুরুষ ও নারী উভয়ের বহু বিবাহ, প্রাক - বিবাহ মাতৃত্ব, বিবাহ বর্জিত সম্পর্ক, বিধবার সহমরণ বর্ণিত হয়েছে। বিপ্রতীপ ভাবে রামায়ণ অনেক বেশি উন্নত ও সংগঠিত এক সমাজের ছবি এঁকেছে।

কন্যাসন্তান মহাভারতে বরাবরই অনভিপ্রেত । কন্যার জন্মকেও ধিক্কার দিয়েছে মহাভারত। (১.১৭৩.১০)। মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার বর্ণনাও মহাভারতে বিশেষ নেই, যদিও দ্রৌপদী ও উত্তরার শিক্ষার কথা সাধারণভাবে উল্লিখিত হয়েছে। মনে রাখা দরকার দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহাভারতে অজস্র পরস্পরবিরোধী কথা আছে। মহাভারতের মূল কাহিনী অংশে দেখা যায়, নারী সত্যই পুরুষের সহধর্মিনী ছিল, কারণ স্বামীকে সে প্রকৃত অর্থেই সদুপদেশ দিয়ে চালনা করত। স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক প্রেম ও অন্যান্য মানবীয় গুণের সমন্বয়ে তিলোত্তমা সেই নারী ছিল গৃহের সম্পদ।

"পূজনীয়া মহাভাগা পুণ্যাশ্চ গৃহদীপ্তয়ঃ।"

কিন্তু নারীর এই মহিমাময়ী রূপ মহাভারতের নীতিকথামূলক অংশে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শিক্ষার অভাব, ধর্মাচরণের অনধিকার, এবং বাল্য বিবাহের শিকার কিশোরী বধূ স্বামীর সহধর্মিণী হওয়ার পরিবর্তে বয়সে এবং ব্যক্তিত্বে অনেক বড় স্বামীর কাছে প্রশ্নহীন আনুগত্যে নত হল, স্বামী যত অত্যাচারীই হোক না কেন, তার যাতে কোন ঘাটতি না থাকে, সে বিষয়ে সমাজ ক্ষমাহীন। স্বামী তার কাছে দেবতুল্য—

"দৈবতং পরমং গতিঃ।"

অসহায় পত্নীর গরিমা গাওয়ার জন্য নতুন শব্দবন্ধ সৃষ্ট হল— পতিব্রতা। পতিব্রতার লক্ষণ কি ? একমাত্র লক্ষণ, স্বামীর প্রতি তার নির্দ্ধিধ আনুগত্য এবং কোন অবস্থাতেই স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ না করা। স্বামী র শত অত্যাচার তাকে মুখ বুজে সইতে হবে, স্বামীর যাবতীয় ব্যভিচার বিষয়ে তার প্রশ্ন করার অধিকার নেই, কিন্তু তার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা অপরিহার্য, স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তির চিন্তাও যেন তার মনে কখনো না দেখা দেয়। এমন কি চন্দ্র, সূর্য বা পুরুষ-নামাঙ্কিত কোন গাছের দিকেও যেন সতী নারী না তাকায় — এমনি ছিল মহাভারতের কঠোর অনুশাসন।

"ন চন্দ্রসূর্যৌ ন তরুং পুংনাম্না যা নিরীক্ষতে ।" (মহা১ ৩.১৪৬.৪৩) আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই যখন দেখি যে দ্রৌপদীর মত তেজস্বিনী নারীও কৃষ্ণপত্নী সত্যভামার প্রশ্নের উত্তরে অপকটে স্বীকার করছেন যে তিনি সদাই তার নিজস্বতাকে দূরে সরিয়ে রাখেন কারণ স্বামীই স্ত্রীর কাছে একমাত্র দেবতা।

অনুশাসন পর্বে অজস্রবার বলা হচ্ছে, যে নারী তার ইচ্ছা অনিচ্ছা সব স্বামীর চরণে সমর্পণ করে, যার কাছে স্বামী দেবতাতুল্য, যে দ্বিতীয় পুরুষের কথা ভুলেও

চিন্তা করে না, সেই সত্যিকারের ধার্মিক। বনপর্বে ব্রাহ্মণী অতিথি মহাব্রাহ্মণের সেবায় বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে পতিসেবায় ব্যস্ত হলেন— প্রমাণ হল, স্বামীসেবার চেয়ে বড় কিছু নেই।

নারী যে মহাভারতের সমাজে পুরুষের সহধর্মিনী নয়, ক্রীড়নক মাত্র ছিল তার প্রমাণ মেলে জোর করে তার উপর নিয়োগ প্রথার মত নিষ্ঠুর প্রথা চাপিয়ে দেওয়ায়। পান্ডু কুন্তীকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, যেহেতু তিনি নিঃসন্তান, অতএব কুন্তীর কর্তব্য নিয়োগ প্রথার আশ্রয় নিয়ে তাকে পুত্র সন্তান উপহার দেওয়া। লক্ষণীয় কুন্তীর মতামত একবারও জিজ্ঞাসা করেন নি পাণ্ডু। নিজের সতীত্বের বিনিময়ে পাণ্ডুর সন্তানস্পৃহা তাঁকে পূরণ করতে হবে— এইটি শেষ কথা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, মহাভারতের সমাজে নারী পশুতুল্য ছিল, যাকে বিবাহ বা অন্য কোন উপলক্ষ্যে উপহার হিসেবে দিয়ে দেওয়া হত। দ্রৌপদীকে পণ রেখে যুধিষ্ঠির পাশায় হারলেন, অথচ একবারও দ্রৌপদীর মত নেওয়ার দরকার মনে করেন নি। যে সমাজে রাজবধূ প্রকাশ্য রাজসভায় স্বামীর চোখের সামনে বিনা প্রতিবাদে নিগৃহীতা হন, সেখানে সাধারণ মেয়েদের অবস্থা কি ছিল, সহজেই অনুমেয়। মহাভারতে নারীর অবস্থান 'সহধর্মচারিণীর' ধারণা থেকে অজস্র আলোকবর্ষ দূরে, স্বামীর পায়ে তাদের নতজানু সমর্পণের ভঙ্গীটিকে শোভন নির্মোকে সাজাতে 'পতিব্রতা' বিশেষণটি সার্থক যোজনা।

নারীর প্রতি হীন মনোভাব রামায়ণের সমাজেও দুর্লক্ষ্য নয়। দশরথের তিন পত্নী যজ্ঞীয় চরু খেয়েছিলেন পুত্রলাভের জন্য, কারণ পুত্র বংশধারা রক্ষা করে, পিতাকে নরক থেকে মুক্তি দেয়। অথচ কন্যার জন্মের সঙ্গে পার্থিব বা পারমার্থিব কোন লাভেরই যোগ নেই, বরং বিবাহ কালে অর্থহানির সুনিশ্চিত সম্ভাবনা, সুতরাং রামায়ণের কবি বললেন—

'কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি সর্বেষাং মানকাঙ্খিনাম।" (উত্তর ৯.১১)

সাধারণ মেয়েদের শিক্ষার কোন বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায় না, তবে রাজ অন্তঃপুরের মহিলারা, যেমন সীতা, তারা, মন্দোদরী যে শিক্ষিত ছিলেন, তা তাঁদের কথায় স্পষ্ট।

নর নারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহাভারতের তুলনায় রামায়ণের মনোভাব অনেক বেশি রক্ষণশীল। রমণীর সম্পূর্ণ পতি-নির্ভরতা বাল্মীকি অসংখ্যবার দেখিয়েছেন। যে কোন নারীর কাছে স্বামী হচ্ছে একমাত্র দেবতা, এবং তাকে বাদ দিয়ে মোক্ষ লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। বনগমনের প্রাক্ মুহূর্তে সীতা রামের অনুগামিনী হতে চেয়েছেন। তাঁর যুক্তি-ইহজন্মে এবং পরজন্মে স্বামী মেয়েদের একমাত্র আশ্রয়। স্বামীর ভাগ্য একমাত্র মেয়েরাই ভাগ করে নেয়, তার স্বামীর চরণ আশ্রয় করে থাকাটাই যে কোন

মেয়ের পক্ষে বাঞ্ছিত।

পতিব্রতার সংজ্ঞাও দিয়েছেন বাল্মীকি — স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরতা ও স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তির চিন্তা না করাই হচ্ছে পতিব্রতার লক্ষণ। পতিব্রতার কর্তব্য সম্পর্কে মহামুণি অত্রির স্ত্রী অনসূয়া সীতাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা মেয়েদের চূড়ান্ত দাস্যকে সূচিত করে — "স্বামী বৃদ্ধ, অসুস্থ, নির্বোধ, ঋঞ্জ, বধির, ক্রোধী, অথবা বিপন্ন যাই হোক না কেন, স্ত্রী যদি তার সঙ্গে অশ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করে, তাহলে সেই নারীর নরকপ্রাপ্তি অনিবার্য। নারী স্বভাবেই দূষিতচরিত্রা, একমাত্র পতিসেবার মধ্য দিয়েই তার মুক্তি সম্ভব।" (অযোধ্যাকাণ্ড ১০৯.২৩-২৮)

তবে স্ত্রী যে সময় বিশেষে স্বামীকে সুপরামর্শ দেয় না এমন নয়, যেমন অকারণ রাক্ষসবধ থেকে সীতা রামকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন, সেখানেও একধরণের দাস্যসুলভ মনোভাব সক্রিয় রয়েছে। (রামায়ণ ১০.২)

নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে পতির ছায়ামাত্র রূপে বেঁচে থাকতেই নারীজন্মের সার্থকতা এবং আদর্শ পতিব্রত্যের শিরোপা সেই নারীকে মহীয়সী করে তুলবে— বাল্মীকি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন। মেয়েদের বিবাহপূর্ব বা বিবাহোত্তর পুরুষ সম্পর্ক রামায়ণকার কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন, কিন্তু দশরথের অন্তঃপুরে তিনজন প্রধানা মহিষী ছাড়াও সাড়ে তিনশো নারীর অবস্থান সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। সমস্ত নীতিনিষ্ঠার অনুশাসন মেয়েদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে সাত খুন মাপ। তৎসত্ত্বেও নারীবিদূষণে রামায়ণের পুরুষরা অক্লান্ত। লক্ষ্মণ জাতি হিসেবে স্ত্রীলোককে ধিক্কার দিয়েছে —"মেয়েরা অস্থিরমতি, অধর্মপরায়ণ এবং বক্রস্বভাব, পরিবারে যত, বিবাদ-বিসংবাদের মূলে তারাই।"

অথচ পুরুষ যে স্ত্রীর প্রতি অবিরত দুর্ব্যবহার করতেন তার অজস্র প্রমাণ মেলে রামায়ণে। কৌশল্যা অভিযোগ করেছেন দশরথের তাঁর প্রতি মনোযোগহীনতা সম্পর্কে, রামের সীতা-পরিত্যাগের ইতিবৃত্ত তো সকলেরই জানা। রাজাগোপালাচারী যথার্থই বলেছেন, "সীতার ট্র্যাজেডি হচ্ছে আমাদের দেশের অগণিত মৌন নারীর বেদনার সমার্থক।।"

দেখা যাচ্ছে, বৈদিক যুগেও স্বামীর "সহধর্মচারিণী" নারী মহাকাব্যের যুগে তার স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও সর্বোপরি মানুষরূপে মর্যাদা হারিয়ে স্বামীর হাতে নিছক ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। 'পতিব্রতা'র জয়টীকায় মুড়ে তাকে নামহীন, গোত্রহীন এক ছায়ামূর্তিতে পরিণত করা হয়েছে, তার বোবা কান্না তাই বহুযুগ পরের পাঠকের কাছে অশ্রুতই থেকে যায়।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। ও . আর . এরেনফেলস্ — মাদার রাইট্ ইন্ ইন্ডিয়া, হায়দ্রাবাদ, ১৯৪১

২। সুকুমারী ভট্টাচার্য — উইমেন অ্যান্ড্ সোসাইটি ইন এনসেন্ট্ ইন্ডিয়া , কলিকাতা-১৯৯৪

৩। ডঃ শাকম্ভরী গয়াল, দি স্ট্যাটাস্ অব উইমেন্ ইন্ দি্ এপিকস্ দিল্লী - ১৯৬৬

৪। এ. এম . আল্টেকর — দি পোজিশন অব উইমেন্ ইন্ হিন্দু সিভিলাইজেশন্ দিল্লী-১৯৯৫

৫। আর. পি. শর্মা, উইমেন ইন্ হিন্দু লিটারেচর — দিল্লী - ১৯৯৫

৬। অ্যালিস্ থর্ন্ অ্যান্ড মৈত্রেয়ী কৃষ্ণরাজ এডিটেড্ — আইডিয়ালস্ ইমেজেস্ অ্যান্ড রিয়েল্ লাইভস্ , উইমেন্ ইন্ লিটারেচর অ্যান্ড হিস্ট্রি, ওরিয়েন্ট লংম্যান , মুম্বাই, ২০০০

৭। প্রভাতী মুখার্জী — হিন্দু উইমেন্, নরমেটিভ্ মডেলস্, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা, - ১৯৭৮

৮। বনমালা ভাতয়ালকর, ওম্যান্ ইন্ দি মহাভারত, দিল্লী - ১৯৯৯

আপদধর্মঃ সামাজিক গতিশীলতার পরিচায়ক

দূর্বা আইন দাস

ধর্ম শব্দটি অত্যন্ত বিতর্কিত। বর্তমানে এই শব্দের দ্বারা মূলত বোঝায় সাম্প্রদায়িক উপাসনা পদ্ধতি বা সাধনার মার্গকে। তবে অনেক সময় স্বভাব বা প্রকৃতি বোঝাতে তা-ব্যবহৃত হয়; যেমন যুগধর্ম, মানবধর্ম ইত্যাদি।[১] ক্ষেত্রবিশেষে কর্তব্যবোধের কথা ব্যঞ্জিত হলেও সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে ধর্ম শব্দের প্রথমোক্ত অর্থটিই প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে এই শব্দটি দ্বারা বোঝাতো জীবন যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পালনীয় কতকগুলি আচরণ ও কর্তব্যকে যা সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষের মান্য করা উচিত। 'ধৃ' ধাতু থেকে 'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ হল 'ধারণ' করা, সমর্থন করা, পুষ্ট করা। ঋগ্বেদে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ধারক বা সমার্থক অর্থে[২]। এছাড়াও উপাসনা পদ্ধতি[৩] ও আচরণের নির্দিষ্ট নিয়মবিধি অর্থেও[৪] এটি ব্যবহৃত হয়েছে। অথর্ববেদে এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় উপাসনার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফল হিসাবে[৫]। তবে বৈদিক পরবর্তীযুগের শাস্ত্রকারগণ 'ধর্ম' বলতে প্রধানত পালনীয় কর্তব্যকেই বুঝিয়েছেন। তাই বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে রাজধর্ম, বর্ণ-ধর্ম, পুত্র-ধর্ম, জাতি-ধর্ম, পিতৃ-ধর্ম , পতি-ধর্ম, স্ত্রী-ধর্ম, দাস-ধর্ম ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ রাজধর্ম অর্থাৎ রাজার পালনীয় ধর্ম বা কর্তব্য, বর্ণ-ধর্ম অর্থাৎ বর্ণের পালনীয় ধর্ম বা কর্তব্য ইত্যাদি[৬]।

এই প্রসঙ্গে আপদ ধর্মের ধারণাটি লক্ষণীয়—'আপদ ধর্ম' অর্থাৎ আপদ কালে পালনীয় ধর্ম। অন্যভাবে বলা যায় আপদ ধর্ম শব্দটির অর্থ হল আপৎকালে অবলম্বনীয় ধর্ম যা অন্যকালে অবিধেয়[৭]। 'আপদ' শব্দটির অর্থ হল বিপদ, দুর্দশা বা দুঃখ । সুতরাং আপদ কাল হল দুর্দশার সময় (ইংরাজীতে আপদ বলতে 'DISTRESS' শব্দটি ব্যবহৃত হয়)। প্রাচীন ভারতের ধর্মশাস্ত্রগুলিতে আপদ ধর্ম সম্পর্কিত তত্ত্ব পাওয়া যায় যা সামাজিক ইতিহাসের আলোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করে।

আপদধর্ম সম্পর্কিত ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায় গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব, বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে, মনু-সংহিতায়, মহাভারত। মনুসংহিতায়[৮] (২০০খ্রিঃ পূঃ - ২০০খ্রিঃ) বলা হয়েছে যে আপৎকালীন সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ শিল্পকর্ম, বেতনের পরিবর্তে কাজ, অন্যদের আদেশপালন, পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, ভিক্ষাগ্রহণ, ঋণপ্রদান, প্রভৃতি কাজ করতে পারেন। সেখানে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে আপদ কাল ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণগণ উপরোক্ত কাজগুলি করতে পারবেন না। ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে উপরোক্ত তালিকার সাতটির কথা উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে আরও যুক্ত হয়েছে কয়েকটি কাজ—ভাড়ার গাড়ি চালান,

পার্বত্য অঞ্চল থেকে জ্বালানী ইত্যাদি সংগ্রহ ও বিক্রয়, রাজার কাছে আশ্রয় গ্রহণ বা ভিক্ষা গ্রহণ (রাজার কাছ থেকে) ইত্যাদি।

ধর্মশাস্ত্রগুলিতে সাধারণভাবে বর্ণগুলির পালনীয় কর্তব্যের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট কাজগুলি হল যজন যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতি গ্রহণ। ক্ষত্রিয়দের বলা হয়েছে শস্ত্রজীবী এবং বৈশ্যরা মূলত কৃষক, বণিক ও অন্যান্য শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। শূদ্রদের স্থান ছিল এদের সবার নিচে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আপদকালীন অবস্থায় বিভিন্ন বর্ণগুলির জন্য নির্দিষ্ট কাজগুলির ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ঘটছে।

আপদধর্মের অনুশাসন প্রাচীন গ্রন্থগুলিতেই লিপিবদ্ধ আছে যেগুলি ব্রাহ্মণদের দ্বারা ব্রাহ্মণদের জন্য রচিত। শাস্ত্রকারগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং লিপিবদ্ধ নিয়মনীতিগুলি ব্রাহ্মণদের সাহায্যে পালন করতে হত, ফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণদের আধ্যাত্মিক ও আর্থ-সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা গ্রন্থগুলিতে আপদ ধর্মের অন্তর্ভুক্তি প্রমাণ করে যে তাঁরা বর্ণ ব্যবস্থার কিছু কিছু ব্যত্যয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যা তাঁদের মর্যাদা হানিকর। তাই সেগুলিকে শাস্ত্রের বর্ম পরাবার জন্যই হয়ত আপদ ধর্ম তত্ত্বের অবতারণা।

এই তাত্ত্বিক ধারণাটি প্রাচীন ভারতীয় সমাজের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে। একসময় পাশ্চাত্যে এমন কি কিছু ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ছিল একেবারে অচল অনড়[৯]। সেখানে পরিবর্তনশীলতার কোন স্থান ছিল না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে গ্রন্থগুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় সেগুলি অনুশাসনমূলক অর্থাৎ 'কি করা উচিত' তার বর্ণনা, 'কি করা হত' তা নয়। তবে তাত্ত্বিক ভাবেও বলা যায় যে অনুশাসনকারগণ একেবারে অনমনীয় ছিলেন না। তাই দেখা যায় আপদধর্মের মত একটি তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা তাঁরা করেছিলেন। এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনের ধারণাকে তাঁরা সমর্থন করতেন। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার ধারাবাহিকতার মধ্যে ও পরিবর্তনশীলতা বা গতিশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সনাতন ধারণা অনুযায়ী গড়ে ওঠা সমাজের বাহ্যিক কাঠামো আজও এক। তবে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন ঘটেছে। আর একথাও অনস্বীকার্য যে নমনীয়তা ছিল বলেই তা আজও টিকে আছে। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা সংক্রান্ত ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে নমনীয়তা, পরিবর্তনশীলতা বা গতিশীলতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন[১০]। অন্যথায় সামাজিক ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি হয়তসঠিক হবে না।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। রাজশেখর বসু, চলন্তিকা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৩৮৯ নতুন মুদ্রণ, কলকাতা, ১৪০৫, পৃঃ ৩৫২
২। রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম খন্ড (১.১৮৭.১), কলকাতা, ১৯৭৬. ১৯৯৩, (পুনর্মুদ্রণ) পৃঃ ৩২৮
৩। তদেব ; ১ .২২.১৮; ৫.২৬.৬; ৮.৪৩.২৪; ৯.৬৩.১ পৃঃ ১০২, ৫৫৫, ২৭৬ (দ্বিতীয় খন্ড), ৩৮৪ (দ্বিতীয় খন্ড)
৪। তদেব; ৪.৫৩.৩; ৫.৬৩.৭; ৬.৭০.১ ;৭.৮৯.৫ পৃঃ ৫২৮; ৬০৪; ১০০ (দ্বিতীয় খন্ড); ১৮৬ (দ্বিতীয় খন্ড)
৫। শ্রী বিজনবিহারী গোস্বামী, অথর্ব বেদ ১১.৯.১৭, কলকাতা, ১৯৭৮, ১৯৯২ (পুনর্মুদ্রণ); পৃঃ ৩০৭
৬। আর. এস. শর্মা, পার্সপেকটিভ্স ইন সোশ্যাল এ্যান্ড ইকোনমিক হিষ্ট্রি অব আর্লি ইন্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৮৩, পৃঃ ৮৫
৭। রাজশেখর বসু, চলন্তিকা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৩৮৯, নতুন মুদ্রণ, কলকাতা, ১৪০৫ পৃঃ ৬৯
৮। মথুরানাথ তর্করত্ন, মনুসংহিতা, কলকাতা, ১৯৩১
৯। আর. এস. শর্মা, পার্সপেকটিভ্স ইন সোশ্যাল এ্যান্ড ইকোনমিক হিষ্ট্রি অব আর্লি ইন্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৮৩, পৃঃ ৮৫
১০। সমাজ পরিবর্তনের বিষয়ে একথা স্মরণীয় যে সামাজিক পরিবর্তনকে সাল তারিখের নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা যায় না। কোন একদিন আকস্মিকভাবে সমাজ পরিবর্তিতও হয়ে যায় না। পরিবর্তনের রেশ সমাজের মধ্যেই থেকে যায়।

প্রাচীন হরিকেলের উপজাতীয় সমাজ ও হরিতক ধর্মসভা *বিহার*

কৃষ্ণেন্দু রায়

সাম্প্রতিক কালে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ধর্মীয় ইতিহাসকে বোধ করার প্রয়াস শুরু হয়েছে। এই প্রয়াসের ভিত্তিতে একথা অন্তত বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ অচল, অনড় ছিল না। সচল সেই সমাজের ইতিহাসের যে-পর্ব সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়, সেটি হল ভারতীয় ইতিহাসের আদিমধ্যযুগ (খ্রিঃ৬০০—১৩০০ খ্রিঃ)। এই সময় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটে একাধিক আঞ্চলিক রাজশক্তির বিকাশ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটে কৃষির সম্প্রসারণ। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ছিল ভক্তিবাদের ব্যাপক প্রসার। প্রধানত এই ভক্তিবাদের জনপ্রিয়তার ফলেই ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীদের ঘিরে গড়ে ওঠে মঠ। পাশাপাশি বৌদ্ধদের ধর্ম প্রতিষ্ঠানও ছিল যাদের বলা হত বিহার। এই সব ব্রাহ্মণ্য মঠ ও বৌদ্ধ বিহারগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেখানে বসবাসকারী সন্ন্যাসীদের ভরণ পোষণের উদ্দেশ্যে নিষ্কর জমি দান করা হত রাজকীয় নির্দেশে। প্রশাসনিক সেই দান সাধারণত তাম্রপটে করা হত। যেমন বৈন্যগুপ্তের (খ্রিঃ ৫০৭/৮) তাম্রশাসন, চন্দ্ররাজা শ্রীচন্দ্রের (খ্রিঃ৯২৫—৭৫খ্রিঃ) পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন ইত্যাদি। কিন্তু জমিদানের খবর সম্বলিত লেখ-উৎকীর্ণ তামার ঘটের (ভাস্) সন্ধান আদিমধ্যকালীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম পাওয়া গেল। ৭০ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট ঘটটির উচ্চতা ৩৮সেমি। দান সংক্রান্ত বক্তব্যকে সংস্কৃত ভাষায় ঘটটির গায়ে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। সময়কাল ধরা হয়েছে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের গোড়ার দিক (৭১৫ খ্রিঃ)। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।[১] বর্তমান প্রবন্ধে এই লেখমালার বক্তব্যকেই আমরা নেড়েচেড়ে দেখবো।

শুরুতে আমাদের মনে রাখতে হবে আলোচ্য ঘটটি স্থানীয় একটি রাজকীয় দলিল। জানা গিয়েছে যে, অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে হরিকেল (বর্তমান চট্টগ্রাম) অঞ্চলে একাধিক উপজাতি বসতি করত — সজ্জ, সাহি, ওরু, শুড়ি, বিভ্র, বেমি, অনুকূল, দদ্দি-সুরকি ইত্যাদি। সেই উপজাতীয় সমাজে খশ উপজাতির লোকেরাও বাস করতেন।[২] প্রাচীন বাংলায় অষ্টম শতকের শেষ দিকে খশ উপজাতীয় মানুষেরা যে বসতি করতেন, সে খবর পালরাজ ধর্মপাল (খ্রিঃ ৭৭৫—৮১০খ্রিঃ) ও দেবপালদেবের (খ্রিঃ৮১০-৪৭খ্রিঃ) লেখমালা থেকেই পাওয়া যায়।[৩] কিন্তু অষ্টম শতকের গোড়া থেকেই হরিকেলের মতো এত প্রান্তীয় অঞ্চলে খশ উপজাতির বসতির খবর এই প্রথম

পাওয়া গেল। যা হোক্ এইসব উপজাতীয় মানুষেরা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকারদের সুনজরে ছিলেন না বলেই বোঝা যায়। যেমন মনু-সংহিতায় (আঃ খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে আঃ খ্রিঃ দ্বিতীয় শতক) বলা হয়েছে খশরা ছিলেন শূদ্রদের সমতুল্য।[৪] ব্রাহ্মণ্য সমাজের চোখে খশরা ছিলেন পাপ। একমাত্র ভগবান বিষ্ণুর আশ্রয় পেয়েই খশরা শুদ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।[৫] অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের, বিশেষ করে বৈষ্ণব ধর্মের সহায়তায় খশ উপজাতির লোকেরা সমাজে একটু স্থান পেয়েছিলেন— এই ধরণের দাবি করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে হরিকেলের সমাজে অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষেরাও ছিলেন। নির্যাতিত দাম-উপাধিযুক্ত (সম্ভবত) একটি পরিবারের সন্ধান আলোচ্য ঘট থেকে পাওয়া যায় — *নির্যাতিতান্ তথা শ্রী পৃথুদাম, শ্রী জিষ্ণুদাম, শ্রী (শম্ভু) দাম. শ্রী গৌরীদাম।*[৬] দাম-পরিবার যে এলাকায় বাস করতেন, সম্ভবত সেই এলাকা ব্রাহ্মণ্য সমাজের সুনজরে ছিলনা (বিষয়টিতে পরে আসছি)। এই ধরণের অবহেলিত উপজাতীয়'সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মাহাত্ম প্রচার কতটা সাড়া পেয়েছিল, সে বিষয়ে কোন খবর আলোচ্য ঘট-লেখ থেকে জানা যায় না।

তবে এটি বোঝা যায় যে, হরিকেলের উপজাতীয় সমাজ বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করেছিল। স্থানীয় উপজাতীয় (খশ) শাসক দেবাতিদেব নিজেও বৌদ্ধ ধর্মের মাহাত্মকে সম্ভবত স্বীকার করেছিলেন এবং তিনি বুদ্ধের উপাসক ছিলেন— *সুগতঃ তস্য ভগবতঃ পাদারবিন্দ - বন্দন - উপচিত — শ্রীমৎদেবাতিদেব ভট্টারকস্য — ।*[৭] এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে আলোচ্য ধর্মসভা বিহারকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব।

সেনাবাহিনীর সাহায্যে রাজা নিঃসন্দেহে নিজ ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন; তবে ধর্মীয় তথা সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারাও রাজশক্তির অবস্থান দৃঢ়তর হওয়া সম্ভব। এমন নজির আদি মধ্যকালীন পর্বে বাংলা সহ উত্তরভারতে অনেক আছে।[৮] দেবাতিদেবের মুখ্যমন্ত্রী নয়পরাক্রম — গোমিন সজ্জ, সাহি প্রভৃতি উপরোক্ত উপজাতীয়দের নিকট থেকে তণ্ডকের* বিনিময়ে ৩৩ পাটক (পাটক হল জমির পরিমাপ বিশেষ। ১ পাটকে প্রায় ৬৪০ বিঘা জমি ধরা যেতে পারে [৯]) জমি অধিগ্রহণ করে দেবাতিদেবের সম্মানে ধর্মসভা নামে এক বৌদ্ধ বিহারকে দান করে দেন।[১০] গোমিন শব্দের অর্থ শুধু মাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ্ -ই নয়; বৌদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যিনি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্বভার বহন করতেন, তাকেও গোমিন আখ্যা দেওয়া হত।[১১] নয়াপরাক্রম সম্ভবত ধর্মসভা বিহার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত দায়িত্বেও ছিলেন। সেই কারণেই বোধ করি ৩৩ পাটক জমি উক্ত বিহারের জন্য অধিগ্রহণ করেছিলেন। এবং সেই জমি দান করে উক্ত বিহারকে আর্থিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। তন্ড ধাতু থেকে আগত তণ্ডক শব্দের অর্থ পাটা দ্বারা আহত।[১২] এখন যেহেতু তণ্ডক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেহেতু ধরা যেতে পারে তণ্ডক ছিল পাটা

দ্বারা আহত এক জাতীয় মুদ্রা। এখন, হরিকেল অঞ্চলে ২.৬ সেন্টিমিটার থেকে ৩.০৭ সেন্টিমিটার ব্যাস এবং ৫ থেকে ৭.৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট গোলাকৃতি ও পাটা দ্বারা পূর্ণাহত কিছু মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে যাদের সময়কাল ধরা হয়েছে আঃ খ্রিঃ ৭ম শতক।[১৩] তণ্ডক সম্ভবত এই জাতীয় মুদ্রার-ই অনুসারী ছিল। যা হোক্ রাজকীয় সেই জমি দানের মাধ্যমে একদিকে দেবাতিদেবের রাজদরবারের সঙ্গে অন্য দিকে উক্ত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির সঙ্গেও আলোচ্য বৌদ্ধ বিহারের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। রাজকীয় দানের মাধ্যমে রাজদরবারের পক্ষ থেকে উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় বৌদ্ধধর্ম-সংস্কৃতিগত পৃষ্ঠপোষকতাকে সমর্থন করা হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, হরিকেলের সমাজে অবহেলিত মানুষেরাও বাস করতেন। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা সম্ভবত তারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। উপরোক্ত দাম-পরিবারও বোধ করি এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং ২৫ পাটক জমি উক্ত বিহারকে দান করেছিলেন। অর্থাৎ ধরা যেতে পারে যে, দান করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দাম-পরিবার ছিল সমাজে অবহেলিত ; এবং এই দানের মাধ্যমে উক্ত পরিবার তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। অধিকন্তু পরিবারটি যে-এলাকায় বাস করতেন, সেই এলাকাটিকেও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক নজরে আনার উদ্দেশ্যে এই দান করা হয়েছিল— *নির্যাতিতান্ তথা শ্রীপৃথুদাম - শ্রীজিষ্ণুদাম-(শম্ভু) দাম - গৌরীদাম - ভিঃ - চ -অত্র-এব স্থানয়োঃ পুণ্য (র্জেণ?) র্বের্ন পঞ্চতিবিংশতি পাটকান্ অস্মাকং সর্ব্বেষাং পুণ্য - অভিবৃদ্ধয়ে সর্বাতি -ভোগ ভোগ্যান্ - করুত- ইতি।*[১৪] এই দানের মাধ্যমে দাম-পরিবারের সামাজিক সম্মান এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, শ্রী জিষ্ণুদাম ও শ্রী শম্ভুদাম দেবাতিদেবের সেনাপতিপদে আসীন হয়েছিলেন-মহাবলাধিকৃত - শ্রী জিষ্ণুদাম - শ্রী — ।[১৫]

শুধু এরাই নয়, খশ ও মগ উপজাতির বহু লোক দেবাতিদেবের রাজসভায় পালন করতেন — অশেষ খশ - মকাধিকরণ - - - - ।[১৬] মক শব্দটি প্রাকৃত ভাষার সাধারণ নিয়মেই হবে মগ এবং খ্রিস্টীয় যুগের প্রথম দিকে বঙ্গ অঞ্চলে (ঢাকা, ফরিদপুর এলাকা) মগদের বসতির প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে।[১৭] কাজেই রাজ্য অর্থে[১৮] মক শব্দের ব্যবহারকে তথ্যসম্মতভাবে মেনে নেওয়া কঠিন। যা হোক্ বলা যেতে পারে অবহেলিত মানুষের নিকট থেকে আলোচ্য বিহারটি মান্যতা পেয়েছিল।

এই সূত্র ধরে বিহারটির অন্য একটি দিকে নজর দেওয়া যাক। খশ উপজাতি - অধ্যুষিত এলাকাস্থ চন্দ্র ভট্টরিকা গ্রামের বাসিন্দা সরভদত্ত প্রমুখদের নিকট থেকে বিহারটি ৬০ দ্রোণবাপ পতিত জমি সরাসরি কিনে নিয়েছিল। বিহারটি আরও ১৪০ দ্রোণবাম জমি (অর্থাৎ ৩.৫ পাটক, ৪০ দ্রোণ বাপ = ১ পাটক) বিভিন্ন সময়ে

সরাসরি কিনে নিয়েছিল। সেসব জমির প্রকৃতি অবশ্য জানা যায় না। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য বিহারটি এতসব জমি কিনেছিল চাষ-আবাদ করার জন্য যাতে বিহারে বসবাসকারী সন্ন্যাসীদের ভরণ-পোষণ এবং বিহারটির মেরামতির তথা সংস্কারের খরচ মেটানো সম্ভব হয়—

আর্য - ভিক্ষু - সংঘস্য পুণ্য - উপভোগায় বিহারস্য চ
দীর্জীর্ণ - শীর্ণ - স্ফুটিত - প্রতিসংস্করণায় .... ।[১৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিহারস্ত কয়েকজন সন্ন্যাসী সরাসরি যুক্ত ছিলেন — দেবসিংহ - সুচরিত - সোমপ্রভ ..... ।[২০] এবং এই কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য বিহারে একটি কার্যালয়ও ছিল বলে বোঝা যায়। কারণ জমি ক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে উক্ত সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কয়েকজন কেরানির নাম উপস্থিত লেখতে বারে বারেই করা হয়েছে— *দেবসিংহ - সুচরিত - সোমপ্রভ- পাদমূল -করণি- হস্তিরূদ্র-বিজয়ি-প্রভৃতি ভিঃ ..... উভয় করণ- সমক্ষে ।*[২১] কর্মীসহ পুরদস্তুর কার্যালয় বজায় রেখে কোন ধর্মস্থান কর্তৃক সরাসরি জমি ক্রয়ের ঘটনার খবর এই প্রথম পাওয়া গেল। নিঃসন্দেহে তাই এটি অভিনব। বলা যেতে পারে আলোচ্য বিহারটি শুধুমাত্র ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে যুক্ত ছিল না, ধর্ম-নিরপেক্ষ কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। অর্থাৎ ধর্মস্থানটির ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত জটিলতা লক্ষণীয়। জটিলতা ছিল বলেই আলোচ্য ধর্মসভা *বিহারটির* আরও দুটি ছোট প্রতিষ্ঠান ছিল—মহাযান *বিহার* এবং অন্য একটি *বিহার* (সম্ভবত মহাযান)—যাদের সঙ্গে ধর্মসভা *বিহারের* রীতিমত সংযোগ ছিল—*সম্বন্ধিকৃতঃ*।[২২] এবং জমির পরিমাণ দেখে মনে হয় ধর্মসভা *বিহারটি* বেশ বড়মাপের জমিদার ছিল। তবে *বিহারটি* হীনযানী না-কি মহাযানী সম্প্রদায়ের ছিল, সে-কথা জোর দিয়ে বলা কঠিন। তবে *বিহারটির* সামাজিক হয়ে ওঠার ধারা দেখে মনে হয় এটি মহাযানী সম্প্রদায়ের ছিল; কারণ মহাযানীরা সব সময় সকল মানুষের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করতেন, সকলের মুক্তির কথা বলতেন, সমাজের কল্যাণের কথা বলতেন, ছিলেন মহান।

সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে আলোচ্য বিহারটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ও সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল যে, সরকারি দলিলে একে হরিকেল অঞ্চলের নামের সঙ্গে যুক্ত করে স্মরণীয় করা হয়েছে— হরিতক *ধর্মসভা বিহার*।[২৩] *হরিতক* শব্দটি *হরিকেড়* হবে।[২৪] এবং প্রাকৃত ভাষার সাধারণ নিয়মে হরিকেড় হবে হরিকেল।[২৫] কাজেই শব্দগুচ্ছটি হবে এরকম—হরিকেল ধর্মসভা বিহার।

সবশেষে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ আদি মধ্যকালে ধর্মপ্রতিষ্ঠানে জমি দানের খবর সাধারণত তাম্রপট্টের ওপর-ই পাওয়া যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে তামার ঘট ব্যবহার করা হল কেন? পূজা-পার্বণ তথা শুভকাজে জলপূর্ণ ঘট স্থাপন সুবিদিত। ধর্মস্থানে দানকার্যের

মতো শুভকাজেও মঙ্গল ঘটের ব্যবহার সম্ভবত শুরু হয়েছিল। ঘটের গায়ে দেয় বস্তুর নাম লিখে দানগ্রহীতার হাতে সেই ঘট থেকে জল দান করে আনুষ্ঠানিকভাবে বোঝানো হত দেয় বস্তু তাকে দান করা হল। দান জাতীয় শুভকাজে এইভাবে মঙ্গল ঘটের ব্যবহার হয়তো সমকালীন হরিকেলের সমাজে অনুসৃত হত এবং তারফলে সেটি ধীরে ধীরে প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এবং পূজা সংক্রান্ত শুভকাজে তামার ব্যবহারও ঐতিহ্যগতভাবে সুপরিচিত। তাই হয়তো আলোচ্য তামার ঘটের গায়ে দেয় বস্তুর নাম লিখে আনুষ্ঠানিক ও প্রথাগতভাবে ধর্মসভা *বিহারকে* দান করা হয়েছিল। বস্তুত দানগ্রহীতার উদ্দেশ্যে দেয় বস্তুর এইভাবে দান করার বিষয়টিকে ধীরে ধীরে (আঃ খ্রিঃ নবম শতকের মধ্যে) পুরাণ গ্রন্থে সংকলিত করে এটিকে ধর্মীয় আনুশাসনিক করে তোলা হয়।[২৩] এইভাবে বিষয়টি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের অঙ্গ হয়ে ওঠে।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। ভট্টাচার্য গৌরীশ্বর, 'এ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট অন্ দ্য ইনস্ক্রাইবড্ মেটাল ভাস্ ফ্রম দ্য ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব্ বাংলাদেশ', (এর পর থেকে এ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট বলে উল্লিখিত)।
ইন মিত্র দেবলা (সম্পাঃ) এক্সপ্লোরেশন্স্ ইন আর্ট অ্যান্ড আরকিওলজি, কোলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ২৩৮।
২। ভট্টাচার্য গৌরীশ্বর, 'এ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট', পৃঃ ২৪৩, লাইন নং ৪, ৬।
৩। শাস্ত্রী হীরানন্দ, 'দি নালন্দা কপার-প্লেট অব দেবপালদেব', এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা (এর পর এ. ই বলে উল্লিখিত), খণ্ড ১৭, নং ১৭, পৃঃ ৩২১, লাইন নং ৩১;
ভট্টাচার্য পি.এন, 'নালন্দা প্লেট অব ধর্মপালদেব', এ ই, খণ্ড ২৩, নং ৪৭, পৃঃ ২৯১, লাইন নং ১৪।
৪। তর্করত্ন পি (সম্পাদঃ), মনু-সংহিতা, বাংলা, কোলকাতা, ১৩৯৭, পৃঃ ২৪—২৫, শ্লোক নং ৩৯, পৃঃ ২৯১—৯২, শ্লোক নং ২০, পৃঃ ২৯৫, শ্লোক নং ৪১।
৫। ত্যাগারে জি.এন (অনুঃ), দি ভাগবৎ পুরাণ, খণ্ড ৭, অংশ নং ১, পুনর্মুদ্রিত, দিল্লী, ১৯৯২, পৃঃ ১৭২, ২.৪.১৮.।
৬। ভট্টাচার্য গৌরীশ্বর, 'এ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট', পৃঃ ২৪৩, লাইন নং ৭।
৭। ঐ, 'তদেব', পৃঃ ২৪৩, লাইন নং ১ (খ)।
৮। চট্টোপাধ্যায় বি.ডি, 'হিস্ট্রিওগ্রাফি, হিস্ট্রি অ্যান্ড রিলিজিয়াস সেন্টার্স আর্লি মিডিয়াভ্যাল নর্থ ইন্ডিয়া সার্কা এ.ডি ৭০০—১২০০', ইন দেশাই ডি.এন ও ম্যাসন ডি (সম্পাঃ), গডস্, গার্ডিয়ান্স্ অ্যান্ড লাভার্স টেম্পল স্কালপচার্স ফ্রম নর্থ ইন্ডিয়া (এ.ডি. ৭০০—১২০০), চিদাম্বরম, ১৩৯৩, পৃঃ ৩৯ থেকে।
৯। ভট্টাচার্য গৌরীশ্বর, 'এ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট', পৃঃ ২৪৪, লাইন নং ১৪।
৯ক) সরকার ডি.সি, 'উওমানস্ ইন বেঙ্গল এপিগ্রাফস্', *ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টার্লি*, খণ্ড ২৬, সংখ্যা ৪, পৃঃ ৩১০-১১।
১০। ভট্টাচার্য গৌরীশ্বর, 'এ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট', পৃঃ ২৪৩, লাইন নং ৫—৭।
১১। সরকার ডি.সি, *ইণ্ডিয়ান এপিগ্রাফিক্যাল গ্লোসারি*, দিল্লী, ১৯৬৬, পৃঃ ১১৮; তুলনীয়, উইলিয়ামস্ মনিয়ের মনিয়ের, *এ স্যান্সক্রিট - ইংলিশ ডিকশনারি* (এরপর *এস.ই.ডি*), পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী, ১৯৯০, পৃঃ ৩৬৬ স্তম্ভ নং ১।
১২। উইলিয়ামস্ মনিয়ের মনিয়ের, *এস.ই.ডি*, পৃঃ ৪৩২, স্তম্ভ নং ২।
১৩। মুখার্জী বি.এন, 'প্লেস্ অব হরিকেল কয়েনেজ ইন দ্য আর্কিওলজি অব বাংলাদেশ', *জার্নাল অব দ্য বরেন্দ্র*

রিসার্চ মিউজিয়াম, খণ্ড ৭, পৃঃ ৫৯।
১৪। ভট্টাচার্য গৌরীশ্বর, 'এ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট', পৃঃ ২৪৩, লাইন নং ৭—৮।
১৫। ঐ , 'তদেব', পৃঃ ২৪৩, লাইন নং ২।
১৬। ঐ , 'তদেব', পৃঃ ২৪৩, লাইন নং ৪।
১৭। মুখার্জী বি.এন, 'খরোষ্ঠী অ্যান্ড খরোষ্ঠী - ব্রাহ্মী ইনস্ক্রিপশন্স্ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল (ইন্ডিয়া)', *ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন,* কোলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ২৮, ৪৪, নং ৪, ফিগার নং ৪।
১৮। ভট্টাচার্য গৌরীশ্বর, 'এ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট', পৃঃ ২৪৫, সূত্র-নির্দেশ নং ১২।
১৯। ঐ , 'তদেব', পৃঃ ২৪৩, লাইন নং ৭।
২০। ঐ , 'তদেব', পৃঃ ২৪৪, লাইন নং ১৩।
২১। ঐ , 'তদেব', পৃঃ ২৪৪, লাইন নং ১৩-এর শেষাংশ।
২২। ঐ , 'তদেব', পৃঃ ২৪৪, লাইন নং ১৭।
২৩। ঐ , 'তদেব', পৃঃ ২৪৩, লাইন নং ৭।
২৪। অধ্যাপক বি.এন. মুখার্জীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনা প্রসূত, আমি তার নিকট কৃতজ্ঞ।
২৫। বৈদ্য পি.এল (সম্পাঃ), *প্রাকৃত গ্রামার দি এইট্থ অধ্যায় অব সিদ্ধ - হেম - শব্দানুশাসন বাই হেমচন্দ্র,* পুনে (পুনা), ১৯৫৮, পৃঃ ৪৫৮ সূত্র নং ২০২—*ডো লঃ*
২৬। তর্করত্ন পি (সম্পাঃ), *অগ্নিপুরাণম্,* বাংলা, কোলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৩৯৫, শ্লোক নং ৪৯—৫০।

প্রাচীন ভারতের শস্য সংরক্ষণ ও শস্যাগার : জাতকের সাক্ষ্য

সুদর্শনা চৌধুরী (ভাদুড়ী)

শস্য সংরক্ষণ ও শস্যাগার নির্মাণ—ব্যক্তিগত বা প্রশাসনিক যে উদ্যোগেই ঘটুক না কেন—কৃষি উৎপাদনে অগ্রগতি ও জটিল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। উন্নততর কৃষিব্যবস্থার দ্বারাই তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের চেয়ে অধিকতর শস্য উৎপাদন করা সম্ভব, এই উদ্বৃত্ত তখন শস্যাগার বা ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আশ্রিত রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর উদ্ভব ও বিকাশ এবং নগরায়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ কৃষি উৎপাদনের নিবিড় যোগ লক্ষ্য করার মতো। প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতা ও হরপ্পা সভ্যতার বিকাশে শস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ অজানা নয়।[১] খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিঃ ৩০০ অব্দ পর্যন্ত নগরায়ন ও রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য প্রসার দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে উন্নততর কৃষি প্রযুক্তি ও বহুল পরিমাণ ফলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অজানা নয়। নগরজীবন ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হলেও শস্য সংরক্ষণ এবং বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ে তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা তুলনায় অপ্রতুল। সেই কারণে জাতক কাহিনীর ভিত্তিতে শস্য ভাণ্ডার সম্পর্কে এই নিবন্ধটি রচিত। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও দৈনন্দিন জীবনের নানাদিক জাতক গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সেইজন্য জাতক কাহিনীগুলির উপযোগিতা পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত।

জাতক কাহিনীগুলি গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত। এটি পালি ভাষায় রচিত। আধুনিক মত অনুযায়ী জাতক কাহিনীগুলির লিখিত রূপ খ্রিঃ পূঃ ২০০ থেকে খ্রিঃ ২০০ অব্দের মধ্যে রচিত। অতএব জাতক মৌর্যত্তর পর্বের সাহিত্য কীর্তি এই আলোচনায় শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষের বাংলা অনুবাদটি অনুসৃত হয়েছে। ই.বি. কোয়েল সম্পাদিত জাতকের ইংরেজি অনুবাদটিরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিনয় পিটকে বৌদ্ধ সংঘারামের অন্তর্গত বিভিন্ন কক্ষের উল্লেখ আছে। শস্য ও খাদ্য সংরক্ষণের জন্য একটি পৃথক কক্ষেরও এতে উল্লেখ আছে। এখানে যে বিভিন্ন কক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়, সম্ভবত এই সব কটি কক্ষ একই গৃহের অন্তর্গত ছিল না[২]। মঠ সন্নিকট কোষ্ঠাগারের একটি দৃষ্টান্ত দেবধর্ম্মজাতকে আছে[৩]। এই কাহিনী থেকে জানা যায় যে শ্রাবস্তীবাসী এক ভূমধ্যাকারী পত্নীবিয়োগের পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। প্রব্রাজক হবার সংকল্প করে তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য একটি ঘর, একটি অগ্নিশালা ও একটি ভাণ্ডারগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। ভাণ্ডারগৃহটি ঘি, চাল ইত্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করে তিনি প্রব্রাজক হয়েছিলেন।

এর দ্বারা প্রমাণিত যে ভিক্ষুরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য পাকশালা ও ভাণ্ডার গৃহ নির্মাণ করতে পারতেন। তবে এই বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে এগুলি সংঘারামের বাইরে নির্মিত হয়েছিল। সুতরাং জাতকের কাহিনীতে সংঘারাম সংলগ্ন কোষ্ঠাগার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

জাতকে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন কোষ্ঠাগারের উল্লেখ একাধিকবার আছে। কাক-জাতক[৪] কাহিনীতে প্রাসাদ সংলগ্ন শস্যাগারের ধান রোদে দেওয়ার বর্ণনা আছে। কাক-জাতক কাহিনীতে দেখা যায় যে এক দাসী কোষ্ঠাগারের ধান রোদে দিয়ে বসে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছিল। তাকে ঘুমন্ত দেখে একটি ছাগল সেখানে এসে ধান খেতে থাকে, দাসীকে জাগা দেখলেই সে পালায়। এইভাবে ছাগলটি তিনবার দাসীকে ঘুমোতে দেখে ধান খেল। তিনবার ছাগলটিকে তাড়িয়ে দাসী ভাবতে লাগল যে ছাগলটি যদি বারবার এসে খেতে থাকে তা হলে গোলার অর্ধেক ধান শেষ হয়ে যাবে। এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য দাসী একটি মশাল হাতে নিয়ে ঘুমোনোর ভান করে বসে রইল। ছাগলটি আবার যখন ধান খেতে এল তখন দাসী সেই মশাল দিয়ে ছাগলটির পিঠে আঘাত করল। তাতে ছাগলটির লোম জ্বলে উঠল। আগুন নেবানোর উদ্দেশ্যে ছাগলটি হস্তিশালার কাছে একটি তৃণকুটিরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তৃণ কুটিরটায় আগুন ধরে গেল এবং সেই আগুনের শিখা গিয়ে পাশের হস্তিশালায় লাগল।

কাক-জাতকের কাহিনীতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সরকারি কোষ্ঠাগারটির অবস্থান রাজপ্রাসাদ ও হস্তিশালার অদূরে ছিল। জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইমারতের নিকটে কোষ্ঠাগারের অবস্থান শস্য সংরক্ষণের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে। কাহিনীতে ধানের উল্লেখ দেখে মনে হয় কোষ্ঠাগারে সংরক্ষিত শস্যের মধ্যে ধান ছিল অন্যতম।

কুরুধর্ম্মজাতকে[৫] প্রাসাদ সংলগ্ন কোষ্ঠাগারের উল্লেখ আছে। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে দ্রোণমাপক একদিন ভাণ্ডার দ্বারে বসে রাজার প্রাপ্য ধান মাপার সময় যে ধানরাশি মাপা হয়নি তার থেকে এক একটি ধান নিয়ে লক্ষ্য স্থাপন করেন। এমন সময় বৃষ্টি শুরু হয়। দ্রোণমাপক লক্ষ গুণে 'এত ধান মাপা হল' বলে লক্ষ্যগুলি ঝাঁট দিয়ে যে ধানের রাশি মাপা হয়েছিল তার উপর ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি দরজার ভিতর প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়ে তাঁর মনে সন্দেহ হয়, যে তিনি লক্ষ্যগুলি মাপা ধান না অমাপা ধানের উপর ফেলেছেন। তিনি ভাবেন যদি তিনি লক্ষ্যগুলি মাপা ধানের উপর ফেলে থাকেন তবে অকারণে রাজার অংশ তিনি বাড়িয়েছেন এবং প্রজার অংশ কমিয়েছেন।

এই কাহিনী থেকে মনে হয় সে যুগের রাজস্ব মূলত শস্যের মাধ্যমে আদায় করা হত। এই শস্য সংরক্ষিত হত প্রাসাদ সংলগ্ন কোষ্ঠাগারে। সে যুগের রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক ইতিহাসে শস্যাগারের গুরুত্ব কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

মহাস্বপ্নজাতকে[৬] শুধু প্রাসাদসংলগ্ন কোষ্ঠাগার নয় ব্যক্তিগত শস্যভাণ্ডারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে অষ্টম স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—পৃথিবীর বিনাশ কাল আসন্ন হলে, রাজারা দুর্গত ও কৃপণ হবেন। তাঁদের মধ্যে যারা সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী তাদের ভাণ্ডারেও লক্ষাধিক মুদ্রা সঞ্চিত থাকবে না। এই অভাবগ্রস্ত রাজারা জনপদবাসীদের নিজেদের বপন কার্যে নিয়োগ করবেন। উপদ্রুত প্রজারা তাদের নিজেদের কাজ ত্যাগ করে রাজাদেরই কাজ করবে, তাদের জন্য ধান, যব, গম, মাষকলাই বপন করবে, রক্ষা করবে, ক্ষেত থেকে কেটে আনবে, মর্দন করবে ও রাজভাণ্ডারে তুলে রাখবে। তারা আখের চাষ করবে, গুড় প্রস্তুত করবে। তারা পুষ্পোদ্যান ও ফলোদ্যান করবে। এই সব উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে তারা রাজার কোষ্ঠাগারই বারবার পূর্ণ করবে, নিজেদের ভাণ্ডার যে শূন্য সে দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করবে না।

প্রাসাদ সংলগ্ন কোষ্ঠাগারে যে শুধু ধান থাকত না তার প্রমাণ এই কাহিনীতে পাওয়া যায়। উপরে উক্ত সব কটি দ্রব্যই আশা করা যায় যে কোষ্ঠাগারে রক্ষিত হত। ব্যক্তিগত কোষ্ঠাগারের উল্লেখও এই কাহিনীতে পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত শস্যাগারের উল্লেখ অসম্পদান জাতকে আছে।[৭] পুরাকালে মগধ রাজ্যে রাজগৃহ নগরে বোধিসত্ত্ব এক মগধ রাজের শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল শঙ্খশ্রেষ্ঠী। বারাণসী নগরে সেই সময় পিলিয় নামে আর এক শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। একবার পিলিয়র কোন কারণে সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট হয় তখন শঙ্খশ্রেষ্ঠী তাঁকে সাহায্য করেন। তাঁর নিজের সম্পত্তি দু'ভাগে ভাগ করে একভাগ পিলিয়কে দান করেন। এরপর শঙ্খশ্রেষ্ঠীর একই দুর্দশা উপস্থিত হলে তিনি পিলিয়র কাছে সাহায্যের জন্য যান। পিলিয় তাঁকে সাহায্য করার পরিবর্তে এক আঢ়া মোটা ভুসি দিয়ে বিদায় করেন। কিন্তু সেই একই দিনে পিলিয়র গোলাতে সহস্র প্রমাণ উৎকৃষ্ট ধান ঝেড়ে তোলা হয়।

উদ্ধৃত অংশটি থেকে মনে হয় সে যুগের অর্থনীতি ছিল মুলত কৃষিপ্রধান। বিভিন্ন বাণিজ্যিক দ্রব্যের মধ্যে শস্য ছিল উল্লেখযোগ্য। ধনী শ্রেষ্ঠী বা ধনী গৃহপতিরা তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের মূলত শস্যের মাধ্যমে বেতন দিতেন। এই শস্য সংরক্ষিত হত তাদের ব্যক্তিগত গোলায়। সঞ্চয়ের প্রতি ভারতীয়দের প্রবণতা ছিল সুদূর অতীত থেকে। সম্ভবত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল।

গৃহপতি[৮] জাতক ও উচ্ছিষ্টভক্ত[৯] জাতক এই দুই কাহিনীতেও ব্যক্তিগত শস্যভাণ্ডারের উল্লেখ আছে। গৃহপতি জাতকে বলা হয়েছে যে বোধিসত্ত্বের স্ত্রী গোলায় উঠে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গ্রামভোজনককে বলছে যে গোলায় ধান নেই। এর থেকে মনে হয় শস্যের গোলা মাটি থেকে এটকু উঁচুতে অবস্থিত হত। গ্রামনীচণ্ড

জাতকেও[১০] এই ধরণের শস্যাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

উচ্ছিষ্টভক্ত জাতকে উল্লেখিত ভান্ডারটি সম্ভবত মাটির নিচে অবস্থিত ছিল। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে গৃহে আসতে দেখে তাঁর উপপতিকে ভান্ডারগৃহে নামিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ পুরো ঘটনাটি নটপুত্র বোধিসত্ত্বের কাছে থেকে জানতে পেরেছিলেন। ঘটনাটি ব্যক্ত করার পর বোধিসত্ত্ব সেই ব্যক্তিকে টিকি ধরে টেনে তুলেছিলেন। এই বিবরণ থেকে মনে হয় মাটির নিচে শস্য সংরক্ষণ করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। অতীতে অনেক জায়গাতেই এইভাবে খাদ্য শস্য সংরক্ষিত হত। নব্যপ্রস্তর যুগে কাশ্মীরের বুবজাহোমে[১১] ও খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে পুনার নিকটে অবস্থিত ইমামগাঁও[১২] তে এর নিদর্শন পাওয়া গেছে। অর্থশাস্ত্রতেও এইভাবে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করার বিবরণ আছে। উত্তর ও মধ্যভারতের কিছু অঞ্চলে এখনও খাদ্যশস্য সংরক্ষিত হয়।

কোষ্ঠাগারের উল্লেখ শালিকেদার জাতক[১৩] ও চাম্পেয় জাতকেও[১৪] আছে। তবে এই কাহিনী দুটি থেকে কোষ্ঠাগার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

জাতকের কাহিনী থেকে খ্রিঃ পূঃ ২০০ - খ্রিঃ ২০০ অব্দের মধ্যে উত্তর ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন শস্যাগার সম্পর্কে জানা যায়। শস্যাগারের অবস্থান এবং তাতে সংরক্ষিত বিভিন্ন দ্রব্য সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়। তবে এই কাহিনী সমূহ থেকে কোষ্ঠাগারের সঠিক পরিকাঠামো নির্ধারণ করা যায় না। অর্থশাস্ত্র ও অন্যান্য জৈন গ্রন্থে কোষ্ঠাগার সম্পর্কে যে বিস্তারিত বিবরণ আছে সেরকম বিস্তারিত বিবরণ জাতকে নেই।

তবুও জাতকে বর্ণিত শস্যাগারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একটি সমৃদ্ধশালী কৃষিপ্রধান অর্থনীতির চিত্র এর থেকে পাওয়া যায়। সে যুগে রাজস্ব মূলত শস্যের মাধ্যমে গ্রহণ করা হত। প্রাসাদ সংলগ্ন কোষ্ঠাগারে তা সংরক্ষিত হত। কোষ্ঠাগারের রাজনৈতিক গুরুত্ব তাই অনস্বীকার্য। একাধিকবার ব্যক্তিগত কোষ্ঠাগারের উল্লেখ প্রমাণ করে খাবার সংরক্ষণের প্রয়োনীয়তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা। বহু জাতক কাহিনীতে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টিজনিত খরা প্রভৃতির বিশদ বিবরণ আছে। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা সম্বন্ধে জাতক কাহিনীগুলির সচেতনতা অনস্বীকার্য। শস্যাগারে নিয়মিত উপস্থিতি ও শস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকার দুর্দশা উপশম করতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে হয়। নগরায়ণ পদ্ধতিতেও শস্যাগারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সংরক্ষিত উদ্বৃত্ত শস্য খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়, নগরবাসীর ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজন।

সুতরাং সে যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে শস্যাগারের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল— জাতকের কাহিনীসমূহ তারই সাক্ষ্য বহন করে।

সূত্র-নির্দেশ ঃ-

১। প্রাক্ হরপ্পা সভ্যতার শস্যাগার মেহেরগড়ে পাওয়া গেছে।
দ্রষ্টব্য — জিন ফ্রান্‌কোয়স জারেজ, 'এস্‌ক্যাভেসন্ এট্ মেহেরগড় : দেয়ার সিগ্‌নিফিকেন্স এ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ্ হরপ্পান্ সিভিলাইজেশন্, গ্রেগরি পোসসেল (সম্পাদিত) *হরপ্পান সিভিলাইজেসন এ রিসেন্ট পার্সপেকটিভ*, অক্‌সফোর্ড ও আই.বি.এইচ্ পাব্‌লিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃঃ ৭৯-৮৪।
হরপ্পা সভ্যাতর শস্যাগারগুলির মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হরপ্পায় প্রাপ্ত শস্যাগারটি।
দ্রষ্টব্য ঃ ভাট্‌স্ এম.এস, *এক্‌সক্যাভেসন এ্যাট হরপ্পা ভলিউম* - ১, দিল্লী, প্রকাশক ভারত সরকার, ১৯৪০ পৃঃ ১৫-২২।

২। মার্শাল, জন, *ট্যাক্ সিলা*, ভারতীয় পাব্‌লিশিং হাউস, ১৯৭৫ পৃঃ ২৩৩।

৩। ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, *জাতক*, প্রথম খন্ড, করুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৩৮৪, পৃঃ ২২-২৩।

৪। *জাতক*, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৫৬।

৫। ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, *জাতক*, দ্বিতীয় খন্ড, করুণা প্রকাশনী, বৈশাখ, ১৪০৫, পৃঃ ২৩৬।

৬। *জাতক*, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৬১।

৭। *জাতক*, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৩৪-২৪৫।

৮। *জাতক*, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৮৬-৮৭।

৯। *জাতক*, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ১০৬-১০৭।

১০। *জাতক*, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ১৮৭-১৯৬।

১১। ঘোষ, এ (সম্পাদিত), *এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ্ ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি*, ভলিউম-১, মুন্সিরাম মনোহর লাল পাব্‌লিশার্স লিমিটেড, ১৯৮৯, পৃঃ ৮৬।

১২। ধাবালিকার এম.কে, সান্‌কালিয়া এইচ্ ডি. আন্‌সারি জেড ডি (সম্পাদিত) *এক্‌সাক্যাভেসনস এ্যাট ইমামগাঁও*, প্রথম খন্ড, প্রথম ভাগ, ডেকান কলেজ পোস্টগ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পুনা, ১৯৮৮, পৃঃ ১৮৯-১৯৩।

১৩। ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, *জাতক*, চতুর্থ খন্ড, করুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৩৮৫, পৃঃ ১৮৯-১৯১।

১৪। *জাতক*, চতুর্থ খন্ড, পৃঃ ২৯৯-৩০৭।

উনের রাজনৈতিক ইতিহাসের উত্থান পতনের সাক্ষী-বল্লালেশ্বর মন্দির

স্বাতী মণ্ডল অধিকারী

মধ্যপ্রদেশের খারগোন জেলায় উন নামে একটি ছোট গ্রাম বর্তমান। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের প্রাচুর্য থেকে মনে হয়, একদা এই ছোট গ্রামটি ছিল একটি মন্দির নগরী। বর্তমান প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয় হল উনের একটি মন্দির, যার নাম বল্লালেশ্বর মন্দির।

বর্তমানে মন্দিরটি অর্ধভগ্ন। যদিও মন্দিরগাত্রে একটি লেখ আছে, কিন্তু তারিখহীন এই লেখ কালের প্রকোপে জীর্ণ। সম্পূর্ণ লেখটির পঠন সম্ভব নয়। মন্দির নির্মাণকালে যে দেবমূর্তি ধূপ, চন্দন, মাল্য সহযোগে গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত হন, তিনিও নিরুদ্দেশ। আপাতদৃষ্টিতে মূক মন্দিরটি কিন্তু তাও ইতিহাসের গল্প বলে। এর গঠন শৈলী ও ভাস্কর্য এর নির্মাণকালের ইঙ্গিত দেয়। মন্দিরগাত্রে সংস্থাপিত মূর্তিগুলি থেকে অনুমান করা যায় কোন দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দিরটি নির্মিত হয়। তাই মন্দিরটির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

স্থাপত্য

ভিতের নক্সা — বল্লাশেশ্বর একটি পূর্বাভিমুখী পঞ্চরথ মন্দির। বর্গাকার গর্ভগৃহ, আয়তাকার অন্তরাল ও বর্গাকার বৃহৎ মন্ডপ নিয়ে মন্দিরটি গড়ে উঠেছিল। মন্ডপের সম্মুখে ছিল প্রবেশদ্বার সম্বলিত আয়তাকার মুখমন্ডপ ও মন্ডপের দুদিকে ছিল দুটি আয়তাকার পার্শ্বমন্ডপ। যেহেতু মন্দিরে কোন প্রদক্ষিণপথ নেই, তাই এটি নিঃসন্দেহে একটি নিরন্ধর মন্দির।

উলম্বরেখানুসারে মন্দিরটির বিভিন্ন অঙ্গ — মন্দিরটি উলম্বরেখায় তিনটি ভাগে বিভক্ত। নীচের দিক থেকে দেখলে বোঝা যায়, পীঠ, ত্রি-অঙ্গ মন্ডোবর ও শিখর নিয়ে মন্দিরটি গঠিত ছিল।

পীঠ — নীচের দিক থেকে পীঠের মোল্ডিংগুলি হ'ল ভিত্তা, কর্ণিকা, ড্যাড্যকুম্ভ, অন্তরপট্ট, কর্ণিকা, অন্তরপট্ট, গ্রাসপট্টিকা এবং ছজ্জিকা।

ত্রিঅঙ্গ মন্ডোবর — ত্রিঅঙ্গ মন্ডোবর বেদীবন্ধ, জঙ্ঘা ও বরন্তিকায় বিভক্ত। বেদীবন্ধের মোল্ডিংগুলি হল খুরক কুম্ভ, অন্তরপট্ট, চিপ্পিকা, কলস, চিপ্পিকা, অন্তরপট্ট এবং কপোতপালিকা। জঙ্ঘা অংশঠিতে তিনদিকে মধ্যরথে একদা বিশালাকার দেবমূর্তি সমন্বিত কুলুঙ্গী ছিল। জঙ্ঘার মধ্যরথ ভিন্ন অন্যান্য রথগুলি অর্ধস্তম্ভ দ্বারা সুসজ্জিত। এমনকি প্রতি দুটি অর্ধস্তম্ভের মধ্যভাগের সলিলান্তরগুলি স্তম্ভকূটের দ্বারা অলঙ্কৃত।

অন্তরপট্ট এবং কূটছাদ্য।

শিখর — বর্তমানে মন্দিরটির প্রাচীন শিখর সম্পূর্ণ ভগ্ন। উনবিংশ শতকে মন্দিরটিকে বাঁচানোর জন্যে এর গর্ভগৃহের ওপর একটি ইস্লামিক গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। বল্লালেশ্বরের শিখরের সূচনাভাগে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কিছু স্তম্ভকূট আজও স্বস্থানেই বিরাজিত। স্তম্ভকূট ভূমিজ[১] মন্দিরের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ঠ। উনের অন্যান্য মন্দিরগুলিতে, (যেগুলি বল্লালেশ্বরের সমকালীন) ভূমিজ শৈলীর শিখর বর্তমান। মনে হয়, একদা বল্লালেশ্বর মন্দিরটি ভূমিজ শিখর দ্বারা সজ্জিত ছিল।

মন্দিরের অভ্যন্তরভাগের বর্ণনা — বর্তমানে মন্দিরটির মুখমন্ডপ, মন্ডপ ও পার্শ্বমন্ডপ সম্পূর্ণ ভগ্ন। শুধুমাত্র গর্ভগৃহ ও অন্তরাল অটুট।

গর্ভগৃহ — বর্গাকার গর্ভগৃহটির বিশেষত্ব হল, এর উত্তরাদিকের দেওয়ালের অভ্যন্তরে একটি ছোট জলাধারের অবস্থান। বাইরের দেওয়ালে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র নালীমুখ, যার দ্বারা মন্দিরের বাইরে থেকেই ঐ জলাধারে জল ভরা হত। এই জল পূজার্চ্চনায় ব্যবহৃত হত। গর্ভগৃহের উত্তরের দেওয়ালে একটি পাথরের তাক ও পেছনের দেওয়ালে তিনটি কুলুঙ্গী অবস্থিত। ছাদ গম্বুজাকৃতি ও অলঙ্কৃত। ছাদটি অবস্থান করছে কীচক কীচকী শোভিত বারোটি ক্ষুদ্র ব্র্যাকেটের ওপরে। মেঝে এবড়ো খেবড়ো ও সেখানে একটি সাধারণ প্রস্তরখন্ড প্রতিষ্ঠিত, যেটিকে গ্রামবাসীরা শিবলিঙ্গরূপে পূজা করেন। তবে মেঝেতে প্রস্তরনির্মিত অর্ঘ্যটি প্রাচীন। অর্ঘ্যটি উত্তর দেওয়ালের সাথে নালী দ্বারা যুক্ত। নালীমুখটি দেখা যায় বাইরের দিকে, উত্তরদিকে দেওয়ালে।

গর্ভগৃহদ্বার — গর্ভগৃহের দ্বারটি পঞ্চশাখাবিশিষ্ট দুইদিকেই মধ্যশাখে শৈব প্রতিহার মূর্তি অবস্থিত। কিন্তু অন্যশাখাগুলি অপেক্ষাকৃত কম অলঙ্কৃত।

অন্তরাল — অন্তরাল হল গর্ভগৃহ ও মন্ডপের সংযোগ রক্ষাকারী অংশ। এর সমতলপদ্মক ছাদটি আজও অক্ষত। উনের অন্যান্য মন্দিরের (বল্লালেশ্বরের সমকালীন) অন্তরালের ছাদও একইপ্রকার।

মন্ডপ — বর্তমানে সম্পূর্ণ ভগ্ন মন্ডপের মেঝেতে স্বম্ভের নিম্নভাগের চিহ্ন দেখে বোঝা যায় যে একদা এটি চারটি স্তম্ভশোভিত প্রশস্ত কক্ষ ছিল যার দুইদিকে ছিল দুটি পার্শ্বমন্ডপ।

ভাস্কর্য

দেবমূর্তি সংস্থাপন ও মূর্তিতত্ত্ব — মন্দিরের বেদীবন্ধ অংশে কুম্ভ মোল্ডিংএ ক্ষুদ্রাকার কুলুঙ্গীতে বিভিন্ন দেবদেবীমূর্তি সংস্থাপন করা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গণেশ, মহেশ্বরী, চামুন্ডা, বিষ্ণু, কৌমারী। জঙ্ঘা অংশে উত্তর ও পশ্চিম দিকের মধ্যরথে যথাক্রমে চামুন্ডা ও নটরাজের মূর্তি সংস্থাপিত হয়েছে।

দক্ষিণদিকের মধ্যরথটি ভগ্ন, তাই দেবমূর্তি অদৃশ্য। যেহেতু উনের অন্যান্য মন্দিরগুলির দক্ষিণ মধ্যরথে অন্ধকান্তক শিবমূর্তি বর্তমান, তাই মনে হয়, বল্লালেশ্বরের দক্ষিণ মধ্যরথেও অন্ধকান্তক মূর্তি ছিল। জঙ্ঘা অংশে, পশ্চিমে রয়েছে দিকপাল বরুণের মূর্তি। উত্তর উত্তরপশ্চিম রথেও দুটি হস্তপদভগ্ন দেবমূর্তি আছে। একদা জঙ্ঘায় অষ্টদিকপালমূর্তি সংস্থাপিত ছিল।

গর্ভগৃহের দ্বারের ওপরে কেন্দ্রস্থানে অর্থাৎ ললাটবিম্বস্থানে ক্ষুদ্রাকার গণেশমূর্তি বর্তমান। চতুর্হস্ত মূর্তিটি জীর্ণ, তাই আয়ুধ বর্ণনা সম্ভব নয়। গর্ভগৃহের দ্বারের ওপরে সর্দলে গণেশ, বীরভদ্র ও সপ্তমাতৃকা সম্বলিত গণেশ বর্তমান।

বেদীবন্ধের কুম্ভ মোল্ডিংএর দেবদেবীমূর্তি

নাম	ভঙ্গিমা	আয়ুধ		উল্লেখযোগ্য তথ্য
গণেশ	ললিতাসনে আসীন	উচ্চ দক্ষিণ হস্ত	কুঠার	বাহন অনুপস্থিত।
		উচ্চ বাম হস্ত	অস্পষ্ট	
		নিম্ন দক্ষিণ হস্ত	ছুরিকা	
		নিম্ন বাম হস্ত	মোদকভান্ড	
মহেশ্বরী	ললিতাসনে আসীন	উচ্চ দক্ষিণ হস্ত	ত্রিশূল	বাহন অনুপস্থিত।
		উচ্চ বাম হস্ত	সর্প	ইনি জটামুকুটধাবিণী
		নিম্ন দক্ষিণ হস্ত	অভয়মুদ্রা	
		নিম্ন বাম হস্ত	অক্ষমালা	
চামুন্ডা	দ্বিভঙ্গে দন্ডায়মান	উচ্চ দঃ হস্ত	অস্পষ্ট	বাহন অনুপস্থিত।
		উচ্চ বাঃ হস্ত	খট্টাঙ্গ	ইনি জটামুকুটধারিণী
		নিম্ন দঃ হস্ত	অক্ষমালা	
		নিম্ন বাঃ হস্ত	তর্জনী ঠোঁটের কাছে স্থিত	
কৌমারী	ললিতাসনে আসীন	উচ্চ দঃ হস্ত	শূল	ইনি করন্ডমুকুটধারি
		উচ্চ বাঃ হস্ত	অস্পষ্ট	বাহন অনুপস্থিত।
		নিম্ন দঃ হস্ত	বরদামুদ্রা	
		নিম্ন বাঃ হস্ত	অক্ষমালা	

জঙ্ঘায় চামুন্ডা ও নটরাজের মূর্তি

নাম	অবস্থান	ভঙ্গিমা	আয়ুধ	উল্লেখযোগ্য তথ্য
চামুন্ডা	জঙ্ঘায় উত্তর দিকের মধ্যরথে	দ্বিভঙ্গে দন্ডায়মানা	অষ্টহাত প্রত্যেকটি ভগ্ন	ইনি জটামুকুটধারিণী পায়ের নীচে শবদেহ
নটরাজ	জঙ্ঘায়পশ্চিম	উর্দ্ধজানু ভঙ্গীতে	"	ইনি জটামুকুটধারিণী

	দিকের মধ্যরথে	নৃত্যরত।		নীচের অংশ ভগ্ন, তাই বাহন অদৃশ্য।

জঙ্ঘায় দিকপাল বরুণের মূর্তি

নাম	অবস্থান	ভঙ্গিমা	আয়ুধ	উল্লেখযোগ্য তথ্য
বরুণ	জঙ্ঘার পশ্চিমদিক	দ্বিভঙ্গে দন্ডায়মান	উচ্চ দক্ষিণ হস্তে পাশ, অন্য তিনটি হস্ত ভগ্ন	বাহন ছিল বর্তমানে ভগ্ন

গর্ভগৃহদ্বারের ওপরে সর্দলে বীরভদ্র ও গণেশ সহ সপ্তমাতৃকা প্যানেল—

ব্রাহ্মী	মহেশ্বরী	কৌমারী	বৈষ্ণবী	বীরভদ্র	বরাহী	ঐন্দ্রি(?)	চামুন্ডা	গণেশ
উচ্চ দঃ হস্ত সর্প	উচ্চ দঃ হস্ত ত্রিশূল	উচ্চ দঃ হস্ত শূল	উচ্চ দঃ হস্ত চক্র	উচ্চ দঃ হস্ত বীণা	উচ্চ দঃ হস্ত চক্র	উচ্চ দঃ হস্ত বজ্র(?)	উচ্চ দঃ হস্ত খট্বাঙ্গ	উচ্চ দঃ হস্ত কুঠার
উচ্চ বাঃ হস্ত পুস্তক	উচ্চ বাঃ হস্ত সর্প	উচ্চ বাঃ হস্ত অস্পষ্ট	উচ্চ বাঃ হস্ত পদ্ম	উচ্চ বাঃ হস্ত অস্পষ্ট	উচ্চ বাঃ হস্ত পদ্ম	উচ্চ বাঃ হস্ত অস্পষ্ট	উচ্চ বাঃ হস্ত তর্জনী ঠোঁটে স্থিত	উচ্চ বাঃ হস্ত অস্পষ্ট
নিম্ন দঃ হস্ত জলপূর্ণঘট	নিম্ন দঃ হস্ত ঘট	নিম্ন দঃ হস্ত ঘট	নিম্ন দঃ হস্ত ঘট	নিম্ন দঃ হস্ত ঘট	নিম্ন দঃ হস্ত ঘট	নিম্ন দঃ হস্ত ঘট	নিম্ন দঃ হস্ত ঘট	নিম্ন দঃ হস্ত ছুরিকা
নিম্ন বাঃ হস্ত রুদ্রাক্ষমালা	নিম্ন বাঃ হস্ত রুদ্রাক্ষমালা	নিম্ন বাঃ হস্ত রুদ্রাক্ষমালা	নিম্ন বাঃ হস্ত রুদ্রাক্ষমালা	নিম্ন দঃ হস্ত বীণা	নিম্ন বাঃ হস্ত রুদ্রাক্ষমালা	নিম্ন বাঃ হস্ত রুদ্রাক্ষমালা	নিম্ন বাঃ হস্ত রুদ্রাক্ষমালা	নিম্ন বাঃ হস্ত মোদকভান্ড

মন্দিরটি কোন দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ছিল

মন্দিরগর্ভে নটরাজ অন্ধকান্তক, মহেশ্বরীর, প্রাচুর্য ও গর্ভগৃহদ্বারের সর্দলে সপ্তমাতৃকা প্যানেলে কেন্দ্রস্থানে শিব বীরভদ্রের অবস্থান ইঙ্গিত দেয় যে এটি একটি শৈব মন্দির। সম্ভাবনাটি সঠিক প্রমাণিত হয় গর্ভগৃহের মেঝেতে স্থিত অর্ঘ দ্বারা, যেটি প্রাচীন শিবলিঙ্গটির আধার ছিল।

স্থাপয়িতা

উন গ্রামটির সঙ্গে জুড়ে আছে অনেক কিংবদন্তী। প্রচলিত কিংবদন্তীগুলির মধ্যে একটি নাম বারবার শোনা যায়, নামটি হল বল্লাল। নামটি নেহাৎ অনাথ নয়, এর একটি নিশ্চিন্ত আশ্রয় আছে। আশ্রয়টি হল বল্লালেশ্বর মন্দির। মন্দিরগাত্রে একটি প্রায় ক্ষয়ে যাওয়া ও ভগ্ন তারিখহীন লেখতে বল্লাল নামটি পাওয়া যায়। কিংবদন্তী অনুসারে একদা মন্দিরটির স্থাপনা হয়েছিল রাজা বল্লালের হাতে।[২]

মন্দিরের নির্মাণের তারিখ

মন্দিরটির নির্মাণের সময় জানার জন্যে দুটি উপাদান বর্তমান। প্রথম — মন্দিরের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও ভাস্কর্যের শৈলী। উনে পরমারযুগে (আনুঃ ৮০০ - ১৩০৫ খ্রিঃ) বেশ কয়েকটি মন্দির নির্মিত হয়। এদের মধ্যে অন্যতম 'চৌবারা ডেরা' মন্দিরটিতে একটি লেখতে পরমার নৃপতি উদয়াদিত্যের নামোল্লেখ রয়েছে।[৩] উনে পরমারযুগে

নির্মিত মন্দিরগুলি, ও বল্লালেশ্বরের ভিতের নক্সা ,ভাস্কর্য শৈলী ও মন্দিরগাত্রে দেবমূর্তি সংস্থাপনের প্রবণতা হুবহু এক। বল্লালেশ্বর ও অন্য পরমারকালীন মন্দিরগুলির পীঠ, দেবীবন্ধ ও বরন্তিকার মোল্ডিংগুলিও প্রায় একইপ্রকার। তাই মনে হয়, বল্লালেশ্বর পরমার যুগেই নির্মিত হয়।

মন্দিরের নির্মাণকাল জানার দ্বিতীয় উপাদান হল গুজরাট নরেশ কুমারপালের বড়নগর প্রশস্তি ও হেমচন্দ্রের রচনা। ১১৫১ খ্রিস্টাব্দে রচিত বড়নগর প্রশস্তি থেকে জানা যায়, কুমারপাল মালবরাজকে পরাজিত করেন ও তাঁর মস্তক কেটে এনে নিজ প্রাসাদদ্বারে ঝুলিয়ে রাখেন[৪]। আবার, হেমচন্দ্রের রচনায় পাওয়া যায়, কুমারপাল মালবরাজ বল্লালকে পরাজিত করেন। সম্ভবত, বড়নগর প্রশস্তির হতভাগ্য, মালবরাজ ও হেমচন্দ্রের মালবরাজ বল্লাল একই ব্যক্তি। যদি এই অনুমান সত্য হয় তবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না যে বল্লাল ১১৫১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে মালবঅঞ্চলে রাজত্ব করতেন এবং ১১৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বল্লালেশ্বর মন্দির নির্মিত হয়।

ইতিহাস রচনায় বল্লালেশ্বরের গুরুত্ব

যদি চৌবারা ডেরা মন্দিরটি উনে পরমার শাসনের ইঙ্গিত দেয়, তবে বল্লালেশ্বর উনে বল্লালের শাসনের ইঙ্গিত প্রদান করে। এক্ষেত্রে সবথেকে জটিল প্রসঙ্গটি হল বল্লালের শাসনের সম্ভাব্য তারিখ পরমারদের সময়সীমার মধ্যেই পড়ে। ইতিহাস অনুসারে, পরমাররাজ, যশোবর্মণ (১১৩১ খ্রিস্টাব্দ-সিংহসনারোহন) গুজরাট নরেশ কর্তৃক আক্রান্ত হন, ফলত মালবের কিয়দ্বংশে তাঁর অধিকার নষ্ট হয়। সম্ভবত এই সময় তাঁর দুর্বলতার সুযোগে বল্লাল উনে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি গুজরাট নরেশ কুমারপাল দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হন।অর্থাৎ বল্লালেশ্বর মন্দিরটি একাধারে পরমারদের ক্রমাবনতির ইতিহাস, বল্লালের উত্থান ইতিহাস ও তৎপ্রসঙ্গে উনের ইতিহাসে রাজনৈতিক উত্থান পতনের ইঙ্গিত প্রদান করে।

উনে শৈবধর্ম যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল, বল্লালেশ্বর মন্দির তার প্রমাণ। বল্লাল যে শিবের উপাসক ছিলেন, তাতেও সন্দেহ নেই।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

1. **Krishna Deva** – 'Bhumija Temples' Studies in Indian Temle Architecture; University of Chicago, 1975, P-

2. **A. Cumingham** – Tours in Bundkhand and Malwa in 1874-75 & 1876-77; Varanasi; 1966; Vol-X ; P- 67

3. **H. V. Trivedi** – Corpus Inscriptionum Indicarum; Inscriptions of the Paramaras ; Vol- VII ; Part- 2, New Dehli ; 1978 , P-1989

4. **A . K. Majumdar** -- Chalukyas of Gujrat ; Bombay ; 1956 ; P- 111

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. **Rakhaldas Banerjee** – Progress Report of the Archeological Survey of India, Western Circle; 1918-1919,

2. **M.D. Khare** – 'Un An Important Centre of Paramara Art and Architecture ; Art of the Paramaras of Malwa , Delhi,

3. **M.A. Dhaky , Meister** – Encyclopedia of Indian Temple Architecture, North India, Beginings of Medieval India; Vol- II. Part- 3 , 1998 .

4. J. N. **Banerjee** – The Development of Hindu Iconography, New Delhi , 1985

খিজিঙ্গকোট্টের শৈব ভাস্কর্য (আঃ ১০ম খ্রিঃ)

রাজশ্রী মুখোপাধ্যায়

উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার উত্তরপশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত খিচিং নামক গ্রামটি ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মতিক্রমে প্রাচীন ভঞ্জ রাজ্য খিজিঙ্গমণ্ডলের রাজধানী খিজিঙ্গ কোট্টরূপে শনাক্ত হয়েছে। খিচিংয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে প্রচুর পরিমাণে ভাস্কর্য ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে।[১] প্রাক-স্বাধীনতা যুগে সেখানে ময়ূরভঞ্জ রাজদরবারের উদ্যোগে তিনটি মন্দির তাদের প্রাচীন ভিত্তির উপর উড়িষ্যা শিল্পশাস্ত্রানুসারে পুনর্নির্মিত হয় এবং প্রধান মন্দির প্রাঙ্গণে একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করে তাতে প্রমাণ আকারের মূর্ত্তিগুলি সংরক্ষিত করা হয়। এই গবেষণা পত্রের আলোচনার বিষয় হল, সংগ্রহশালার সংরক্ষিত ও মন্দিরগাত্রে পুনস্থাপিত শৈব ভাস্কর্য এবং তাদের আলোকে ভঞ্জরাজবংশের ধর্মীয় সামাজিক ইতিহাস।

খিচিংয়ের শৈব ভাস্কর্যের আলোচনার প্রথমেই আসবে প্রমাণাকারের হরমূর্তিটির কথা। এটি ভাস্কর্যের এক অনুপম নিদর্শন। এই মূর্তিটির উচ্চতা ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি। খিচিংয়ের বেশিরভাগ ভাস্কর্যের মত এটিও নীলচে ধূসর ক্লোরাইট পাথর দ্বারা নির্মিত। ১৯২২-২৩ সালে উৎখননের প্রথম পর্যায়ে এটি আবিষ্কার হয়। এর প্রভামণ্ডলে নিপুণ সূক্ষ্ম ফুল লতা-পাতার নক্শা রয়েছে। মাথায় জটা মুকুট। মুখমণ্ডল এক অনির্বচনীয় প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত। যদিও শৈলী ও ভঞ্জ লেখসমূহে প্রাপ্ত তারিখের ভিত্তিতে খিচিংয়ের ভাস্কর্যগুলিকে প্রধানত দশম শতাব্দীর কাজ বলে চিহ্নিত করা হয়, তবু এর অর্ধনিমিলিত চোখে ও ভ্রু, নাসিকা ইত্যাদির সুচারু তক্ষণে এই মূর্তিটিকে অনায়াসে গুপ্ত শৈলীর ভাবগত উত্তরসূরী বলা চলে। কুণ্ডল কণ্ঠহার ইত্যাদি রত্নালঙ্কারে ভূষিত চতুর্ভুজ এই হর মূর্তিটি, শৈব মূর্তির নিয়ম মেনেই উর্ধ্বলিঙ্গ। বাঁ হাত দুটিই ভাঙা। ক্ষতিগ্রস্ত দুটি ডান হাতের একটিতে বরদা মুদ্রা এবং অন্যটিতে অক্ষমালা। বাঁদিকে ত্রিশূলের মুখের ভাঙা অংশ রয়েছে এবং দণ্ডটি লোহার রড দ্বারা প্রতিস্থাপিত। ডানপাও ভাঙা এবং তামার রডদিয়ে বেদীর সঙ্গে যুক্ত। হরের দু দিকে, দুই নারী মূর্তি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় এবং পায়ের নীচে বাধ্য বাহন নন্দী হাঁটু মুড়ে বসে। সমগ্র মূর্তিটি পরিপাট্য বিন্যাস লক্ষনীয়। এমনকি বাহন নন্দীর গলকম্বল ও গলার ঘণ্টা ওই স্বল্প পরিসরে নিখুঁত ভাবে খোদিত হয়েছে।

এখানে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রি অনুযায়ী এই ধরণের মূর্তি শিবের হর রূপের প্রকাশক। সেখানে হর মূর্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—

"ত্রিশূলধৃকতথা বামে, বরদো দক্ষিণেনতু।"[২]

অষ্টম শতকীয় পাহাড়পুরের প্রস্তর ভাস্কর্যে অনুরূপ একটি প্রতিমা পাই, যার দক্ষিণ হস্তে বরদা মুদ্রা ও বাম হস্তে শোভা পাচ্ছে ত্রিশূল।[৫]

এই হর মূর্তির থেকে সামান্য ছোট কিন্তু হুবহু একই ধারায় নির্মিত দুটি শৈব মূর্তি পাই। সেগুলি হল চণ্ড ও প্রচণ্ডের। এই দুটি মূর্তিই শিবের উগ্র বা ঘোর রূপের প্রতীক। আগমশাস্ত্র অনুযায়ী শিবের ৬৪ জন ভৈরব বর্তমান যাঁরা আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতিটি শ্রেণী ৮ জন প্রধান ভৈরবের নামে সূচিত এবং চণ্ড এই অষ্ট ভৈরবের অন্যতম।[৬] সাধারণভাবে ভৈরব মহাদেব ভয়ালদর্শন, বিস্রস্ত কেশ, মুণ্ডমালাপরিহিত বিকৃত মুখগহ্বর ও কপালধারী হন। কিন্তু খিচিংয়ের চণ্ডমূর্তির হাতে কপাল থাকলেও, মাথায় সুবিন্যস্ত জটামুকুট ও মুখের ভাব প্রশান্ত। বাঁদিকের একটি হাত ভাঙা, অপরটিতে কপাল। ডান দিকের পিছনের হাতে অক্ষমালা, সামনের হাত ভাঙা। এই মূর্তিটিও হরের মতই এক চালা। এরও প্রভামণ্ডলে সূক্ষ্ম নক্শা চালচিত্রের দুই কোণায় মালা হাতে উড্ডীয়মান গন্ধর্ব ও লম্বালম্বি ভাবে চালচিত্রের দুধারে পালযুগের প্রতিমার মত ঘন সন্নিবদ্ধ নক্শা। মূর্তিটি বিশ্বপদ্মের উপর দণ্ডায়মান ও তার পাদদেশের দুইধারে পূর্ণঘট ধারিণী দুই নারী মূর্তি খোদিত আছে।

প্রচণ্ড মূর্তিটিও ভৈরব শিবের মূর্তি। হর এবং চণ্ডের মূর্তির মত এটিও বৃহদাকার একচালা, প্রভামণ্ডলে সূক্ষ্ম ফুললতাপাতার নক্শা সমন্বিত। মুখের ভাব গম্ভীর ওষ্ঠের দুই ধারে দুটি দন্ত বিকশিত হয়ে আছে। প্রচণ্ড মূর্তির চোখও ধ্যানে অর্ধ নিমীলিত এবং কানে কুণ্ডল। তবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এঁর মুখে শশ্রুগুম্ফের উপস্থিতি। প্রচণ্ডের হাতগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত। বাঁ হাতে ভাঙা দণ্ড ও অক্ষমালা রয়েছে। দণ্ডের মাথায় করোটি খোদিত রয়েছে। ডান দিকে ডমরু খোদিত আছে। সামনের ডান হাতে কপাল। এই শৈব মূর্তিটিও বিশ্বপদ্মের উপরে দণ্ডায়মান এবং এর পাদদেশের দুপাশে ত্রিভঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে দুই পুরুষ মূর্তি।

হর. চণ্ড, প্রচণ্ডের তিনটি সমগোত্রীয় মূর্তি ছাড়া, সংগ্রহালয়ে তিনটি সমগোত্রীয় উমা মহেশ্বর মূর্তি দেখা যায়। এই মূর্তিগুলির আসন, লাঞ্ছন, মুদ্রা, বাহন সবই এক— শুধু আকারের ও চালচিত্রের নকশার পার্থক্য রয়েছে। শিব এখানে চতুর্ভুজ ও বিশ্বপদ্মদলে ললিতাসনে আসীন। উমা দ্বিভুজা। তার বাঁ হাতে দর্পণ এবং ডান হাত প্রসারিত মহেশ্বরের কাঁধের উপর দিয়ে। মহেশ্বর একটি হাত দিয়ে উমার স্তন স্পর্শ করে আছেন, একটি হাতে পদ্মকলি, একটি হাতে ত্রিশূল এবং চতুর্থ হাত দিয়ে উমার চিবুক স্পর্শ করে সানুরাগ প্রণয়ের দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখদর্শন করছেন। পায়ের তলায় দুই জনের বাহন, বৃষ ও সিংহ রয়েছে। একে অপরে নিমগ্ন দেবদম্পতিকে মানব দম্পতিরই প্রতিরূপ মনে হয়। বৃহদীশ্বর, কোসাম ও বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত[৭] উমামহেশ্বর মূর্তিগুলির থেকে খিচিংয়ের এই মূর্তিগুলি কোন অংশে কম নয়।

খিচিংয়ের প্রাপ্ত অবশিষ্ট শৈব মূর্তিগুলির অন্তর্গত হল একপাদমূর্তি ও লকুলীশ মূর্তি। একপাদ বা অজৈকপাদ একাদশ রুদ্রের অন্যতম এবং উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশের দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মন্দিরভাস্কর্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। খিচিংয়ের প্রধান মন্দির, খিজিঙ্গেরশ্বরীর মন্দির গাত্রে লকুলীশের মূর্তি চোখে পড়ে। আদিতে মানুষ ও শৈবগুরু এবং পরে দেবায়িত ও শিবের আঠাশতম অবতার রূপে কল্পিত, লকুলীশ মহাদেবের বিগ্রহরূপেই পূজিত হন। তাঁর মধ্যে শিক্ষক বা আচার্য সত্তাই প্রধান।[৬]

মহাভারতের শান্তিপর্ব, গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে ৩৮০-৩৮১ খ্রিঃ রচিত একটি লেখ এবং রাজস্থানের উদয়পুরের কাছে মন্দিরগাত্রের এক লেখ (৯৭১ খ্রিঃ) লকুলীশের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মত হল লকুলীশ খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে পূর্বপ্রচলিত শৈব মত ও আচার অনুষ্ঠানসমূহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও পুনর্গঠিত করেন ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমত পাশুপত নামে খ্যাত।

সুস্পষ্টভাবে শৈব এই ধরণের মূর্তি ছাড়াও, একটি অতি সুন্দর অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আছে খিচিংয়ে। এটি শৈব ও শাক্তধর্মের সমন্বয়ের প্রতীক। শিল্পশাস্ত্র শিল্পরত্ন[৭] এর মতে অর্ধনারীশ্বরের মূর্তির দক্ষিণভাগে শিবের প্রতিমালক্ষণ এবং বামভাগে পার্বতীর প্রতিমালক্ষণ থাকবে, বেদীমূলে তাঁদের বাহনের মূর্তি সহ। খিচিংয়ের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, যার চারটি হাতই ভাঙা, শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে নির্মিত। এটিও আকারে বৃহৎ (৫ ফুট ৫ ইঞ্চি লম্বা) এবং হর, চণ্ড, প্রচণ্ডের মূর্তির মত একই ধরণের নিপুণ সূক্ষ্ম কাজের সাক্ষ্য বহন করে। এই ঘরানার একটি অপূর্ব নটরাজ মূর্তির বর্ণনাও ছবি পুরনো রিপোর্ট ও গেজেটিয়ারে পাওয়া যায়।[৮] তবে আশ্চর্যজনকভাবে সেই মূর্তিটি বর্তমান গবেষিকার ক্ষেত্রানুসন্ধানের সময় খিচিং, বারিপদা অথবা ভুবনেশ্বর সংগ্রহালয় কোথাও চোখে পড়েনি! সেটি কার্যত একটি নটরাজ মূর্তির ভগ্নাংশ ছিল। সর্বাধিক আকর্ষণীয় ছিল বাহন বৃষের রূপায়ণ। বেদীমূল থেকে সে মুগ্ধ বিস্ময়ে একটি পা তুলে প্রভুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুখ তুলে। তার শরীরেও শিবের মহানৃত্যের ছন্দ। বাহন ছাড়াও নটরাজের বেদীমূলে চোখে পড়ে বাদ্যরত কিছু কীচক মূর্তি। এই প্রমাণাকারের মূর্তিগুলি ছাড়াও মন্দিরগাত্রের জঙঘাতে, পাভাগে শৈব যোগীর বিভিন্ন ভঙ্গিমার রিলিফ চোখে পড়ে। কখনও বা সে মৈথুন রত, কখনও শিক্ষাদানে ব্যস্ত কখনও শুধুমাত্র ত্রিশূল ও কমণ্ডুল হাতে দণ্ডায়মান।

শৈব ভাস্কর্যের এই আধিপত্যের কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি আমরা ভঞ্জরাজাদের বিভিন্ন লেখের দিকে চোখ ফেরাই। যেমন রণভঞ্জদেবের বামনঘাটি তাম্রশাসন, খণ্ডদেউলি তাম্রশাসন, নরেন্দ্রভঞ্জদেবের আদিপুর তাম্রশাসন, শত্রুভঞ্জদেবের কেশরি তাম্রশাসন ইত্যাদি।[৯]

প্রায় প্রত্যেকটি তাম্রশাসনই আরম্ভ হচ্ছে শিবের বন্দনা করে, তাঁর প্রতি ভক্তি

নিবেদন করে। যেমন বামনঘাটি তাম্রশাসনের শুরুতে পাই—

"ওঁঃ স্বস্তি।। ... সকল ভুবনৈকনাথ ভবভয় বিদুর

ভবভবানীশ বিবিধসমাধিবিধিজ্ঞ সর্বজ্ঞঃ শিবাস্তু।।"

অর্থাৎ, সকল ভুবনের একমাত্র নাথ, যিনি ভবভয় দূর করেন, যিনি ভবানীর নাথ, বিভিন্ন ধরণের বিদ্যার অধিকারী সেই সর্বজ্ঞ শিবকে প্রণাম। উড়িষ্যা সংগ্রহশালার তাম্রশাসনে রণভঞ্জ নিজেকে "পরম মহেশ্বর" রূপে বর্ণনা করেছেন। সিঙ্গারা বা শোনপুর তাম্রশাসনেও ওই একই অভিধা পাই। বামনঘাটি তাম্রশাসনে রণভঞ্জদেব নিজেকে "খিজিঙ্গকোট্টবাসী" রূপে বর্ণনা করেছেন এবং আরও বলেছেন যে শিবের চরণ আরাধনার ফলে তার পাপ দূরীভূত হয়েছে "হরচরণারাধনা ক্ষয়িতপাপঃ।" [১০] যে আরাধ্য দেব 'হর'-র তিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁরই মূর্তি খিচিং সংগ্রহালয়ে রয়েছে এবং তার বিশদ বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। লেখের অন্তর্গত প্রমাণ ছাড়াও সব কয়টি লেখের উপরিভাগে একটি তামার সীলমোহর বিদ্যমান, যাতে একটি অর্ধচন্দ্র, বৃষ ও ত্রিশূলের রিলিফ, লেখ প্রদানকারী রাজার নামের সঙ্গে মুদ্রিত আছে।

অতএব প্রতিমাতাত্ত্বিক প্রমাণও ভঞ্জবংশীয় তাম্রশাসন থেকে প্রাপ্ত প্রমাণে একথা স্পষ্ট যে ভঞ্জ রাজারা শিবের উপাসক ছিলেন এবং তাঁদের রাজত্বে নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে খিচিংএ শৈব ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু খিচিংয়ে তো শুধু শৈব ভাস্কর্য নয়, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর, বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তিও পাওয়া গেছে। অতএব একথাও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে খিচিংয়ের ভঞ্জরাজারা একান্তভাবে শৈব হলেও, তাঁদের কোনো গোঁড়ামি ছিল না। অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় তাদের স্বীয় ধর্মের চর্চা করে গেছেন পাশাপাশি এবং মিশ্রণও ঘটেছে। যেমন, শৈব, শাক্ত ও তন্ত্রের সমন্বয়। এই সংযোগের পরিচয় খিচিং ভাস্কর্যে স্পষ্ট।

এখন শিবের পূজা কত প্রাচীন, উড়িষ্যা এবং ময়ূরভঞ্জের প্রেক্ষিতে তার অবস্থান কি, এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে মূলত অবৈদিক দেবতা শিব এই উপমহাদেশে প্রাক্-হরপ্পীয় যুগ থেকে উপাসিত হয়ে এসেছেন।[১১] ময়ূরভঞ্জেও প্রথমে লিঙ্গপ্রতীকের মাধ্যমে পরে মূর্তির দ্বারা তাঁর উপাসনার ঐতিহ্য বহু প্রাচীন।[১২] শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহীর মতে উড়িষ্যায় পঞ্চম শতাব্দী থেকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাসপায় ও শৈবধর্মের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।[১৩]

পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তরভারতকে কেন্দ্র করে গুপ্ত রাজাদের অধীনে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে পুনঃজাগরণ ঘটেছিল, উড়িষ্যাও সেই বৃহত্তর পরিবর্তনের আওতাতেই পড়ে। তবে উড়িষ্যায় শৈব ধর্মই প্রধান ধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং ভৌমযুগে (আনুঃ ৭৩৫ খ্রিঃ - ৯৩০ খ্রিঃ) পাশুপত গোষ্ঠীর উত্থান হয়। আগেই বলা হয়েছে যে লকুলীশ ছিলেন প্রথম পাশুপত প্রচারক। ভুবনেশ্বরের বেশ কিছু মন্দিরে ধর্মচক্রমুদ্রায়, লকুট

সহ লকুলীশের মূর্তি পাওয়া গেছে। এখন খিচিংয়ের মন্দিরগাত্রে প্রাপ্ত লকুলীশের মূর্তি প্রমাণ করে যে—খিচিংএ পাশুপত শৈব ধর্মের প্রচলন ছিল। এর সমর্থন মেলে খিচিংয়ের থেকে—৬৫ কিমিঃ দূরে সিতাভিঞ্জি ও দেঙ্গাঁপোসি পার্বত্য গুহায় শৈব সাধুর বসবাসের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের মাধ্যমে। এই শৈব সাধুদের উপাসনার বস্তু ছিল একটি মুখলিঙ্গম, যা এখনও সেখানে রয়েছে। প্রস্তর লেখমালায় বর্ণিত উপাসনাবিধি থেকে বোঝা যায় যে সিতাভিঞ্জির শৈব সাধুরা পাশুপত মতাবলম্বী ছিলেন।

খিচিংয়ের মন্দিরের রিলিফগুলি খুঁটিয়ে দেখলে চোখে পড়ে যে সেখানে শুধুমাত্র শৈব, পাশুপত নয়, শাক্ত ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাবও রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের অদ্ভুত মিশ্রণ ও সহাবস্থানের অন্যতম উদাহরণ হল খিচিংয়ের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। এই মিশ্রণ ভৌম যুগের বৈতাল দেউলেও চোখে পড়ে। যদিও তা শাক্ত মন্দির তবু তাতে শৈব ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন মূর্তির রিলিফ দেখা যায়।

খিচিং থেকে মাত্র ৫ কিমি দূরে আদিপুর গ্রামের কাছে এগারটি শিবলিঙ্গ পূজিত হতো।[১৪] স্থানীয় ভাবে তাদের 'একাদশ' রুদ্র বলে অভিহিত করা হয়, যদিও এখন সেই এগারটি মন্দিরের কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু বারিপদা সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত অজৈকপাদ মূর্তিটি এই একাদশ রুদ্রের পূজার সাক্ষ্য বহন করে। একাদশ রুদ্রের অন্যতম হল অজ এবং একপাদ। এদের মিশ্রিত রূপ হল অজৈকপাদ। সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশে একপাদমূর্তির বিশেষ প্রচলন ছিল। এছাড়াও ক্ষেত্রানুসন্ধানের সময় বর্তমান গবেষিকা শিবলিঙ্গ উপাসিকার একাধিক রিলিফ দেখতে পেয়েছেন বৈতরণী নদী তীরে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা 'হিরো স্টোনে'। এগুলি বীরভঞ্জ রাজাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ক্ষুদ্র স্মৃতিস্তম্ভ।

তাই উপরোক্ত মূর্তিতাত্ত্বিক আলোচনা, তাম্রশাসনের প্রমাণ ও অন্যান্য গবেষণার আলোকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বর্তমানে খিচিংয়ের যে প্রধান মন্দির, তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডা হলেও, খিচিং শৈব সাধনার ক্ষেত্র ছিল। পাশুপত ধর্মের পাশাপাশি যেখানে একাদশরুদ্র, বিশেষ করে অশৈকপাদ পুজিত হতেন। শৈবধর্মের সাথে শাক্ত ও তান্ত্রিক ধর্মের সমন্বয়ের ইঙ্গিতও আমরা বিভিন্ন রিলিফ বা মূর্তি থেকে পাই। শৈবধর্মের অবৈদিক চরিত্রের সাথে, সহজেই আদিবাসী লোকাচারের মিশ্রণ ঘটেছিল এবং খিচিং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের আক্রমণের সময় পরিত্যক্ত হলেও[১৫] সেখানের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে শৈব আচার অনুষ্ঠানের রেশ রয়ে যায় যে কারণে শিবরাত্রি আজও খিচিংয়ের সবচেয়ে বড় উৎসব।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ্ দ্য আর্কিওলিজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ১৯২২-২৩, ১৯২৩-২৪, ১৯২৪-২৫।
২। *হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রি*, আদিকাণ্ড, ২৯, ৪ খ - ৫ক।
৩। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, *প্রতিমা শিল্পে হিন্দুদেবদেবী*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ৫৫।
৪। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি-প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট, ইতিহাস গ্রন্থমালা - ৫, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ১৫৬।
৫। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭।
৬। তদেব, পৃঃ ৮৯; নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৫।
৭। শিল্পরত্ন, সম্পাদনা-গণপতি শাস্ত্রী, ত্রিবান্দ্রম, ১৯২২।
৮। সেনসাস অফ ময়ূরভঞ্জ স্টেট, ১৯৩১, ভল্যুম - ১ রিপোর্ট, (মুদ্রিত - কলকাতা - ১৯৩৭); রমাপ্রসাদ চন্দ, "আর্ট ইন্ ওড়িশা" জার্নাল অফ দ্য রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ আর্টস", লণ্ডন, ১৯৩৪, চিত্রাবলী।
৯। স্নিগ্ধা ত্রিপাঠি সম্পাদিত 'ইনস্ক্রিপশনস্ অফ উড়িষ্যা', খণ্ড - ৪, উড়িষ্যা স্টেট মিউজিয়াম, ভুবনেশ্বর, প্রকাশিত।
১০। তবেদ; জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, খণ্ড - XL ১৮৭১, পৃঃ ১৬৫ - ৬৬।
১১। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২; নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৩।
১২। নগেন্দ্রনাথ বসু, অ্যান আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ময়ূরভঞ্জ, ১৯১১, পৃঃ ২৫।
১৩। কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী, হিস্ট্রি অফ উড়িষ্যা, কিত,ব মহল, কটক, ১৯৮১, পৃঃ ৩১৩।
১৪। উড়িষ্যা ডিস্ট্রিকট্ গেজেটিয়ার - ময়ূরভঞ্জ, সেনাপতি ও সাহু সম্পাদিত, ১৯৬৭, পৃঃ ৪৫৭।
১৫। অর্জুন যোশী, হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অফ খিজ্জিঙ্গকোট্ট, বিকাশ, নিউ দিল্লী, ১৯৮৩, পৃঃ ৪।

মৌর্যকালীন চন্দ্রকেতুগড়

গৌরীশংকর দে

মৌর্যযুগ ভারত ইতিহাসের এক জ্যোতিচিহ্ন। মৌর্য সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের প্রথম শক্তিমান সাম্রাজ্য। মৌর্যশ্রেষ্ঠ অশোক যুদ্ধ বর্জন করে অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রীর পথে বিশ্বজয়ের যে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন তা আজও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার, নগরভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নতুন প্রকাশ প্রভৃতি নানা দিক থেকেই মৌর্যকাল স্মরণীয়।

মৌর্য আমলেই গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগরায়ন শুরু হয় [১]। গড়ে ওঠে পুণ্ড্রবর্ধন, কোটিবর্ষ, তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রকেতুগড় ইত্যাদি নগর। বিভিন্ন নদ-নদীর নাব্যতা, সুষ্ঠু, যাতায়াত ব্যবস্থা, কৃষি, কারিগরী শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি, শাসনকেন্দ্র ও সেনাবাস স্থাপন ইত্যাদি কারণে এই নগরায়ন ঘটেছিল[২]।

উৎখননের ফলে চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসস্তুপে দেখা গেছে জনবসতির ছয়টি কালস্তর। এই ছয়টি স্তরেই উদ্ভাসিত হয়েছে ছয়টি কালপর্বের সাংস্কৃতিক ধারা। প্রাচীনতম স্তরটি প্রাক্ মৌর্য যুগের। প্রথম স্তরের দ্বিতীয় পর্যায়ে আবিষ্কৃত হয়েছে মৌর্য যুগের লোকবসতির নানা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন[৩]। চন্দ্রকেতুগড়ে নগর বেষ্টনকারী প্রাচীরের ভগ্নাবশেষের কাছে ধানক্ষেতে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তের ফুট এবং জলের স্তরের এক ফুট নিচে পর-পর সাজানো মাটির গোল পাইপের একটি পয়ঃপ্রণালী আবিষ্কৃত হয়। এর গতি পূর্বদিকে। নগরের সমৃদ্ধির কালে মৌর্যযুগে এর ব্যবহার হত [৪]। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মধ্যভাগে ক্রীট দেশের রাজা নোসাস-এর রাজপ্রাসাদে এই ধরণের মাটির গোল পাইপ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ইউরোপ মহাদেশে এটিই হল প্রাচীনতম পয়ঃপ্রণালী[৫]। দেবপ্রসাদ ঘোষ নিশ্চিত যে চন্দ্রকেতুগড়ের পয়ঃপ্রণালী নিঃসন্দেহে মৌর্য আমলের কারণ উৎখননের ফলে এর সঙ্গে পাওয়া গেছে উত্তর ভারতীয় কালো মৃত্তিকা পাত্রের ভগ্নাংশ[৬]।

চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে আহবিত হয়েছে অসংখ্য উত্তর অঞ্চলের কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ মৃৎ পাত্র (Northern Black Pottery)। মৌর্য শুঙ্গ যুগে ব্যবহৃত এই পাত্রগুলি মৌর্যকালীন অন্যান্য প্রত্নস্থলেও দেখা গেছে। যেমন—অহিচ্ছত্র, কোশাম্বী, রাজঘাট, পাটলিপুত্র, বৈশালী, রাজগীর প্রভৃতি।[৭] এই শ্রেণীর পাত্রের ব্যবহারকাল খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-২০০ অব্দ। মনে হয় মৌর্যযুগে চন্দ্রকেতুগড়ে উন্নত ধরণের মৃৎশিল্পের কোনো কারখানা ছিল।[৮]

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রকেতুগড় পরিদর্শন করতে গিয়ে একটি কালো ক্লোরাইট পাথরের ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'স্তম্ভটিতে

সুন্দর পালিশ আছে এবং এই পালিশ দেখিতে অশোকের স্তম্ভগুলির পালিশের মত'।[৯] বর্তমান লেখক চন্দ্রকেতুগড় থেকে একটি ক্ষুদ্রাকার কিন্তু সম্পূর্ণ অতি মসৃণ (যা মৌর্য যুগের বৈশিষ্ট্য) প্রস্তরস্তম্ভ সংগ্রহ করেছেন। প্রবাসী অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তীর মতে নিদর্শনটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে নির্মিত।[১০] এর ব্যবহার অজ্ঞাত। রাখালদাস চন্দ্রকেতুগড় থেকে একটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ শীলমোহরও সংগ্রহ করেন। [১১] "শীলমোহরটি ছোট ও বহুমূল্য, হরিদবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত"। এই শীলমোহরে তিনি দেখেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে উত্তর ভারতে প্রচলিত ব্রাহ্মী বর্ণমালার 'ঘ' হরফটি।[১২]

চন্দ্রকেতুগড়ের সঙ্গে মৌর্য যুগের সংশ্রবের নিশ্চিত প্রমাণ এখানে আবিষ্কৃত Ring Stone [১৩] অমূর্ত প্রতীকের মাধ্যমে মাতৃদেবতার অর্চনার নিদর্শন হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।[১৪] জন মার্শাল ছিদ্রবিশিষ্ট বৃত্তাকার ও ক্ষুদ্র ও অপেক্ষাকৃত, বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডগুলিকে যোনিপ্রতীক বলে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন।[১৫] তক্ষশিলা, কৌসাম্বী, রাজঘাট, পাটনা প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ খননকার্যের মাধ্যমে মৌর্য শুঙ্গ যুগের উপরোক্ত নিদর্শন উদ্ধার করেছেন। এদের প্রত্যেকটি নরম প্রস্তর (stealitc) বা বালুকা-প্রস্তরে (sand stone) নির্মিত, বৃত্তাকার, মধ্যে ছিদ্র বা নাতিগভীর গোলাকার গর্তবিশিষ্ট। এদের উপরিভাগে বা কোনটির মধ্যস্থ ছিদ্রগাত্রে নগ্ন মাতৃকামূর্তি ও বৃক্ষাদির চিত্র উৎকীর্ণ। উত্তর ভারতের প্রাচীন গান্ধার থেকে পাটলিপুত্র অবধি বিভিন্ন প্রাচীন স্থান থেকে মৌর্য বা মৌর্য শুঙ্গ যুগের এই ধরণের নির্দশন আবিষ্কৃত হয়েছে।[১৬] নিদর্শনগুলি মাতৃশক্তি বা উর্বরতার দেবী সংক্রান্ত ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত পূজ্য বস্তু (votive objects) মনে করা যেতে পারে।[১৭] বস্তুগুলি ধর্ম ও শিল্পের মধ্যেকার অন্তরঙ্গ সম্পর্কেরও উদাহরণ।[১৮] যতদূর জানা গেছে, এ যাবৎ সমগ্র বঙ্গদেশে মাত্র দুটি প্রত্নস্থল থেকে ring stone বা প্রস্তর বলয় আবিষ্কৃত হয়েছে। এই দুটি স্থান হলো মহাস্থানগড় (প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন যেখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে মৌর্য যুগের ব্রাহ্মী হরফে লিখিত খণ্ডিত প্রস্তর-লিপি) ও চন্দ্রকেতুগড়। চন্দ্রকেতুগড় থেকে যে ভগ্ন প্রস্তর বলয় পাওয়া গেছে তা মথুরায় প্রচলিত লাল পাথরে তৈরি। বলয়টিতে দেখা যায় দণ্ডায়মান নগ্ন মাতৃমূর্তি। তাঁর দুই পাশে দুটি তাল গাছ ও দুটি ধাবমান অশ্ব। এখানে মাতৃদেবী সম্ভবত জায়মান বিশ্ব, তার উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের রক্ষয়িত্রী ও পালিকা দেবী। উপরোক্ত স্থান থেকে পোড়া মাটিরও অসংখ্য বলয় পাওয়া গেছে।

উৎখননে দ্বিতীয় কালস্তরে (আঃ ৪র্থ-৩য় খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) চিহ্ন যুক্ত রূপার মুদ্রা ও ঢালাই মুদ্রা চন্দ্রকেতুগড় থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এর সঙ্গে একই স্তর থেকে পাওয়া গেছে কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ পাত্র।[১৯] সম্ভবত মৌর্যযুগে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে বঙ্গ দেশে অর্থনৈতিক কারণে চিহ্নযুক্ত মুদ্রা (punch marked coin) প্রথম প্রচলিত হয়।[২০]

চন্দ্রকেতুগড় থেকে ২৭০টি রৌপ্য চিহ্নযুক্ত মুদ্রা ভর্তি একটি মাটির পাত্রের আবিষ্কার এই ধারণাকে দৃঢ় করে। মুদ্রাগুলির সঙ্গে প্রাপ্ত একটি শীলমোহরের লিপি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের।[২১]

মৌর্য সাম্রাজ্যের এক শ্রেণীর দুষ্প্রাপ্য রজত মুদ্রার সোজা দিকে তিনটি মানুষের চিত্র, পাহাড়ের ওপর একটি ময়ূরের চিত্র।[২২] এই ধরণের একটি মুদ্রা বর্তমান লেখক চন্দ্রকেতুগড় থেকে পেয়েছেন। [২৩] ডি. ডি. কোশাম্বী তাঁর মুদ্রা বিষয়ক গ্রন্থে বিভিন্ন মৌর্যরাজগণের মুদ্রা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এক শ্রেণীর প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রায় (যোগচিহ্ন যুক্ত) ত্রিচুড় পর্বতে বিস্তৃতকলাপ ময়ূর উৎকীর্ণ দেখা যায়। কোশাম্বীর মতে সম্রাট বিন্দুসার এই ধরণের মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন।[২৪] চন্দ্রকেতুগড় থেকে এই শ্রেণীর একটি দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে।

চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে কয়েকটি টেরাকোটা মূর্তি যা লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত টেরাকোটা মূর্তির স্বগোত্রীয়, সদৃশ ও নিশ্চিতভাবে মৌর্যকালীন। [২৫] টেরাকোটা মূর্তিগুলি দুই শ্রেণীর—ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মীয় মৌর্যকালীন টেরাকোটা মূর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য এক ধরণের মানবী-সর্পিণী মূর্তি।[২৬] ৮ সেন্টিমিটারের মূর্তিটির উপরের দিকটি ছুঁচালো, সাপের মাথার মতো। ছোট দুটি বিন্দু দিয়ে চোখ তৈরি। মূর্তির নীচের দিকটি মানবীর। এই ধরণের নিদর্শন শোনপুর, কৌশাম্বী ইত্যাদি প্রত্নস্থল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। উপরোক্ত স্থানগুলির নিদর্শনের মতো চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত নিদর্শনও (মানবী-সর্পিনী) মৌর্যকালীন।

চন্দ্রকেতুগড় থেকে এমন কয়েকটি অপরূপ টেরাকোটা নারী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যা পাটলিপুত্রে আবিষ্কৃত মূর্তি সদৃশ। মৌর্য টেরাকোটা শিল্পের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই মূর্তিগুলিতে উপস্থিত। এদের মুখ মাটির ছাঁচে তৈরি। দেহ, পরিধেয় ও অলঙ্কার হাতে মাটি টিপে তৈরি।

বর্তমান লেখক চন্দ্রকেতুগড় থেকে একটি অসাধারণ টেরাকোটা নারী মূর্তি সংগ্রহ করেছেন। দণ্ডায়মানা মূর্তিটির ঘাঘরা জাতীয় পরিধেয়। হাতে একটি কপোত। ত্রি-মাত্রিক মূর্তিটির শিরসজ্জা গোল চাকতির মতো।[২৭] এই ধরণের মূর্তি প্রথম দেখা যায় হরপ্পা মোহেন-জো-দড়োতে। এই শিল্পধারার শেষ বিশিষ্ট নিদর্শন মৌর্য যুগের। পরবর্তীকালে এই ধরণের নারীমূর্তি আর পরিলক্ষিত হয় না। মূর্তিটি পূর্ণাঙ্গ (in the round, ১৪ × ৭ সেমি.) অলংকারের মধ্যে কেবল কণ্ঠহার। দণ্ডায়মান মূর্তি ঘাঘরা পরিহিতা। মুখাবয়বের দুপাশের পূর্ণচন্দ্রাকৃতি শিরোভূষণ থেকে সন্দেহ থাকে না যে মূর্তিটি মৌর্যকালীন (খ্রিঃ পূঃ ৩য় শতক) এবং পাটলিপুত্রে আবিষ্কৃত মৌর্য মৃন্ময় নারীমূর্তির সঙ্গে তুলনীয় ও সমকক্ষ। মোনালিসার মতো রহস্যময় স্মিতহাসি আভাসিত মূর্তির দক্ষিণ হস্ত কটিদেশে ন্যস্ত ও বাম হস্তে একটি বিহঙ্গ (ঘুঘু অথবা কপোত)।

কোমল বিহঙ্গটি কোমল বক্ষ সংলগ্ন। শিল্পী স্বহস্তে মূর্তিটি রূপায়িত করেছেন (appli-que পদ্ধতি)। নির্দ্বিধায় মূর্তিটিকে ভাস্কর্যের নিদর্শন বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। অকস্‌ফোর্ড যক্ষিণী প্রাচীন তাম্রলিপ্তের গর্ব, চন্দ্রকেতুগড়ের নারীমূর্তিটিও প্রাচীন গঙ্গারিডি রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

শক্তিশালী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি, সম্প্রসারণশীল বৌদ্ধ-সংস্কৃতি, উদারতা ও মানবিকতা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অগ্রগতির মধ্য দিয়ে যে মৌর্যকাল ভারত ইতিহাসে অক্ষয়-দ্যুতি সঞ্চারিত করেছে সেই দীপ্তি-বলয়ে চন্দ্রকেতুগড়ও একদিন অবগাহন করেছিল, হিরণ্ময়ী হয়ে উঠেছিল। এই রূপান্তরের বহু নিদর্শন চিরকালের মতো অবলুপ্ত। কেবল কয়েকটি প্রত্নদ্রব্য ধরে রেখেছে মৌর্যকালীন চন্দ্রকেতুগড়ের গৌরবময় অতীত।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। শর্মা রামশরণ ঃ *প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস* (অনুবাদ ঃ অঞ্জন গোস্বামী), কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ১৫১।
২। মুখোপাধ্যায় ব্রতীন্দ্রনাথ ঃ *লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ১৮-১৯।
৩। গোস্বামী কুঞ্জ গোবিন্দ ঃ *প্রত্নতীর্থ পরিক্রমা*, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ১৪৭।
৪। তদেব, পৃঃ ১৪৪।
৫। তদেব।
৬। ঘোষ, ডি. পি. ঃ *স্টাডিজ ইন মিউজিয়াম এ্যান্ড মিউজোলজী ইন ইণ্ডিয়া*, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ৪৭।
৭। গোস্বামী কুঞ্জ গোবিন্দ, পৃঃ ১৮৬।
৮। তদেব।
৯। বন্দ্যোপাধ্যায় রাখালদাস ঃ চন্দ্রকেতুগড়, বার্ষিক বসুমতী, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ।
১০।চক্রবর্তী দিলীপ, গোস্বামী ও চট্টোপাধ্যায় ঃ আর্কিয়োলজি অফ কোস্টাল ওয়েস্ট বেঙ্গল ঃ টোয়েন্টি ফোর পরগনাস অ্যান্ড মিডনাপুর ডিস্ট্রিকটস, সাউথ এসিয়ান স্টাডিজ, ১৯৯৪, পৃঃ ১৪৬, ফিগার ৫।
১১।বন্দ্যোপাধ্যায় রাখালদাস ঃ *ডেসক্রিপটিভ লিস্ট অফ স্কালপচারস অ্যান্ড কয়েনস ইন দি মিউজিয়াম অফ দি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ*, কলকাতা, ১৯১১, পৃঃ ১৬।
১২।তদেব
১৩। দে শুভ্রদীপ ঃ প্লান্ট মোটিফ ইন দি টেরাকোটা আর্ট অফ চন্দ্রকেতুগড়, জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট, নং ৪, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৪১৭, প্লেট ৩২.৬।
১৪।বন্দ্যোপাধ্যায় জিতেন্দ্রনাথ ঃ *পঞ্চোপাসনা*, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ২১৭।
১৫।তদেব, পৃঃ ২১৮।
১৬।তদেব।
১৭।মুখোপাধ্যায় ব্রতীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৯।
১৮।তদেব, পৃঃ ২০।
১৯।মুখার্জী বি. এন. ঃ কয়েনস অ্যান্ড কারেন্সি সিস্টেমস্ অফ আর্লি বেঙ্গল, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ১৪।
২০।তদেব।
২১।তদেব।
২২।গুপ্তা পি. এল ঃ *ভারতের মুদ্রা* (বঙ্গানুবাদ), নয়া দিল্লী, ১৯৮৭, পৃঃ ২২৪।
২৩।দে জি. এস্ ঃ অ্যা রেয়ার পান্চ-মার্কড কয়েন ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়, জার্নাল, ভারতীয় মুদ্রা পরিষদ (এন. এস.

আই.), ১৯৮৯।

২৪। কোসাম্বী ডি. ডি. ঃ *ইণ্ডিয়ান নিউমিসমেটিকস্*, নিউ দিল্লী, ১৯৯২, পৃঃ ১১০।

২৫।হক এনামুল ঃ চন্দ্রকেতুগড়, ঢাকা, ২০০১, পৃঃ ১০২-১০৩।

২৬।তদেব, পৃঃ ১০৩।

২৭।হক এনামুল ঃ পৃঃ ১০৩, চিত্র ঃ পৃঃ ১০৭।

খড়দহের প্রাচীন গ্রামদেবতা

এলাশ্রী

প্রভু নিত্যানন্দের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার কার্য তাঁর তিরোভাবের পরেও অব্যাহত ছিল। তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবাদেবী এই দায়িত্ব ভার নিজে তুলে নেন। ১৫৮২ খ্রিঃ খেতুরীতে সন্তোষ দত্ত ছয়টি কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে বঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের তাবৎ বৈষ্ণব বিদ্বজ্জন আমন্ত্রিত হন। খড়দহের বৈষ্ণবাচার্য নিত্যানন্দ তনয় বীরচন্দ্র এই খেতুরী মহোৎসবে যোগদান করেন। জাহ্নবাদেবী তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের মধ্যমণি হয়ে এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। সন্তোষ দত্ত প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণমূর্তির অনুসরণে খড়দহেরও কৃষ্ণ মূর্তি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বীরচন্দ্র প্রত্যাবর্তন করেন।

খড়দহের প্রাচীন গ্রাম দেবতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে ভাগীরথীর অপর তীরে বল্লভপুরে প্রতিষ্ঠিত বল্লভ জীউ এবং সাঁইবনায় অধিষ্ঠিত নন্দদুলাল জীউয়ের প্রতিষ্ঠা কাহিনী।

একদা বীরচন্দ্র স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে চৈতন্যভক্ত হুসেন শাহের উত্তরসূরী গৌড়াধিপতি সোলেমান খাঁর দরবারে উপস্থিত হলে কাফের গুপ্তচর জ্ঞানে নবাব তাকে বন্দী করলেন। এই সময়ে নবাবের জামাতা কোন কারণে মানসিক পীড়ায় অসুস্থ ছিলেন। বন্দী বীরচন্দ্রের সুমধুর হরিনাম সঙ্কীর্তনের সুরে মুগ্ধ হয়ে নবাব জামাতা ধীরে ধীরে অবসাদ মুক্ত হয়ে আরোগ্যলাভ করেন। সোলেমান খাঁ জামাতার আরোগ্যলাভে খুশি হয়ে বীরচন্দ্রকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন এবং তাঁকে কিছু উপহার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন।

বীরচন্দ্র স্বপ্নে দেখা নবাব প্রাসাদের একটি কষ্টিপাথর যাচ্ঞা করলেন। নবাবের আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু সমস্যা হয়—অত উঁচু থেকে এই প্রস্তর খণ্ডটি কিভাবে নামানো হবে! একজন পীর দরবেশ মুস্কিল আসান করেন। তিনি প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণ করে এই বিশাল পাথরটি নামিয়ে আনেন। এই তত্ত্বকে হিন্দু মুসলমান ধর্মের সমন্বয়ের প্রতীক বলা যেতে পারে।

বৃন্দাবন থেকে ভাস্কর আনিয়ে বীরচন্দ্র এই পাথরে তিনটি মূর্তি তৈরি করালেন। 'প্রেমবিলাস' রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস বলেন,—

'শ্যামসুন্দর গড়ি অবশিষ্ট যে পাথর।
তাহা দিয়া গড়িল দুই মূর্তি মনোহর॥
শ্রীনন্দদুলাল মূর্তি রহে শখীবন।
বল্লভপুরে বল্লভজী অধিষ্ঠিত হন॥

নিত্যানন্দ দাসের মতানুযায়ী যদি প্রথম মূর্তিটি শ্যামসুন্দর অর্থাৎ বীরচন্দ্রের স্বপ্নে দেখা দেববিগ্রহ হ'ত, তাহলে আরও দুটি মূর্তি কেবল অপরকে দান করার আগ্রহে তৈরি করানোর কথাটি দুর্বল যুক্তি বলেই মনে হয়। এই কারণেই সর্বাপেক্ষা সুন্দর তৃতীয় মূর্তিটি নিজে রেখে প্রথম মূর্তি বল্লভজীকে প্রাণের বন্ধু রুদ্ররাম পণ্ডিতকে দান করেন। রুদ্ররাম প্রতিষ্ঠিত বল্লভজীর মন্দির থেকেই প্রাচীন আক্না গ্রাম বল্লভপুর নামে পরিচিত হয়। দ্বিতীয় মূর্তি নন্দদুলালজীকে নিত্যসেবার জন্য শখীবনে লক্ষ্মণ পণ্ডিতের হাতে দেওয়া হয়।

শ্যামসুন্দর, বল্লভজী ও নন্দদুলাল—একই প্রস্তর খণ্ড থেকে এই তিনটি মূর্তি তৈরি করা হয়। এ সম্বন্ধে কিংবদন্তী রয়েছে যে, বীরচন্দ্র নয়—রুদ্ররাম পণ্ডিত দিল্লীর দ্বিতীয় শাহ্ আলমের দরবার থেকে এই পাথর আনেন এবং তিনটি মূর্তি তৈরি করান।॰

শ্রীরামপুর নিবাসী যদুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পক্ষের পুত্র রুদ্ররাম একদিন ইন্দ্রপ্রস্থের দরবারগৃহের তোরণ দ্বার থেকে এই প্রস্তরখণ্ডটি সংগ্রহ করার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হন। দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র শাহ্ আলমের (১৭২৮-১৮০৬ খ্রিঃ) পরবার তোরণ থেকে পাথর এনে তিনটি মূর্তি তৈরি করেন এবং একটি মূর্তি খড়দহের বৈষ্ণবাচার্য বীরচন্দ্রকে ও অপর মূর্তি বৈমাত্রেয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণ পণ্ডিতকে দিয়ে নিজে একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু এ তথ্য ঠিক নয়। রুদ্ররামের জন্ম ১৫৩৯ খ্রিঃ অর্থাৎ বীরচন্দ্রের থেকেও চাব বছরের কনিষ্ঠ। তারপক্ষে শাহ্ আলমের দরবার থেকে পাথর আনা সম্ভব নয়। তাছাড়া খেতুরী মহোৎসবের পূর্বে কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন ও ভজনার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এই খেতুরী মহোৎসবে খড়দহের বৈষ্ণবাচার্য বীরচন্দ্রই অংশগ্রহণ করেছিলেন। শৈবভক্ত পরিবারের রুদ্ররাম নয়। তাই বিচার বিশ্লেষণ করলে বীরচন্দ্র দ্বারাই গৌড় থেকে কষ্টিপাথর আনিয়ে বিগ্রহ তৈরি করা যত অধিক যুক্তি ও তথ্য নির্ভর মনে হয়, শৈবভক্ত রুদ্ররামের অকস্মাৎ কৃষ্ণভক্ত হয়ে মূর্তি স্থাপন—ততখানি যুক্তি ও তথ্য সমর্থিত হয় না। ১৬০১ খ্রিঃ লিখিত নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' কাব্যের ২৫৩ পাতায় গৌড় থেকে বীরচন্দ্রের প্রস্তর খণ্ড আনার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়।

নিত্যানন্দ সেবিত দারু-শ্যামসুন্দর বসতবাড়ি কুঞ্জবাটিতে নিত্য-সেবিত হন। বীরচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর সেখানে স্থাপিত হয়ে পূজিত হন। একই দেবালয়ে একই দেবতার দুই মূর্তি সেবিত হন না—জাহ্নবাদেবী নিত্যানন্দ সেবিত শ্যামসুন্দরকে নিত্যানন্দের শিষ্যের হাতে নিত্যপূজার জন্য দান করেন, যা আজও আঁটপুরের আনোয়ার বাটিতে পরমেশ্বর দাসের বসত বাড়িতে পূজিত হচ্ছেন। কুঞ্জবাটিতে শ্যামসুন্দর প্রায় দুশো বছর সেবিত হন। ১৭৫১ খ্রিঃ পট্টেশ্বরী দেবী কর্তৃক নির্মিত বর্তমান মন্দিরে শ্যামসুন্দর স্থানান্তরিত হন। এই তিনটি মূর্তি তিনটি ভৌগোলিক সীমাকে একসাথে বেঁধে রেখেছে,

তার তাৎপর্যও কম নয়। গঙ্গার পশ্চিমতীরে বল্লভপুর, পূর্বতীরে খড়দহ এবং খড়দহের পূর্বদিকে শখীবন—এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধর্মীয় সূত্রে বিগ্রহ তিনজন মালা গেঁথে রেখেছে। আগে প্রতিবছর মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে শোভাযাত্রাসহ এই তিন বিগ্রহ শোভাবাজার রাজবাড়িতে ধর্মসভায় মিলিত হতেন। পরে তা নানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়। তবে ভক্তরা এই তিথিতে তিন বিগ্রহকে দর্শন করে যোগসূত্র রক্ষা করেন।

খড়দহের মাটি অত্যন্ত পবিত্র ভূমি। ১২৮১ বঙ্গাব্দের ১৪ই শ্রাবণ দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গাপথে ঠাকুর। রামকৃষ্ণ খড়দহে এসেছিলেন এবং রাসখোলা ঘাটের অনতিদূরে নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামীদের বালাখানার বাড়িতে শ্যামসুন্দর জিউর ভোগ খেয়েছিলেন। ১৩১১ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্যামসুন্দর দর্শনের জন্য এসেছিলেন। খড়দহের মাটি ধন্য হয়েছিল ভগিনী নিবেদিতার পদস্পর্শে। তাঁর সঙ্গী ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। শিখগুরু নানক ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে মিলিত হয়েছিলেন ভাগীরথী তীরস্থ খড়দহ গ্রামে বৈষ্ণবগুরু নিত্যানন্দের সাথে। খড়দহের গ্রামীণ দেবতা শ্যামসুন্দরের মন্দির আজও বিদ্যমান এবং খড়দহের ইতিহাসের সঙ্গে তা ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত।

প্রাচীন বঙ্গের নগরনামের বৈশিষ্ট্য ও নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য

অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রাচীন বঙ্গে গ্রামকে কেন্দ্র করেই জনবসতি গড়ে উঠেছিল। সাধারণত নদী ও সমুদ্রের ধারে কিংবা জঙ্গল বা অরণ্যের কাছাকাছি, কখনো বা কতিপয় পথের সংযোগস্থলে বসতির স্থান নির্বাচিত হতো। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গে শহর, বন্দর যে ছিল না একথা বলা যায় না। ভারতের ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মতো প্রাচীন বঙ্গেও শহর, নগর বন্দর, শাসনসংক্রান্ত কেন্দ্রস্থল, রাজধানী, ধর্মীয় স্থান ইত্যাদি বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীন বঙ্গে গ্রামকেন্দ্রিক জনবসতি ধীরে ধীরে নগর, শহর বন্দরের প্রয়োজন অনুভব করলো। এ প্রসঙ্গে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানাদিকের প্রায়োজনীয়তা বাড়তে থাকে। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্পায়ন, নানাবিধ ধর্মীয় মতবাদ, বিশ্বাস, রাজ্যশাসন — এই সকল কারণে ধীরে ধীরে শহর, নগর, বন্দর, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র, শাসনকেন্দ্র, রাজধানী ইত্যাদি গড়ে উঠতে লাগলো। প্রাণবন্ত, উন্নত, সৃজনশীল সমাজ ব্যবস্থাই শহরের চাহিদার অন্যতম পটভূমিকা। এইভাবে নগরের পত্তন শুরু হয়। ক্রমে এই নগর, শহর, বন্দর জটিল ও বৈচিত্র্যময় রূপ গ্রহণ করে। এই ধারা কেবলমাত্র প্রাচীন বঙ্গে নয়, ভারতে ও ভারতের বাহিরে, পৃথিবীতে পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ এই ভাবেই সর্বত্র নগরের পত্তন হয়েছিল। আবার নানাকারণে এই সব নগরের অবলুপ্তিও হয়েছিল। যে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে নগর, বন্দর গড়ে উঠেছিল, যে রাজ্যের সমৃদ্ধিতে নগর রাজধানীর উন্নতি ও গৌরব বৃদ্ধি হয়েছিল সেই রাজ্যের ও রাজার বিলুপ্তি, সংস্কৃতির অবক্ষয়, নদীর দিক পরিবর্তন, নদীও সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া , বন্যা, প্রলয়, ভূমিকম্প, আবহাওয়ার পরিবর্তন — এসব নানাকারণে রাজা-রাজ্য, সাম্রাজ্য কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। নগর, বন্দর ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্য যখন বন্ধ হয়ে আসে তখন নগরের পতন ঘটে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন প্রথিতযশা ঐতিহাসিক আর, এস শর্মা তাঁর ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত আরবান ডিকে ইন ইন্ডিয়া (Urban decay in India) গ্রন্থটিতে। সেখানে তিনি স্পষ্ট বলেছেন নগরের পতন ঘটে ব্যবসা সংক্রান্ত অর্থনীতির অবক্ষয়ের জন্য (with the decline of trade economy)

প্রাচীন ভারতের নগরায়ন, নগরের পরিকল্পনা, কাঠামো, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ তাঁদের গবেষণালব্ধ সুচিন্তিত অগণিত ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের

কথা উল্লেখ করছি। অধ্যাপক বিজয় কুমার ঠাকুর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর আরবানাইজেসন ইন এ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া (Urbanigation in Ancient India) গ্রন্থে বিশদ বিশ্লেষণী আলোচনা করেছেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Urban Decay in India (C 300 - 1000 A.D) গ্রন্থে অধ্যাপক আর, এস, শর্মার অবদান উল্লেখনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অধ্যাপক দিলীপ কুমার চক্রবর্তী তাঁর The Archaeology of Ancient Indian Cities গ্রন্থে প্রত্নতত্ত্বের আলোকে হরপ্পা সভ্যতার উৎপত্তি, বসতি, পটভূমিকা ও ঐতিহাসিক নগর সমূহের বিবৃতি দিয়েছেন।

এই নিবন্ধে নগরের বহুবিধ অধিবাসীবৃন্দের জীবনালেখ্য চিত্রিত করা হচ্ছে না। প্রাচীন বঙ্গের উপজাতিসমূহের ও ঐ সকল অধিবাসীবৃন্দ অধ্যুষিত নগর জীবনের ও নগরের বিশদ বর্ণনা লিখিত ও প্রত্নত্ত্বীয় উপাদানে বিধৃত হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ, জৈন, গ্রন্থ জাতক, চৈনিক প্ররিব্রাজক হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, কলহণের রাজতরঙ্গিণী, ধোয়ীর পবনদূত, গোবদ্ধনাচার্যের আর্যসপ্তসতী ইত্যাদি লিখিত উপাদান থেকে তথ্য আহৃত হয়েছে [১]। অন্যদিকে মহাস্থানগড় লেখ, বিজয়সেনের দেওপাড়া লেখ, ভোজবর্মনের বেলার তাম্রশাসন, ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর লেখ ও প্রত্নতত্ত্বীয় উৎখননের প্রতিবেদন (রিপোর্ট) ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহের বিশ্লেষণী ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিবন্ধের শিরোনামের অর্থাৎ প্রাচীন বঙ্গের নগরনামের গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য ও নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে [২]।

প্রাচীন বঙ্গে নগর, বন্দর, শাসনকেন্দ্র, রাজধানী ইত্যাদি নানাভাবে নগরের পরিকাঠামো পরিলক্ষিত হয়। অগণিত নগর, রাজধানী, বন্দরের মধ্যে উল্লেখনীয় কতিপয় নগরের নাম লিপিবদ্ধ কর হ'ল। যথা-পুণ্ড্রবর্ধননগর, কর্ণসুবর্ণ, সমতট, রামাবতী, লক্ষ্মণাবতী, বিজয়পুরী /বিজয়নগর, গৌড়পুর, দন্তপুর, বর্দ্ধমাননগর, ঢেক্করী, ধার্যগ্রাম, পলাশবৃন্দক, ত্রিপুর নদিয়া, ফল্গুগ্রাম, পঞ্চনগরী, পট্টিকেরা, পুষ্করণ, সোমপুর, সুবর্ণগ্রাম, সিংহপুর, তবির, ত্রিবেণী, বিক্রমপুর, পাহাড়পুর, বাণগড়, স্কন্দনগর, ময়নামতী, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রাম, গাঙ্গে ইত্যাদি [৩]। কিন্তু সব নগরীর সনাক্তকরণ ও ভৌগোলিক স্থিতি সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সমতটনগরীর কোন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। সাহিত্য ও লেখমালায় যে সব উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে প্রাচীন সমতটের বর্তমান স্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ব্যতিরেকে সমতট নগরীকে সনাক্ত করা সম্ভব হবে না। তবে সাধারণভাবে বলা যায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের ভূখণ্ডেই প্রাচীন মহা নগরী সমতট অবস্থিত ছিল [৪]। তবে এখনও তা অনিশ্চিত। বঙ্গদেশের সুপ্রাচীন আন্তর্জাতিক বন্দর ও মহানগরী তাম্রলিপ্তির বর্তমান স্থিতি ও দৃঢ়ভাবে নির্ধারিত হয়

নি। সাহিত্য ও লেখমালার উপাদান থেকে তাম্রলিপ্তিকে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তমলুকের সাথে সনাক্ত করা হয়েছে। তমলুকের পাশ্ববর্তী অঞ্চলে একাধিক উৎখননও পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোন প্রত্ননিদর্শন পাওয়া যায় নি যার ভিত্তিতে প্রাচীন তাম্রলিপ্তিকে বর্তমান তমলুকের সাথে সনাক্ত করা যায়। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সুধীররঞ্জন দাশের উৎখননের ফলে হিউয়েন সাঙ্ বর্ণিত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার ও ঐ মহাবিহারের প্রাপ্ত সীলে উৎকীর্ণ 'শ্রী রক্তমৃত্তিকা মহাবৈহারিকার্য ভিক্ষু-সঙ্ঘস্য' লেখার ভিত্তিতে মহারাজাধিরাজ গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ মহানগরীর বর্তমান স্থিতি নির্ধারিত হয়েছে [৫]। নগর, বন্দর, রাজধানীকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালীর ইতিহাসের ধারা নির্ণীত হয়। এ পর্যায়ে কর্ণসুবর্ণ মহানগরীকে কেন্দ্র করে বিশদ আলোচনা প্রতিফলিত হয়েছে অধ্যাপক দাশের ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কর্ণসুবর্ণ মহানগরী গ্রন্থটিতে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ঐতিহাসিক ডক্টর ভিন্‌সেন্ট স্মিথ কনৌজ নগরীর ওপর মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। প্রবন্ধটির নাম The History of the City of Kanuj and King of Yasovarman. [৬]।

প্রাচীন বঙ্গের নগর নামের বিশ্লেষণে কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। লিখিত ও লেখমালার তথ্য থেকে জানা যায় স্থাননামের শেষে 'নগর', 'পুর', 'পত্তন', 'স্থানীয়', 'নগরী', 'পুরী' ইত্যাদি শব্দের সংযোজন। 'নগর' ও 'পুর' সংযোজন সাধারণত নগর ও শহর বলে চিহ্নিত হয়। যেমন পুণ্ড্রবর্ধননগর বা পুর, গৌড়পুর, পাহাড়পুর, কর্ণসুবর্ণনগরী, শূরনগর, রামাবতীনগর ইত্যাদি। স্থাননামের শেষে 'স্থানীয়' সংযোজন শাসনকেন্দ্রকে নির্ধারিত করে। 'পত্তন' সংযোজন সাধারণত বন্দর বলে চিহ্নিত হয়। আবার লক্ষণীয় বিষয় হলো কোন কোন নগরনামের শেষে 'গ্রাম' শব্দ সংযুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, ফল্গুগ্রাম, ইত্যাদি। অনুমিত হয় গ্রাম, নগরের বৈশিষ্ট্য, কাঠামো ও চাহিদার পূর্ণতা লাভ করে নগরে রূপায়িত হয়েছে।

নগরনামের আর একটি উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল নগরের নাম কখনো রাজার নামে, কখনো বংশের নামে, কখনো ধাতু, গাছপালা, লতাপাতা, পুষ্করিণী, নদী, ফুল-ফল, কখনো বা উপজাতির নামে চিহ্নিত হয়।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন বঙ্গের নগরসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) রাজধানী উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - পুণ্ড্রবর্ধননগর বা পুর, কর্ণসুবর্ণ নগরী, রামাবতীনগর, লক্ষ্মণাবতীনগর, নদিয়া ইত্যাদি।

(খ) জয়স্কন্দবার অর্থাৎ রাজা যে অঞ্চলে যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন সেই স্থান নগরে রূপান্তরিত হয়েছে যেমন উল্লেখ করা যেতে পারে বটপর্বতিক, কাঞ্চনপুর,

ত্রিপুর, ফল্গুগ্রাম, বিজয়পুরী, বিক্রমপুর প্রভৃতি।

(গ) শাসনকেন্দ্র- যথা কোটাবর্ষ (বাণগড়), তবরি ইত্যাদি।

(ঘ) বন্দর - যথা-তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রাম, গাঙ্গে - এই সব নগর।

কোন কোন নগর একাধারে রাজধানী, শাসনকন্দ্র, ধর্মীয়কেন্দ্র ও ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল।

সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'লো যে, নগরনামের বিশ্লেষণে অনেক নগরের নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ এই নিবন্ধে দুটি নগরনাম উল্লেখ করছি। যথা- পুন্ড্রবর্ধননগর বা পুর ও গৌড়নগর বা পুর। এই দুটি নগরনাম উপজাতির নামে নামাঙ্কিত। 'পুন্ড্র' নামক আদিম নরগোষ্ঠীর নামে পুন্ড্রনগরের নামকরণ হয়েছে। পুন্ড্রনগর বা পুন্ড্রবর্ধন মহনগরীর বর্তমান অবস্থিতি ও স্থিরীকৃত হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় নামক স্থান থেকে আবিষ্কৃত মৌর্যযুগের খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ লেখতে পুন্ড্রনগর এর উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধননগর বর্তমান মহাস্থানগড়েই অবস্থিত ছিল। মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ, হিউয়েন সাঙ্ কর্তৃক বর্ণিত পুন্ড্রবর্ধনের সন্নিকটে অর্থাৎ ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত 'পো-সি-পো' বৌদ্ধমঠ, ভাসু বিহার প্রভৃতির অনুরূপ বলে মনে হয় [৭]।

এক্ষণে আলোচ্য বিষয় পুন্ড্রনগরের নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য নির্ণয় করা। 'পুন্ড্র' নামক উপজাতি কোন নরগোষ্ঠীভুক্ত ছিল ও কোন্ ভাষায় কথা বলতো তার অনুসন্ধান করা। নৃতত্ত্ববিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদগণের গবেষণায় স্থিরীকৃত হয়েছে যে, এই পুন্ড্র উপজাতি সম্ভবত ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চল থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর বঙ্গে বসতি স্থাপন করেছিল [৮]। এইভাবে ঐ অঞ্চল পুন্ড্র উপজাতির নামে পুন্ড্রবর্ধন বা পুন্ড্র দেশ নামে পরিচিতি লাভ করে। ছোটনাগপুরের উপজাতিরা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষায় কথা বলে। তাহলে পুন্ড্রেরা ও হয়তো ঐ ভাষাতেই কথা বলতো। উত্তরবঙ্গে যে পুন্ড্র উপজাতি বসবাস করতে শুরু করলো তারা অঙ্গ, সুহ্ম ও কিরাত নামক উপজাতিদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল [৯]। বর্তমানে মালদহ, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমে পুনরোজ বা পুন্ড্রারিকজ নামে যে সকল উপজাতির বাস তারা নৃতত্ত্ববিদগণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় পুন্ড্র নামক সুপ্রাচীন উপজাতির বংশধর বলে পরিগণিত হয়[১০]। আবার লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পুনরোজ উপজাতি ও ২৪ পরগণার পোদ নামক উপজাতি একই গোষ্ঠীভুক্ত [১১]। হার্বার্ট রিজলী বঙ্গের পোদদের দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নৃতাত্ত্বিক মাপজোপ নিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, পোদ নামক উপজাতিরা মাঝামাঝি চেহারার মানুষ, প্রশস্তমুন্ড (mesocephalic head), চ্যাপ্টা নাসিকা (mesorrhinic nose) সমন্বিত, গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ বা কালো [১২]। কিন্তু পণ্ডিতগণ মনে করেন প্রাচীনকালে

পুণ্ড্র উপজাতির অধিকাংশই লম্বাকরোটিযুক্ত (dolichocephalic head) ও প্রশস্তনাসিকা (platyrrhinic nose) সমন্বিত গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ ছিল। কিন্তু কালের প্রবাহে মিশ্রণের ফলে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেহারার ও গায়ের রং এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর শারীরিক গঠন সাধারণত ছোটখাটো কিন্তু স্বাস্থ্যবান, মাথার গড়ন লম্বাকরোটিযুক্ত (dolichocephalic head), প্রশস্তনাসিকা (platyrrhinic nose) সমন্বিত গায়ের রং কালো কিন্তু মসৃণ, মাথার চুল ঢেউ খেলানো বা কোঁচকানো[১৩]। এরূপ বহুবিধ প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আলোচনার মাধ্যমে নৃতত্ত্ববিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পুণ্ড্র নামক আদিম উপজাতিগোষ্ঠী অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত অস্ট্রিকভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ছিল। লিখিত উপাদান থেকে জানা যায় পুণ্ড্র নামক উপজাতিগোষ্ঠী আর্যেতর গোষ্ঠীভুক্ত এবং আর্যেতর গোষ্ঠীর ভাষার কথা বলতো। স্বভাবতই তারা টোটেম (Totem), অ্যানিমিজম্ (animism) ও ম্যাজিক (magic) এ বিশ্বাস করতো। তারা totemic group এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। লক্ষণীয় বিষয় এই যে পুণ্ড্র শব্দ পুন্‌রি বা পুড়ি শব্দ থেকে উদ্ভূত। পুড়ি শব্দ বাংলা ভাষায় আখ যা ইংরাজীতে Sugarcane. যাইহোক পুণ্ড্রবর্ধননগর সম্ভবত পুণ্ড্র নামক উপজাতির নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। এইরূপে নগরনামের নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়।

সেইরূপ অপর একটি নগরনাম 'গৌড়পুর' বা 'গৌড়নগর' । এই নগরটির নামকরণ গৌড় নামক উপজাতির নামে চিহ্নিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়। গৌড় উপজাতি একটি মিশ্রিত জনগোষ্ঠী। মঙ্গোলয়েড, অ্যালপিনয়েড, অস্ট্রালয়েড ও মেডিটেরেনিয়ান নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ গৌড় উপজাতির মধে বিদ্যমান। গৌড় নামক উপজাতি মালব, খস, কুলিক, হুণ ইত্যাদি উপজাতিদের সংগে উত্তর- পশ্চিম ভারতবর্ষ থেকে সৈনিক রূপে উত্তর ভারতের মধ্য দিয়ে বঙ্গে প্রবেশ করেছিল। বঙ্গের পালরাজা ধর্মপালের নালন্দা তাম্র শাসনে এসব তথ্য উল্লিখিত আছে [১৪]। যদি ধরে নেওয়া যায় উত্তর পশ্চিম ভারতের ঐ সকল উপজাতি মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত ছিল, তাহলে ঐসকল উপজাতি উত্তর ভারতে ইন্দো আর্যভাষাভাষী অ্যালপিনয়েড নরগোষ্ঠীর সংগে সংমিস্রিত হয়। পরে ঐ মিশ্রিত উপজাতি বঙ্গে প্রবেশ করে অস্ট্রালয়েড ও মেডিটেরেনিয়ান নরগোষ্ঠীর সংগে মিলেমিশে যায়। এইভাবে সংস্কৃতভাষাভাষী অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ইন্দোচীন ভাষাভাষী জনগণের মিশ্রিত ফলশ্রুতি গৌড়জন। বঙ্গে এই নরগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করে, ক্রমে রাজ্য ও রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে। তাদের রাজধানীর নাম গৌড়পুর বা গৌড়। পরবর্তীকালে বঙ্গদেশ গৌড়দেশে নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। বঙ্গের রাজা, মহারাজা গৌড়েশ্বর, গৌড়াধিপতি বিশেষণে ভূষিত হতেন। যেমন গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ইত্যাদি।

তবে গৌড় উপজাতির নৃতাত্ত্বিক সমীকরণ অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। এইটুকু বলা যায় তারা মিশ্র উপজাতি। কালক্রমে বঙ্গে অগণিত উপজাতির প্রবেশ ও আদিম সুপ্রাচীন উপজাতির বসতি ছিল। গৌড় নামক মিশ্র উপজাতি এদের সকলের সংগে ধীরে ধীরে মিলে মিশে বাঙালীজনে রূপান্তরিত হয়েছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও কাব্যমীমাংসাতে গৌড়জনের গায়ের রং এর যে আভাস পাওয়া যায় তার থেকে মনে হয় তারা হরিদ্রাভ অর্থাৎ গৌড়বর্ণ ছিল [১৫]। হরিদ্রাভ ফর্সা সাধারণত মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর দেহের বর্ণ। এবিষয়ে নিবন্ধকার অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছে। সংক্ষিপ্ত আকারে সম্প্রতি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের একটি নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে [১৬]। প্রাচীন বঙ্গের গ্রাম নামেরও নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে। সে সম্বন্ধেও নিবন্ধকার দুটি প্রবন্ধে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে ও ইতিহাস অনুসন্ধানে সবিশেষ আলোচনা করেছে [১৭]। স্থাননামের অর্থাৎ গ্রাম, নগর ও অন্যান্য স্থানের নামের বিশ্লেষণী সমীক্ষায়, বৈজ্ঞানিক নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় স্থাননামের গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য ও নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়। স্থাননামের বিশদ আলোচনা করেছেন ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সুকুমার সেন ১৯৮০ সালে প্রকাশিত তাঁর মূল্যবান বাংলা স্থান নাম গ্রন্থটিতে। বাংলার গ্রাম নাম নিয়ে শ্রী অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম (১৯৮০ সালে প্রকাশিত) বইটিতে বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণপদ গোস্বামী। গ্রাম, নগর, বন্দরের নামের ব্যাখ্যার মাধ্যমে সেই স্থানের উত্থান, সমৃদ্ধি, পতন ও বিলীন হওয়ার ইতিবৃত্ত আলোকিত হয়। আবার ঐ সকল স্থান নামকে কেন্দ্র করে সেই যুগের রাজা মহারাজার ও রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, ব্যবসা বাণিজ্য, সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালী, সাংস্কৃতিক জীবন, মন্দির, মঠ, বিদ্যাচর্চা সবকিছুরই ইতিহাস আলোকিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক দাশের কর্ণসুবর্ণ মহানগরী গ্রন্থটি বঙ্গের নগর মহানগরীর ইতিহাস রচনার গুরুত্ব নির্ণয়ে পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে। নগরকেন্দ্রিক ইতিহাস লিখনে নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এক্ষণে বলা যেতে পারে গ্রাম নগর ও স্থান নামকে কেন্দ্র করে জনগণের সামগ্রিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির নব-রূপায়ণ করা যেতে পারে।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, XLI ১২; ল. বি. সি, এ্যানসিয়ান্ট ইন্ডিয়ান ট্রাইব্‌স্, ভল্যুম, টু, পৃ ১৫ (লন্ডন ,১৯৩৪); বোরো, এ. এ্যানসিয়ান্টি জিওগ্রাফ অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৬৫ (গৌহাটী, ১৯৭১); পঞ্চানন তর্করত্ন, মহাভারত, ভল্যুম ওয়ান, আদিপর্ব, চ্যাপটার ১৭৫, ৩৬, ৩৭, ২৮, পৃঃ ১৬৯; ভল্যুম টু, শান্তিপর্ব, চ্যাপ্টার ৩৫, ১৪, পৃঃ ১৪৪১; সভাপর্ব, দিগ্বিজয় সেকসন্, চ্যাপ্টার ২৭, ৩০, ৩১, পৃঃ২৪০-২৪২;

কাওয়েল, ই.বি. অ্যান্ড নীল, আর এ (সম্পাদনা দিব্যাবদন, পৃঃ ১২১-১২২, ১৮৯৬);ওয়াটার্স, টি (অনুবাদক), অন য়ুয়ান চোয়াংস ট্রাভেলস্ ইন ইন্ডিয়া, ভল্যুম টু, পৃ-ঃ ১৮৪-১৯৩ (রিপ্রিন্ট, দিল্লী, ১৯৬১);
মজুমদার, আর, সি, বসাক ও ব্যানার্জী (সম্পাদিত), রামচরিত অব সন্ধ্যাকর নন্দী, চ্যাপ্টার থ্রি পৃঃ-১০৩, ১০৮, ২০৪ (রাজসাহী, ১৯৩৯); ষ্টেন ঔরেল (অনুবাদক), রাজতরঙ্গিণী, অব কলহণ, ফোর (iv) পৃঃ ৩৩২, ৪২২ (লন্ডন, ১৯০০); ধোয়ী, পবনদূত, ভার্স, ২৮, ৪২; মজুমদার, আর. সি, হিস্ট্রি অব এ্যানসিয়ান্ট বেঙ্গল, পৃঃ ৪৬৪ - ৪৬৫, (কলিকাতা, ১৯৭১)

২। মাইতি, এস, কে, এ্যান্ড মুখার্জী, আর আর, করপাস অব বেঙ্গল ইন্সক্রিপসনস্ রিয়ারিং অন হিস্ট্রি এ্যান্ড সিভিলাইজেসন অব বেঙ্গল, পৃঃ ৩৯-৪০(কলিকাতা, ১৯৬৭); সরকার, ডি, সি, সিলেক্ট ইন্সক্রিপসনস্ বিয়ারিং অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি এ্যান্ড সিভিলাইজেসন্, পৃঃ ৪২. (কলিকাতা, ১৯৬৫) (মহাস্থানগড় লেখ); মাইতি ..... তদেব, পৃঃ ২৪৪-২৫৭ (বিজয়সেনের দেওপাড়া লেখ); তদেব, পৃঃ ২৩৪-২৪৩ (ভোজবর্মণের বেলার তাম্রশাসন) তদেব, পৃঃ ৩৪৯-৩৬০ (ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর লেখ)

৩। পুন্ড্রবর্ধননগর : ওয়াটার্স, টি (অনুবাদক), অন উয়ান চোয়াঙ'স ট্রাভেলস্ ইন ইন্ডিয়া, ভল্যুম টু, পৃঃ১ ৮৪ -১৮৩ (দিল্লী, ১৯৬১)
মহাস্থান লেখ, পাহাড়পুর, তাম্রশাসন, কলাইকুরি লেখ, দামোদরপুর তাম্রশাসন, উৎখননের প্রতিবেদন।

কর্ণসুবর্ণনগরী : ওয়াটার্স, তদেব, দাশ, সুধীরঞ্জন, রাজবাড়ীডাঙ্গা, কর্ণসুবর্ণমহানগরী ইত্যাদি।
সমতট : ওয়াটার্স, তদেব, দাশ, কর্ণসুবর্ণ মহানগরী, পৃঃ-২
রামাবতী : মজুমদার, বসাক, ব্যানার্জী, (সম্পাদক), রামচরিত, চ্যাপ্টার থ্রি, পৃঃ ১০৩,
বর্ধমাননগরী/ বর্ধমানপুর : কান্তিদেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসন
ঢেক্করী : ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসন
সোমপুর / বর্তমান পাহাড়পুর : উৎখননের প্রতিবেদন
পাহাড়পুর : উৎখননের প্রতিবেদন, পাহাড়পুর, তাম্রশাসন (৪৭৮-৭৯ এ.ডি)
ধার্যগ্রাম : লক্ষ্মণসেনের ভোওয়াল, মাধাইনগর, শক্তিপুর, তাম্রশাসন,
পলাশবৃন্দক : ৪২২ খ্রিস্টাব্দের বুধগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন।
ত্রিপুর : বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রশাসন
নদিয়া : মিনহাজ - উদ্দিনের তবকাৎ-ই-নাসিরি।
ফল্গুগ্রাম : কেশবসেনের ইদিলপুর, তাম্রশাসন, বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য পরিষৎ তাম্রশাসন।
পঞ্চনগরী : বাইগ্রাম, তাম্রশাসন, গুপ্তাব্দ ১২৮, কলাইকুরি, তাম্রশাসন, গুপ্তাব্দ ১২০, সুলতানপুর, তাম্রশাসন।
পট্টিকেরা : ময়নাবতী তাম্রশাসন অব রণবন কমল্ল হরিকেলদেবের লেখ ইত্যাদি।
পুষ্করণ : চন্দ্রবর্মণের শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে খোদিত লেখ।
সুবর্ণগ্রাম : জিয়াউদ্দিন বারুনী ও ইবন্ বতুতা উল্লিখিত।
সিংহপুর : ভোজবর্মনের বেলাব তাম্রশাসন।
তবির : হরিবর্মণের সংগোলি প্লেট, শশাঙ্কের মেদিনীপুর তাম্রশাসন।
ত্রিবেণী : প্লিনি, টলেমির লেখায়, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ধোয়ীর পবনদূত।
বিক্রমপুর : শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসন, ভোজবর্মনের বেলাব তাম্রশাসন বিজয়সেনের বারাকপুর তাম্রশাসন, লক্ষ্মণ সেনের আনুলিয়া তাম্রশাসন।
বাণগড়/প্রাচীন কোটাবর্ষ বাণপুর : বায়ু পুরাণ, জৈন কল্পসূত্র, উৎখননের প্রতিবেদন, তৃতীয় বিগ্রহপালের দামোদরপুর তাম্রশাসন, ১ম কুমারগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন গোস্বামী, কে.জি, এক্সকাভেশন অ্যাট বাণগড়, (১৯৩৮ -৪১) ১৯৪৮ কলিকাতা, অ্যান এনসাইক্লোপিডিয়া অব

ইন্ডিয়ান আরকিওলজি, সম্পাদক, এ, ঘোষ, পৃঃ৪৭, (নিউ দিল্লী, ১৯৮৯)

স্কন্দনগর : ময়নামতীঃ সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত উৎখননের প্রতিবেদন, রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকালদেবের ময়নামতী তাম্রশাসন (শকাব্দ ১১৪১), আই, এইচ, কিউ, ৯ পৃঃ ২৮২ এফ, এফ, নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, ১ম ও ২য়খন্ড, কলিকাতা, ১৯৮০।

তাম্রলিপ্তি : বৃহৎসংহতিা, দশকুমার চরিত, হেমচন্দ্রের কথাসরিৎসাগর ওয়াটার্স ১টি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৪-১৯৩।

সপ্তগ্রাম : চৈতন্যভাগবত, ভক্তিরত্নাকর, ষষ্ঠীমঙ্গল, কৃষ্ণক মিশ্রের কাব্য, আইন-ঈ-আকবরী, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, জাও ডি ব্যারোসের ম্যানের নকশায়

গাঙ্গে : পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি, টলেমির লেখায়।

লক্ষণাবতী/ গৌড় : মিনহাজ -উদ্দিনের তবকত্-ই-নাসিরি

৪। দাশ, সুধীর রঞ্জন, কর্ণসুবর্ণমহানগরী, পৃঃ ২ (কলিকাতা, ১৯৯২)

৫। দাশ, তদেব, ও পৃঃ ২৫১ রাজবাড়ীডাঙা, কলিকাতা, ১৯৬৮, উৎখনন বিজ্ঞান, কলিকাতা-১৯৭৫

৬। সেন, এস, পি, (সম্পাদিত), হিস্টোরিয়াল এ্যান্ড হিস্টোরিওগ্রাফি অব মর্ডাণ ইন্ডিয়া, পৃঃ ৪৫১ (কলিকাতা, ১৯৭৩) ; জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯০৮

৭। দাশ, সুধীররঞ্জন, কর্ণসুবর্ণমহানগরী, পৃঃ সরকার, ডি, সি, সিলেক্ট ইনস্ক্রিপসন্স্ পৃঃ ৮২ (কলিকাতা, ১৯৬৫) ;
মাইতি, এস, কে, এ্যান্ড মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯ (কলিকাতা, ১৯৬৭)

৮। সেন বিনয়চন্দ্র, সাম হিস্টোরিক্যাল অ্যাসপেক্ট অব দি ইনস্ক্রিপসন্স্ অব বেঙ্গল, পৃঃ ১২৮-১৩০ (কলিকাতা, ১৯৪২)

৯। তর্করত্ন পঞ্চানন (সম্পাদক ও অনুবাদক), মহাভারত, ভল্যুম টু, পৃঃ ১০০২, ভল্যুম ওয়ান, চ্যাপ্টার ৩০ পৃঃ ১৪১; ভীষ্মপর্ব, চ্যাপ্টার নাইন (IX), পৃঃ ৮২২ (বঙ্গবাসী এডিশন, কলিকাতা, ১৮৩০ শকাব্দ)

১০। সেন্সাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া, (বেঙ্গল), ১৯০১, পৃঃ ৪২৫-৪২৬

১১। সেন্সাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া (বেঙ্গল এ্যান্ড সিকিম) ১৯৩১, পার্ট ওয়ান, পৃঃ ৪৬৩, বিজলী, এইচ, এইচ, দি ট্রাইবস এ্যান্ড কাস্টস্ অব বেঙ্গল, ভল্যুম টু, পৃঃ ১৭৮ (রিপ্রিন্ট, কলিকাতা, ১৯৮১)

১২। বিজলী, এইচ, এইচ, দি পিপল্ অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৪০১ (কলিকাতা, ১৯০৮, লন্ডন, ১৯১৫)

১৩। মিত্র, এ, কে, দি ট্রাইবস্ এ্যান্ড কাস্টস্ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্সাস ১৯৫১, পৃঃ ২৪ (কলকাতা, ১৯৫৩)

১৪। এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা, ভল্যুম ২৩ (XXIII) পৃঃ ২৯১ এফ, এফ; সরকার, ডি. সি., স্টাডিজ ইন দি সোসাইটি এ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব এ্যানসিয়েন্ট এ্যান্ড মিডাইভ্যাল ইন্ডিয়া, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ ১৩৬-১৩৭ (কলিকাতা, ১৯৬৭)

১৫। দালাল, সি, ডি
শাস্ত্রী, ও আর, এ, (সম্পাদক)
ঘোষ, এম, (অনুবাদক)
কাব্যমীমাংসা
পৃঃ ৮ (থার্ড এডিশন)
(ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট,)
বরোদা, ১৯৩৪ ;

ভারতের নাট্যশাস্ত্র ২৩/ ৬৪; (ভল্যুম ওয়ান এ্যান্ড টু, কলিকাতা, ১৯৫০, ১৯৬১)

১৬। চট্টোপাধ্যায় এ, এ ব্রিফ নোট অন দি এপ্রো হিস্টোরিক্যাল অ্যাপ্রোচ টু দি সিটিজ অব এ্যানসিয়েন্ট বেঙ্গল, অল ইন্ডিয়া হিস্ট্রি কংগ্রেস, ২০০১।

১৭। চট্টোপাধ্যায় এ, ইতিহাস অনুসন্ধান, খন্ড ১২, পৃঃ ১৪৪ -১৫০, (কলিকাতা, ১৯৯৮) চট্টোপাধ্যায় এ, প্রোসিডিংস অব দি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, ৫৮ সেশন্, বাঙ্গালোর, ১৯৯৭, ভিলেজ, নেমস্ অব এ্যানসিয়েন্ট বেঙ্গল এ্যাজ এভিডেন্স অব দি ওরিজিনস্ অব দি পিপল্ এ্যান্ড কালচার অব বেঙ্গল, পৃঃ ১২৭-১৩১।

প্রাচীন বাংলার জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

অরবিন্দ মাইতি

কোন স্থানের জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা উঠলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে স্থানটির অক্ষাংশ কত? ভূপ্রকৃতি কেমন? ঐ স্থানের গড় উচ্চতা কি রকম? সমুদ্রের প্রভাব ঐ স্থানটির উপর আছে কি না? পর্বতের অবস্থান কি রকম? বনভূমির বিস্তৃতি ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস কেমন? কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য কি কি? এই প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে ঐ স্থানের গড় আবহাওয়া বা জলবায়ু বা প্রাকৃতিক পরিবেশের মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সেই স্থানের আবহাওয়ার আঁচ পাওয়া খুব সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রাচীন সাহিত্যের বিশ্লেষণ যৎসামান্য প্রাচীন লেখর পাঠোদ্ধার, বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ এবং চিরায়ত লোক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত খাদ্যাভ্যাস ও কৃষিউৎপাদনের মাধ্যমে এর কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। আবার যে উৎপাদনের উপর নির্ভর করে আমরা আবহাওয়া ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য জানার চেষ্টা করি তার অনেকগুলিই কালের গতিপথে পরিবর্তন শীল।

তবে একথা সত্য প্রাচীন বাংলা সারা ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপরেখার বাইরে ছিল না। এই উপমহাদেশের তাম্রাশ্রিত সভ্যতার যুগ থেকে এর জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করছিল মৌসুমী বায়ু উত্তরের হিমালয় পর্বত, সমুদ্রাগত মৌসুমীবায়ুকে প্রতিহত করে ব্যাপকভাবে যেমন বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছিল তেমনি উত্তরপূর্ব মৌসুমী বায়ুর শীতল স্পর্শ থেকে রক্ষা করছিল এই উপমহাদেশকে পশ্চিমের আরাবল্লী পর্বত যা বর্তমান ক্ষয়প্রাপ্ত পর্বতরূপে স্বীকৃত সেকালে এর উচ্চতা ছিল অনেক বেশি এর প্রভাবে পশ্চিম ভারতের অনেকাংশে তখন ছিল সুজলা-সুফলা। বারিপূর্ণ মেঘরাশি আরাবল্লীতে প্রতিহত হয়ে স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও জনজীবনে আনত এক স্বচ্ছন্দ গতি। রাজস্থানের ভূ-ভাগে সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাবের মরুপ্রায় ভূমির বিস্তার ছিল সীমিত। গম, যব, শুটি, তিল, তরমুজ ও তুলার চাষ এই সব অঞ্চলে ব্যাপক হত। অবশ্য ধান চাষের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। উপরোক্ত ফসলের চাষ পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রায় ১০০ সেন্টিমিটার মতো বৃষ্টিপাত হতো। উপরোক্ত অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৩৫° - ৪০° সেন্টিগ্রেডের মতো ছিল। এবং শীতকালে ১২° - ১৫° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি থাকত। উপরোক্ত অঞ্চলে মানুষজনের আমিষ জাতীয় খাদ্যাভ্যাস থেকে জানা যায় ওরা ভেড়া ও শুকরের মাংস, পর্যাপ্ত মাছ ও ডিম ব্যবহার করত। উপরোক্ত প্রাণীগুলি মরুভূমিতে বাস করতে পারে না। এমন কি কিছু সংখ্যক মানুষের অন্যতম জীবিকা ছিল মৎসশিকার যা কেবলমাত্র ভূ-পৃষ্ঠের সঞ্চিত জলাশয় ও জলপূর্ণ নদী ছাড়া সম্ভব নয়। এমন কি বিশেষ ধরণের বঁড়শির কাঁটা এই সভ্যতায় ব্যবহৃত হত। যা মৎস্য

শিকারের অন্যতম উপায় ছিল। অবশ্য হরপ্পার তাম্রাশ্রিত সভ্যতার কথা উঠলে তার শীলমোহরে অঙ্কিত পশুমান শিবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যার মাধ্যমে হস্তী, গন্ডার, মৃগ ও ব্যাঘ্রাদি জন্তুর অবস্থিতির কথা বুঝতে পারা যায়। এই সমস্ত প্রাণী বিস্তৃত অরণ্যাঞ্চল ছাড়া বাস করতে পারে না। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা মনে করতে পারি তৎকালীন যুগে এই সভ্যতার সন্নিকটবর্তী ভূ-ভাগে বিস্তীর্ণ অরণ্য ভূমির অবস্থান ছিল।

বিগত তিন থেকে চার দশকের মধ্যে পশ্চিমবাংলার রাঢ় অঞ্চলে অজয় ময়ূরাক্ষী, দামোদর, কোপাই, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা ইত্যাদি নদী অববাহিকায় পান্ডুরাজার ঢিবি ছাড়াও ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হয়েছে। ডঃ পরেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত ও ডঃ অমিতা রায় প্রমুখ প্রত্নবিজ্ঞানীদের নিরলস চেষ্টায় বসন্তপুর, রাজার ডাঙ্গা, গোস্বামীখন্ড, মঙ্গলকোট, গঙ্গাডাঙ্গা, কিরণাহার, চন্ডীদাস-নানুর, বেলুটি, সুপুর, মন্দিরা শালখানা, সুরম রাজার ঢিবি, যশপুর প্রভৃতি নানা জায়গায় তাম্রপ্রস্তর বা তাম্রাশ্রিত সভ্যতার বহু নিদর্শন ও প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্রের আবিষ্কার হয়েছে। বোলপুরের সন্নিকটে কোপাই নদীর তীরে (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার) অনুসন্ধান কার্যের ফলে মহিষাদল গ্রামে অন্যান্য প্রত্ন নিদর্শনের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ ধান ও চালের অঙ্গার পাওয়া গিয়েছে যার তেজস্ক্রিয় অঙ্গার পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হয়েছে যে এগুলির বয়স খ্রিস্টপূর্ব ১৩৮০ থেকে খ্রিঃ পূঃ ৮৫৫ এর ভিতরে। উপরোক্ত পরীক্ষা থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দেও প্রাচীন বাংলায় ধানের চাষ হত। বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন হতো পশুপালনে ও সমাজগঠনে সে সময় বাঙালি অভ্যস্থ ছিল। এমন কি ডঃ পরেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত মনে করেন যে রাঢ় অঞ্চলের উপরোক্ত নদীগুলির খাত যথেষ্ট গভীর ছিল এবং এই নদীগুলির সংলগ্ন ভাগীরথী নদীর মাধ্যমে সুদূর ভূ-মধ্যসাগরে অবস্থিত ক্রীট এবং মিনয় সভ্যতার সঙ্গে ব্যাপক নৌ-বাণিজ্য চলত। উপরোক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণগুলি থেকে প্রাচীন বাংলার জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি ধারণা পাওয়া যায়। অবশ্য প্রাচীন বাংলার অক্ষাংশ বা পর্বতের অবস্থান ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন বর্তমানে না ঘটলেও পশ্চিমের মালভূমির অযোধ্যাপাহাড়, পঞ্চকুট পাহাড়, বিহারীনাথ পাহাড় ও বীরভূমের মামাভাগ্না পাহাড় তুলনামূলক ভাবে অনেকখানি উচ্চ ছিল। সে তুলনায় নবীন পলি অঞ্চল গাঙ্গেয় সমভূমি ছিল অনেকাংশে নাব্য। দক্ষিণ ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুরের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চল অনেকাংশে নিম্ন। নদীর মোহনাগুলি ছিল সুবিস্তৃত খাড়ি যার মাধ্যমে সমুদ্রের প্রভাব অনেকাংশে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারত। জন বিস্ফোরণ ও যান্ত্রিক শিল্পায়ন তখন একেবারেই ঘটেনি। সে কারণে পরিবেশ দূষণের প্রশ্নই উঠে না। ব্যাপক বৃষ্টিপাত ও বিস্তীর্ণ অরণ্যানী ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের অবস্থানের ফলে ব্যাপক কৃষি উৎপাদন ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল প্রাচীন বাংলা। ইন্ডিকা গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে আমরা জানতে পারি এদেশের উর্ব্বর মাটিতে

শীত এবং বর্ষা এই দুই ঋতুতে বছরে দুবার ফসল উঠত। কৃষিজ ফসলের মধ্যে ছিল ধান, গম, যব, ডাল, জোয়ার, বাজরা, রাগি, ইক্ষু, তুলা প্রভৃতি। প্রাচীন বাংলায় ব্যাপক কৃষি সম্পদের পাশাপাশি স্বাভাবিক অরণ্য ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের থেকে সংগৃহীত হত আম (সহকার) মধুক বা মহুয়া, পনস বা কাঁঠাল, ডালিম্ব বা দাড়িম্ব, পকৃকটি বা খেঁজুর, গুবাক বা সুপারি, নারিকেল, পান বা তাম্বুল, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা এবং পিপ্পল ও দারুচিনি। সম্ভবত লাক্ষা বিপুল পরিমাণে সংগৃহীত হত। এগুলি বাদেও স্বাভাবিক বৃক্ষ ও গুল্মের মধ্যে ছিল— নিম, নিশিন্দা, করঞ্জ, তাল, বকুল, তমাল, কদম্ব, তেঁতুল, অর্জুন, জাম, বট, অশ্বত্থ, কেন্দু, কঁতবেল, তুলসী, ছাতিম ও কেয়া, বাঁশ, বেত ইত্যাদি খুব সম্ভবত প্রাচীন বাংলায় পানের উৎপাদন স্বাভাবিক ভাবেই হতো। বারীন্দ্রদেশে এবং সম্ভবত সমগ্র বঙ্গদেশে শ্রীফল (বেল), কন্দমূল জন্মাত। প্রাচীন বাংলার কোন লিপিতে কদলির উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে এবং নানা প্রস্তর চিত্রে একাধিক ক্ষেত্রে ফল সমন্বিত বা ফল বিযুক্ত কলা গাছের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে ও তরাই অঞ্চলের অরণ্যভূমিতে যেমন ঘন অরণ্য সন্নিবেশিত ছিল পশ্চিমের রাঢ় মালভূমিতে শাল, পিয়াল, কেন্দু ইত্যাদি বৃক্ষ যেমন জন্মাত তেমনি বাংলাদেশের বিক্রমপুর ভাগে, সুন্দরবনের খাড়িমন্ডল এবং দক্ষিণবঙ্গের নিম্ন জলাভূমি ও মেদিনীপুরের দক্ষিণ পূর্বাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ জাতীয় অরণ্যের অবস্থান ছিল।

বাংলা রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির ও সংস্থাপনার মধ্যে হস্তীর একটি প্রধান স্থান ছিল। গ্রিক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে পাই Prasioi প্রাচ্য ও Gangaridae গঙ্গারাষ্ট্রের সম্রাট, Agrammes বা ঔগ্রসৈন্যের সামরিক শক্তি অনেকটা হস্তীর উপর নির্ভর করত। পাল ও সেন রাজাদের হস্তী, অশ্ব ও নৌবল নিয়েই ছিল সামরিক শক্তি। এই হস্তী আসত কোথা হতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে। কলিঙ্গ, অঙ্গ, করূষ এবং পূর্বদেশীয় হস্তীই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই পূর্বদেশ বলতে কৌটিল্য বাংলাদেশ বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের পার্বত্য অঞ্চলের কথা বলেছেন, তাহা অনুমান করা যেতে পারে। এখনও তো গারো পাহাড় অঞ্চল হাতির জায়গা, আর এই বাংলাদেশইতো পরবর্তীকালে হাতি ধরা এবং হস্তী আয়ুর্বেদ নামে এক বিশেষ বিদ্যাশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল সেকথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বহুদিন আগেই প্রমাণ করে গেছেন। প্রাচীন গৌড়দেশ যে হাতির জন্য বিখ্যাত ছিল তা রাজতরঙ্গিনীর কবির নিকটও সুবিদিত ছিল। প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্র দেশও একই কারণে বিখ্যাত ছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণেও পাওয়া যায়। এমনকি কামরূপের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে যুথবদ্ধ হাতি বিচরণ করত। তা য়ুয়ান চোয়াঙ এর বিবরণ হতে জানা যায়। জীবজন্তু, পশুপাখিও দেশের ধনসম্পদের মধ্যে গণ্য। হাতিছাড়া অন্যান্য পশুগুলির উল্লেখ কিছু কিছু বাংলার লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। এছাড়া পূর্বোক্ত রাঢ় অঞ্চলের ও

অন্যান্য স্থানের ভূ-তাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খনন কার্যের ফলে যে সকল অস্থি ও জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে তার থেকে বোঝা যায় গন্ডার, বন্যমহিষ, হরিণ, ব্যাঘ্র, বরাহ, সর্প, ইত্যাদি প্রাণী ব্যাপকভাবে প্রাচীন বাংলার জীব পরিমন্ডলের মধ্যে ছিল। আদি বাঙালির সর্প ও ব্যাঘ্র ভীতি সুবিদিত। বনবহুল, বৃষ্টিবহুল গ্রীষ্মপ্রধান এই দেশে এই দুইয়ের অপ্রতিহত প্রভাব, বিশেষভাবে বনময়, জলময়, সমুদ্র তীরবর্তী এই দেশে পরিলক্ষিত হয়। পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং কোন কোন প্রস্তর চিত্রে আরও অন্যান্য নানা জীবজন্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। তার মধ্যে গরু, বানর, হরিণ, শুকর, ঘোড়া ও উট উল্লেখযোগ্য। গরু, উট, ঘোড়া গৃহপালিত জন্তু। আবার ঘোড়া ও উট সাধারণভাবে বাংলাদেশের প্রাণী নয়। যুদ্ধ ও বাণিজ্যিক সংক্রান্ত ব্যাপারেই হয়তো এদের এখানে আমদানি করা হয়েছিল।

প্রাচীন বাংলার পশুদের সম্পর্কে আমরা যতটা জ্ঞাত হই বিহঙ্গ বা পাখিদের সম্পর্কে অতখানি জানার সুযোগ নাই। তবু কিছু কিছু লিপিতে ও প্রাচীন সাহিত্যে ও কুক্কুট, ময়ূর, সজারু, কপোত ও নানাজাতীয় জলচর বিহঙ্গ কাক ও কোকিলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নদীবহুল প্রাচীন বাংলার খাল-বিল জলাভূমি খাঁড়ি ও নিম্নভূমিতে এবং উপকূলের নোনা জমিতে প্রচুর পরিমাণে মাছ, মকর, শুশুক, হাঙ্গর, ঝিনুক প্রভৃতি জলচর প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। পাল যুগের জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে আমরা মৌরালি মাছের ব্যবহারের পরিচয় পাই। মধ্যযুগের সাহিত্যে চিভল মাছ, মাগুর মাছ, শৌল মাছ ও রুই, বোয়াল মাছের উল্লেখ আছে।

ঋতুচক্রের বিবর্তনে প্রাচীন বাংলার জলবায়ু ও মানবজীবনে আসে বৈচিত্র্য। বাংলার ঋতুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্যযোগ্য হল বর্ষা ঋতুর আগমন। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙ বলেছেন বাংলার জলবায়ু ছিল নাতিশীতোষ্ণ। তবে পশ্চিমাঞ্চলের বিশেষত বীরভূম ও বর্ধমানের পশ্চিমাংশে এবং কতকটা মেদিনীপুরেও গ্রীষ্মের তাপ প্রখর হত। অন্যত্র গ্রীষ্মের বায়ু আর্দ্র। কিন্তু বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বারিপাত বাহুল্য। এই বারিপাত ভারত মহাসাগর বাহিত মৌসুমীবায়ু সঞ্জাত। হিমালয়ের গারো-খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে সমগ্র উত্তর ও পূর্ব বাংলা বিশেষভাবে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রঙপুর, পাবনা, বগুড়া বা বগড়া, ময়মনসিং, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর, বরিশালে অবিরল বারিপাত হত। প্রাচীন সাহিত্যে অতিসুন্দর ভাবে এই বারিবর্ষণের কথা উল্লেখ থাকলেও একমাত্র রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে বাংলাদেশের অবিরল বারিপাতের উল্লেখ আছে। বাঙালি কবি জয়দেবের বর্ষাবর্ণনা "মৈঘের্মেদুরমম্বরম্" আমাদের সকলের হৃদয়ের কথা। যোগেশ্বর বাংলার বর্ষার একটি বাস্তব সুন্দর ছবি এঁকেছেন। প্রচুর জল পেয়ে ধান চমৎকার

গজিয়ে উঠেছে। গরুগুলি ঘরে ফিরে এসেছে। ইক্ষুর সমৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। অন্য কোন ভাবনা নাই। ঘর্মক্লান্তি যুক্ত স্ত্রী ওঘরে এই অবসরে উষীর (এক প্রকার ফুলের রেণু) প্রসাধন করছে। বাইরে আকাশ থেকে প্রচুর জল ঝরছে। গ্রাম্য যুবক সুখে শুয়ে আছে। প্রকৃত পক্ষে বর্ষা ঋতু ছিল বাংলার অবসর বিনোদনের সময় নর-নারীর মধুর মিলন রসে সম্পৃক্ত। তার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীবাণভট্ট রচিত সংস্কৃত সাহিত্যে। তার বাংলা অনুবাদ ঃ-

হে সখা,
ঘনবর্ষা নেমেছে;
ময়ূর কলাপ মেলে নাচছে,
দাদুরীর কলরবে পুষ্ট হয়েছে দিক্,
প্রক্ষীণ হয়ে আসছে পথিকদের পথযাত্রা,
আকাশ থেকে যেন চুরি হয়ে গেছে চাঁদ এবং নক্ষত্র,
বিদ্যুতের কণায় চিকচিকিয়ে উঠছে জলধারা,
হংসের হিংসা ভাসছে পবনে;—
এই হেন করাল সময়ে, হে সখা

নীল মেঘের মতো নভোলোপী এই সৌন্দর্যের মধ্যে ছেড়ে যেও না ঐ বাষ্পাকুলা বালাকে, ছেড়ে যেও না — তার উন্নত স্তনের শিখর।

উপরোক্ত কাব্যাংশে বাঙালির কথা রয়েছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সদুক্তি কর্ণামৃত কাব্য সংকলন গ্রন্থে যেমন বর্ষার বর্ণনা আছে তেমনি বাংলার হেমন্ত কাল শীতের আগমনের বর্ণনা রয়েছে। কৃষকের বাড়ি কাটা শালি ধানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। গ্রাম সীমান্তে ক্ষেতে প্রচুর যব-শীষ নীলোৎপলের মতো স্নিগ্ধ শ্যামল। গরু বলদ ও ছাগলগুলি ঘরে ফিরে আসতে নূতন খড় পেয়ে আনন্দ লাভ করছে। অবিরত ইক্ষু যন্ত্র ধ্বনিমুখর গ্রামগুলি গুড়ের গন্ধে আমোদিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত বলা যায় পুন্ড্র পুঁড় কোম পুন্ড্র দেশে ইক্ষু হতে গুড় উৎপাদনে পারদর্শী ছিল। চন্দ্রকেতু গড়ের প্রত্নক্ষেত্র থেকে যে টেরাকোটার ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে তার একটিতে খেজুর গাছ থেকে খেজুর রস সংগ্রহের চিত্র অঙ্কিত আছে যার মাধ্যমে আমরা অনুমান করতে পারি খ্রিস্টাপূর্বাব্দেও বাঙালি রসনা খেজুরের রস ও নলেন গুড়ের রসের আস্বাদন করতে অভ্যস্ত ছিল। ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাবে প্রকৃতি ও মানব মনে আসে এক সুখানুভূতি। তারই প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি নরনারীর রূপসজ্জায় ও গৃহ সজ্জায়। চন্দ্রকেতু গড়ের অপর এক পোড়ামাটির ফলকে অঙ্কিত আছে পত্র পল্লব ও পুষ্প সংগ্রহের এক চিত্র। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু প্রবাহের শেষে উত্তরপূর্ব শুষ্ক শীতল বায়ু প্রবাহিত হত প্রাচীন বাংলায়। এই বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে পূর্বঘাট পর্বতের

মহেন্দ্র গিরিতে প্রতিহত হয়ে শীতকালে বৃষ্টিপাত ঘটাত বর্তমান তামিলনাড়ুতে। শীতের শেষে দক্ষিণদিক থেকে এক শীতল মলয় বাতাস বঙ্গ দেশের ভৌগোলিক সীমানায় প্রবেশ করে। এরই উল্লেখ ধোয়ী কবির "পবন দূতে" পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ সেন যখন দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারতে গমন করেন তখন কুবলয়বতী নামে মলয় পর্বতের এক গন্ধর্ব নারী তার প্রতি প্রেমাকৃষ্ট হন। বসন্ত আগমনে কুবলয়বতী লক্ষ্মণ সেনের বিরহ সহ্য করতে না পেরে বসন্ত পবনকে দূত করে প্রেরণ করেন। এই বসন্ত পবন উত্তরপূর্ববাহী এবং যেহেতু এই বাতাস মলয় পর্বত স্পর্শ করে আসে সেই হেতু কাব্য সাহিত্যে বসন্তের বাতাসের নাম মলয় পবন বলা হয়। ধোয়ী কবি 'পবন দূত' কাব্যের ভিতর দিয়ে একটি ভৌগোলিক সত্যকে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। যার উদাহরণ কবি কালিদাসের "মেঘদূত" কাব্যগ্রন্থে পেয়ে থাকি।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। ভারত ভূ-মন্ডল .... ডঃ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
২। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) .... ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।
৩। হর্ষচরিত "অধিকন্তু" অনুবাদক শ্রী প্রবোধেন্দু নাথ ঠাকুর।
৪। লেখকের ব্যক্তিগত ডাইরী।

দেবী সরস্বতী ঃ তার উদ্ভব ও অস্তিত্ব

সুমিত বিশ্বাস

নদীটির নাম ছিল সরস্বতী। যার তীরে ঋষিরা রচনা করলেন বেদমন্ত্র। নির্মল তার জল হয়ত তাতে ফুটত সাদা পদ্ম, হয়ত বা তার জলে চরে বেড়াত রাজহংস-হংসী। বৈদিক ঋষিরা তাকে "নদীতমে" এবং "অম্বিতমে" আখ্যা দিয়েছিলেন। তাকে তুলনা করেছেন মায়ের সাথে যে মা তার শাখানদীদের সন্তানের ন্যায় পুষ্ট করেছেন তার জলে। যে নদীর তীরে তারা রচনা করলেন এহেন জ্যোতির্ময় মন্ত্র তাকে তারা জ্যোতিস্বরূপা সরস্বতী নাম রাখলেন। তারপর হঠাৎ একদিন নদী সরস্বতী হয়ে গেলেন দেবী সরস্বতী। ভারুৎ শিল্প শৈলীতে প্রথম আমরা দেখতে পাই পদ্মআসীনা বীণাজাতীয় যন্ত্রবাদনরতা এক নারীকে। ঐতিহাসিকরা তাকে সরস্বতীর আদিরূপ (Proto Swaraswati) বলে মনে করেন। গুপ্ত যুগে আমরা সরস্বতীকে পাই চতুর্ভূজা পদ্মাসীনা বীণাবাদনরতা এবং বেদ ও অক্ষমালাধারিণী ময়ূরবাহিনী, শ্বেতাম্বরা এবং মরাল দ্বারা পরিবেষ্টিতা। উত্তর গুপ্ত যুগে যখন দেবীদের শক্তি খর্ব করার একটা প্রবণতা দেখা যায় তখন সরস্বতী দুটি হাত ছেঁটে দেওয়া হয়। কিন্তু বীণা, শ্বেতপদ্ম ও হংসের কোন পরিবর্তন হয় না। সরস্বতীর বাহন হিসাবে হংসের সার্থকতা হল হংস নির্মল পরমহংসের ক্ষমতা, জল থেকে দুধ আলাদা করে নেওয়ার এবং জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে বিচরণ করা, সে জ্ঞানের ন্যায় ত্রিচর, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ অনুযায়ী সরস্বতী ব্রহ্মার মানস কন্যা ও স্ত্রী। বিষ্ণুপুরাণ ও নারদ পুরাণ অনুযায়ী নারায়ণের অর্ধাঙ্গিনী। কিছু লোককথা অনুযায়ী সরস্বতী তাঁর তার্কিক স্বভাবের জন্য শ্বশুরালয় থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। জাপানে একটি বেদীর পূজা হয় তিনি পদ্মাসীনা, তারের যন্ত্র (Lire) বাদনরতা এবং তাঁর মন্দির এর পাশে কোন জলাশয় বা নদী থাকা আবশ্যিক। সরস্বতী বিদ্যা জ্ঞান, কলা ও শাস্ত্রের দেবী, কোথাও বা তাকে প্রাচীন ডাক্তার হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তিনি সর্পদংশন এর বিষ প্রতিহত করার মন্ত্রে পারদর্শী এবং এখানে তার ময়ূর বাহন হওয়ার সার্থকতা। কারণ ময়ূর সাপের প্রধান শত্রু। সরস্বতীকে খুঁজতে গিয়ে আমাদের একটা কথা মনে পড়ে যে তার্কিক মেয়েদের বৈদিক যুগে বা বেদ পরবর্তী যুগে সমাদরটা একটু কমই ছিল বোধ হয়, ব্রহ্মবাদিনী অরুন্ধতীকেও চুপ করানো হয়েছিল...

সারাংশ

মূর্তিতত্ত্বে গণপতি ও শক্তির সমন্বয় ঃ একটি সমীক্ষা

শুভজিৎ দাশগুপ্ত

গণপতি শব্দের অর্থ গণের অধিপতি (Overlord) অথবা গণের অধিদেবতা (tutelary deity)। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধান অমরকোষের রচয়িতা বৈয়াকরণ অমরসিংহ (খ্রিঃ অষ্টম শতাব্দী) গণপতি অর্থে **'গণাধিপ'** শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। যেহেতু ঈশ ও অধিপতি শব্দের একই অর্থ, অতএব যিনি গণপতি তিনি গণেশ।

গণেশ শব্দের অপর এক প্রতিশব্দ **বিনায়ক**। মহারাষ্ট্র অঞ্চলে এই শব্দটি গণেশ অপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দটিকে গণপতির সঙ্গে যৌথভাবে **(বিনায়ক-গণপতি)** ব্যবহার করা হয়।

গণপতি একটি দেবতার নাম নয়। এটি একটি অধিভা (epit et) অথবা বিরুদ (insignia) যা যে কোন ব্যক্তি, দেবতা, অথবা অপেক্ষাকৃত গৌণ দেবযোনির অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র দেবতার (demigod) ক্ষেত্রে অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়।

গণপতি অভিধাটি নিঃসন্দেহে প্রাচীন। ঋগ্বেদ-সংহিতায় এর উল্লেখ রয়েছে (**গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে;** ২/২৩/১৯)। সেখানে ইন্দ্র এবং বৃহস্পতি, উভয়কেই গণপতি বলা হয়েছে। যজুর্বেদ-সংহিতায় (**শুক্ল যজুর্বেদ, তৈত্তিরীয়,** ৪/১,২.২ **ও বাজসনেয়ী,** ২/১৫ , ২২ .৩০) ও পরবর্তী সূত্র সাহিত্যে গণপতির সঙ্গে রুদ্রের অভিন্নতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে গণ শব্দের অর্থ সঙ্ঘ। সুতরাং বেদবর্ণিত **'বিশ্বদেব'** নামক সঙ্ঘচারী দেবতাদের মধ্যে গণপতির প্রাধান্য সহজেই অনুমেয়।

শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শব্দের অর্থ সততই পরিবর্তনশীল। পাণিনীয় সংস্কৃতে লৌকিক বাগ্ধারার প্রভাবে বহু বৈদিক শব্দই তাদের পূর্বনির্ধারিত অর্থের সীমানা অতিক্রম করেছে। গণ শব্দের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটেনি। মহাকাব্য ও পুরাণসমূহে ক্ষুদ্র দেবযোনি অর্থেই গণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, **সঙ্ঘ** অর্থে নয়। যক্ষ, কিন্নর, সিদ্ধ-বিদ্যাধর প্রমুখ গণের পর্যায়ে পড়ে। বরাহমিহির (খ্রিঃ চতুর্থ শতাব্দী) গণ শব্দের পরিবর্তে **প্রথম** শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ শিবানুচর প্রেত (**শিবের** এক নাম **প্রমথনাথ**)। এখনও কথ্য বাংলায় ভূতপ্রেতকে অপদেবতা বলা হয়। ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ-গ্রন্থে এই ধরণের দেবতাকে ব্যন্তরদেবতা বলা হয়েছে। গণ শব্দের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে হলে দেবীমাহাত্ম্যের অন্তর্গত **'দেবীকবচ'** অংশের সাহায্যে নিতে হয়। এই অংশে বলা হয়েছে, দেবীর এই পরম গোপনীয় মহামন্ত্র, জল-স্থল-অন্তরীক্ষ্য সর্বত্র ভক্তকে নিরাপদ রাখে। ভূচর, খেচর , সমুদ্র-উপকূলবাসী অপদেবতাগণ, গন্ধর্বাদি ক্ষুদ্র দেবযোনি, সহজ, কুলজ প্রভৃতি অনিষ্টকারী

ভৈরব দেবীকবচের দ্বারা আশ্রিত ভক্তের দর্শনমাত্রে অপসৃত (নষ্ট) হয়। সুদীর্ঘ তালিকাটির মধ্যে যাদের কথা আছে, তারা সবাই 'গণ'এবং গণপতি প্রকৃতপক্ষে এদেরই অধীশ্বর। তালিকাভুক্ত **কুষ্মান্ড** নামটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বৌদ্ধ সাহিত্যে কুষ্মান্ডদের **বিরূঢ়ক** নামক একশ্রেণীর লোকপাল বলা হয়েছে। সাঁচীস্তূপের দক্ষিণ তোরণগাত্রে বিরূঢ়কমূর্তি রয়েছে, যা মূর্তিতত্ত্বের প্রসঙ্গে পুনরায় আলোচিত হবে। কুষ্মাণ্ডগণ সম্পূর্ণ কল্পিত চরিত্র নাও হতে পারেন। জাতকের কাহিনী অনুযায়ী কুষ্মান্ড গণমুখ্য কুম্ভীরের রাজ্য রাজগৃহের নিকটে অবস্থিত ছিল। সম্ভবত সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে **কাক-খর্পরীক-মালব-যৌধেয়** প্রভৃতি যে সব গণসঙ্ঘের উল্লেখ রয়েছে, সেই প্রকার কুষ্মান্ডগণ একটি প্রাচীন গণসঙ্ঘে'র অধিবাসী ছিলেন। মানব গৃহ্য সূত্রে (২ /১৪.২৮) গণেশকে **কুষ্মান্ড রাজপুত্র** বলা হয়েছে। প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের '**এ ট্রাইব্যাল্ হিস্ট্রী অব্ এনশেন্ট্ ইন্ডিয়া : এ নিউমিসমেটিক অ্যাপ্রোচ**' নামক মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থটির মতে প্রাচীন ভারতের উপজাতিগুলি বহু লৌকিক দেবতাকে স্বীয় ইষ্টদেবতা রূপে এবং অনেক ক্ষেত্রে সেই দেবতার প্রতীক অথবা বাহনকে টোটেম হিসাবে গ্রহণ করে। যৌধেয়গণ শিখিবাহন কুমার কার্তিকেয়'র উপাসনা করতেন। এইসব বিশ্লেষণের সূত্র ধরে যদি বলা হয় যে কুষ্মান্ড উপজাতীয় গণসংঘ অনুরূপভাবেই এক গণপতি দেবতার উপাসনা করত এবং ইনি পরবর্তীকালে পৌরাণিক দেবতা গণেশে পর্যবসিত হয়েছেন, তাহলে বোধহয় খুব অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতপক্ষে গণপতি ও গাণপত্য সম্প্রদায় বিষয়ে গবেষণা -নিরত জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গবেষিকা ডঃ অনীতা রৈনা থাপন ১৯৯৭ সনে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে এই সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

যেহেতু তথাকথিত "ইতিহাস-পুরাণ ঐতিহ্যের" অনেকটাই লৌকিক আচার ও বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত, সেই হেতু বহু পৌরাণিক দেবদেবীর মধ্যেই আর্যেতর চিন্তাধারা সংশ্লিষ্ট হয়েছে। শাক্ত- তান্ত্রিক মহাদেবী (Great Goddess) এই প্রক্রিয়ার এক অপূর্ব উদাহরণ। প্রয়াত ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর **হিস্ট্রী অব্ শাক্ত রিলিজিয়ন্** (নতুন দিল্লী, ১৯৭৪) ও **দ্য ইন্ডিয়ান্ মাদার গডেস্** (নতুন দিল্লী, ১৯৭৭) গ্রন্থদ্বয়ে মার্কসীয় 'দ্বন্দমূলক বস্তুবাদ' (dialectic materialism) তত্ত্বের আলোকে মহাদেবীর উৎপত্তি ও তাঁর দুর্গা, কালী প্রভৃতি রূপভেদের প্রাসঙ্গিক অনার্য প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। ভারতীয় বিদ্যা ভবন কর্তৃক প্রকাশিত 'দ্য ক্লাসিকাল্ এজ' (পৃ. ৪৪৬) গ্রন্থে ডঃ এইচ. ডি. ভট্টাচার্য বলেছেন , 'শাক্ত মহাদেবী ছিলেন মূলত লৌকিক দেবতা এবং, "As the destroyer of the demons Mahishasura, Raktavija, sumbha and Nishumbha, Chanda and Munda, She liteially fought her way into the orthodox pantheon just as Rudra had done by disturbing Daksha's Sacrifice."

অতএব শক্তি ও গণপতি উভয়েই লৌকিক দেবতা এবং উভয়ের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক।

দেবীমাহাত্ম্যে দেখি, দুর্গা স্বয়ং 'গণপতি' র ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন। মহিষাসুর সৈন্য বধ করার সময় প্রচন্ড রণবিক্রমে দেবী যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তার প্রভাবে এক সশস্ত্র গণসৈন্য সৃষ্টি হয় ("নিঃশ্বাসান্মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণে হম্বিকা/ত এত সদ্যঃ সম্ভূতা গণাঃ শতসহস্রশঃ", ২'য় অধ্যায়, শ্লোক ৫২)। এই সৈন্যকে প্রমথ সৈন্যও' বলা হয়েছে (দেবীমাহাত্ম্য), ৩'য় অধ্যায়, শ্লোক ২৪)। গণ ও প্রমথ যে সমার্থক, বরাহমিহির ইতিপূর্বেই তা বলেছেন। তান্ত্রিক গ্রন্থগুলিতে দেবী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্মশানবাসিনী এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি প্রমথ পরিবৃতা। প্রমথবৃন্দ ব্যতিরেকে ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি 'লীলাসহচরী' দেবীকে অনুগমন করেন। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে (খ্রিঃ ষোড়শ শতাব্দী) দেখি, চুরির অভিযোগ মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত সুন্দরকে বধ্যভূমিতে আনা হয়েছে, তখন ঃ-

"প্রিয়পুত্র চোর হৈল/ কোটাল মশানে লৈল
কালীর অন্তরে হৈল রোষ।
কাট বলি ডাকে তায়/যতেক ডাকিনী ধায়
উচ্চকণ্ঠে ঘর্ঘর নির্ঘোষ ।।"

তন্ত্রে এই অনুগামিনীদের দেবীর গণ বলা হয়েছে এবং পৃথক যন্ত্র ও মন্ডলক্রমে এঁদের পুজার ব্যবস্থা আছে।

ইতিহাস বলে, আনুমানিক চতুর্থ খ্রিস্টাব্দ থেকেই শক্তি উপাসনা একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্ম দেয় এবং সপ্তম খ্রিস্টাব্দের পর থেকে সম্প্রদায়ের উপর তন্ত্রের গভীর প্রভাব পড়ে। বিবর্তনের প্রায় সমান্তরাল ও সাদৃশ্যমূলক একটি ধারা গাণপত্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। গুপ্তযুগে অর্থাৎ খ্রিঃ চতুর্থ হতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে গণেশ ও শক্তি একই সঙ্গে তথাকথিক স্মার্ত পঞ্চায়তনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় উভয়েই মূর্তিতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে (Iconographic tradition) বেশিদিন পৃথক থাকতে পারেননি।

আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতেই একাধিক গজমুখী দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই মূর্তিগুলির অধিকাংশই পশ্চিম রাজস্থানে (রণথম্ভোর, উদয়পুর, মেরতা, অমজহর, দুঙ্গারপুর প্রভৃতি অঞ্চলে) উদ্ধার করা হয়েছে। মূর্তিতত্ত্বের সাক্ষ্য অনুযায়ী আদি মধ্যযুগে পশ্চিম রাজস্থান ও সংলগ্ন গুজরাট গাণপত্য সম্প্রদায়ের একটি বর্ধিষ্ণু প্রভাবক্ষেত্র ছিল। তাই এখানে গজমুখী দেবীমূর্তি গণপতি ও শক্তির এক সমন্বিত রূপ যার সঙ্গে অর্দ্ধনারীশ্বর, হরি অর্ধমূর্তি প্রভৃতির তুলনা করা চলে।

গজমুখী মূর্তিগুলির মধ্যে আজমের যাদুঘরে সংরক্ষিত অষ্টম শতাব্দীর একটি কালীমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালো মার্বেল পাথরে তৈরি মূর্তিটি দশমুন্ড ও চুয়ান্নটি হস্তবিশিষ্ট যা দেবী মাহাত্ম্যের প্রথম চরিত্রে বর্ণিত 'নীলকান্তমণিতুল্য প্রভাময়ী' যোগনিদ্রা বিষ্ণুমায়াস্বরূপা তমস্বিনী মহাকালীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মূর্তিটি পালি জেলার আওয়া গ্রামে পাওয়া গেছে। নৃত্যরতা দেবীর পদতলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য এক শব (শিব) শায়িত আছেন। মূর্তির মূল মুখমন্ডল ব্যতীত অন্য সবকটি মুখ জীবজন্তুর আদলে গড়া, তন্মধ্যে একটি গজমুন্ডও বিদ্যমা। এই ধরণের মূর্তি এককভাবে থাকলে একে ব্যতিক্রম মনে করা যেতে পারে। কিন্তু অনুসন্ধান করলে এই প্রকার প্রাচীনতর মূর্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। চিতোরের নিকটে মন্ডোরাগ্রামে একটি শিব মন্দিরগাত্রে গণপতির মূর্তিসহ আটজন মাতৃকার উৎকীর্ণ ভাস্কর্য (relief) পাওয়া গেছে। ভাস্কর্যটি ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর প্রত্ন নিদর্শন। অষ্টমাতৃকার মধ্যে এক গজমুখী দেবী আছেন। ডঃ জে. সি. অগ্রবাল মুম্বইস্থিত রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণা পত্রিকায় মূর্তিটিকে গণেশানী অথবা বৈনায়কীর মূর্তি বলে চিহ্নিত করেছেন (R. C. Agrawala, A Unique Matrka Relief from Rajasthan, J. B. R. S., Vol 43, Part 1-2)।

আনুমানিক দশম শতাব্দীর নির্মিত অনুরূপ এক গণেশানী মূর্তি উদয়পুরের নিকট কেকিন্দা গ্রামের একটি শিবমন্দিরে পাওয়া গেছে। তবে এই মূর্তির ক্রোড়ে একটি শিশু দেখা যায়। অর্থাৎ এটি নিছক শক্তিমূর্তি নয়, শক্তির মাতৃমূর্তি। অতএব ষষ্ঠ হতে দশম খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মূলত এক আঞ্চলিক মাতৃকা রূপে গজমুখী গণেশানী দেবী আত্মপ্রকাশ করেন এবং যুগপৎ ভাবে গাণপত্য ও শৈব শাক্ত দেবতাচিন্তার সমন্বয় সাধন করেন।

খ্রিঃ সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে তন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে পরিস্থিতি বদলে যায়। গণেশানী গণেশের সহচরী মাতৃকা অথবা গণপতিস্বরূপিনী মাতৃশক্তির পরিবর্তে গণেশের সহচরী লীলাসঙ্গিনী ভৈরবীতে পর্যবসিত হন। হরপার্বতীর যুগ্ম মূর্তির মত গণেশ ও তাঁর অভিন্ন হৃদয় শক্তি গণেশানীর শৃঙ্গারাত্মক মিথুনমূর্তি নির্মিত হতে থাকে। একই সঙ্গে রাজস্থান ও গুজরাটের গন্ডী পার করে গাণপত্য সম্প্রদায়ের একটি শাক্ত-তান্ত্রিক শাখা মধ্যভারতে, নর্মদা ও তুঙ্গভদ্রা পরিবৃত দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতীয় প্রাচীন মূর্তিলেখমালায় নারীর ভূমিকা

জগৎপতি সরকার

প্রাচীন ভারতবর্ষে সমাজে নারীর ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা যায়। আচার্য মনুর বিখ্যাত উক্তি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। যেখানে বাল্যে পিতা, কৌমারে ভর্তা, বার্ধক্যে পুত্র, অতএব স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য কোথায়? আমার মনে হয় তখনকার দিনে বেশিরভাগ মানুষই এই মতের অনুসারী ছিলেন। তবে ব্যতিক্রম ঘটেছে যুগে যুগে।

আমরা দেখেছি বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে নারীর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। আমরা দেখেছি সমাজ প্রগতির পথে নারীর পথ প্রদর্শনা। আমরা দেখেছি নারীকে অর্ন্তনিহিত সাধনালব্ধ সত্যকে আঁকড়ে ধরতে।

যাইহোক প্রাচীন ভারতবর্ষের মূর্তিলেখমালা পড়তে গিয়ে সেখানে নারীদের ভূমিকা নিয়ে অনেক উল্লেখ এসেছে। সেখানে দেখেছি পুরুষের সঙ্গে একেবারে তালে তাল মিলিয়ে সমাজ অর্থনীতি এবং প্রগতিতে সাহায্য করতে। শিল্পে তাদের ভূমিকা, ধর্মীয় সমাজে তার অসামান্য ভূমিকা, অর্থনীতিতে তাদের প্রত্যক্ষ যোগ প্রভৃতি। অনেক সময় সে যুগে দাঁড়িয়েও তারা গৃহগন্ডী বা ধর্মীয় গন্ডীর বাইরে এসে যোগ দিয়েছে মানবের হিত সাধনে। এযুগে দাঁড়িয়ে সে কথা আজ আমরা ভাবতে পারি না। সেই সমস্ত টুকরো টুকরো সংবাদকে একটি সূত্রে গ্রথিত করাই আমার এই উপস্থাপনার মূল লক্ষ্য। সেখানে দেখেছি নারীর বৈবাহিক জীবনই শেষ কথা নয়। নারীর জীবন তার নিজের। নারীর অপরিমিত শক্তি। সেই শক্তিতে সে স্বনির্ভর হতে পারে। শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী একথা বলতে পারি সেখানে নারী সুদূর প্রসারী দৃষ্টির এক ধারক এবং বাহক। সে একাধারে মূর্তি দান করছে। স্তূপ এবং মন্দির দান করছে, কৃষিতে কাজ করছে, শিল্পে হাত লাগাচ্ছে। নানাভাবে সে নিজেকে উন্মুক্ত করেছে সমাজ দর্পনে অপরকে পথ দেখাতে। সেখানে সে পথপ্রদর্শকের ভূমিকাও গ্রহণ করেছে বারবার।

গৌতম বুদ্ধের ধর্ম দর্শনের বস্তুগত ভিত্তি

মলয় বিশ্বাস

সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম হয়েছিল নেপালের তরাই অঞ্চলে, শাক্য বংশে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ সনে। তাঁর জন্মসন নিয়ে পন্ডিত মহলে মতান্তর আছে। তিনি ৩৯ বৎসর বয়সে 'বোধি' লাভ করে 'বুদ্ধদেব' হন।

তাঁর ধর্মদর্শনের উন্মোচিত দিকটি হল 'প্রজ্ঞা'। দুঃখ (দারিদ্র) মুক্তি।

বুদ্ধদেবের চিন্তার জগৎ, কর্মক্ষেত্র বস্তু বিযুক্ত ভাববাদী দর্শনে সম্পৃক্ত নয়। তার ভাবনায় যুক্ত হয়ে আছে সমাজ ভাবনা। বস্তু চেতনা। তিনি মুক্তির সূত্র খুঁজেছেন তৎকালীন চলে আসা ভারতীয় সমাজ দেহ কাঠামোয়। নগর কেন্দ্রিক বাণিজ্য বিত্ত ব্যবস্থার (Oriental Semi-Capitalist) মধ্য থেকে সঞ্জাত হয়েছে তার বিত্ত বোধ।

গণপ্রজাতান্ত্রিক শাসন কাঠামো থেকে আহরিত হয়েছে গণতান্ত্রিক সংঘ চেতনা। যুক্তিবাদ।

প্রাচীন বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া

প্রাচীন বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘারামগুলোকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্‌গাতা ছিলেন গৌতম বুদ্ধ এবং এর ক্রমবিস্তারে দায়িত্ব পালন করেছিলেন অভিজ্ঞ পন্ডিত ভিক্ষু-সঙ্ঘ। প্রথমাবস্থায় এতে শিক্ষানবীশ নবীন শ্রমণ বা উপসম্পন্নকে সঙ্ঘের নিয়ম-কানুন বা বিনয়বিধানসহ পিটকগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হত। এগুলো শিক্ষা গ্রহণ ছিল নবাগতদের অপরিহার্য। ফলশ্রুতিতে বিহার বা সঙ্ঘারামগুলোতে ধীরে ধীরে শাস্ত্রচর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারই এক একটি আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। পরবর্তীকালে এসব বিহারকেন্দ্রিক শিক্ষা নিকেতনের বেশ কযেকটি শিক্ষা ব্যবস্থার মান দেশ-বিদেশের জ্ঞানান্বেষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ বিদ্যা নিকেতনগুলোর আচার্য অধ্যাপকবৃন্দ চরিত্রবলে ও পান্ডিত্যে ছিলেন দেশের আদর্শস্থানীয়। বৌদ্ধযুগের বিহার-কেন্দ্রিক শিক্ষালয়গুলোর মধ্যে নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী, বল্লভী, জগদ্দল, সোমপুর, পন্ডিত প্রভৃতি বিদ্যায়তনের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। ফলে ভারতবর্ষসহ চীন তিব্বত প্রভৃতি দেশের শিক্ষার্থীরাও এসব শিক্ষানিকেতনে জ্ঞানাহরণের জন্য আগমন করতেন। এ শিক্ষাকেন্দ্রগুলো ছিল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জ্ঞানার্থী ও শিক্ষার্থীর জন্য অবাবিত। আর শিক্ষার পাঠ্য বিষয়ও ছিল সর্বজনীন। ধর্মশাস্ত্র বিশেষ করে পিটকশাস্ত্র অধ্যয়ন শ্রমণ উপসম্পন্নদের বাধ্যতামূলক হলেও সাধারণ ছাত্ররা তাদের পছন্দমত বৈষয়িক শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ পেত। এসব পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে আয়ুর্বেদবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, গণিতবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, শল্যবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, সাংখ্য, ন্যায়, পুরাণ, বেদ, দর্শন প্রভৃতি অন্যতম। প্রসঙ্গত প্রাচীন কালে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাব সাথে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল একক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী একজন গুরুর অধীনে গুরু-গৃহে শিক্ষা লাভ করত। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিষয়ও ছিল সীমিত ও সংকীর্ণ। ব্রাহ্মণ বা উচ্চ বংশ-জাত শিক্ষার্থী ব্যতীত অন্যদের এ শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল না। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা এ সংকীর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রবর্তন করে ব্যাপক বিষয়ভিত্তিক সঙ্ঘবদ্ধ সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা। ফলে এসকল বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে কোন কোনটিতে কয়েক হাজারে উন্নীত হয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এদের অন্যতম। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেছিলেন। তখন এটার অধ্যক্ষ বা উপাচার্য ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও দার্শনিক বাঙালি পন্ডিত শীলভদ্র। তখন একমাত্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েই দশ হাজার শিক্ষার্থী অধায়ন এবং হাজারাধিক অধ্যাপক অধ্যাপনা করতেন বলে জ্ঞাত

হওয়া যায়। অনুরূপভাবে অন্যান্য বিহার বিদ্যায়তনগুলোতে কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করত। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিরূপ ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছিল এবং ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বেই এসবের আবির্ভাব। বস্তুতপক্ষে নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি বিশ্ব শিক্ষা নিকেতনে প্রাচীন বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। কাজেই বলা অসঙ্গত হবে না যে, অতীতের বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচ্ছন্ন বা স্বচ্ছ প্রতিফলন ঘটেছে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে।

পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে জীবতত্ত্বের উৎস

জিনবোধি ভিক্ষু

ভগবান বুদ্ধের 'পালি ভাষা' একটি সুসমৃদ্ধ 'ভাষা'। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে তা অতীব প্রাচীন ভাষা হিসাবে প্রতিভাত হয়। এই ভাষা মাগধী ভাষারই নামান্তর। তথাগত বুদ্ধ বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই সহজ ও সর্বজনবোধ্য ভাষায় তাঁর বাণী ও শিক্ষা দিয়েছিলেন। পালি তখনকার প্রচলিত ভাষা ছিল। বুদ্ধের উপদেশাবলী যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল তাকে বলা হয় পালি ভাষা। এই ভাষাতে বৌদ্ধ শাস্ত্র ও ত্রিপিটক গ্রন্থসমূহ রচিত এবং সংরক্ষিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন রচনার ক্ষেত্রে পালি ভাষা ছিল শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। পালি ভাষা আমাদের মাতৃভাষার সূতিকাগার। পালি বা মাগধীর অপ্রভ্রংশ বাংলা ভাষার উৎপত্তি। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এই নতুন ভাষায় প্রথম গীতি কবিতা রচনা করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও মূলত পালি ভাষারই সুফল। তাই বৌদ্ধধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল — জীবতত্ব, মনস্তত্ব এবং কার্যকারণ নীতি প্রধান ধর্ম। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তথাগত বুদ্ধের এইগুলিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দান। তাঁর সমগ্র ধর্ম দর্শনই বাস্তব, যুক্তনিষ্ঠএবং আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। বর্তমান নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় জীবতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

গুপ্তযুগের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা (২৭৫ খ্রিঃ - ৫০০ খ্রিঃ) একটি সমীক্ষা

তপন কুমার মন্ডল

গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার যুগপরিবেশে গুপ্ত রাজাগণ তাঁদের শাসন ব্যবস্থার বিভিন্নস্তরে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসে একটি উদার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন ঘটিয়েছিলেন। অবশ্য বিকেন্দ্রীকরণ শাসন

নীতি গ্রহণ এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দান গুপ্তরাজাদের সদিচ্ছার প্রতিফলন ছিল কি না বা তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত গুপ্তরাজাদের বিকেন্দ্রীকরণ শাসননীতি ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রদানের নীতি গ্রহণে বাধ্য করেছিল কি না, তা একটি বিতর্কীত বিষয়। যাহোক, গুপ্তযুগের বিকেন্দ্রীকরণ শাসননীতির দৌলতে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা বর্তমান ভারতের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত দিকের সংগে মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বলা যায়।

যতদূর জানা যায় প্রাচীন কালের রাজাদের যে "ডিভাইন রাইট থিয়োরি" বা "দৈব ক্ষমতার তত্ত্বে" যে অটুট আস্থা ছিল তা গুপ্তযুগে ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শক্তির একক প্রাধান্যের গুরুত্বকে হ্রাস করে দিয়েছিল। রাজতন্ত্র এ যুগে সাম্রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক এক উপরি কাঠামোয় পরিণত করেছিল বলা যায়। যার ফলে শাসনতান্ত্রিক স্তর বিন্যাস এ ক্ষমতাভোগের যে চরিত্র তার পরিবর্তন ঘটে।

সম্ভবত এরূপ পরিবর্তনের ধারায় কেন্দ্রীভূত নির্জলা স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গুপ্তযুগে গড়ে উঠেছিল ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত "উদারনৈতিক রাজতন্ত্র", যে রাজতন্ত্রের শাসনে ক্ষমতা বিভাজিত হয়েছিল প্রদেশে, বিষয়ে বা জেলায় এবং সর্বপরি গ্রামীণ স্তরে। আর এরূপ ক্ষমতা বিভাজনের ফলে গড়ে উঠেছিল স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা।

গুপ্তযুগে শুধুমাত্র গ্রাম কেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা নয়। প্রদেশে ও জেলা স্তরেও স্বায়ত্তশাসন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি বর্তমান কালের ন্যায় ছিল না। গুপ্তযুগে রাজাদের কেন্দ্রীয় শাসন নীতিকে অনুসরণ করে প্রদেশ, জেলা, গ্রাম ইত্যাদি স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। সরকারি প্রতিনিধি স্থানীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত থাকতেন অথচ স্থানীয় প্রতিনিধিরাই স্থানীয় শাসনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন। প্রথা মাফিক এবং তাত্ত্বিক দিক থেকে এই সমস্ত শাসক কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতি আনুগত্যের বন্ধনকে অস্বীকার করতেন না।

গুপ্ত যুগে সর্বনিম্ন প্রশাসনিক বিভাগ ছিল গ্রাম। এক একটি গ্রামিকের অধীনে করে 'গ্রামসভা' গঠন করা হত। বলা যায়, গ্রাম সভাগুলি ছিল আধুনিক কালের গ্রাম পঞ্চায়েতের ন্যায়। এই গ্রাম সভাগুলির ছিল গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানিক রূপ।

অভিলেখ সাক্ষ্যের আলোকে প্রাচীন বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থা : পাল ও সেন যুগ

চিত্তরঞ্জন মিশ্র

প্রাচীন বাংলার রাজ্য-প্রশাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা খুবই কঠিন। কারণ আদিকাল থেকে সেন বংশের পতন পর্যন্ত সময়কালের বাংলার প্রশাসনিক

কাঠামোর ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয় উৎসের একান্তই অভাব। সাহিত্যিক উপাদান থেকে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক কিছু জানা গেলেও তাতে প্রশাসনিক রূপরেখার তথ্য একেবারেই সীমিত। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র সমসাময়িক লিপিমালায় প্রাপ্ত তথ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কিন্তু এ সকল লিপিমালায় রাষ্ট্র -প্রশাসন সংক্রান্ত সকল তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। এগুলিতে ভূমি দান-বিক্রয় সংক্রান্ত প্রশাসন-যন্ত্রের যে অংশের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন হয়েছে সে সমস্ত তথ্যসহ আরও কিছু কিছু তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পাল ও সেন যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে অভিলেখমালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

শিরোনাম ঃ বঙ্গ, বঙ্গাল এবং বাংলা নামের সন্ধানে ভূগোল আর ভাষা বিজ্ঞান

রাজকুমার জাজোদিয়া

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন - সুক্ষ্ম, তাম্রলিপ্ত, রাঢ়, পুন্ড্র, সমতট, গৌড়বঙ্গ ইত্যাদি।

সুক্ষ্ম ঃ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রবাহিত হচ্ছে নদী সুবর্ণরেখা। সুবর্ণরেখা সুবর্ণ শব্দের অনুকরণে সুক্ষ্ম নামটি আসাই স্বাভাবিক।

তাম্রলিপ্ত ঃ রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থান করছে তমলুক। ঐতিহাসিকদের মতে আজকের তমলুক হচ্ছে প্রাচীন কালের তাম্রলিপ্ত। একসময় রূপনারায়ণ নদের বালি বা পলিতে তাম্র মিশ্রিত ছিল। তাম্রলিপ্ত বালি বা পলি হচ্ছে তাম্রলিপ্ত। এই তাম্রলিপ্ত বালি বা পলি থেকে তাম্র ধাতু নিষ্কাশন করা হত। পরীক্ষা করলে হয়তো দেখা যাবে অন্যান্য বালির তুলনায় এখানকার বালিতে বেশি তামা পাওয়া যাবে।

রাঢ় ঃ ভাগীরথী নদীর পশ্চিম অঞ্চলে 'লাল' নামে পরিচিত ছিল। এ অঞ্চলের মাটির রঙ লালচে। লাল শব্দটি নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্তিত হয়।

গৌল — গৌড়

লাল — লাড় বা লাঢ় — রাঢ়

'ল' ধ্বনি 'ড়', 'ঢ়' বা 'র' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

গৌড় ঃ মালদহ এবং বাংলা দেশের রাজশাহী অঞ্চলে গঙ্গা এক বিরাট দ্বীপভূখন্ড তৈরি করেছে। এই দ্বীপটি গৌল গঙ্গা দ্বারা বেষ্টিত। তাই দ্বীপের নাম গৌল দ্বীপ বা গৌল। এই গৌল নামটি কালক্রমে গৌড় নামে পরিচিত হয়।

পুন্ড্র ঃ পদ্মানদীর উত্তর অঞ্চলে পরিচিত ছিল পুন্ড্র জনপদ নামে। পদ্মানদীর নামের অনুকরণে পুন্ড্র নামটি এসেছে।

মাতা পিতা — পুত্র — পৌত্র

পদ্মা — পুন্দ্র বা পুন্ড্র — পৌন্ড্র

পদ্মার অনুকরণে পুন্ড্র নামের ভূখন্ড হয়। আবার পুন্ড্রভূখন্ডের অধিবাসীরা পৌন্ড্র জাতি নামে পরিচিতি লাভ করে।

সমতট ঃ গঙ্গার অতি দীর্ঘমোহনা অতি ভগ্ন। সে তুলনায় প্রতিবেশী মেঘনার পূর্ব তটসম। সমতটই থেকেই সমতট হয়েছে।

বঙ্গ ঃ বঙ্গ নামটি প্রাচীন। ঐতরেয় আরণ্যকে 'বঙ্গ' নামটি পাওয়া যায়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ভাগীরথীর পূর্বে এবং পদ্মা, নিম্ন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার পশ্চিমে অবস্থিত ভূখন্ড বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। সহজভাবে বলতে গেলে গঙ্গা দ্বারা সৃষ্টি ব-দ্বীপ ভূখন্ডই ছিল বঙ্গ জনপদ। বঙ্গ ভূখন্ডের পূর্বে ভাগীরথী এবং পশ্চিমে পদ্মা ছিল। দক্ষিণে ছিল বঙ্গ উপসাগর অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর । পৃথিবীর সবথেকে বড় ব-দ্বীপ হচ্ছে বঙ্গ। এর আয়তন ১, ৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।

ইতিহাসের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভূগোল। মানব সভ্যতায় ভূগোলের মধ্যে নদীর গুরুত্ব সর্বাধিক। আমরা জানি সিন্ধু নদের নামের অনুকরণে হিন্দ, হিন্দুস্তান বা ইন্ডিয়া হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদের অনুকরণে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মদেশ হয়েছে। ঠিক এভাবেই গঙ্গা থেকে বঙ্গ হয়েছে। কীভাবে হয়েছে, তা খোঁজ করা দরকার।

গঙ্গা হিমালয়ের গোমুখ বা গঙ্গোত্রী বা দেবপ্রয়াগ থেকে যাত্রা শুরু করে হরিদ্বারের সমভূমিতে এসেছে। হরিদ্বার থেকে উত্তর প্রদেশ, বিহার অতিক্রম করে রাজমহল পাহাড়ের নিকট পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় প্রবেশ করেছে। মালদহের পরে মুর্শিদাবাদ বা কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলে গঙ্গা দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম ভাগ পদ্মানামে পরিচিত হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে এবং ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে অবশেষে নোওয়াখালির নিকট বঙ্গোপসাগরে মিলেছে। গঙ্গার দ্বিতীয় ভাগ ভাগীরথী নামে পরিচিত হয়ে কলকাতাকে পূর্বে রেখে অবশেষে গঙ্গাসাগরের নিকট বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। ভাগীরথী এবং বঙ্গোপসাগরের মিলনস্থানের নামে হয়েছে গঙ্গাসাগর। গঙ্গা আর সাগরের মিলন। পূর্ব ভারতে এক প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। বলার তাৎপর্য হচ্ছে, ভাগীরথীকেই মূল গঙ্গা ধরা হত।

এখন বিষয়টি প্রাচীন নৌকাচালক বা যাত্রীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত নৌ প্রবাহযোগ্য প্রবাহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) হরিদ্বার থেকে বারাণসী পর্যন্ত প্রবাহ হচ্ছে পূর্ব-দক্ষিণমুখী। (২) বারাণসী থেকে রাজমহল পর্যন্ত প্রবাহ হচ্ছে প্রায় পূর্বমুখী। (৩) রাজমহল থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত প্রবাহ হচ্ছে দক্ষিণমুখী। গঙ্গার প্রথম দু-ধারায় হিমালয়, বিন্ধ্য ও আরাবল্লী থেকে অনেক উপনদী গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। গঙ্গার বামতীরে পূর্বতম সীমায় রয়েছে কোশী

উপনদী। গঙ্গার নিম্ন বা দক্ষিণ প্রবাহ ভাগীরথী এক প্রাকৃতিক সীমানা তৈরি করেছে। গঙ্গা যেখানে পূর্বমুখী থেকে দক্ষিণমুখী হয়েছে সেই অঞ্চলে গঙ্গার অভ্যন্তরীণ ভূখন্ড অঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে ভাগলপুর অঞ্চলে বলা যায়। আবার অঙ্গের বাইরে অর্থাৎ ভাগীরথী-গঙ্গার পূর্ব অঞ্চল বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। অঙ্গ থাকলে বঙ্গ থাকা স্বাভাবিক। অঙ্গের অবস্থান ছিল গঙ্গার সীমানার ভিতর এবং বঙ্গের অবস্থান ছিল গঙ্গার সীমানার বাহিরে। অঙ্গ আর বঙ্গ ছিল প্রতিবেশী। বিভাজিকা রেখা ছিল ভাগীরথী অর্থাৎ গঙ্গা। তাই বিষয়টি নিম্নলিখিত ভাবে লেখা যায়।

অন্তর্গঙ্গা — অগঙ্গা — অঙ্গা — অঙ্গ

বহির্গঙ্গা — বগঙ্গা — বঙ্গা — বঙ্গ

'বঙ্গ' শব্দ বা নামের উৎস জানা গেল। এই বঙ্গ নামটি প্রথম পর্যায়ে 'বঙ্গাল' নামে রূপান্তরিত হয়। উল্লেখ্য, উত্তর ভারতীয়রা এখনো বঙ্গাল বলেন বা লেখেন। প্রাচীন সাহিত্য চর্যাগীতিতে 'বঙ্গালী' শব্দ বা নামটি পাই। এই বঙ্গালী শব্দে লুকিয়ে রয়েছে 'বঙ্গাল' নামটি। সহজভাবে বলা যায় বঙ্গালী শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে 'বঙ্গাল' শব্দটি। এই বঙ্গাল নামটি কীভাবে এল তা বিচার করা যাক।

আমরা জানি, ঘাট থেকে ঘাটাল, লিঙ্গ থেকে লাঙ্গল এবং হাত থেকে হাতল শব্দ এসেছে। কিছু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে মূল শব্দ ঘাট, লিঙ্গ এবং হাত শব্দের সঙ্গে 'ল' ধ্বনি যুদ্ধ হয়ে ঘাটাল, লাঙ্গল বা হাতল শব্দগুলি এসেছে। এখানে ঘাট, লিঙ্গ বা হাত ক্ষুদ্র আয়তন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার ঘাটাল, লাঙ্গল বা হাতল শব্দগুলি বৃহৎ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং বঙ্গ সাধারণ আয়তন অর্থে এবং বঙ্গাল বৃহত্তর আয়তন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন বাংলা নাম কীভাবে এল। আমরা জানি, মেঘ থেকে মেঘলা এবং জল থেকে জলা (ভূমি) শব্দগুলি এসেছে। ঠিক এভাবেই বঙ্গ বা বঙ্গাল থেকে বাঙলা বা বাংলা নামটি এসেছে। কিছু ভাবলে বোঝা যাবে, বঙ্গ থেকে বাংলা পরিবর্তনের অন্তিম প্রক্রিয়া বাংলার মানুষ দ্বারাই হয়েছে। কালচক্রে বঙ্গের পরিধি বাড়তে থাকে এবং সুক্ষ্ম, তাম্রলিপ্ত, রাঢ়, পুন্ড্র, সমতট, গৌড়, বঙ্গ ইত্যাদি সবই বাংলা নামে পরিচিতি লাভ করে। সুতরাং বাংলা বলতে সম্পূর্ণ বাংলা ভূখন্ডকেই বোঝায়। যদিও বর্তমানে পূর্ববাংলা বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলা পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত। যাই হোক আমরা শুধু যুক্তি বা শুধু বিশ্বাসকে ভিত্তি করে বাঁচতে পারিনা। আমাদের বাঁচতে হয় দুটোকে সমন্বয় করে।

উত্তর ভারতের আদি ও মধ্যযুগীয় (৬০০-১২০০ খ্রিঃ) মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতুর গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য

শিল্পী গাঙ্গুলী

কোন যুগের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তৎকালীন মুদ্রাব্যবস্থার মাধ্যমে বহুলাংশে বিশ্লেষণ করা যায়।

গুপ্তোত্তর যুগ থেকে প্রায় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত উত্তরভারতে উল্লেখযোগ্যভাবে স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যাল্পতা লক্ষ্য করা যায়। বৃহৎ (বাণিজ্যিক) ব্যবসায়িক আদানপ্রদান তথা অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল।

অন্যদিকে, আঞ্চলিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহৃত হত, প্রাত্যহিক প্রয়োজনে তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল।

উপেন্দ্র নাথ ঠাকুর[১] বিভিন্ন দেশীয় উৎসের বিবরণ দিলেও মূলত রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষে স্বর্ণ আমদানি হত। আমদানিকৃত স্বর্ণ থেকে মুদ্রা প্রস্তুত হত।

কিন্তু হূণ আক্রমণজনিত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট গুপ্তসম্রাটদের হস্তচ্যুত হওয়ায় রোমের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অষ্টম শতকে আরবগণ সিন্ধুদেশ অধিকার করে। কালক্রমে তারা আরবসাগরীয় বাণিজ্যের উপর একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করে ভারতীয় বণিকদের উচ্ছেদ করে। নবম শতকের মধ্যভাগে ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। এর পরিণতিতে স্বর্ণ আমদানি বন্ধ হয়ে যায়, স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনও হ্রাস পায়। দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় শুরু হয়। তবে স্বর্ণ উৎপাদনকারী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকায় কাশ্মীর, বাংলা এবং বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি স্থানে নিম্নমানের স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল।

কাশ্মীর ঃ-

মধ্যএশিয়ার সহিত কাশ্মীরের স্থলপথে সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক সম্পর্কের ফলে কাশ্মীরে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে মধ্যএশিয়ার বাণিজ্য মুসলমানদের অধিকারে আসে। কিন্তু কাশ্মীরের কারকোটা রাজবংশের আমলে পূর্বাঞ্চলের প্রতিবেশী রাজ্যগুলি যেমন নেপাল, তিব্বত এবং চীনের সহিত কাশ্মীরের বাণিজ্য শুরু হয়। ইহার

পরিণতিস্বরূপ, কাশ্মীরে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি শুরু হয়। কিন্তু কারকোটা রাজবংশের পতনের পর কাশ্মীরে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ধ্বংস হয়, বাণিজ্যে মন্দা শুরু হয় এবং কাশ্মীরে তাম্রমুদ্রার প্রচলনের সূত্রপাত ঘটে।

মধ্যভারত ঃ- ত্রিপুরীর কলচুরী রাজা গাঙ্গেয়দেব (১০১৯-১০৪১ খ্রিঃ) উপবিষ্টা লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি অঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন।[২] মধ্যএশিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একাদশ শতকের প্রারম্ভে দূরপ্রাচ্য, সুমাত্রা, জাভার সহিত বাণিজ্যের মাধ্যমে সুবর্ণের আমদানি হত। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য উড়িষ্যার বন্দরগুলির মাধ্যমেই হত। ফলে কলচুরী রাজাদের সহিত উড়িষ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

কলচুরীদের অনুকরণে বুন্দেলখন্ডের চন্দেল্লা রাজগণ, মালবের পরমার রাজগণ এবং গাহড়বাল রাজা গোবিন্দচন্দ্র স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন।

বঙ্গদেশ ঃ- গুপ্তোত্তর যুগে বাংলাদেশে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। সমাচারদেব, শশাঙ্ক, জয়নাগ গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রার অনুকরণ করেন। স্বর্ণ উৎপাদনকারী দেশগুলি যেমন চীন,[৪] কামরূপ[৫], তিব্বত[৬], মালয় দ্বীপপুঞ্জের[৭] সহিত বহির্বাণিজ্য চলায় বঙ্গদেশে সুবর্ণের আমদানি ছিল। ফলে শাসকগণ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনে সক্ষম হন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির যে অবনতি ঘটে পাল সেন যুগে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলেও পাল সেন যুগে কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত না হওয়ায় সামুদ্রিক বাণিজ্যের অবনতি হয়েছিল বলা যায়।

সুতরাং, বলা যায়, মুদ্রার প্রয়োজনে ব্যবহৃত স্বর্ণের সিংহভাগই বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতে আমদানি হত। যখন স্বর্ণ সরবরাহকারী দেশগুলির সহিত ভারতের সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল তখন ভারতে উন্নতমানের স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। কিন্তু গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের বহির্বাণিজ্য ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ আমদানি বন্ধ হয় যার পরিণতিতে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনও হ্রাস পায়। রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার প্রচলন শুরু হয়।

রৌপ্যমুদ্রার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় হীরাট ও আফগানিস্থান থেকে রূপা আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।[৮]

তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার কয়েকটি অঞ্চলে সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন অব্যাহত ছিল। অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার ময়নামতীতে[৯] খননকার্যের ফলে যে অসংখ্য রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাংলায় রৌপ্য খনি না থাকলেও রৌপ্য উৎপাদনকারী অঞ্চল

আরাকানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্কের ফলেই যথেষ্ঠ পরিমাণে রৌপ্য আমদানি করা হয়েছিল।[১০] চট্টগ্রামের সমুন্দর বন্দরের মাধ্যমে আরাকান থেকে ময়নামতীতে রৌপ্য আমদানি করা হত।[১১]

তাম্রমুদ্রার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রাজস্থান, বিহার,[১২] বালুচিস্তানের[১৩] খনি থেকে যে তাম্র উত্তোলিত হত তা মুদ্রা প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হত। সুতরাং প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মুসলিম বিজয়াভিযানের সময় পর্যন্ত উত্তর ভারতে তাম্রমুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল।

বস্তুত, অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে মুদ্রায় ধাতু ব্যবহৃত হত। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মানের উপর মুদ্রান্তরের মানের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভরশীল ছিল। সমৃদ্ধ বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে যখন ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্য নিয়মিতভাবে আমদানি হত তখনই উচ্চমানের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ছিল। এ প্রসঙ্গে গুপ্তযুগের উল্লেখ করা যায়। কিন্তু বহির্বাণিজ্যের অবনতির ফলে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার সংখ্যাল্পতা লক্ষ্য করা যায় এবং ধাতুতে খাদমিশ্রণের শুরু হয়।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অবনতি হয়। দশম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে গুর্জর প্রতিহার বংশের পতনের ফলে অসংখ্য পরস্পর বিবদমান রাজ্যের উদ্ভবে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সড়কগুলির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, উচ্চহারে শুল্ক আদায়ের ফলে বণিকদের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই অনিশ্চিত পরিস্থিতি ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল ছিল না। অধিকন্তু, পুনঃপুনঃ মুসলমান আক্রমণে জীবন ও সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা ছিল না। সুলতান মামুদের বারংবার আক্রমণে দেশের সঞ্চিত সম্পদ লুণ্ঠিত হয়। পরিণতিতে, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। উত্তরভারতে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা দেখা যায়। বহির্বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিপর্যয়ের ফলে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। ব্যবসা বাণিজ্যে শাসকশ্রেণীও আগ্রহ হারায়। এই পরিস্থিতিতে জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে মুদ্রার ব্যবহার আরও সীমিত হয়। দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাম্রমুদ্রার ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক আদানপ্রদান এবং সীমিত অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণী বিলিয়ন[১৪] অথবা রৌপ্য ও তাম্রমিশ্রিত মুদ্রার ব্যবহার শুরু করেন।

এই ভাবে উক্ত সময়ে উত্তরভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

সূত্র নির্দেশ :—

১। 'জার্নাল অব দি নিউমিসমেটিক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া', খণ্ড নং ৩৯, পৃঃ ৮৯-৯৬।

২। 'দি কয়েনেজ অব নর্দান ইণ্ডিয়া'— রায়, পি. সি.।

৩। 'জার্নাল অব দি নিউমিসমেটিক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া', খণ্ড নং ৪৫, পৃঃ ১৫৭।

৪। 'জার্নাল অব দি নিউমিসমেটিক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া', খণ্ড নং ৩৪, পৃঃ ১০১

৫। 'দি ইকোনমিক কণ্ডিশন অব অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া'— দেবী সুশীল মালতী পৃঃ-৩১৭।

৬। 'জার্নাল অব দি নিউমিসমেটিক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া', খণ্ড নং ৪৫, পৃঃ ১৬১-১৬২।

৭। দি ইকোনমিক কণ্ডিশন অব অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া'— দেবী সুশীল মালতী পৃঃ-৩১৭।

৮। 'কয়েনস অফ ইণ্ডিয়া'—ব্রাউন, সি. জে. পৃঃ-৫৫।

৯। 'জার্নাল অব দি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম' খণ্ড নং ৭, পৃ-৮২।

১০। 'জার্নাল অব দি নিউমিসমেটিক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, খণ্ড নং ৪৫, পৃঃ ১৬৩।

১১। ঐ পৃঃ - ১৫৯-১৬০।

১২। 'কয়েনস অফ ইণ্ডিয়া'—ব্রাউন, সি. জে. পৃঃ-৭৩।
'এক্সক্যাভাশন অ্যাট হরপ্পা', প্রথম খণ্ড, — ভাটস, এম. এস. পৃঃ - ৩৭৮-৩৭৯।

১৩। 'কয়েনস অফ ইণ্ডিয়া'—ব্রাউন, সি. জে. পৃঃ-৭৩।
'দি কপারব্রোঞ্জ এজ ইন ইণ্ডিয়া' --
-আগরওয়াল, ডি. পি. পৃঃ ১৪৫।

১৪। 'কয়েনস অফ মিডিয়াভ্যাল ইণ্ডিয়া'
- কানিংহাম, আলেকজান্ডার পৃঃ - ৮৯।

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ—

১। 'দি ইকোনমিক লাইফ অব নর্দান ইণ্ডিয়া'
—গোপাল, লালনজী।

২। 'আর্লি মিডিয়াভ্যাল কয়েন টাইপ অব নর্দান ইণ্ডিয়া'
—গোপাল, লালনজী।

৩। 'ইণ্ডিয়ান কয়েনস' — র‍্যাপসন, ই. জে.

৪। 'ক্যাটালগ অব দি কয়েনস ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম' প্রথম খন্ড
—স্মিথ, ভি. এ.

৫। 'ইণ্ডিয়ান ফিউডালিজম' — শর্মা, আর. এস.

বাঙলার মন্দির-লিপি ঃ মধ্যযুগ

প্রণব রায়

বাঙলায় মন্দির স্থাপত্যশৈলী ও তার অলঙ্করণ নিয়ে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়, তার চূড়ান্ত পরিণতি লক্ষ্য করা যায় মধ্যযুগের শেষ কয়েক শতকে খ্রিস্টীয় পনের শতক থেকে আঠার শতকের মধ্যে। এই দীর্ঘ পাঁচশ বা সাড়ে পাঁচশ বছরে বাঙলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য তার সম্পূর্ণ এক নিজস্ব রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়েই সৃষ্টি হয় বাঙলার নিজস্ব 'চালা', 'জোড়বাঙলা', 'চাঁদনি', 'দালান', 'দেউল' ও রত্নমন্দির।

ইঁট বা পাথরে তৈরি মন্দিরে যে লিপিফলকগুলো বসানো হত, সেগুলোতে শুধুমাত্র যে মন্দির-প্রতিষ্ঠাকাল, মন্দির স্থপতি বা প্রতিষ্ঠাতার নাম বা পরিচয় লিপিবদ্ধ হত, তাই নয়, সমকালীন কিছু কিছু ঘটনা বা ঐতিহাসিক ঘটনারও উল্লেখ থাকত। এর অনেকগুলি এখনও অক্ষত আছে। এর মধ্যে চন্দ্রকোণার রঘুনাথ বাড়িতে রক্ষিত অধুনালুপ্ত গিরিধারীলাল জীউর 'নবরত্ন' মন্দিরে পাথরের বৃহৎ লিপিফলকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ লিপিফলকটি কয়েক বছর আগে স্থানীয় রামানুজ 'অস্থলে' (মঠে) স্থানান্তরিত হয়েছে। এর থেকে জানা যায় খ্রিস্টীয় সতের শতকে চন্দ্রকোণার 'ভান'- বংশীয় রাজাদের পরিচয়।[১] ৬১ সে.মি. ৪৮ সে.মি. মাপের এই শক্ত পাথরের ফলকে ১১ সারির সংস্কৃত লিপিতে 'ভান' বংশের পর পর রাজা বীরভান, হরিভান, তাঁর রাণী লক্ষণাবতী, পুত্র রাজা মিত্রসেনের উল্লেখ আছে। পার্শ্ববর্তী, 'ভূম'-রাজ্য মল্লভূমের রাজপরিবারের সঙ্গে এঁদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মন্দিরটি ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়, সম্ভবত শহর চন্দ্রকোণার বাইরে লালগড়ে। বহুকাল আগে স্বস্থানচ্যুত এই লিপি ফলকটি সেকারণে বিশেষ মূল্যবান।

আমাদের এই নিবন্ধে বাঙলার শেষ মধ্যযুগের মন্দির লিপিগুলিই প্রধান আলোচ্য। খ্রিস্টীয় পনের শতকের শেষ ভাগ থেকে যে সব মন্দির নির্মিত হয়েছিল, সেগুলিতে বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষায় লিপি পাওয়া যায়। অক্ষর ছিল বাঙলা। খুব কম ক্ষেত্রে 'নাগরি' — অক্ষরে খোদিত সংস্কৃত লিপি দেখা গেছে।[২] বেশিরভাগ লিপিতে (এক্ষেত্রে পোড়ামাটির লিপিফলকের সংখ্যাই বেশি) প্রতিষ্ঠাকাল জ্ঞাপক শুধুমাত্র শকাব্দ বা 'শকাব্দ' ও 'বঙ্গাব্দ' — দুইয়েরই উল্লেখ আছে। প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখের আগে প্রতিষ্ঠাতার ইষ্টদেবতা বা যে দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দির সমর্পিত হচ্ছে তাঁর নামের

উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দুটি বিষয় মন্দির-লিপিতে আবশ্যিক ভাবে স্থান পেয়েছে। শকাব্দের উল্লেখ অনেক ক্ষেত্রে অঙ্কে করা হলেও প্রহেলিকার মাধ্যমে উল্লেখ করাও ছিল সেকালের রীতি। এই রীতি প্রাচীন পুঁথিপত্রের পুষ্পিকায় প্রচলিত ছিল। কোন কোন সময় মন্দিরলিপিতে শুধুমাত্র প্রহেলিকার মাধ্যমেই শকাঙ্ক উল্লেখিত হত।[৩]

লিপিতে মন্দির-প্রতিষ্ঠাকালের পর কোন কোন সময় মন্দিরের স্থপতি বা সূত্রধর এবং মন্দির প্রতিষ্ঠাতার নাম ও ঠিকানার উল্লেখ ছিল।[৪] দক্ষিণ বা নিম্নবঙ্গের অসংখ্য ইঁটের মন্দিরে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মল্লভূম — বিষ্ণুপুরের ইঁট বা পাথরে নির্মিত কোন কোন মন্দিরেও এই স্থপিত সূত্রধর, এমন কি প্রতিষ্ঠাতা রাজার নামেরও উল্লেখ আছে। বলা যায় যে, স্থপতি ও ভাস্করেরা মন্দির নির্মাণ করে সমাজে যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করতেন।[৫]

মন্দির লিপিতে শকাব্দের ব্যবহার দীর্ঘকাল ছিল। খ্রিস্টীয় সতের শতকের আগে সম্ভবত বঙ্গাব্দের প্রচলন হয় নি। ঘাটাল শহরের কোন্নগর পল্লীতে সিংহবাহিণীর যে 'চারচালা' মন্দির আছে, সেটি খ্রিস্টীয় পনের শতকের শেষ দশকে নির্মিত। সেখানে প্রতিষ্ঠাকাল ১৪১২ শকাব্দ (১৪৯০ খ্রি) এবং সংস্কারকাল ১৭১৭ শকাব্দের (১৭৯৫ খ্রিঃ) উল্লেখ আছে।[৬] বঙ্গাব্দের কোন উল্লেখ নেই। ষোড়শ শতকে নির্মিত মন্দিরেও বঙ্গাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অন্তত ওই সময়ের পুঁথিগুলির পুষ্পিকাতে শকাব্দেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা যায় যে বঙ্গাব্দের প্রচলন মুঘলসম্রাট আকবরের রাজত্ব কালের পর থেকে চলিত হয়েছিল। খ্রিষ্টীয় সতের শতকের প্রথমার্ধ থেকে মন্দির লিপিতে শকাব্দের সঙ্গে বঙ্গাব্দও চলিত হতে থাকে।

শকাব্দ - বঙ্গাব্দ ছাড়া মন্দিরলিপিতে মল্লাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে, সেগুলি সবই প্রায় বাঁকুড়া - বিষ্ণুপুর ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী কোন কোন অঞ্চলের মন্দিরে।[৭] ৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে মল্লাব্দের শুরু। মল্লভূম-বিষ্ণুপুর ও আশপাশের অনেক মন্দিরে মল্লাব্দ থেকে প্রতিষ্ঠাকাল নির্ণয় করতে পারা যায়। গড়বেতা শহরে 'শ্রীমল্লভূরমণ দুর্জন সিংহদেব' ৯৯২ মল্লাব্দে বা ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণের জন্য একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি 'আটচালা'-শৈলীর মাকড়া পাথরে তৈরি এবং এখনও সেটি অক্ষত আছে। কিন্তু এই মল্লাব্দ মন্দির-লিপিতে তেমন প্রচলিত হতে পারে নি।

রাজ-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির বেশির ভাগেরই লিপি শক্ত মুগ্‌নি বা ক্লোরাইট্ পাথরে খোদিত থাকায় সেগুলির প্রায় সবই অক্ষত আছে। এমন কি, ইঁটের মন্দিরেও রাজা জমিদারেরা পাথরের লিপি বসিয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরের প্রায় সব মন্দিরেই এই ধরণের লিপি পাওয়া যায়, যেমন মদনমোহন (১৬৯৪ খ্রি:), কেষ্টরায় (১৬৫৫ খ্রি:) প্রভৃতি মন্দিরে। কিন্তু পোড়ামাটির ফলকে খোদিত লিপিই বেশি দেখা যায়, যদিও সে ক্ষয়ের

ফলে এ ধরণের বহু লিপি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কয়েকটি ইঁটের মন্দিরে পোড়ামাটির লিপি ফলক অক্ষুণ্ন আছে। উদাহরণ স্বরূপ, দাসপুর থানার রাধাকান্তপুর গ্রামের গোপীনাথজীউর 'একরত্ন' মন্দিরের দেওয়ালে নয় সারির লিপি আজও অক্ষত আছে।[৮]

মধ্যযুগের শেষে বাঙলার মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজা জমিদার এবং ধনী ব্যবসায়ী বণিক সম্প্রদায়। তাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি 'টেরাকোটা'-অলংকরণে পূর্ণ। কিন্তু মধ্যবিত্ত বা কিছুটা সম্পন্ন ব্যক্তিরাও অজস্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার কোন কোনটির দেওয়ালও 'টেরাকোটা ফলকে ছাওয়া হত এবং প্রতিষ্ঠাতা লিপিফলকও থাকত। অনেকগুলিতে প্রতিষ্ঠাতা মন্দিরস্থপতি-সূত্রধরের নামটাই দিতেন বেশি। অনেক লিপি ফলকে প্রতিষ্ঠাতার নামও পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে শ্রীধরজীউর মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তন্তুবায় জাতীয় কানাই রুদ্র দাস। তাঁর নামের সঙ্গে মন্দিরস্থপতি হরি সূত্রধরের নাম আছে।[৯] সম্ভবত এই 'হরি সূত্রধর' রামহরি সূত্রধর হতে পারেন। তিনি সোনামুখীরই একটি দেউল এবং বর্ধমানের কালনার প্রসিদ্ধ প্রতাপেশ্বর দেউল (১৮৪৯ খ্রি) নির্মাণ করেন। বাঁকুড়ার সোনামুখী এক তন্তুবায় প্রধান স্বচ্ছল গ্রাম ছিল। আর একজন তন্তুবায় চন্দ্রকোণার নিমাইচরণ দাসদত্ত ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণের একটি প্াথরের চাঁদনি মন্দির ওই শহরের মিত্রসেনপুর পল্লীতে প্রতিষ্ঠা করেন।[১০]

সেকালে স্বল্পবিত্তশালী বণিকসম্প্রদায় একজোট হয়েও কখনও কখনও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন ঐ মিত্রসেনপুরের তাম্বুলিজাতীয় কয়েকজন বণিক সমবেতভাবে কলকলি দেবীর একটি 'পঞ্চরত্ন' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ১২৯৭ বঙ্গাব্দ বা ১৮৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে। অল্প দুরে গোবিন্দপুর পল্লীতে খলসা শিবের 'আটচালা' - রীতির মন্দিরও তাম্বুলিদের প্রতিষ্ঠিত। শহর মেদিনীপুরের জগন্নাথ মন্দিরচকে জগন্নাথের উচ্চ দেউল মন্দির। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়।[১১] রামজীবনপুরের (চন্দ্রকোণা থানা) কর্মকার-জাতীয় বংশীধর দাস প্রামাণিক দামোদরের একটি পঞ্চরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৪০ খিস্টাব্দে। এখানে মন্দিরলিপিতে রামজীবনপুরেরই এক মন্দিরস্থপতি পেলারাম সূত্রধরের নাম আছে।[১২]

কোন কোনটি মন্দির লিপি থেকে তৎকালীন মন্দির প্রতিষ্ঠার খরচার কথা জানা যায়। এঁরা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক ছিলেন। ডিহিচেতুয়া গ্রামের (দাসপুর) এক বিধবা মাধবী দাসী ও তাঁর ছেলে নবীনচন্দ্র বেরা ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে চাঁদনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ৩৫০ টাকা খরচে। সাম্প্রতিক কালে মন্দিরসংস্কারের সময় ওর লিপিটি নষ্ট করে ফেলা হয়। বর্তমান লেখকের পাঠোদ্ধার করা লিপিটি প্রকাশ করা হল।

শ্রীশ্রী* শীতলা ঠাকুরাণি / শকাব্দ ১৮০৫ শন ১২৯০ সাল/

প্র: শ্রীমত্যা মাধবি দাসি / তস্ব পুত্র শ্রীনবীনচন্দ্র বেরা/

শা: ডিহি চেওয়া প: চেওয়া/শ্রী উদয়চন্দ্র মিস্ত্রি/ এই মণ্ডপে ৩৫০ টাকা খরচ।

প্রঃ - প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠাত্রীর মন্দিরটি চেতুয়া পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে মন্দিরটির স্থপতি উদয়চন্দ্র মিস্ত্রীর নামও আছে। এরকম বহু মন্দিরে প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে মন্দিরমিস্ত্রীর নামও উল্লেখ করা হয়েছে বা অনেক জায়গায় শুধুমাত্র মন্দিরমিস্ত্রীর নামেরই উল্লেখ আছে।

লিপিতে মন্দিরস্থপতি সূত্রধরের নামের উল্লেখ সাধারণভাবে আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকেই বেশি দেখা যায়। মধ্যবিত্তদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেই এটা বেশি করে লক্ষ্য করা যায়। বিত্তশালী বা রাজা - জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেও স্থপতি সূত্রধরের নামের উল্লেখ আছে। কোন কোন প্রধান মিস্ত্রী মন্দিরলিপিতে পদ্য লিখে খোদাই করে দিয়েছেন। যেমন, উনিশ শতক দাসহরের এক প্রসিদ্ধ মন্দিরস্থপতি সূত্রধর ছিলেন ঠাকুরদাস শীল। তিনি অনেক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ডেবরা থানার বলরামপুরে সীতারামের দেউল মন্দির (১৮৬০-১৮৬১ খ্রি.) নির্মাণ করেন। এর পশ্চিম দিকের দেওয়ালে পঙ্কচুণে খোদিত একটি পদ্যে মন্দিরপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। লিপিটি থেকে জানা যায় যে ঐ কাজে তাঁর সঙ্গে আটজন লোকও যুক্ত ছিল।[১৩]

মন্দির স্থপতিরা প্রধানত 'সূত্রধর'- সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। একসময় তাঁদের উপজীবিকাই ছিল মন্দিরশিল্প ও তার অলংকরণ। সূক্ষ্ম সূত্রের সাহায্যে মাপ নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন শৈলীর মন্দির-নির্মাণে অশেষ দক্ষ ছিলেন। পাথর ও ইঁটের অসংখ্য মন্দির তাঁরা তৈরি করেছেন। অনেক মন্দিরের দেওয়াল 'টেরাকোটা' ও প্রস্তর ভাস্কর্যফলক দিয়ে অলংকৃতও করেছেন। এই সূত্রধর সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠী শুধুমাত্র কাষ্ঠতক্ষণ শিল্পে ও অন্য গোষ্ঠী চিত্র অঙ্কনে নিযুক্ত থাকতেন। সূত্রধরদের বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল কয়েকটি জেলাকে কেন্দ্র করে। এই গোষ্ঠী বা থাকের নামগুলি হল ঃ ১. বর্ধমান থাক — বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং মুরশিদাবাদ অঞ্চল নিয়ে; ২. অষ্টকুল থাক — পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী এবং নদীয়ার কিছু অংশ নিয়ে; ৩. ব্রহ্মযষ্ঠীয় থাক — যশোর, খুলনা এবং নদীয়ার অংশ নিয়ে এবং ৪. পূর্ববঙ্গ থাক — উত্তর ও পূর্ব বাঙলা এবং অসম নিয়ে।[১৪]

আঠার - উনিশ শতকের মন্দিরলিপিতে সূত্রধরদের নাম - ঠিকানা থেকে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি প্রমাণ পাওয়া যায় মেদিনীপুর জেলার বহু মন্দির লিপিতে। এই জেলার দাসপুর, কলমীজোড়, ক্ষীরপাই, কাশীগঞ্জ, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, রাজহাটী পাথরা (কোতোয়ালি যাশ) এবং সেনহাটী (হুগলী), ময়াল

বন্দীপুর (হাওড়া) থেকে পাটওরা যায়। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, সোনামুখী ও বালসী এবং হাওড়া জেলার থলিয়া - রসপুর গ্রামে একসময় মন্দির সূত্রধরদের বসতি কেন্দ্রীভূত ছিল। মেদিনীপুর জেলার দাসপুরে আঠার-উনিশ শতকে বহু মন্দির সূত্রধর বাস করতেন। তাঁদের সৃষ্টি মন্দির এখনও দাসহর অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় এঁদের পদবী ছিল শীল, দে, চন্দ, দাস, সাঁই। লিপিসমূহে দেখা যায়, নিজেদের পদবীর পাশে এঁরা পরিচয়জ্ঞাপক 'মিস্ত্রী', 'ছুতোর' বা 'সুত্রধর' পদগুলিও ব্যবহার করতেন।[১৫] সোনামুখীর দেওয়ানবাজারে মন্দিরনির্মাতা সূত্রধরদের বসতি ছিল। তাঁদের মধ্যে গদাই মিস্ত্রী, ঋষি মিস্ত্রী এবং ভোলা মিস্ত্রীর কারিগর হিসেবে বেশ নাম ছিল। এইসব মিস্ত্রী বাঁকুড়া ও বর্ধমানের কোন কোন স্থানে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

পূর্বোক্ত রাধাকান্তপুরের (দাসপুর) মন্দিরে পোড়ামাটির ফলকে যে নয় সারির বাঙলা লিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে ঐ মন্দিরটির সংস্কার হয় ১২৫১ বঙ্গাব্দ (১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে)। তার দু'শ বছর আগে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। এই লিপিতে বলা হয়েছে, শ্যামদাস নামে এক ব্যক্তি ওই মন্দিরে গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করে তাঁর গড়বাড়ি সুরক্ষিত করার জন্য চরাপাশে পরিখা খনন করান। এর পর একটি বড় পুকুর কাটান। ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন শোভা সিংহ। ঐ সময়ে তাঁর দরকারের লোক না পাওয়াতে, তিনি শ্যামদাসের মাথা কেটে ফেলার আদেশ দেন। কিন্তু দেখা গেল, শ্যামদাসের কাটা মুণ্ডু 'দুর্গা দুর্গা' নাম বলছে। পূর্বপুরুষের এই ইতিবৃত্ত পদ্যাকারে রচনা করে মন্দির টেরাকোটা ফলকে উৎকীর্ণ করেন শ্যাম দাসের মধ্যম ভ্রাতার বংশের নারান দাসের বংশধর যজ্ঞেশ্বর দাস সংস্কারের সময়।[১৬]

এ ধরণের লিপিতে প্রতিষ্ঠিতা বা সংস্কারকের নাম এবং কিছু সমকালীন ঘটনার কথা জানা যায়। এমন কিছু লিপি পাওয়া যায় যেখানে প্রতিষ্ঠাতা দেবতার প্রতি ভক্তির আতিশয্যে নিজের নাম পর্যন্ত গোপন রাখা হয়। রাধানগরের (ঘাটাল) গোপীনাথ মন্দিরের (পঞ্চরত্ন) লিপিতে মন্দির প্রতিষ্ঠাতা শুধু বলেছেন — 'আমি ভক্তিপূর্বক ১৬৪০ শকাব্দ বা ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে গোপীনাথের জন্য এই মন্দিরটি দিলাম।[১৭] (খবেদরস সংযুক্তে শা / কে চৈব নিশাপতৌ গোপী / নাথস্য বেস্মেদং ভক্তিতো দত্তবাণহং ।। ১৬৪০ (খ = ০, বেদ = ৪, রস = ৬ নিশাপতি = ১, অর্থাৎ ১৬৪০ শকাব্দ হবে বা ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দ)।

মুঘল বাঙলায় মল্লভূম - বিষ্ণুপুরের রাজারা ছাড়াও বর্ধমান রাজ পরিবার এবং নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত বহু মন্দিরে তাঁদের উৎসর্গ লিপি আজও আছে। পূর্বোক্ত চন্দ্রকোণার গিরিধারীলাল জীউর প্রতিষ্ঠাকালীন উৎসর্গলিপিটি এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এটি ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এক সুদৃশ্য মন্দির।

বর্ধমান রাজপরিবারের মধ্যে মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের পুত্র চিত্রসেনের দুই মহিষীর প্রতিষ্ঠিত দুটি 'আটচালা'-রীতির শিবমন্দির কালনার জগন্নাথবাটি এলাকায় আজও শোচনীয় অবস্থায় বিদ্যামান। এরা হলেন ছঙ্গকুমারী ও ইন্দ্রকুমারী, যদিও ওই মন্দিরদুটির লিপিতে এঁদের কোন নামের উল্লেখ নেই। ছঙ্গকুমারীর প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত মন্দির ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।[১৮] দ্বিতীয় মন্দিরের কোন লিপি বর্তমানে নেই। পূর্বে ছিল বলে কেউ কেউ বলেন।[১৯] কালনার শ্যামরায় - পাড়া'য় অনন্তবাসুদেব বা বৈকুণ্ঠনাথের 'আটচালা' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে কীর্তিচন্দ্রের মাতা (জগৎরামের মহিষী) এবং ত্রিলোকচন্দ্রের পিতামহী ব্রজকিশোরী।[২০] কালনা রাজবাটী এলাকায় যে কয়েকটি মন্দির আছে, তার সবগুলিতেই লিপি বর্তমান। এর মধ্যে মহারাজ ত্রিলোকচন্দ্রের মাতার প্রতিষ্ঠিত বিজয়াদি বৈদ্যনাথের মন্দিরটি কৃষ্ণচন্দ্রের পঁচিশচূড়া মন্দিরের পার্শ্ববর্তী। গর্ভগৃহের দেওয়ালে শ্বেত পাথরের লিপি থেকে জানা যায়, মাতা লক্ষ্মীদেবী পুত্রলাভের জন্য বৈদ্যনাথের আরাধনা করে ত্রিলোকচন্দ্রকে লাভ করেন। তিনি মহেশ্বরের প্রীতির জন্য আটচালা মন্দির স্থাপন করেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাকালের কোন উল্লেখ নেই। ত্রিলোকচন্দ্র ছিলেন কীর্তিচন্দ্রের ভাই কুমার মিত্রসেনের পুত্র। উল্লেখ্য পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণচন্দ্রের বিশাল পঁচিশচূড়া মন্দিরও ত্রিলোকচন্দ্রের মাতা প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে। এখানে শকাব্দ ১৬৭৩ এর সঙ্গে বঙ্গাব্দ ১১৫৯ এরও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।[২১]

নিকটবর্তী পঁচিশচূড়ার বিশাল লালজীউর মন্দির আরও প্রাচীন ১৬৬১ শকাব্দ (১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত।[২২] সংস্কৃত লিপিতে বলা হয়েছে, কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা রাজকুমারী ব্রজকিশোরী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। এই লিপি থেকে জানা যায় যে মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। ঐ একই বৎসরে অম্বিকা কালনা। প্রসিদ্ধ দেবী সিদ্ধেশ্বরীর 'জোড়াবাংলা' মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়।[২৩] মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহারাজ চিত্রসেন এবং মিস্ত্রী ছিলেন রামচন্দ্র।

রাজবাড়ি এলাকায় আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দিরের মধ্যে লালজীউ ও কৃষ্ণচন্দ্র-মন্দিরবাড়ির বাইরের প্রাঙ্গণে রূপেশ্বর শিবের দক্ষিণমুখী 'চাঁদনি' মন্দির রাজা তিলকচন্দ্রের প্রধানা মহিষীর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৮৬ শকাব্দ (১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে)।[২৪] এছাড়া মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্রের মহিষী প্যারীকুমারীর প্রতিষ্ঠিত কারুকার্যযুক্ত প্রতাপেশ্বরের দেউল মন্দির ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। এই মন্দিরের স্থপতি ছিলেন সোনামুখী পূর্বোক্ত রামহরি মিস্ত্রী। 'টেরাকোটা'-অলংকরণ অনেকটা নিম্নমানের হলেও এর প্রাচুর্য ও বিষয় - বৈচিত্র্যও অনবদ্য। লিপিটি আছে পাদপীঠের নীচের দেওয়ালে। এখানে শকাব্দ ১৭৭১ এবং বঙ্গাব্দ ১২৫৬ সালের উল্লেখ আছে (১৮৪৯ খ্রি।)।

রাজবাড়ি বা ঠাকুরবাড়ি এলাকার বাইরে অম্বিকা-কালনার প্রসিদ্ধ ১০৮ 'আটচালা'-রীতির শিব মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথের বা তোরণের দেওয়ালে বেলে পাথরের লিপিটি থেকে জানা যায়, ১৭৩১ শকাব্দ (১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে) মহারাজ তেজশ্চন্দ্র এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করেন। ১০৮ শিবমন্দির নামে পরিচিত হলেও আসলে আটচালা প্রবেশদ্বার দিয়ে মোট ১১৯টি 'আটচালা' মন্দির। লিপিতে 'নবাধিকশতম্' বলা হয়েছে অর্থাৎ ১০৯টি মিন্দর। এই লিপি বা আরও দু'একটি লিপিতে শুধুমাত্র এই স্থানকে অম্বিকা নগরই বলা হয়েছে।[২৫]

প্রায় একই ধরণের ১০৮ 'আটচালা' শিবমন্দির মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের মাতা (বিষণকুমারী বা বিষ্ণুকুমারী) বর্ধমান শহরের নবাবহাটে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে। বেলেপাথরের লিপিটি প্রথম মন্দিরটির দেওয়ালে বেলেপাথরে উৎকীর্ণ সংস্কৃত রচিত। প্রহেলিকা ও অঙ্কে সেখানে ১৭১০ বঙ্গাব্দ ১১৯৫ এর উল্লেখ আছে।[২৬] তেজশ্চন্দ্রের মাতার প্রতিষ্ঠিত কালনার রাজবাড়ির কাছে শিবের (কারও কারও মতে রামেশ্বরের) একটি 'আটচালা'-রীতির মন্দিরের দেয়ালে বেলেপাথরের লিপিটি থেকে জানা যায় যে সেটি ১৭০৫ শকাব্দে (১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে) নির্মিত। মন্দিরটি রামেশ্বরের বলে পরিচিত হলেও লিপি থেকে জানা যায়, এটি শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৭] মহারাজ তেজশ্চন্দ্র (১৭৭০-১৮৩২ খ্রি.) চন্দ্রকোণার রঘুনাথ বাড়ির পূর্বোক্ত মন্দিরগুলির সংস্কার সাধন করেছিলেন ১২৩৮ বঙ্গাব্দে (১৮৩১ খ্রি.)। ঐ মনে তিনি মল্লেশ্বরপুরের (চন্দ্রকোণা) মল্লেশ্বরজীউ ও অন্যান্য মন্দিরেরও সংস্কার করেন যা লিপি থেকে জানা যায়।[২৮]

নদীয়া রাজ প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দিরের লিপিগুলি আজও অক্ষত। অনেক লিপি পাথরের ফলকে খোদিত হলেও পোড়ামাটির ফলকে কোন কোন লিপি পাওয়া যায়। রাজা রাঘব ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। তিনি ১৫৯১ শকাব্দে (১৬৬৯ খ্রি:) দিগনগর গ্রামে ইঁটের একটি চারচালা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পোড়ামাটির সংস্কৃত লিপিতে বলা হয়েছে যে তরঙ্গমালায় শোভিত একটি দীঘির তীরে এই সুন্দর মন্দিরে রাজা রাঘব শিবকে অধিষ্ঠিত করলেন।[২৯]

এর আগে বাগআঁচড়ার (শান্তিপুর) এক চাঁদ রায় ১৫৮৭ শকাব্দে (১৬৬৫ খ্রি:) শিবের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। লুপ্ত মন্দিরটি পোড়ামাটির ফলকে উৎসর্গ লিপিটি শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে।[৩০]

রাজ রাঘবের প্রপৌত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রপ্রতিষ্ঠিত শিবনিবাস ও গঙ্গাবাসের মন্দিরগুলির লিপি আজও অক্ষুণ্ণ। ঐ মন্দিরগুলি প্রচলিত শৈলী অনুসারে নির্মিত হয় নি। শিবনিবাসের সব লিপিই প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ। এখানের তিনটি উচ্চ মন্দিরের মধ্যে বিশাল শিব লিঙ্গযুক্ত রাজরাজেশ্বর শিবের মন্দিরটিই কেবল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র

১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। অপর দুটি মন্দিরের মধ্যে সম্ভবত তাঁর প্রধানা মহিষী রামচন্দ্রের মন্দির ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় মহিষী লক্ষ্মী দেবী মহারাজ্ঞীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ অপর একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।[৩১]

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাবাসে হরিহরের যে মন্দির স্থাপন করেন, তার শিলালিপি থেকে জানা যায় যে হরি ও হর যে অভিন্ন, একই অদ্বৈতমূর্তি তার জন্যই তিনি ১৬৯৮ শকাব্দে (১৭৭৬ খ্রি.) ওই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরীশচন্দ্র কৃষ্ণনগরে আনন্দময়ীর এক সুদৃশ্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে। মন্দিরের পাদপীঠসংলগ্ন একটি স্থানে সংস্কৃত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, কৈলাসের মতো এই কৃষ্ণনগরে রাজ 'গিরীশচন্দ্র' আনন্দময়ীর মন্দির স্থাপন করলেন।[৩২]

নদীয়ার দুটি 'জোড়াবাংলা'—শৈলীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খ্রিস্টীয় সতের শতকের শেষভাগে। ইঁটের তৈরি শ মন্দিরদুটিতে লিপিফলক লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে তেহট্টের কৃষ্ণরায়ের মন্দির ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন রামদেব নামে এক ব্যক্তি। রামদেবের কোন পরিচয় জানা যায় না। লিপি থেকে আরও জানা যায়, লক্ষ্মী তাঁর পদসেবা করতেন।[৩৩] সংস্কৃত শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের পংক্তি (১৯ অক্ষর) অনুসারে লিপিটি রয়েছে, যদিও তৃতীয় পংক্তিতে দুটি অক্ষর বেশি আছে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় রাজা রাঘবের পুত্র রুদ্রের রাজত্বকালে। দ্বিতীয় 'জোড়বাংলা'টি হল উলা বীরনগরের রাধাকৃষ্ণমন্দির। মন্দিরটি 'টেরাকোটা' - অলংকরণযুক্ত। ১৬১৬ শকাব্দে (১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে) ওই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রামেশ্বর মিত্র। জানা যায় নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে তিনি সুবে বাঙলার 'মুস্তৌফী' (নায়েক কানুনগো) নিযুক্ত হন। মন্দিরের সামনের দিকের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ লিপিটি আছে।[৩৪]

আঠার শতকের শেষাশেষি মেদিনীপুরের সদর-কানুনগো ছিলেন রায়মহাশয় রাজনারায়ণ ঘোষ। খড়গপুরের চকগণেশ গ্রামে তাঁর বসতবাড়ি এলাকায় তিনি শিবের দ্বাদশ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তার একটি পোড়ামাটির লিপিফলক থেকে জানা যায়, ১৬৯৯ শকাব্দে (১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে) রাজনারায়ণ ওই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৫] এই জেলারই খেলাড়ে (খড়গপুর লোকাল) বসুদের দামোদরের 'পঞ্চরত্নে'র লিপি থেকে জানা যায়, দর্পনারায়ণ বসুর প্রতিষ্ঠিত ওই মন্দির বাংলা ১২৭২ সালে (১৮৬৫ খ্রি.) তৈরি করা শুরু হয় এবং শেষ হয় ১২৭৫ বঙ্গাব্দে (১৮৬৮ খ্রি.)। মাঝখানে ১২৭৩ বঙ্গাব্দে (১৮৬৬ খ্রি.) দুর্ভিক্ষ হয়। তের সের ধানের দাম এক টাকায় উঠে যায়। এছাড়া গর্ভগৃহে বেদিমন্ডপের দেওয়ালে বসু-বংশের এক কুলজীনামা দেওয়া আছে।[৩৬]

সতীদাহ প্রথাকে স্মরণে রাখার জন্য কোন কোন সমাধিমন্দিরে স্মারকলিপিফলক

দেওয়া হত। ডেবরা থানার হরিনারায়ণপুর গ্রামের রাস্তার ধারে পাশালি দুটি ছোট 'আটচালা'—রীতির সমাধিমন্দিরের ১৩৫১ বঙ্গাব্দে (১৯৪৪ খ্রি:) দেওয়ালে সংস্কারকালীন এক লিপি থেকে জানা যায়, বাংলা ১১৭২ সালে (১৭৬৫ খ্রি.) বলরাম বেরার মা মৃত স্বামীর সঙ্গে সহ-মরণ করেছিলেন।[৩৭]

মধ্যযুগের মন্দিরের এই লিপিগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা সমকালীন সমাজের সঙ্গে পরিচিত হই। কিন্তু ওইসব লিপির মধ্যে কয়েকটি ছাড়া বিস্তৃত ধারাবাহিক কোন ঐতিহাসিক সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় বেশির ভাগ লিপি পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হওয়ার ফলে ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মন্দির ও লিপিফলক নিশ্চিত রূপে সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

সূত্রনির্দেশ ঃ—

১। রায় প্রণব, *মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ,* প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬, পৃ-৬৯-৭০।

২। *তদেব,* পৃ. ১২১, পাথরে খোদিত (৩২ সেমি X ২৩ সেমি) লিপি ফলকটি আগে চন্দ্রকোণা গোসাঁইবাজারের অধিবাসী প্রয়াত রাধারমণ সিংহের বাড়িতে ছিল।

৩। উত্তর চব্বিশ পরগণার নৈহাটীর কাঁঠাল পাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত যাদবেশ শিবের 'পঞ্চরত্ন' — মন্দিরের লিপির সারি অনুসারে।

বেদবস্বশ্ব ভূমানে—
শাকে সংস্থাপিতঃ
শিবঃ।। সমন্দিরো যাদবেশ
নাম্না যাদবশর্ম্মণা।।

১৭৮৪ (শকাব্দ) বা ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ।

৪। রায় প্রণব, *পূর্বোক্ত,* ৫১-৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এখানে স্থপতি-সূত্রধর ও প্রতিষ্ঠাতাদের বিশাল তালিকা দেওয়া আছে।

৫। রায় প্রণব, ''মন্দির লিপিতে ইতিহাস ও সমাজচিত্র'', *চতুরঙ্গ,* কার্তিক পৌষ, ১৩৮৮

৬। রায় প্রণব (সম্পাদিত), *মেদিনীপুর, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন,* ৩য় খণ্ড, এপ্রিল ২০০২ মন্দির স্থাপত্য সমীক্ষা : প্রণব রায়, পৃ. ১৬৭।

৭। গড়বেতা থানার উড়িয়াশাই এর একটি মন্দিরে মল্লাব্দের সংস্কৃত লিপিটি এই ঃ

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণপদারবিন্দে
শ্রীমান মুদা দুর্জনসিংহভূপঃ
রসগ্রহাঙ্কে মিতে মল্লবর্ষে
ন্যবেদয়ৎ সৌধমিদং সুচারু
৯৯৬

মল্লাব্দ বা ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দ। এই লিপিটি থেকে জানা যায় উড়িয়াশাই — এর ওই মন্দির মহারাজ দুর্জনসিংহদেব (মল্লভূম বনবিষ্ণুপুরের রাজা প্রতিষ্ঠা করেন।)

৮। রায় প্রণব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০১, এখানে সম্পূর্ণ লিপির পাঠাদ্ধার এই :
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ/জয়তিতরাং/শকাব্দ ১৭৬৭ বাং ১২৫২ সাল।।/
শাকে মুনিরসাব্ধীন্দুগণ্যে শ্রীধরম/ন্দিরং। অভবত্তত্র
সম্পুর্ন্নং পঞ্চবিং/শতিচূড়কং।। কানাঞিরুদ্রদাসেন/অন্তবায়েন
যত্নতঃ ।। নির্ম্মায়িতং বরং সৌধং নানাচিত্রসমন্বিতং।/
পক্ষবাণার্কগণ্যে বেশানে ম্লেচ্ছাবনীপতেঃ/ হরিসূত্রধরেণ
বনির্ম্মিতং তদা
অর্থাৎ মন্দির (পঁচিশচূড়া) ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়।

১০। যথাযথ লিপি এই :
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজিউ/চরণ স্মরণং/শুভমস্তু সকাব্দাঃ/১৭০২/১০/৩০/
নিমাঞিচরণ দাস/দস্ত সন ১১৮৭ সাল/তারিখ ৩০ মাঘ:।
এখানে লিপিতে ১৭০২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ ।১০।৩০ এর অর্থ মাঘ মাসের ৩০ তারিখ। বাংলা সন ১১৮৭র ৩০শে মাঘ

১১। লিপির পাঠোদ্ধার ঃ
জগন্নাথ নিবাসার্থং শ্রীজগন্নাথমন্দিরং/জগন্নাথ পদাব্জাস্তৈঃ তাম্বুলি নিকরৈ কৃতমং।। শুভমস্তু সকাব্দা ১৭৭৩
এর অর্থ, জগন্নাথের পাদপদ্মে রত তাম্বুলিগণ ১৭৭৩ শকাব্দ বা ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে জগন্নাথের নিবাসের জন্য এই জগন্নাথমন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন।

১২। লিপির পাঠোদ্ধার ঃ
৭ শ্রীশ্রীদামোদরঠাকুর জিউ/ ৭ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জিউ ; শকাব্দ ১৭৬২ । সন ১২৪৭ সাল / তারিখ ২৩ জাষ্ট / শ্রীবংসীধর দাস / প্রামানিক মিস্ত্রী শ্রী/ পেলারাম সূত্রধর সাং রা/ম জীবনপুর.

১৩। রায় প্রণব, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ* পৃ: ১৭৬ । লিপির যথাযথ পাঠোদ্ধার ঃ
শ্রীশ্রী˚ সীতারাম চন্দ্র জিউ / শুন সর্ব্বজন : / করি নিবেদন : / মন্দির নির্ম্মাণ কথা: / দাসপুরে বাষঃ / মিস্ত্রী ঠাকুরদাস ঃ /শিলপদবিতে গাঁথাঃ / মিস্ত্রীর সঙ্গে অশ্টজন / করিল শুগঠন / সকলে ক্ষেমতাপর্ণ ঃ ।/আরম্ভ সাতনাশ্টী সালেঃ / গেল দিন হরি বলে / আশশ্টীর আসাড়ে সংপূর্ণ ঃ । ইতি
এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, রায় প্রণব, "মন্দিরগড়ার বিশ্বকর্মা ঃ সূত্রধর সম্প্রদায়", *পশ্চিমবঙ্গ* ২৫ নভেম্বর, ১৯৮৩।

১৪। দত্ত, বিমলকুমার, *বেঙ্গল টেম্পলস*, মুনসীরাম মনোহরলাল, ১৯৭৫ , পৃ: ৭৬।

১৫। আমোদপুরের (খড়গপুর লোকাল) জানাদের রঘুনাথের 'পঞ্চরত্নের' লিপি, পরিচারক শ্রী গোপালকৃষ্ণ জানা / শ্রীশ্রী রঘুনাথ জিউ / শ্রী রামপদ দে মিস্ত্রী সাং চেওয়া দাসপুর, রামচন্দ্রপুর (ময়না) — ঘোড়াইদের 'দালান' — কারিগর মাধবচন্দ্র মিস্ত্রী সাং দাসপুর পরগণে চেতুয়া।

১৬। রায় প্রণব, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২০১, এখানে সমগ্র লিপির পাঠ যথাযথ দেওয়া হয়েছে।

১৭। রায় প্রণব, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২০২।

১৮। লিপির পাঠোদ্ধার ঃ

বাণাদ্রিমাতৃকামানে / শাকে প্রাসাদমৈষ্টকং

চিত্রসেনস্য মহিষী মহেশায় ন্যবেদয়ৎ

১৬৭৫ শকাব্দ বা ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ।

১৯। দাশ, বিবেকানন্দ, *কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত*, ১৯৯৯, পৃ ৬৪।

২০। দাশ, পৃঃ ৬৬, লিপিটি খুব অস্পষ্ট থাকায় এবং রঙের প্রলেপ থাকায় পাঠোদ্ধার করা যায় নি। তবে সংস্কৃত লিপির অর্থ থেকে জগৎরামের মহিষী এর প্রতিষ্ঠাত্রী জানা যায়। কিন্তু এতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, এতে সন্দেহ জাগে। কীর্তিচন্দ্র এই সময়ের বহু আগে মারা যান (১৭৪০ খ্রি.)।

২১। দাশ, পৃঃ ৫৯।

২২। দাশ, পৃঃ ৫১।

২৩। দাশ, পৃঃ ১১। এই গ্রন্থে যে লিপিপাঠ আছে, তা এই ঃ

৮॰ শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৬১ দি

য়তাম শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী দে

বীং শ্রীযুত মহারাজ চিত্র

সেন রায়স্য মিস্ত্রি শ্রীরামচন্দ্র।

২৪। লিপির পাঠোদ্ধার (লিপিটি শ্বেতপাথরে উৎকীর্ণ) ঃ

শ্রীরামপ্রতিমো মহাগুণময়স্ত্রৈলোক্যচন্দ্রো নৃপ

তস্যান্তে নৃপশেখরস্য মহিষী জ্যেষ্ঠা ধরিত্রীসুতা।

সবকার্ষীদ্রিপুরান্তকস্য ভবনং কৈলাসশৈলোপমঃ

শাকে তত্র রসাষ্টষম্মহিসিতে চাপেয়মার্ত্তণ্ডকে।।

এর থেকে ১৬৮৬ শকাব্দ বা ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

২৫। লিপিটি নিম্নরূপ ঃ

শাকে চন্দ্রশিবাব্ধিসপ্তিকুমিতে শ্রী

তেজচন্দ্রাভিধো রাজা সূর্য্য ইবস্থিরা

র্পিতচলচ্চণ্ড প্রতাপানলঃ

শম্ভো ধার্মপরং নবাধিকশতশ্রী

মন্দিরৈ র্মণ্ডলং প্রাকার্যাম্মহদা

ম্বিকাখ্যনগরে কৈলাশসেতং নবং

এখানে প্রহেলিকার মাধ্যমে ১৭৩১ শকাব্দ (১৮০৯ খ্রি.) প্রতিষ্ঠাকাল বলা হয়েছে।

২৬। লিপির পাঠোদ্ধার ঃ

'শাকে শূন্যশশাঙ্ক শৈলকুমিতে নির্ম্মায় রাধা—

হরিশ্রীত্যৈপুণ্যবতী নবাধিকশতং শ্রীমন্দি
রাণি স্বয়ং ধীরশ্রীযুতভেজচন্দ্র ধরণী ধৌরেয়
চূড়ামণে র্মাতা তৎসবিধে বিধায় সসরস্তৌলে সমস্থাপয়ৎ

২৭। লিপির পাঠোদ্ধার ঃ

বাণব্যোমধরাধরেন্দুগণিতে শা
কে শশাঙ্কপ্রভু শ্রীকল্পস্য নিবা
সমন্দিরমিদং রাধাপতিপ্রীতয়ে
শ্রীরশ্রীযুতভেজ চন্দ্রধরণী ধৌরেয়
চূড়ামণে র্মাতা সম্প্রতি নির্ম্মমে সুর
সরিৎক্ষেত্রে হম্বিকাখ্যে পুরে।। ১৭০৫

এখানে প্রহেলিকা ও অঙ্কে শকাব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু বঙ্গাব্দের উল্লেখ নেই। প্রহেলিকার অর্থ ১৭০৫ শকাব্দ বা ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

২৮। রায় প্রণব, পৃ: ৭০ ও ১৯১।

২৯। লিপির পাঠোদ্ধার ঃ

১৫৯১।। শাকে সোমনবেষুচন্দ্রগণিতে পুণ্যৈক
রত্নাকরো ধীরশ্রীযুতরাঘবো দ্বিজমণি
ভূমীভূজামগ্রণীঃ।। নির্ম্মায় স্ফুরদুর্ম্মি নির্ম্মল
জলপ্রদ্যোতিনীন্দীর্ঘিকান্তস্তীরে
কৃতরম্যবেশ্মনি শিবন্দেবং সমস্থাপয়ৎ।।

অর্থাৎ ১৬৯১ শকাব্দ বা ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দ

৩০। লিপিটি এই ঃ

শাকে বারমতঙ্গবাণহরিণাঙ্কেনাঙ্কিতে শঙ্করং
সংস্থাপ্যাশু সুধা সুধাকরকরক্ষীরোদনী রোপমম্।
তস্মৈ সৌধমিদং মুদা সুজলদা নিলীনলোলধ্বজং
তৎপাদেরিতধীরধীরবিরতং শ্রীচাঁদরায়ো দদৌ।।

৩১। মহারাজ্ঞীশ্বর মন্দিরের শিবলিঙ্গের বেদিতে যে দু'সারির লিপি আছে, তার পাঠোদ্ধার ঃ যঃ শীমানধিগত্য রাজতি মহারাজাধিরাজেন্দ্রতাং লক্ষ্মীস্তস্মহিষী হরেরিব মহারাজ্ঞীতি সংকীর্ত্তিতা।/ তৎসংস্থাপিত এব দীব্যতি মহারাজ্ঞী শ্বরোহয়ং শিবঃ খ্যাত স্যাদ্‌গিরিশস্তদীশ্বর তয়া ভক্ত্যা প্রিয়ৈ স্থাপ্যতে।।

৩২। লিপির পাঠোদ্ধার ঃ

বেদাঙ্গেক্ষণগোত্রকৈরব কুলাধীপে শকে শ্রীযুতে
কৈলাস প্রতিরূপ কৃষ্ণনগরে শ্রীমদ্‌গিরীশোৎসবে।
নাম্নানন্দময়ী শুভেদুহনি মহামায়া মহাকালভৃৎ
রাজ্ঞা শ্রীলগিরীশ চন্দ্র ধরণীপলেন সংস্থাপিতা। (১৯৭১)

৩৩। এখানে ১৬০০ শক (১৬৭৮ খ্রি.) উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৪। লিপির পাঠোদ্ধার ঃ

অঙ্গৈককালেন্দুমিতে শকাব্দে ১৬১৬ কায়স্থ
কায়স্থহবেষ ধর্ম্মঃ। যো নির্ম্মমে শ্রীহরিযুগ্ম
ধাম শ্রীযুতরামেশ্বরমিত্রদাস

৩৫। লিপির পাঠোদ্ধার ঃ

শকাব্দা ১৬৯৯
শাকেদুস্কাকলাম্নানে/শত্তোর্দ্বাদশমন্দিরঃ/নির্মমে শ্রীরাজনারা/য়ণঃ ঘোষঃ শিবপ্রভুঃ।

৩৬। রায় প্রণব, পৃ: ১০৩।

৩৭। লিপির পাঠোদ্ধার

'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তি/ সন ১১৭২ সাল তাং ছয়াই আষাঢ়/ শ্রীবলরাম বেরার মাতা সহমৃতা ইইয়াছে/ সন ১৩৫১ সাল মাহ আষাঢ় জ্ঞাতি/সহ মেরামত হয়। দ্রষ্টব্য, রায় প্রণব, পৃ: ২২৪।

"রাজস্থানের মরুপ্রদেশে মধ্যযুগীয় জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ধারা"

(চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়সলমীর থেকে প্রায় ৪০ কিমি দূরে কুলধারা। বালুকারাশির মধ্যে চতুর্দশ শতাব্দীর একটি জনমানবহীন গ্রাম যেটিকে রাজস্থান সরকার 'heritage village' বলে ঘোষণা করেছেন। প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্বে এখানকার জনপদ এক অজ্ঞাত কারণে এক রাত্রির মধ্যে গ্রামটি পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। এর পিছনে একটি কিংবদন্তী আছে যার কিছুটা বাস্তব। মরুভূমিতে বৃষ্টি অত্যন্ত কম হওয়ার ফলে এখানকার পাথরের তৈরি বাড়িঘর, গ্রামের মধ্যেকার চওড়া রাস্তা ও গলি, ব্যবহৃত জিনিষপত্র, গ্রামের মাঝখানে একটি দুইতলা মন্দির ও সংলগ্ন চাতাল মোটামুটি ভাল অবস্থাতেই আছে, যদিও বাড়িঘরগুলি ভগ্নপ্রায়। এত বছর আগের এই গ্রামের জল সংগ্রহ করে রাখার পদ্ধতি ছিল। প্রায় ছয়-সাত বৎসর পূর্বে এখানে পাঁচটি কূপ আবিষ্কৃত হয়েছে যা বালির নিচে এতকাল চাপা পড়েছিল। তারপর ২০০০ সালে আরও দুটি পাওয়া যায়। সর্বাধিক বড় কুয়োটি যেটিকে স্থানীয় ভাষায় "কুন্ড" বলে, ১০০ ফুট গভীর। এতে এখনও জল আছে। কুণ্ডের গভীরে নামার জন্য ৫০টি সিঁড়িও আছে এবং প্রখর গ্রীষ্মে জল শুকিয়ে গেলে, আরও গভীরে জল তোলার সুবিধার জন্য বেদী তৈরি করা আছে।[১]

রাজস্থানের মত শুষ্ক প্রদেশে, বিশেষকরে জয়সলমীরের, মত যেখানে একটিও (রাজস্থানী ভাষায় 'বারামাসী') অর্থাৎ বারোমাস ধরে বয়ে চলেছে এমন একটিও নদী নেই, বছরে যেখানে দশ দিনও ভালভাবে বৃষ্টি হয়না (মাত্র ১৫ সে. মি.), সেখানে প্রতিটি বিন্দু জল ধরে রেখে অর্থাৎ সংগ্রহ করে তা বহুকাল পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য করে রাখার বিভিন্ন পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও নির্মাণ কৌশল রীতিমত বিস্ময় জাগায়। বর্ষা হয় অত্যন্ত কম, সারা বছরে মাত্র ৬০ সে.মি., মাটির উপরের জলের স্বাদও অসম্ভব লবনাক্ত। তাই এখানে সাম্ভর, ডেগানা, ডোডওয়ানা, লুনকরাসর, পোখরান এবং কুচানন প্রভৃতি বিশালাকার ঝিল বা জলাশয়গুলিতে নুন বা লবণের চাষ হয় বেশি। কিন্তু প্রকৃতির এত কৃপণতা সত্ত্বেও, এখানকার মানুষজন শত শত বছর ধরে অতি

সামান্য বৃষ্টির জল এবং মাটির অনেক গভীরে প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ ফুট নিচের ভূজলকে বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চিত করে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে স্বনির্ভর করে তুলেছিল। কত শত বৎসর পূর্বে নির্মিত বিভিন্ন ধরণের 'কূপ' বা কুয়ো, 'কুঁই' বা একধরণের অত্যন্ত সুরু কুয়ো, 'কুন্ড', জলাধার এবং জলাশয় — উদাহরণস্বরূপ, জয়সলমীরের ৬৭৫ বৎসর পুরানো 'গড়সীসর' বা 'গড়ীসর' জলাশয় ৫০০ বৎসর পুরানো 'জৈতসর' জলাশয়, ৩৫০ বৎসর পূর্বে নির্মিত 'অমর সাগর' জলাশয়, জয়সলমীর থেকে ৪৫ কি.মি. দূরে 'ডেরা' নামক গ্রামে ৫০০ বৎসরের বেশি পুরানো 'জলঢোল জসেরী' জলাশয়, জয়পুরের 'জয়গড়' দুর্গের ৩৬০ বৎসর পুরানো 'কড়োরপতি' টাংকা যোধপুরের ফলোদী শহরের ২৫০ বৎসর পূর্বে নির্মিত আটটি 'অষ্টকোণী কুয়ো' ও বিকানের শহরের অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত 'চৌতিনা' বা চতুর্ভূজাকার কুয়ো এবং টোঙ্ক জেলার 'টোডা রায়সিংহ কি বাওরী', বা আজও মিষ্টি জলের চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে। এদের নির্মাণকালের ইতিহাস থেকে মরুপ্রদেশের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়।[২]

তবে রাজস্থান বিশেষকরে মরুভূমি অঞ্চলের জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ধারা নিয়ে বিস্তারিত ভাবে বলার পূর্বে এই রাজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আজকের রাজস্থান ক্ষেত্রফল হিসেবে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য। রাজ্যের একত্রিশটি জেলার মধ্যে জয়সলমীর রাজ্যের সর্বাধিক বড় জেলা। এখানকার শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য একে শুষ্ক ক্ষেত্র বা 'পশ্চিমী বালুর ময়দান'ও বলা হয়। এখানে বর্ষা অত্যন্ত কম ও ভূস্থলও মাটির অনেক গভীরে। তা সত্ত্বেও মরুপ্রদেশের মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রম করে। বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তি ও কৌশলের মাধ্যমে যতটুকু জল বৃষ্টি ও মাটির গভীর থেকে সংগ্রহ করা যায় তা সংরক্ষিত করেছিল। এই কাজে তৎকালীন রাজা বা রাওল মহারাওলেরা যেমন নিজেদের কীর্তি স্থাপন বা প্রজাহিতের কথা ভেবে যোগদান করেছেন, তেমনই সাধারণ জনগণও যথাসাধ্য নিজেদের শ্রম ও অর্থ দান করেছেন।

জয়সলমীরের 'গড়সীসার' বা 'গড়ীসর' জলাশয় একটি পরিচিত নাম। পর্যটন মানচিত্রে এই গড়ীসরকে বড় করেই দেখানো হয়। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই জলাশয়ের পাড়, যেটিকে রাজস্থানী ভাষায় 'আগোর' বলা হয়, প্রায় তিন মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া। জয়সলমীরের শাসক মহারাওল গড়সী ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে ঐটির নির্মাণ করেছিলেন! কথিত আছে, রাওল নিজে ঐটির নির্মাণে শ্রমদান করেছিলেন। ইতিহাস বলে গড়সী রাওলের সিংহাসন আরোহণের পূর্বে, জয়সলমীরে তখন এক চরম অরাজকতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ভাটিরাজার ভাটি বংশ ছিল অন্তর্কলহে জর্জরিত। রাজ সিংহাসন হস্তগত করার লোভ ভিতরে ভিতরে

অসহিষ্ণু করে তুলেছিল রাজবংশীয় অন্যান্য জ্ঞাতিদের। শুধু অভ্যন্তরীণ গোলযোগই নয়, নানা দেশী - বিদেশী শত্রুদের আক্রমণের ভয়েও তটস্থ হয়ে থাকতেন জয়সলমীর বাসীরা।[৩] এহেন অনিশ্চয়তার মধ্যেই বীর গড়সী রাওল ১৩৩০ সনে রাঠোর সেনার সাহায্যে জয়সলমীর অধিকার করেন।[৪]

১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে গড়সীসাগর বা গড়ীসর জলাশয় নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়। বহু বছর ধরে মহারাওল এই বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে, এর নির্মাণকার্য যখন প্রায় শেষ, গড়সীসারের পাড়ে দাড়িয়ে থাকাকালীন পিছন থেকে এক আততায়ীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিতে হয় তাঁকে জল আসার আগেই। রাওলের রাণী বিমলা কিন্তু রাজার চিতায় উঠে সতী হলেন না, বরং গড়সীসর নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করলেন। মরুভূমির এই স্বপ্নের জলাশয়ের দুটি রঙ। এর জলের রঙ নীল। আর এর পাড়ে প্রায় অর্দ্ধেক জলাশয়ের চারপাশ জুড়ে গড়ে উঠেছে হলুদ পাথরের (sandstone) ঘাট, মন্দির, স্তম্ভ, নানান সৌধ, বারাদরী এবং বিভিন্ন বেদী ইত্যাদি। জলাশয়ের মধ্যে একটি জলমহলও আছে, যা আজ ভগ্নপ্রায়। একটা সময় এর পাড়ে পাঠশালা বসত। আর একদিকে রাজকার্যে যোগ দিতে আসা বহিরাগতদের থাকার ব্যাবস্থা ছিল। এখানেই নীলকণ্ঠ ও গিরিধারীর মন্দিরও নির্মাণ করা হয়েছিল। এখানে যেমন যজ্ঞশালা ছিল, তেমনই বাবা জমালশাহ পীরের দরগাও ছিল। হিন্দু মুসলিম উভয়ের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সারা শহরের চাহিদার জল এখান থেকেই সরবরাহ করা হত। শহরে নলকূপ আসার আগে পর্যন্ত এখানে জল নিতে আসা মহিলাদের মেলা বসে যেত। গড়সীসরের সামনে পশ্চিমদিকের প্রবেশদ্বার 'টিলো কা পোল' নামে খ্যাত। সূক্ষ্ম জাফরীর কাজ করা 'ঝারোখার' জন্য ঐটি খুবই দৃষ্টিনন্দনকারী শোনা যায় সুদূর সিন্ধ প্রদেশ থেকে আসা 'টিলো' নামের এক গণিকা এই প্রবেশদ্বার বানিয়েছিলেন। তখনও গড়সীসারের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। কিংবদন্তী আছে, এটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই কিছু দরবারী ইর্ষাবশত মহারাওলের কাছে অভিযোগ করে 'আপনি কি করে একটি গণিকা দ্বারা নির্মিত এই প্রবেশদ্বার দিয়ে গড়সীসরে প্রবেশ করতে পারেন? এই নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। রাওল ঐটিকে ভেঙে ফেলার হুকুম দেন। বুদ্ধিমতী টিলো রাতারাতি প্রবেশদ্বারের চূড়ায় একটি ছোট্ট মন্দির তৈরি করান। তখন মহারাওল আদেশ প্রত্যাহার করেন।[৫]

গড়সীসরের আশে-পাশে এর 'আনোরের' (রাজস্থানী ভাষায় 'আগোর' মানে জলাশয়ে বৃষ্টির জল আসার জন্য পাড় জুড়ে নির্মিত নালাপথ বা canal) নির্মাণ পদ্ধতি এমন হত যাতে বৃষ্টি হলে শুধু জলাশয়ের মধ্যেই নয় উপরন্তু আশে পাশের

সমস্ত এলাকায় যে বৃষ্টিপাত হত তার জল 'আগোরের' রাস্তা ধরে মূল জলাশয়ের মধ্যে চলে আসত। আগোরের তলায় পাথরের পট্টি এমনভাবে বিছানো থাকত যে এর উপর দিয়ে বয়ে আসা জল কখনই পট্টির নিচে বালির সংস্পর্শে আসত না। জলাশয়ের আশে পাশের বেশ কিছুটা এলাকা জুড়ে পাথরের পট্টি বিছানো থাকত, যা এখন নষ্ট হয়ে গেছে। এই ভাবেই গোটা শহর ও জলাশয়ের আশে পাশের সমস্ত বৃষ্টির জল এই জলাশয়ের মধ্যে জমা হত। এই বিশাল জলরাশিকে জলাশয়ের দিকে ধাবিত করার জন্য আট কি.মি. লম্বা একটি বাঁধের আকারের উচুঁ ক্যানালও নির্মাণ করা হয়েছিল। এই রাস্তা ধরে আসতে থাকা প্রবল জলস্রোতে যাতে মূল জলাশয়ের ঘাট বা অন্যান্য স্থাপত্য নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য এর রাস্তায় পাথরের ছোট ছোট দেওয়াল বানানো হয়েছিল। বৃষ্টির সময় জলরাশির প্রবল বেগ এতে ধাক্কা খেয়ে কমে যেত ও তারপর ধীরে ধীরে গড়সীসরে প্রবেশ করত। এর পরের ব্যবস্থা আরও অভূতপূর্ব। গড়সীসর যখন জলে পরিপূর্ণ হয়ে যেত, তখন এর অতিরিক্ত জল উপচে না পড়ে জলাশয় সংলগ্ন একটি কুণ্ডে থাকে স্থানীয় ভাষায় 'নেষ্টা' বলা হয়, সংরক্ষিত থাকত। বৃষ্টিপাত বেশি হলে এই জল 'নেষ্টা' থেকেও উপচে পড়ে পাড় ভাসিয়ে যেত না বরং সেখান থেকে আরও একটি ক্যানাল বা ছোট নালাপথ ধরে অন্য একটি জলাশয়ে চলে যেত। সেখানেও যখন জল ভরে যেত তখন তা থেকে অন্যত্র আরও একটি জলাশয়ে। এই পদ্ধতিতে জল নয়টি জলাশয় পর্যন্ত পৌঁছে যেত। অর্থাৎ বৃষ্টির জলের একটা ফোঁটাও যাতে অপচয় না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই নয়টি জলাশয়ের নাম — নৌতল, গোবিন্দসর, জোশীসর, গুলাবসর, ভাটিয়াসর, সুদাসর, মোহতাসর, রতনসর এবং কিসানঘাট।[৬] এই কিসানঘাট পর্যন্ত পৌঁছেও যখন জল অতিরিক্ত রয়ে যেত তা সংগ্রহ করা হত কিসানঘাট লাগোয়া ছোট ছোট কয়েকটি কুন্ডতে। জল গড়সীসর থেকে কিসানঘাট পর্যন্ত সাড়ে ছয় মাইল দুরত্ব অতিক্রম করত। এর নির্মাণ পদ্ধতির ফলে বাইরে থেকে বা সামনের পাহাড়ের উপর কেল্লা থেকে বা পাড়ে দাঁড়িয়ে থেকে এই জল আনার পদ্ধতি বা উপায় পুরোপুরি বোঝা যেত না যা স্থাপত্যের এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত।

গড়সীসর স্থলের সঙ্গে যুক্ত অন্য নয়টি জলাশয়ের কথা এখানকার লোকেরাও প্রায় ভুলতে বসেছে। গড়সীসরের পিছনের 'আগোর' বা জল আসার নালাপথে বায়ুসেনার (air-base) তৈরি হওয়াতে ঐ অঞ্চলের বৃষ্টির জল আর জলাশয়ে না এসে অন্য দিকে বয়ে যায়। এর 'কুন্ড' বা নেষ্টার' সঙ্গে যুক্ত অন্য নয়টি জলাশয়ের আশেপাশে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠতে থাকা শহরের ভীঁড়ে এই জলাশয়গুলি ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন আগোরের নালাপথ দিয়েও গড়সীসরে জল সেরকমভাবে

প্রবেশ করতে পারে না, কারণ এই নালাপথের নিচে বিছানো পাথরের পট্টিগুলি ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। এর ফলে বালি জল শুষে নেয়। তাই গড়সীসরের জল বর্ষাকাল ছাড়া অন্যসময় খুবই কমে যায়।

গড়সীসরের পর এই মাপের অন্য জলাশয় বানানো কঠিন হয়ে পড়লেও ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় 'জৈতসর'। এটিকে একটি বাঁধের আকারে তৈরি করা হয়। জয়সলমীরের উত্তরে দাঁড়ানো পাহাড়ের চুড়ো থেকে যে বৃষ্টির জল নিচে নেমে আসে, এই পাথরের বাঁধ তা আটকে রাখে এই জলাশয়ে। জলাশয়ের অন্য পাড়ে বাগান যা 'বড়া বাগ' নামে পরিচিত এই জলেই সিঞ্চিত হয়।

'অমর সাগর' গড়সীসরের অর্থাৎ ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। এই জলাশয়টি পাথরের টুকরো জুড়ে তৈরি বাস্তুকলার একটি অসাধারণ নিদর্শন। জলাশয় চারদিকে বিশাল পাথরের দেওয়াল। একদিকে সিঁড়ি নেমে গেছে জলাশয়ের ভিতরে। উপরে অতি সুন্দর কাজ করা ঝরোখা ও গম্বুজ। এই জলাশয়ের উল্টো দিকের দেওয়ালটি সমান। এখানে দেওয়ালের গায়ে জলস্তর বোঝার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে পাথরের অতি সুন্দর বাঘ, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতির মূর্তি বানানো আছে। এর থেকে বোঝা যেত জল কত মাস ধরে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু এই জলাশয়ে বাহিরে হতে কোন জল আসার সম্ভাবনা নেই, অতএব প্রখর গ্রীষ্মে এটি শুকিয়ে যেত। কিন্তু এখানেই জয়সলমীরের তৎকালীন শিল্পীরা জলাশয়ের তলদেশে সাতটি কুণ্ড বানিয়ে ছিলেন। প্রখর গ্রীষ্মে জলাশয়ের জল শুকিয়ে গেলেও, এই সাতটি কুন্ড বা রাজস্থানী ভাষায় যাকে বলে 'বেরিয়াঁ'র জল কিন্তু শুকিয়ে যেত না। জলাশয়ের তলদেশে এই কুন্ডগুলির উপর পাথর দিয়ে নির্মিত সুন্দর বেদী, স্তম্ভ, 'ছতরী' অর্থাৎ ছোট ছোট মন্দির এবং কুন্ডের আরও গভীরে প্রবেশ করার জন্য কারুকার্যকরা সিঁড়ি রয়েছে। বর্ষায় 'অমর সাগর' যখন ভরে ওঠে তখন 'ছতরী' গুলিকে জলের উপর ভেসে থাকা উল্টোনো নৌকা বলে মনে হয়।

'বাপ' বা 'ভাপ' বীকানের - জয়সলমীরের রাস্তায় একটি ছোট শহর। এখানে দেখা যায় 'মেঘোজী কী তালাও' এর তিনটি উঁচু পাড়। কথিত আছে, ৫০০ বছর আগে 'মেঘা' নামের এক মেষপালক এই জলাশয়টি তৈরি করেছিল। কাহিনীটি এই রকম। মেঘা তার গরুগুলি নিয়ে একদিন মরুভূমির এই স্থান থেকে বাড়ি ফেরার সময় তার জলের কুঁজো হতে অবশিষ্ট জল বালিতে গর্ত খুঁড়ে ঢেলে দিয়ে শুকনো পাতা দিয়ে তা ঢেকে দেয়। তারপর দুদিন বাদে তৃতীয় দিন সেই স্থানে এসে পাতাগুলি গর্তের মুখ থেকে সরাতেই একটা ঠান্ডা ভাপ বা বাষ্প মেঘার মুখে এসে লাগে। মেঘা ভাবে যে এত গরমে যদি দুদিনেও জলের আর্দ্রতা রয়ে যেতে পারে,

তাহলে এখানে একটা জলাশয়ও তৈরি হতে পারে। মেঘা একাই জলাশয় খোঁড়ার কাজে লেগে যায়। এভাবেই দুই বছর অতিক্রান্ত হয়। আশে পাশের গ্রামের লোকেও সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। বারো বছর কেটে যায়। মেঘা মারা গেলে তার স্ত্রী এরপর ছয় মাসের মধ্যেই এই জলাসয়ের কাজ সম্পূর্ণ করে। ভাপ বেরোনর কারণে এর কাজ শুরু হয়, তাই এই স্থানের নাম 'ভাপ' ও এই জলাশয়ের নাম 'মেঘোজী কী তালাও' হয়।[৭]

এরপর বলতে হয় পালীওয়াল ব্রাহ্মণদের কথা। এঁদের দ্বারা স্থাপিত ঐতিহাসিক চুরাশীটি গ্রামের ও সেখানকার প্রায় ৭০০টি কুণ্ড বা কুয়োর কথা। রাজস্থানের পালী নামক স্থানের পালীওয়াল ব্রাহ্মণেরা জয়সলমীর এসে, চতুর্দশ শতাব্দীতে, চুরাশীটি গ্রামে বসবাস করতে আরম্ভ করে। প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লিখিত 'কুলধারা' গ্রামটি এই চুরাশীটি গ্রামের একটি। এই গ্রামগুলিতে বসবাসকারী পালীওয়ালরাই প্রথম জয়সলমীরে গমের চাষ করে। মরুভূমিতে জলের যা পরিমাণ তাতে সেখানে গম ফলানো সম্ভব নয়। কিন্তু পালীওয়ালরা বর্ষার জলকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে ধরে, একটু নিচু জমিতে বাঁধ দিয়ে ঘিরে রাখতেন। জল ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেলে সেই ভিজে জমিতে ফসল ফলাতেন। এই জমি বা অস্থায়ী জলাধারাকে 'খতীন' বলা হত। এই পালীওয়ালরা এতটাই সম্পন্ন ছিলেন ও স্বাবলম্বী ছিলেন যে এখানে নাকি কখনো আকাল পড়েনি। এই কারণেই এরা যথেষ্ট স্বাভিমানীও ছিলেন। এরই ফলে তৎকালীন রাজা মূলরাজের এক ক্ষমতাশালী দেওয়ান সালিম সিংহের সাথে কোন একটি প্রসঙ্গে বিবাদের জেরে, চুরাশীটি গ্রামের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে একটি সম্মেলন করে সমবেত রূপে সিদ্ধান্ত নেন যে তাঁরা এই রাজ্যই ছেড়ে চলে যাবেন। বহু বছরের পরিশ্রমের ফল, বাড়িঘর, কুয়ো, কুণ্ড, 'খতীন' বা জমি সবকিছু যেমন ছিল তেমনি রেখে চুরাশীটি গ্রাম খালি করে তারা চলে যান। সেই থেকে এই গ্রামগুলি পরিত্যক্ত হলেও, গ্রামের বাইরে এই খতীনগুলিতে কিন্তু আজও শস্য ফলানো হয়।[৮]

এই পালীওয়াল ব্রাহ্মণেরাই জয়সলমীর থেকে ৪৫ কিমি দূরে 'ডেরা' নামক গ্রামে প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে 'জসঢোল জসেরী' নামক জলাশয়টি নির্মাণ করেন। এই জলাশয় নাকি কোনদিনও শুকায় না। এটি একটি বিশাল কুয়ো। এর নীচেও পাথরের পট্টি বিছানো আছে এমনভাবে, যে এর ভিতরের জল কখনই পট্টির নীচের নোনা জল বা বালির সংস্পর্শে আসেনা। গত বর্ষার জল শুকায়নি কি নতুন বছরের বর্ষার জল আবার ঐটিকে পূর্ণ করে দেয়। এটি আজও আশেপাশের সাতটি গ্রামের জলের চাহিদা পূরণ করে।[৯]

জয়সলমীরের অর্থাৎ মরুপ্রদেশের বাইরের কয়েকটি বিশেষকরে দুটি জায়গার কথা

বলা দরকার। আজ থেকে ৩৭০ বছর পূর্বে, অর্থাৎ ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে জয়পুরের কাছে 'জয়গড়' দুর্গের উপর নির্মিত হয়েছিল 'কড়োরপতি টাংকা' অর্থাৎ জলাধার। কোন দুর্গের উপর তৈরি করা সর্ববৃহৎ জলাধার এটি। ১৫০ হাত লম্বা এই জলাধার ৪০ হাত গভীর। এতে ষাট লাখ গ্যালন অর্থাৎ তিন কোটি লিটার জল ধরে রাখা যায়। এর বিশাল ছাত, জলের ভিতর ডুবে থাকা ৪১টি থাম বা স্তম্ভের উপর টিকে আছে। চারিদিকে ক্ষুদ্র গবাক্ষ বা জানালা আছে যার মাধ্যমে আলো ও হাওয়া জলাধারের ভিতর প্রবেশ করতে পারে, যাতে সারা বছর এর জল পরিশ্রুত থাকে। এই জলাধারের দুই কোনে দুটি দরজা আছে যেখান থেকে জলাধারের ভিতরে নামার প্রবেশ পথ ও সিঁড়ি আছে। এর জল কেল্লাকে স্পর্শ করে দাড়িয়ে থাকা পর্বতের ঢাল বেয়ে একটি বড় সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে এবং কেল্লার প্রাকারের উপর তৈরি প্রায় ৪ কিমি লম্বা, একটি পাথরের তৈরি নালাপথ বেয়ে, এই জলাধারে প্রবেশ করে। প্রত্যেক বছর বর্ষার আগে এই নালাপথ পরিষ্কার করা হত। এই জলধারের জলেই কেল্লা বা দুর্গের সমস্ত চাহিদা মিটত।[১০]

যোধপুর জেলার ফলোদী শহরে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেঠ সাংগীদাসজী ৩০০ ফুট গভীর নয়টি 'অষ্টকোণী কুয়ো' নির্মাণ করেন, যেখান থেকে সেই সময় সমস্ত শহরের জলের চাহিদা পূরণ হত। পাথরের বিশাল আয়তনের চারটি অষ্টকোণী কুয়ো। চারটি কুয়োর এক একটি বাহু কোণাকুণিভাবে বিস্তৃত হয়ে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় তৈরি হয়েছে আরও একটি অপেক্ষাকৃত ছোট অষ্টকোণী কুয়ো। এই মাঝামাঝি অবস্থানের কুয়োটিকে নিয়ে মোট কুয়োর সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ। আবার মাঝখানের অষ্টকোণী কুয়োর চারটি বাহু বরাবর বৃহদ আয়তনের চারটি কুয়োর সংযোগ স্থলের মাঝামাঝি চারটি স্থানে আরও চারটি ক্ষুদ্র কুয়ো তৈরি করা হয়েছে। এইভাবে মোট কুয়োর সংখ্যা দাঁড়ালো নয়ে। কুয়োগুলির ভিতরে জলের দর্শন পেতে গেলে সিঁড়ি দিয়ে কুয়োর উপর বেশকিছুটা উঠতে হবে। প্রত্যেকটি কুয়োর গায়ে দুটি করে চতুর্ভূজাকার জলধারা আছে। অর্থাৎ মোট আটটি ছোট জলাধার আছে যার জল পশুদের জন্য ব্যবহার করা হত। এই কুয়োগুলি রাজস্থানের মধ্যযুগীয় ফলিত বাস্তুকলার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। একই কথা বলা যায় বিকানীর শহরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত দর্শনীয় 'চৌতিনা' বা চারকোণা কুয়ো যা আজও শুধু মিষ্টি জলের উৎসই নয় উপরন্ত কুয়ো ঘিরে তৈরি হওয়া অতি সুন্দর মহলে নগর পালিকার দফতরও আছে।

এমন অজস্র উদাহরণ আরও আছে, যা থেকে দেখা মেলে জলের সন্ধানে মরুপ্রদেশের জনগণের মধ্যযুগীয় উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রয়োগশীলতা।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। Jaisalmer Khadi gramoday parishad.

২। শ্রী অশোক আত্রে — 'রাজস্থান কী বাওড়ী' — *রাষ্ট্রদূত পত্রিকা*, ১৮ই জুন ১৯৮৯, জয়পুর।

৩। 'নাথমলজী রী খ্যাত' ও 'মোহতা নয়নসিংহ রী খ্যাত' — A 15th century chronicle, Jaisalmer Khadi gramoday Parishad.

৪। শ্রীনারায়ণ শর্মা — 'জয়সলমীর', উদয়পুর, ১৯৪৪।

৫। —ঐ—

৬। —ঐ—

৭। শ্রী অনুপক মিশ্র, রাজস্থান কী রজত বুঁদে, মে ১৯৯৪, নতুন দিল্লী।

৮। —ঐ—

৯। —ঐ—

১০ Shree R. S. Khangawat and Shree P. S. Nathawal, 'Jaigarh : The invincible fort of Amer' - 1985, Jaipur

মুর্শিদাবাদ - বাণিজ্য পথ - ঐতিহাসিক পরিক্রমা

অনিরুদ্ধ দাস

সমৃদ্ধ ইতিহাসের জেলা মুর্শিদাবাদের বাণিজ্যের ইতিহাসও সুপ্রাচীন ও সমৃদ্ধ। বাণিজ্যিক সমৃদ্ধতার মূল মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রের পরস্পরের এবং তাদের সঙ্গে ভারতের তথা বহির্বিশ্বের স্থল ও জলপথে যোগাযোগ। এই যোগাযোগ সচল থাকার সময় বাণিজ্য ছিল প্রাণবন্ত। সময়ের সঙ্গে এই সমস্ত বাণিজ্য পথ পরিবর্তিত হয়ে সমৃদ্ধ করেছে মুর্শিদাবাদের নতুন নতুন স্থানকে। বর্তমানে ঐ সমস্ত প্রাচীন বাণিজ্য পথের অনেকগুলিই হয়তো লুপ্ত, তার স্থানে নতুন ভাবে গড়ে উঠেছে বাণিজ্য পথ।

প্রাচীন যুগে মুর্শিদাবাদের প্রাণ কেন্দ্র ছিল শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ এবং পরে পাল যুগে মহীপাল। অবশ্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্মৃতি চিহ্ন কিছু খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ১৯৭৪ সালে, ফারাক্কা ব্যারেজের উত্তর-পূর্ব দিকে চ্যানেল খননের সময়।[১] কিন্তু এরপর তার সঙ্গে সংযোগকারী পথ ঘাটের সন্ধান বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। যদিও ঐ সভ্যতা নর্দান ব্ল্যাকপলিস্‌ড পটারি যুগের। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে শশাঙ্কের সময় গৌড় জনপদের বিস্তৃতি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তা যে বর্তমান মুর্শিদাবাদ মালদহ বীরভূম ও বর্ধমানের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল তা বলা যায়।[২] সপ্তম শতকের দ্বিতীয় পাদে য়ুয়ান চোয়াঙ বারাণসী থেকে এসেছিলেন মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্তে সেখান থেকে কর্ণসুবর্ণ হয়ে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গে গিয়েছিলেন। এই প্রাচীন রাজপথের অনুসারী হয়েই পরবর্তীতে রেলপথ অনেকাংশে নির্মিত। বিদ্যাপতির পুরুষ পরীক্ষায় গৌড় থেকে গুজরাত পর্যন্ত বাণিজ্য পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। য়ুয়ান চোয়াঙ দ্বিতীয় পথের কথা বলেছেন তাম্রলিপ্ত থেকে কর্ণসুবর্ণ হয়ে রাজমহল চম্পা (বর্তমান ভাগলপুর) স্পর্শ করে পাটলীপুত্র।[৩]

প্রাচীন বাংলার বাণিজ্যিক সামরিক ও সংস্কৃতির যোগাযোগ রক্ষার জন্য এই সব পথই ছিল স্থল ও জলপথের মিশ্রণ। য়ুয়ান চোয়াঙ হর্ষবর্ধন-ভাস্কর বর্মা সংবাদ প্রসঙ্গে কামরূপ থেকে কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত একটি জলপথের ইঙ্গিত দিলেও তার সঠিক পথ নিয়ে সংশয় আছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বংশী দাসের মনসামঙ্গল ও অন্যান্য মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এবং বিস্তৃতভাবে মুকুন্দ রামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন চৈতন্য চরিত কাব্যে বাংলার বন্দর গুলির অনেকগুলির নামোল্লেখের মাধ্যমে তাদের সঠিক পথ প্রবাহের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।[৪] এরই মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার

স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত, চাঁদ সদাগর এখান হয়ে বাণিজ্য করতে যেতেন কথার মাধ্যমে হয়তো চণ্ডী মঙ্গলে বিধৃত চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য পথের যোগসূত্র করা যেতে পারে। কারণ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ভগবানগোলায় ছিল বিরাট বাজার। ভগবানগোলা বাণিজ্য কেন্দ্রের ইঙ্গিত অতএব মধ্যযুগেও পাওয়ার সূত্র আছে।

১৭৭৯ সালে জেমস্ রেনেল সার্ভেয়ার জেনারেল নিযুক্ত হয়ে যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন 'The Map of Bengal and Behar' তা সেই সময় থেকে অন্তত অড়াইশো বছরের প্রাচীনত্ব নির্দেশ করে।[৫] বলা যেতে পারে ঐ পথ গুলি পাঠান ও মোঘল আমলে ছোট বড় সংযোগকারী রাস্তা হিসাবে ব্যবহৃত হত। এর মধ্যে (১) উত্তরের পথটি বড়নগরের কাছে বামিনিয়া থেকে দ্বিমুখী হয়ে একটি রাজমহল, অন্যটি মালদহ। মালদহ পর্যন্ত পথটিই পরবর্তীর বাদশাহী সড়ক, এই সড়কের পরবর্তী অংশ মুর্শিদাবাদ থেকে পলাশী হয়ে বর্ধমান, আরামবাগ, ক্ষীরপাই ও মেদিনীপুরের উপর দিয়ে ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (২) দক্ষিণের দিকে একটি পথ পলাশীর কাছে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটি পশ্চিমে সোজা কলকাতা এবং অপরটি বর্ধমান মেদিনীপুর হয়ে ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত। (৩) মুর্শিদাবাদের উত্তর পূর্বের পথটি গঙ্গা পেরিয়ে বোয়ালিয়া অতিক্রম করে রংপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। (৪) দক্ষিণ পূর্ব থেকে ৪ নম্বর পথটি আজিমগঞ্জ ও ঢাকাকে যুক্ত করেছিল। (৫) দক্ষিণ পশ্চিমের ৫ নং পথটি শেরপুর বাজিতপুর হয়ে সিউড়ি থেকে রাজনগর থেকে উত্তরে প্রসারিত ছিল দেওঘর পর্যন্ত। এই সমস্ত প্রাচীন পথ ঘাটেরই বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছিল সুসমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলি। মুর্শিদাবাদের এরকম বাণিজ্যিক রমরমার জন্যই মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৪ সালে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে মুর্শিদাবাদে আসতে থাকেন ব্যবসায়ী, শ্রেষ্ঠী ও নানা ধর্মোপাসকরা, রেনেলের মানচিত্রেই জেলার মধ্যে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির যোগসূত্রের চিহ্ন পাওয়া যায়-মুর্শিদাবাদ থেকে ভগবানগোলা, জলঙ্গী ও তারপর পলাশী হয়ে বর্ধমান এছাড়াও সুতী ও রাজমহলের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। এই রাস্তাগুলি কিন্তু পাকা সড়ক ছিল না, এমন কি সারা বছর কার্যোপযোগীও ছিল না। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে কলকাতা গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে উঠলে মুর্শিদাবাদের যোগাযোগের উন্নতি ব্যাহত হয়।[৬]

বাংলায় দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর ১৭৭২ সাল নাগাদ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ দৌল্লার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে ১৭৭৮ সালে কোলকাতার সরকারের সঙ্গে ক্যাপ্টেন জন্ ম্যাকগোয়ানের এক চুক্তি হয়। এর ফলে সুতী থেকে শুরু হয়ে ভাগীরথীর শাখা যেখানে — হুগলী নদীতে মিশেছে সেখান পর্যন্ত ৬০০ মণ ওজন পর্যন্ত নৌকা বহনোপযোগী হয়ে ওঠে। এটি পরবর্তী পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত টিকে ছিল।

উল্লেখ্য, আলীবর্দীর সময়ে মুর্শিদাবাদে প্রধান নদী বন্দর ছিল ভগবানগোলা। একই সঙ্গে অনেকগুলি জলপথের নিয়ন্ত্রক এই ভগবানগোলার সঙ্গে সারা বছর যোগাযোগ ছিল জলপথে। সমসাময়িক কবি বিজয়রাম তীর্থমঙ্গলে ভগবানগোলার বাজার আট মাইল বিস্তৃত ছিল বলে বর্ণনা করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে তুলোর আমদানির সঙ্গে ভগবানগোলার গুরুত্ব আরো বাড়ে। ১৭৮৮ সালে বেনারসের কালেক্টর ডানকান মন্তব্য করেন ভগবানগোলার বাজার দর মীর্জাপুরের বাজারকে প্রভাবিত করত। ভগবানগোলায় ঢাকা, কোলকাতা ও অন্যান্য স্থান থেকে ব্যবসায়ীরা আসত তুলো কিনতে। প্রসঙ্গত ভগবানগোলা বন্দরকে রক্ষা করতে এমনকি পরিখাও খনন করা হয়েছিল।[৭]

অন্যদিকে কাশিমবাজার ছিল সিল্ক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে ভাগীরথীর অন্যতম জনপ্রিয় নাম ছিল কাশিমবাজার নদী। এবং গঙ্গা, ভাগীরথী, জলঙ্গীর সীমাবদ্ধ স্থানের নাম ছিল কাশিমবাজার দ্বীপ। ষোড়শ শতকের সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম, সপ্তদশ শতকের হুগলী বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্ব হারালে এবং কোলকাতা বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার আগে কাশিমবাজার শূন্যস্থান পূর্ণ করেছিল। এবং সেখানে কাশ্মীরী, গুজরাটী, পার্সিয়ান, আর্মেনিয়ান, এবং তুর্কী বণিকরা জমায়েত হয়েছিল। কাশিমবাজার থেকে সিল্ক রপ্তানি হত মীর্জাপুর, সেখান থেকে তা চলে যেত মুলতান, লাহোর। অন্যদিকের সিল্ক মীর্জাপুরের পর নাগপুরে গেলে সেখানে তা থেকে তৈরি হত নানা দ্রব্য। ৭/১৬ ভাগ সিল্ক সমুদ্র পথে যেত সুরাটে।[৮] সমৃদ্ধির তালিকায় একে একে উঠে আসে মুর্শিদাবাদ, তিন মাইল উত্তরে জিয়াগঞ্জ এবং নদীর অপর পাড়ে আজিমগঞ্জ, আরও উত্তরে জঙ্গীপুর। মুর্শিদাবাদ রাজধানী হওয়ার পর তার সমৃদ্ধি হয় ভাগীরথীর দুই তীরেই। প্রচুর জাহাজ মুর্শিদাবাদ শহরের কাছাকাছি ভিড় করত কাস্টম হাউসগুলির পরীক্ষার জন্য।[৯]

এই সময় কাশিমবাজারের পশ্চিমে সৈদাবাদে ছিল ফরাসি ফ্যাক্টরি। সৈদাবাদের জলপথে যোগাযোগ ছিল সুগম, এর চারদিকে ছিল ওসমানখালির বিল, বিষ্ণুপুরের বিল, শ্বেতাখাঁর পুকুর নামে একটি বড় বিল। যেগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে নদী ও তারপর সমুদ্রে পড়েছিল। সৈদাবাদ বন্দর থেকে নদী ও সমুদ্র পথে তাই বিদেশেও পাড়ি দেওয়া যেত। সে সময় সৈদাবাদ থেকে মালদহ বা কোলকাতায় কাপড়ের বেল নদী পথে যেত ২০-২৫ দিনে। পাটনা থেকে বড় বড় নৌকায় গুলি গোলার বারুদের জন্য আসত সোরা। বাংলার যে সমস্ত বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে ডুপ্লে সুরাট, জেদ্দা বসরা, চীন ও তিব্বতে পাঠাতেন তার মধ্যে সৈদাবাদও ছিল। ফরাসিদের ব্যবসা পণ্যের মধ্যে ছিল সুতীবস্ত্র, রেশমি বস্ত্র, রেশম, চিনি, আফিং, লঙ্কা, চাল ইত্যাদি। সৈদাবাদ

জেলার অন্যান্য স্থানের সঙ্গেও যুক্ত ছিল সড়ক পথে। কুঞ্জ ঘাটায় ফরাসি কুঠি থেকে সৈদাবাদ মৌজার পশ্চিম বরাবর একটি রাস্তা ব্রহ্মপুর হয়ে পলাশীর দিকে চলে গিয়েছে। আর দুটি বড় রাস্তা ঐ মৌজার উত্তর বরাবর কুঞ্জ ঘাটার জলকলের উত্তর ও দক্ষিণ থেকে বেরিয়ে শ্বেতাখাঁর বাজার হয়ে একটি কালিকাপুর হয়ে কাশিমবাজার ও অন্যটি হোতা সাঁকো পর্যন্ত। এছাড়াও এই মৌজার কাছাকাছি দৈহাট্টা রোড, দয়ানগর রোড, নন্দ কুমার রোড এর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল।[১০]

১৮৭১ সালে মুর্শিদাবাদের কালেক্টর ১৩টি রাস্তার নাম করেছিলেন যেগুলি স্থানীয়ভাবে সংরক্ষিত হত। এগুলির দুটি ছিল পাকা রাস্তা। এগুলি ছিল ব্রহ্মপুর মুর্শিদাবাদ রোড ১০ $^{৩}/_{৪}$ মাইল, আজিমগঞ্জ রোড ৭ মাইল। কাঁচা রাস্তাগুলির মধ্যে ছিল জলঙ্গী রোড, সাড়ে ২৭ মাইল, মীরগঞ্জ রোড সাড়ে ১৬ মাইল, বেউলিয়া রোড ২০ মাইল, কান্দী রোড সাড়ে ২১ মাইল, মানকরা রোড সাড়ে ৩ মাইল, সুতী রাজমহল রোড সাড়ে ২৯ মাইল, ভগবানগোলা মোর্চা রোড সাড়ে ১১ মাইল, জঙ্গীপুর কামরা রোড ৫ মাইল, মুরারই রোড ১৪ পূর্ণ ৩/৪ মাইল, পাকুড় ধুলিয়ান রোড ১৫ মাইল। এছাড়াও পি ডব্লু ডি-র অধীনে ছিল দুটি রাস্তা প্রথমটি কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে যার দৈর্ঘ্য ২২ মাইল এবং দ্বিতীয়টি বহরমপুর থেকে ভগবানগোলা যা গিয়েছে মুর্শিদাবাদ শহর ও জিয়াগঞ্জ হয়ে, দৈর্ঘ্য ২২ মাইল। এই সব রাস্তার ওপর বড় বাজার গড়ে না উঠলেও বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলির সংযোগস্থল হিসাবে এগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।[১১]

এছাড়াও ঐ সময়ের আর যে কটি রাস্তার উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি হল ৩০ মাইল দৈর্ঘ্যের বহরমপুর পাটিকাবাড়ি রোড, ১৭ মাইল দৈর্ঘ্যের মুর্শিদাবাদ পাঁচগ্রাম রোড, ৩৫ মাইলের বাদশাহী রোড যা জোরুর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছে।

তথ্যানুযায়ী ১৮৬২ সালে মুর্শিদাবাদে স্থাপিত প্রথম রেলপথ যুক্ত করেছিল নলহাটি থেকে আজিমগঞ্জ পর্যন্ত। ঐ সময়ে নলহাটিও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যেই ছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের একটি লুপ লাইন ছিল এটি। স্টেশনগুলি ছিল নলহাটির দিক থেকে নওদা, বোখরা, সাগরদীঘি, সাহাপুর ও আজিমগঞ্জ। ১৮৭২-৭৩ এ মুর্শিদাবাদের কালেক্টর তাঁর প্রশাসনিক রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন আজিমগঞ্জের ব্যবসায়ীদের জন্য তুলো ও পাট বর্ষার সময়ে নামত ভগবানগোলায়, শুকনো সময়ে আলাতলি বা নিউ ভগবান গোলায়, এরপর কান্দী হয়ে তা পৌঁছাতে সাঁইথিয়াতে গরুর গাড়িতে, এরপর রেলে কোলকাতায়। আজিমগঞ্জ ভগবানগোলার কাছে অবস্থিত হলেও খুব অল্পই নলহাটি হয়ে রেলপথে কোলকাতা যেত। রেলপথ স্থাপিত হওয়ার পর আজিমগঞ্জের ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে উন্নতি হয়। ১৮৬০ সালের বিচ্ছিন্ন গ্রাম মুরারই ধুলিয়ানের

পরই শস্য ব্যবসায় দ্বিতীয় স্থান নেয়। এখান থেকে ১৮৭৬ সাল নাগাদ প্রচুর পরিমাণ আমন ধান রেলে যেত কোলকাতায় বা উত্তর-পূর্বে।[১২] ১৯০৫ এ রাণাঘাট মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে চালু হয়। এছাড়া গঙ্গার পশ্চিম তীর দিয়ে গিয়েছে বারহাবরা-আজিমগঞ্জ-কাটোয়া রেলপথ। ঐ পথে সর্বশেষ সংযুক্তি ১৯৭১ সালে তিলডাঙ্গা থেকে ফারাক্কা।

উনিশ শতকের শেষ দিকে জলপথে পণ্য পরিবহণের পরিমাণ বাড়ে এবং এর উন্নতিও হয়। ১৮৭৫ সালের ১৮ অক্টোবর সরকার *দ্য বোট ট্রাফিক অব বেঙ্গল* এর উপর যে রেজুল্যশন নেয় তাতে দেখা যায় মুর্শিদাবাদের সঙ্গে বিহার ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের যে বাণিজ্য চলত জলপথে দক্ষিণাভিমুখে তার নথিভুক্তিকরণ হত সাহেবগঞ্জে। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ, জঙ্গীপুর, ধুলিয়ানের জন্য আসত পণ্য। উত্তরাভিমুখী বাণিজ্যের সময় নথিভুক্তকরণ হত জঙ্গীপুরে।[১৩]

বর্তমান শতকের প্রথম দিকে জেলায় ৮৯ কিলোমিটার পাকা রাস্তা ৮২৪ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা সংরক্ষণ করত জেলা বোর্ড। এছাড়াও ১৩৯৫ কিলোমিটার ছিল গ্রাম্য রাস্তা। ওমেলি ১৯১৪ সালে মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিকট্ গেজেটিয়ারে যে কটি রাস্তার নাম করেছিলেন সেগুলি হল (১) ভগবানগোলা রোড যার একটি শাখা গিয়েছে জিয়াগঞ্জে। রাণাঘাট মুর্শিদাবাদ রেললাইন হওয়ার পূর্বে এটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ ছিল। (২) বহরমপুর জলঙ্গী রোড। (৩) কৃষ্ণনগর বা কোলকাতা রোড যা বহরমপুর ও কোলকাতা যুক্ত করেছে। (৪) কান্দী সাঁইথিয়া রোড। (৪) বাদশাহী রোড ১৮৭৪ এ দুর্ভিক্ষের সময় যা পুনর্গঠিত হয়েছিল। (৬) ডাহাপাড়া থেকে পাঁচ গ্রাম পর্যন্ত পাঁচ গ্রাম রোড (৭) জঙ্গীপুর মুরারই রোড (৮) পুরনো রাজমহল রোড়ের অংশ জিয়াগঞ্জ জঙ্গীপুর রোড (৯) রামনগর থেকে সুতি হয়ে ধুলিয়ান পর্যন্ত রামনগর ধুলিয়ান রোড।[১৪]

বর্তমান ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক কোলকাতা থেকে শিলিগুড়ির পথে ছুঁয়ে গিয়েছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর, রঘুনাথগঞ্জ, বেলডাঙ্গা, নবগ্রাম, সুতি, সাগরদীঘি, সমসেরগঞ্জ, এবং ফারাক্কা থানাকে। দুটি রাজ্য সড়ক যুক্ত করেছে কুলী মোড়গ্রাম ও অপরটি মোরগ্রাম ও বীরভূমের নলহাটিকে । এছাড়াও আছে বহরমপুর লালবাগ কার্জন রোড ও বহরমপুর কান্দী রাস্তা।[১৫]

জেলার বাণিজ্য পথের ঐতিহাসিক পরিক্রমায় দেখা যায় জলপথ বা সড়ক পথে মুর্শিদাবাদের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগ যেমন সুগম ছিল তেমনি ছিল জেলার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই সকল পথেরই মধ্যে বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্র থাকায় হয়েছে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি তথা আর্থিক উন্নতি। নদীপথ তার গতি পরিবর্তনের সঙ্গে যেমন পুষ্ট করেছে অন্যান্য নতুন এলাকাকে, পুরনো বাণিজ্য পথের ওপর তেমনই কেন্দ্রগুলি রয়ে গিয়েছে সহায়ক হিসাবে। সড়ক পথে যোগাযোগ তথা বাণিজ্য পথের ইতিহাস কিন্তু একা

ধারে উন্নতির। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদের আর শিল্পোৎপাদিত পণ্য বা কুটির শিল্পের পণ্যের আর সেই রমরমা না থাকলেও রয়ে গিয়েছে পুরনো পথগুলি। অষ্টাদশ-উনিশ শতকে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে উন্নতি হয়েছে কোলকাতার আর মুর্শিদাবাদ হয়েছে স্থবির। কিন্তু মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক পথগুলি সেই স্থবিরতাকে অতিক্রম করে যায়।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। West Bengal District Gazetters : Murshidabad by Birendra Kumar Bhattacharya, (March 1979)

২। বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব ঃ নীহার রঞ্জন রায় (দে'জ—বৈশাখ ১৪০০)

৩। তদেব

৪। তদেব

৫। শারদীয় মুর্শিদাবাদ সন্দেশ, ১৪০২, প্রবন্ধ প্রাচীন মুর্শিদাবাদের পথঘাট - তারাপদ সাঁতরা।

৬। A Bengal District in transition : Murshidabad 1765-1793 : Khan Mohammad Mohsin (1973), Asiatic Society of Bangladesh.

৭। IBID

৮। IBID

৯। The story of Kasimbazar, Silk Merchant and commerce in Eighteenth Centruy India by Rita Mukherjee (published in Review, Fernand Braudel Centre, Vol. XVII, Number 4, Fall 1994; A journal of the Fernand Braudel Centre for the study of Economics, Historical system and civilization).

১০। গণকণ্ঠ বিশেষ সংখ্যা ১৯৯৮, প্রবন্ধ সৈদাবাদ একটি প্রাচীন ঐতিহ্যময় জনপদ ঃ প্রাক পলাশী পর্ব - শ্যামল দাস।

১১। A statistical Account of Bengal by W. W. Hunter, 1876 (Reprint edition 1974).

১২। IBID

১৩। IBID

১৪। L. S. S. O'melly : District Gazetteer, Murshidabad (1914).

১৫। ১ নং উৎস দ্রষ্টব্য

এছাড়াও সহায়ক পাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে-

১) বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ)

২) বন্দর কাশিমবাজার ঃ সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী (এপ্রিল, ১৯৭৮)

৩) Encyclopaedia Britannica

৪) Memoir of a Map of Hindoostan or the Mogul Empire by James Rennell (First Indian edition 1976).

৫) The Twenty Year Road Development Plan (1981-2001) For West Bengal Part II Govt. of West Bengal Public works (Roads) Directorate, 1984.

খাজা আনওয়ার-ই শহিদের কবর কমপ্লেক্স বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা সতের শতাব্দির শেষদিকে নির্মিত

রাশেদা ওয়ায়েজ

খাজা আনওয়ার-ই শহিদের কবরটি বর্ধমান শহরে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। বর্তমান স্থানটি খাজা আনওয়ারের[১] 'মেরা' (of enclosure) নামে পরিচিত।

আনওয়ার-ই-শহিদ ছিলেন প্রধান আমির আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস-সাহর অধীনে যিনি বর্ধমানের শাসনকর্তা ছিলেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে দীর্ঘদিন রাজধানী থেকে অনুপস্থিত থাকার দরুণ দাক্ষিণাত্যের মুসলিম বিদ্রোহ, মারাঠা বিদ্রোহ দরুণ খুব স্বাভাবিকভাবে মুগলদের এ সব দূর অঞ্চলগুলির উপর কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। ইব্রাহিম খাঁ যখন শাসনকর্তা ছিলেন, (তিনি ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হন,) তখন শোভা সিং বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়কে একটি যুদ্ধে পরাজিত করেন। কৃষ্ণরাম এর পুত্র জগৎ রায় ঢাকায় পালিয়ে যান এবং ইব্রাহিম খাঁর সাহায্যপ্রার্থী হন। শোভা সিং নিজের দলে রহিম খানকে ও তার অনুসারী আফগানদের একত্রভূত হন। সমস্তদেশে অরাজকতা বিরাজ করছিল যখন বাদশাহ আওরঙ্গজেব আজিম উস শাহনকে বাংলায় সুবাদার হিসাবে প্রেরণ করেন। আজিম উস শাহন তাঁহার দুই পুত্র সুলতান কামরদ্দীন এবং মোহাম্মদ ফারুক সিয়রকে সঙ্গে নিয়ে বিহারে যান। ইতিমধ্যে ইব্রাহিম খানের সাহসী পুত্র জবরদস্ত খান রহিম খানকে পরাজিত করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যুবরাজ আজিম উস নাহন তাহার ভাল কাজের কোন স্বীকৃতি দেননি। তাই মনের দুঃখে জবরদস্ত খান বাংলার ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে চলে যান।

রহিম খান যিনি এতদিন 'লুকায়িত ছিলেন এখন সম্মুখে বেরিয়ে আসলেন এবং বর্ধমানের সীমান্তবর্তী এলাকা, হুগলী এবং নদীয়ায় আক্রমণ চালান যেইমাত্র রাজকীয় সৈন্য রহিম খানের নিকটবর্তী হইল, রহিম খান তখনই তাহার তাঁবু তৎপরতার সহিত গুটিয়ে বর্ধমানের সীমান্ত অঞ্চলসমূহে পলায়ন করেন। প্রিন্স আজিম-উস-শাহ চিন্তা করলেন যে আফগানদের ধরা তার জন্য খুব কষ্টসাধ্য না - প্রিন্স প্রতিজ্ঞা করলেন রহিম খান যদ্ধি তার কাছে ধরা দেন - তাকে পুরস্কৃত করবেন - নচেৎ তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আবদুল ওয়ালী বর্ণনা দিচ্ছেন ''রহিম খান রাজকুমারের প্রধান আমির খাজা আনওয়ার-ই-শহিদ ও তার সঙ্গীদের এইভাবে বলেন যদি

রাজকুমারের উচ্চপ্রদস্থ লোকজন প্রতিজ্ঞা করে তাকে আস্বস্ত করেন, তবে তিনি মহামান্য রাজকুমার এবং তার সঙ্গীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে রাজি আছেন।[২]

এই ভাবে কথাবার্তা হওয়ার পর রাজকুমারের আদেশমত ও ইচ্ছানুযায়ী আনওয়ার কয়েকজন সঙ্গী ও কয়েকজন মাত্র সৈন্য নিয়ে তিনি রহিম খানের তাঁবুর নিকটে পৌছালেন - অবশিষ্ট সৈন্য পিছনে ঘোড়ার সওয়ার হয়ে বসে রইল। রহিম খান অল্প সময়ের মধ্যে তার পূর্বের ভাবমূর্তি পরিবর্তন করে অনুরোধ করলেন আনওয়ার তার তাঁবুতে প্রথম প্রবেশ করে রহিম খানের সাক্ষাৎ প্রার্থী হবেন - কিন্তু আনওয়ার অবিচল থাকলেন ভয়ে এই ভেবে রহিম খান প্রতিজ্ঞা না রেখে তাকে বিপদে ফেলতে পারেন। ইতিমধ্যে রহিম খান তার লুক্কায়িত সৈন্যদের বাহির করে খাজা আনওয়ারা-ই-শহিদকে আক্রমণ করেন। যদিও আনওয়ার-ই-শহিদ ও তাঁর সৈন্যরা জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে তারা তাদের প্রাণ রক্ষার্থে যুদ্ধ চালিয়ে যান কিন্তু আনওয়ার তাহার সঙ্গীরা রক্তাক্ত অবস্থায় শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। চতুর রহিম খান রাজকীয় ক্যাম্পকে চতুরদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলেন এবং রাজকুমারের হাতিকে আক্রমণ করেন। রাজবাহিনী এরপর পালিয়ে যায় এবং রাজকুমার দারুণ বিপদে পড়েন। ঠিক এই দুর্যোগ মুহূর্তে হামিদ খাঁন কোরেশী, যিনি নিকটে অবস্থান করছিলেন রহিম খানকে তীরের সাহায্যে আক্রমণ করলে রহিম খান মৃত্যুবরণ করেন।

অল্প কথায় ইহাই হচ্ছে উচ্চপদস্থ খাজা আনওয়ার-ই-শহিদের করুণ মৃত্যুর কাহিনী এবং এই বীর সেনাপতি কিভাবে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কি সাহসিকতা, নির্ভীকভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং তার এ আত্মবলির জন্য তিনি ''শহিদ'' মার্টির বলে ইতিহাসে আখ্যায়িত হয়ে আছেন। খাজা আনওয়ার এবং তার সঙ্গীরা যেখানে একত্রে মৃত্যু বরণ করেন - সে স্থানটি বর্ধমান শহরের বাইরে। স্থানটি সদর ঘাটের খুব নিকটবর্তী, খাজা আনয়ার-ই-শহিদের মৃত্যুর পর, তাহার চাচা আমিরুল ওমরা শা মসুড-দৌলা খান বাহাদুর মনসুর জং এবং তাহার ভ্রাতা বর্ধমানে যান। বাদশাহ ফারুক শিয়র এই মাজারটি তৈরি করেন নগদ দুই লক্ষ টাকা এবং মৌজা 'পদ্মারঘাট' ছাড়া আরও পাঁচটি মৌজা প্রদান করা হয় যাতে আনওয়ার-ই-শহিদের কবরের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ চালানো হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় মৌজাগুলি বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে বন্ধোবস্ত হয়। তিনি সরকারকে যে টাকা তাহার জন্য ধার্য্য হয় তাহা প্রদান করেন।

নকশা, উত্তোলন স্থাপত্যের দিক থেকে খাজা আনওয়ার-ই-শহিদের মাজারটি একটি অদ্বিতীয় ইমারত। একটি চর্তুকায় কেন্দ্রীয় বা প্রধান কক্ষ যাহা মধ্যখানে অবস্থিত, এক গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত গৃহ, যাহাব পূর্ব ও পশ্চিমদিকে একটি নিচু চতুর্দায়, বিল্ডিং দ্বারা উভয়দিকে খাড়া দুই চালা কক্ষ অধোমুখে অবস্থান বা সন্নিবেশন করা হয়েছে।

যোলবিঘার জমির উপর এই সুন্দর স্থাপত্যটি নির্মিত হয়। বিরাট দরজা সংযুক্ত প্রাসাদ পেরিয়ে বাগান মধ্যখানে। দিঘীর মাঝখানে 'হাওয়া মহল' যেখানে বেগমরা হাওয়া খেতেন। দিঘীটিতে চারদিকে চারটি ঘাট আছে। হাওয়া ঘরে পৌছানোর জন্য দিঘীর মাঝখান দিয়ে পাথরকেটে সিড়ি বানানো হয়েছে।

মাজারটি মাপ এরূপ ঃ

পূর্ব পশ্চিম - ১৯'-৮"

উত্তর দক্ষিণ - ১৯'-২"

উত্তর দক্ষিণে - দু চালা গৃহের মাপ ১৮'-৮"

পূর্ব পশ্চিমে দু চালা গৃহ ১৯'-২"

মাজারটিতে সর্বমোট সাতটি দরজা আছে। দু'দিকে দ'চালা ঘর ও মধ্যখানে চতুর্কায় বিল্ডিং যাহা একটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। মোট দু'টি গেট পরপর উচ্চ, বৃহৎ ও মজবুত যাহার ভিতরদিয়ে অনায়াসে হাতি প্রবেশ করতে পারে। দরজা পেরিয়ে বাগানে প্রবেশ করতে হয়, মোগল বৈশিষ্টপূর্ণ বাগানের পূর্বপ্রান্তে এককোণে আনওয়ার-ই-শহিদ ও তাঁর সঙ্গীরা সমাহিত। চারকোণা বৃহৎ ঘরটি আনওয়ায়-ই-শহিদ নিজে ও দুই চালা গৃহে তাঁর সঙ্গীরা সমাহিত। ক্যাথারিন বি আসার এই ভাবে স্থাপত্যটির বর্ণনা দিচ্ছেন "কবরটি একটি বৃহৎ কমপ্লেকস এর উত্তরে শেষ মাথায় একটি বৃহৎ চত্বরে মাঝখানে অবস্থিত যাহার দক্ষিণে একটি উচুঁ স্ক্রিনযুক্ত দেওয়াল দ্বারা আবৃত যাহার এক বাহুতে পশ্চিমদিকে একটি মসজিদ ও অপর বাহুতে পূর্ব দিকে একটি মাদ্রাসা" - দুটি সৌধ বর্তমানে বিদ্যমান।[৩]

মাজারটি একটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত এবং ড্রামের উপর স্থাপিত। 'ফিনিয়াল' হিসাবে কলস মোটিফের ব্যবহার যাহা গম্বুজ শীর্ষ সুশোভিত হয়ে উঠেছে। দক্ষিণের বৃহৎ দরজাটি একাধিক 'মালটিফয়েল' আর্চ দ্বারা সুশোভিত। চারকোণে একটি করে লম্বা অথচ ক্রমে ক্রমে সুরু হওয়া মিনার আছে, যাহা কিয়স্ক সহ কিউপিলা দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন করা হয়েছে। সৌধটির তিনটি করে অত্যন্ত উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা হয়েছে যাহা আজও অক্ষত আছে।

ক্যাথারিন বি আসারের মতে "খাজা অনুয়ার-ই-শহিদের কবরটির সম্মুখভাগ জ্যামেতিক প্যাটার্ন দ্বারা সজ্জিত, গভীরভাবে কর্তন করে স্টাকুর কাজ এবং সুন্দর সুক্ষ্মাগ্র প্রত্যর্পণ কুলুঙ্গি[৪]। অতএব এ সমাধি নির্মিত হয় সতেরশ শতাব্দির শেষের দিকে। দরজার উপরের অংশে আছে দুসারি কুলুঙ্গি, তিনটি করে প্রতিটি সারিতে কুলুঙ্গি দুই সারিতে মোট ছয়টি কুলুঙ্গি। নিচের সারির কুলঙ্গিগুলি উপরের সারির চেয়ে বৃহৎ।

মাজার গৃহের গম্বুজটি নমুনার দিক দিয়ে মোগল বৈশিষ্ট্যে নির্মিত যাহা অষ্টাকৃতি ড্রামের উপর স্থাপিত। সজ্জিত একাধিক কোণ বিশিষ্ট 'ব্যাটলমেন্ট' 'প্যারা পেট' গুলির চালাইবার জন্য যাহা সাধারণ দুর্গে অন্যান্য অট্টালিকার নির্মিত ফোকর বিশিষ্ট প্রাচীর অথবা মারলসন। চারটি ক্রমে ক্রমে সরু হওয়া একটি করে চারকোণা মিনার স্থাপিত। মিনারগুলি এক প্যানেল বা স্কোপ দ্বারা সজ্জিত। সংযোজিত দু অংশ দু-চালা ভবনটি যে স্থপতির আনন্দের বহিঃপ্রকাশ যাহা বাংলার চিরপরিচিত দেশীয় কুঁড়ে ঘরের নমুনা থেকে গৃহীত।

কররের উপর কোন উৎকীর্ণ লিপি নেই। কিন্তু বর্ধমান গেজেটিয়ারে ১১২৭ - এ - এইচ (১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে) সৌধটির তারিখ উল্লেখ আছে। এটি সঠিক নহে যেহেতু কোন উৎকীর্ণ লিপি নেই। আব্দুল ওয়ালী একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, একটি পার্সী অসমাপ্ত অর্ধশ্লোক অথবা অসমাপ্ত পদ - পঙক্তি এ ভাবে লেখা আছে **আহ্-আনওয়ার শাহী-ই-আকবর-শড'** "হায় হায় আনওয়ার হলেন প্রধান শহিদ) নির্ণয় করে ১১০১ এ এইচ ইহার তারিখ ১৬৯৮ এ ডি, অতএব এ সমাধি নির্মিত হয় ১৭০০ শতাব্দির শেষ দিকে এবং অষ্টাদশ শতাব্দিতে নহে।[৬]"

খুব সম্ভব আনওয়ার-ই-শহিদের কবরটি যাহা বর্ধমানে অবস্থিত বাংলার সবচেয়ে সুন্দর ও বিষ্ময়কর ইমারত। পরিকল্পনা এবং উচ্চতার দিকে এটি একটি বিষ্ময়কর ইমারত। এই কবর কমপ্লেক্সটি একটি ব্যতিক্রম ধর্মী ইমারত। ইহা অন্যান্য ইমারতগুলি হতে স্বতন্ত্র বা পৃথক বলে মনে হয়। আমরা ফোকরযুক্ত একাধিক কোণ বিশিষ্ট "প্যারাপেটে" চারটি অর্ধেবকের কাছাকাছি আটাকায় খাড়া অথচ সরু কোন টাওয়ারে পাই যাহা মোল্ডিং এর সাহায্যে ভাগ করা হয়েছে। ইহা 'কিউপলা' দ্বারা সজ্জিত। ইহার ছাদকে ছাড়িয়ে গেছে উচ্চতার দিকে। মাজার গৃহের গম্বুজটি সম্পূর্ণ মোঘল আকৃতির নমুনা বহন করে যাহা একটি অষ্টাকৃতি ড্রামের উপর স্থাপিত। গম্বুজটির ভিতরের অংশ ব্যাটলমেন্ট প্যারাপেট' অথবা মারলসন দ্বারা সজ্জিত। এই কবর চেম্বারটি যদি স্থাপত্যের নমুনা হিসাবে নেওয়া হয় তবে এটি একটি অসাধারণ নমুনা বলে বিবেচিত হবে। ইহার পশ্চিম বাহুতে একটি মসজিদ আজও আছে যাহাতে নামাজিরা নামাজ আদায় করে থাকেন এবং পূর্ব বাহুতে একটি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর মাদ্রাসা বহন করে। সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে এই মাজারের দুদিকে দুটি যে দুচালা ভবন বহন করে তাহা বাংলার চিরন্তন বাঁশে নির্মিত দুচালাকে মনে করিয়ে দেয়। গম্বুজগৃহটি সবচেয়ে চমৎকার দেখায় এর সুন্দর অলংকরণের দুচালা ভবন দ্বারা আলাদা করা হয়েছে, খাড়া ও মালটিফয়েল খিলান দ্বারা বিভক্ত করার মাধ্যমে ইহা ঢাকার খাজা শাহ বা জের কবরগৃহকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

সুন্দর কবরটি চতুস্কোণ ভবনটির একটি মাত্র গম্বুজ দ্বারা আবৃত যাহার পূর্ব ও পশ্চিমদিকটা একটি করে দুচালা খাড়া কক্ষ অর্ধোমুখে সজ্জিত। ইহা কেবল্ গৌড়ের ফাতেহ্ খানের মাজারের নমুনায় দেখতে পাওয়া যায়। আবার এই সমাধির অলংকরণ পিলখানা মসজিদ যাহা মুর্শিদাবাদে অবস্থিত ও যথেষ্ট মিল আছে যাহা পূর্বেই আনওয়ার-ই-শহিদের বাজারে ব্যবহার হয়। আনওয়ার-ই-শহিদের মাজারটি একটি মাত্র উদাহরণ যাহাতে দু-চালা বিশিষ্ট সংলগ্ন অট্টালিকা দেখা যায় এবং কারতালেব খানের মসজিদ যাহা ঢাকায় অবস্থিত এবং আড়িখানের দ্বৈত কবরে যাহা সরাইল কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত সেখানেও এ ধরণের উদাহরণ পাওয়া যায়। পাঁচপীরের মাজারে চিরাগদানী নমুনায়, ঢাকার সোঁনারগায়ে দামুদায় অবস্থিত শরীয়তপুর এবং শাহজাদপুরে শিবগঞ্জ, রাজশাহী, দুচালা ভবনটির নমুনা এমনকি মন্দিরকে প্রভাবান্বিত করেছে যাহা আমরা পানামের সোনার গাঁয়ে ঢাকায় একটি মনিভরের দুতলা ছাদে পাই।

এমনকি আধুনিক কালে নাইম (Niem) প্রতিষ্ঠান যাহা ঢাকায়, ঢাকা কলেজের অতি সন্নিকটে অবস্থিত এর বাগানের মধ্যে একটি মসজিদ আছে যাহা বাংলার চিরন্তন কুঁড়েঘর ধাঁচে নির্মিত হয়েছে।

এই আনওয়ার-ই-শহিদের কবর কমপ্লেক্স এর ন্যায় আমরা দুই বাংলায় কয়েকটি কবর কমপ্লেক্সের উদাহরণ পাই। ত্রিবেণী, হুগলী, পশ্চিমবাংলায় জাফর খানের মাজারেতে কমপ্লেক্স হিসাবে একই জায়গায় তিনটি স্থাপত্যের সমাবেশ পাই যেমন মাজার মসজিদ ও মাদ্রাসা যেটি বহুপূর্বে তেরশ শতাব্দিতে স্থাপিত হয়েছিল। বিবি মরিয়মের সমাধি কমপ্লেক্সএ যেটি ঢাকার নারায়ণগঞ্জে স্থাপিত একটি দরজা, মসজিদ ও অতিথিশালা পাই। অপর দিকে ঢাকার হাইকোর্টের অতি নিকটে যেখানে খাজা সাহ স্থাপিত একটি সুন্দর দরজা, একটি তিনগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ এবং মাজার সম্মুখে দুচালা সংযুক্ত একটি মাজার তার বৈশিষ্ট নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। এ. এইচ দানী, *মুসলিম আরকিটেকচার, অফ বেঙ্গল* ঢাকা, ১৯৬১।

২। আবদুল ওয়ালী, "এনটিকুইটিস অফ বারদওয়ান", *জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল*, ১৯১৭, পৃষ্ঠা ১৭৭-৮৯।

৩। সি বি আশার, *ইনভেনটরি দি ইসলামিক হেরিটেজ অফ বেঙ্গল*, ইউনেসকো, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা - ৪৮।

৪। আবদুল ওয়ালী, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠ - ৪৮।

৫। *লিষ্ট এনসিয়েন্ট মনুমেন্টস* ইন বেঙ্গল, ক্যালকাটা, ১৯৯৬, পৃঃ - ৪৫৬-৬০।

৬। *বারদওয়ান গেজিটিয়ার; মৌলভী ওয়ালী - দি এনটিকুইটিস অব বেঙ্গল*, পৃঃ ৯৮৮ (এমএবি)

৭। সি বি আশার - *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৮।



মাজার কমপ্লেক্স আনওয়ার-ই-শহীদ, বর্ধমান
সতেরশ শতাব্দীর শেষ দিকে নির্মিত



আনওয়্যার-ই-শহীদের মাজারের ভিতরের দৃশ্য, বর্ধমান
সতেরশ শতাব্দীর শেষ দিকে নির্মিত

অগ্রণী বণিক ঃ শেঠ বসাক

(পনেরো থেকে আঠেরো শতক)

উত্তরা চক্রবর্তী

"পিরালি কায়েত তাঁতি আর সোনার বেনে
করলে আবাদ তারা দেশ বয়ে ধন এনে[১]।"[১]

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এই ধরণের বহু ছড়া প্রচলিত ছিল। কলকাতার আদি পর্বে যে সব জাতের মানুষদের ভূমিকা ছিল এই ছড়াটিতে তাদেরই উল্লেখ পাওয়া যায়।

পিরালি ঠাকুর, ঘোষাল, হালদার, ইত্যাদি অন্যান্য ব্রাহ্মণ পরিবার, ঘোষ, দত্ত, মিত্র ইত্যাদি কায়স্থরা, সুবর্ণবণিক এবং তাঁতি ও তন্তুব্যবসায়ী তাঁরাই ছিল কলকাতার আদি বাসিন্দা। বিশেষ করে সুতানটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা এই তিন গ্রাম থেকে কলকাতার গোড়াপত্তন যাঁরা করেছিলেন, সেই শেঠ বসাক তন্তুবাণিকদের উপার্জিত ধনে 'কলকাতা শহরের আবাদ হ'ল, একথা বললে ভুল বলা হয় না। অনেক সময়ই ইতিহাসের প্রকৃত সত্য খুঁটিনাটি তথ্যের প্রাবল্যে চাপা পড়ে যায়। আবার অনেক সময় ইতিহাসের প্রবহমান ধারার দিক নির্দেশ কোন দিকে, এই জিজ্ঞাসা তুচ্ছ করে তথ্যর খুঁটিনাটিকেও ছাপিয়ে বির্তক প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু মুখের কথার পরম্পরায় ইতিহাসের সত্যটি কিন্তু ধরা হয়ে থাকে। উনিশ শতকের প্রচলিত এই ছড়াটির মধ্যে আমরা সেই সত্যেরই সন্ধান পাই। যাদের আবাদে শহর তৈরি হল। পোশাকি ঐতিহাসিক তাদের কথা ভুলে গেলেন। সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে কিন্তু তাঁরা রয়ে গেলেন।

ঔপনিবেশিক কালপর্বের ইংরেজ ঐতিহাসিকরা কিন্তু শেঠ বসাকদের শহর প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব দিতে, বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। এমনকি কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি সম্ভবত বাংলা ভাষায় প্রথম কলকাতার ইতিহাস লিখেছিলেন, বা হরিসাধন মুখোপাধ্যায় দু'জনেই শেঠ বসাকদের শহর কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা মনে করেছেন।[২]

প্রাচীন কলকাতার ইতিহাসের পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে শেঠ বসাকদের ইতিহাসও জানা প্রয়োজন। তন্তু বণিকদের ইতিহাস সুপ্রাচীন। অতিপ্রাচীন কাল থেকেই দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্যের প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল সুতীর কাপড়। সুতো তৈরির কারিগর, কাপড় বোনার তাঁতী এবং তৈরি কাপড় রপ্তানির তন্তুবণিকরা, বাংলার অর্থনৈতিক

জগতে সুপরিচিত এবং অপরিহার্য ছিল। হাতে চালানো তাঁতে কাপড় বোনার দক্ষ কারিগররা উদ্যমী তন্তুবণিকরা এই অঞ্চলে ব্যাপক ও সমৃদ্ধ শিল্প বাণিজ্য গড়ে তুলেছিল। একই জাতির অন্তর্গত হলেও তাঁতী এবং তন্তুবণিকদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। তাঁতীরা দক্ষ কারিগর, তন্তুবণিকরা তাঁতীদের তৈরি বস্ত্র পণ্যের ব্যবসা করত। ব্যবসা গত কারণে এরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ছিল। বলাবাহুল্য তন্তুবণিকরা তুলনামূলক ভাবে ধনী ছিল। কলকাতার আদি বাসিন্দা শেঠ বসাকরা ভ্রাম্যমান তন্তুবণিক ছিলেন। সুতো এবং সুতীর কাপড়ের ব্যবসার খাতিরে তাঁরা এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চল ঘুরে বেড়াতেন। গৌড় থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে রাজমহল, মালদহ সপ্তগ্রাম বিস্তারিত অঞ্চল জুড়ে এবং এগারো থেকে ষোল/সতেরো শতক এই ব্যাপক সময়কাল ধরে শেঠ বসাকদের বাণিজ্যের বিচরণ তৈরি হয়েছিল।[৩]

শেঠ ও বসাক তন্তুবণিকরা বৈশ্য গোষ্ঠীভুক্ত বণিক জাতি। বৈশ্যসমাজ ভুক্ত কারিগর এবং বণিকরা আহারীয় এবং ব্যবহারীয় পণ্য উৎপন্ন করতেন। ব্যবহারীয় পণ্যের পাঁচভাগ রত্ন, বস্ত্র, শঙ্খ, কংস ও সৌগন্ধ। বস্ত্রবণিকরা বস্ত্র বয়ণ এবং তার বাণিজ্য করতেন। সম্ভবত পরে তন্তুবায় কারিগর এবং তন্তুবণিক ব্যবসায়ীদের পার্থক্য তৈরি হয়। জনৈক তন্তুবণিক নারায়ণ বসাকের পুঁথি থেকে তন্তুবণিকদের উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া যায়। দেবতন্তুবায় শিবদাস কুশাবর্তী বা কার্পাস তুলাকে বিশ্বকর্মার তৈরি তাঁত যন্ত্রের মাধ্যমে তন্তুতে বা সুতোতে রূপান্তরিত করেন। শিবদাসের চারপুত্র বলরাম, উদ্ধব, মধুসূদন, জনার্দন, বাংলার বিভিন্ন অংশে যথাক্রমে বঙ্গ, রায়, রায়েব মধ্য অঞ্চল এবং দক্ষিণে রাঢ়ে তাঁত ব্যবসা ছড়িয়ে দেন।[৪]

শেঠ ও বসাক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পাওয়া যায় বারো শতকে লেখা উশনঃ সংহিতা নাম একটি গ্রন্থে। বসুক মূল শব্দ থেকে, বসুক, বসাক, বসকা এবং বসাকা ইত্যাদি নানা শব্দ পাওয়া যায়। ধন অর্থে বসু শব্দ, স্বার্থে 'ক' প্রত্যয়, বসুক এই শব্দটির অর্থ ধন বা সম্পদ। বসাক বা বসুক হলেন এমন মানুষ যিনি ধনের সঙ্গে যুক্ত। করপ্রদান, বাজারে দোকান বসানো, কেনা বেচা ইত্যাদি নানা ধরণের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বসাক বা বসুক বলা হত।[৫] বসাক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অভিমত হল 'বুশাখ' এই ফার্সি শব্দটি থেকেই এর উৎপত্তি। 'বুসাখ' কথার অর্থ হ'ল সৌরভ।

শেঠ শব্দটির ব্যুৎপত্তি অপেক্ষাকৃত সরল. শ্রেষ্ঠী এই তৎসম শব্দ থেকেই শেঠী বা শেঠ শব্দের উদ্ভব।[৬]

এগারো শতকের শুরুতে বাংলার বৈশ্য সমাজের বেশ কিছু মানুষ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। যথেষ্ট ধনী এবং অর্থনীতির জগতে অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও

মধ্যযুগীয় সামাজিক বিন্যাসে তাঁদের স্থান নিচে রাখা হয়েছিল, সম্ভবত এই কারণে তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মের বর্ণহীন সমাজের অন্তর্গত হতে চেয়েছিলেন। চোদ্দ শতকে তাঁরা আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসেন। যে সমস্ত কারিগর এবং ব্যবসায়ী জাতি এভাবে বৌদ্ধধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মে ফিরে এসেছিলেন তাদের নবশাখা বা নবশাখ বলা হত। দক্ষ কারিগর তাঁতী এবং সম্পন্ন ব্যবসায়ী তন্তুবণিক দুইই নবশাখ সম্প্রদায়ভুক্ত হলেন।[৭] শেঠ বসাকরাও নবশাখ জাতিভুক্ত হয়েছিলেন। পনেরো শতকের শেষাশেষি দক্ষিণবাংলার সমাজজীবনে আলোড়ন তুললেন চৈতন্যদেব। চৈতন্যর বৈষ্ণব ধর্ম কারিগর এবং ব্যবসায়ী দুই শ্রেণীকেই আকৃষ্ট করেছিল। বৈষ্ণব ধর্মের হাওয়া থেকে শেঠ বসাকরাও দূরে থাকেননি। চৈতন্যর শিষ্য নিত্যানন্দের আমলেই এরা বৈষ্ণব হয়েছিলেন।[৮]

শেঠ ও বসাকদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। সম্ভবত এই কারণে এরা একত্রিত হয়ে গোবিন্দপুর গ্রামে বসতি করেছিলেন। শেঠদের গোত্র ছিল দুটি মৌদগল্য এবং কাশ্যপ। বসাকদের পনেরোটি। (১) অগ্নিঋষি, (২) অলদ ঋষি, (৩) অলম্ব ঋষি, (৪) বস্মাঋষি, (৫) আলম্যান, (৬) কাশ্যপ, (৭) মহর্ষি, (৮) মৌদগল্য, (৯) নাগঋষি, (১০) মঙ্গলঋষি, (১১) শৃঙ্গঋষি, (১২) পান্ডুঋষি, (১৩) মধুকুল্য (১৪) অলত্রঋষি এবং (১৫) দূর্বাঋষি।[৯]

পনেরো শতক, বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় বাংলার শিল্প বাণিজ্য এশিয় সামুদ্রিক বাণিজ্যর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। বাংলার বিখ্যাত মসলিন থেকে শুরু করে মাঝারি এবং সাধারণ মানের কাপড়ের চাহিদা ছিল ইন্দোনেশিয়া, মালয়, থাইল্যান্ড বর্মা এং পশ্চিমে লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর নিয়ে গোটা এশিয় বাণিজ্যের জগতে। পশ্চিমের বাণিজ্য ছিল প্রধানত আরব এবং গুজরাটি বণিকদের হাতে। বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্যের প্রধান কর্ণধার ছিল করমন্ডল উপকূলের চেত্তি ও চুলিয়া এবং ওড়িয়া ও বাঙালি বণিকরা। বাঙালি বণিকরা যে করমন্ডল উপকূল ধরে আসা যাওয়া করতেন এমন, তথ্য পাওয়া গেছে। টোম পিরেস এবং দুয়ার্তে বারবোসা বাংলার দেশীয় বণিকদের অগাধ সম্পদের মালিক বলে বর্ণনা করেছেন। ষোল শতকের সূচনায় বাংলার বাণিজ্যিক ছবিটি মোটামুটি একই ছিল। শেট বসাক বণিকরা সরাসরি সমুদ্র বাণিজ্য করতেন কিনা জানা যায়নি, কিন্তু বৃহত্তর সমুদ্র বাণিজ্যের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত ছিলেন, একথা ভাবা ভুল নয়। ষোল শতকে উপকূল ধরে বেশ কিছু বন্দর শহর গড়ে উঠেছিল। পাশাপাশি বাজার শহরও গড়ে উঠতে থাকে। বাজার শহর এবং উপকূল শহর এই দুইএর যোগাযোগেই আধুনিক কালের শহরগুলির গোড়াপত্তন হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং কলকাতা তাই শহরগুলির গড়ে ওঠার পিছনে এধরণের একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া কাজ করেছিল। নতুন শহরগুলি সামুদ্রিক বাণিজ্যের গুরুত্ব থেকেই গড়ে ওঠে।[১০]

শেঠ ও বসাক তন্তুবণিকরাও এরকমই একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। একটি বড়বাজার এবং দুটি ও একটি বসতগ্রামের কেন্দ্রীয়অংশকে বৈদেশিক সমুদ্র বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে একটি আধুনিক শহরের সূচনার ইতিহাস তাঁরা তৈরি করেছিলেন।

পনেরো শতকের মাঝামাছি, মৌদগল্য গোত্রীয় মুকুন্দরাম শেঠ, অগ্নিবংশ গোত্রের কালিদাস বসাক, অলত্রিঋষি গোত্রীয় শিবদাস, অম্বাঋষি গোত্রে বারপতি ও ব্রহ্মাঋষি গোত্র সম্ভূত বাসুদেব, একজন শেঠ ও চার বসাক তন্তুবণিক সপ্তগ্রাম থেকে দক্ষিণে এগিয়ে এসে ভাগীরথী নদীর পূর্ব পারে বসতি করলেন।[১১] ঐ অঞ্চলে তখন কিছু জেলে, শিকারী বা সামান্য চাষী ছাড়া তেমন কোন বসবাস ছিল না। এই পাঁচ তন্তুবণিক অঞ্চলের জঙ্গল কেটে, তাঁদের পরিবারবর্গ নিয়ে একটি গ্রামের পত্তন করলেন। আরাধ্য গৃহ দেবতা গোবিন্দজীর নামে গ্রামের নাম হল গোবিন্দপুর। জঙ্গল কেটে বসতি করার জন্য, এই আদি পাঁচ তন্তুবণিক পরিবার জঙ্গল কাটা বাসিন্দা বলে প্রসিদ্ধ হল। ষোল শতকের গোড়ার দিকেই গোবিন্দপুরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি শুরু হয়েছে। সুতোর লুটি বিক্রির জন্য একটি হাট ও তৈরি হয়েছে। সুতানুটি হাটে ব্যবসা করানোর জন্য শেঠ বসাকরা হুগলী, সপ্তগ্রাম এবং আশেপাশের অঞ্চল থেকে তাঁতীদের উদ্যোগ করে বসতি করাতে শুরু করলেন। এ ভাবে হাট ঘিরে সুতানুটি গ্রামও তৈরি হয়ে গেল। সুতানুটি হাটের পশ্চিম দিকে কলিকাতা গ্রাম, চীৎপুর এবং বড়বাজার নামে একটি বাজার তৈরি হয়েছিল, এর আগেই। গোবিন্দপুরের শ্রীবৃদ্ধি নানা দিক থেকে অন্য মানুষদের আকৃষ্ট করেছিল। পিরালি ঠাকুর, হালদার, ঘোষাল ইত্যাদি ব্রাহ্মণ এবং মিত্র, দত্ত ইত্যাদি কায়স্থ পরিবারগুলি গোবিন্দপুরে বসতি শুরু করে।[১২]

ষোল শতকের তিরিশের দশকে পর্তুগিজ বণিকরা বাংলা বাণিজ্য জগতে উপস্থিত হল। তখনও সপ্তগ্রাম মূল বাণিজ্য কেন্দ্র। সরস্বতী নদী এবং আদিগঙ্গার প্রবাহের পথে বেতোড় নামে পশ্চিমপারের একটি জায়গায় পর্তুগিজদের জাহাজ নোঙ্গর করত। সেখান থেকে বড় নৌকায় পর্তুগিজরা তাদের পণ্যসামগ্রী আনা নেওয়া করত। মাল ওঠানামার জন্য বেতোড়েও একটি অস্থায়ী হাট বা বাজার গড়ে ওঠে। শেঠ বসাকদের লক্ষ্য ছিল এই হাটের ব্যবসাকে দখলে আনার। পর্তুগিজ বাণিজ্যকে তাদের দিকে টেনে আনাও উদ্দেশ্য ছিল।

একটি জটিল প্রশ্ন অবধারিত এই প্রসঙ্গে থেকে যায়। পনেরো শতক এবং ষোল শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সপ্তগ্রাম যদি রমরমা বাণিজ্য কেন্দ্র, শেঠ বসাকরা কেন বাণিজ্যর এই মূল অঞ্চল ছেড়ে একটি অপরিচিত নতুন এলাকায় ব্যবসার বসতি তৈরি করলেন? সি. আর উইলসন মনে করেছেন পর্তুগিজদের মাঝপথে ধরার জন্যই শেঠ বসাকরা গোবিন্দপুর গ্রামের পতন. সুতানুটি হাট গ্রাম এবং কলিকাতা গ্রাম বাজার

তৈরি করেছিলেন। অর্থাৎ বিদেশী বাণিজ্যকে আগে ভাগে দখল করে একচেটিয়া ব্যবসা তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরা।

এই দূরদৃষ্টির জন্যই উইলসন তাদেঁর অগ্রণী এবং উদ্যোগী বণিক বলেছেন। একটি নতুন বাণিজ্য এবং একটি নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের কৃতিত্ব তাঁদেরই। ১৮৯১ সালের ক্যালকাটা রিভিউর এপ্রিল সংখ্যায় গৌরদাস বসাকের একটি প্রবন্ধে অন্য তথ্য পাওয়া যায়। গৌরদাসের হিসেবমত ঐ সময় থেকে ৪২৫ বছর আগে অর্থাৎ ১৪৬৬ খ্রিস্টাব্দে শেঠ বসাকরা গোবিন্দপুর গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার বছর তিরিশ পরে ১৪৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের পিপলাই এর 'মনসা বিজয়' কাব্যে কলিকাতা'র নাম উল্লেখ অস্বাভাবিক কিছু নয়।[১৩]

সপ্তগ্রাম থেকে শেঠ বসাকরা দক্ষিণের দিকে এগিয়ে এলেন তার কারণ কি সরস্বতী নদীর জলে ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়া? শেঠ বসাকরা কি উদ্বেগ বোধ করছিলেন? গৌরদাস বসাক শেঠ বসাকদের আগমণ কালের যে সময় হিসেব দিলেন তখনও সরস্বতী শুকিয়ে যাওয়ার বাহ্যিক চিহ্ন কোন দেখা যাচ্ছিলনা। অতএব তাঁর মতে অভিযান প্রিয় এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শেঠ বসাকরা অন্য প্রতিযোগী বণিকদের অতিক্রম করে এখানে বসতি তৈরি করেছিলেন। পর্তুগিজ বণিকরা কি তাহলে এদেরই আকর্ষণে এখানে এসেছিল?

মুকুন্দরাম শেঠ, কালিদাস বসাক, শিবদাস বসাক, বারপতি বসাক এবং বাসুদেব বসাককে আমরা কি তাহলে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলতে পারি? ষোল শতকের প্রথম দিকে কলত্রীশ গোত্রীয় যাবদচন্দ্র বসাকও গোবিন্দপুরে বসতি করেছিলেন। গোবিন্দপুরের খানিকটা উত্তরে বরাহনগরে বেশ কয়েকঘর তাঁতীদের বসবাস ছিল। শেঠ বসাকরা এই তাঁতীদের সঙ্গে দাদনি বা অগ্রিম লেনদেনের ব্যবসা শুরু করলেন। সুতানুটি হাটের বসত করানো তাঁতীদের সঙ্গেও দাদনি ব্যবসা চালু হল।

সতেরো শতকের শেষের দিকে পর্তুগিজ বণিকদের বাংলা বাণিজ্য জগৎ থেকে প্রস্থানের পর শেঠ বসাক তন্তুবণিকরা ইংরেজদের এই অঞ্চলে আকৃষ্ট করল। ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'ঈগল' জাহাজের ক্যাপটেন স্ট্রেনগাম মাষ্টারের বিবরণে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে মোগলদের থানা দুর্গ এবং পূর্বপারের মেটিয়াবুরুজ দুর্গর উল্লেখ পাওয়া যায়। গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা গ্রামের কথাও তিনি বলেছেন। এর আগেই অবশ্য ১৬৫৬ সালে ভ্যালেন্টাইনের প্রস্তুত একটি ডাচ্ নকশায় 'গর্ভনারপুর' এবং 'চিত্তালুটির' উল্লেখ রয়েছে।[১৪] সম্ভবত এ দুটি গোবিন্দপুর এবং সুতানুটির অপভ্রংশ। এর ঠিক দুবছর পর ১৬৭৯ সালে 'ষ্যালকন' জাহাজের ক্যাপটেন স্ট্রাফোর্ড কোর্ট সেন্ট জর্জ থেকে রওনা হয়ে সুতানুটি ঘাটে পৌঁছান। 'গোবিন্দপুর গ্রামের শেঠ বসাকদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেন। স্ট্রাফোর্ডের বিবরণ অনুযায়ী অঞ্চলের সমস্ত বাণিজ্যের একচেটিয়া কারবারি ছিলেন শেঠ বসাকরা।[১৫] ১৬৮৬-১৬৯০ এই সময়ের মধ্যে ইংরেজরা পাকাপাকি

ভাবে কোন বাণিজ্যিক বন্দোবস্ত করে উঠতে পারছিলনা। অতএব শেঠ বসাকদের প্রস্তাবে সাড়া দিতে তাদের দিক থেকেও আগ্রহের কমতি ছিল না। ইংরেজদের কুঠি বাড়ির জায়গা জমির ব্যবস্থা শেঠ বসাকরা করে দিয়েছিলেন। তাঁদেরই দৌলতে স্থানীয় তাঁতীদের সঙ্গে ইংরেজদের যোগাযোগ ও দাদনি ব্যবসার সূত্রপাত হয়।[১৬]

আঠেরো শতকের গোড়াতে শেঠ বসাকরাই এই অঞ্চলের বাণিজ্যের নিয়ামক। জায়গা জমি দিয়ে ঋণের ব্যবস্থা করে নানাভাবে ইংরেজদের তাঁরা সাহায্য করছিলেন। প্রথম দিকে সুতানুটিতে আস্তানা নিলেও, ইংরেজরা পরে শেঠ বসাকদের কাছাকাছি থাকার জন্য কলিকাতা বড়বাজার এবং গোবিন্দপুরে চলে আসে। কোম্পানির পুরোনো রেকর্ড থেকে জানা যায় যে অঞ্চলটি সম্পূর্ণ ভাবে শেঠ বসাকদের দখলে ছিল।[১৭] এই অঞ্চলের পথঘাট তাদের নামেই পরিচিত হয়। আঠেরো শতকের বিখ্যাত তন্তুব্যবসায়ী গোড়ারাম বসাকের নামে তৈরি হয়েছিল শোভাবাজার। শ্যামচাঁদ বসাকের নামে শ্যামপুকর, শ্যামবাজার। লালমোহন শেঠের নামে লালবাজার। লালমোহন শেঠ সম্ভবত লালদিঘীর খননও করেছিলেন। চাঁদপাল তাঁতীর নামে চাঁদপাল ঘাট তৈরি হয়েছিল। ময়দানের কাছে বির্জিতালাও তৈরি হয়েছিল ব্রজরাম শেঠের নামে। পাথুরিয়াঘাটও শেঠদের তৈরি। সাগর রাম বসাক রাধাবাজার স্থাপন করেন। তাঁর কারখানা ছিল ময়দানে। উনিশশতকে জেমস লঙ কলকাতায় এসে চাঁদপাল ঘাটের কাছ বহু তন্তু বণিকদের বসতি দেখেছিলেন। সুতানুটিও বহুদিন পর্যন্ত তাঁতীদের গ্রাম বলে পরিচিত ছিল।[১৮]

১৬৯০-১৭০৭ সালের মধ্যে কোম্পানির সুতানুটি অফিসের অধিকাংশ চিঠিতেই কোন না কোন সূত্রে শেঠ বসাকদের উল্লেখ থাকত। চিঠিপত্র গুলি থেকে শেঠদের বাগান, জমি, বাড়ি ঘর বাজার ইত্যাদি নানা সম্পত্তির একটা সুষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। অধিকাংশ চিঠিতেই এদেঁর কলকাতা সুতানুটির মালিক বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। এমন কোন একটি চিঠিতে বলা হচ্ছে 'শেঠদের মত তৎপর এবং সফল ব্যবসায়ী এই অঞ্চলে আর কেউ নেই। তাঁতীদের সঙ্গে দাদনি ব্যবসায়ে শেঠদের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হবে, কারণ তাতীঁদের ওপর একচেটিয়া প্রতিপত্তি এঁদেরই।[১৯]

রাস্তাঘাট নির্মাণ পথের দুপাশে গাছ লাগানো ইত্যাদি ব্যাপারে জনার্দন শেঠ, গোপাল শেঠ, বদু শেঠ, বারাণসী শেঠ এবং জয়কৃষ্ণ শেঠের উদ্যোগের কথা পাওয়া যায় কোম্পানির পুরোনো রেকর্ডগুলিতে।[২০] গোবিন্দপুরের শেঠ পরিবারের প্রথম পুরুষ মুকুন্দরামের অধস্তন বংশধর হলেন কেনারাম। কেনারামের তিনপুত্র, জনার্দন, বারাণসী এবং নন্দরাম। ১৭০৭ থেকে ১৭১২ পর্যন্ত জনার্দন কোম্পানির মধ্যস্থ বণিক ছিলেন। ১৭০৯ সালের কোম্পানির একটি চিঠি থেকে জানা যায় সেই সময়ের বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজকোষের ভারপ্রাপ্ত মীর মহম্মদ রেজার সঙ্গে জনার্দন ইংরেজদের যোগাযোগ

করিয়ে দিয়েছিলেন। মীর মহম্মদের সঙ্গে জনার্দনের যথেষ্ট খাতির ছিল বোঝা যায়।[২১] হুগলীর তৎকালীন শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জনার্দনের পরিচিতি ছিল। সেই কারণে ইংরেজরা তাঁকে সমীহ করত এবং অনেক ব্যাপারে তাঁর উপর নির্ভর করত। জনার্দনের পুত্র বৈষ্ণবচরণ গোবিন্দপুর কলকাতার সমাজে একজন গণ্যমান্য ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। বৈষ্ণবচরণের বদান্যতা, বিচক্ষণতা ও উদারতা এমন কি তাঁর স্ত্রী টুনুমনির দানধ্যানের কথাও[২২] কোম্পানির রেকর্ড থেকেই জানা যায়।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি শেঠ বসাকদের বাণিজ্য প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ১৭৫৩ পর থেকে শেঠ বসাকদের মধ্যস্থতার বদলে কোম্পানি সরাসরি তাঁতীদের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করল।[২৩] তাছাড়া এই সময় থেকেই নতুন এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর উত্থান হচ্ছিল যারা ইংরেজ এজেন্ট হিসেবে ইংরেজ ব্যবসায়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে কাজ করছিল। তবু শেঠ বসাকদের সম্পদ বা প্রভাব প্রতিপত্তির কমতি কিছু ছিলনা। কোম্পানির আর্টিলারির লেফটেনান্ট ওয়েলসের আঁকা ১৭৫৩র একটি নকশায় চিহ্নিত নদীর ধার বরাবর শেঠ বসাকদের বিস্তৃত বাগানবাড়ি গুলিই তার প্রমাণ দেয়। নকশাটিতে রামকৃষ্ণ শেঠের বাড়ি দেখানো হয়েছে। রামকৃষ্ণ সেই সময়ের একজন প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। আমি এনগ্রেভার কিচিন এর তৈরি রামকৃষ্ণ শেঠের বাড়ির একটি এনগ্রেভিও আছে। ওয়েলসের নকশায় রাসবিহারী শেঠের পরিত্যক্ত ভগ্নপ্রাসাদ দেখানো হয়েছে।[২৪] রাসবিহারী শেঠ কে ছিলেন? ইতিহাসের কালানুক্রমের কোন পর্বে তাঁর ধন সম্পত্তির বিলীন হল তার কোন হদিশ অবশ্য পাওয়া যায়নি।

১৭৫৭র পরও তন্তুবণিক শেঠ বসাকদের লক্ষণীয় ভূমিকা ছিল। ১৭৫৭ তে এবং তার পরের সময়তেও নবকৃষ্ণদেবকে তারা শোভাবাজার এলাকায় জমি জায়গা দফায় দফায় বিক্রী করেছেন।[২৫] শোভা রায় বসাক ছিলেন আঠেরো শতকের অগ্রগণ্য ধনীদের একজন।

১৭৮০ সালে শোভা রাম বসাকের মৃত্যু হয়। তাঁর অগাধ সম্পদের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর উইলে। বসরী, পারস্য উপসাগর এলাকা পর্যন্ত তাঁর বাণিজ্য ছিল।[২৬]

১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ এই সময়কালের রাজনৈতিক পরিবর্তন শেঠ বসাকদের ততটা ক্ষতি করেনি যতটা করল গোবিন্দপুর গ্রাম ইংরেজদের দখলে চলে যাওয়া। ১৭৫৩ থেকেই ইংরেজদের নতুন একটি দুর্গ তৈরির পরিকল্পনা চলছিল। জনৈক ক্যাপটেন স্কটের প্ল্যানে ঠিক হয়েছিল গোবিন্দপুর গ্রামের শেঠ বসাকদের বাড়ি গুলি ভেঙ্গে দেওয়া হবে। ক্ষতিপূরণ ধার্য হল মাত্র ৬,০০০ টাকা।[২৭] শেঠ বসাকদের পুনর্বাসন হ'ল বড়বাজার চীৎপুর এলাকায়। পুরানো এই ব্যবসায়ী পরিবারগুলি বাধা দেবার কোন চেষ্টা করেনি। হয়ত ১৭৫৭র পর থেকে ঘটনার দ্রুত পরিবর্তনের ইঙ্গিত তাঁরা

বুঝেছিলেন। ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ কোন দিকে সেই বুঝে, নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও ছিল।

উনিশ শতকে শুরুতে এদেঁর অনেকেই স্বাধীন বস্ত্র ব্যবসা ছেড়ে মহাজনী কারবার শুরু করেছিলেন। পরিবার গুলির তরুণ প্রজম্মে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অন্য জীবিকার সন্ধানী হচ্ছিলেন। সময়ের পরিবর্তন কি ভাবে শেঠ বসাকদের ছুঁয়ে যেতে শুরু করেছে। তা চিহ্নিত হল একটি বিশেষ ঘটনায়। ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি হিন্দু কলেজের প্রথম ক্লাস শুরু[২৮] হয়েছিল চীৎপুরের গোরাচাঁদ বসাকের বসত বাড়িতে।

পনেরো, ষোল শতক থেকে আঠেরো এবং উনিশ শতক এই দীর্ঘ সময়কালের নানা পরিবর্তনের সঠিক মুহূর্তগুলি বুঝে, শেঠ বসাকদের প্রজন্ম ধরে মানিয়ে নেওয়া এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত।

খোলা বাজার, আড়ৎ, কারখানা, পাকা বাড়ি, বাগান, জলাশয়, নদীর ধারের প্রাসাদোপম বাড়িঘর নিয়ে একটি শহরের আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় লক্ষণগুলি এবং দৃশ্যাবলী শেঠ বসাকরা তৈরি করেছিলেন।

অগ্রণী আন্ত্রেঁপ্রিনিয়র ব্যবসায়ী শেঠ বসাকদের সম্বন্ধে সমকালীন দেশীয় বিবরণ পাওয়া যায় না। অথচ সতেরো এবং আঠেরো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোম্পানির পুরোনো রেকর্ডগুলি শেঠ বসাকদের অগ্রণী ভূমিকার উল্লেখে ভরপুর

আশ্চর্য এই যে, শেঠ বসাকদের প্রতিপত্তি যখন পড়তির দিকে, তখনই তাঁদের বৈভবের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কোম্পানির রেকর্ড, পুরোনো নক্শায়, আঁকা ছবিতে অথবা অনামা ছড়াকারের স্মৃতিতে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতার অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পৃ: ১০।

২। Walter Hamillton, East India Gazetteer Vol I পৃ: ৩১৬, (খ) C. R. Wilson, Early Annals of the English in Bengal পৃ: ১২৭, ১২৮, ১৩৭ (গ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা কল্পলতা, রঙ্গলাল রচনাবলী পৃ: ৪-৫ (ঘ) হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা সেকালের ও একালের (১৯১৫) পৃ: ১৮৮।

৩। নগেন্দ্রনাথ শেঠ, কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস—নগেন্দ্রনাথের মতে আদিতে গুজরাট নিবাসী শেঠ বসাকরা সপ্তগ্রাম আসেন একাদশ শতকে, পৃ: ১ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, পৃ: ১৮৪।

৪। বৃন্দাবন চন্দ্রপাল, তন্তুবায় তত্ত্ব ঃ তন্তুবায় জাতির উৎপত্তি, তন্তুবায় সমাচার ১ম বর্ষ আশ্বিন, ১৩৩৮ ২য় সংখ্যা, সম্পাদক শ্রী সতীশ চন্দ্র ভড়।

৫। মদনমোহন হালদার, বসুক (১৮৯৫) পৃ. ৮-৯, ১০১ মদন মোহনের মতে বসুক বা বসাকরা আদিতে তুলোর ব্যবসা করতেন। নগেন্দ্রনাথ শেঠ, পৃ: ১।

৬। নগেন্দ্রনাথ শেঠ, তন্তুবায় জাতির ইতিহাস, তন্তুবায় সমাচার কার্তিক ১৩৩৮, ১ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

৭। যোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়, স্মৃতিতে সেকাল, ঐতিহাসিক পত্রিকার বিশেষ অংশের পুনর্মুদ্রণ, ২০০১ কলকাতা। "বৌদ্ধযুগে চতুর্বর্ণের মধ্যে বৈবাহিক কার্যের দ্বারা বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছিল।......ইহাদিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিবার সময় যাহাদের শরীরে শূদ্র শোণিত ছিলনা, তাহারা নবশাখ বা সৎশূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইল। অরুণ নাগ, সঠিক হুতোম প্যাঁচার নক্শা পৃ: ৫৭ "নয়টি সৎশূদ্র জলচল সম্প্রদায়ের সমাহার, বারুই, কামার, কুমোর, মালাকর, ময়রা, নাপিত, সদ্গোপ, তাঁতী ও তেলি।" নগেন্দ্রনাথ শেঠ (১৩৫৭) "চতুর্দশ শতাব্দীতে, বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করতঃ শেঠ বসাকরা হিন্দু দলভুক্ত হইয়া নবশাখ অর্থাৎ নবশাখা নামে পরিচিত হয়েন।"

৮। নগেন্দ্রনাথ শেঠ, তন্তুবায় জাতির ইতিহাস, তন্তুবায় সমাচার কার্তিক ১৩৩৮, ১ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা।

৯। তদেব।

১০। Omprakash, European Commercial Enterprise in Pre-Colonial India, Cambridge University Press (paperback edition 2000) pp 8, 12, 13, 18, 21, 22.

১১। Gourdas Basak, Kalighat and Calcutta, The Calcutta Review, Vol. 92, No. 184, April 1891, Aloke Roy ed. Calcutta keepsake p. 20. নগেন্দ্রনাথ শেঠ, কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস, পৃ: ১, নগেন্দ্রনাথ একটি সামান্য পরিবর্তিত তালিকা দিয়েছেন। কালিদাস বসাকের গোত্র অগ্নিঋষি, বারপতি বসাকের অলম্বঋষি এবং শিবদাস বসাকের পরিবর্তে করুণাময় বসাক ও গোত্রের নাম অলদঋষি, উল্লেখ করেছেন।

১২। মদন মোহন হালদার, বসুক, পৃ: ১২২-১২৩, Wilson, Early Annals of the English in Bengal Vol. p. 128.

১৩। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা কল্পলতা পৃ: ৪-৫, Gourdas Basak, Kalighat and Calcutta , P. 20, Wilson p. 137.

১৪। Wilson, Early Annals Vol p. 52-54, "Strcynsham Master left again in the Eagle for the Bay on 31 July 1676. "....Opposite to the right was the village of Govindapur where the Setts and Bysacks .....built homes for their families."

১৫। Wilson, vol I, p. 58-59.

১৬। তদেব পৃ: ১৩৭।

১৭। Pradip Sinha, Calcutta in Urban History Firma KLM (1978) p. 62.

১৮। মদন মোহন হালদার, বসুক পৃ: ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫ পৃ: ১৫৯, নগেন্দ্রনাথ শেঠ, তন্তুবায় জাতির ইতিহাস, তন্তুবায় সমাচার কার্তিক ১৩৩৮ ১ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

১৯। Pradip Sinha, Calcutta in Urban History p. 62 Calcutta Committee

of Revenue, Fort William June 22, 1778. The Setts are described as "farma Proprietor of Sutanuti".

২০। Wilson, Vol,I, p. 199 (b) Extract from Public Consultations, fort William, Sept II 1707 Range Vol. I. Wilson Old Fort William in Bengal Vol I, p. 67. Wilson, Old Fort William in Bengal Vol I, Report of Chuttanuttee and Govind Pore. P. 132-133 p. 162-163.

২১। Wilson, Early Annals. Vol I, p. 315-317.

২২। তদেব পৃ: ১৯৯।

২৩। Pradip Sinha, p. 63.

২৪। Plan of Fort William and part of the city of the Calcutta, Surveyed and drawn by William Wells, Lieutenant of the Artillery Company in Bengal in the year 1753. Wilson, Old Fort William in Bengal Vol - II, Phate VIII (খ) নগেন্দ্রনাথ পৃ· ৩০৫ রামকৃষ্ণ শেঠের পৃ: ২ কিচিন।

২৫। মদন মোহন হালদার, বসুক পৃ: ১৫৮ (খ) Report on the Census of the Town of Calcutta taken on 6th April 1876 by H. Beverley, p. 16. Foot Note. "This ground (13 cottahs 8 chittacks in Sootalooty) was purchased from Rash Vehari Sett and Brindaban Sett for Arcol Rs. 288.

২৬। Pradip Sinha pp 64, 65. Sobhasam died in 1780. He left 37 houses, 3 garden houses.....There were 891 pearls, in his personal possession. 413 diamonds, 35 rubies besides gold mohurs, gold threads etc. In his warehouse there were 1,745 balls of Cotton. Debts to his estate in bonds from Europeans amounted to Rs 5,27,112 and from Indias Rs. 53,083. For ventures to sure, bombay, Brussels etc Rs. 45,751 was due to his estate.

২৭। Wilson, Old Fort William in Bengal Vol II pp. 43, 46, Extract from General Letter from the Court to Bengal, Fort William Feb. 11. 1756 (b) Houses destroyed by colonel Scotls Plan.

২৮। Binoy Krishna Dev, Early History of Calcutta, p. 80.

চন্দননগরের ফরাসি বাণিজ্য (১৭১৯-১৭২৭)

অনিরুদ্ধ রায়

এই সময়কার ফরাসি বাণিজ্যর উপর বিশেষ লেখা নেই। ফরাসি ঐতিহাসিক কেপল্যান ১৭১৯ সালে তাঁর বই শেষ করেছেন।[১] শিবপদ সেন[২] ১৬৯৩ সালে শেষ করার পর আবার শুরু করেছিলেন ১৭৬৩ সাল থেকে। সাম্প্রতিক কালে ফরাসি পন্ডিত হদ্রেয়ার[৩] ১৭১৯ থেকে ১৭৯৩ পর্যন্ত লিখেছেন। কিন্তু তাঁর বিষয় ছিল প্রধানত পৃথিবীজুড়ে ফরাসি বাণিজ্যর ইতিহাস। আমার একটি রচনায় এই সময়ের ফরাসি বাণিজ্যর কথা লিখেছি।[৪] কিন্তু তার কাঠামো বা চরিত্র নিয়ে আলোচনা করিনি। যা এখানে করার চেষ্টা করব।

১৭১৯ সাল থেকে লেখার কারণ ঐ বছরে ফরাসি দেশে একটা নূতন কোম্পানি তৈরি হয় সমকালীন আরো কয়েকটা ফরাসি কোম্পানি একত্রিত করে রাজনুগ্রহে বিশাল অঙ্কের টাকা নিয়ে জাঁ ল পরিচালিত এই কোম্পানি কাজ শুরু করে। কিছুকাল শেয়ার বাজারে কেলেকারির পর জাঁ ল চলে গেলেও কোম্পানি চলতে থাকে।[৫] বিগত দুই দশক ধরে কোম্পানি খুব খারাপ অবস্থায় ছিল। ভারতে ফরাসিদের দেনা দাঁড়িয়েছিল নয় লাখ ফরাসি মুদ্রার উপর।[৬] ১৭০৮ সালের পর থেকে স্যাঁ মালে বাদরের কয়েকজন বণিক মিলে জাহাজ পাঠাচ্ছিল। কিন্তু তার কুটির লোকজনদের মাহিনা দেবার কোন ব্যবস্থা করেনি। ফলে ত্রিশবছরের বেশি ভারতের কোম্পানিতে কাজ করার পর চন্দননগরের পথে পথে ফরাসিদের ভিক্ষা করতে হচ্ছিল।[৭] এই পরিপ্রেক্ষিতে নূতন কোম্পানি পুরানো অধিকার নিয়ে ১৭১৯ সালে একটা নুতন কাঠামো ও দর্শন নিয়ে আসে। ১৭২৩ সালের মধ্যে অবশ্য ঐ কাঠামো পুরানো অবস্থায় ফিরে যায়। কিন্তু ততদিন কোম্পানির কাজকর্মের বিশাল পরিবর্তন হতে শুরু করেছে।

মুর্শিদকুলী খান মারা যান ১৭২৭ সালে। ইংরাজ বা ড্যানিশ কোম্পানির সঙ্গে তাঁর কিছু গোলমাল হলেও। ফরাসিদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল। ওঁর মৃত্যুর পর থেকে মুর্শিদাবাদ দরবারের সঙ্গে ফরাসিদের গোলমাল শুরু হয়ে যায়। ফরাসিরা ততদিনে বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছিল এবং তাদের বক্তব্য ক্রমশ আগ্রাসি চেহারা নেয়। আমরা ঐ পরিবর্তিত ভূমিকার আগের ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে দেখব।

(২)

১৭১৯ সালের পরই নূতন কোম্পানি পন্ডিচেরীতে প্রচুর টাকা পাঠায় প্রধানত ঋণ

পরিশোধ করে মাল কেনার জন্য। ১৭২০ সালে দুটি জাহাজ আসে চল্লিশ লক্ষ ফরাসি মুদ্রা (প্রায় বিশ লক্ষ টাকার সমান) নিয়ে।[৮] প্যারিস বাণিজ্যর কাঠামো প্রথম দিকে ঠিক করে দেয়।

ফরাসি দেশ থেকে টাকা (বিদেশী মুদ্রা, সোনারূপার তাল ইত্যাদি) প্রথমে আসবে পন্ডিচেরীতে যারা বাংলায় টাকা পাঠাবে। কতটা পাঠানো হবে বাংলায় সেটা নির্ভর করবে। পন্ডিচেরীর উপর। এর বদলে পন্ডিচেরী মাল পাঠাবে ইউরোপে যার জন্য তারা বাংলা থেকে মাল যথাসময়ে পন্ডিচেরীতে নিয়ে আসবে। এর ফলে প্যারিসের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল পন্ডিচেরীর হাতে থাকে। উল্লেখযোগ্য, যে সুরাটের ঋণ কিছুটা মেটানো হলেও। তখনো প্রচুর ঋণ বাকি ছিল। যার ফলে ফরাসিরা সুরাটে জাহাজ পাঠাতে চাইছিল না।

প্রথম দিকে প্যারিস প্রধানত, দুটি ধরণের পণ্য আমদানির উপর জোর দিয়েছিল। যে দুটি আসত বাংলা থেকে। এর ফলে অন্তত প্রথমদিকে বাংলা মাল পাঠানোর কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

প্যারিস প্রথম থেকেই এক লক্ষ মণ সোরা আমদানি করতে চাইত বছরে। ওদের বক্তব্য এটি হুগলীতে সহজেই পাওয়া যায়। যদিও তখন কোন যুদ্ধ ইউরোপে হচ্ছিল না। কিন্তু বিগত ত্রিশ বছরের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে তারা শান্তির সময়েই এই আমদানি করতে চাইছিল। কারণ যুদ্ধ বাধলে আমদানি বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় পণ্যটি ছিল বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার কড়ির আমদানি। এই কড়ির বদলে ফরাসিরা আফ্রিকাতে (প্রধানত গিনি উপকূলে) দাস ও হাতির দাঁত আমদানি করত। এটি সহজে বাংলাতে পাওয়া গেলেও। প্যারিস জোর দিয়েছিল যে বাংলা থেকে বছরে অন্তত দুবার বড় নৌকা মালদ্বীপে পাঠিয়ে কড়ি নিয়ে আসবে।[৯]

(৩)

ফরাসি বাণিজ্যিক কাঠামো তৈরি হলেও বাংলায় চালু করা শক্ত ব্যাপার ছিল। ওখানে ফরাসিদের প্রধানত ছিল দুটি সমস্যা। সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় বাণিজ্য করার অধিকার ফরাসিরা লাভ করে ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে। তখন শতকবা সাড়ে তিন ভাগ শুল্ক দিতে হত।[১০] কিন্তু ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে নূতন ফারমান আর আসেনি। ফলে ফরাসিরা শুধু যে শতকরা চার ভাগ শুল্ক দিচ্ছে তাই নয়। শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গেও গোলমাল হচ্ছিল। দ্বিতীয় সমস্যাটি পুরানো। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার থেকেই নদীর দুই পারের জমিদাররা বণিকদের নৌকা থেকে মালের জন্য তোলা তুলছিল। এই নিয়ে বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে গোলমালও হচ্ছিল। বারবার নবাব ও দেওয়ানকে জানিয়েও কোন ফল হয়নি।[১১]

বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তোলা আদায়ের পরিমাণ বেড়ে যায় ও গোলমাল চলতেই থাকে।

বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের লোকেরা চন্দননগরে বসবাস করতে শুরু করে। ফলে ফরাসিরা চন্দননগরের বেশি লোকের থাকার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়। পুরানো জলাভূমি ভরাট করে সেখানে বাড়ি তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৭২৫ সালের মধ্যে ফরাসিরা কয়েকটি ছোট গ্রাম ছাড়া চক নাসিরাবাদ কেনে।[১২] যার উপর পরবর্তী কালে শহর গড়ে ওঠে।

(৪)

১৭২৩ সালে প্যারিস ষোল লক্ষ ফরাসি মুদ্রা বাংলাতে পাঠায়। পণ্যের পরিধিও বাড়ে। এখন তারা চায় সোরা, কড়ি, লাক্ষা ও কাপড়।[১৩] এ সবের জন্য বণিকদের সঙ্গে কনট্রাক্ট করতে হয়। কিন্তু কিভাবে এবং কোথায় মাল পাওয়া যাবে তা নিয়ে বাংলার সঙ্গে পন্ডিচেরীর মতবিরোধ শুরু হতে থাকে যা ১৭৩০ সালের দশকে তুঙ্গে এসেছিলো।

প্যারিস ও পন্ডিচেরী চাইছিল যে বাংলা থেকে জাহাজ পাঠানো হোক মোখাতে। যেখান থেকে কফি ও অন্যান্য পণ্য আমদানি করা যাবে। বাংলা চাইছিল এর বদলে পারস্যতে পাঠাতে যেখানে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা আছে ও যার ফলে লাভ বেশি থাকত। এ দ্বন্দ্বের নিরসন হয়নি। যার ফলে মোখাতে জাহাজ পাঠালেও, মাঝে মাঝে পারস্যদেশে জাহাজ পাঠাত।

একই রকমভাবে প্যারিস ও পন্ডিচেরী জোর দিচ্ছিল যে বাংলা থেকে মালদ্বীপে জাহাজ পাঠিয়ে কড়ি, দড়ি দড়া ইত্যাদি আনার জন্য। বাংলার মতে ঐ সবই বাংলাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ও যাতায়াতের খরচ ধরলে একই খরচ পড়ে। এর বদলে বাংলা চাইছিল অনেকগুলি নৌকা একসঙ্গে করে পাটনাতে পাঠাতে। যেখান থেকে সস্তায় সোরা ও আফিম কিনতে পারা যাবে। পন্ডিচেরীর মতে সোরা শুধু বাংলাতে পাওয়া যায় তাই নয়। পন্ডিচেরীতেও পাওয়া যায়।[১৫] বলা দরকার এই মতবিরোধের পরিষ্কার কোন আলোচনা হয়নি এবং বাংলা প্রধানত পন্ডিচেরীর নির্দেশ মেনেই চলছিল।

১৬৯৮ সাল থেকে পন্ডিচেরী ফরাসিদের প্রধান কেন্দ্র হলেও, সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল ইউরোপের চাহিদা অনুযায়ী মাল পাঠানোর জন্য বাংলার উপরে। এই নির্ভরশীলতা ছিল দুধরণের। প্রথম ছিল ইউরোপীয় বাণিজ্যিক পণ্য যার মধ্যে ছিল সোরা, কড়ি, লাক্ষা ও কাপড়। দ্বিতীয় ধরণের মধ্যে ছিল ইউরোপগামী জাহাজের খাবার - ময়দা, গম, চাল ও বিস্কুট। এই শেষেরটির জন্য হুগলী ফরাসি নাবিকদের কাছে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল।[১৬]

বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি সমস্যা সামনে এসে যায়। ক্রমশ বড় জাহাজ আসতে থাকে যেগুলিকে পন্ডিচেরী থেকে মাল ভর্তি করা সম্ভব হচ্ছিল না। কোম্পানি তখন ঠিক করল ঐ বড় জাহাজগুলি বাংলাতে এসে মাল নিয়ে ইউরোপে চলে যাবে। ১৭২৫ সালে ঐরকম একটা বড় জাহাজ (**হারকিউলিস**) বালাসোরে এসে পৌঁছায়। কিন্তু ভালো পাইলটের অভাবে নদীর ভিতরে আর যেতে পারে না। সুতরাং নৌকা করে চন্দননগরের থেকে মালপাঠানো হয়।[১৭]

চন্দননগরের বাণিজ্যের এই কাঠামোগত সমস্যা ছাড়াও আরো কতকগুলি সমস্যা ছিল প্রধানত কাপড় কেনার মধ্যে। ইংরাজ ও ওলন্দাজদের তুলনায় ফরাসিরা আরো চওড়া মাপের কাপড় কিনত যার জন্য তাঁত বদলানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁতীরা আগাম টাকা ও বরাত না পেলে তাঁত বদলাতে রাজি নয়।[১৮] প্রথমদিকে ফরাসিদের হাতে টাকা না থাকায় এবং ধার না পাওয়ায় আগাম টাকা ও বরাত দেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। জাহাজ আসার পর টাকা দিলে মাল পেতে দেরি হত, যার ফলে জাহাজ ছাড়তে দেরি হবার সম্ভাবনা থাকত। এছাড়াও পরের বছরের জন্য ফরাসিদের হাতে টাকা না থাকায় পরের বছরও ঐ সমস্যা রয়ে যায়।[১৯] একমাত্র দুপ্লেক্স তিরিশের দশকে টাকা ধার নেবার ব্যবস্থা করলে এই সাময়িক সুরাহা হয়।

(৫)

চন্দননগরের ফরাসি আধিকারিক হার্দান কোর্ট সম্রাট ফারুখশিয়ারের কাছ থেকে ১৭১৯-২০ সালে একটি **ফারমান** জোগাড় করেছিলেন।[২০] এর অল্পপরে ফারুখশিয়ার মারা গেলে পরবর্তী সম্রাট মুহম্মদ শাহর কাছ থেকে **ফারমান** নেবার প্রয়োজন এসে যায়। ঐ **ফারমান** না পাওয়া গেলেও। ঐ পুরানো **ফারমানের** ভিত্তিতে বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা মুরসিদ কুলি খান ১৭২১-২২ সালে তিন বছরের জন্য ফরাসিদের বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়ে একটি **পরোয়ানা** দেন।[২১] কিন্তু ফরাসিরা তিন বছরের মধ্যে **ফারমান** নেবার কোন চেষ্টা করে না। এর ফলে ফরাসিদের ও তাদের বণিকদের সঙ্গে শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের ও নদীর উপরে বসানো বিভিন্ন চৌকির সঙ্গে গোলমাল বাড়তে থাকে। চন্দননগরের মাত্র পঞ্চাশজন সৈন্য থাকায়, চন্দননগর পন্ডিচেরীর কাছে আরো পঞ্চাশ সৈন্য পাঠাতে বলে। কিন্তু পন্ডিচেরী এতে রাজি হয় না কারণ ওর থেকে বেশি সৈন্য রাখার আদেশ নেই।

কিন্তু চন্দননগরে সৈন্যর প্রয়োজন ছিল। **ফারমান** না থাকার অভিযোগে হুগলীর ফৌজদারের লোকেরা চন্দননগরের কাছে ফরাসিদের দখলের গ্রামগুলিতে হামলা চালিয়ে কৃষক পরিবারকে বন্দী করে নিয়ে আসে। আশেপাশের গ্রাম থেকে ফরাসিরা পাইক ভাড়া করে ও নিজেদের সৈন্য নিয়ে প্রতি আক্রমণ করে ওদের ছিনিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।[২২]

পন্ডিচেরী এ সব সমস্যা বুঝতে চাইত না। কিন্তু বারবার লেখার পর তারা তিনটে সিদ্ধান্ত নেয় যার ফলে কাঠামোর চরিত্র কিছুটা বদলে যায়। প্রথমটি হল যে বড় বড় জাহাজ বাংলা থেকে মাল বোঝাই করে সরাসরি ফরাসিদেশে চলে যাবে। ১৭২৫ সালে এই পরীক্ষা সার্থক হয়েছিল।[২৩] এর ফলে বাংলা সরাসরি প্যারিসকে চিঠি পাঠাতে শুরু করল পন্ডিচেরীর মাধ্যমে না গিয়ে। দ্বিতীয়টি কোম্পানি ১৭২৩ সালেই চালু করেছিল। এবার সেটা পরিষ্কার ভাবে জানানো হল। কোম্পানির কর্মচারীরা ও অন্যান্য লোকেরা ব্যক্তিগত বাণিজ্য করতে পারবে। তবে সেটা সীমাবদ্ধ থাকবে ভারত ভূখন্ডের উপকূল ও এশিয়ার মধ্যে।[২৪] এর ফলে চন্দননগরের বাণিজ্য অনেকাংশে বেড়ে যায়। তৃতীয়টি আগেরটির সঙ্গে যুক্ত। কোম্পানির কর্মচারীরা বাইরের বণিকদের নিয়ে ব্যক্তিগত সংস্থা করতে পারবে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য যার মধ্যে কোম্পানি একটা অংশ নেবে। পন্ডিচেরীতে এই ধরণের সংস্থা গঠন হলেও,[২৫] তিরিশের দশকের আগে চন্দননগরে হয়নি। অবশ্য পন্ডিচেরীর সংস্থাগুলির মধ্যে বাংলার ফরাসিরা অংশ নিয়েছিল। চন্দননগরে বিশের দশকে ঐ ধরণের সংস্থা না হবার কারণ সম্ভবত চন্দননগরের ভারতীয় বণিক বাস করছিল না। এমন কি তিরিশের দশকে চন্দননগরে দুপ্লেক্স যখন ঐ ধরণের সংস্থা গড়ে তোলেন। তার সদস্যরা ছিলেন প্রধানত ইউরোপীর যাঁরা কলকাতা বা চুঁচুড়ায় থাকতেন। পন্ডিচেরীতে প্রচুর সংখ্যায় তামিল বণিক থাকার ফলে ওখানে ঐ সংস্থাগুলি হতে পেরেছিল।

এই ধরণের সংস্থাগুলি চালু হবার ফলে ফরাসি বাণিজ্যের কাঠামোর মধ্যে দুটি সমান্তরাল ধারা পাশাপাশি চলতে থাকে। বিশের দশকের শেষ দিক থেকেই কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বাণিজ্যে প্রচুর অর্থ লগ্নী করলে ব্যক্তিগত বাণিজ্য খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। এর জন্য অবশ্য কোন কোন কর্মচারীকে পরবর্তীকালে নানান অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়।

১৭২৭ সালের শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মূল সমস্যাগুলির নিরসন হয়নি। **ফরমান** পাওয়া যায়নি - ফলে মুর্শিদাবাদ দরবারের সঙ্গে গোলমাল কিছু পরে বড় আকার ধারণ করে। দ্বিতীয়ত বাণিজ্যিক নীতি কি হবে সেটাও পরিষ্কার হয়নি - পারস্য না মোখা বা আচিন না চীন - কোথায় জাহাজ যাবে সেটাও পরিষ্কার করা হয় নি। তৃতীয়ত আগাম দাদন দেওয়ার কথা চন্দননগর বারবার বললেও এর কোন সুরাহ হয়নি। এ সব ছাড়াও, আর একটি সমস্যা উঠে আসতে থাকে। যেটি পরিবর্তিত কাঠামোর মধ্যে নিহিত ছিল। পন্ডিচেরী কেন্দ্রে কিন্তু চন্দননগর কতটা পন্ডিচেরীর অধীন - এ প্রশ্নটা বারবার উঠছে। অর্থাৎ অন্যান্য কুঠিগুলির স্বাধীনতা কতটা সেটা কোথাও পরিষ্কারভাবে না বলার ফলে পন্ডিচেরীর সঙ্গে চন্দননগরের সম্পর্ক পরের দশকে তিক্ত হয়ে যায়।

১৭২৫ সালে শোভালিয়র দ্যালবাট চন্দননগরে আসেন। এখানকার অর্থাভাবের ফলে বাণিজ্য ব্যাহত হচ্ছে সেটা পরিষ্কার বলেছেন। ওঁর মতে বাংলাই প্রধানত ফরাসি দেশে মাল উৎপাদক ও চালানকারি। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে নানান ধরণের অরাজকতার ফলে বাণিজ্যের ক্ষতি হচ্ছে। প্রচুর পরিমাণে রূপো আসার ফলে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে। নবাব অরাজকতা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার ফলে ফরাসি বাণিজ্যের ক্ষতি হচ্ছে।[২৬]

১৭২৫ থেকে ১৭২৭ সালের মধ্যে চন্দননগর পাটনাতে কুঠি বসানোর চেষ্টা করে নৌকা পাঠায়। নানান কারণে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।[২৭] কিন্তু পরিত্যক্ত কাশিমবাজারের কুঠি মেরামত করে বাণিজ্য শুরু করার অনুমোদন প্যারিস দেয়।[২৮] কিন্তু ১৭২৭ সালে মুর্শিদকুলী খান মারা গেলে মুর্শিদাবাদ দরবারের সঙ্গে ফরাসিদের গোলমাল শুরু হয়ে যায়। ফরাসিরাও ক্রমশ প্রতিরোধের মনোভাব নিতে থাকে[২৯] যার ফলে ফরাসি বাণিজ্যর একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়।

১৭১৯ সাল থেকে ফরাসিদের বাণিজ্যর এক দশকের মধ্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বছরে দু লাখ টাকার বাণিজ্য চলতে থাকে যা পরবর্তী দশকে দশ লাখ টাকায় পৌঁছায়। উল্লেখযোগ্য যে অভাবনীয় উন্নতির মূল সোপান বাংলায় দুপ্লেক্স আসার আগেই হয়েছিল এবং উন্নতির মূল হোতা ছিলেন দুপ্লেক্স এ ধারণাটা ঠিক নয়।[৩০]

সূত্র নির্দেশঃ—

১। Paul Kaeppdin : *La Compagnil des Indes Orientales*, প্যারিস, ১৯০৮।

২। S. P. Sen, *The French in India*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭, *The French in India. 1763-1816*, নিউদিল্লী, ১৯৭১।

৩। Philippe Haudrere, *La Compagnie Francaise des Indes on XVIII sicde*, প্যারিস, ১৯৮৭, চার খণ্ড।

৪। Aniruddha Ray, "Revival of French Trade in India : Pondichary and Bengal during the port Duplix Period "*Indian Historical Review*". খন্ড ২৫, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৫৮-৮৭।

৫। হদ্রেয়ার, প্রাগুক্ত, প্রথম খন্ড, কোম্পানি শেয়ার বিক্রী করে আড়াই কোটি ফরাসি মুদ্রা তোলে। তাছাড়া তামাকের ইজারা থেকে নয়কোটি মুদ্রা বছরে আসে। রাজা এক কোটি মুদ্রা ধার দেন। আরো শেয়ার ইত্যাদি বেচে কোম্পানির আয় হয় দশ কোটি ফরাসি মুদ্রা। এই কোম্পানির মধ্যে ছিল সেনেগাল, লুইসিয়ারী, চীন ও ভারত ভূখণ্ড।

৬। প্যারিসকে লেখা পন্ডিচেরীর চিঠি, তেসরা ফেব্রুয়ারি ১৭১৮ (*Archines Nationales et Coloniales*, colonise C(2) 70, ফোলিও ২৬৫ - ২৬৫ খ) (ওখানে সংক্ষেপে *AN*)।

৭। পন্ডিচেরী থেকে প্যারিসে লেখা দু লিভিয়ারের চিঠি, ১৪ই ফ্রেব্রুয়ারি ১৭১৪ (*AN, Colonie C(2) 69,* ফোলিও ৭৬ - ৭৬ খ)।

৮। প্যারিস থেকে পন্ডিচেরীতে চিঠি, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৭১৯ (*AN,* Colonie C (2) 72, ফোলিও ৪৫-৫৫)।

৯। ঐ।

১০। দ্রষ্টব্য, অনিরুদ্ধ রায, 'সপ্তদশ শতকের শেষে বাংলায় ফরাসি কোম্পানি ও দুটি ফার্মান', *ইতিহাস অনুসন্ধান,* ১৯৯৯, সংখ্যা ১১, পৃঃ ২৪৭-২৬১।

১১। Aniruddha Roy, *Adventures, Landowners and Rebels, Bengal, C 1575 - C. 1715,* নিউ দিল্লী, ১৯৯৮, পৃঃ ১৬২-১৭৪।

১২। ঢাকা থেকে লেখা কুঠিয়াল আরাকের প্রতিবেদন (*AN,* Colonie C (2) 115, ফোলিও ২৪-২৫), ১৮২২ সালে লেখা ঐ সময়ে বোরোকৃষ্ণপুর গ্রামও কেনা হয়।

১৩। পন্ডিচেরী থেকে চন্দননগরে চিঠি, ২০ অক্টোবর ১৭৩০ (*AN,* Colonie C (2) 72, ফোলিও 387-387 খ)।

১৪। পন্ডিচেরী থেকে প্যারিসে লেখা চিঠি, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৭২১, ঐ, ফোলিও ৪৮খ - ৬৮খ।

১৫। ঐ, ফোলিও ৯৮খ - ৯৯খ।

১৬। পন্ডিচেরীর চিঠি, ১৮ই অক্টোবর ১৭২৪ (*AN,* Colonie C (2) 73, ফোলিও ৪৪)।

১৭। পন্ডিচেরীর চিঠি, ২৫ আগষ্ট, ১৭২৫ (*AN,* Colonie C (2) 73, ফোলিও ৪০৫-৪০৫ খ)।

১৮। আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য অনিরুদ্ধ রায়, "The French Establishment in Bengal : Challenges and Responses, 1671-1719" (Om Prakash & Danys Lombard (ed), *Commerce and culture in the Bay of Bengal,* 1500-1800, নিউ দিল্লী, ১৯৯৯, পৃঃ ১৯৭-২২০)।

১৯। পন্ডিচেরীর চিঠি, ২৫ আগষ্ট, ১৭২৩ (*AN, Colonie C(2) 72,* ফোলিও ৩৯৭ খ)।

২০। ঢাকা থেকে আরাকের প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, ফোলিও, ২৫-২৬।

২১। ঐ, ফোলিও ২৬ খ।

২২। পন্ডিচেরী থেকে লেখা চিঠি, ২৫ আগষ্ট, ১৭২৩ (*AN, Colonie C(2) 72,* ফোলিও ৪০০-৪০১)।

২৩। বড় জাহাজটির নাম ছিল *হারকিউল,* পন্ডিচেরীর চিঠি, ২৫ আগষ্ট, ১৭২৫, (*AN, Colonie C(2) 73,* ফোলিও ১৬৯ খ)।

২৪। বিশদ আলোচনার জন্য, দ্রষ্টব্য অনিরুদ্ধ রায়ের প্রবন্ধ "Revival of French Trade", প্রাগুক্ত।

২৫। ঐ।

২৬। গেডালিয়র দ্যালবার্টের প্রতিবেদন (*বিবলিওথেক ন্যাশিওনাল*)। প্যারিস, Fond Frangais 9090 ফোলিও ১৩৪-১৫২।

২৭। সমকালীন কোন ফরাসি দলিলে পাটনার কুঠি স্থাপনের চেষ্টার কথা পাওয়া যায় না। ১৭৩৪ সালে দুপ্লেক্স যখন পাটনাতে কুঠি বসান, তখন ঐ সময়কার চেষ্টার কথা পাওয়া যায়।

২৮। পন্ডিচেরী থেকে চন্দননগরে লেখা চিঠি, ২০, জানুয়ারি ১৭২৮ (বিবলিওথেক ন্যাশিওনাল Nouvtlle Acquisition Frangaise 8933,ফোলিও ২৬)

২৯। চন্দননগর কাউন্সিলের মতামত (*AN*, Colonic C(2) 74, ২৭, সেপ্টেম্বর ১৭২৭, ফোলিও ১৩৫ খ)

৩০। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ফরাসিদের বাণিজ্যিক উন্নতির জন্য ফরাসি আধিকারিক দুপ্লেক্সকে কৃতিত্ব দিয়েছেন (*The Economic History of Bengal*, কলিকাতা, ১৯৮১, তিন খণ্ড, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫ - ৫২)।

মধ্যযুগে চট্টগ্রাম বন্দর

শামসুল হোসাইন

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে যোগাযোগ ও পরিবহনের উপায় হিসাবে জলপথ মানব সভ্যতার বিকাশে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।[১] জলপথে যোগাযোগের অনুসঙ্গ হিসেবে গড়ে ওঠে পোতাশ্রয় এবং বন্দর। বঙ্গোপসাগরের তীরে এমন একটি প্রাচীন সমুদ্র বন্দরের নাম চট্টগ্রাম।[২]

রূপনারায়ণ নদীর পশ্চিমতীরে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার বিশ্বখ্যাত প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বা তমলুক বন্দর প্রাকৃতিক কারণে অ-নাব্যতা সমস্যার কবলে পড়লে পূর্বভারতের পণ্যরপ্তানির চাহিদা পূরণের সুবিধার্থে বিকল্প বন্দর হিসেবে আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রামের ব্যবহার শুরু হয়।[৩] বাংলা এবং আসামের যে কোন জায়গায় নদী পথে এই বন্দর থেকে পণ্য আনা-নেওয়া প্রাকৃতিক সুবিধা বিরাজমান ছিল। পশ্চাদভূমি এবং অগ্রভূমির সঙ্গে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি বন্দরের উত্থান, বিকাশ ও গুরুত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। কর্ণফুলির তীরে গড়ে ওঠা সমসাময়িক সমৃদ্ধ হরিকেল রাজ্য এবং আরব ভৌগোলিকদের বিবরণের হরকন্দের সমুদ্র কেবলমাত্র প্রাচীন চট্টগ্রাম বন্দরের বাণিজ্যিক গুরুত্বকেই উপস্থাপন করে।[৪] ৯৭১ খ্রিস্টাব্দে একটি লেখে *বঙ্গসাগর সম্ভান্তারিতাক* নামটি পাওয়া যায়। রণবীর চক্রবর্তী একে অভ্যন্তরীণ ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর নদীবন্দর সাভারের (ঢাকার কাছে) সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। তিনি আরো মনে করেন যে, দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারত মহাসাগরের পূর্বদিকের জলরাশি বঙ্গসাগর নামে অভিহিত হতো।[৫]

আরব বিবরণের সমন্দর বন্দর শহরটির নামকরণে ভিনদেশী এবং তখনও এদেশে অপ্রচলিত ফার্সি ভাষার প্রাবল্য লক্ষ্য করার মতো। ফার্সি **سام** (সম) এবং **اندرون** (আন্দরোন) থেকে **سمندر** (সমন্দর) নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[৬] 'সম' মানে হলো 'আগুন' এবং 'আন্দরোন'— এর অর্থ হলো 'ভেতরে'। দুটি মিলে 'সমন্দর' নামের মানে দাড়ায় 'ভেতরে আগুন'।[৭] পণ্ডিতবর্গ সমন্দর ও চট্টগামকে অভিন্ন মনে করেন। মুদ্রা ও লেখের সাক্ষ্যে চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম হরিকেল হিসেবে চিহ্নিত করা হলে[৮] আরব বিবরণের অস্থানীয় সমন্দর নামটি বিভ্রান্তি জাগায়। আবার আরবরাই বঙ্গোপসাগরকে হরকন্দের সমুদ্র বলছেন। তাহলে কী ধরতে হবে 'সমন্দর'

নামকরণে আরবরা চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্টকেই উপস্থাপন করেছিলেন — যা এখনো দেখা যায় সীতাকুন্ড বাড়বকুন্ডের পাহাড়ী অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের আগুনে — মাটি ফুড়ে ওঠা প্রদীপ আকারে। *হুদুদ আল আলম* এবং *তাবাই আল হায়ওয়ান*-এর বিবরণ অনুসারে বি. এন. মুখার্জি মত প্রকাশ করেন যে, হরিকেল রাজ্যে হাজকিরা বা হরকন্দ নামের আরো একটি শহর ছিল।[৯]

চতুর্দশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে সোনারগাঁয়ের সুলতান ফখর-উদ-দিন মুবারক শাহ চট্টগ্রাম অধিকার করলে বাংলার সঙ্গে এ-অঞ্চলের এক পরিবর্তিত সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের সূচনা হয়।[১০] এই ব্যবস্থারও প্রধান নিয়ামক ছিল চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর। পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে আরাকানি এবং মুখল শাসনামলে বন্দরের গুরুত্ব অব্যাহত থাকে। ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা চট্টগ্রাম ভ্রমণকালে বন্দরে অনেক জাহাজ নোঙ্গর করা অবস্থায় দেখতে পান।[১১] সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামের সঙ্গে নদী বন্দর সোনারগাঁয়ের ছিল সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা। পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে চীন দেশের এক রাজকীয় প্রতিনিধি দল ভাগীরথী তীরের রাজধানী পাণ্ডুয়ায় যান চট্টগ্রাম-সোনারগাঁ-পাণ্ডুয়া পথে।[১২] বিহারের মানের এলাকার মৌলানা মুজাফ্ফর শামস্ বলখি বাংলার সুলতান গিয়াস-উদ-দিন্ আজম শাহকে অনুরোধ করেন যেন তিনি মৌলানা বলখি এবং তাঁর সঙ্গী একদল দরবেশের মক্কা শরীফ যাওয়ার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করতে চট্টগ্রামে তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে রাজকীয় আদেশ (ফরমান) জারি করেন।[১৩] সুলতান ফখর-উদ-দিন চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরি করেন যাতে প্রয়োজন বোধে জলপথ পরিহার করা যায়। এই সুলতানের শাসনামলেই চট্টগ্রামে সমন্বিত মুসলিম সমাজ বিস্তারের সূচনা ঘটে এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষণায় নির্মিত হয় অনেক মসজিদ এবং দারগাহ।[১৪]

সুলতান ফখর-উদ-দিনের সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ফলে বাংলার সঙ্গে এক সুদীর্ঘ সম্পর্কের সূত্রপাত হয় চট্টগ্রামের, যা ইতোপূর্বে হরিকেল নামের একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মূল উৎপত্তিস্থল ছিল। মুদ্রা এবং শিলালিপির সাক্ষ্যে অনুমান করা যায় যে, ইলিয়াস শাহী রাজবংশ, রাজা গণেশের বংশধর এবং পরবর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতানদের রাজত্বকালে ফখর-উদ-দিন সূচিত সম্পর্ক বহাল থাকে। সম্ভবত হাবশী সুলতানদের সময়েও একই অবস্থা বিরাজ করছিল এবং চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের কর্তৃত্ব ছিল তাদের দখলে। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে হাবশী সুলতান শামস-উদ-মুজাফ্ফর শাহ্ এক বিদ্রোহে নিহত হলে আলা-উদ-দিন হোসেন শাহ্ বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন। পুরো রাজ্যের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরও তাঁর হস্তগত হয়। ত্রিপুরা এবং আরাকান রাজাদের সংক্ষিপ্ত হস্তক্ষেপ ছাড়া হোসেন শাহী সুলতানরা ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বন্দর নিজেদের দখলে রাখেন।[১৫]

মধ্যযুগের বন্দর শহরগুলোতে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যেত, যেমন : ১. একটি সাধারণ স্থায়ী বাজার, ২. এর বাসিন্দারা মূলত অকৃষিজীবী, ৩. শহরগুলো ছিল বাণিজ্য এবং দক্ষতা-নির্ভর শিল্প-কৌশলের কেন্দ্র, ৪. নদী বা কৃত্রিম জলাশয় থেকে পানীয় জল সংগ্রহের সহজ ব্যবস্থা, ৫. মাটি বা ইটের প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে দুর্গ এবং বহিরঙ্গে গভীর পরিখা ইত্যাদির সাহায্যে আক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা, ৬. খাঁড়ি বা নদীর মোহনা পথে খোলা সমুদ্রে যাতায়াতের সংযোগ, ৭. একটি নিরাপদ পোতাশ্রয় এবং ৮. সুশাসনের সকল সুব্যবস্থা। বন্দর শহর চট্টগ্রামে উল্লিখিত সকল ব্যবস্থাতো ছিলই এবং আরো ছিল নদী পথে পশ্চাদভূমির সঙ্গে সহজ যাতায়াতের প্রাকৃতিক সুযোগ।[১৬]

চট্টগ্রাম পৌর কর্পোরেশনের সুলকবহর মৌজার কর্ণফুলি নদীর তীরে সম্ভবত অবস্থিত ছিল সুলতানী আমলের বন্দরটি।[১৭] سلوک بحر (সুলকবহর) একটি আরবি শব্দ, যার মানে সমুদ্রে যাত্রা করার জায়গা।[১৮] মধ্যযুগে বঙ্গোপসাগর নির্ভর সমুদ্র বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এই বন্দর। সুলকবহরের আশে পাশে চন্দনপুরা (চন্দন একটি উল্লেখযোগ্য সুগন্ধিযুক্ত কাঠ) এবং কাপাসগোলা (کرپاس পাট বা শনের তৈরি মিহি কাপড়) ইত্যাদি স্থান-নামের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে মধ্যযুগের বন্দর কেন্দ্রিক বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের ইতিকথা। সুলকবহর-ষোলশহর অঞ্চলে একটি জায়গার নাম গোদীর পাড়া। লোকে বলে প্রাচীন কালে এই জায়গা আরব ব্যবসায়ীদের জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামতের এক প্রখ্যাত কেন্দ্র ছিল। এই অঞ্চলে পুকুর খোঁড়া বা অন্যান্য মাটিব কাজে এখনো নিচ থেকে উঠে আসে ভাঙ্গা জাহাজের টুকরো বা অংশবিশেষ। এই জায়গারই গোদীর পাহাড় নামক একটি বিশেষ টিলাকে চিহ্নিত করা হয় জাহাজ মেরামতের ডক হিসেবে।[১৯] غوث (*গৌথ*) একটি আরবি শব্দ (যার অর্থ নিম্নমুখী ঢাল) যেখান থেকে ঝাঁপ দেওয়া যায়।[২০] সম্ভবত নতুন নির্মিত বা মেরামত করা জাহাজগুলো মাটির এই ডক থেকেই পাশের কর্ণফুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়তো বলেই টিলাটির এই নাম। প্রবাসী পত্রিকায় ১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে জাহাজ নির্মাণের একখানা সচিত্র বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। কর্ণফুলি নদী তীরে এক উঁচু জায়গায় আমিনা খাতুন নামের এই জাহাজটি তৈরি হয়েছিল।[২১] প্রধান মিস্ত্রি কালীকুমার দের তত্ত্বাবধানে চল্লিশ জন শূদ্রজাতীয় মিস্ত্রি একনাগাড়ে এক বছর পরিশ্রম করে পাঁচ/ছয় হাজার মন মাল বহনে সক্ষম এই দেশীয় জাহাজটি নির্মাণ করেছিলেন। এর চেয়েও দুই তিন গুণ বড় জাহাজ তখন জাহাজী মালিক সওদাগররা ব্যবহার করতেন। চট্টগ্রাম বন্দর সংলগ্ন হালিশহর পতেঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে অনেকগুলো দেশীয় জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল। ঈশান মিস্ত্রি নামে একজন দক্ষ ও প্রসিদ্ধ জাহাজ

নির্মাণের কারিগর ছিলেন। তার নামানুসারে একটি হাট দক্ষিণ-মধ্যম হালিশহরে এখনও টিকে আছে। চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদ মৌজার মিস্ত্রি পাড়ায় জাহাজ নির্মাণের অপর 'ওস্তাদ কারিগর' ইমাম আলী মিস্ত্রির কবর রয়েছে।[২২] সুদীর্ঘ কাল ধরে পুরুষানুক্রমে ধারাবাহিক ঐতিহ্যে লালিত কারিগরী জ্ঞান অতীতের প্রেক্ষাপটে টিকে থাকে সমাজ অনুষঙ্গে। সম্ভবত চট্টগ্রামে দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ওস্তাদ কারিগরদের দক্ষতার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে দূর অতীতের অনুষঙ্গ, কালানুক্রমিক চর্চায় যা তারা উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাদের পূর্বপুরুষ থেকে।[২৩] বন্দরের *মহুলত-ই সায়ের*-এর একটি মহাল হিসেবে *জিহাত গোদি বা মারামাত-ই জাহাজাত* নামের উল্লেখ দেখা যায়।[২৪] ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বন্দরে শুল্ক হিসেবে আদায় হয় এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার দু'শ পঁয়ত্রিশ টাকা পঁচিশ পয়সা এবং আনুমানিক তিয়াত্তর লক্ষ অষ্টাশি হাজার দু'শ তেত্রিশ টাকা তিন পয়সা মূল্যের পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়।[২৫]

সুলকবহরের অবস্থান কর্ণফুলী মোহনা থেকে আনুমানিক বার মাইল অভ্যন্তরে। রিচার্ড ইটন বলেন, "For long the city has been a window on the Indian Ocean, when under the controls of the sultans, it served as a principal port for Muslim pilgrims and for the export of manufactured goods."।[২৬] দূরপ্রাচ্য এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাতে গিয়ে তৎকালীন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সিন্ধু থেকে বাংলা পর্যন্ত দুর্গম ভূখন্ড এবং রাজনৈতিক গোলযোগপূর্ণ অঞ্চলগুলো পরিহার করতে সমুদ্র উপকূলবর্তী নৌপথ ব্যবহার করতো। বারবোসা এবং বারথেমার বর্ণনায় এরকম দুটি প্রধান সমুদ্র পথের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে দূরপ্রাচ্যের দিকের পথটি দক্ষিণমুখী হয়ে বার্মা উপকূল, রামবী দ্বীপ, আরাকান, পেগু, শ্যাম, মালাক্কা, সুমাত্রা, জাভা, মসলার দ্বীপ, পতনী, ত্রেঙ্গানু এবং চম্পা হয়ে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অপর দক্ষিণ পশ্চিম পথটির বিস্তার ছিল উড়িষ্যা উপকূল, কয়াল, করমন্ডল উপকূলের ফত্তন বন্দর, সিংহল, মালাবার হয়ে পারস্য উপসাগর এবং আরব উপসাগর, কূলবর্তী আরব এবং আবিসিনিয়া হয়ে লোহিত সাগর এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত।[২৭]

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে জাহাজের অনেক বর্ণনা এবং সমুদ্র যাত্রার বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। *মনসামঙ্গল* এবং *চন্ডীমঙ্গলে* রয়েছে নৌবাণিজ্যের অনেক চিত্রবৎ আলেখ্য।[২৮] এসব বিবরণ থেকে তৎকালীন বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকাও তৈরি করা সম্ভব। বংশীদাসের *মনসামঙ্গল* কাব্যে রপ্তানি পণ্যের তালিকায় পান, সুপারি, চুন, খয়ের, এলাচি, ফলমূল, শাকসবজি, ডাল, পেঁয়াজ, আদা, কর্পুর, জলজ উদ্ভিদ, ছাগল, ভেড়া, শুঁটকি, আখ, পাট, কাঠের আসবাবপত্র ও গৃহসরঞ্জাম,

পোড়ামাটির তৈজসপত্র, তেল ও পরিশুদ্ধ ঘি, কুমকুম, আফিম গাছ ইত্যাদি নাম রয়েছে। এসময় আমদানি করা হতো মূল্যবান হীরা, পান্না ও মণিমুক্তা, সোনা ও রূপা, প্রবাল, রুবি, হাতির দাঁত, চন্দন কাঠ, রাজদন্ড, কড়ি, সোনা-রুপার আসবাবপত্র ও তৈজষপত্র, বেলমেটাল-এর তৈজষপত্র, মধু ইত্যাদি। মুকুন্দরামের *চন্ডীমঙ্গল*-এও রয়েছে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের তালিকা।[২৯] লোককাহিনী ভেলুয়া-তে চট্টগ্রামের একটি পরিবারের বিবরণ পাওয়া যায়, যে পরিবার নৌবাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।[৩০] অনুমান করা হয় যে, এই কাহিনী বাংলার স্বাধীন সুলতান নসরত শাহের সময় সৃষ্ট।[৩১] দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন, কাহিনীটির একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে।[৩২] এতে শাপলা বন্দরের জনৈক মাণিক সওদাগরের পুত্র আমিরের কয়েকটি সমুদ্রযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ গ্রথিত। তাঁর জাহাজের নাম ছিল 'কালাধর'। এই লোককাহিনীতে আরো রয়েছে সমুদ্রযাত্রার সময় জাহাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রীর একটি তালিকা।[৩৩] তবে কাহিনীটির অন্যতম আকর্ষণ নৌবাণিজ্যের সন্ধানে ঘরছাড়া আমিরের অনুপস্থিতিতে তাঁর সুন্দরী স্ত্রী ভেলুয়ার দুঃখ ও বেদনার করুণ কথা এবং সমসাময়িক সমাজের বিবরণ। ভেলুয়ার আলেখ্য মুসলিম বিয়ে উপলক্ষে মহিলারা লোকগান হিসেবে এখনো পরিবেশন করেন। চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ পাহাড়তলী মহল্লায় বিশাল ভেলুয়ার দিঘি মনে করিয়ে দেয় ভেলুয়ার করুণ কাহিনী।[৩৪]

সন্দ্বীপের ডকে নির্মিত জাহাজগুলো টেকসই এবং সস্তা হওয়ায় বিশ্বজুড়ে ছিল এর জনপ্রিয়তা এবং চাহিদা। তুরস্কের সুলতানরা আলেকজান্ডারিয়ায় তৈরি জাহাজ পছন্দ না করে সন্দ্বীপ থেকে জাহাজ তৈরি করিয়ে নিতেন।[৩৫] এসব কারখানায় জাহাজের মাস্তুল তৈরির উপযুক্ত লম্বা এবং পুরু কাঠের সরবরাহ আসতো সরকার বাজুহা থেকে।[৩৬] পর্তুগিজ ভূগোলবিদ জোয়া ডি ব্যারোস ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর আঁকা বাংলাদেশের একখানা মানচিত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব বিবেচনা করে স্থানটিকে কর্ণফুলির তীরে যথোপযুক্তভাবে চিহ্নিত করেন।[৩৭] বাংলার সুলতান গিয়াস-উদ-দিন মাহমুদ শাহের অনুমতি নিয়ে পর্তুগজরা চট্টগ্রামে একটি শুল্ক ভবন এবং কারখানা নির্মাণ করে।[৩৮]

বাংলার সুলতানদের কাছ থেকে চট্টগ্রাম দখল করে আরাকানিরা সুদীর্ঘ একশ বছর বন্দরের ওপর তাদের আধিপত্য বহাল রাখে। এ সময় মগ-ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের উৎপাতে বাংলার নিম্নাঞ্চলে সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেয়। মুঘল নৌবাহিনীর দুর্বলতার ফলেই জলদস্যুরা আরাকান রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় এত বেপরোয়া হয়ে উঠতে পেরেছিল।[৩৯] পরে মুঘল আক্রমণের ফলে এই বন্দর হাতছাড়া হয়ে গেলে আরাকান রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি মুঘল নৌবাহিনী আরাকানিদের হাত থেকে চট্টগ্রাম দুর্গ দখল করে নেয়।[৪০] এই বিজয়ের ফলে বন্দর-শহর চট্টগ্রাম একটি মুঘল সরকার বা জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়, একজন ফৌজদার এর নির্বাহী দায়িত্বে থাকেন।[৪১] বঙ্গোপসাগর তীরে সমুদ্র বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে মুঘল শাসনামলে চট্টগ্রাম বন্দর তার পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখে। পর্তুগিজদের অশুভ প্রভাব ক্ষুণ্ণ করে উপসাগর কেন্দ্রিক ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা বিধান করা ছিল মুঘল আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আদেশে আরাকান উপকূল পর্যন্ত দস্যুতা দমনের জন্য বাংলার সুবাহদার শায়েস্তা খান চৌদ্দ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পূর্বাঞ্চলীয় মুঘল নওয়ারাকে পুনর্গঠিত এবং শক্তিশালী করেন।[৪২] নওয়ারা জাগির এবং উমলে-আসলাম-এর অধীনে সেনা ও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়োগ করে সমুদ্রোপকূলীয় বন্দরগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা হয়।[৪৩] এরকম একটি শক্তিশালী সেনা অবস্থানের কারণে ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে পরিচালিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চট্টগ্রাম বন্দর দখল অভিযান সফল হতে পারে নি। এসময় চট্টগ্রামের জাহাজ নির্মাণের কারখানাগুলোও সচল থাকে। এখনো চট্টগ্রাম শহর এবং জেলার গ্রামাঞ্চলে অনেক বাড়ির মৃত বা বর্তমান মালিকের পরিচয়মূলক পদবি নৌবাণিজ্য বা জাহাজ ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত। পদবিগুলো হলো : মালুম, সারাং, সুকানি, টেন্ডল, খালাসি, লস্কর, দোভাসি ইত্যাদি। জি. ই. হার্ভে বলেন "Chittagong bread a race of competent seamen"।[৪৪] ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে বাংলা সলতনত এবং পরবর্তীকালে সুবাহ্‌র একটি উল্লেখযোগ্য টাঁকশালের মর্যাদা লাভ করেছিল চট্টগ্রাম। মুঘল আমলে এই টাঁকশাল থেকে স্বর্ণমুদ্রাও জারি করা হয়েছিল।[৪৫]

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। সিন ম্যাকগ্রেইল, দি সিপ : *র‍্যাফটস্, বোটস্ অ্যান্ড সিপস্ ফ্রম প্রিহিস্টোরিক টাইমস্ টু দা মিডিইভ্যাল এরা,* লন্ডন ১৯৮১, পৃ: ৫।

২। উইলিয়াম আর. সেফার্ড, *হিস্টোরিক্যাল এটলাস,* নিউ ইয়র্ক ৮ম সংস্করণ, ১৯৫৬, পৃ: ১০৪সি।

৩। রণবীর চক্রবর্তী, "বেলাকুলের বৃত্তান্ত", *ইতিহাস অনুসন্ধান* ১৬, কলকাতা ২০০২, পৃ. ১৫; এ. এইচ. দানি, "আর্লি মুসলিম কনট্যাক্ট উইথ বেঙ্গল", *প্রসিডিংস অব দ্য অল পাকিস্তান হিস্ট্রি কনফারেন্স,* ফার্স্ট সেশন, করাচি, ১৯৫১ পৃ. ১৮৪-২০২।

৪। ইবনে খুরদাদবি, "আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক" এবং সুলাইমান আল-তাজির ইত্যাদি, "আখবার অল-সিন ওয়াল-হিন্দ", *এরাবিক ক্লাসিক্যাল একাউন্টস্ অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না,* এস. মকবুল আহমদ (অনু.), সিমলা ১৯৮৯, পৃ. ২৪, ৫৮-৫৯।

৫। রণবীর চক্রবর্তী, "বেলাকুলের বৃত্তান্ত", পৃ. ১৭ এবং টিকা ২৮।

৬। আবদুল করিম, "সমন্দর অব দি এরার জিওগ্রাফার্স", *জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্থান*, খণ্ড ৮, সংখ্যা ২ ডিসেম্বর ১৯৬৩।

৭। এফ্ স্টেইংগাস্, *অ্য কমপ্রিহেন্সিব পার্সিয়ান-ইংলিশ ডিক্সনারি*, দিল্লী, ১৯৯৬, পৃ. ৬৯৭।

৮। বি. এন. মুখার্জি, "অরিজিনাল টেরিটরি অব হরিকেল", *বাংলাদেশ ললিতকলা*, খণ্ড ১ এবং ২, জুলাই ১৯৭৫, পৃ. ১১৫-১১৯।

৯। বি. এন. মুখার্জি, "আর্লি কয়েনেজেস অব 'বেঙ্গল'— টু রিসেন্ট পাব্লিকেশনস্", *ন্যুমিসম্যাটিক ডাইজেস্ট*, খণ্ড ২৩-২৪, ১৯৯৯-২০০০, পৃ. ১৭৬।

১০। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* : সুলতানী আমল, ঢাকা ১৯৮৭ দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃ. ১৬৬-১৬৭।

১১। নলিনী কান্ত ভট্টশালী, *কয়েন্স অ্যান্ড ক্রনলজি অব দ্য আর্লি ইন্ডিপেনডেন্ট সুলতানস্ অব বেঙ্গল*, কেমব্রিজ ১৯২২, পৃ. ১৩৬, ১৪৫-১৪৯; তপন রায়চৌধুরী এবং ইরফান হাবিব (সম্পা.), দি কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, খণ্ড ১, কেমব্রিজ ১৯৮২, পৃ. ১৩০।

১২। অনিরুদ্ধ রায়, *অ্যাডভেঞ্চারার্স ল্যান্ডওনার্স অ্যান্ড রিভেল্স বেঙ্গল সি.* ১৫৭৫ - সি. ১৭১৫, নিউ দিল্লী, ১৯৯৮, পৃ. ১৮; হরপ্রসাদ রায়, "পাণ্ডুয়া ইন দ্য ফিফটিন্থ সেঞ্চুরি : দি চাইনিজ ভিউ", প্রত্ন সমীক্ষা, খণ্ড ৬-৮, ১৯৯৭-১৯৯৯, পৃ. ৯৭।

১৩। আবদুল করিম, *সোসাল হিস্ট্রি অব দ্য মুসলিম্স ইন বেঙ্গল* (ডাউন টু এডি ১৫৩৮), চিটাগাং ১৯৮৫, ২য় সংশোধিত সংস্করণ, পৃ. ১৭-১৮, ৭৯।

১৪। যদুনাথ সরকার, "দি ফিরিঙ্গি পাইরেট্স অব চাটগাঁও, ১৬৬৫ এডি", *জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ন্যুমিসম্যাটিক সাপ্লিমেন্ট ৩, সংখ্যা ৬, জুন ১৯০৭, পৃ. ৪২১।

১৫। জে. জে. এ. ক্যাম্পস, *হিস্ট্রি অব দ্য পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল*, পাটনা ১৯৭৯ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৩০-৪০।

১৬। এম. পি. সিংহ, *টাউন, মার্কেট, মিন্ট অ্যান্ড পোর্ট ইন দ্য মোগল এমপায়ার*, নতুন দিল্লী ১৯৮৫, পৃ. ১-২।

১৭। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স, *স্মল এরিয়া এটলাস অব বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৩২-৩৩।

১৮। এফ. স্টেইঙ্গাস্, প্রাগুক্ত ১৯৯৬, পৃ. ১০৮, ৫০৬।

১৯। আবদুল হক চৌধুরী, *বন্দর শহর চট্টগ্রাম*, ঢাকা ১৯৯৪, পৃ. ১৫২-১৫৩।

২০। এফ. স্টেইঙ্গাস্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৮।

২১। "আমাদের দেশে সাধারণত বড় বড় নৌকাদি যে ভাবে প্রস্তুত হয়, ইহাও সেই প্রকরণেই প্রস্তুত হইয়াছে। বড় বড় গাছের ঠেক্না দিয়ে জাহাজকে খাড়া রাখা হইয়াছিল। কোন ডক কারখানা হইতে জাহাজাদি জলে ভাসান যেমন সহজ, ইহা তেমন সহজ বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য বেলা ৩টার সময় কর্ণফুলী পূর্ণ জোয়ারে ভরিয়া উঠিলে মিস্ত্রিরা ক্রমে ক্রমে সবগুলি ঠেক্না ফেলিয়া দিতে লাগিল। লোকে মনে ভাবিল এত বড় জাহাজ ঠেকনা ছাড়া কেমন করিয়া থাকিবে—এক দিকে হেলিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু তাহা হইল না।

মিস্ত্রিরা জাহাজের তলা হইতে দুইখানা খুব পালিশ লম্বা তক্তা ঢালু ভাবে নদীর ধার পর্যন্ত সাজাইয়া রাখিয়াছিল এবং তাহার ঠিক সমভাবে দুইখানা চৌকা গাছ পালিশ করিয়া জাহাজের দৈর্ঘ্যের সমানে বড় বড় কড়া সংযোগে দড়ি দিয়া জাহাজের তলার দুই পার্শ্বে বাঁধিয়া দিয়াছিল। এই কাঠপাতগুলি এমনি ভাবে কুলুপ করা ছিল যে একটি অন্যটির উপর দিয়া পিছলাইয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু এপাশে ওপাশে সরিয়া যাইতে পারিবে না। উক্ত তক্তা ও গাছগুলিকে চর্ব্বি দ্বারা অত্যন্ত পিচ্ছল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে এমন একটি কৌশলপূর্ণ কাষ্ঠনির্মিত চাবি ছিল যে বিনা ঠেকনায়ও জাহাজ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। ডাক্তার গোরলে ও তাহার পত্নী দুইটি দুগ্ধপূর্ণ বোতল জাহাজের অগ্রভাগে (গলুই) ভাঙিয়া দিবামাত্র প্রধান মিস্ত্রি একটি হাতুড়ির আঘাতে উক্ত চাবি ভাঙ্গিয়া দিল এবং এক মিনিটের মধ্যে জাহাজ যাইয়া জলে পড়িল, — যেন একটি উড়ন্ত চিল মৎস্য-লোভে যাইয়া জলে ছোঁ মারিল।"

মোহিনীমোহন দাস, "চট্টগ্রামে জাহাজ নির্ম্মাণ", *প্রবাসী,* ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২১, পৃ. ৫৯২-৫৯৫।

২২। তদেব।

২৩। তপন রায়চৌধুরী এবং ইরফান হাবিব (সম্পা), প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৩০।

২৪। এম. পি. সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

২৫। ঐ, পৃ. ৩৩২।

২৬। রিচার্ড এম. ইটন, *দি রাইজ অব ইসলাম অ্যান্ড দি বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার,* ১২০৪ - ১৭৬০ দিল্লী, ১৯৯৪, পৃ. ২৩৫।

২৭। এস. এম. ইমামুদ্দিন, "বেঙ্গলস মেরিটাইম ট্রেড উইথ দ্য ফার ইস্ট আপটু দ্য সুলতানেত পিরিয়ড", *জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ,* খণ্ড ১৭, সংখ্যা ১, জুন ১৯৮২, প. ১৬।

২৮। দীনেশচন্দ্র সেন (সং ও সম্পা), *ইস্টার্ন বেঙ্গল বেলাড্‌স,* খণ্ড ৩, অংশ ১, কলকাতা ১৯২৮, পৃ. XI.

২৯। ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, *অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দ্য মেরিটাইম হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া,* কলকাতা ১৯৯৪, পৃ ১০২।

৩০। দীনেশ সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-১০৬, চট্টগামের লোকসংস্কৃতি সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী এই কাহিনীটি সংগ্রহ করেন। তাঁর জীবন চরিতের জন্য দেখুন: মাহবুবুল হক, *আশুতোষ চৌধুরী,* ঢাকা ১৯৯৪। ভেলুয়ার বাংলা সংস্করণের জন্য দেখুন: মোমেন চৌধুরী (সম্পা), *আশুতোষ চৌধুরীর রচনা ও সংগ্রহ সম্ভার,* ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ১১৭-১৪৬।

৩১। দীনেশ সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭। সুলতানী আমলে চট্টগ্রামের দক্ষিণ সীমানা ছিল প্রায়ই কর্ণফুলী নদীর তীর ঘেসে। হোসেন শাহী আমলের শেষ দিকে আরাকানিরা তাদের দিকে বেশ তৎপরতা দেখায়। সুতরাং এই লোক কাহিনীকে নসরত শাহের আমলের বলে সনাক্ত করা দুষ্কর।

৩২। ঐ, পৃ. ৫৩।

৩৩। ঐ, পৃ. ৬৬।

৩৪। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স্, পৃ. ৩০-৩১ (জিও কোডস ২১ ১৫০, ৩৪ ৯২১ এবং ৩৫ ০৩৬)।

৩৫। এল. এস. এস. ওমেলি, *ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার : চিটাগং,* কলকাতা ১৯০৮, পৃ. ২।

৩৬। ইমামুদ্দিন, পৃ. ১৭, ইরফান হাবিব, *অ্যান এটলাস অব দ্য মুঘল এম্পায়ার,* দিল্লী ১৯৮২, সিট নাম্বার : ১১বি।

৩৭। 'চাটিগাম' স্থান নামটি একটি বড় নদীর পশ্চিম তীরে মোহনার মুখে দেখতে পাওয়া যায়। দেখুন : আবদুল করিম, "সমন্দর অব দি এরাব জিওগ্রাফার্স", প্রাগুক্ত।

৩৮। জে. জে. এ. ক্যাম্পস, প্রাগুক্ত পৃ. ৩০-৪০।

৩৯। যদুনাথ সরকার, "দি কনকোয়েস্ট অব চাটগাঁও, ১৬৬৬ এডি", *জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল,* ন্যুমিসম্যাটিক সাপ্লিমেন্ট ৩, সংখ্যা ৬, জুন ১৯০৭, পৃ. ৪০৬।

৪০। তদেব, পৃ. ৪১৪।

৪১। আবুল ফজল আল্লামি, *আইন-ই আকবরি,* খণ্ড ২)পুনর্মুদ্রণ), নিউ দিল্লী ১৯৭৭-৭৮, পৃ. ১৫২।

৪২। বলদেও সহায়, *ইন্ডিয়ান সিপিং : এ হিস্টোরিকাল সার্ভে,* নিউ দিল্লী, ১৯৯৬, পৃ. ১৬৬।

৪৩। তদেব, পৃ. ১৫৮

৪৪। জি. ই. হার্ভে, *হিস্ট্রি অব বার্মা, লন্ডন,* ১৯২৫, পৃ. ১৪০।

৪৫। আবদুল করিম, *করপাস অব দি মুসলিম কয়েনস্ অব বেঙ্গল* (ডাউন টু এডি ১৫৩৮), ঢাকা, ১৯৬০, পৃ. ২৬১, মুর্তজা বশীর, "চাটগাঁও : মিডিইভাল মিন্ট-টাউন অব বেঙ্গল", *জার্নাল অব দ্য ন্যুমিসমেটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া,* খণ্ড ৫২, সংখ্যা ১ ও ২, ১৯৯০, এম. পি. সিংহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৪৪।

শাহজাহান পুত্র শাহসুজা ও মেদিনীপুর

রাজর্ষি মহাপাত্র

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে শেষ আফগান শাসক দায়ুদখান কররাণীর পরাজয় ও নিধনের পর বাংলাদেশে মুঘল সম্রাটের অধিকার প্রবর্তিত হয়। পরে উড়িষ্যায় মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে পোর্তুগীজদের সঙ্গে সংঘর্ষের কথা বাদ দিলে বাংলাদেশে মুঘল শাসন একরকম শান্তিতেই পরিচালিত হয়েছিল।[১]

সম্রাট শাহাজাহানের আমলে কাসিমখানের মৃত্যুর পর আজিমখান (১৬৩২-১৬৩৭) বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। তবে বাংলার সুবাদাবী চালানোর মত যোগ্যতা আজিমখানের ছিলনা। যে কারণে সম্রাট তাঁকে পদচ্যুত করেন। এরপর শাহাজাদা শাহাসুজা যখন বাংলার শাসনভার (১৬৩৯) গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৪।[২]

সুজা বাংলার শাসক নিযুক্ত হয়ে এলেও সে সময় উড়িষ্যাও তাঁরই কর্তৃত্বাধীনে ছিল। আর সুবা উড়িষ্যার মধ্যে মেদিনীপুরের অধিকাংশই বিশেষকরে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুঘল সম্রাট আকবরের দেওয়ান টোডরমল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাকে কয়েকটি সরকারে ও প্রতিটি সরকারকে কয়েকটি মহালে বিভক্ত করেন। উড়িষ্যার ৫টি সরকারের মধ্যে জলেশ্বর সরকার ছিল অন্যতম। সরকার জলেশ্বরের ২৮টি মহালের মধ্যে অন্তত ২৩/২৪ টি মহাল ছিল জলেশ্বর সংলগ্ন মেদিনীপুর জেলায়। এরপর শাহজাহানের রাজত্বকালে বাংলার শাসনকর্তা সম্রাটের দ্বিতীয়পুত্র শাহাসুজার সময় উড়িষ্যাও তাঁর অধীন ছিল এবং ১৬৪৬-৫৮ সময়কালে সরকার জলেশ্ববকে উড়িষ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। জলেশ্বর সরকারকেও ৬টি ক্ষুদ্রায়ন সরকার এ বিভক্ত করা হয়। এদের মধ্যে সমগ্র মালঝিটা (নিমক মহাল) এবং মুজকরি ও জলেশ্বর সরকারের কিছু অংশ বর্তমানের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অন্তর্গত ছিল। এই সময়কার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার প্রশাসনিক অবস্থান সম্পর্কে 'মেদিনীপুর ইতিহাস প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসুর বক্তব্য ঃ ''এগরা ও রামনগর থানা দুটি ছাড়া কাঁথি মহকুমার অবশিষ্টাংশে সরকার মালাঝিটার, রামনগর ও বালেশ্বর জেলাব কিছুটা অংশ সরকার মুজকুরির এবং দাঁতন ও এগরা থানা আর বালেশ্বর জেলার কতকাংশ জলেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩]

টোডরমলের রাজস্ব বন্দোবস্ত অনুয়ায়ী "সুবে বাংলা" ১৯ সরকার এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হয়েছিল। এই বন্দোবস্তের নাম ছিল "আসল জমা তুমার"। শাহজাহানের রাজত্বকালে যখন সুজা বাংলার সুবেদারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজা টোডরমলের বন্দোবস্তের সংশোধন করে "সংশোধিত জমা তুমার" প্রস্তুত করেছিলেন, যার ফলে বাংলাদেশে অতিরিক্ত ১৫ সরকার ও ৬৬৮ পরগণায় বিভক্ত হয়ে ২৪,২২,৭৫৫৲ টাকা জমাবৃদ্ধি পেয়ে টাকশাল প্রভৃতির আয়সহ মোট জমার অঙ্ক হয়েছিল অনেক বেশি। অবশ্য শাহসুজার সুবেদারীকালে উড়িষ্যা থেকে কতক ভূভাগ খারিজ করে বাংলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ফলে বাংলার ভূভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তাই অতিরিক্ত জমার অঙ্ক সম্ভব হয়েছিল। অধিকন্তু টাকশাল প্রভৃতির আয়ও (৩,২১,২২২৲ টাকা) তার সঙ্গে সংযোজিত ছিল।[৪]

হিজলী চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সুজার প্রশাসনিক বিভাগের সমগ্র সরকার মালঝিটা এবং সরকার মুজকুরি ও সরকার জলেশ্বরের কিছু অংশ। সরকার মুজকুরির ও সরকার জলেশ্বরের অবশিষ্ট অংশ মেদিনীপুর চাকলায় আসে। ঝাড়গাম মহকুমার দক্ষিণ প্রান্তিক বর্তমানের গোপীবল্লভপুর, শাঁকরাইল ও নয়াগ্রাম থানা শাহসুজার আমল থেকে ঝাড়খণ্ডের অংশ। তবে প্রধানত পোর্তুগীজ ও আরকানি জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে উপকূল ভূমিকে রক্ষার জন্য এই প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল।[৫]

টোডরমলের সময়ের সরকার ও মহালগুলি ভাঙ্গা-গড়া করে সুজা কতগুলি ক্ষুদ্রতর সরকার ও মহালের সৃষ্টি করেন। এর ফলে এদেশের জমিদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার কোন কোন জমিদারের অধিকারে একাধিক মহালও ছিল দেখা যায়। সে সময় সাধারণত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহালের অধিকারীগণ চৌধুরী বা তালুকদার আখ্যায় এবং বড় বড় মহালের আধিকারীগণ রাজা বা জমিদার নামে অভিহিত হতেন। সুজার এই নতুন রাজস্ব বন্দোবস্তে যে সব জমিদার বংশের অভ্যুদয় হয়েছিল তাদের কয়েকজনের বংশ এখনও হয়তো আছে।[৬]

১৬৩৯ খিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশের দায়িত্ব যখন যুবরাজ সুজার হাতে ন্যস্ত ছিল, সেই সময় মহিষাদলে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের রায়চৌধুরী বংশীয় কল্যাণ রায়চৌধুরী নামে কোন এক রাজা রাজত্ব করতেন। যুবরাজ সুজার রাজত্বকালে তাঁর রাজস্ব খতিয়ানে মহিষাদল সরকার মালঝিটার অন্তর্গত ছিল। তখন হিজলী মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাজ খাঁ। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি তখন যথেষ্ট ছিল। ঐ সময়ে জনার্দন উপাধ্যায় নামে এক কনৌজ ব্রাহ্মণ গেঁওখালি আসেন ও একটি নতুন এলাকার পত্তনীর জন্য নবাব দরবারে সনদ পেয়ে সম্ভবত গেঁওখালির দক্ষিণাংশের জমিদারি লাভ করেন। এই বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা তিনি জনপদে পরিণত করেন। ঐ সময় কল্যাণ রায়চৌধুরী মহিষাদল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৭]

শাহাজাদা সুজার শাসনকালে শান্তি বজায় থাকলেও লোকের স্বস্তি ছিল না। তাঁর ভয়ে অভিজাতদের মধ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেয় নি।

মেদিনীপুরের সেই সময়ে উড়িষ্যার অধীন হিজলীর জমিদারের দৃষ্টান্ত থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বাহাদুর খাঁ ছিলেন হিজলীর জমিদার। তাঁর জমিদারি রূপনারায়ণ থেকে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। বাহাদুর খাঁর জমিদারি তখন ভৌগোলিক দিক দিয়ে উড়িষ্যার অধীন থাকায় তিনি বাংলার শাসনকর্তাকে অমান্য করে চলতেন। কিন্তু ১৬৫১ খিস্টাব্দে সুজাকে যখন বাংলার শাসনপদের সঙ্গে উড়িষ্যারও শাসনকর্তা নিয়োগ করা হল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাহাদুর খাঁর বাৎসরিক কর বাড়িয়ে দিলেন। বাহাদুর খাঁ এই কর দিতে বিলম্ব করলে সুজা উড়িষ্যায় তাঁর সরকারি শাসক জানবেককে হিজলীর জমিদারকে বন্দী করতে আদেশ দিলেন এবং হিজলী অধিকার করবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন। বাহাদুর খাঁকে বন্দীকরে কারাগারে রাখা হয়। কিন্তু ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের মৃত্যুর পূর্বেই উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব শুরু হলে বাহাদুর খাঁ পালিয়ে গিয়ে নিজের জমিদারি পুনর্দখল করেছিলেন। পরে মীরজুমলা আবার তাঁকে পরাস্ত করেন।[৮] শাহজাহানের দরবারী ঐতিহাসিক ওয়ারিসের লেখাযও এর সমর্থন পাওয়া যায়।[৯]

শাহজাহান সুজাকে একটা উপদেশ দিয়েছিলেন যা থেকে মনে করা যায় যে মেদিনীপুর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সম্রাট পুত্রকে রাজমহল থেকে মাঝে মাঝে বর্ধমান, মেদিনীপুর পর্যন্ত সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। মেদিনীপুর যেহেতু উড়িষ্যার সীমান্ত শহর সেইজন্য তিনি সেখানকার হিসাবপত্র নেবেন এবং মেদিনীপুর সম্পর্কে যথাসম্ভব সংবাদ আহরণ করবেন। অর্থাৎ সেখানকার তাঁর অধীনস্ত কর্মচারীদের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করতে শাহাজাহান সুজাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে প্রথমে মেদিনীপুর থেকে জাহানাবাদ (আরামবাগ) এবং সেখান থেকে হুগলীর সাতগাঁও এবং মুকসুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) হয়ে রাজধানী রাজমহলে ফিরতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১০] এতে সুজার দেশ ও জনগণের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের সুযোগ পাবেন।[১১]

বেশকয়েকবছর যোগ্যতার সঙ্গে শাসন পরিচালনা করলেও হঠাৎ সম্রাট শাহজাহান বাংলায় শাহসুজার প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে তাঁকে বাংলার শাসনভার ইতকাদ খানের হাতে সমর্পণ করতে আদেশ দিলেন। শাহসুজা বাংলা ছেড়ে লাহোরে গেলেন। সম্রাটও তখন লাহোরে ছিলেন। সুজাকে তিনি কাবুলের শাসকপদে নিযুক্ত করলে, সুজা কাবুল পছন্দ না হলেও দু বছর সেখানে কাটিয়ে শাহসুজা পুনরায় বাংলায় ফিরে এলেন।[১২]

সপ্তদশ শতকের শুরুতে সুবা বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যান্য সুবার মতই একজন সুবাদারের দ্বারা শাসিত হত। তাঁকে সাহায্য করতেন দেওয়ান। সমগ্র শাসন ব্যবস্থা যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হত তাতে সুবার সাধারণ মানুষের অবস্থা খুব একটা ভাল ছিলনা। সপ্তদশ শতকের গোড়ায় লেখা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল[১৩] এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিবরণী বিশেষকরে সেবাষ্টিয়ান ম্যানরিক, মীর্জানাথান এবং শিহাবুদ্দীন তালিশের লেখা উপরোক্ত মন্তব্যের স্বপক্ষে উদ্ধৃত করা যায়।[১৪]

১৬৫৭ খিস্টাব্দের শেষভাগে শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লাভের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এই দ্বন্দ্বে শাহসুজাও লিপ্ত হন। তিনি বাংলা থেকে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু বারাণসীতে দারাশিকোর পুত্রের হাতে পরাজিত হয়ে বাংলাতে ফিরে এলেন। ধর্মাঠ ও শামুগড়ের যুদ্ধে দারাশিকোর পরাজয়ের সংবাদে উল্লসিত হয়ে সুজা পুনরায় আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হলেন। কিন্তু এলাহাবাদের অদূরে খাজুয়ার যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেন (১৬৫৯ খ্রি:)। মীরজুমলা সুজার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। সুজা পাটনা, ভাগলপুর ও রাজমহল অতিক্রম করে চট্টগ্রামের পথে আরাকানে উপস্থিত হলেন। ঔরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ সেনাপতি মীরজুমলার সঙ্গে বিবাদের ফলে শাহসুজার সঙ্গে যোগ দেন।[১৫]

ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাংলায় ফিরে এসে আরকানের দিকে পলায়ন করেন। আরাকানে সপরিবারে তিনি নিহত হন। হুগলী তমলুক ও নোয়াখালির সেনাগণ ও পর্তুগীজ গোলন্দাজরা তাঁকে সাহায্য করলেও, পরাজিত হয়ে তিনি আরাকানের দিকে পলায়ন করেন।[১৬]

১৬৫৮ ও ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে দুবার বাংলাদেশ সাময়িকভাবে ত্যাগ করলে সেই সুযোগে প্রাদেশিক প্রশাসন ভেঙে পড়ে ও অরাজকতার সূত্রপাত হয়। শেষ পর্যন্ত সুজার সাথে যোগদানের অপরাধে শাহজাদা মুহম্মদ যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হলেন। ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে হত্যা করা হয় বলে বলা হয়। সুজার পলায়নের পর মীরজুমলা বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন (১৬৬০ খ্রি:)।[১৭]

সুজামুঠা পরগণা, সুজাগঞ্জ মহকুমা, কসবা নারায়ণ গড়ের মসজিদ শাহসুজার স্মৃতি বিজড়িত। নারায়ণগড়ের পালরাজাদের সঙ্গে খুররম্ (পরে সম্রাট শাহজাহান) ও শাহসুজার সম্প্রীতি ছিল। শাহসুজা বাংলায় সতেরো বছর সুবাদারী করেন। তাঁর শাসনকালেই ইংরাজ ডাক্তার বৌট্নের কূটবুদ্ধিতে ইংরেজ কোম্পানি বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকা পেস্কাস দিয়ে বিনা মাশুলে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি পেয়েছিল।[১৮]

শাহাসুজা চব্বিশ বছর বয়সে বাংলার যখন শাসনভার গ্রহণ করেন। অল্প বয়সে অপরিমিত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তিনি তা অপব্যবহার করেন যা কতটা দুর্ভাগ্যবশতও

হয়েছিল।[১৯] অবশ্য সুজা বাংলায় খুব বেশিদিন সুখী ছিলেন না, যদিও তিনি এখানে খুবই আলস্যে ও আমোদ প্রমোদের মধ্যে দিন কাটাতেন। একই সঙ্গে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন।[২০]

মুর্শিদকুলী খাঁনের আগে শাহসুজার সঙ্গে মেদিনীপুরের যোগাযোগের ফলে আঞ্চলিক উন্নতি কিছু লক্ষ্য করা যায়। মদ, অহিফেন সেবন ইত্যাদির ফলে ও দিল্লীর রাজনীতি থেকে দূরে থাকার ফলে যতটা উন্নতি হওয়া সম্ভব ছিল তা হয়নি।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। যদুনাথ সরকার, *হিস্ট্রি অফ্ বেঙ্গল*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮, পৃ. ১৯৬, ২৮৮।

২। গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায়, *দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), মেদিনীপুর, ১৯৮৬, পৃ. ১৮৩-১৮৪।

৩। যোগেশচন্দ্র বসু, *মেদিনীপুরের ইতিহাস* (২য় সংস্করণ), কলকাতা ১৩৪৬, পৃ. ১১, ১৯।

৪। নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস*, কলকাতা, ১৩৬১, পৃ. ৫০, কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, মধ্যযুগে বাঙ্গলা, কলকাতা (দেজ সংস্করণ), ২০০২, পৃ. ১২১, ১২২।

৫। বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি, *দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত* বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি, দাঁতন (মেদিনীপুর), ১৯৯০, পৃ. ৩৬।

৬। বসু, তদেব, পৃ. ১৮৯-১৯০।

৭। বিষ্ণুহরি জানা, *ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে হলদিয়া*, নন্দীগ্রাম (মেদিনীপুর), ১৯৮৭, পৃ. ১০৩-১০৪।

৮। কিরণচন্দ্র চৌধুরী, *দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গেব ইতিহাস কথা*, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১৫৪।

৯। কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, *দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৭৩।

১০। চৌধুরী, *তদেব*, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

১১। সেনগুপ্ত, *তদেব*, পৃ. ৭৪।

১২। চট্টোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ১৮৫

১৩। সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* — ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ৩৬৮, অধ্যাপক সেনের মতে কাব্যগ্রন্থটি লেখা হয়েছিল১৫৭৩ থেকে ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

১৪। শ্যামাপ্রসাদ বসু, *অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী*, মেদিনীপুর, ১৯৯৫, পৃ. ১।

১৫। চট্টোপাধ্যায়, *তদেব*।

১৬। সেনগুপ্ত, তদেব, পৃ. ৭২

১৭। চৌধুরী, *তদেব*, পৃ. ১৫৩-১৫৪।

১৮। প্রবোধচন্দ্র বসু, *এই আমাদের কাঁথি*, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ২৪, ২৫।

১৯। চট্টোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ১৮৪।

২০। সেনগুপ্ত, *তদেব*, পৃ. ৭৪।

সারাংশ

মধ্যযুগের হাবড়া

শংকর রঞ্জন মজুমদার

মধ্যযুগের হাবড়ার বিষয়ে আলোচনা প্রকৃতপক্ষে হাবড়ার ধারাবাহিক ইতিহাসের সূচনা। এখানে যে সব লক্ষ্মী ও বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে তা নিঃসন্দেহে পাল, সেন যুগের। তবে শুরুরও শুরু আছে, এবং এই শুরুটাই হল হাবড়ার নব্য প্রস্তর যুগ ও আদি যুগ।

এখানে জানাফুল মৌজার শানপুকুর অঞ্চল এবং বাঁশপুল মৌজায় যে সব খন্ডিত ও অখন্ড মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে তা নূতন প্রস্তর যুগের।[১]

যে পাথুরে এবং ব্রোঞ্জ মূর্তিসমূহ এখানে পাওয়া গেছে তার পূজাকারী লোকেরা এখানে এসেছিল ভাগীরথীর শাখা নদী যমুনাও, যমুনার শাখা নদী পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চলে। তার আগে যে জনতা এখানে ছিল তারা কৃষিকার্য এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য এখানে জনবসতি গড়ে তুলেছিল। এটা প্রাক্ মৌর্য শাসন ব্যবস্থার সময়। মৌর্য শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যে নগরায়ন পর্ব শুরু হয় তখন এ অঞ্চলে এল বাইরের বাণিজ্য দ্রব্য, বণিককূল ও কারিগরী এবং শিল্পীর দল। ফলে গ্রামীণ পরিমন্ডলে বহিরাগত বা আর্য সংস্কৃতির প্রভাব পড়ল।[২]

মধ্যযুগের প্রথম পর্বের আরেকটি ও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা হল 'হাবড়া' স্থান নামের উৎপত্তি। পঞ্চম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে।[৩]

এখানে যে পীরের থানগুলি দেখা যায় তা মুলত এই অঞ্চলে ইসলাম আগমনের অন্যতম কথা। অন্ত মধ্যযুগের এই অঞ্চলে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ। মানসিংহ এই অভিযানে এখানকার জাতীয় সড়ক যশোহর রোড মতান্তরে গৌড়বঙ্গ রোড ধরে এগিয়েছিলেন।[৪]

এক অর্থে আঞ্চলিক ইতিহাস হল সাহিত্যের গথিক আর্ট বা মূল কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত জাতীয় ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে চলে।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় - লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প - কলকাতা ১৯৯৯, পৃ. ১৩

২। তদেব, পৃ. ১৮-১৯।

৩। শংকর রঞ্জন মজুমদার — হাবড়া স্থান নাম ও কয়েকটি তথ্য-হাবড়া ২০০১।

৪। সতীশচন্দ্র মিত্র — যশোহর খুলনার ইতিহাস (২য়) ২০০১, কলকাতা, পৃ. ৭৩২।

নারায়ণ পাল ---- পুরাতত্ত্বে নাংলাবিলের এপার ওপার, হাবড়া, ১৯৯৮

গৌরীশংকর দে — হাবড়ার কথা, হাবড়া ১৯৭৬, পৃ. ৩।

বিদ্যুৎপ্রভা — আদি মধ্যযুগের এক আশ্চর্য নারী

মল্লিকা ব্যানার্জী

কিছুদিন আগেও প্রাচীন ভারত বলতে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক সময়কে ধরা হ'ত— ১৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ অব্দি ছিল তার ব্যাপ্তি, সাম্প্রতিক কালে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে, যুগ বিভাজনে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সময়কে (১) প্রাক ঐতিহাসিক যুগ (২) প্রাচীন যুগ, (৩) আদি মধ্যযুগ, এই ভাবে ভাগ করা হয়।

আদি মধ্যযুগ প্রাচীন ভারত ও মধ্যযুগের ভারতের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ। কিন্তু তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না; তবুও অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেক বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের জন্য আদি মধ্যযুগের চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রামশরণ শর্মার "ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের" নাম সহজেই মনে পড়ে যায় সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক দিকটি নিয়ে নানা রকম বিতর্ক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু সামন্ততন্ত্রের সামাজিক দিকটি নিয়ে কম আলোচনা করা হয়েছে; বিশেষ করে আদি মধ্যযুগে মেয়েদের সামাজিক অবস্থান কি রকম ছিল বর্ণভেদ বিজড়িত সমাজ ব্যবস্থায় নারী এবং শূদ্ররা ছিল অধিকার হীন পর নির্ভরশীল একটি সম্প্রদায়। সমাজের শীর্ষে অবস্থান ছিল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের যাদের সহজেই অধিকার ভোগী শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। বর্ণের পবিত্রতা সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত্ত করার জন্যে মেয়েদের জন্য বাল্যবিবাহ ছিল সুনির্দিষ্ট। এর অন্যথা হবার উপায় ছিল না এবং কোন কারণেই এই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার উপায় ছিল না। মাতা ভগিনী, কন্যা হিসাবে শতস্নেহ ভালবাসা পাওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের মনুর অনুশাসনের ফলে কোনো স্বাধীন সত্তা ছিল না। পরিবারের পুরুষ সদস্যদের পরিচয়ে তার পরিচয়, তার নিজস্ব কোন পরিচয় নেই, অস্তিত্বহীনতার লজ্জা মেয়েদের অন্তরকে কোন পীড়া দিত না, কারণ (১) বিদ্যাচর্চার অভাব, (২) পরিবারের বৃত্তের বাইরে মেয়েদের বিশেষ যাতায়াত ছিল না।

সার্বিক অন্ধকার যেখানে বিধি নির্দিষ্ট — সেখানে হলায়ুধের সেখ শুভদয়া'তে আমরা বিদ্যুৎপ্রভার মত এক আশ্চর্য নারীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। বিদ্যুৎপ্রভার পরিচয় হচ্ছে যে সে গাঙ্গোনর্ব নামে একটি পর্বেব পুত্রবধু এবং জয় নামক অপর একটি পর্বের স্ত্রী, ফলত সেও একজন নারী, কিন্তু সে নারীর সামাজিক অবমাননাকে

অস্বীকার করে এবং পুরুষদের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে লজ্জা বোধ করে না, গঙ্গাতে সে পারদর্শিনী; বিভিন্ন রাগ রাগিনীর উপর তার স্বচ্ছন্দ অধিকার, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে রাজপুরুষদের ভোগ ও লালসার শিকার হতে হয়, কিন্তু বিদ্যুৎপ্রভা প্রকাশ্যে যারা তাকে ভোগ করছে অথচ যথার্থ মূল্য দেয় নি নির্ভয়ে তাদের চিহ্নিত করে সামাজিক অবক্ষয় ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় দুর্ভোগ ডেকে আনবে এই ভবিষ্যৎ বাণী করে।

"যত্র রাজা চ মন্ত্রীত্র দ্বাবপি পরদায়িক
তস্যরাষ্ট্র বিনাশ: স্যাৎ সংশয়ো নাত্র বিদ্যতে"

যে রাষ্ট্রে রাজা এবং মন্ত্রী দুজনেই পরদারিক সেই রাষ্ট্রের বিনাশ ঘটবে তাতে কোন সংশয় নেই, তার ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল কারণ, বক্তিয়ার খিলজীর আক্রমণে সেন রাজ্যের পতনের কাহিনী আমাদের সকলের কাছেই পরিচিত।

বাঁকুড়ার ডিহর গ্রামের ষাঁড়েশ্বর মন্দির ও শিবপূজা

অমিয় কুমার বাউল

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর প্রাচীন মন্দির ও স্থাপত্য শিল্পের জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত। প্রাচীন ও মধ্য যুগীয় বহু মন্দির বিষ্ণুপুরের পাশাপাশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাই বিষ্ণুপুরকে মন্দিরনগরীও বলা হয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথা প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণায় বার বার বিষ্ণুপুরের প্রাচীন মন্দির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরের পাশ্ববর্তী প্রাচীন গ্রাম ডিহরে কয়েক শতাব্দী পুরানো ষাঁড়েশ্বর মন্দির সেই অর্থে এখনো প্রচারের আলো পায়নি। অথচ স্থানীয় এলাকায় মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে কাহিনী কিংবদন্তীর ছড়াছড়ি, সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রাচীন ইতিহাস।

এই ষাঁড়েশ্বর মন্দিরটি ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে পৃথ্বীমল্লের সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। ল্যাটেরাইট প্রস্তরে নির্মিত ত্রিরথ এই মন্দিরে উড়িষ্যার রেখ দেউলের সাদৃশ্য প্রতিফলিত। এর প্রবেশপথে খিলানের কারুকার্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মূল মন্দিরটি আসলে শিব মন্দির। প্রায় দু ফুট উঁচু, আটত্রিশ ফুট পাঁচ ইঞ্চি বাই ছত্রিশ ফুট ন ইঞ্চি বেদীর উপর গড়ে উঠেছে মূল মন্দিরটি। মন্দিরের বাইরে বাইরে মাপ হল বাইশ ফুট দশ ইঞ্চি বাই বাইশ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। আর ভিতরের মাপ ন-ফুট চার ইঞ্চি বাই ন-ফুট এক ইঞ্চি। বেদীসহ মন্দিরটির উচ্চতা ত্রিশ ফুট ছ ইঞ্চি। মন্দিরের গায়েই লাগানো রয়েছে লোহার সিঁড়ি। মন্দিরের কিন্তু কোন চূড়া নেই। কেউ কেউ বলেন চূড়াটি কালের প্রকোপে ভেঙে পড়েছে। আবার অনেকের মুখেই শোনা যায় অপর একটি কাহিনী। এই মন্দিরটি একরাত্রে তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল তৎকালীন

বিষ্ণুপুররাজের। কিন্তু চূড়া নির্মিত হওয়ার আগেই ভোর হয়ে যায়। তাই চূড়া তৈরি হয়নি। যদিও যুক্তির খাতিরে কারণগুলি বিশ্বাস করা কঠিন। যাই হোক চূড়া তৈরির ব্যাপারে মহারাজ পৃথ্বীমল্লের রাজকোষে অর্থাভাব নাকি উদ্যমহীনতা তা সঠিক বলা কঠিন। মন্দিরের অভ্যন্তরে কোন কারুকার্য না থাকলেও বাইরে মন্দিরগাত্রে খোদাই করা আছে নানা মূর্তির ভগ্নাংশের সূক্ষ্ম কারুকার্য। মন্দিরের অভ্যন্তরে একচল্লিশ ইঞ্চি বাই তিপান্ন ইঞ্চির গৌরীপট্ট সংযুক্ত ছাব্বিশ ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট আট ইঞ্চি উচ্চ কালো পাথরের শিবলিঙ্গ ইনিই হলেন ভক্তবৎসল বাবা ষাঁড়েশ্বর। এই বাবাকে কেউ বলেন 'ষন্ডেশ্বর' কেউ বলেন 'ষাঁড়েশ্বর', কেউ বলেন 'সারেশ্বর' আবার কেউ বা আদর করে 'বুড়ো' বলে ডাকেন।

এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে পন্ডিত মহলে মতদ্বৈত রয়েছে। প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়ের মতে এই মন্দির খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত হয়েছিল। অন্যপক্ষে ডি. বি. স্পুনার ও শিবদাস ভট্টাচার্য নামক দুই পন্ডিতের ধারণায় পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়। শিবদাস ভট্টাচার্য মল্লরাজ বংশীয়দের কুলপঞ্জী ঘেঁটে প্রমাণ করেছেন যে মল্লরাজ পৃথ্বীমল্ল কর্তৃক ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে নির্মিত হয়েছিল (প: বাংলার তীর্থ - ২৪০ পাতা)।

ষাঁড়েশ্বরের প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ফকির নারায়ণ কর্মকার তার 'বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী' পুস্তকে বলেছেন "বিষ্ণুপুর বাজবংশের সপ্তত্রিংশ রাজা পৃথ্বিমল্ল খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ৬০৬ মল্লাদে প্রতিষ্ঠা করেন উক্ত শিব ও শ্রীমন্দির"।

ষাঁড়েশ্বর মন্দিরের অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গের পিছনের দিকে পূর্ব দেওয়াল বরাবর দেবতা সেজে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নতুন ও পুরানো মডেলের বৃহদাকার টেরাকোটার হাতি ঘোড়ার দল। এদের মধ্যে গণেশ ঠাকুর, কালভৈরব, অষ্টধাতুনির্মিত বটুক ভৈরব প্রভৃতি সাজানো রয়েছে।

শ্রদ্ধেয় অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'বাঁকুড়ার মন্দির' পুস্তকে লিখেছেন "ষাঁড়েশ্বর মন্দির আদিতে ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু দেবালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি যাতে এটিকে অন্য ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। মল্লরাজাদের কুলপঞ্জীতে পৃথ্বীমল্লকে যে প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা যদি আংশিকভাবে সত্য হয় তাহলে প্রতিষ্ঠাকালীন বিগ্রহ শিব হওয়াই অধিকতর সম্ভব কেননা খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাঁকুড়ার ধর্মীয় ক্ষেত্র থেকে জৈন প্রভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়েছিল।" যদিও আজকের বদ্ধমূল ধারণা ষাঁড়েশ্বর শিবমন্দিরে জৈন প্রভাব বিদ্যমান।

এই ষাঁড়েশ্বর মন্দিরকে কেন্দ্র করে বছরের বিভিন্ন সময়ে ছোট বড় নানা মেলা

অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে 'গাজন মেলা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পৌষ সংক্রান্তিতে পূণ্য মকরস্নানের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপুর শহর এবং পাশাপাশি ১০-১৫ টা গ্রাম থেকে আবাল-বৃদ্ধ বণিতার শুভাগমন হয়। এদের মধ্যে থাকেন পূণ্যার্থী, দর্শনার্থী, ফেরিওয়ালা, ছোটো খাটো মাপের ব্যবসায়ী এবং ফলমূল ও সবজি বিক্রেতা। আবার তুষু, বারুনী প্রভৃতি মেলাও হয়ে থাকে। তবে সমস্ত মেলাগুলির মধ্যে 'গাজন মেলাটাই' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চারদিন ধরে এই মেলা হয়। এই মেলার আড়াই হাজারের (২৫০০) মত ভক্ত ও সেইসঙ্গে প্রায় ৮-১০ হাজারের মত দর্শনার্থীর ঠাসা ভিড় চোখে পড়ে।

তবে বাবা ষাঁড়েশ্বর মন্দিরকে কেন্দ্র করে এই রকম বহু মেলা হয়ে থাকে। সেইসঙ্গে বহু মানুষ আর্থিক ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে অনেক পর্যটক আসার ফলে এই মন্দিরের গুরুত্ব দিনের পর দিন বাড়তে চলেছে।

সন্দর্ভ পত্র

বর্ধমানের শেষ মধ্যযুগীয় কয়েকটি মন্দির ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়

দীপাঞ্জন দত্ত

বাংলায় মন্দিব অনেক প্রাচীনকাল থেকে তৈরি হওয়া শুরু হলেও বর্তমানে সেই প্রাচীন মন্দিরগুলি খুব কম ক্ষেত্রেই জীবিত। কালের গ্রাসে ও অন্যান্য কারণে সেই মন্দিরগুলি আজ লুপ্ত। বর্তমানে আমরা যে মন্দিরগুলি দেখতে পাই তার বেশির ভাগই মধ্যযুগের সৃষ্টি। এই প্রবন্ধে মধ্যযুগের শেষ পর্বের মন্দির প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল—তবে সমগ্র বাংলার ক্ষেত্রে নয়, শুধুমাত্র বর্ধমান জেলার কয়েকটি মন্দিরকে নিয়ে। বর্ধমান জেলার ঐতিহ্য আর পুরাকীর্তি-সমগ্র বর্ধমান জেলায় তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মন্দির নির্মাণে সাধারণত পাথর ও ইট প্রধান উপাদান। এর সঙ্গে যুক্ত হয় গঠন শৈলী, শিল্পীর মনন ইত্যাদি বিষয়গুলি। মন্দিরের গাত্র অলংকরণ অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই প্রবন্ধে বর্ধমানের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের কয়েকটি মন্দির নিয়ে এবং তার সঙ্গে সমসাময়িক সমাজ ও সংস্কৃতিকে আলোচনা করা হল। আলোচনার ভিত্তি তথ্য সূত্রের গ্রন্থগুলিও অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

রূপরেখায় উনিশ শতক ও বাঙালী মধ্যবিত্ত

অশোক মুস্তাফি

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আমাদের জাতীয় জীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঠিক স্থান ও ভূমিকা কী, তা নিয়ে যেমন একদিকে সংশয়, অন্যদিকে তেমনি বিতর্ক ঘনীভূত হয়েছে। যেটা বোঝা গেছে তা হল এই যে বিষয়টি শুধু চিত্তাকর্ষক নয় বরং পক্ষান্তরে বেশ জটিল ও বহুমাত্রিক। একে কেন্দ্র করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটুকু আলোচনা করা হয়েছে, তা শুধু খণ্ড বিক্ষিপ্ত নয় বরং স্থানে স্থানে প্রতি-সরলীকৃত।

সুখের বিষয় বাঙালী মধ্যবিত্তকে নিয়ে কিছু কিছু পথপ্রদর্শক স্থানীয় গ্রন্থের নাম বিদ্যোৎসাহী মহলে অল্পবিস্তর পরিচিত। যেমন বি. বি. মিশ্রর 'The Indian Middle Class', অতুল গুপ্ত সম্পাদিত 'Studies in Bengal Renaissance', বিনয় সরকারের 'নয়া বাংলার গোড়াপত্তন', বিনয় ঘোষের 'মেট্রোপলিটান মন ও মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ', ডঃ ভবতোষ দত্তর 'বাঙালী মধ্যবিত্তের তিন কাল', নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহর 'বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রথম পর্যায়', জে. এইচ. ব্রুমফিল্ডের 'Elite conflict in a plural society' এবং কে. এল. শর্মার 'Caste, Class and Social Movements'। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস-আশ্রয়ী মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক একটি পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দীর্ঘদিন আমরা সাগ্রহে অপেক্ষমান ছিলাম।

বাংলার নবজাগরণের মূলে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল, তা বহুলাংশে বণিক ইংরাজের সৃষ্টি এবং যার মেরুদণ্ড হল ছোট জমিদার বা চাকুরিজীবী শ্রেণী। এরা হল এক অর্থে এ দেশে শিল্পবিপ্লবের স্টেপ-চিল্ড্রেন। বস্তুত ভূমি নির্ভর অভিজাত ও নির্বিত্ত কৃষক শ্রমিকের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল এই শ্রেণীর অবস্থান। এই শ্রেণীর একটি সুস্পষ্ট মর্যাদা ও সচেতনতা ছিল, এ বিষয়ে ভুল নেই। মূলত বংশ, সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত কৃতিত্বকে আশ্রয় করে এই শ্রেণী নিজের মর্যাদা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়। এটা তো আজ অনস্বীকার্য যে বাংলার বুদ্ধিপ্রধান মধ্যবিত্তরা ছিলেন জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক সংস্কারের অগ্রদূত।

আমরা দেখছি যে, কালের বিবর্তনে মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা পালটেছে এবং সঠিক অর্থে সীমিত সংখ্যক শাহরিক মধ্যবিত্তের সংখ্যাও বেড়েছে। এটাও ঠিক যে, পরিবর্তনশীল ভারতীয় সমাজ ববস্থায় মধ্যবিত্তের অবস্থা ও অবস্থান পাল্টাচ্ছে এবং তার অস্তিত্বও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ছে। কালের নিয়মে এই বহু-কথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী অবলুপ্তপ্রায় কিনা তাও আমাদের খতিয়ে দেখার প্রয়োজন।

হাল আমলে একটি বৈধ তাত্ত্বিক প্রশ্ন হল বাঙালী মধ্যবিত্ত কি আর্থিক দিক দিয়ে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্রেণী অথবা নূতন সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন একটি গোষ্ঠী?

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সহায়ক একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করা ছিল ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এদেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো অথবা কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা ব্রিটিশ শাসকদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না। সেইকারণে এই নবোদ্ভূত শ্রেণী ছিল একটি খণ্ডিত শ্রেণী, যা কখনও পূর্ণতা পায়নি। তবুও ঠিক যে সীমিত ক্ষেত্রে বাঙালী মধ্যবিত্ত উনিশ ও বিশ শতকে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা কিছুটা পালন করতে সক্ষম হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, সে আমলের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এই শ্রেণীর আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছিল। কেননা দৃশ্যত এই শ্রেণী অভিজাতদের গুণগুলিকে আয়ত্ত করেছে, তাদের ত্রুটিগুলি থেকে অল্প বিস্তর মুক্ত হয়ে। বাঙালী মধ্যবিত্তের উদ্ভবকে ১৭৯৩ সালের ভূমিব্যবস্থা ও পরবর্তীকালের বাজার-ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত করা হয়ে থাকে।

অন্য পাশ্চাত্ত্য দেশের মতো অব্যাহতভাবে আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে না পারলেও, চরিত্রগতভাবে কিন্তু ছিল বরাবর সম্ভাবনাময়, মুখর ও সৃজনশীল। বস্তুত এই উদীয়মান মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চিন্তা তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবনা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট জায়গা জুড়ে রয়েছে। বাঙালী মধ্যবিত্তকে সম্পর্কিত করা যায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রবহমান সমাজ জীবনে, বিশেষ করে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে স্থাপিত করে দেখার চেষ্টাও করা সম্ভব এটা উচিৎ। বাস্তবিক, বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। এই আবির্ভাবের ফলশ্রুতি অন্তত কয়েকটি মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছিল যেমন যুক্তিনির্ভরতা, উদারনৈতিকতা, নিয়মতান্ত্রিকতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদিতা। একাধিক কারণে এই বাঙালী মধ্যবিত্ত উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী ছিলেন না, যদিও পরে পাশ্চাত্ত্য দুনিয়ার স্বাধীনতাস্পৃহা কতকাংশে এই শ্রেণীকে ব্রিটিশ বিরোধী করে তোলে। কালক্রমে মানসিকতার দিক থেকেও আমাদের এই সদ্যোজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণী একটি মিশ্র শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। একদা ব্রিটিশ শাসনের সহযোগী এই শ্রেণীটি ইতিহাসের একটি প্রতিবাদী শ্রেণীর চরিত্র অর্জন করে। অর্থাৎ দেশের মাটির সঙ্গে গোড়ায় নাড়ির টান অনুভব না করলেও, পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়ার ফলে এই শ্রেণী একটি ভিন্নতর হয়তো বা অনভিপ্রেত ভূমিকা গ্রহণ করে।

ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে নিঃসংশয়ে আমাদের মধ্যবিত্তশ্রেণী একটা অনুঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

যে প্রবণতার দিকে সাম্প্রতিককালে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তা হল সারা মধ্যবিত্তকরণের দিকে যা নাকি আসলে মধ্যবিত্তের প্রলেতারীয়করণের বিপরীত প্রক্রিয়া। এটা অবশ্য ঠিকই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বর্তমানে তার সমজাতীয় চারিত্র্য হারাচ্ছে এবং

জাতিগত আনুগত্য, ধর্ম এবং পেশাদারি স্বার্থ তাদের ঐক্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

বস্তুত ঠিক এই মুহূর্তে **Two-class model** তত্ত্ব প্রায় পরিত্যক্ত হতে চলেছে। শুধু এই নয়, ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশ নির্বিশেষে শ্রমিক আর ধনিকের একক কর্তৃত্ব প্রায় অস্তমিত হতে চলেছে। এমনকি সাম্যবাদী দলের শ্রেণী চরিত্রেও মধ্যবিত্তের আধিপত্য পরিদৃশ্যমান। মধ্যবিত্তদের একাংশে আজকে একদিকে একটা অস্তিত্বহীনতাবোধে আক্রান্ত হচ্ছে, আর, অপর দিকে প্রত্যাশার একটা বিস্ফোরণ ঘটছে এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধানত একটা বৈষয়িক তাগিদে। পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণ অর্থাৎ ভোগবাদের প্রতি আকর্ষণ এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাববাদের প্রতি একটা সমান্তরাল আকর্ষণও দেখা যাচ্ছে আমাদের মধ্যবর্তী শ্রেণীর মধ্যে। ফলে পরিবর্তনের বিপক্ষে আজকের মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিন্তু চিন্তা করছে একটা স্থিত স্বার্থ শ্রেণীর মতই। আসলে যাকে মধ্যবিত্তের সম্ভাবনা বলে মনে করা হত এককালে, তার বর্তমান সংকটের সৃষ্টি বোধহয় সেইখান থেকেই।

এক বিস্মৃত জমিদার বাড়ির কথা ঃ হুগলীর সুলতানগাছার মুখোপাধ্যায় পরিবার *

মৃণালকুমার বসু

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের পুরোনো জমিদার পরিবারের পতন ও নতুন ধরণের জমিদার বংশের উত্থান বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাসে একটি বহু আলোচিত বিষয়। অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ চিত্রিত পতনের ইতিহাস কিছুটা বদলে গেলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুরুত্ব সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সবক্ষেত্রে পুরোনো জমিদাররা শুধুই পতন নয় নির্মাণের মধ্যে দিয়ে শুধু অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন তাই নয় নিজেদের শক্তি বাড়িয়েছিলেন। এমনকি, এই নির্মাণের মাধ্যমে ইংরেজী ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের নিচে একই সঙ্গে বিনির্মাণ ও নির্মাণের দেশজ প্রক্রিয়া বর্ধমান রাজপরিবারের মাধ্যমে চলেছিল। পতন ও উত্থানের এই জটিল পটভূমিকায় হুগলী জেলার সুলতানগাছার মুখোপাধ্যায় পরিবার ইতিহাসের আড়ালে থেকে গেছে। অথচ উনিশ শতকের বাংলার জমিদার পরিবার হিসেবে বিশেষত আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তির নিরিখে এই পরিবার মনোযোগ দাবি করতে পারে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অসম্ভব চড়া খাজনার হার ধার্য হওয়ায় শুধু পশ্চিমবাংলার নয়—বাংলার অন্যতম প্রধান জমিদার পরিবার-বর্ধমানের ক্ষেত্রী বংশীয় জমিদার পরিবার বিশেষত মহারাজা তেজচন্দ্র বিপাকে পড়েন। তাঁর সমস্যা একদিকে তাঁর নিজস্ব; অন্যদিকে ইংরেজ প্রবর্তিত বন্দোবস্তের ফল। এই পতনের মোকাবিলা করার জন্য চূড়ান্ত বিপদের মধ্যে মহারাজা তেজচন্দ্র নতুন উদ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন সূত্র বের করেন। একই সময়ে মহারাজা তেজচন্দ্র বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশ[১] ও মুঘলযুগীয় বাঁশবেড়িয়ার রাজামহাশয় উপাধিকারী জমিদার বংশের অধিকাংশ এলাকা দখল করেন। অন্যদিকে, বর্ধমান রাজপরিবারের বহু বিস্তৃত জমিদারির নানা অংশ মূলত নতুন চারটি জমিদার পরিবার কিনে নেন। এঁরা হলেন—(১) ভাস্তাড়ার সিং বংশ (২) সিঙ্গুরের সিং বংশ[২] (৩) জনাই এর মুখোপাধ্যায় ও (৪) তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। সোজা কথায়, হুগলী জেলার দুই অবাঙালী ক্ষত্রিয় বাঙালী ব্রাহ্মণ বংশ বর্ধমান জমিদারির অংশ কিনেছিলেন। হান্টার ও জেলা গেজেটিয়ারের কল্যাণে এঁদের নাম সুপরিচিত। অন্য কারণেও এঁদের নাম ইতিহাস বইয়ে পাওয়া যায়। ফলে, বর্ধমান রাজপরিবার একই সঙ্গে পতন ও নির্মাণের মধ্যে দিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিঘাত সামলে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সর্বোচ্চ স্তরের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের পরের ধাপে বর্ধমান রাজপরিবার নতুন এক অভিজাত গোষ্ঠী

গড়ে তোলার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই প্রক্রিয়া আবার আরো আগের যুগের বর্ধমান রাজপরিবার ভিত্তিক সাফল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য গড়ে তোলার ছকের সঙ্গে কিছুটা মিলে যায়। বর্ধমান রাজপরিবারের দুর্দশা কাজে লাগিয়ে পরবর্তীকালের মহারাজা নবকৃষ্ণের মত কোলকাতার প্রখ্যাত অভিজাত ও খিদিরপুরের ভূকৈলাসের ঘোষাল পরিবার ও রামমোহনের পূর্বপুরুষ ফুলে ফেঁপে উঠেন। সমস্যা হল, বর্ধমান রাজপরিবার কেন্দ্রিক হুগলীর নতুন অভিজাতদের দল আবার একই ধরণের বিপদের মধ্যে পড়েন ও একই প্রক্রিয়ায় নতুন দল সামনে আসে। এঁদের মধ্যে সুলতানগাছার মুখোপাধ্যায় পরিবার ও উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় পরিবার উল্লেখযোগ্য। উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় পরিবার মূলত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের একক কৃতিত্বে বেড়ে ওঠে। শুধু ইংরেজ সাহচর্যেই নয়, আধুনিক মনস্ক দক্ষতা উদ্যমী জয়কৃষ্ণকে নিচুস্তরের সরকারি চাকরিকে কাজে লাগিয়ে একেবারে ওপরের স্তরে উঠতে সাহায্য করে। ইংরেজি ধাঁচের বৈষয়িক বুদ্ধি, হুগলী-কোলকাতার সঙ্গে সঠিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ও সমসাময়িক অবিবেচক প্রতিষ্ঠার পরনির্ভরতা ও অমিতব্যয়ের বেড়াজালের ওপরে উঠে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অন্যদিকে শুধু বৈভবনির্ভর সুলতানগাছার মুখোপাধ্যায় পরিবার অন্য মেরুতে ছিলেন। রাজপুতানা থেকে আসা সিং পরিবার বিশেষত ভাস্তাড়ার সিং বংশের (পরবর্তীকালে সিংহরায় হিসেবে বহু পরিচিত) প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণপ্রাণ সিং বর্ধমান রাজপরিবারের বড় কর্মচারী ছিলেন। এরই অধস্তন পুরুষ ছকুরাম সিং ভাস্তাড়ার জমিদারি কেনেন [৩]। ইনি ত্রিবেণী থেকে নিজ বাড়ি পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরি করেন ও এই পরিবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যলাভ করেন। এছাড়া চকদীঘিতে সারদাপ্রসাদ সিংহরায়ের নামে একটি অবৈতনিক ইংরেজি বিদ্যালয়[৪] দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়। এ সব কাজের মধ্যে দিয়ে রাজস্ব সংগ্রহের পাশাপাশি মফস্বলের এক জমিদার পরিবারের ব্যাপকতর কর্মকাণ্ডের ধারা লক্ষ্য করা যায়। এ সব তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি নেই এ বংশ সম্পর্কে একেবারে আলাদা তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে। এই জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নাম পাওয়া যাচ্ছে নলসিং রায়ের—যাঁর ছেলেদের নাম হল ১) ভবানী সিং ২) দেবী সিং ৩) ভৈরব সিং ৪) হরি সিং। হরি সিং এর দুই ছেলে ছকনলাল সিং ও শশীভূষণ যাঁরা দুজনেই ১৮৮১ সাল নাগাদ চকদীঘিতে অর্থাৎ নিজেদের বসতবাড়িতে বাস করছেন জানা যায় [৫]। দুটি তথ্য থেকে ছকুরাম বা ছকনলাল নাম পাওয়া যাচ্ছে যার মধ্যে একটি ভুল বোঝা গেলেও এই ব্যক্তি ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে বার্ড সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত পুলিস কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছেন ও ১৮৮১ সাল নাগাদ বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন ধরে নিলে তাঁকে খুবই দীর্ঘায়ুব্যক্তি বলেও মানতে হয়। এঁর কথায় আবার ফিরে আসতে হবে। পাশাপাশি, জনাই এর মুখোপাধ্যায় পরিবার মোটামুটি পরিচিত।

এঁদের স্তরের জমিদার পরিবার সুলতানগাছার মুখোপাধ্যায় পরিবার। মাপকাঠি হ্ল বাৎসরিক দেয় খাজনা। দীর্ঘ জমিদারি প্রশাসন বিষয়ক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নীলকমল মুখোপাধ্যায় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে "জমিদার ও প্রজা" শীর্ষক একটি বই লেখেন ও জমিদারদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। সর্বোচ্চ বা প্রথম শ্রেণীভুক্ত জমিদার হিসেবে তাঁদেরই চিহ্নিত করেন—যাঁরা বছরে লক্ষ টাকা খাজনা দেন[৬] এই হিসেবে সুলতানগাছার মুখোপাধ্যায় পরিবারকে প্রথম শ্রেণীর জমিদার বলা যায়।

হুগলী জেলায় এ ধরণের উচ্চকোটির জমিদার হিসেবে চিহ্নিত পরিবারবর্গও আসলে মূলত বর্ধমান রাজপরিবারের অধীন পত্তনীদার। এই পত্তনীদার দর পত্তনীদার গোষ্ঠীর মাধ্যমে বর্ধমান রাজপরিবার এক নতুন অভিজাতগোষ্ঠীর রূপকার। অবশ্য এঁরা অতি দ্রুত বেড়ে ওঠেন অথবা নীচে নেমে যান বলে এঁদের বিশেষ স্থায়ীভাবে একই জায়গায় দেখা যায় না। তাই গ্রাম বাংলার তথাকথিত জড় অবস্থা থেকে ছবিটা বেশ আলাদা। তবে রাজস্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সকলেই মোটামুটি একমত যে পত্তনীদার ও দর পত্তনীদারদের তুলনায় জমিদার অর্থাৎ বর্ধমান রাজপরিবার অনেক কম সুবিধে পেতেন[৭]। তাই তাঁদের অর্থাৎ সম্পন্ন পত্তনীদের রমরমা সহজেই চোখে পড়ত। এঁদের দলে অসাধারণ ব্যক্তিগত কর্মনৈপুণ্য ইংরেজি ভাষা ও আইনজ্ঞান সরকারি মহলে যোগাযোগ সম্বল করে উত্তরপাড়া মুখোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সেকালের দ্রুত ভাঙ্গাগড়া কাজে লাগিয়ে সমাজে ও জমিদার গোষ্ঠীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। জয়কৃষ্ণের ঐতিহাসিক জীবনীকারের লেখা থেকে জানা যায় যে তিনি ১৮৩২ সালে প্রথম সামান্য জমিদারি কেনেন ২৪ বছর বয়সে। দশ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৪২এ জয়কৃষ্ণ সরকারকে একলক্ষ টাকা খাজনা দিতেন[৮]। এ তথ্যের সঠিক উৎস অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। অন্য বড় জমিদারদের মত তিনি একদিকে রাস্তাঘাট সংস্কারের কাজে যুক্ত হন। তিনি রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় জনাই থেকে বালি পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করেন। অন্যদিকে, এক আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ এর লেখা থেকে জানা যাচ্ছে যে জনাই এর ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাই জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় চণ্ডীতলা থেকে জনাই পর্যন্ত চার মাইল রাস্তা তৈরি করেন[৯]। ফলে জমিদাররা নানা আঞ্চলিক কর্মকাণ্ড বিশেষত রাস্তাঘাট সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্যাপক সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হন। এ ধরণের জমিদারদের তুলনায় কোলকাতার নৈকট্য ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা জনিত কারণে কোলকাতার নানাবিধ কর্মকাণ্ডে তিনি সহজেই যুক্ত হয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। স্থানীয় ও কোলকাতা কেন্দ্রিক ব্যাপক কর্মকাণ্ডে একই সঙ্গে যুক্ত থাকার কৃতিত্ব জয়কৃষ্ণকে অধিকতর প্রতিষ্ঠা অর্জনে সহায়তা করেছে।

আঞ্চলিক ক্ষেত্রে কিন্তু অবস্থাটা বেশ আলাদা ধরণের। সেখানে বর্ধমান রাজপরিবারের অধীনস্থ পত্তনীদার জমিদাররা অনেক প্রতিপত্তিশালী। সরকারের কাছে

তাদের প্রতিপত্তির কথা বোঝা যায় ১৮৩৭-১৮৩৮ সালের পুলিসী বন্দোবস্ত পর্যালোচনা ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে সরকার বার্ড সাহেবের অধীনে একটি কমিটি গঠন করেন। তথ্য ও পরামর্শের জন্য সরকার নানা ধরণের সাক্ষীকে জেরা করেন। সম্পন্ন জমিদার সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন কোলকাতার দ্বারকানাথ ঠাকুর ও হুগলী জেলার দুজন জমিদার। এঁরা হলেন রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও ছকু সিং। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে এখানে দেখা যাচ্ছে না। ফলে, তাঁর প্রতিপত্তি ও সরকারি কোষাগারে দেয় রাজস্বের পরিমাণ জীবনীকার বর্ণিত তথ্যের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না। হুগলীর দুই জমিদারের মধ্যে ছকু সিং কে সহজেই সনাক্ত করা যায়। দ্বিতীয় সাক্ষী রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে জনাই মুখোপাধ্যায় বংশীয় জমিদার হিসেবে চেনা যায় যদিও সুলতানগাছার জমিদার পরিবারে একই নামের জমিদার আছেন[১০]। তবু এঁকে জনাই এর জমিদার বলেই ধরা যায় যদিও বার্ড কমিটির প্রতিবেদনে এঁদের জমিদারির অবস্থান উল্লেখ করা হয়নি স্পষ্টভাবে। বিশেষত আঞ্চলিক ইতিহাসকারদের লেখায় নানা পরস্পর বিরোধী মন্তব্য দেখা যায়। উনিশ শতকের বিখ্যাত লেখক লোকনাথ ঘোষ জনাই এর মুখোপাধ্যায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রামজয় মুখোপাধ্যায়কে চিহ্নিত করেছেন। এঁর পুত্র হলেন গোলকচন্দ্র ও পৌত্র চন্দ্রকান্ত যাঁর ১৮৮১ সালে বয়স ৬৫ বছর [১১]। এখানে রামনারায়ণ খুব স্পষ্টভাবে উঠে আসেন নি। অন্যদিকে জনাই এবং আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ জানাচ্ছেন যে জনাই এর জমিদার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জগমোহন মুখোপাধ্যায়। যিনি বিহারে বিপুল সম্পত্তি অর্জন করেন। ছাপরায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই বংশের রামরতন পরে বাকসায় বসতি করেন। চণ্ডীতলা থেকে রাস্তার সংস্কার ও ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন [১২] । একই সঙ্গে পুরোনো বাবু কালচার এর ধারক হিসেবে জমিদারি বোলবোলাও রপ্ত করে ভাইয়ের বিয়েতে "নেকী ও কাশ্মীরী প্রভৃতি প্রধান, গায়ক তরফাওয়ালী আনেন"[১৩]। এখানেই উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের মূল তফাৎ। জয়কৃষ্ণ সত্যিকারের আধুনিক যাঁর পুরোনো ঐতিহ্যের মোহ নেই। তাই, অপব্যয় নেই। অন্যদিকে জনাই বংশের সম্পর্কে অন্য এক আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ জানাচ্ছেন যে "এই বংশের রামরত্ন মুখোপাধ্যায়" ১২৪৯ সালে পরলোকগমন করিলে 'সমাচার দর্পণ' পত্রে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১২৪০ "শোক প্রকাশ করা হয়"[১৪]। ১২৪০ অথবা ১২৪৯ যে কোনও একটি ছাপার ভুল ধরে নিলেও রামরত্ন বার্ডকমিটির সাক্ষী রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নন। এই পরিবারের দ্বিতীয় ব্যক্তি পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জনাই এর বাড়িতে নিজ ব্যয়ে শকুন্তলা নাটক ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে অভিনয় করিয়ে কোলকাতার বিখ্যাত বাবু সমাজে স্থান করে নেন। কাঞ্চন কৌলিন্যের সঙ্গে সংস্কৃতি মনস্কতার মেলবন্ধন ঘটানোর মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন সেযুগের একটি পরিচিত ছক বলা যেতে পারে। জনাই এর রামরতন বাকসায় বসতি করেন ও জনাই পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করেন[১৫]। রামরতন ও তাঁর ভাই রামরত্ন

এঁরা জনাই-বাকসার জমিদার হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন[১৬]। এভাবে বার্ড কমিটির এই দুই সাক্ষীকে সনাক্ত করে তাঁদের বক্তব্য অল্প কথায় জানা যেতে পারে।

সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে স্বীকৃতির মূল্য দেশীয় জনগণের স্বীকৃতির চেয়ে অনেক মূল্যবান ছিল। তবু ব্যক্তিগত স্বার্থ বিশেষত গোষ্ঠীস্বার্থ বজায় রাখার জন্য জমিদাররা সরকারের সমালোচনা করতেও গররাজি ছিলেন না। পুলিস কমিশনের সামনে দ্বারকানাথ ঠাকুর জানালেন যে কোলকাতার উন্নত পুলিস বন্দোবস্তের পাশে মফঃস্বল বাংলার পুলিস বন্দোবস্ত একেবারে নিকৃষ্ট। গ্রামবাংলায় পুলিসেরা অপদার্থ ও ঘুষখোর। শুধু তাই নয়, বড়লোক অর্থাৎ জমিদাররা সবসময়েই গরিব বিচার প্রার্থীদের চেয়ে বেশি সুবিধে ভোগ করে[১৭]। গ্রামবাংলায় পুলিস কর্মচারী বিশেষত দারোগাদের অসীম প্রতিপত্তির কথা মনে রেখে তিনি পরামর্শ দিলেন যে পদটি শুধু দেশি লোকদের জন্য নির্দিষ্ট না রেখে ইংরেজ, আধা ইংরেজ ও দেশীয় সকলের জন্য উন্মুক্ত করা দরকার। দেশের উন্নতির জন্য পুলিস বিভাগকে ঢেলে সাজাবার পরামর্শও তিনি দিয়েছিলেন।

অন্য সাক্ষী হকিন্স স্বীকার করেন যে দারোগারা বড় কর্মচারীদের অনুগ্রহ নির্ভর জীব। নিরাপত্তার অভাবের জন্য দারোগারা অবৈধ পন্থায় উপরি রোজগার করেন[১৮]। আর এক সাক্ষী টরেন্স বলেন যে দারোগাদের উপযুক্ত মাইনে দেওয়া দরকার ও উপযুক্ত শিক্ষিত লোকদের দারোগাপদে নিয়োগ করা দরকার। ডব্লু অ্যাডাম দারোগাদের সম্পর্কে বিস্তারিত মতামত জানান। তাঁর মতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের পরিস্থিতি আলাদা ও সর্বত্র শুধু জমিদাররা সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি নন। তাঁদের শক্তি যেখানে বেশি বা যেখানে তাঁরা একচ্ছত্র আধিপত্য করেন সেখানের সমস্যা একধরণের আবার যেখানে জমির ওপর দখল বেসরকারি ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সেখানে দারোগাদের সমস্যা আর এক রকমের। ফলে একদিকে দেশী জমিদাররা অন্যদিকে সমস্যার মূল আকর হল নীলকররা। অবশ্য তারাও আবার সব জায়গায় এক রকমের নয়। ত্রিহুতের নীলকররা বর্ধমানের নীলকরদের তুলনায় অনেক বেশি অত্যাচারী কেননা বর্ধমানের মহারাজার প্রতাপ তাদের দমিয়ে রাখে[১৯]। অ্যাডাম জানান যে দারোগা হতে গেলে গড়পড়তা ১০০০ টাকা থেকে ২০০০ ঘুষ দিতে হয়। অবশ্য এ টাকা তারা সহজেই উসুল করে নেয়। দারোগাদের ঘুষের বহর বোঝাতে তিনি বলেন যে দারোগারা মাসে ২৫ টাকা মাইনে পেয়ে, বড় সংসার প্রতিপালন করে ও ভালভাবে থেকে ৪/৫ বছরে পাকা বাড়ি তৈরি করে। অথচ পাকা বসত বাড়ি বেশি মাইনে পেয়ে ইংরেজি নবীশ একশটাকা মাইনের কেরানিদের লাগে অন্তত কুড়ি পঁচিশ বছর[২০]।

দারোগা সাক্ষীরা সকলেই মুসলমান। কেননা পেশাটি হিন্দুদের আকৃষ্ট করেনি অথবা গত শতকের মুসলমান আধিপত্য থেকে গেছে। প্রবীণ দারোগারা দীর্ঘকাল চাকরি করে ২৫ টাকার বেশি মাইনে পান না। আবদুল হাকিম খান বলেন যে সপ্তম হপ্তমের

ফলে বেশির ভাগ জায়গায় স্থায়ী জমিদার নেই। নতুন জমিদাররা কাজকর্ম দেখার জন্য মাসিক ১্ টাকা মাইনের ফৌজদারি গোমস্তা রাখে। এরাই জমিদারের বকলমে অত্যাচার চালায়।

হুগলী জেলার দু জন বড় জমিদার সাক্ষী হলেন—ছকুরাম সিং ও রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। বাবু ছকু সিং ভাস্তাড়ার জমিদার—তিনি সরকারকে ২৭,০০০্ টাকা ও বর্ধমানের মহারাজাকে এক লক্ষ টাকা খাজনা দেন[২১]। বোঝা যায়, যে জেলার বড় জমিদার হিসেবে পরিচিত অভিজাতরা মূলত বর্ধমানের মহারাজার পত্তনীদার। ছকু সিং জানালেন যে দারোগাগিরি পেশাটাই খারাপ। এদের মাসিক ১০০্ টাকা মাইনে দিলেও এরা সৎ হবে না। অপর সাক্ষী রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় জানালেন যে চৌকিদারি ব্যবস্থা জমিদার নির্ভর। অন্যদিকে দারোগারা সরকারি কর্মচারী। ফলে পুলিসী বন্দোবস্তের মধ্যে এই দ্বৈত ব্যবস্থা থাকায় কাজকর্মের মান নিচু। অন্যদিকে, তিনি অভিযোগ করেন যে সরকারি কর্তৃপক্ষ ডাকাতি হলে স্থানীয় জমিদারকে জড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন যদিও অকুস্থল থেকে জমিদারের বসতবাড়ি অনেক দূরে। জমিদাররা ডাকাতদের পোষকতা করেন এই অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি জানালেন যে তাঁর জমিদারিতে প্রায়শই দাসীদের রাত্রে আটক রাখা হয়[২২]। বাবু রামনারায়ণ জানালেন যে তিনি সরকারকে ৫০,০০০্ টাকা ও বর্ধমানের মহারাজাকে প্রায় এক লক্ষ টাকা খাজনা দেন। তিনি দারোগাদের অত্যাচার সম্পর্কে সরকারকে বিস্তারিত তথ্য দেন। অবশ্য অবস্থার উন্নতি করার জন্য দারোগাদের মাসিক ১২৫্ টাকা মাইনে দেবার পরামর্শ দেন। কেননা, দারোগাদের ভদ্রসমাজে মিশতে হয় — রাঁধুনি রাখতে হয়— নিজেদের পালকি রাখতে হয় — তাই মাইনে উপযুক্ত না হলে চলবে না। পাশাপাশি, তিনি চৌকিদারদের দুভাগে ভাগ করতে পরামর্শ দেন। জমিদারের চাকরান ভোগী চৌকিদারদের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত হবে না। বাকি চৌকিদাররা গ্রামের নিরাপত্তা সরকারি নিয়ন্ত্রণে থেকে বজায় রাখবে। এদের খরচ জোগাবে গ্রামবাসীরা কেননা প্রজারা নিজেদের স্বার্থে ও নিরাপত্তার স্বার্থে বাড়তি কর দিয়ে দ্বিতীয় ধরণের চৌকিদারদের বহাল রাখবে।

অবশ্য ব্যাপক পরিবর্তনের সুপারিশ করা সত্ত্বেও সরকার সৎ পরামর্শে কান দেননি। ফলে পুলিসী বন্দোবস্তে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হুগলী জেলায় বড় জমিদারদের সংখ্যা বেশি ছিল না। ১৮৫০ সালে হুগলী জেলায় ২৭৮৪ টি জমিদারিতে ৫৭৭৫ জন জমিদার খাজনা দিতেন[২৩]। কিন্তু মুষ্টিমেয় যে কজন জমিদার ছিলেন তাঁদের আদবকায়দা ও জীবন চর্যা অন্য জায়গার সম্পন্ন জমিদারদের থেকে আদপে আলাদা ছিল না। অপরিমিত ব্যয় ও অকুণ্ঠ আনুগত্য বিষয়ে খুব পার্থক্য চোখে পড়ে না। সিপাহি যুদ্ধ শুরু হবার আগেই সাঁওতাল বিদ্রোহ

শুরু হলে বাংলা ও বিহারের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও অত্যন্ত পুরোনো ধরণের অস্ত্রে সজ্জিত সাঁওতালেরা ছোটকাট যুদ্ধে কিছু ইংরেজ বাহিনীকে হঠিয়ে দেয়। অগণিত অথচ কার্যত নিরস্ত্র সাঁওতালদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার বিপুল বন্দোবস্তের আয়োজন করে ও তাদের সামরিক প্রচেষ্টাকে মদত দিতে বাংলা ও বিহারের ভূস্বামী সম্প্রদায় উদারভাবে সহায়তা করে। সবে মাত্র, রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেল যোগাযোগ চালু হয়েছে—কাজ চলছে রাজমহল পর্যন্ত এলাকায়। তখন, এ সব রুক্ষ জঙ্গলে ভরা এলাকায় সামরিক তৎপরতা চালাতে ইংরেজদের দরকার ছিল সুশিক্ষিত হাতি[২৪]। তাই মুর্শিদাবাদের নবাব থেকে আরম্ভ করে বিহার ও বাংলার বিভিন্ন জমিদার হাতি পাঠিয়ে সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্য দেখালেন। কিন্তু উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আদপে হাতি পাঠাননি। হয়ত হাতি তিনি রাখতেন না। কিন্তু অনেক অল্প খরচে কি বন্দোবস্ত করতে তিনি রাজি তা সরকারকে জানান যা ইতিহাস গ্রন্থে বহু উল্লিখিত। অন্যদিকে সনাতনপন্থী জমিদাররা—মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বহু ব্যয় করে হাতি পোষেন—সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখাতে হাতি পাঠাতে লাগলেন। হুগলী জেলার অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেট ককরেল উর্ধতন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে জমিদার ও সম্পন্ন ব্যক্তিদের পাঠানো হাতি সম্পর্কে যে তথ্য পেশ করেন তা থেকে সমসাময়িক জমিদারদের সম্পর্কে ও সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের বিষয়ে মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে। এই তালিকাটি মনোযোগ দাবি করতে পারে।

১) বাবু মধুসূদন মুখোপাধ্যায় দুটি হাতি পাঠিয়েছেন। একটি হুগলী জেলার তরফে ও অন্যটি মেদিনীপুর জেলার তমলুকের জমিদারির জন্য[২৫]। আর কোনও হুগলীর জমিদার দুটি হাতি দেননি। ইনি সুলতানগাছার জমিদার। বোঝা যাচ্ছে ১৮৩৭-১৮৩৮ এর হিসেব বেশ বদলে গেছে। সুলতানগাছার এই ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারের এখন বাড়বাড়ন্ত—তিনি বর্ধমানের মহারাজার পত্তনীদের আবার অন্য জেলার জমিদার। তিনি জমিদার হিসেবেই একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এঁরই নামানুসারে আগে এই "গ্রামের নাম মধুয়াবাটী ছিল পরে ইহা শুবিপুর বলিয়া খ্যাত হয়। বর্তমানে ইহা কলাছড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ"[২৬] যদিও বর্তমানে এই গ্রাম সুলতানগাছা হিসেবে পরিচিত।

ককরেল সাহেবের তালিকা থেকে শুধু মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের[২৭] উল্লেখ আছে তাই নয়—অন্যান্য সম্পন্ন ও বড় জমিদারদের বিবরণ আছে।

তালিকায় উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম নেই। তিনি পুরোনোপন্থী নন এমনকি পুরোনো জীবনচর্যা বজায় রাখায় উৎসাহী নন। তিনি আনুগত্য দেখাতে কম তৎপর নন। এমনকি পরে, লাঠিয়াল দল গড়ে তুলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করার কথা বলেন, সেকথা বহু গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। এ পরামর্শ অকেজো তবে অল্প খরচে আনুগত্য দেখাবার প্রকট দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যেতে পারে।

অন্যদিকে বাকি জমিদাররা ও অভিজাতরা জয়কৃষ্ণের বিবেচক পন্থা নেননি। তারা টিকিয়ে রাখেন পুরোনো দিনের অর্থনাশকারী জীবনচর্যা। জয়কৃষ্ণের কোলকাতার সঙ্গে সম্পর্কের তাৎপর্য তাঁরা বুঝতে পারেননি। অথবা সমকালীন ইংরেজি জ্ঞাননির্ভর ব্যবহার জীবনচর্যা আয়ত্ত করা ছিল অন্য বেশির ভাগ জমিদারদের পক্ষে অসম্ভব। একই সঙ্গে উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাব বাকিদের ঠেলে দেয় বিস্মৃতির আড়ালে। পুরোনো পন্থী জীবনযাত্রার একটা পরিচিত অনুষঙ্গ ছিল কামান। হাতির মতই কামান আবার আভিজাত্যের প্রতীক। এই প্রতীক আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর ব্যক্তি ও সংগঠনকে সমান আকৃষ্ট করেছিল। সিপাহি যুদ্ধের পরে হুগলী জেলা ও অন্যত্র কামানধারীদের একটি তালিকা সরকার তৈরি করেন যেটি সে যুগের সম্পন্ন জমিদার ও মান্যগণ্য মানুষদের চিনে নিতে সাহায্য করে। সঙ্গে সঙ্গে, একথা বলা দরকার, আভিজাত্য ও বিত্তের এই পুরোনো অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে ও অনেকেই তাঁদের খ্যাতি গড়ে তুলেছিলেন যার সত্যিকারের তাৎপর্য বাকিরা একেবারেই বুঝতে পারেন নি।

হুগলী জেলার কামানধারীদের নাম যে সারণি থেকে জানা যায় তার শীর্ষে আছে বর্ধমানের মহারাজা[২৮]। কিন্তু তালিকায় সকলেই জমিদার নন। আছেন ব্যবসায়ী ও ঠাকুরবাড়ি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কৃপাধন্যা রাসমণিও আছেন কামানের মালিক হিসেবে। তবে বর্ধমান মহারাজ ছাড়া তালিকার শীর্ষে আছেন বাবু মধুসূদন মুখোপাধ্যায় যিনি সুলতানগাছার জমিদার হিসেবেই নয় মেদিনীপুর এলাকায় তাঁর জমিদারিতে আছে আর একটি কামান[২৯]। এখানেও পাচ্ছি না উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম। পুরোনো প্রতীক ছেড়ে তিনি আধুনিক জমিদার। একদিকে তিনি প্রবল উদ্যমী জমিদার আবার অন্যদিকে তিনিই গড়ে তোলেন হুগলী জেলার সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি ও সফল ইংরেজি স্কুল।

হাওড়া জেলার কামানধারীদের তালিকা উল্লেখ করা নিরর্থক হবে না। আন্দুলের জমিদার বাড়িতে আছে ৪টি কামান। কিন্তু মজার ব্যাপার হল বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান— ফোর্ট গ্লষ্টার মিলের আছে ৮টি কামান যা তাঁরা কর দিয়েও নিজেদের অধিকারে রাখতে চান[৩০]।

হুগলী বা অন্য জেলার জমিদার পত্তনীদার পরিবারের পতনের মধ্যে একটা সহজ ছক আছে। এর মধ্যে প্রধান হল জমিদারসুলভ কার্যকলাপ—যা সহজ হিসেববুদ্ধির নাগাল পায় না। সুলতানগাছার মুখোপাধ্যায় পরিবার তেমনি হাতি আর কামান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বন্দোবস্ত বজায় রেখে জমিদারি বোলবোলা বজায় রেখেছিলেন। হান্টার এর স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্টস অফ হুগলী তে সুলতানগাছায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয়েরও খোঁজ পাওয়া যায় যদিও এসব কাজের গুরুত্ব তাঁরা বুঝেছিলেন বলে মনে হয় না। অবশ্য যাঁরা বুঝেছিলেন তাঁরাই আসলে ব্যতিক্রমী চরিত্র— যেমন জয়কৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায়। উনিশ শতকীয় জমিদারি পরিচালনায় সমৃদ্ধ এক ভূয়োদর্শী ব্যক্তি জমিদারদের কয়েকটি পরামর্শ দেন। তাঁর মতে জমিদারদের কর্তব্য শুধু উন্নত জমিদারি পরিচালনা বা রাজস্ব বৃদ্ধিতেই শেষ হয় না। বিলাসিতার পথ পরিত্যাগ করে নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিদেশী পণ্যের অবিরাম স্রোত ঠেকানোই তাঁদের কর্তব্য হওয়া উচিত[৩১]। এই মাপকাঠিতে সুলতানগাছার মুখোপাধ্যায় পরিবার দূরে থাক খোদ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পাশ করতে পারবেন বলে মনে হয় না। সে যুগের বিশেষ সামাজিক পরিমণ্ডলে দ্রুত পরিবর্তনশীল জমিদার-পত্তনীদারগোষ্ঠীর মধ্যে হুগলীর সুলতানগাছার এই ব্রাহ্মণ পরিবারের খণ্ডচিত্র উল্লেখনীয়।

সূত্রনির্দেশ ঃ—

* এই প্রবন্ধের জন্য কিছু তথ্য সুলতানগাছা মুখোপাধ্যায় বংশের ধীরেন মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে মদন দাসের মাধ্যমে পেয়েছি।

১। সুকুমার সিংহ ও হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট লেটার্স রিসিভড, ১৮০২-১৮৬১ পৃ: XIV-XVI কোলকাতা, ১৯৮৯

২। হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, পৃ: ১৪৯, ১৯১০ সং: সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস গ্রন্থে সিঙ্গুর পরিবার সম্পর্কে লেখেন এঁদের "পূর্ব হইতেই ডাকাতির প্রসিদ্ধি ছিল" পৃ: ৪২০, কোলকাতা, ১৩৫৫।

৩।অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, পৃ.৬৮৩, কোলকাতা, ১৯৮২।

৪। পশ্চিমবঙ্গ হুগলী জেলা সংখ্যা, ১৪০৩, পৃ. ১২০।

৫। লোকনাথ ঘোষ, দ্য মডার্ন হিস্ট্রি অফ দ্য ইণ্ডিয়ান চিফ্‌স, রাজাস এণ্ড জমিন্দারস, পৃ ১০. পার্ট টু।

৬।নীলকমল মুখোপাধ্যায়, জমিদার ও প্রজা, কোলকাতা, ১৮৭৩।

৭। বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, পৃ ১১৩, কোলকাতা, ১৯১০।

৮।নীলমণি মুখোপাধ্যায়, এ বেঙ্গল জমিন্দার, জয়কৃষ্ণ মুখার্জী এণ্ড হিজ টাইমস।

৯। সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস, পৃ ৭৯, কোলকাতা, ১৩৫৫ সন।

১০। সুলতানগাছার বংশ তালিকায় মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের নাম রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। অবশ্য এঁর পক্ষে বার্ড কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেওয়া সম্ভব নয়।

১১। লোকনাথ ঘোষ, পূর্বোক্ত পৃ ৩১০।

১২। রেণুপদ মুখোপাধ্যায়, সেকালের জনাই, পৃ ৩২-৩৪ হুগলী, ১৩৫০।

১৩।ঐ, পৃ ৩৩।

১৪। সুধীরকুমার মিত্র, ঐ, পৃ ৭৯৮।

১৫। জর্জ টয়েনবি, এ স্কেচ অফ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ফ্রম ১৭৯৫ টু ১৮৪৫, পৃ ১১৪ কোলকাতা, ১৮৮৮।

১৬। রেণুপদ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৩২।

১৭। রিপোর্ট অফ দ্য বার্ড কমিটি, ১৮৩৮ পৃ ৯-১২।

১৮।ঐ, পৃ ১২-১৩।

১৯।ঐ, পৃ ৭৫।

২০।ঐ, পৃ ৭৭।

২১। ঐ, পৃ ১০১।
২২। ঐ, পৃ ১১০।
২৩। ঐ, পৃ এস. এস. ও'ম্যালি, হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, পৃ. ২১৩।
২৪। মেজর শাকবার্গ ক্রমাগত সুশিক্ষিত হাতির দাবি জানাচ্ছিলেন। কালীকিঙ্কর দত্ত, দ্য সান্তাল ইনসারেকসন, পৃ ৪৮, কোলকাতা, ১৯৮৮ সং।
২৫। প্রসিডিংস, জানুয়ারি ১৮৫৬, ইডিশিয়াল বিভাগ।
২৬। সুধীর কুমার মিত্র, প্রাগুপ্ত, পৃ ৬৯৩, হুগলী জেলার মৌজা ম্যাপে মধুসূদনপুর আছে।
২৭। বংশতালিকায় মধুসূদনের পুত্রের নাম রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় দেখা যাচ্ছে। তবে, তাঁর পক্ষে ১৮৩৭ সালে সাক্ষী দেওয়া সম্ভব নয় বলে মনে হয়।
২৮। জেনারেল ডিপার্টমেন্ট, ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৩।
২৯। ঐ
৩০। ঐ
৩১। নীলকমল মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃ ২-১৫

উনিশ শতকের তিরিশের দশকে বঙ্গদেশে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য চিকিৎসা সংক্রান্ত বিতর্ক

ভবতোষ কুণ্ডু

সাধারণত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিক্ষা সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়েই ঐতিহাসিকেরা মাথা ঘামান। কিন্তু উনিশ শতকের তিরিশের দশকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য চিকিৎসা সংক্রান্ত বিতর্ক যে বেশ জমে উঠেছিল তা এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

১৮৩৫ সালে স্থাপিত কলকাতার মেডিক্যাল কলেজকে বঙ্গদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বাগত জানাল।[১] শীঘ্রই শিক্ষিত শ্রেণীর একাংশ বিশেষ করে ইয়ং বেঙ্গল পাশ্চাত্য চিকিৎসার গুণকীর্তন এবং দেশীয় চিকিৎসার সমালোচনা শুরু করলেন। ১৮৩৬ সালে *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকা লিখেছিল যে দেশীয় চিকিৎসক বা বৈদ্যরা "মূর্খ" এবং রোগের উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অসংখ্য লোক মারা যাচ্ছে। সুতরাং পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার প্রবর্তন এদেশের পক্ষে শুভ এবং মেডিক্যাল কলেজে অপারেশন পদ্ধতির শিক্ষা প্রবর্তন দরকার।[২] ঐ কলেজের শব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা প্রবর্তনের এবং কালা ও বোবাদের জন্য হসপিটাল স্থাপনের প্রয়োজনের প্রসঙ্গে ১৮৩৯ সালের ঐ পত্রিকার একটি সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে মফঃস্বলের অশিক্ষিত লোকেরা পাশ্চাত্য চিকিৎসার উৎকর্ষ সম্পর্কে অজ্ঞ।[৩]

ইতিপূর্বে ১৮৩৭ সালে *সমাচার দর্পণের* সম্পাদককে লেখা একটি দীর্ঘ পত্রে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে বৈদ্যশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা হেতু কবিরাজদের ত্রুটিপূর্ণ চিকিৎসার ফলে অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। এদেশীয়দের মধ্যে যাঁরা কিছু জ্ঞান আহরণ করেছেন তাঁরা অসুস্থতা এবং ছোটখাটো রোগের চিকিৎসা বিষয়ে ইউরোপীয় চিকিৎসার সুফল সম্পর্কে অবহিত। "অশিক্ষিত" কবিরাজদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণমোহন উল্লেখ করেছিলেন যে মেয়েদের সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে কবিরাজদের চিকিৎসা নির্মম, অসঙ্গত এবং ক্ষতিকারক এবং এর ফলে অনেক মা এবং নবজাত শিশুর মৃত্যু ঘটছে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে কিভাবে তাঁর স্ত্রীর সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে বৈদ্যদের কঠোরতা ব্যতিরেকে ইংরেজ ডাক্তার ডাং ম্বাকাস্টানের চিকিৎসা ফলপ্রসু হয়েছিল। উপসংহারে তিনি মন্তব্য করেছেন যে ইউরোপীয় চিকিৎসা দেশীয় চিকিৎসার তুলনায় উৎকৃষ্ট, কেননা ইউরোপীয় চিকিৎসা Inductive method of observation and experiment-এর উপর প্রতিষ্ঠিত আর কবিরাজী চিকিৎসা Words or sayings of ancient writer or sages-এর উপর প্রতিষ্ঠিত।[৪] উল্লেখ্য ১৮৪০ সালে *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকা ইংরেজ ডাক্তার মিঃ ওষাঙ্গনামীর তত্বাবধানে গর্ভবতী মহিলার

চিকিৎসার জন্য মতিলাল শীল কর্তৃক হাসপাতাল স্থাপনে আনন্দ প্রকাশ করেছিল।[৫]

ইতিপূর্বে ১৮৩৬ সালে ভগবানগোলায় মহামারী প্রসঙ্গে *জ্ঞানান্বেষণ* লিখেছিল—

> ভগবানগোলায় সর্বস্থানে ঐ পীড়া এমত সাঙ্ঘাতিক ভয়ানক যে তাহা হইলে রোগী পাঁচদিনের অধিক রক্ষা পায় না। এ বৎসরের জ্বরের ধারাই এইরূপ হইয়াছে। বাঙালী কবিরাজেরা তাহার কিছুই করিতে পারে না। প্রথমে অপাক হইয়া পরে জ্বর প্রকাশ পায়। কিন্তু কম্পন হয় না বাঙালী কবিরাজেরা জোলাপ না দিয়া কোষ্ঠ শুদ্ধির নিমিত্ত হরিতাঘটিত বটিকা দেয় তাহাতে জ্বরের দমন হয় বটে কিন্তু শারীরিক পূর্বাপেক্ষা দুর্বল করে এবং তাহাতে জ্বর ত্যাগ হয় না। রোগীর বাহিরে জ্বরের উপশম দেখিয়া লোভপ্রযুক্ত যাহা মনে লয় তাহাই খায়। তাহাতে সুতরাং পুনরায় পীড়িত হইয়া মারা পড়ে। অতএব বাঙ্গালিরা ইঙ্গরেজী বৈদ্যশাস্ত্রানুসারে চিকিৎসায় সুশিক্ষিত না হইলে এ বিষয়ে ভারতবর্ষের উত্তম উপকার হইবেক না।[৬]

একথা ঠিক যে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ও পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা দেশীয় বৈদ্যদের চিকিৎসা থেকে উৎকৃষ্ট বা ফলপ্রসু। কিন্তু দেশীয় বৈদ্যরা সব অশিক্ষিত বা দেশীয় চিকিৎসা সম্পূর্ণ খারাপ—এই মন্তব্য সঠিক নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার ন্যায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার প্রতি প্রবল ঝোঁকবশত দেশীয় চিকিৎসার প্রতি পক্ষপাত মূলক মনোভাবই এদেশীয় শিক্ষিত শ্রেণীর একাংশ বা ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে প্রতিফলিত। সম্ভবত তাঁরা ভারতের রোগ ও চিকিৎসার উপর ইংরেজদের Medical Discourse-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮৩৭ সালের *জ্ঞানান্বেষণের* একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে তাঁরা কলিকাতায় রোগের বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্বলিত ডাঃ মার্টিনের রচনা Calcutta Medical Topography-এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।[৭]

উল্লেখ্য যে দেশীয় বৈদ্যরা নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকেন নি। ১৮৩১ সালে তাঁরা একটি সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন পশ্চিমি ডাক্তারি বিদ্যার আক্রমণের হাত থেকে এদেশীয় চিকিৎসা বিদ্যাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। সোসাইটির সদস্যগণ মনে করতেন যে ইংরেজ ডাক্তারদের নির্দেশিত ঔষধ ও খাদ্য হিন্দুরা গ্রহণ করলে তাদের জাতি ও ধর্ম নাশ হবে। এই ধরণের চিন্তা গোঁড়া মনোভাবেরই পরিচায়ক। কিন্তু ঐ সোসাইটির সদস্যগণ একটি বাস্তবসম্মত যুক্তি তুলে ধরে বলেছিলেন যে ইংরেজ ডাক্তারগণ কদাচ গ্রামে গিয়ে গরিব ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষের চিকিৎসা সাধন করবে। এই শ্রেণীর দেশীয় জনগণকে বৈদ্যদের উপর নির্ভর করতে হবে। সুতরাং দেশীয় বৈদ্যদের মধ্যে একতার প্রয়োজন রয়েছে। উপরিউক্ত সোসাইটির তরফে ধনী হিন্দুদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল বৈদ্যদের পৃষ্টপোষকতা করার জন্য।[৮]

রামকমল সেনের ন্যায় শিক্ষিত মানুষ ঐ বৈদ্য সোসাইটির উদ্দেশ্য আন্তরিকভাবে সমর্থন করতেন। ঐ সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন বৈদ্য পণ্ডিত ক্ষুদিরাম বিশারদ। সোসাইটির অধিবেশনে সেন মহাশয় যোগ দিয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন।[৯] অবশ্য যে কমিটি বেঙ্গল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন, কলিকাতা মাদ্রাসা এবং সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণীর বিলোপ সাধন করে ১৮৩৫ সালে। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সুপারিশ করেছিল রামকমল সেন সেই কমিটির সদস্য ছিলেন।[১০] তবে তিনি তাঁর *ঔষধ সার সংগ্রহ* গ্রন্থে (পুনঃ মুদ্রণ ১২১৬, ১ মাঘ) বৈদ্য চিকিৎসার পুরোপুরি অবলুপ্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে লিখেছেন—

ইদানীং ইংরেজদের রাজ্যোন্নতি হইবাতে ইউরোপীয় চিকিৎসকের ব্যবসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও ব্যাপক হইতেছে। আর হিন্দুর বৈদ্যক শাস্ত্রের অনুশীলনার অপ্রাচুর্য্য প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় অনেক বিশিষ্ট লোক ইংরাজী ঔষধ ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু ইংরাজী বৈদ্যক এ পর্যন্ত এদেশের ভাষায় হয় নাই একারণ তত্ত দৌষবের তত্বজ্ঞ ইহারা হইতে পারেন না, অতএব যে সকল ভেষজ সতত ব্যবহার্য্য। তাহার নাম উৎপত্তি গুণ ও অধিকার বাঙ্গালা ভাষায় সর্বসাধাণ্ণের নিমিত্তে প্রকাশ করিলাম।[১১]

অপরদিকে *সমাচার দর্পণের* ন্যায় মিশনারি পত্রিকা ইংরেজী চিকিৎসা বিদ্যাকে পুরোপুরি সমর্থন জানায়। ঐ পত্রিকা ইংরেজ চিকিৎসকদের চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ বিষয়ে বৈদ্য সোসাইটির সদস্যগণকে সতর্ক করে দিয়েছিল। বিশেষ করে ঐ পত্রিকা হিন্দুদেরকে দেওয়া ইংরেজ চিকিৎসকদের নির্দেশিত ঔষধ ও খাদ্যের উপর বৈদ্য সোসাইটির নিষেধাজ্ঞার কঠোর সমালোচনা করেছিল এবং একে গোঁড়ামি বলে মন্তব্য করেছিল।[১২]

এইরূপে ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর একাংশ বা ইয়ং বেঙ্গল এবং *সমাচার দর্পণের* ন্যায় পত্রিকা বৈদ্যদের চিকিৎসা বিদ্যা পুরোপুরি বর্জন করে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিল। অপরদিকে বৈদ্য সোসাইটি দেশীয় চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিল। রামকমল সেনের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি বৈদ্যদের চিকিৎসা পুরোপুরি তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না।

দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যা ও পশ্চিমি চিকিৎসা বিদ্যা—এই দুটির কোনটিকে বেছে নেওয়া হবে সেই প্রশ্ন সরকারের সামনে ছিল। উইলিয়াম এ্যাডামের এদেশীয় শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট (১৮৩৫ ও ১৮৩৮)[১৩] অগ্রাহ্য করে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানকেই বেছে নেন। তিনি এক আদেশ জারি করে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে দেশীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চা নিষিদ্ধ করেছিলেন।[১৪]

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। স্যার রোপার লেথব্রিজ, *রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্মণ এ্যাণ্ড রিফর্মার*, লণ্ডন, সোয়ান সোয়েনামচিন, ১৯০৭, পৃঃ ৯৭।

২। *জ্ঞানান্বেষণ* উদ্ধৃত *সমাচার দর্পণে*। মার্চ ২৬, ১৮৩৬, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *সংবাদপত্রে সেকালের কথা।* দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৩০-১৮৪০), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৪ সাল, পৃঃ ৩৮।

৩। *জ্ঞানান্বেষণ* উদ্ধৃত *সমাচার দর্পণে*, জুন ২৩, ১৮৩৯, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২-৪৩।

৪। *সমাচার দর্পণ*, মার্চ ১৮, ১৩৩৭, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৮-১৩৯।

৫। *জ্ঞানান্বেষণ* উদ্ধৃত *সমাচার দর্পণে*। ফেব্রুয়ারি ২২, ১৮৪০, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৫-৩২৬।

৬। *জ্ঞানান্বেষণ* উদ্ধৃত *সমাচারদর্পণে*, নভেম্বর ২১, ১৮৩৬, সুরেশচন্দ্র মৈত্র সংকলিত *সিলেকসনস ফ্রম জ্ঞানান্বেষণ*, কলিকাতা, (Prajna) ১৯৭৯, পৃঃ ৩৩।

৭। *জ্ঞানান্বেষণ* উদ্ধৃত *সমাচার-দর্পণে*, অক্টোবর, ১৮৩৭, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত , পৃঃ ১৬৩-১৬৪।

৮। *সমাচার দর্পণ*, আগষ্ট ১৩, ১৮৩১, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯৭

৯। যোগেশচন্দ্র বাগল, *"রামকমল সেন" সাহিত্য সাধক চরিতমালা* নং ৭২, (ষষ্ঠ খণ্ড) কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৩ সাল পৃঃ ১৮।

১০। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫-১৬; শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ*, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৩, পৃঃ ১৪৫-১৪৬।

১১। যোগেশ চন্দ্র বাগল প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

১২। *সমাচার দর্পণ*, আগষ্ট ১৩, ১৮৩১, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৭।

১৩। বিশদ বিবরণের জন্য উইলিয়াম আদম, *রিপোর্টস অন দি স্টেট অফ এডুকেশন ইন বেঙ্গল* (১৮৩৫ ও ১৮৩৮) অনাথ নাথ বসু সম্পাদিত, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১।

১৪। সুব্রত পাহাড়ী, *উনিশ শতকের বাংলায় সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বরূপ*, কলিকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃঃ ১৬৮।

"কলকাতা ও ১৮৬৬ : উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের কিছু চিত্র

সৌমিত্র শ্রীমানী

১৮৫৭-এর বিদ্রোহ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; ১৮৬১-তে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা—এসবই শহর কলকাতাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে এক বড় অংশীদারিত্ব এনে দিয়েছিল। কিন্তু এসবের থেকেও শহর হিসাবে তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে যখন শহরে এক পুরো মাপের পৌর প্রশাসন গড়ে উঠল। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ গুরুত্ব অর্জন করেছিল এভাবেই। পৌর কর্তৃপক্ষ ঐ বছরেই শহরে উন্নত পদ্ধতিতে শোধন করে ভূগর্ভস্থ নালির মাধ্যমে নিয়মিত জল সরবরাহের সূচনা হল। কিন্তু বাংলার সঙ্গে কলকাতা ঐ বছরেই আক্রান্ত হয়েছিল গুরুতর এক বিপদের দ্বারা। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের পর ঐ মাপের দুর্ভিক্ষ বাংলা তথা উড়িষ্যাতে ইতিপূর্বে কখনো দেখা দেয় নি। দুর্ভিক্ষ শহরের মানচিত্রকে কিছুটা বদলে দিয়েছিল—নিরন্তর ক্ষুধাতুরদের মিছিলের মধ্য দিয়ে। তবে শহর কলকাতার জনবসতি ও তার জাতি-ভিত্তিক চেহারা কিন্তু আমরা ঐ বছরই প্রথম লাভ করলাম। ঐ বছর কলকাতায় প্রথম আধুনিক কায়দায় জনগণনার কাজ হয় — যে ঘটনা এই শহরের জীবনে সেই প্রথম।

১৮৬৬-র জনগণনার গুরুত্ব অনুভব করতে হলে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে শহর কলকাতার সামগ্রিক অবস্থা আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হয়। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ কলকাতায় প্রভাব ফেলতে পারে নি। সম্ভবত ঐ ঘটনাই কলকাতাকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল। ঐ শতকের গোড়া থেকেই ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রধান গতি পূর্বদিকে ধাবিত ছিল [১]। কিন্তু সরকারিভাবে সেই গুরুত্বের সঙ্গে তাল রেখে শহরের পরিকাঠামো গড়ার জন্য কোন উদ্যোগ চোখে পড়ে না। উন্নত তথা জনবহুল শহরের স্বাস্থ্যকেও যে উন্নত রাখা দরকার—তা বিদেশী শাসকরা কোন সময়ে বোঝে নি। তাই ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দেই "ফিভার হসপিটাল" কমিটির সভায় জে. আর. মার্টিন সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানান [২]। কিন্তু সরকারের সেদিকে মাথাব্যথা ছিল না—সে বাণিজ্য বিস্তারের আপন গতির সুযোগ নিতে ছিল ব্যস্ত।

কলকাতার উপযোগীতার প্রধান কারণ ছিল হুগলী নদী। এই নদী যেমন তার বাণিজ্যের প্রধান পথ তেমনি, তার প্রতিরক্ষারও প্রধান ব্যূহ। কিন্তু ১৮৫২ থেকেই এমন রব উঠল যে, নদী অতি শীঘ্র শুকিয়ে যাবে যেখানে বড় জাহাজ আদৌ চলতে পারবে না। ১৮৫৭-তে নদীর গভীরতা ছিল মাত্র ২২ ফুট এবং সেই সময়ে বড় মাপের বাণিজ্য পোতগুলি ছিল কম করেও ২৫০০ টন ভার বহনের যোগ্য। জাহাজের আয়তন

ছিল ক্রমবর্ধমান এবং উল্টোদিকে নদীর গভীরতা ছিল ক্রম হ্রাসমান। [৩]

পাশাপাশি নদীর ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন তরফেই মাথা ব্যথা ছিল না। ১৮৬৬ পর্যন্ত নিয়মিত নদীতে মরাপশু, আধপোড়া শব এবং শহরের যাবতীয় আবর্জনা নির্বিচারে ফেলে দেওয়া হত [৪]। মনে হয় জনস্বাস্থ্যের এই রূপটি ছিল সর্বজনগ্রাহ্য। নানা সমস্যা সত্ত্বেও বিদ্রোহের বছর থেকে ১৮৬৬ পর্যন্ত সময়ে শহরে জনবসতির পরিমাণ ছিল ক্রমবর্ধমান। [৫]

এই পটভূমিতে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল—কলকাতা ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে শহর হিসাবে কতখানি গড়ে উঠল এবং ১৮৬৬-র জনগণনাতে তার প্রতিফলন কেমন। কলকাতা 'শহরের' সীমা সর্বপ্রথম সরকারিভাবে ঘোষিত হয়েছিল ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর। ১৮৬৩-র ৬ নং আইনের ২ নং ধারা অনুযায়ী 'শহর' কলকাতা বলতে ১৮৬১-তে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা হাইকোর্টের আদিম ক্ষেত্রকে বোঝাল। এই ক্ষেত্রটি ছিল—উত্তর চিৎপুর খালের সামান্য দক্ষিণের সীমা, পূর্বে বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, পশ্চিমে হুগলী নদী এবং দক্ষিণে টালির নালা ও মারাঠা খালের কিয়দংশ। এই পরিধির মোট পরিমাণ ছিল ১৫,১১৫ বিঘা ৮ কাঠা ১০ ছটাক ২৭ ফুট [৬]। লক্ষণীয় বিষয় যে, ১৭৯৪-এর ঘোষিত সীমার সঙ্গে এই সীমার বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই [৭]। অর্থাৎ ৭০ বছরে শহর হিসাবে কলকাতার আয়তন বৃদ্ধি আদৌ ঘটে নি। তবে ঐ সময়কালে জনবসতির পরিমাণ অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার প্রতিফলন ঘটছে বাসযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে। ১৮৬৩-তে শহরে মোট বাসযোগ্য এলাকা, যার মধ্যে বিভিন্ন মাপের রাস্তা, জলাশয়, ধর্মস্থানও ছিল—তার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ১০,৯৫৩ বিঘা ৯ কাঠা এবং ৮ ছটাকের মত। কিন্তু রাজস্ব আদায় হত ৮৮১৪ বিঘা ১৭ কাঠা ৩ ছটাক ২৫ ফুট এলাকা হতে [৮]। অর্থাৎ শেষোক্ত পরিমাণেই ছিল সেইসব মানুষের বাস যারা শহরের দায়-দায়িত্ব বহন করত খাজনা দিয়ে। কিন্তু পূর্ববর্তী দীর্ঘ ৭৫ বছরের হিসাব নিলে দেখা যাচ্ছে যে—এই পরিমাণটাও নগণ্য। ১৭৮৮-তে রাজস্ব আদায় করা হত ৭৬৪৪ বিঘা ১৪ কাঠা ও সাড়ে ৪ ছটাক জমি থেকে [৯]। অর্থাৎ ঐ দীর্ঘ সময়ে রাজস্ব আদায় হত এমন জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ১২০০ বিঘার মত। কলকাতার নগরায়ণের পশ্চাতে এই সময়ে তার পশ্চাদ্‌ভূমির এক ভাল অংশীদারী আছে। এর জন্য চাই ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা। ১৮১০ থেকেই পূর্বদিকে এই ব্যবস্থা প্রসারিত হতে থাকে বেলেঘাটা খাল সংস্কারের মাধ্যমে। ১৮২৬ থেকে তৎকালীন পূর্ববাংলার যমুনা নদীর জলপথের সংযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়। ঐ জলপথ সর্বদা এতই জলযানে পূর্ণ থাকত যে ১৮৫৯-এ বর্তমানের আর. জি. কর রোডের পূর্বে এবং উল্টোডাঙ্গার মধ্য দিয়ে নতুন একটি খাল যা 'নিউ-কাট ক্যানাল' নামে পরিচিত—তা কাটা হল। ঐ খাল লবণ হ্রদের গা দিয়ে গিয়ে

বেলেঘাটা খালে মিশেছে। এই জলপথের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন বাংলার প্রধান শস্যক্ষেত্র বরিশাল জেলায় দ্রুত যাওয়া-আসার এবং সেখান থেকে চাল কলকাতায় নিয়ে আসা [১০]। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল উন্নতি ঘটল ১৮৪০-এর দশকে রেল যোগাযোগ শুরুর চেষ্টার মাধ্যমে। এ বিষয়ে অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর যিনি ১৮৪৪-এ 'দি গ্রেট ওয়েস্টার্ন অফ বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠা করেন [১১]। রোল্যান্ড ম্যাক্‌ডোনাল্ড স্টীফেনসন তৈরি করেন 'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি'। পরবর্তীকালে দ্বারকানাথের কোম্পানি 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' কিনে নেয়। দ্রুত এই রেলপথ কলকাতাকে (অবশ্যই হাওড়ার মধ্য দিয়ে) উত্তর ভারতের আরো কাছে নিয়ে এল। এরই ফলে উত্তরভারতের বহু মানুষ রুজির খোঁজে কলকাতায় আসতে শুরু করল [১২]। বাংলার অন্যান্য জেলাগুলিও একইভাবে কলকাতার কাছাকাছি আসতে শুরু করল। কলকাতার মধ্যেই শিয়ালদহে নতুন একটি স্টেশন তৈরি হল। ১৮৬২-তে উত্তরের নদীয়া জেলার রানাঘাট পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী ক্যানিং বন্দর পর্যন্ত দুটি রেল লাইন পাতার কাজ সম্পন্ন হল।[১৩] এমনকি কলকাতা বন্দরের নাব্যতা সমস্যা দেখা দেওয়ায় ক্যানিং-এ ঐ বছরই পৃথক বন্দর গড়ার কাজও শুরু হয়[১৪]। বন্দরকে শহরের কাছাকাছি আনা ও রেলপথের সঙ্গে তাকে যুক্ত করাও ছিল জরুরি কারণ, ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রুত পণ্য পৌঁছে দেওয়া ছিল বিদেশী শাসকদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই শিয়ালদহ থেকে বেলেঘাটা—কাঁকুড়গাছি হয়ে গঙ্গানদীর কাছ বরাবর উত্তরে রেলইয়ার্ড নির্মিত হল। শহর বিশাল বিশ্ববিপণনের অংশীদার তো বটেই এমনকি উপমহাদেশের লাখো মানুষের রুজির কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল এভাবেই।

বাণিজ্যের তাগিদে রাজস্থানের মরু থেকে যেমন মারওয়ারিরা দলে দলে কলকাতামুখী তেমনি ইহুদিরাও। একই সঙ্গে মুর্শিদাবাদ, আদিমগঞ্জ, মিয়াগঞ্জ প্রভৃতি শহরে যেসব মারওয়ারির বাণিজ্য কুঠি ছিল সেসবই মুর্শিদাবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। এইসব স্থান থেকেও তারা কলকাতায় উঠে এল। ১৮১২-তে কলকাতায় মারওয়ারির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭৫ জন যা ১৮২৩-এ বৃদ্ধি পেয়ে হল ৬০০। কিন্তু ১৮৬০-এর পর রেলপথের সুযোগ নিয়ে ঐ সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছিল দ্রুত লয়ে। [১৫]।

আবার বাগদাদে দাউদ পাশার (১৮১৭-১৮৩১) হত্যাকাণ্ড সেদেশে নিয়ে আসে চরম অস্থিরতা। তারই ফলে সেখানকার বণিককুল যাদের অধিকাংশ ছিল জাতিতে ইহুদি—তারা সেদেশ ত্যাগ করে। তাদের একাংশ এল কলকাতায়। ১৮১৬-তে কলকাতায় তাদের সংখ্যা ছিল ৫০ যা ১৮৩৭-এ হয়েছিল ৩০৭।[১৬]।

জনাগম যে শুধুমাত্র বাণিজ্য প্রসারের কারণেই ঘটছিল তা নয়। একই সময়ে কলকাতা ও তার শহরতলী একটি বড় শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে রূপ পেতে শুরু করেছিল।

হুগলী নদীর দুই তীর ধরে গড়ে উঠল কল কারখানা যাদের বেশিরভাগ ছিল চটকল। ১৮৫৭-তে এ অঞ্চলের সর্বপ্রথম পুরোদস্তুর আধুনিক কারখানা হিসাবে জন্ম হল বরানগর জুট মিলে'র [১৭]। এই ধরণের কারখানা বহু মানুষকে বহু ধরণের কাজ জুটিয়ে দেয়। দক্ষ, অদক্ষ শ্রমিক সহ কেরানি-এ জাতীয় পেশা আকর্ষণ করল হাজারো মানুষকে। মূলত বর্তমান উত্তর প্রদেশের পূর্ব দিকের জেলাগুলি ও বিহার থেকে মানুষ আসতে লাগল দলে দলে [১৮]। একই কারণে প্রতিদিন কলকাতায় তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে আসতে লাগল মানুষ। ১৮৬০-র দশকে নাকি প্রত্যহ একলক্ষ 'হিন্দু' কলকাতায় প্রবেশ ও নির্গমণ করত [১৯]।

অর্থাৎ ১৮৬৬-তে কলকাতার চেহারায় ব্যাপক পরিবর্তন অনুভূত হতে লাগল। একদিকে ইউরোপীয়দের মেট্রোপলিটান শহর গড়ার ইচ্ছা ও অপরদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষিত নব্য-কূলের আগ্রহ—এই দুই মিলে কলকাতাকে আধুনিক করার প্রয়াস শুরু। অবশ্যই ইউরোপীয়রা নিজেদের বসতি এলাকার দিকেই নজর দিল বেশি। কিন্তু সরকার ছিল ব্যয়কুণ্ঠ। তাই অভিনব প্রক্রিয়ায় ১৭৯৩ থেকে লটারির মাধ্যমে টাকা তুলে পূর্ত কাজ করার যে প্রবণতা শুরু হয়—তা কিছুটা ফল অবশ্যই দিয়েছিল। ১৮৬৬-র মধ্যে প্রধান কয়েকটি রাস্তার পাশাপাশি হুগলী নদীর তীর ধরে বাঁধাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়।[২০] ।এ সবের ফলে শহরে জমির দাম বাড়তে থাকে এবং পরোক্ষে তা পৌর প্রশাসনকেও সাহায্য করে।

১৮৪০ এর ২৪ নং আইন অনুসারে গভর্নর জেনারেলকে কলকাতার অধিবাসীদের শহরের জমি-বাড়ির মূল্য নির্ধারণের (তা অবশ্য চালু মূল্যের থেকে কোন মতেই ৫%-এর বেশি নয়) এবং খাজনা আদায়ের ক্ষমতা হস্তান্তরের অধিকার দেওয়া হয়েছিল[২১]। অর্থাৎ জন প্রতিনিধি চয়নের ব্যবস্থা হল। এই কাজ সুচারুভাবে করার উদ্দেশ্যে শহরকে চারভাগে ভাগ করা হল। ১৮৪৮-এর ২ নং আইন অনুসারে কলকাতায় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ও পরিশোধিত জল সরবরাহের প্রস্তাব হয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তা কাজে রূপান্তরিত হল না। ১৮৫২-এর ১০ নং আইন অনুসারে শহরকে উত্তর ও দক্ষিণ সোজাসুজি দুইভাগে ভাগ করা হল। উত্তরভাগ ভারতীয় এলাকা এবং দক্ষিণভাগ ইউরোপীয়। বহুবাজার স্ট্রীট ছিল মোটামুটি বিভাজিকা। শহরের ৩১টি চালু থানার সংখ্যা কমিয়ে করা হল ১৮ এবং পরবর্তীকালে ঐ ১৮টি হল শহরের পৌরসভার ১৮টি ওয়ার্ড।

এই পৌরসভা ১৮৬৩ থেকে প্রত্যহ শহরের আবর্জনা সাফ করে লবণ হ্রদ এলাকায় ফেলে দেওয়ার কাজ করতে থাকে। এ জন্য ১৮৬৪-তে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করে শহরের পূর্বপ্রান্তে একটি রেলপথও পাতা হয় [২২]। ১৮৬৬-তে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী তৈরি শুরুতে মেথররা যে বাধা সৃষ্টি করেছিল তাকেও দমন করা হল এবং পয়ঃপ্রণালী বাবদ

পৌরসভা ৪ লক্ষ ৯ হাজার ৩৩৬ টাকা ঐ বছর পর্যন্ত ব্যয় করে।

কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল পরিশোধিত জল সরবরাহ করা। ১৮৬৫-তে কলকাতা থেকে ২৫ কিলোমিটার উত্তরে পলতায় হুগলী নদী থেকে প্রত্যহ ৬০ লক্ষ গ্যালন জল তুলে তা শোধন করে মাটির তলায় ইঁটের তৈরি নালার মাধ্যমে কলকাতার টালাতে এনে তা বাড়ি বাড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা হয় এবং সে বাবদে ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য হয়[২৩]। তবে ১৮৬৬-তে কাজ যখন শুরু হল তখন দেখা গেল যে শহরে ইউরোপীয় অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়নের গতি অনেক বেশি[২৪]। ঐ বছরই শেষ দিকে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে শহরের উন্নয়নের বৈষম্য আরও বেশি করে নজরে আসতে থাকে। মজার কথা হল শহরের পূর্তকাজের ব্যয়ভার বহন করতে হত বাসিন্দাদের যাদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ ছিল ভারতীয়রা। কিন্তু তারা যে এলাকাগুলিতে বাস করত সে সব স্থানে উন্নয়নের গতি ছিল খুবই মন্থর। ১৮৫৬-তে গৃহ করের পরিমাণ ছিল ৭.৫% এবং প্রত্যেক অধিবাসীকে সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে ২% হারে পথে আলো জ্বালানোর খরচ দিতে হত। ১৮৬৬-তে পৌরসভার মোট আয় ছিল ১৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৮৪ টাকা এবং ঐ সময়ে গৃহ কর ধার্য ছিল ১০% হারে। যুক্তি ছিল ক্রমবর্ধমান ব্যয়পূরণের [২৫]। খরচ বৃদ্ধির কারণ হল জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা কারণ শহর ও তার শহরতলীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখতেই হবে সাম্রাজ্যের স্বার্থে ও তার বাণিজ্যের স্বার্থে[২৬]।

কিন্তু শহরের জনগোষ্ঠীর চেহারাটা কেমন দাঁড়াল। সেটা নির্ধারণের জন্য পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ডাঃ নরম্যান শীভারস্, মানেকজী রুস্তমজী, খান বাহাদুর মৌলভী আব্দুল লতিফ এবং রমানাথ ঠাকুরকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি হল। ৮ই জানুয়ারি ১৮৬৬ তারিখে রাত থেকে মধ্যরাত ২টো পর্যন্ত প্রতিটি বাড়ি এবং বস্তিতে গিয়ে জনগণনাকারীরা লোক গুনেছিল। সাধারণ মানুষের মনে সব রকমের ভীতি এড়ানোর জন্য ব্যাপক প্রচার করা হয় এবং এই কাজে পুলিসকে বিশেষত 'নেটিভ' পুলিসকে যুক্ত করা হয় নি[২৭]। সাধারণভাবে কলকাতাবাসী ভালই সাড়া দিয়েছিল। সমগ্র শহরকে কেবলমাত্র ১৪৯টি বাড়ি জনশূন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে তদন্তে জানা যায় যে ৯৮টি বাড়ির মানুষ জনগণনা এড়াবার জন্যই শহর ছেড়ে গিয়েছিল। কারণ, মানুষের মনে এমন একটা ধারণা ছিল যে—এটা নতুন কোন কর চাপাবার ফন্দি মাত্র। তাই বস্তির ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল হয়, বস্তির মাতব্বররা যে সংখ্যা ঘোষণা করছে—তাই গ্রহণ করা হবে, প্রত্যেক ঘরে গিয়ে গণনার প্রয়োজন নেই।

দেখা গেল কলকাতায় মোট ১০,৯৫৩ বিঘা, ৯ কাঠা, ৮ ছটাক ও ৪৪ ফুট এলাকা নিয়ে শহর। তার মধ্যে নানা আকারের জলাশয়ের পরিমাণ—৫৪৯ বিঘা, ১ কাঠা, ৮ ছটাক ৩০ ফুট; রাস্তা—১৪৬৩ বিঘা, ১৩ কাঠা, ৮ ছটাক ৪০ ফুট; ধর্মীয় স্থান— ৯৩ বিঘা, ৫ কাঠা ১ ছটাক ১৫ ফুট এবং কবরস্থান ৩২ বিঘা, ১২ কাঠা, ২ ছটাক ২৪

ফুট। অর্থাৎ মোট ২১৩৮ বিগা ১২ কাঠা, ৫ ছটাক ও ১৯ ফুট জমি। অর্থাৎ বসতির জন্য ছিল ৮৮১৪ বিঘা, ১৭ কাঠা, ৩ ছটাক ২৫ ফুট। এই এলাকায় মোট বাড়ির পরিমাণ ছিল ১৫,৯৭৫টি। এদের মধ্যে ১টি ৫ তলার, ২৬টি ৪-তলার, ৯৯১টি ৩-তলার, ৭৬৭৭টি ২-তলার এবং ৭২৭২টি ছিল ১-তলার বাড়ি। কিন্তু পাকা বাড়ির তুলনায় বস্তির সংখ্যা ছিল অনেক বেশি—৪২,৯১৭টি। এই বস্তির অধিকাংশই ছিল উত্তরে। এই আবাসনের মধ্যে শহরে ঐ দিন রাতে মোট জনসংখ্যা ছিল ৩,৫৪,৮৭৪[২৮]।

শহরে হিন্দুর পরিমাণ ছিল—২,৩১,২০৬, মুসলমানের—১,০২,৮৪৪, ইউরোপীয়দের—৬,৬৯০, গ্রিকদের—৩০, বিভিন্ন এশিয়াবাসীর—১,৩৬০, চীনাদের—৩৬৯, ইন্দো-ইউরোপীয়র—১০,৮৫৫, আর্মেনিয়ানদের—৭০৩, ইহুদির—৬৮১, পার্শীর—৯৮ এবং আফ্রিকান—৩৮। অর্থাৎ কলকাতা যথার্থই একটি আন্তর্জাতিক শহরে রূপান্তরিত। জনগণনায় পরিষ্কার হল যে—উত্তরভাগ তুলনামূলকভাবে অধিক ঘিঞ্জি। সেখানে মাথা পিছু গড় এলাকার পরিমাণ ছিল ৭ ছটাক ১৭ ফুট কিন্তু দক্ষিণভাগে ঐ মাপ ছিল ৯ ছটাক ৮ ফুট। স্বাভাবিক ভাবেই দক্ষিণভাগ ছিল পৌর-পরিষেবায় বেশি উন্নত এবং এক্ষেত্রে সেই পরিচিত উপনিবেশিক মনোভাবের প্রকাশ।

ঐ বছর কলকাতায় দুর্দিন ঘনিয়ে এল দুর্ভিক্ষ শুরু হতেই যা ছিল ১৭৭০-এর পর তাবৎকালের মধ্যে মারাত্মক। সাধারণ চালের মণ পার্শ্ববর্তী ২৪ পরগণাতে সাড়ে ৪ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হল ৬ টাকা [২৯]। দলে দলে ক্ষুধাতুর মানুষ শহরে আসতে থাকল। উড়িষ্যাতে বিপর্যয় মারাত্মক আকার নেওয়ায় সে অঞ্চল থেকেও এল মানুষের ঢল। শহরের সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল। কলেরা মহামারী আকার নিল। মৃত্যুর পরিমাণ দাঁড়াল ৬৮২৮ জন যার মধ্যে উত্তরভাগে সংখ্যাটি হল ৪৯৮৪ [৩০]। বেশকিছু সময় নীরব থাকার পর সরকারকে নড়াচড়া করতে হল। ৩০শে নভেম্বর তারিখে পুলিশ কমিশনার বাংলা সরকারের সচিবের কাছে এক পত্রে ঐ বুভুক্ষুদের শহর থেকে বলপূর্বক সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এমন কি শহরে ব্যক্তিগত দাতব্য যা রাজেন্দ্র মল্লিকের মত কিছু ধনী শুরু করেন, চালু থাকলে যে ঐ সমস্যাও থাকবে—তাও উল্লেখ করা হয়। সরকারিভাবে চিৎপুরে একমাত্র 'ফেমিন রিলিফ' কমিটিকে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হল [৩১]। অর্থাৎ সাধারণভাবে দুর্গতকে বাঁচাবার কোন উদ্যোগ না নিয়ে কেবলমাত্র শহরের দক্ষিণভাগকে বাঁচাবার প্রচেষ্টা দেখা গেল। দক্ষিণভাগই ছিল ইউরোপীয়দের বাসস্থান। কিন্তু এত সাবধানতা এমন কি চরম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা নিয়েও ইউরোপীয়দের যে অধিকমাত্রায় সুরক্ষিত করা গেল—তা বলা চলে না।

এমনই একটি চিত্র শহর হিসেবে কলকাতার প্রস্ফুটিত হল। উনবিংশ শতক

কলকাতার জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ-বিশেষত তার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে। কলকাতা সমৃদ্ধ হয়েছিল পৃথিবীর নানা প্রান্তের সাংস্কৃতিক ভাবধারাকে সম্পৃক্ত করে। সেই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল নানা ভাষা-ভাষী মানুষের আগমনের ফলে। এই মানুষদের খতিয়ান আমাদের তৎকালীন কলকাতা সম্পর্কে আমাদের বুঝতে সাহায্য করে।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। জেমস্ লঙ্—ক্যালকাটা এণ্ড ইটস্ নেবারহুড : হিস্টরি অফ ক্যালকাটা এণ্ড ইটস্ পিপল ফ্রম ১৬৯০-১৮৫৭, এস. সেনগুপ্ত সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৯৭৪) পৃ: ১০১।

২। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার—জেনারেল কমিটি অফ্ দ্য ফিভার হসপিটাল এণ্ড মিউনিসিপাল ইমপ্রুভমেন্ট কার্যবিবরণী, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩-১৫।

৩। এল, এস, এস ও ম্যালি— বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্ : ২৪ পরগনা, (কলকাতা, ১৯১৪, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৮) পৃ: ৭।

৪। ক্যালকাটা মিউনিসিপাল এডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টস্ ফর ১৮৬৬ (কলকাতা. ১৮৬৭), ২৯শে এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে লিখিত সি ফেবার টোনারস্-এর চিঠি যা সে, এস, হগের উদ্দেশ্যে প্রেরিত।

৫। রিপোর্ট অন সেনশাশ অফ ক্যালকাটা, ১৮৬৬ (কলকাতা, ১৮৬৬)।

৬। তদেব।

৭। এ. কে. রায়—ক্যালকাটা, টাউন এণ্ড সাবার্বস্ : এ শর্ট হিস্ট্রি অফ্ ক্যালকাটা, ভূমিকা এন. আর. রায (কলকাতা, ১৯৮২) পৃ: ১১৬-১৯।

৮। সেনশাশ অফ ক্যালকাটা, ১৮৬৬।

৯। সৌমিত্র শ্রীমানী, এনাটমি অফ এ কলনিয়াল টাউন : ক্যালকাটা ১৭৫৬-১৭৯৪ (কলকাতা, ১৯৯৪) পৃ: ১১০।

১০।ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া . প্রভিন্সিয়াল সিরিস্, বেঙ্গল, (কলকাতা, ১৯০৯) ১ম খণ্ড, পৃ: ২৪৩।

১১। প্লেয়ার, বি, ক্লিং, পার্টনার ইন এম্পায়ার : দ্বারকানাথ টেগোর এণ্ড দ্য এজ অফ এন্টারপ্রাইস ইন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া (কলকাতা, ১৯৮১) পৃ: ১৯৪।

১২। তদেব, পৃ: ১৯৫।

১৩। বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্ ২৪ পরগণা, পৃ: ২১৬।

১৪। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারস্, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৬।

১৫। টমাস, এ, টিমবার্গ, এ নোট অন দ্য এরাইভ্যাল অফ ক্যালকাটাস্ মারওয়ারীস্ যা, বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট পত্রিকার ৯০ খণ্ড ১ম ভাগ-এ প্রকাশিত।

১৬। টিমবার্গ, দ্য জু'স অফ ক্যালকাটা যা, ঐ পত্রিকার ৯৩ খণ্ড— ১ম ভাগ এ প্রকাশিত।

১৭। পঃ বঃ রাজ্য লেখ্যাগার, ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, মিউনিসিপাল ব্রাঞ্চ কার্যবিবরণী, নভেম্বর, ১৮৭৮, কল্ নং ১, নং-৪৬-৪৭।

১৮। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারস্, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৯।

১৯। ক্যালকাটা ইন দ্য ওল্ডেন টাইমস্—ইটস্ পিপল যা, ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকার ৩৫ খণ্ডতে (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ১৮৬০) প্রকাশিত।

২০। পঃ বঃ রাজ্য লেখ্যাগার, জেরিন ডিপার্টমেন্ট কার্য বিবরণী, ২৬শে জুন ১৮৪২ এবং জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট কার্যবিবরণী, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪; ৬ই অক্টোবর ১৮৫৯ এবং মে ১৮৬৪ দ্রষ্টব্য।

২১। এ. কে. রায়, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ১৬৪।

২২। ক্যালকাটা মিউনিসিপাল এডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টস্, ১৮৬৬।

২৩। তদেব।

২৪। তদেব, ৬ নং প্রতিবেদনটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

২৫। তদেব।

২৬। অফিসিয়াল করসপনডেন্স ডিউরিং ১৮৮৮-৮৯ রিগার্ডিং দ্য লায়বিলিটি অফ্ দ্য করপোরেশন অফ্ ক্যালকাটা টু পে পোলিশ চার্জেস্, (কলকাতা, ১৮৮৯)।

২৭। সেনশাশ অফ্ ক্যালকাটা, ১৮৬৬।

২৮। তদেব।

২৯। নরেন্দ্রনাথ লাহা, সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্ত্তি (কলকাতা, ১৯৪১) ২-য় খণ্ড, পৃঃ ৭২।

৩০। ক্যালকাটা মিউনিসিপাল এডমিনিসট্রেশন রিপোর্টস্, ১৮৬৬।

৩১। নরেন্দ্রনাথ লাহা. পূর্বোল্লেখিত, (কলকাতা, ১৯৪২) ৩-য় খণ্ড। পৃঃ ১৬-১৯।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের আর্থ সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা

দেবলীনা সিংহ

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে গ্রামীণ ঋণ ছিল একটি অন্যতম সমস্যা। দরিদ্র কৃষিজীবীদের নিম্নহার সুদে ঋণ দানের প্রয়োজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কৃষিজীবীদের অসুবিধাগুলি উপশমের তৎকালীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার মনে করেন সমবায় নীতিতে ঋণদানের সুবিধা দিলে কৃষিজীবীদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে। তাঁদের এই প্রচেষ্টা পরিণতি লাভ করে ১৯০৪ সালে Co-operative Credit Socities Act আইন হবার পর।

১৯০৪ সালের এই আইন ছিল সরল ও নমনীয়। বলা হয় তৎকালীন আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর সমস্যাগুলির প্রয়োজনভিত্তিক সমাধান বিবেচনা করেই সমবায় প্রণালীতে ঋণদানের নীতি প্রয়োগ করেছিলেন ব্রিটিশ সরকার। এই প্রয়োজনীয়তা নির্দ্ধারণের সঠিকতা অবশ্য বিচারের দাবি রাখে।

পল হুবার্ট ক্যাসেলমানের মতে সমবায় ছিল "an economic system with a social content."[1]

ভারতবর্ষে সমবায় প্রকল্পের একটি সামাজিক ভিত্তি ছিল, কারণ এর মূলে ছিল আর্থ সামাজিক ব্যাধিগুলি নির্মূল করা। তৎকালীন আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে এই প্রকল্প বা আন্দোলনের সফলতা আমাদের আলোচনার বিষয়।

সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয় পরীক্ষামূলকভাবে রাষ্ট্রনীতি হিসেবে। শুরুতে, কোন কোন ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের সমবায় সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট ছিল না। লালু ভাই সামালদাস, গোপালকৃষ্ণ গোখেলের মত কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁরা সরকারে নিযুক্ত না থেকেও সমবায় আন্দোলনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ১৯০৪ সালের আইনে কিছু ত্রুটি থাকায় সমবায় আন্দোলন সঠিকভাবে গড়ে উঠতে বা বিস্তার লাভ করতে পারে নি। এই ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্য ১৯১২ সালে Co-operative Societies Act প্রণয়ণ করা হয়। সার্বিক উন্নতির কথা ভেবে ১৯১২ সালের এই আইনে ঋণ বহির্ভূত সমিতিগুলিকেও তালিকাভূক্ত করা হয়। এই আইনের ফলে সমিতিগুলিকে সীমিত এবং অসীমিত দায়িত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়েছিল বিনিয়োগকারীদের লাভের কথা চিন্তা করা হয়েছিল এবং কেন্দ্রিয় সমিতিগুলিকে তালিকাভুক্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

১৯১২ সালের পর সমবায় সমিতিগুলি যে শুধু সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নয়, সেগুলিকে পুনর্গঠনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। ১৯১৪ সালে ম্যাকলাগান এর নেতৃত্বে একটি কমিটি হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল সমবায় আন্দোলনের ধারা পরীক্ষা এবং তার উন্নতি সাধনের পরামর্শদান।[২] উক্ত কমিটির রিপোর্ট যদিও তৎকালীন সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করেছিল সেটি আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তার অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হয়েছিল কিনা সেটি বিচার্য। ১৯১২ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছিল, প্রাথমিক সমিতিগুলি আর সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিল না, কদিনারে কয়েকটি বহুমুখী সমিতি স্থাপিত হয়েছিল, বোম্বাই অঞ্চলে সমবায় গৃহনির্মাণের প্রচেষ্টা হয়েছিল এবং শিক্ষাপ্রদানের প্রচেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু এগুলির বাস্তবিকতা চিন্তা করা হয় নি। সমবায় সমিতিগুলি সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলেও এগুলির গুণগত মানের উন্নতি হয় নি।

ভারতীয় সমবায় ক্ষেত্রে ঋণদানই ছিল প্রধান যদিও এর বহুমুখীতার প্রয়াস অব্যাহত ছিল। স্যার হোরেস প্লানকেট কৃষি বিষয়ক রয়াল কমিশনের কাছে এই মর্মে বক্তব্য পেশ করেন যে এই আন্দোলনের সরকারি নীতি হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং স্বাভাবিক অগ্রগতির ধারায় প্রবাহিত হয় নি।[৩]

সমবায় আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে ১৯১৯ সালে Reforms Act প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের ফলে সমবায় কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় অথবা প্রাদেশিক পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশ নিজস্ব সমিতি আইন (Societies Act) প্রণয়ন করে। ১৯২৫ সালে বোম্বাইতে, ১৯৩২ সালে মাদ্রাজে, ১৯৩৪ সালে বিহার ও উড়িষ্যায়, ১৯৩৭ সালে কুর্গে, ১৯৪০ সালে বাংলায় Societies Act প্রণয়ন করা হয়। বোম্বাইতে আন্দোলনের পরিধি ছিল বিস্তৃত। এর উদ্দেশ্য ছিল কৃষিজীবী ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে ব্যবহারিক জীবনে ও ব্যবসায়ে উন্নতিসাধন ও উৎপাদন বৃদ্ধি। এই আইনে অবশ্য নিয়ামক বা রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সমবায় বিভাগ (Co-operation Department) এর সূচনা হয়। সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় পদাধিকারীগণ অবশ্য আন্দোলনে বেসরকারি নেতৃত্ব চেয়েছিলেন।

১৯১৯ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে সমবায় সমিতি এবং তার সভ্য সংখ্যার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় এবং মূলধনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ঋণ বহির্ভূত ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রসার ঘটে এবং শিল্পক্ষেত্রে সমবায় নীতি প্রয়োগের পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখা যায়।

১৯২৬-২৭ সালে কৃষি বিষয়ক রয়্যাল কমিশন সমবায় আন্দোলনের উন্নতিকল্পে অনেকগুলি প্রস্তাব পেশ করে। এই কমিশনের মতে সমবায় ব্যর্থ হলে গ্রামীণ ভারতবর্ষের সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে যাবে। একথাও ঠিক ঐ সময় পর্যন্ত আন্দোলনের সার্থকতার

কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

১৯৩০-৩১ সালে সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কোচন, আন্দোলনের ওপর একটি চাপ সৃষ্টি করে। ঐ সময়ে আন্দোলনকে প্রসারিত করার পরিবর্তে সুদৃঢ় এবং পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু এর ফলে আন্দোলনে সরকারি হস্তক্ষেপ আরও বৃদ্ধি পায়।

কৃষিজীবীদের ঋণের পরিবর্তে জমি বন্ধক দেওয়ার ফলস্বরূপ সমবায় মাধ্যমে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রচলন হয়। প্রথম জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৯ সালে। এই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক নিম্নবিত্ত কৃষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না কারণ তারা জমির অধিকারী ছিল না। মহীশূরে Economic Development and Planning Commission এর শ্রী কৃষ্ণ রাওয়ের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ ৩০০ টাকার কম হলে সেটি বন্ধকী ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। মহীশূরের ৮০ শতাংশ ঋণ গ্রহীতারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল[৪]

১৯৩৫ সালে Reserve Bank of India প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একই সময়ে কৃষি ক্ষেত্রে ঋণ দানের সমস্যা ও তার সমাধানের জন্য কৃষি ঋণ বিভাগ (Agricultural Credit Department) এর সূচনা হয়। ১৯৩৭ সালে এই বিভাগের অনুসন্ধান অনুযায়ী সমবায় সমিতিগুলিকে কর্মক্ষেত্রে উন্নতিসাধনের এবং কার্যকারীতার ভিত্তিতে পুনর্গঠনের প্রস্তাব করা হয়।[৫]

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। এই সময় বৃহৎ শিল্প সংগঠনগুলি যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে লিপ্ত থাকায় সাধারণ মানুষের অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন এবং সমবণ্টনের জন্য নতুন নতুন বহুমুখী কৃষি ও বিপনন সমিতি গড়ে ওঠে। যুদ্ধের সামগ্রী উৎপাদনের জন্যও একাধিক শিল্প সমবায় ও গঠিত হয়। এই পর্যায় সমবায় সমিতির কার্যক্ষেত্রে গ্রামীণ ঋণদানের ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে বহুমুখী এবং ব্যাপকতর সংস্থার রূপ ধারণ করে।

১৯৪৪ এর Agricultural Finance Sub Committee (Gadgil Committee) এবং ১৯৪৫ এর Co-operative Planning Committee (Saraiya Committee) কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক পরিবর্তনের পন্থা নির্দেশ করে এবং ১৯৪৭-এ মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত রেজিস্ট্রারদের সম্মেলনে এর সমর্থনে রায় দেওয়া হয়।[৬] বরোদার কদিনার তালুকে তৎকালীন সমবায় বিভাগের নিয়ামক (রেজিস্ট্রার), মণিলাল বি. নানাবতী বহুমুখী সমিতি নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ বিভাগ (Agricultural Credit Department) এই প্রকার সমিতির সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে গ্রামীণ জনগণের ব্যবসার উন্নতি ও উন্নততর কর্মদক্ষতা অর্জনের উপায় হিসেবে এই প্রকার বহুমুখী সংস্থা সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ করে।[৭] কিন্তু এখানে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক

বৈচিত্র এবং লৌকিক প্রয়োজন অনুযায়ী এই নীতিগুলিকে প্রয়োগভিত্তিক করা হয় নি।

১৯৪৭ এর পূর্বাবস্থায় সমবায়ের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ সুস্পষ্ট। আপাত দৃষ্টিতে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য নির্দিষ্ট হলেও সরকারি ও ব্যাঙ্কের নথিপত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আধিকারিক ও কিছু প্রভাবশালী বিত্তবান ভারতবাসীর নিয়ন্ত্রণেই এই সমিতিগুলি ছিল। তাই বাস্তবিক দরিদ্র সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবে এই আন্দোলনে যুক্তও ছিল না, আকৃষ্টও হয়নি এবং সর্বোপরি উপকৃত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মননশীল মানুষকে সমবায়ের ধারণা যেমন অনুপ্রাণিত করে তেমনই তার অপপ্রয়োগের অপকারিতা তাঁদের দৃষ্টি এড়ায় না। তাই তাঁর সমবায় নীতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এই কোঅপারেটিভ প্রণালী আমাদের দেশকে দারিদ্র্য থেকে বাঁচাইবার উপায়। সমবায় প্রণালী চাতুরী বা বিশেষ একটা সুযোগ পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড় হইতে চাহিবে না। মিলিয়া বড় হইবে।[৮]

এই প্রসঙ্গে আই. জে. ক্যাটান্যাকের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন ভারতবর্ষই প্রথম অপাশ্চাত্য দেশ যেখানে গ্রামীণ সমবায় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় এবং সমবায়ের যে সব পদ্ধতি এখন অবলম্বন করা হয় সেগুলির উন্মেষ ভারতবর্ষেই কিন্তু অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে।[৯]

এ. জি. চন্দভারকার তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে গ্রামীণ সমবায় ব্যর্থ হয়েছিল এবং এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল ঋণ দাতার কৃষককে সঠিক হারে ভোগমুখী পণ্যের জন্য ঋণ দানে অনীহা।[১০] বস্তুত সমবায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থান্বেষী ঋণদাতার নাগপাশ থেকে দরিদ্র্যকে মুক্ত করে তাদের স্বনির্ভর করা। বাস্তবে কিন্তু ঋণদাতার পুঁজিই বাড়ে। কৃষক আরও গরিব হয়।

ঔপনিবেশিক শাসন কর্তারা সমবায়কে তৎকালীন আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনের উপযোগী করে তুলতে পারে নি। সমস্যার মূলে ছিল প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় উৎপাদন সামগ্রীর পার্থক্য নিরূপণ করে সেই অনুযায়ী সমবায়ের প্রসার করা। কার্যক্ষেত্রে তাদের নজর ছিল মুনাফার দিকে। তাই সমবায় প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে সহজাত হলেও জটিল আইন ও বিধি প্রণয়নের জন্য সমবায় প্রকল্প দরিদ্র, ক্ষুদ্র কৃষক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত গণসমর্থন পায় নি। বরং গণস্বার্থকে ব্যাহত করেছিল। তৎকালীন কর্মপ্রণালী যদি মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট না হয়ে বাস্তব সমস্যা কেন্দ্রিক প্রয়াস হত তা হলে সেই সময়ের ভারতবর্ষের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষই ছিল সমবায়ের উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। শুধু আর্থিক সাচ্ছন্দ নয়, প্রাদেশিক শিল্প কলারও প্রভূত উন্নতি হত। দরিদ্র চাষী, ক্ষুদ্র শিল্পী সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের পথ খুঁজে পেত। ভারতীয় প্রাকৃতিক সম্পদেরও যথাযথ ব্যবহার হত।

বিহার এবং উড়িষ্যার সমবায় বিভাগের নিয়ামক সমবায় মাধ্যমে জনসাধারণের

জীবন ধারণের মান উন্নতি এবং মানসিক বিকাশের প্রকল্প নির্ধারিত সমবায় প্রয়াস উল্লেখযোগ্য।[১১] শুধু ঋণ দান নয়, সুস্থ শরীর ও মানসিক বিকাশের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পানীয় জলের জন্য পরিচ্ছন্ন জলাধার নির্মাণ, ঔষধ ইত্যাদির ন্যায্যদামে সরবরাহ, জল নিষ্কাষণ, উপযুক্ত সড়ক নির্মাণ প্রভৃতি এবং সম্যক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমমনস্কতা, সহনশীলতা, পারস্পরিক প্রয়োজনে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও ছিল। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই বিশাল প্রকল্পে স্বেচ্ছা সংগঠন এবং গণসমর্থনের অপেক্ষা রাখে নি। স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন ও অভিমতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ঔপনিবেশিক পরিশাসনের পূর্ণ হস্তক্ষেপ থাকায় ক্ষুদ্র মানুষের প্রচেষ্টা পরাজিত হয়।

এফ. ডাবলু. ওয়েস তাঁর সমবায় আন্দোলনের রিপোর্টে ঋণ বহির্ভূত সমিতিগুলির ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, "The considerable and steadily growing strength of the non credit side of the movement, improving as it does the economic position of the peasants, adds greater stability to the credit side, quite apart from its education, moral influence." [১২]

এক্ষেত্রেও সমিতিগুলির ধারক ও বাহক এবং সেগুলির গুণাগুণের বিচারক ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী। গণমত এখানেও বিবেচিত হয় নি।

ঋণ বহির্ভূত সমবায় সমিতিগুলি সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হয়। বুনন সমিতি, তাঁতশিল্প সমিতি, মাদ্রাজে মুদ্রণ সমিতি, বোম্বাইতে মৎস্য সমবায় সমিতি, ট্রাভানকোরে কৃষি সমিতি, উন্নতমানের জীবনধারণের সমিতি, দুগ্ধ প্রকল্প সমবায় সমিতি, বৃক্ষরোপণ সমিতি, বীমা সমিতি, স্বাস্থ্য সমবায়, শিক্ষা সমবায় সমিতি, আবাসন সমিতি, মহিলা সমিতি, অবহেলিত গোষ্ঠীর সমিতি, পরিবহণ সমিতি, ছাত্র সাহায্য সংস্থা, মধ্যস্থতা সমিতি—প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতি গঠিত হয়। কিন্তু এখানেও হয় বৃহৎ গোষ্ঠীর বা সরকারি হস্তক্ষেপ থাকায় এবং যাদের উন্নয়নের জন্য বা স্বনির্ভরতার জন্য এই প্রকল্পগুলি নেওয়া হয় তাদের সক্রিয় ভূমিকা না থাকায় সমাজের দরিদ্রতম সামান্য মানুষের লক্ষণীয় উন্নতি সাধন হয় নি।

সমবায়ের ধারণা ভারতীয় উদ্ভাবন নয়, পশ্চিমি আরোপ। সমবায় আন্দোলন ঔপনিবেশিক নীতিরই অংশ বিশেষ—এই নীতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য পরিস্ফুট হয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ভারতে তাদের দখল আর কায়েমী করার প্রয়াস করে জনহিতার্থ ও গণ উন্নয়নের প্রলেপে। কিন্তু এই জনহিতের বিষয় এবং দিকগুলি ইংরেজ সরকারই নির্ধারণ করে, ভারতবাসীর যথার্থ প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে। ইংরেজদের সাধারণ ভারতবাসীর প্রতি সহমর্মিতার অভাব যেন আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ অনুশাসনের বেড়াজাল এই আন্দোলনকে সাধারণ

ক্ষুদ্র শ্রমজীবী মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যা সাধারণ ক্ষুদ্র মানুষকে স্বনির্ভর হওয়ায় অনুপ্রাণিত করতে পারত। বঙ্গীয় কৃষক সমিতি, মহীশূরের থোগাতাগেড়ী সমিতি প্রভৃতি গণ প্রচেষ্টারই নিদর্শন। কিন্তু ক্রমশ এগুলি ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় জনসমর্থন হারায়। এগুলি সরকারি আইন ও পরিকাঠামোর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে অগ্রগতির পথ খুঁজে পায় নি। বেশ কতগুলি বেসরকারি প্রচেষ্টার সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি সরকারি নীতি ও বিধির অনুগ না হওয়ায় সরকারিভাবে নথিভুক্ত করা হয় নি। তাই এগুলির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না।

শ্রমজীবী মানুষ, ক্ষুদ্র শিল্পী সমবায় আদর্শ নীতিতে অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিল কিন্তু সরকারি নিয়ন্ত্রণ সাধাবণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কিছু মাত্রায় হ্রাস করেছিল। সমবায় নীতি, আদর্শ, মূল ভাবনা সাধারণ মানুষকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল। ক্ষুদ্র মানুষ তাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় সমবায়ের আদর্শকে নিজস্বভাবে গ্রহণ করে ঔপনিবেশিকতার অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মোকাবিলা করার প্রয়াস করেছিল। সমবায়ের অন্তর্নিহিত মর্ম তাদের মজ্জাগত ছিল কিন্তু সরকারি অনুমোদিত পরিকাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না যার ফলে এই সকল প্রয়াস নথিভুক্ত হয় নি।

সুতরাং আন্দোলনের দুটি দিক সুস্পষ্ট ছিল—সরকারি যা নথিভুক্ত এবং সরকার বহির্ভূত স্বাতন্ত্র একটি দিক—আন্দোলনের দুটি অঙ্গই সমান্তরালভাবে গড়ে ওঠে যা ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে একসূত্রে বাঁধা হতে পারে নি।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

1. Paul Hubert Casselman, The Co-operative Movement and Some of its Problems.
2 Maclagan Report on Co-operation, 1914.
3 Horace Plunkett Foundation (Ed.), Year Book of Agricultural Co-operation
4 Speech of P H. Krishna Rao, Commissioner for Economic Development and Planning in Mysore - reported in Mysindia, 11th November, 1944.
5. Staturory Report on the Co-operative Movement, Agricultural Credit Department, R.B I.. 1937
6 Report of Agricultural Finance Sub Committee, 1944. Report of Co-operative Planning Committee, 1945
7. Bulletin of Agricultural Credit Department, 1947.
8. Rabindranath Tagore, Samabay Niti, Sravan, 1325.
9. I. J. Catanach, Rural Credit in Western India, 1875-1930—Rural Credit and the Co-operative Movement in the Bombay Presidency.
10. A. G. Chandavarkar, Money and Credit, 1858 - 1947, Cambridge Economic History of India, Vol. II, (ed.) Dharma Kumar & Tapan Raychaudhuri.
11. Report on the Condition of the Co-operative Movement, Orissa.
12. Report on the Condition of the Co-operative Movement, Punjab, 1939.

বিংশ শতাব্দীতে বাংলায় চর্মশিল্পের বিকাশ (১৯০০-১৯৪৫)

শ্রীপর্ণা বাগচী

বাংলাদেশে চর্মশিল্পের চিরাচরিত রূপটি ছিল পরিপূর্ণ অর্থেই শ্রেণীভিত্তিক, শ্রমনিবিড় এবং আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার কৃৎকৌশলের সঙ্গে সার্বিকভাবে সঙ্গতিহীন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে সুনির্দিষ্ট কতগুলি কারণে—বাহ্যিক প্রতিযোগিতা, রেলপথের সম্প্রসারণ, নগরকেন্দ্রিক চামড়ার কারখানার প্রসার, চর্মজাত দ্রব্যের বাণিজ্যিকীকরণ—এই শিল্পের নগরায়ণের প্রক্রিয়াটি গতিশীল হয় এবং গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে চামড়া প্রক্রিয়াকরণের কাজটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে।[১]

বিংশ শতাব্দীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ভারতে চর্মশিল্পের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পর্যায়ের সূচনা হয়। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সামরিক বিভাগে চর্মজাত দ্রব্যের বিশেষত সৈনিকদের জুতো ও অন্যান্য জিনিসের চাহিদা বেড়ে যায়। এই চাহিদার প্রায় অর্দ্ধেক যোগান দিত ভারতীয় চামড়ার কারখানাগুলি[২]। ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে উচ্চমানের চামড়া ও চামড়ার তৈরি জিনিস আমদানি করে ঘাটতির বাকি অংশ মেটানো হত।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় পরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে বারতে সামরিক বিভাগের প্রয়োজনীয় চর্মজাত দ্রব্যের আমদানি নিষিদ্ধ হয়। কাঁচা চামড়া রপ্তানির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর হওয়ার জন্য ভারতের বিভিন্ন বন্দরে প্রচুর পরিমাণে এই চামড়া জমে ওঠে।

প্রায় বিপর্যস্ত এই অবস্থার মধ্যেও প্রায় সমগ্র ভারতে এক নতুন ধরণের অভ্যন্তরীণ বাজার গড়ে ওঠার এবং চর্মশিল্পের পুর্নগঠনের সম্ভাবনা দেখা যায় কয়েকটি কারণে—

(১) উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য ইণ্ডিয়ান মিউনিশান বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯১৭ সালে মাইহারে 'এসোসিয়েট ট্যানিং রিসার্চ ফ্যাক্টরি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল চামড়া প্রক্রিয়াকরণের উন্নতিসাধন এবং এজন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা।

(২) এরপর ১৯১৮ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে শিল্প কমিশন গঠিত হয়। চর্মশিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির প্রাধান্য নির্ধারণ এবং প্রাপ্য সম্পদের সম্ভাব্য সর্বাধিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থার অনুমোদন করাই ছিল এই কমিশনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

(৩) এই সময় মাদ্রাজে স্যার আলফ্রেড চ্যাটারটন উদ্ভাবিত 'ক্রোম ট্যানিং পদ্ধতি' চর্মজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য, গুণগত মান উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সূচনা করে।

যুদ্ধের পরিস্থিতিতে ক্রমপ্রসারমান অভ্যন্তরীণ বাজারে চর্মপ্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রটি দ্রুত আকর্ষণীয় ও লাভজনক হয়ে উঠতে থাকলে নগরাঞ্চলে বৃহদায়তন চামড়ার কারখানা প্রতিষ্ঠা ও সেগুলির সম্প্রসারণের প্রবণতা দেখা যায়।[৩] এই সময় নতুন প্রযুক্তি, মূলধন ও সরকারের অনুগ্রহে বিদেশী উদ্যোগগুলি সামরিক বিভাগে চর্মদ্রব্য সরবরাহের স্থিতিশীল বাজার লাভের সুযোগ পায়।অন্যদিকে কানপুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় ভারতীয় উদ্যোগে চামড়ার কারখানা গড়ে উঠতে থাকে। অনেকক্ষেত্রে সীমিত সংখ্যায় ভাড়াটে শ্রমিক অথবা একই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ছোট ছোট কারখানা তৈরি হতে থাকে। এগুলির স্থায়িত্বকাল সীমিত হলেও এ কথা সত্যি যে চর্মশিল্পে রূপান্তরের মূল প্রবাহে এই উদ্যোগগুলি অংশ নিতে চেয়েছিল। এমনকি গ্রামীণ চর্মশিল্পীরাও এই প্রবাহে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছিল।[৪]

পরিবর্তনশীল এই আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিবেশে বাংলাদেশ, বিশেষত কলকাতা শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চর্মশিল্পের পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকীকরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কাঁচা চামড়া রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র বন্দর শহর কলকাতায় বিভিন্ন রেলপথের সংযুক্তি, চর্মশিল্পের জন্য পর্যাপ্ত দেশীয় শ্রমিকের সহজলভ্যতা, এবং চামড়া প্রক্রিয়াকরণের, বিশেষত 'ক্রোম ট্যানিংয়ের, উপযুক্ত প্রাকৃতিক, খনিজ ও রাসায়নিক উপাদান ব্যবহারের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে দেশীয় চর্মশিল্প বিকাশের প্রক্রিয়া দারুণভাবে ব্যাহত হয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল দেশীয় শিল্পের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা এবং বিদেশী উদ্যোগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব।

বাস্তবিক অর্থে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বাংলার দেশীয় উদ্যোগগুলি ছিল প্রধানত ক্ষুদ্র এবং সেগুলির কার্যক্রম তেমন সন্তোষজনক ছিল না। ১৯২১ সালের শিল্পসংক্রান্ত আদমসুমারি থেকে জানা যায় যে ১৯১১ সালে কলকাতা শহরের পূর্ব উপকণ্ঠে ১০টি চামড়ার কারখানায় যে পরিমাণ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল, তার তুলনায় ১৯২১ সালে ২৫টি কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা অনেক সঙ্কুচিত হয়।[৫] বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্বে বাংলার চর্মশিল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি অনুসরণে ব্যর্থ হয়। ফলে এই উদ্যোগগুলির কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাণিজ্যিকীকরণ ব্যাহত হয়।এ ছাড়া বৃহদায়তন শিল্প গড়ে তোলার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য ও সুযোগ সুবিধা থেকেও বাংলার দেশীয় শিল্পগুলি বঞ্চিত হয়।[৬]

অভ্যন্তরীণ বাজারে আমেরিকা ও জার্মানির মত শিল্পোদ্যোগীদের সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেও বাংলার দেশীয় শিল্পগুলি রেল পরিবহন ব্যবস্থায় শুল্ক হ্রাসের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের থেকে কোন সুবিধা লাভ করেনি।

বাংলাদেশে চর্মশিল্পের স্থানীয়করণ হয় নি ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতায়। এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে নির্দিষ্ট অঞ্চলে উপজাত দ্রব্য ব্যবহারের জন্য সহায়ক বা অধীনস্থ

শিল্পগুলি সঙ্ঘবদ্ধভাবে গড়ে উঠতে পারত। এর থেকে দুই ধরণের সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল—(১) আরও বেশি শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করে লাভজনক শিল্প গড়ে তোলা যেত, (২) উপজাত দ্রব্য ব্যবহার করার ফলে যে আর্থিক লাভ হত, তা বাংলাদেশে চর্মশিল্পের প্রসারে সহায়ক হত।

চর্মশিল্পের রূপান্তরের এই পর্যায়ে বাংলাদেশে চামার সম্প্রদায়ের মধ্যে চর্মপ্রক্রিয়াকরণের উন্নত কৌশল আয়ত্ত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার সুপরিকল্পিত কর্মসূচি অনুসরণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সরকারী অনীহার ফলে তা কার্যকর হয় নি। এই কারণেই এলাহাবাদ ও মাইহারের চামড়া কারখানাগুলি 'ক্রোম ট্যানিং' এর জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণে অনেক এগিয়ে ছিল।

কাঁচামাল থেকে চামড়ার তৈরি জিনিস বানানোর জন্য আরও উৎসাহ ও সুনির্দিষ্ট প্রয়াস থাকলে বাংলাদেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র শিল্পগুলির যৌথ সংগঠন গড়ে উঠতে পারত। এর ফলে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা, স্বল্প দাম এবং নির্দিষ্ট আয়ের সমান্তরাল মাত্রা তৈরি হলে শ্রমিকদের অনেক সুবিধা হত এবং দেশীয় চর্মশিল্প স্থিতিশীল হলে উৎপাদনের গুণগত মান আরও উন্নত হতে পারত।

লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রাতিষ্ঠানিক অসুবিধা সত্ত্বেও বাংলাদেশের দেশীয় চর্মশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কানপুর, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এর মত যুদ্ধকালীন চাহিদাপূরণে কিছুটা সমর্থ হয়েছিল।[৭] যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য বাংলার চর্মশিল্পীরা তাদের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। এজন্য বাজারে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে উৎপন্ন চামড়া ও চর্মজাতদ্রব্যের চাহিদা বাড়তে থাকে।

এদিকে তেজী বাজারের সুযোগ কাজে লাগাবার জন্য ভারতের অন্যান্য জায়গায় মত বাংলাদেশেও ইউরোপীয় উদ্যোগ ক্রমশই প্রসারিত হতে থাকে।[৮] সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে সেই সময় বাংলাদেশে দেশীয় ও বিদেশী উদ্যোগে পরিচালিত ১৫টি চামড়া প্রক্রিয়াকরণের প্রতিষ্ঠান ছিল। এর মধ্যে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার ছিল মাত্র ৬টি প্রতিষ্ঠানে। এর সঙ্গে তৈরি চামড়া ব্যবহারের প্রতিষ্ঠানগুলি যোগ করলে সব ধরণের প্রতিষ্ঠানের মিলিত সংখ্যা ছিল ১৮ এবং এগুলিতে কর্মসংস্থান হয়েছিল ১,০৮৯ জনের।[৯] অন্য একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে ১৯১৮ সালে বাংলাদেশে ইউরোপীয় উদ্যোগে পরিচালিত মোট ৮টি বৃহদায়তন চর্মশিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল এবং সবগুলিতেই চামড়া ও জুতো তৈরির জন্য বিদেশী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হত। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পাঁচটি অধিকাংশ ইউরোপীয় এবং অল্পসংখ্যক ভারতীয় কাজ করত।[১০]

বাংলাদেশে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে সুসংবদ্ধভাবে গড়ে তোলার জন্য ১৯১৮ সালের ২৩শে ডিসেম্বর প্রথম সরকারি উদ্যোগে পটলডাঙ্গায় 'ক্যালকাটা রিসার্চ ট্যানারি'

প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বদেশী চেতনা, আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই প্রতিষ্ঠান চর্মপ্রযুক্তির অন্যতম প্রধান কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করে। ডঃ নীলরতন সরকার ও বিরাজমোহন দাসের তত্ত্বাবধানে চর্মপ্রক্রিয়াকরণের জন্য ভারতীয় সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণায় এই প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। যে সময়ে দেশীয় চর্মশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অনিশ্চয়তার জন্য প্রায় দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় এই প্রতিষ্ঠান বাজারের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা পূরণ করে দীর্ঘস্থায়ী মুনাফা অর্জন করেছিল।[১১] ১৯২৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ হয় 'বেঙ্গল ট্যানিং ইনস্টিটিউট'। সম্ভবত, এটাই ছিল ভারতে প্রথম চর্মপ্রক্রিয়াকরণের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং কর্মসংস্থানই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।[১২]

১৯২০-২১ সালে বাংলাদেশে নতুন চর্মশিল্প গঠনের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ দেখা যায় এবং অনেক যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান এই শিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহী হয়। অপ্রত্যাশিতভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে ইউরোপে বিনিময় মূল্যের অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশে অনেক ইউরোপীয় উদ্যোগে পরিচালিত চর্মশিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও মূলধন, ব্যবসায়িক জ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতার অভাবে দেউলিয়া হয়ে যায়। শুধুমাত্র পটলডাঙার ন্যাশনাল ট্যানারি এবং কাঁকিনাড়ার ক্যালকাটা ক্রোম ট্যানারি তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে।[১৩]

১৯৩১-৩৩ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার জন্য ইউরোপীয় মুদ্রাব্যবস্থায় বিনিময়সংক্রান্ত সঙ্কট তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে ইংলন্ড ও আমেরিকার বাজারে ভারতীয় চামড়া ও চর্মজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়। অন্যদিকে উন্নতমানের বিদেশী চামড়া ও জুতোর আমদানি বেড়ে গেলে অভ্যন্তরীণ বাজারে দেশীয় শিল্পগুলির সঙ্কট তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় ন্যাশনাল ট্যানারি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কোনক্রমে টিকে থাকে। এরপর এই সংস্থার ম্যানেজিং এজেন্টস মেসার্স মার্টিন অ্যান্ড কোং লিমিটেডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়।[১৪]

বাংলাদেশে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় চর্মশিল্পের ক্ষেত্রে উদ্যোগের বহুমুখীনতা ছিল বেশি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতার কাছে ধাপায় চীনাদের মাত্র ৯টি চামড়ার কারখানা ছিল এবং এগুলিতে শুধুমাত্র চামড়া প্রক্রিয়াকরণের কাজ হত। এই সময় তারা ' ক্রোম ট্যানিং' পদ্ধতির ব্যবহার জানত না। এরপর কয়েকটি চীনা জুতো প্রস্তুতকারী সংস্থা ইউরোপীয় ও বন্ধ হয়ে যাওয়া ভারতীয় কারখানার যন্ত্রপাতি কিনে নিজেরাই চামড়ার কারখানা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয় এবং দশ বছরের মধ্যে ৩০টি নতুন কারখানা তৈরি করে।[১৫] এইভাবে প্রথমে ইউরোপীয় ও দেশীয় এবং পরে চীনাদের উদ্যোগে শিল্পসংক্রান্ত মালিকানা ক্রমশই বৃহদায়তন থেকে ক্ষুদ্রায়তনে রূপান্তরিত হয়। ১৯২০ সালের পর চামড়ার তৈরি জুতোর উৎপাদন ও বাণিজ্য চীনা অধ্যুষিত বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট

থেকে ধীরে ধীরে কলকাতা শহরতলি অঞ্চলে পাঞ্জাবি মুসলিম সম্প্রদায় দ্বারা সংগঠিত চামড়ার কারখানাগুলিতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। এখানে উত্তরভারতের মুচি সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য দেখা যায় এবং কর্মদক্ষতার জন্য তারা শ্রমশক্তির প্রধান উৎস হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় চর্মশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে তারা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।[১৬] এই সময় কলকাতাকে কেন্দ্র করে চর্মশিল্পের বাণিজ্যের আপেক্ষিক সুবিধাগুলি একদিকে যেমন চুক্তিবদ্ধ অধীন-সম্পর্কের ক্ষেত্রটি ক্রমপ্রসারিত করে তুলেছিল, তেমনই বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত হিন্দু সম্প্রদায়ের মূলধন বিনিয়োগ এই শিল্পের আর্থিক বিন্যাসে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।[১৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সংগঠিত চর্ম উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয় এবং উৎপাদিত চর্মদ্রব্য সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে ক্ষুদ্র চর্মশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দেশীয় বাজারে উৎপন্নদ্রব্য বিক্রয়ের সুযোগ পায়। কলকাতার চীনা উৎপাদন সংস্থাগুলিও এই সুযোগ গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠে। এদিকে যুদ্ধকালীন অবস্থায় চেকোশ্লোভাকিয়ার বাটা স্যু কোম্পানি কলকাতায় তাদের জুতো তৈরির কারখানার মধ্যেই চামড়া প্রক্রিয়াকরণের পৃথক কেন্দ্র স্থাপন করে। উৎপাদনের পুরো অংশটাই তারা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করত বলে দেশীয় বাজারে চাহিদার তুলনায় উন্নতমানের চামড়ার ঘাটতি ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অবস্থায় চীনাদের কারখানাগুলিতে আরও উন্নত পদ্ধতিতে অনেক বেশি পরিমাণ চামড়া উৎপাদন ও বিক্রির প্রয়াস শুরু হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে চীনাদের উদ্যোগে তৈরি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩০ থেকে বেড়ে গিয়ে ৭৭-এ দাঁড়ায়।[১৮] এগুলি নির্মাণের জন্য তারা 'দি বেঙ্গল মেশিনারি কর্পোরেশন' এবং 'দি শালিমার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস' নামে দুটি স্থানীয় শিল্পসংস্থার সাহায্য নিয়েছিল।

প্রকৃত অর্থে, চর্মশিল্পের উত্তরোত্তর শহরকেন্দ্রিকতার ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে এই শিল্পের বিশ্লিষ্টকরণের দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় এবং ভারতের অন্যান্য অংশের মত নতুন আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের ফলে চর্মশিল্পের সঙ্গে যুক্ত বাংলার গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবীদের জীবনধারায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।[১৯]

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য শ্রীপর্ণা বাগচী, 'উনিশ শতকে বাংলাদেশে চর্মশিল্পের বিকাশ', প্রবন্ধ, ইতিহাস অনুসন্ধান ১৬, কলকাতা, ২০০২, পৃ, ২৭১-২৭৬

২। জে. কে. দে, ' লেদার ইন্ডাসট্রি অফ্ বেঙ্গল ডিউরিং দি পিরিয়ড ১৯১৯-১৯৬৯', পুনর্মুদ্রিত, 'দি ডায়মণ্ড জুবিলি স্যুভেনির অফ দি কলেজ অফ লেদার টেকনোলজি, কলকাতা, ১৯৯৪ পৃ. বি ৩৮

৩। 'দি হাইডস সেস এনকোয়ারি কমিটি'-র রিপোর্ট অনুযায়ী এই ধরণের চামড়ার কারখানাগুলিতে ৪০০ থেকে ৫০০ শ্রমিক কাজ করত।

৪। এইসময় গ্রামীণ চর্মপ্রস্তুতকারীরা অভ্যন্তরীণ বাজারের মোট যোগানের ৪৩ শতাংশ চামড়া তৈরি করত। শহরের চামড়া কারখানা গুলির ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ছিল ৫০ শতাংশে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার, রিপোর্ট অফ দি মার্কেটিং অফ হাইডস্ ইন ইণ্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৫২, পৃ ৫৬-৫৭।

৫। ইনটারনাল ট্রেড ইন ইন্ডিয়া, গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, পৃ, ১৫, পুনরুল্লিখিত, বি আর রাও, দি ইকনমিক্স অফ লেদার ইনডাসট্রি, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ, ৬৬।

৬। কলকাতায় চাটার্ড ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী উদ্যোগীদের অগ্রিম অর্থলাভে সাহায্য করত। কিন্তু কলকাতার একটি দেশীয় চামড়ার কারখানার সম্পত্তির পরিমাণ এক লক্ষ টাকা থাকা সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠান দশ হাজার টাকার অগ্রিম অর্থলাভে বঞ্চিত হয়েছিল। 'এভিডেন্স অফ জে. সি. কে প্যাটারসন বিফোর দি ইন্ডিয়ান ইনডাসট্রিয়াল কমিশন', পুনরুল্লিখিত, রাও, পূর্বোক্ত, পৃ, ৮২।

৭। এভিডেন্স অফ কে. এ পীরভয় বিফোব দি ইনডাসট্রিয়াল কমিশন, পুনরুল্লিখত, রাও, পূর্বোক্ত, পৃ, ৯৫।

৮। হারনেস অ্যান্ড স্যাডলারি ফ্যাক্টরি, মেসার্স কুপার অ্যালেন এন্ড কোং প্রভৃতি।

৯। বিস্তৃত বিবরণের জন্য রাও, পূর্বোক্ত, পৃ, ৭৬।

১০। এই প্রতিষ্ঠানগুলি হল দি বেঙ্গল ট্যানারি (খিদিরপুর), ইন্ডিয়ান ট্যানারি (খিদিরপুর), ডি স্যাসুন অ্যান্ড কোং লেদার ফ্যাক্টরি (তপসিয়া রোড), এ. ই. আলেকজান্ডার অ্যান্ড কোং (কাঁচরাপাড়া), মেসার্স গ্রাহাম অ্যান্ড কোং, দে, পূর্বোক্ত, পৃ, বি ৩৮।

১১। পরিতোষ ভট্টাচার্য, বিরাজমোহন দাস ; ভাবতীয় চর্মশিল্পের জনক, পৃ, ৬৯।

১২। তদেব, পৃ, ৬৮।

১৩। দে, পূর্বোক্ত, পৃ, বি ৪০।

১৪। তদেব, পৃ, বি ৪০।

১৫। চীনারা ভাগলপুর, মোতিহারি ও বেলডাঙ্গা ট্যানারি, ইন্ডিয়া ট্যানারি ও বেঙ্গল ট্যানারির সব যন্ত্রপাতি কিনে নিয়েছিল, তদেব, পৃ, বি ৪০।

১৬। গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, রিপোর্ট অন দি সার্ভে অফ কটেজ ইনডাসট্রিজ ইন বেঙ্গল, ক্যালকাটা, ১৯২৯, পৃ, ৪০।

১৭। তীর্থঙ্কর রায়, 'ফরেন ট্রেড অ্যান্ড দ্য আর্টিজনস ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া : এ স্টাডি অফ লেদার', প্রবন্ধ, দি ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোস্যাল হিসট্রি রিভিউ ৩১, ৪ (১৯৯৪), পৃ, ৪৮৮।

১৮। দে, পূর্বোক্ত, পৃ, বি ৪১।

১৯। বিস্তৃত আলোচনার জন্য রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ৪৭৫।

সারাংশ

ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির পটভূমিকায় সিকিমের সংবাদ ও সাময়িক পত্র পত্রিকাদির ভূমিকা

কাজল কুমার রায়

সারাংশ -১ সিকিম ভারতের সঙ্গে সংযুক্তি লাভ করে ভারতীয় সংবিধানের ৩৬তম সংশোধন আইন পাশ করে এবং সংবিধানের ৩৭১ এক অনুচ্ছেদ অনুসারে ভারতবর্ষের ২২তম রাজ্যে পরিগণিত হয়ে ভারতীয় মানচিত্রে স্থান অর্জন করে ২৬ এপ্রিল ১৯৭৫ এবং এই কার্যকরী লাভ করে ১৬মে ১৯৭৫-এ ৪.৫ লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট এই মিশ্র জনগোষ্ঠীর এই রাজ্যে সাক্ষরতার হার ৩২% হওয়া স্বত্ত্বেও এই রাজ্যে প্রাক অন্তর্ভুক্তি পর্বে অনেক ভাষাভাষী সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটে। এই সংবাদপত্রগুলি ইংরাজী, নেপালী, লেপচা, তিব্বতী ভাষায় প্রকাশ হয়েছিল। চল্লিশ দশক থেকেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ সিকিমের সুপ্ত চেতনাকে আঘাত হানতে শুরু করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালী অধিবাসীরা সিকিমের ভুটিয়া, লেপচা, সামন্ত প্রভুদের আধিপত্যে কখনই খুশী ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-এ বেগার শ্রমিক ও কৃষকরা মক্তির কোন পথ খুঁজে পায়নি। ১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা লাভ সিকিমের জনসাধারণের মধ্যে নতুন আশার আলো জাগিয়ে তুলে, 'কালো ভারী'' আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে, প্রথম সংবাদপত্রের সূচনা সূচিত হয়। স্বভাবিক ভাবে একদল আন্দোলনকে সমর্থন করে, অপরদল বিরোধিতা করে পৃথিবীর যে কোন মুক্তিকামী জনগণের মধ্যে যে চেতনার রূপ পরিগ্রহ হয়। সিকিমের আন্দোলনে অনুরূপ চিত্র এই সংবাদপত্রগুলির মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল।

পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তুদের আপাত সংহতি : বাস্তব না অতিকথন ?

বিমান সমাদ্দার

সারাংশ -২ স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়ে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এক ভয়াবহ উদ্বাস্তু স্রোত। সরকারের পক্ষ থেকে সাময়িক ত্রাণ প্রদানের মাধ্যমে এ স্রোতে বাঁধা প্রদানের চেষ্টা করা হলেও এ প্রচেষ্টা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় না। ফলে উদ্বাস্তুরা অনেকেই নিজ প্রচেষ্টায় গড়ে তোলে একাধিক জবরদখল কলোনীসমূহ। বিশেষত দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর সংলগ্ন অঞ্চলে এবং উত্তর চব্বিশ পরগণার সোদপুর -

বেলঘরিয়া সংলগ্ন অঞ্চলে এই প্রকার একাধিক জবরদখল কলোনী গড়ে ওঠে। প্রাথমিক ভাবে এই কলোনীগুলি নির্মাণ, সরকারের কাছে উদ্বাস্তুদের স্বার্থরক্ষার্থে বিভিন্ন দাবি পেশ, জমির মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বাস্তুদের মধ্যে যে আপাত সংহতি চোখে পড়ে তা কিছু ক্ষেত্রে বাস্তব হলেও প্রকৃতপক্ষে এই সংহতির পেছনে ছিল বিভিন্ন প্রকার আঞ্চলিক , রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থসংঘাত। নিঃসন্দেহে একযোগে বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এই সংঘাতের চোরাস্রোত উদ্বাস্তু আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে এই অভ্যন্তরীন সংঘাত ছিল মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি সংঘাত চলেছিলো উদ্বাস্তুদের দুটি সংগঠন United Central Refugees Council বা (U.C.R.C) বনাম Refugee Central Rehabitation Council বা (R .C.R.C) র মধ্যে। অন্য সংঘাতটি চলেছিলো জবরদখল কলোনীর নেতৃত্বের মধ্যে। দ্বিতীয় ধারার সংঘাতে গুরুত্ব পেয়েছিল কোন ব্যক্তির রাজনৈতিক অবস্থান, কলোনীর প্লট বিক্রিতে অনিয়ম, প্লট দখল ও তার থেকে ব্যক্তিগত মুনাফা করার প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন জবরদখল কলোনীর মধ্যে সংঘাত সমূহ। নিঃসন্দেহে এই সংঘাতসমূহ যৌথ উদ্বাস্তু আন্দোলনের স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছিল, তবে এই স্বপ্নভঙ্গ সত্ত্বেও উদ্বাস্তু আন্দোলন এগিয়ে চলেছিলো। এই অভ্যন্তরীন সংঘাত ও উদ্বাস্তু আন্দোলনের এগিয়ে চলার এক বর্ণনাই বর্তমান গবেষকের প্রবন্ধে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও গণতন্ত্র

অশ্রুরঞ্জন পান্ডা

সারাংশ -ঃ ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় এখনও সর্বভারতীয় কোন নীতি গৃহীত হয়নি। শিক্ষা যথার্থ না হলে গণতন্ত্র বাস্তবে ফলপ্রসূ হয় না। ভারতে রাজনৈতিক স্তরে গণতন্ত্র গৃহীত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরেও সার্বজনীন শিক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। জনগণের এক বিরাট অংশ নিরক্ষর।

বর্তমানে শিক্ষা যুগ্মতালিকাভুক্ত। এর পরিবর্তে একে কেন্দ্রীয় তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন। এই সঙ্গে নার্শারী থেকে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরাজীকে পঠনপাঠনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পঞ্চমশ্রেণী থেকে এর সঙ্গে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষাকে আবশ্যিক করা দরকার। পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষায় সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের পরীক্ষার উত্তর পত্র লেখার সুযোগ থাকবে। অদের লিখিত উত্তর পত্র প্রয়োজনে ঐ ভাষার অন্য রাজ্যের পরীক্ষকদের দ্বারা মুল্যায়িত হবে। গোটা ভারতে সিলেবাস হবে

এক রকম। এর ফলে জাতীয় স্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য ঘটবে না। একটি পেপার শুধু আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে থাকবে। শিক্ষায় তপশিলী জাতি, উপজাতি ও ও.বি.সি.দের শুধু জন্মভিত্তিকরে সংরক্ষণ শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে অযৌক্তিক। ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ধনী ব্যক্তিও রয়েছে। আর্থিক অনগ্রসরতাই সাহায্যের মাপকাঠি হবে; সরকারি কলেজ, স্কুলে যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম ভর্তি করা হয়, বিশেষ করে অনার্সে তার সংখ্যা বাড়াতে হবে। উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ, বিশ্বায়ন সীমিত ভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে; জাতীয় স্বার্থ ও নীতির মধ্যে ন্যায্য খরচে তা গৃহীত হতে পারে। কোনভাবেই এখানে মুনাফা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হবে না। গবেষণার ক্ষেত্রে একটি জাতীয় মান নির্ধারিত হওয়া উচিত। ভাল গবেষণাপত্র সরকারের অর্থানুকল্যে প্রকাশিত হবে। পরিশেষে অবিলম্বে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আইনকরে চালু হওয়া উচিত।

পাইকপাড়া রাজ বাড়ি ঃ কিছু তথ্য, কিছু অনুসন্ধান

বর্ণালী সরকার

উত্তর কোলকাতায় ভাগীরথী নদীর প্রান্তে চিৎপুর অঞ্চলের সন্নিকটে বর্তমান বি.টি. রোডের পার্শ্বস্থিত 'পাইকপাড়া রাজ বাড়ি' কোলকাতার পুরাতন অট্টালিকা সমূহের মধ্যে এক অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল যে, সাধারণত পার্শ্ববর্তী চিৎপুর, কাশিপুর, বেলগাছিয়াসহ কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের নিকট এই রাজ বাড়ির অবস্থিতি অজানাই রয়ে গেছে। আর যাদের নিকট এই রাজ বাড়ির অবস্থান অজ্ঞাত নয়, তারাও জানার স্বাভাবিক কৌতূহলের অভাবে কোলকাতার জন্মলগ্নের প্রায় প্রথম পর্বে স্থাপিত এই ঐতিহ্যশালী বনেদি রাজ বাড়ি ও তার স্থাপনকারীদের সম্পর্কে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। এ কথা স্মরণে রেখে শুধু পাইকপাড়াবাসী হিসেবেই নয়, একজন ঐতিহাসিক স্থাপত্যশৈলীর অনুরাগী হয়ে এবং অতীতদিনের কোলকাতার (কলিকাতার) অজানা তথ্যের অনুসন্ধিৎসার আগ্রহের দরুণ "পাইকপাড়া রাজ বাড়ি ঃ কিছু তথ্য, কিছু অনুসন্ধান" শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছি। 'রাজ বাড়ি' সম্পর্কিত সঠিক তথ্য অনুসন্ধানের নানান সমস্যার ও প্রতিবন্ধকতার জন্য এবং সেই সঙ্গে স্বল্প কয়েকদিনের প্রস্তুতির ফলস্বরূপ উক্ত প্রবন্ধটির তথ্যাদি অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রয়োজনাপেক্ষা অপ্রতুল হয়ে পড়ায় আমি পাঠকবৃন্দের নিকট যারপরনাই লজ্জিত হয়ে মার্জনার প্রার্থনা রাখছি।

পাইকপাড়ায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিধানচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত 'রাজা মণীন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার' সংরক্ষিত, বিভিন্ন পুরাতন পত্র-পত্রিকায় ও পুস্তিকায় প্রকাশিত পাইকপাড়া রাজ বাড়ি সম্বন্ধীয় নানান প্রবন্ধাবলী থেকে অবগত হয় যে, আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে [যথাযথ তথ্যের অভাবে প্রকৃত সময়কাল নির্ধারণ সম্ভবপর হয়নি।] বঙ্গদেশের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কান্দি রাজপরিবারের *রাজা গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ* (মতান্তর সাপেক্ষে)-এর বংশধরেরা ভাগীরথী নদীর বাণিজ্যিক সহায়তা লাভের কথা বিবেচনা করে পাইকপাড়ার উপকণ্ঠে এসে এক সুবৃহৎ অট্টালিকা স্থাপন করেন এবং তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজেদের জমিদারিকে সম্প্রসারিত করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, পাইকপাড়া রাজ বাড়ির রাজপুরুষেরা স্বীয় কর্মোদ্যগে বিশাল জমিদারির আধিপত্য লাভ করে আক্ষরিক অর্থে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করলেও তাঁদের পূর্বপুরুষেরা প্রকৃত অর্থে কোন রাজবংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন না। পরবর্তীতে রাজা গঙ্গাগোবিন্দের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ একাধারে পাইকপাড়া, কাশিপুর

সহ বিভিন্ন অঞ্চলকে 'সিংহ' রাজবংশের জমিদারির আয়ত্তাধীনে আনেন। অতঃপর ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে তথাকথিত ক্ষমতালোভী ব্রিটিশ গভর্নর তথা কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষুর প্রভাব থেকে নিজেরা যথাযথ নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাংলার নবজাগরণের বাতাবরণে একাধারে শিল্প-স্থাপত্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিক্ষার পীঠস্থান রূপে তৎকালীন পাইকপাড়াকে এক বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে রূপায়িত করেন সিংহ বংশের রাজ পুরুষেরা। এক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন *রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ* এবং তাঁর সুপুত্র *রাজা বিমল চন্দ্র সিংহ*। তাঁদের এই কর্মোদ্যাগের সুযোগ্যা সহায়িকা ছিলেন রাজা মণীন্দ্রের পত্নী *রাণী অমিয়বালা দেবী*।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকৃতপক্ষে কান্দির রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার অনত্যম সভাসদ (অর্থসচিব) রাজবল্লভের দেওয়ান, যিনি তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ঢাকার (বর্তমান বাংলাদেশ) জমিদারিতে স্বীয় কর্মোদ্যগে ধন সঞ্চয় করে ভাগ্যোদয়ের আশায় কান্দিতে এসে নিজস্ব জমিদারি গড়ে তোলেন। স্বভাবতঃই তাঁর স্বনামধন্য উত্তরাধিকারী যথা ঃ- রাজা মণীন্দ্র চন্দ্র, রাজা বিমল চন্দ্র প্রমুখেরা পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে সদ্ভাব রেখেও একদিকে যেমন পাইকপাড়া অঞ্চলকে আর্থিক ও বাণিজ্যিকভাবে সমৃদ্ধশালী এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বকীয় ধারার রূপদান করেছেন। অপরদিকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বহু বিপ্লবীকে গোপনে আশ্রয়দন করে ও বিভিন্ন বিপ্লবী সংঘকে অর্থদানের মাধ্যমে বাংলার জনচেতনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন সিংহ বংশের বংশধারকগণ। দুর্ভাগ্যবশত রাজ বাড়ি সম্বন্ধীয় তথ্যসমূহের উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে কোলকাতার ঐতিহ্যশালী বনেদি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ইতিহাসের সারিতে উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করতে না পারায় পাইকপাড়া রাজ বাড়ি কোলকাতাবাসীর নিকট আজ প্রায় বিস্মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছে।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মোঘল তথা নবাবি আমলের পাইক, বরকন্দাজদের বসবাসের জন্যই সম্ভবত উক্ত অঞ্চলের নামকরণ হয়েছিল 'পাইকপাড়া'। নিজস্ব অনুসন্ধান অনুযায়ী উল্লেখ করা যায় যে, প্রায় কয়েকশো একর জমির উপর স্থাপিত এবং সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের মোঘল-ব্রিটিশ স্থাপত্যকলার সংমিশ্রণে গঠিত পাইকপাড়া রাজবাড়িটি পুরাতন কোলকাতার অন্যতম উৎকৃষ্ট নিদর্শন, যা বর্তমানে ভগ্নদশায় পর্যবসিত হয়েছে। অবতল জলাভূমি অধ্যুষিত এই পাইকপাড়া অঞ্চলে রাজ - অট্টালিকার মূল প্রবেশদ্বারটি সোপান পরিবেষ্টিত অপেক্ষাকৃত সুউচ্চ স্থানে নির্মিত হয়েছে, যা এই অট্টালিকার প্রতিষ্ঠাতাদের সূক্ষ্ম দূরদর্শিতার পরিচায়ক। সিংহমূর্তি শোভিত তোরণটি অতিক্রম করেই দেখা যায়, সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত বারান্দাকে কেন্দ্র করে চারটি সুউচ্চ ও সুপ্রশস্ত গোলাকৃতি স্তম্ভ। বহিঃবারান্দা অতিক্রম করলেই রাজ বাড়ির অন্দরে প্রবেশের জন্য বিশাল সেগুনকাঠের কারুকার্যমন্ডিত দরওয়াজার চতুষ্পার্শে অবস্থিত রয়েছে কোষাগার এবং

সুদীর্ঘ বৈঠকখানা বা অতিথিনিবাস। অতঃপর একটি সংকীর্ণ, নাতিদীর্ঘ মার্বেলশোভিত পথ পেরিয়ে অন্দরমহলে প্রবেশ করলে দৃষ্টিগোচর হয় সারি সারি আয়তাকার গৃহসমূহ (প্রায় ২০-২৫টি), যা রাজ বাড়ির মধ্যাংশের আয়তাকার পুষ্করিণীকে কেন্দ্র করে অবস্থান করছে। পুষ্করিণীর মাঝে অবস্থিত একটি মনোরম, সুদৃশ্য ঝর্ণাধারা পুষ্করিণীটির শোভা বর্ধন করে। অট্টালিকার শেষ প্রান্তে সুদৃশ্য মূল্যবান ঝাড়বাতি শোভিত বিশাল নাচঘর-এর উপস্থিতিও সেইসঙ্গে লক্ষণীয়। উত্তরমুখী রাজ বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তের প্রবেশদ্বারটি 'রাজ বাড়ির দ্বিতীয় তোরণ' রূপে পরিচিত। রাজ বাড়ির প্রতিটি গৃহের দেওয়াল সমূহে বিভিন্ন নরনারীর মূর্তি খোদিত রয়েছে, যা একাধারে নবাবি ও ভিক্টোরীয় শিল্পকলার অনুকরণীয় এবং ভগ্নপ্রায় রাজ বাড়ির অদ্বিতীয় তথা অতুলনীয় স্থাপত্যকীর্তির পরিচায়ক।

অতঃপর যার অনুল্লেখে রাজ অট্টালিকার বর্ণনা অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে তা হল, অন্দরমহলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সুবৃহৎ আয়তাকার পুষ্করিণী। সাধারণত রাজামাতা ও রাজ বাড়ির অন্যান্য মহিলা সদস্যাদের জন্যই এটি ব্যবহৃত হত। এই পুষ্করিণীর চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত মনোরম রংবাহারি ফুলের গাছের ছায়া পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলকে শীতল রাখত। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, রাজ বাড়িতে জল নিষ্কাশন, পয়ঃ-প্রণালীর বন্দোবস্ত প্রভৃতি সকলক্ষেত্রের নিপুণ ব্যবস্থায় উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শোনা যায়, উক্ত রাজদীঘির তলদেশে দুটি সুগভীর কূপ খনন করা হয়, যার সঙ্গে রাজ বাড়ির পার্শ্ববর্তী 'কলিপুকুর' নামক জলাশয়ের সংযোগ সাধন করে রাজদীঘিতে জল সরবরাহ করা হত।

রাজ বাড়ির বৈঠকখানা ও অতিথিশালার পাশ দিয়ে ঘূর্ণায়মান সোপান শ্রেণী উপরে উঠে ক্রমশ রাজ বাড়ির দোতলায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এই দোতলার গৃহসমূহে রক্ষিত বিভিন্ন বাদ্য-উপকরণাদি বাজপরিবারের সদস্যদের শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার প্রামাণ্য নিদর্শন স্বরূপ চক্ষুগোচর হয়। আর দ্বিতলবিশিষ্ট রাজ বাড়ির শীর্ষদেশে বিস্তৃত ছিল সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত উন্মুক্ত ছাদ এবং ঝুলন বারান্দা, যেখানে গাঙ্গেয় বাতাস অহরহ বয়ে চলত।

আরও যে দুটি স্থাপত্য বর্ণনের অনুল্লেখে রাজ বাড়ির বিবরণ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে, তার একটি হল রাজবাড়ীর পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থিত বিশাল তুলসী মঞ্চ, যেটি বিভিন্ন দেবদেবীর খোদিত মূর্তিসহ নানান অপূর্বসুন্দর কারুকার্যমন্ডিত হয়ে রাজ বাড়ির অন্দরমহলের শোভাবর্ধন করেছিল। অবশ্য ব্রিটিশ আমলের এই রাজ-অট্টালিকায় সেরূপ কোন অস্ত্রাগারের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় নি। সর্বশেষে বলা যায় যে, সম্পূর্ণ শ্বেতপাথরে নির্মিত রাজদীঘির স্নানঘাট তুলসীমঞ্চ ও ঘূর্ণায়মান সোপান শ্রেণীর মজবুত, আকর্ষণীয় অসাধারণ নির্মাণশৈলীই পাইকপাড়া রাজ বাড়ি সৌন্দর্যের মূল প্রাণবারি।

রাজ বাড়ির অপর অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপত্যটি হল, মূল প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রাজ বাড়ির বিল রথ, যাকে কেন্দ্র করে এখনও রথযাত্রার দিন পাইকপাড়া অঞ্চলে বিরাট

মেলা বসে ও উৎসবের বন্যা বয়ে যায়।

পাইকপাড়া রাজ বাড়ির মূল 'সিংহবাড়ি'টিই শুধু নয়, একে কেন্দ্র করে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপী সিংহরাজাদের যে জমিদারি স্থানীয় এলাকায় বিস্তৃত ছিল, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সংরক্ষণের অভাবে রাজ বাড়ির উত্তর রাজপুরুষেরা সেই সিংহবাড়ি ও তৎসংলগ্ন জমিদারির উত্তরাধিকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে সমর্পণ করেন। এক্ষেত্রে প্রধান উল্লেখ্য বিষয় হল যে, পাইকপাড়ার মূল রাজ বাড়িটি বর্তমানে পুলিস্ ব্যারাকে পরিণত হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারাধীন পৌরসভার সৌজন্যবশত পাইকপাড়া জমিদারির অধিগৃহীত বিভিন্ন স্থানে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জনবসতি গড়ে উঠেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, দেশ স্বাধীন হবার অনতিপূর্বেই সিংহবংশের শেষ উত্তরাধিকারীরা নিজেদের প্রয়োজনে ও আর্থিক সহায়তা লাভের আশায় কোলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে নিজস্ব পৃথক অট্টালিকা নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়, যার ফলস্বরূপ জমিদারির অধিকাংশ অঞ্চল বিভিন্ন সরকারি, বে-সরকারি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থাসমষ্টিকে বিক্রয় করে দেন। এইভাবে পাইকপাড়ার প্রথম পুরাতন পোষ্ট অফিসটি রাজ বাড়িতেই গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে সেইটি অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। রাজ বাড়ির সম্মুখে উত্তরদিকের বিশাল আম, জাম, লিচু, সবেদাগাছ সমৃদ্ধ ফলবাগানটিতে বর্তমানে পাইকপাড়া অঞ্চলে Kolkata State Transport-এর বাস-ডিপো নির্মিত হয়েছে। রাজ বাড়ির পূর্বপার্শ্বের দিগন্ত প্রসারিত রংবাহারি ফলশোভিত সবুজ সব্জিক্ষেত বতর্মানে পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত C.I.T. পার্ক বা 'খেয়ালী পার্ক'-এর রূপদান পেয়েছে। সর্বোপতি 'কলিপুকুর'-টি, যেটি ১৯৫০-৬০-এর দশক অবধি স্থানীয় আবাল-বৃদ্ধ বণিতার ব্যবহৃত স্নানক্ষেত্র ছিল, তা সংরক্ষিত মহিলা উদ্যানে পরিণত হয়েছে।

এক্ষেত্রে স্মরণে রাখতে হবে যে, সিংহবংশের রাজারা সেই আমলের বহু ধনবান ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দান করেছিল। পাইকপাড়ার প্রধান বাসিন্দাদের নিকট থেকে জানা গিয়েছে যে, স্থানীয় 'সব্জিবাগান' অঞ্চলে বিশাল দিঘীর পাড়ে জনৈক ধনী ব্যক্তির যে ধানকল ও চালকল ছিল সেখানে আজ ঘনবসতি অঞ্চল গড়ে উঠেছে। ঐ দীঘির অনতিদূরেই ছিল পঞ্চাননতলা শিব মন্দির (প্রতিষ্ঠা: ১৮৩৭ সন) সংলগ্ন এক-বিশাল নাট্যমঞ্চ, যেখানে সিংহরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন বার্ষিক ঋতুতে বাউল, ঝুমুর, কবির গান, যাত্রাপালা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আসর বসত এবং সেইসঙ্গে জনমনোরঞ্জনের জন্য চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে মাসাধিককালীন ব্যাপী বিরাট গাজন উৎসব হত, যা আজও অবধি সমানভাবেই অনুষ্ঠিত হয়।

সর্বোপরি উল্লেখ্য যে রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র রোড, রাণী হর্ষমুখী ও রাণী দেবেন্দ্রবালা রোড প্রভৃতি উত্তর কোলকাতার বিভিন্ন রাস্তাসমূহ আজও তাদের নামের মাধ্যমে পাইকপাড়ার রাজপুরুষদের স্মৃতি বহন করে চলেছে।

পাইকপাড়ার রাজারা প্রতিটি ধর্মের প্রতিই সমান উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন। কারণ একদিকে যেমন রাজা বিমলচন্দ্র সহ অন্যান্য রাজাদের আমলে পাইকপাড়া অঞ্চলে অসংখ্য হিন্দুমন্দির (শিবমন্দির, বুড়ো মাকালী মন্দির, মনসামাতার মন্দির, শীতলাদেবীর মন্দির) নির্মিত হয়েছে, তেমনই মুন্সিডাঙ্গার মসজিদ সিমলাই পাড়ার মসজিদ সহ বেশ কয়েকটি মসজিদও তৈরি হয়েছিল।

পাইকপাড়ার সিংহরাজাদের অসাধারণ, অকৃত্রিম বিদ্যানুসন্ধিৎসা ছিল সমকালীন যুগের আধুনিক মানসিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ পাইকপাড়ার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর কোলকাতায় রাজ বাড়ির অনতিদূরে বর্তমান বি.টি. রোডের পার্শ্বে, যেখানে রাজ বাড়ির ঘোড়ার আস্তাবল ছিল, সে স্থানে বালিকাদের জন্য অমিয়বালা বিদ্যালয় (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে) এবং বালকদের জন্য রাজা মণীন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয় (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাংলার নবজাগরণের প্রেক্ষিতে স্থানীয় বেলগাছিয়া অঞ্চলে ঠাকুরবাড়ির (জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের) বাগানবাড়িতে যখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি সাহিত্যিক ও বিদ্বৎজনের সাহিত্য চর্চা অব্যাহত ছিল সেই সময় পাইকপাড়ার রাজাগণও সেই সকল সাহিত্য সভায় তাদের উৎকৃষ্ট সাহিত্যানুরাগের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। প্রমাণস্বরূপ শোনা যায়, পাইকপাড়া রাজবাড়ির বাগানবাড়িতেই বসে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটির রূপদান করেছিলেন।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, তথাকথিত বাংলার 'বাবু-সংস্কৃতি'-র যুগেও পাইকপাড়ার 'রাজাগণ' বিলাসব্যসন অপেক্ষা জনমনোরঞ্জনকারী অনুষ্ঠান পরিচালনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন, জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, সমাজসেবা প্রভৃতি কর্মে আত্মনিয়োগ করে এক স্বতন্ত্র্য রাজবৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেন।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পাইকপাড়া রাজ বাড়ির উত্তর রাজপুরুষেরা রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন সে কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে পাইকপাড়ার 'সিংহ' রাজবংশের *রাজা বিমলচন্দ্র সিংহ* রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ) তৎকালীন স্বাস্থ্যদপ্তরের দায়িত্ব লাভ করেন। পরবর্তীতে উক্ত রাজ বাড়ির অপর একজন রাজপুরুষ *অতীশচন্দ্র সিংহ* পশ্চিমবঙ্গের এক অন্যতম বিধায়ক পদে নির্বাচিত হন এবং রাজ্যের বিরোধী দলের নেতা রূপে সাম্প্রতিককালেও জনগণের নিকট পরিচিত হয়ে রয়েছেন।

কিন্তু শেষ অবধি উপযুক্ত সংরক্ষণ, উপেক্ষা ও ঔদাসীনতার ফলস্বরূপ 'পাইকপাড়া রাজ বাড়ি' ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ আজ প্রায় চরম ভগ্নদশায় পর্যবসিত হয়ে অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হতে চলেছে — একথা স্মরণ করলে শুধু পাইকপাড়াবাসী হিসাবেই নয়, ইতিহাসের স্থাপত্যশৈলীর অনুরাগী হিসাবে আমার মনে এক স্বাভাবিক

দায়বদ্ধতার উদয় হয়েছে, যার তাগিদে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা অন্যান্য ইতিহাস সংবেদনশীল সংস্থার নিকট আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি যে, এরা যদি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার চরম দুর্দশাগ্রস্ত পরিণতি থেকে এই রাজ বাড়িকে উপযুক্ত সংরক্ষণের মাধ্যমে স্থায়িত্বের সুরক্ষা দান করেন, তাহলে শুধুমাত্র পাইকপাড়া বা কলিকাতাই নয়, সমগ্র বঙ্গদেশ সহ আমাদের রাষ্ট্র ও তার এক ঐতিহ্যশালী স্থাপত্য নিদর্শনের গর্বে গর্বিত হবে।

সূত্র-নির্দেশ ঃ —

১। 'রাজবাড়ি উপাখ্যান' [রাজামণীন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুস্তিকা।]

২। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'কড়চা' বিভাগ [১৯৯১ সালের আগষ্ট মাস-এ]।

৩। শ্রীরামপুর কলেজের নিজস্ব প্রকাশিত বাৎসরিক পুস্তিকা — প্রবন্ধ ঃ 'পাইকপাড়ার ইতিবৃত্ত'।

৪। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় বিভাগ — 'কলিকাতার বনেদী পরিবার সকল' [২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে।]

৫। নিজস্ব ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অনুসন্ধান।

মহেন্দ্রনাথ মাইতির স্মরণে মহেন্দ্র রিলিফ কমিটি

রাসবিহারী মিশ্র

"জাতির দেশের বা সমাজের যদি মঙ্গল হয় তবে আমার, স্বার্থহানি হয় হউক — অম্লান বদনে এই কথা বলিতে পারাই প্রকৃত জাতীয়তাবোধ" — কালিদাস রায়।

কথায় ও কাজের মধ্য দিয়ে এই জাতীয়তাবোধ প্রস্ফুটিত হয়েছে — এই ধরণের ব্যক্তিত্বের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বছর পরে, আমাদের স্মৃতিপট থেকে হারিয়ে যায় না এরকমই একটি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ মহেন্দ্র নাথ মাইতি। মহেন্দ্র নাথ মাইতি মেদিনীপুর জেলার সবং থানার তিলন্তবাড়া গ্রামে সে যুগের তুলনায় যথেষ্ট সম্পদশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে নাম ছিল। আইনি পাশ করার পর প্রথমে কাঁথি কোর্টে প্র্যাকটিস করেন। ধীরেন্দ্র নাথ শাসমলের সহিত মহেন্দ্রনাথ এর পরিচয় এবং বিভিন্ন বিষয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশাত্ববোধ কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। মহেন্দ্রনাথ বীরেন্দ্র শাসমলের কাছে স্বাদেশিকতার প্রেরণা পেয়ে বুঝেছিলেন পরাধীন জাতি আর স্বাধীন জাতির পার্থক্য কি, তিনি বুঝেছিলেন পরাধীনতার জ্বালা কত দুঃসহ। তিনি বুঝেছিলেন অন্তরকে দেশপ্রেমময় করা ভিন্ন ঐ জ্বালা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোন রাস্তা নেই। বীরেন্দ্রশাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুরের ইউনিয়ন বোর্ড বাতিল এবং বর্ধিত চৌকিদারি ট্যাক্স বর্জন আন্দোলন, অসহযোগ পর্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহসে এক অনন্য অধ্যায়। চির উন্নত শির বীরেন্দ্রনাথ বঙ্গ প্রদেশে সর্বময় হাইকোর্ট আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। মহেন্দ্রবাবু কাঁথির ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে তমলুকে চলে আসেন এবং এখানে আইন ব্যবসা শুরু করেন মাঝে মাঝে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তমলুকে এসে মহেন্দ্রনাথের সহিত কংগ্রেসের সাংগঠনিক আলোচনার মধ্য দিয়ে কিভাবে সংগঠন বাড়ান যায় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতেন। মহেন্দ্রনাথ মাইতির বাড়িতে কংগ্রেস সংগঠনকে মজবুত করার জন্য আসতেন সতীশ সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, রমেশ বেরা, সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী, ইন্দ্রপ্রভা দেবী, জ্ঞানেন্দ্র নাথ মাইতি, কুমার জানা আরও অনেকে ঐসময় মহেন্দ্র নাথ মাইতি তমলুক মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন এবং সম্পাদক ছিলেন চন্ডীচরণ দত্ত, ১৯২০ সালে মহেন্দ্রবাবু বাংলাদেশের তমলুক নির্বাচন কেন্দ্র থেকে আইনসভায় নির্বাচিত হন। কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় বীরেন শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলন শুরু হল — যার ফলে অসহযোগ আন্দোলনকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ঠিক হলো। এই আইন বলে সরকার গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন

বোর্ড গঠনে উদ্যোগী হলেন। ইউনিয়ন বোর্ড এর ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করায় — গ্রেপ্তার জেল ও জরিমানা নানাবিধ অত্যাচার শুরু হলো। গ্রামবাসীদের ঘর থেকে বহুমূল্য জিনিষপত্র ক্রোক করা হল। নীলাম জিনিষগুলি বিক্রয় করার জন্য ক্রেতা খুঁজে পাওয়া গেল না। শত অত্যাচারের মধ্যেও ইউনিয়ন বোর্ড এর ট্যাক্স আদায় করা সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়ে সরকার ১৯২১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ইউনিয়ন বোর্ড বাতিল ঘোষণা করলেন।

তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করে বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী গ্রহণ সংগ্রামের কর্মসূচি গ্রহণ করা হ'ল। মহেন্দ্রবাবু ১৯২৫ সালে তমলুক পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এই সময় নিরক্ষরতার অভিশাপ যখন মানুষের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে দিচ্ছিল, নারীদের শিক্ষার সুযোগ বলে বিশেষ কিছু ছিল না, তখন যতই রাজনীতি করা হোক না কেন দেশের জনগণকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে সবই বৃথা যাবে — এই কথা মর্মে মর্মে তিনি অনুভব করেছিলেন। সেজন্য মহেন্দ্রবাবু নিজের বাড়িতে একটি ছাত্রাবাস খুললেন। গরিব মেধাবী ছাত্রদের থাকা, খাওয়া ও বেতনের ব্যবস্থা করতেন। মহেন্দ্রবাবু নির্লোভ রাজনীতি, নিষ্ঠা, সততা এবং জনসেবকের প্রতিমূর্তি ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ মাইতি ও দাদা উপেন্দ্রনাথ মাইতির প্রচেষ্টায় হেমচন্দ্র কানুনগোকে ফ্রান্সে পাঠিয়েছিলেন চিত্রকর করতে। কিন্তু, মূল উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র যোগাড় করা এবং গুপ্ত বৈপ্লবিক সংঘের কর্মপন্থা শিক্ষার জন্য মহেন্দ্রবাবু চেয়ারম্যান থাকাকালীন তমলুক শহরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে যখন তখন অজীর্ণ এবং কলেরা মহামারীতে শতশত নরনারীকে অকালে প্রাণ দিতে হতো। দলনীতি উপেক্ষা করে দেশ ও সমাজের কল্যাণ সাধন হউক এই চিন্তা করে তিনি মেদিনীপুর লাট সাহেবের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন, দরবারে মহেন্দ্রবাবুর আবেদনে মহিষাদলের রাজা কুড়ি হাজার টাকা এবং সরকার তেরহাজার একশত টাকা মোট ৩৩১০০ টাকায় তমলুক পৌরসভার মধ্যে কয়েকটি গভীর নলকূপ খনন করা হয় এবং তাতে তমলুক শহরবাসী মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পায় ১৯২৯ এর ডিসেম্বরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল — পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব। ১৯৩০ এর ২৬শে জানুয়ারি ঘোষিত হলো দেশজুড়ে স্বাধীনতার শপথ গ্রহণের দিন। ঐ দিনে তমলুকে ২৬শে জানুয়ারি সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ মাইতি ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন এবং সহস্রকণ্ঠে ধ্বনীত হ'ল পূর্ণ স্বাধীনতার শপথবাক্য। তাই আজও ২৬শে জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করা হয়। ভারতবর্ষ জুড়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে আইন অমান্য আন্দোলন এবং তার পাশাপাশি অশান্ত যৌবনের দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক কাজকর্মে চলছিল পুরোদমে।

৬ই এপ্রিল ১৯৩০ সাল গান্ধীজী লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। জাতির জনক গান্ধীজী সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন-লবণ আইন অমান্য করে লবণ প্রস্তুতের মধ্যে-সারা

ভারতে লক্ষ লক্ষ জনতা সেই আগুনে পূর্ণাহুতি দেওয়ার জন্য জীবন পণ করে এগিয়ে চলবেন। মহেন্দ্রনাথ মাইতি ও সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তীর নেতৃত্বে "তমলুক মহকুমা আইন অমান্য পরিষদ" গঠিত হয়। প্রতাপ চন্দ্র গুহরায়, জীতেন্দ্র নাথ মৈত্র, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী ও চারুশীলা দেবী আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচার করেন। নরঘাট লবণ আইন অমান্যের আগে মহেন্দ্রবাবু গ্রেপ্তার হন। প্রথমদিন একদল স্বেচ্ছাসেবক সহ অজয় মুখার্জী নরঘাটে লবণ তৈরি করে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। অজয় মুখার্জী পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হলেন — বিচারে দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তৃতীয় দিনে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার হলেন সতীশ চন্দ্র সামন্ত। তাঁর সাজা হ'ল আড়াই বছর।

১৯৩৮ সালে সুভাষ চন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর মহেন্দ্রবাবু তমলুকে একটি জনসভা করার জন্য উদ্যোগ নেন। তাঁর চেষ্টায় ১৯৩৮ সালের ১১ই এপ্রিল তমলুক রাজ বাড়ির সংলগ্ন খোসরঙ্গ মাঠে জনসভা হয়। তমলুক রাজ পরিবারের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। সুভাষ চন্দ্রের ভাষণ শ্রোতাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের শুভাগমনে ধন্যপূর্ণ তমলুকের মাটি, মানুষ, ঐতিহ্য ও ইতিহাস। মহেন্দ্রবাবু বলেছিলেন — আমি কি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারবো ? তার উত্তরে সুভাষবাবু বলেছিলেন — ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে তা নিঃসন্দেহ। আমাদের দেশের যুবক যুবতীরা তাদের এই মহান দায়িত্বভার উপলব্ধি করেছেন এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমি জানি তাঁদের আত্মত্যাগ, তাদের দুঃখ স্বীকার এবং তাঁদের কর্মের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্ম হবে। ১৯৪০ সালের ৬ই জুন মহেন্দ্রনাথ মাইতির জীবনাবসান হয়।

১৯৪২ সালে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন শুরু হলো। আন্দোলন চলাকালীন ১৬ই অক্টোবর প্রলয়ঙ্কর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে তমলুক ও কাঁথি মহকুমার ১৬০০ গ্রাম জলমগ্ন হয়। সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঝড়ের পূর্বাভাস জেলা কর্তৃপক্ষ চেপে রেখেছিলেন। সরকারি ত্রাণ শুধু অপর্যাপ্তই ছিল না। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। প্রতিবাদে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা থেকে অর্থমন্ত্রী ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন।

এই অবস্থায় মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেস নেতৃত্ব ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়-এর সঙ্গে দেখা করেন। কি করে জেলার মানুষকে বাঁচান যায় তার জন্য ডাঃ বিধান রায়ের কাছে সুচিন্তিত অভিমত জানতে চান। ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে মাড়োয়ারি রিলিফ কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে তমলুকে প্রয়াত অবিস্মরণীয় মহেন্দ্রনাথ মাইতির নামে "মহেন্দ্র রিলিফ কমিটি" বেসরকারি ত্রাণকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। মহেন্দ্রনাথ মাইতির বাড়িতে রিলিফ্ কমিটির অফিস স্থাপন করা হয়। অজয় মুখোপাধ্যায় এবং সতীশ সামন্ত সহ অন্যান্য নেতারা আত্মগোপন অবস্থায় সেবাকার্য চালিয়েছেন "মহেন্দ্র রিলিফ কমিটির" সভাপতি ছিলেন অনঙ্গ মোহন

দাস, ব্রিটিশ শাসন, শোষণ, নির্যাতন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতিতে দুর্ভোগ চরম হলেও মেদিনীপুরের মানুষ "স্বাধীনতার" জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল ১৯৪২ এর ১৭ই ডিসেম্বর "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার" প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় সতীশ চন্দ্র সামন্ত। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা বুভুক্ষু মানুষজনের প্রতি বেশিরভাগ সরকারি কর্মচারীদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না, অপরপক্ষে বেসরকারি সাহায্য অত্যন্ত অপ্রতুল হলেও আন্তরিকতায় সকলের কাছে সমানভাবে গ্রহণীয় ছিল।

বেসরকারি দাতব্য প্রতিষ্ঠান "বেঙ্গল রিলিফ কমিটি" এবং মাড়োয়ারি রিলিফ্ কমিটির সাহায্যার্থে "মহেন্দ্র রিলিফ্ কমিটি" পরিচালিত হতো, জাতীয় সরকার স্থাপিত হওয়ার পর (১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২) আর্তত্রাণে জাতীয় সরকারের পূর্ণ সহযোগিতায় এবং বেসরকারি ত্রাণ কমিটির সহায়তায় মহেন্দ্র রিলিফ্ কমিটির কাজ উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করে। যেসব প্রতিষ্ঠান ঐ সময় আর্তদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর মহামারী রোখার জন্য মহেন্দ্র রিলিফ্ কমিটির পরিচালনায় কয়েকটি মেডিক্যাল কেন্দ্র মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন করা হয়। কলিকাতা থেকে ডাক্তার এবং পাঠরত ছাত্ররা অনেক দূরদুরান্ত গ্রামের মেডিক্যাল কেন্দ্রগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে সেবাকাজ চালাতেন। জাতীয় সরকার ৭৯০০০ হাজার টাকার কাপড় চোপড়, ঔষধপত্র, খাদ্য দ্রব্যাদি দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের হাতে মহেন্দ্র রিলিফ কমিটির মারফৎ দিয়েছিলেন। সুদূর নন্দীগ্রাম ও সুতাহাটি থানার যোগাযোগ বিহীন গ্রামগুলিতে ডাক্তারবাবুদের আন্তরিক সাহচর্যে দুর্ভিক্ষজনিত মহামারী অনেকাংশে শিথিল ছিল। প্রধানত জাতীয় সরকারের স্বেচ্ছাসেবকদের তত্ত্ববধানে বিভিন্ন কেন্দ্রে ত্রাণের জিনিষগুলি বিলিবন্দোবস্ত করা হ'ত।

আত্মগোপন অবস্থায় আমার উপর (রাসবিহারী মিশ্র) ঐ মেডিক্যাল কেন্দ্রগুলি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার দায়িত্ব ছিল।

ইতিহাস নতুন তথ্যের ভিত্তিতে নতুন আলোকে ইতিহাস বার বার পুনঃলিখিত হয়। যুগের ভাবধারাও ইতিহাসের উপর তার প্রতিফলন রেখে যায়। মহেন্দ্র বাবুর জীবনচরিত তমলুকবাসীকে অনুপ্রাণিত করবে — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মহেন্দ্রবাবুকে স্মরণীয় রাখার জন্য ডাঃ যোগেন্দ্র নাথ পট্টনায়ক তমলুক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থাকাকালীন ১৬/১১/৭৭ তারিখে মাসিক সভায় একটি প্রস্তাবে পৌরসভার নব নির্মিত হলটি মহেন্দ্র স্মৃতি সদন রাখার প্রস্তাব গৃহীত হল।

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭৭ সালে মহেন্দ্র স্মৃতি সদনের দ্বারোদঘাটন করেন জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক সতীশ চন্দ্র সামন্ত এবং বিদ্যুৎ বাহিনীর নায়ক সুশীল কুমার ধাড়া প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এই সামান্য কয়েকটি কথা মহেন্দ্র বাবুর সম্পর্কে

বলে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সূত্র নির্দেশ ঃ —

১। তমলুক পৌরসভার তথ্য পঞ্জী-২০০০।

২। সর্বাধিনায়ক সতীশ সামন্ত তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি।

৩। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার-রাধাকৃষ্ণ বাড়ি।

৪। বিংশ শতাব্দীর তমলুক - শ্রী শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী।

দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে 'তাম্বুলী সমাজে'র উৎস সন্ধানে

সোমা খান

এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য তাম্বুলী নামক বাঙালী সমাজের অন্যতম এক প্রাচীন গোষ্ঠীর উৎস সন্ধান নয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে উন্নতিকল্পে তাম্বুলী বণিকদের এক আঞ্চলিক প্রচেষ্টার পটভূমি, কার্যকারণ, গতিপ্রকৃতি ও প্রভাব আলোচনা করা। বর্তমানে এটা প্রমাণিত সত্য যে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত প্রাক্ আধুনিক বাঙালী সমাজও সম্পূর্ণ নিশ্চল ও বদ্ধ ছিল না; প্রধানত অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক শক্তি সামাজিক উত্থানের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত না। ঔপনিবেশিককালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। সামাজিক সম্মানলাভের এই প্রচেষ্টা বাঙলার তাম্বুলী সম্প্রদায়ের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়, রিজলের প্রতিবেদন অনুযায়ী তাম্বুলীরা বাঙালী সমাজের অন্যতম এক অগ্রণী সম্প্রদায়। ১৯ শতকের শেষদিকে এরা নবশাখ ও জলাচরণীয় হিসাবে গণ্য হত, তাঁদের তাম্বুলী বণিক নাম থেকেও তাঁদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি স্পষ্ট হয়। কৃষিকাজের পরিবর্তে ব্যবসা কাজের প্রতি তাঁদেব প্রবণতা দেখা যায়। শিক্ষকতা, ওকালতি, সরকারি চাকুরি, ডাক্তারি, মোক্তারি ইত্যাদি আধুনিক বৃত্তিরও প্রচলন তাঁদের মধ্যে হয়ে যায়। কেউ বা জমিদারিকেও বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে।[১] ১৯ শতকের শেষদিক থেকে জনগণনা করতে গিয়ে ইংরেজ সরকার হিন্দু সমাজের জাতি বিভাজনের ওপর গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করলে তথাকথিত অনগ্রসর জাতিগুলি এটাকে 'জাতে-ওঠার' একটা সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে। অন্যান্যদের মত বাঙলার তাম্বুলী বণিকদেরও এই সময় এই উদ্দেশ্যে উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। ২০ শতকের গোড়ায় (১৩০৯ সন) কলকাতা নিবাসী তাম্বুলী বণিকরা এই কারণে যে 'তাম্বুলী সমাজে'র প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের সংগঠিত করা আরম্ভ করে, অচিরেই বাঙলার বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী তাম্বুলীদের মধ্যে অনুরূপ সংগঠনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে এর সর্বপ্রথম নিদর্শন ১৩২৪ সনে (১৯১৭ খ্রিঃ) বাঁকুড়া জেলার হরিহরপুর গ্রামে 'রাজহাটী তাম্বুলী সমাজে'র প্রতিষ্ঠা। আধুনিককালে তাম্বুলীদের আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজেদের 'বৈশ্য' হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা, এবং মূলত এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা নিজেদের নতুনভাবে সংগঠিত করে। তবে এই সংগঠনের নেতৃত্বের চরিত্র ও ভূমিকা, সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচি এবং সংগঠনের সদস্যদের কার্যকলাপের আলোচনা করলে এই আধুনিক জাতি আন্দোলনের চরিত্র এবং বিশেষভাবে তাম্বুলী সম্প্রদায় ও সাধারণভাবে বাঙালী সমাজে এর প্রভাব বোঝা যেতে পারে। বর্তমান নিবন্ধ এই দিশায় একটি প্রাথমিক প্রয়াস।

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে 'তাম্বুলী সমাজে'র উৎস অনুসন্ধানের পূর্বে তাম্বুলী জাতির উৎসমূল আলোচনা প্রয়োজন। নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন যে বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলার আর সকল জাতিই সংকর জাতির অন্তর্ভুক্ত।[২] তবে এই সংমিশ্রণ সম্পর্কে বৃহদ্ধর্মপুরাণের বক্তব্য হল বৈশ্য পিতার সঙ্গে ব্রাহ্মণ মাতার বিবাহের ফলে তাম্বুলী জাতির সৃষ্টি হয়েছে।[৩] পূর্বোক্ত দুই পুরাণ ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বাঙালী হিন্দু সমাজ জীবন ও জীবিকার যে চিত্র পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় তৈলিক, মোদক, গন্ধবণিক প্রভৃতির ন্যায় তাম্বুলী জাতিও বণিক ব্যবসায়ী শ্রেণী। এই শ্রেণী প্রধানত গুবাক ও পানের বীড়া বেঁধে বেচত। রিজলে বাঙলার তাম্বুলী জাতির মধ্যে কতগুলি Sub-caste বা থাক লক্ষ্য করেনঃ (১) সপ্তগ্রামী, (২) অষ্টগ্রামী, (৩) চৌদ্দ গ্রামী (৪) বিয়াল্লিশ গ্রামী ও (৫) বর্ধমানী, তবে এছাড়াও আরও কয়েকটি থাকের যেমন ৪র্থ গ্রামী, রাজহাটী ইত্যাদির উল্লেখ অন্যত্র পাওয়া যায়।[৪] ১৯ শতকের শেষদিক থেকে তাম্বুলী সম্প্রদায় তাদের প্রাচীন জাতিগত পেশা ছেড়ে উত্তরোত্তর সরকারি চাকুরি, ডাক্তারি, মোক্তারি, শিক্ষকতা, ওকালতি প্রভৃতি আধুনিক বৃত্তি গ্রহণ করে। সমাজের আধুনিক ক্ষেত্রে তাদের এই প্রবেশ এক ভিন্ন মানসিকতার পরিচয় দেয়; এই মানসিকতাই তাঁদের নিজেদের সম্প্রদায়ে উন্নতি ঘটাতে ও বৃহত্তর বাঙালী সমাজে নিজেদের গ্রহণ যোগ্যতা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগী করে তুলতে অনুপ্রেরণা যোগায়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা নিবাসী কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তির নেতৃত্বে তাম্বুলী সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় 'তাম্বুলী সমাজ প্রতিষ্ঠিত' হয়। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, মহকুমা শহর এবং পার্শ্ববর্তী দুই রাজ্য উড়িষ্যা ও বিহারের তাম্বুলী সম্প্রদায় স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ অঞ্চলে সংগঠন গড়ে তোলে।

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে 'তাম্বুলী সমাজে'র সর্বপ্রথম নিদর্শন বাঁকুড়া জেলায়। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের তাম্বুলী সম্প্রদায়ের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির উদ্দ্যোগে ১৩২৪ সনে 'রাজহাটী তাম্বুলী সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রথম সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ কুন্ডু, যিনি পেশায় একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন। এছাড়াও কয়েকজন শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী এর কর্ণধার ছিলেন। বস্তুত পক্ষে এই সমস্ত উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গ স্বজাতির জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে তাম্বুলী সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হন। ১৩২৪ সনের ১৭ই চৈত্র বাঁকুড়া জেলার হরিহরপুর গ্রামের হরিহর নাট মন্দিরে 'রাজহাটী তাম্বুলী সমাজে'র প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত রাজগ্রাম বীরসিংহপুর, ছাতনা, হাটগ্রাম, শুশুনিয়া, গৈরা, বিষ্ণুপুর, কালাবতী, চান্ডিল, খাতড়া বানশুখা প্রভৃতি গ্রামের সম্মিলিত ৪৫ জন গ্রামুন্যি (গ্রাম সভার প্রধান) উপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রথম অধিবেশনে সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন নিয়মাবলী গৃহীত হয়। রাজহাটী থাকের বিবাহে ব্যয় বাহুল্য হওয়ায় ব্যয় কমাবার জন্য কতগুলি বিবাহ সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রস্তুত হয় এবং সেই নিয়মানুযায়ী কাজ করতে সমবেত প্রতিনিধিরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। বিবাহ সংক্রান্ত, নিয়মাবলীর ক্ষেত্রে বিবাহের পূর্বে আশীর্বাদী ছাড়া অন্য কোনরকম ভেট বা কোনরূপ আদান প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়, তাছাড়া 'আশীর্বাদী' হয়ে গেলে বিশেষ কারণ ব্যতীত বিবাহ বন্ধ সম্ভবপর নয় বলে ঘোষিত হয়। বিবাহ আসরে খেমটা নাচ, মদ্যপান ও অন্যান্য কুপ্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। সভায় স্থির হয় কন্যাকর্তার সম্মতিক্রমে বরযাত্রীর সংখ্যাও পূর্বে নির্দ্ধারিত হবে এবং বরযাত্রীর মধ্যে গ্রামস্থ পুরুষ ব্যতীত স্ত্রীলোক নিমন্ত্রণ করা চলবে না। এছাড়া যৌতুকের ক্ষেত্রে কন্যাকর্তা ও মাতুল ছাড়া অন্যান্য আত্মীয় বাসনের পরিবর্তে নগদ টাকা দেবেন। উক্ত অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভায় যে সমস্ত বিবাহ সংক্রান্ত নিয়মাবলী গৃহীত হল তর বিরুদ্ধাচারণের প্রতি গ্রামুন্যি লক্ষ্য রাখবে এবং ৫০ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড করতে পারবে। যদি কোন ব্যক্তি গ্রামুন্যির কথা না মানেন তাহলে তা শতকীতে (বিভিন্ন গ্রামুন্যি নিয়ে গঠিত একটি উচ্চ সভা) জানাতে হবে।

তাম্বুলী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ ও পণ প্রথার প্রচলন থাকলেও বিশ শতকের আধুনিকতার স্পর্শে তাঁদের মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত কুসংস্কার বর্জন করে সুস্থ সমাজ গঠনের মানসে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এই কারণে পত্নী জীবিত থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার বিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং পণপ্রথা যাতে রদ হয় সে ব্যাপারে সভার অধিবেশনে কার্যক্রম গৃহীত হয়।

'সমাজে'র তৃতীয় অধিবেশনের সভায় মন্তব্য করা হয় যে অনেক উপবংশি বা বিদেশাগত ব্যক্তি বাঁকুড়ায় বসবাস করছে যারা বাঁকুড়া গ্রামুন্যির অনুমতি নেয়নি বা সাধিগমি (কোন অঞ্চলে বসবাসের জন্য দেয় এক বিশেষ কর) দেয় না। তাই সভার অধিবেশনে স্থির হয় কোন ব্যক্তি নিজ গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে বসবাস করলে তাকে সেই গ্রামের অনুমতি নিতে হবে নতুবা সেই ব্যক্তি কোন গ্রামুন্যির সহানুভূতি ও সাহায্য পাবেন না।

তাম্বুলী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন থাক বা Sub-caste-র মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ চলত না। তাই কেউ থাক ভেঙে বিবাহ দিলে সামাজিক নিয়মভঙ্গের অপরাধে তাকে অর্থদন্ড করার নিয়ম গৃহীত হয়। যদিও পরবর্তীকালের বিভিন্ন অধিবেশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় এই নিয়ম ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়েছিল।

প্রথম অধিবেশনে একটি জাতীয় ধনভান্ডার গঠনের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। বস্তুতপক্ষে সামাজিক নিয়মভঙ্গের জন্য যে অর্থদন্ড আদায় করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা এই জাতীয় ধন ভান্ডারে জমা করা এবং সেই অর্থ দিয়ে স্বজাতির দুঃস্থ বিধবা মহিলাদের ভরণপোষণ ও দুঃস্থ ছাত্রদের শিক্ষার জন্য সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৩২৮

সনের কার্যনির্বাহক সমিতির রিপোর্ট থেকে জানা যায় রাজগ্রাম নিবাসী পঞ্চানন দত্ত-র মাতাকে মাসিক ৫ টাকা হিসাবে দেওয়া হয়। এছাড়া কাটা পাহাড়ী নিবাসী হরিপদ কুন্ডু নামে এক দরিদ্র ছাত্রকে স্কুলে ভর্তি; স্কুলের বেতন এবং পুস্তকাদির খরচ দেওয়া হয়।

তথাকথিত অনগ্রসর তাম্বুলী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা হয়। প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার পরিবর্তে ব্যবহারিক শিক্ষা যার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়া যায় যেমন দর্জির কাজ, হস্তশিল্প এবং ব্যবসাদি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ধন ভান্ডারের অর্থ ছাড়াও পৃথকভাবে আদায়কৃত চাঁদা দ্বারা স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ব্যবসায়ী জাতি হিসাবে ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও ব্যবসার প্রসার বৃদ্ধি যাতে হয় সে সম্বন্ধে নানান আলোচনা হয়।

'তাম্বুলী-সমাজ'-র পরবর্তী কয়েকটি অধিবেশনে গৃহীত কার্যক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যায় শুধুমাত্র স্বজাতির উন্নতি সাধনই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না, বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজেও তাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করেন। ১৩২৯ সনে (১৯২২ খ্রি:) 'সমাজ'-র ৫ম অধিবেশনে পূর্ববঙ্গের Relief Fund-এ 'সমাজ'-র পক্ষ থেকে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই 'সমাজ'র প্রত্যক্ষ ভূমিকা সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য না পাওয়া গেলেও ১৩২৮ সনে (১৯২৯ খ্রি:) কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে স্বজাতির জনসাধারণকে বিলাতী বস্ত্র পরিত্যাগ করে পূর্বের ন্যায় দেশীয় বস্ত্র পরিধানের জন্য আবেদন জানানো হয়। ১৩৩১ সনে (১৯২৪ খ্রি:) 'সমাজ'-র পক্ষ থেকে census বা লোক গণনার কাজে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন গ্রামের লোকগণনার জন্য প্রত্যেক গ্রামুন্যিকে কাগজপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা হয়।

১৩৩২ সনে (১৯২৫ খ্রি:) 'তাম্বুলী সমাজ'-র ৮ম অধিবেশনে শিক্ষা ও ব্যবসার উন্নতির জন্যে প্রত্যেক গ্রামুন্যিতে যুব সামিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যুব সমাজের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত সমাজের উন্নতি সাধন সম্ভব নয় তাঁরা তা বুঝেছিলেন। যুব সম্প্রদায়ের জন্য প্রত্যেক গ্রামে একটি করে পাঠাগার স্থাপন করা হয়। তাছাড়া ঐ বছরই সামাজিক নিয়মাদি প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি জাতীয় পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব হয়। সভার সম্মতিক্রমে 'রাজহাটী তাম্বুলী পত্রিকা' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। কার্যকরী সমিতি যুব সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করে পত্রিকা পরিচালনা করবে স্থির হয়। প্রত্যেক স্বজাতিকে এই পত্রিকা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।

এছাড়াও রাজহাটী তাম্বুলীদের জাতি দেবতা হিসাবে পরিচিত হরিহরপুরের হরিহর নাটমন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার এবং নিত্য শিব পূজার বন্দোবস্ত 'সমাজে'-র পক্ষ থেকে করা হয়।

১৩২৪ সনে 'তাম্বুলী সমাজ'-র প্রথম অধিবেশনে ও পরবর্তীকালে যে সমস্ত নিয়মাবলী তৈরি হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে থাক্

ভাঙা বিবাহের ক্রমশ প্রচলন হচ্ছিল, বস্তুতপক্ষে 'সমাজে'র শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গই এই সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন। ফলে 'সমাজ'-র সমাজপতি যারা 'সমাজ' পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা নেন, তাঁরাই যদি 'সমাজে'-র অনুশাসন সম্পূর্ণভাবে প্রতিপালন না করেন তাহলে 'সমাজ' টিঁকে থাকা অসম্ভব বলে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়। ফলে 'সমাজে'-র মধ্যে একটা ভাঙনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ১৩৪২ সনের অধিবেশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় এই সময় 'সমাজে'র আর্থিক দুর্দিন উপস্থিত হয়েছিল। এর পরবর্তীকালে 'সমাজ'-র কার্যাবলী সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। হয়ত এইসব নানা কারণে এই সংগঠন চালানো সম্ভবপর হয়নি। পরবর্তীকালে ৬০-র দশকে নতুন কলেবরে 'বাঁকুড়া জেলা তাম্বুলী সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

তাম্বুলী সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা, সংস্কৃতি ও পূর্ব ঐতিহ্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে স্বজাতির জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে এই ধরণের সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়। এর প্রমাণ সম্প্রদায়ের প্রাচীনকালের গঠন বজায় রাখার প্রয়াসের মধ্যে পাওয়া যায়। আবার পরিবর্তনশীল এই জগতে যদি যুগপোযোগীভাবে নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে সংস্কার আনতে না পারেন তবে তাঁদের অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিতে পারে এই চিন্তাও কাজ করে। আবার বৃহত্তর ও আধুনিক বাঙালী সমাজে যথাযথ গুরুত্ব পাওয়ার অভিলাষীও তাঁরা ছিলেন, যা জনকল্যাণমূলক কাজ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। সবমিলিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে টিঁকে থাকার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগের থেকে সংঘশক্তির একান্ত প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করেন। এই কারণে স্বজাতির সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক উন্নতি সাধন ছিল তাদের উদ্দেশ্য। বিশ শতকের গোড়ায় তথাকথিত অনগ্রসর জাতির এই ধরণের প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

সূত্র-নির্দেশ ঃ —

১। H.H. Risley : The Tribes and Caste of Bengal (1891) (পৃ: ২৯৪)

২। নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস (পৃ: ২৬)।

৩। ড: অতুল সুর : বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, (পৃ: ১৯৩)।

৪। 'তাম্বুলী-হিঁতৈষী' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা) ১৩৭৬ সাল (৪র্থ সংখ্যা) (পৃ: ১৩৬)।

এই প্রবন্ধের জন্য সবচেয়ে বেশি তথ্য ও সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে 'রাজহাটী তাম্বুলী সমাজ'র প্রথম সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ কুন্ডু মহাশয়ের লিখিত ডাইরি থেকে। অধিবেশন সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্যাবলী লিখেছি তা 'রাজহাটী তাম্বুলী সমাজ'-র কার্যনির্বাহক সমিতির লিখিত রচনাবলী থেকে যা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ কুন্ডু মহাশয়ের লিখিত।

বন্যা বিধ্বস্ত বর্ধমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাঁধব্যবস্থা

মল্লিকা চক্রবর্তী

প্রাক্ ব্রিটিশ সময় থেকে বর্ধমান মূলত কৃষি প্রধান অঞ্চল। সেজন্য বর্ধমান জেলাকে বাংলার শস্যভান্ডার বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ব্রিটিশরা এদেশে আসার পরে বাংলায় বর্ধমানকে কৃষি সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। এই সঙ্কটের অনেকগুলি কারণের মধ্যে বন্যা অন্যতম। আবার বন্যা ঘটার অন্যতম কারণ এই সময়কালে জেলার নদীগুলিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাঁধব্যবস্থা। বহুকাল পূর্ব থেকে দামোদর, অজয় প্রভৃতি নদীগুলির বাঁধ বর্ধমানে প্লাবন রোধ করত।[১] প্রাথমিক পর্যায়ে এই সকল বাঁধ নির্মাণে কৃষকের নিজস্ব জমিকে জলপ্লাবন থেকে রক্ষার জন্য ব্যক্তিগাত উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে যৌথ প্রচেষ্টায় পরিণত হয়। সনাতন জমিদারী ব্যবস্থায় বাঁধ ব্যবস্থার পত্তন এবং রক্ষণাবেক্ষণ অত্যাবশক কর্ম ছিল।[৩] কিন্তু কোম্পানী আমলে চূড়ান্ত অবহেলার ফলে বাঁধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয় যার প্রভাব কৃষি অর্থনীতিতেও পড়ে। তাই কোম্পানী আমলে বর্ধমান জেলায় ক্রমাগত বিধ্বংসী বন্যা দেখা দেয় যা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে।

বর্ধমান জেলার ১৭৭০ সালের বন্যা শীতকালীন শস্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছিল। ১৭৬৯ সালে খরা হওয়াতে পরের বছর অর্থাৎ ১৭৭০- এ বন্যা এবং বন্যার দরুণ দু:র্ভিক্ষ দেখা দেয়।[৪] ২৯শে সেপ্টেম্বর প্লাবন প্রথম লক্ষ্য করা যায় যখন দামোদরের জল বাঁধের উপর পর্যন্ত প্লাবিত করে এবং খুব শীঘ্রই বন্যার জল বাঁধ ভেঙে বর্ধমান শহরে ঢোকে।[৫] সক্রিয় প্রচেষ্টায় বাঁধ মেরামত করা হলেও দ্বিতীয়বার দামোদরের প্লাবনে বাঁধ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। রিপোর্টে দেখা যায় এই বন্যার ফলে বর্ধমান শহর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় এবং একটিও মাটির বাড়ির চিহ্ন থাকে না।[৬] এমনকি পাকাবাড়িরও প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ বছরেই অজয় নদীতে হঠাৎ বন্যা দেখা দেওয়ায় দামোদর এবং অজয়ের মধ্যবর্তী বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে তিন/চার ফিট পর্যন্ত জলমগ্ন হয়। আখ এবং তুলা যা ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়েছিল তা প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সমস্ত বাঁধ ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।[৭] মহারাজা বাঁধ মেরামত কাজের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এই কাজের জন্য সরকার তাঁর দেয় রাজস্ব থেকে আশি হাজার টাকা মুকুব করে। এই ক্ষতি থেকে মুক্তি পেতে কৃষকদের প্রায় দুবছর সময় লাগে।[৮]

বর্ধমান জেলায় ১৭৮৭ বিধ্বংসী বন্যাতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই বন্যায় বর্ধমান শহর মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত হয় এবং বহু লোক প্রাণ হারায়। রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে

১৭৮৭ সালের এই বন্যা ছিল মারাত্মক ভয়ঙ্কর।[৯] সেপ্টেম্বরের শেষে প্রচন্ড বৃষ্টির ফলে অজয় এবং দামোদরে বন্যা দেখা দেয় এবং এই দুই নদীর জল বেশির ভাগ পরগণাকে দুই থেকে তিন ফিট জলের তলায় প্লাবিত করে।[১০] বেশ কিছু লোক ডুবে যায়। এবং অনেক গবাদি পশু মারা যায়। বর্ধমান শহরে পাকাবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মাটির বাড়ি একটিও অবশিষ্ট থাকে না। এই সঙ্গে শুরু হয় সাইক্লোন যার ফলে সমস্ত জেলা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। প্রায় নটি পরগণা এই বন্যার ফলে বিধ্বস্ত হয়।[১২] কালেক্টর থেকে কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট প্রভৃতি সকলের রিপোর্ট থেকেই দেখা যায় যে এই বন্যার ফলে রবিশস্য অর্থাৎ শীতকালীন শস্য বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।[১৩] রাজা তেজচন্দ্রের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে রায়তদের শস্য এবং বাড়িঘর সবকিছুই প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেশ কিছু পরিমাণ গবাদি পশু বিনষ্ট হয়। রবিশস্য বা অক্টোবরের শস্য তিনবার করে লাগানো হলেও কোন ফসলই হয় নি। রাজা আরও বলেন যে, এই অবস্থায় রায়তদের যদি জোর করে রাজস্ব দিতে বাধ্য করা হয় তাহলে তারা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাবে এবং কোম্পানী রাজস্ব খাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১৩] বোর্ডকে লেখা ২৩শে নভেম্বর ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের চিঠিতে কালেক্টর প্রায় একই যুক্তি তুলে ধরেন। তাঁর মতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জেলার যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা পুরোপুরি পর্যবেক্ষণ না করে যদি জোর করে রাজস্ব আদায় করা হয় তাহলে তার ফলে শেষ পর্যন্ত রায়তরাই দুর্দশা ভোগ করবে।[১৪]

এই অবস্থায় কালেক্টর জেলার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য জেলা পরিদর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাজা তেজচন্দ্রও সরকারের কাছে রাজস্ব মুকুবের আবেদন করেন। কিন্তু বোর্ড অব্ রেভেনিউ উভয় অনুরোধই বাতিল করে দেয়।[১৫] কালেক্টরের রিপোর্টকে বোর্ড খুব কম গুরুত্ব দেয় এবং বোর্ড শেষ পর্যন্ত স্থির করে।" "they cannot admit of a temporary calamity constituting any just ground of Government's granting remissions on a settled and Moderate Jumma, it being under such circumstances incumbent on the Zemindars, and not on Government to grant such relief as may be wanted to the Ryotts." এবং বোর্ড আরও বলে "no necessity for any suspension of the zemindar's payments." [১৩]

বর্ধমান জেলায় কোম্পানী পূর্ববর্তী জমিদারী ব্যবস্থায় জমিদাররা বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতি ব্যবস্থায় সক্রিয় ভূমিকা নিতেন এবং যা সাধারণভাবে 'পুলবন্দী' নামে পরিচিত ছিল। বর্ধমানে জমিদারেরা নদীতে বাঁধ ব্যবস্থা খাতে অর্থ ব্যয় করতেন কারণ এই সময়ে সরকারকে দেয় জমিদারের রাজস্ব যথাযথ ছিল।[১৭] ফলে কৃষকদের কাছ থেকে অর্থাৎ কৃষি ব্যবস্থা থেকে যে উদ্বৃত্ত তাঁরা পেতেন তা সহজেই উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় করা হত। সনাতনী জমিদারী ব্যবস্থায় পুলবন্দী জমিদারদের একটি সামাজিক দায়িত্বে পরিণত হয়েছিল।[১৮]

কিন্তু কোম্পানী আমলে চিত্রটি বদলে যায়। বর্ধমানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোম্পানী

কৃষির এই উদ্বৃত্ত দাবি করে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং জমিদারকে পুলবন্দী খাতে নির্দিষ্ট অর্থ মঞ্জুর করে। কোম্পানী আরও দাবি করে যে পুলবন্দীতে নির্দিষ্ট টাকা জমিদার সঠিকভাবে ব্যয় করছে কিনা সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য একজন ইউরোপীয়ান সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ করা হবে।[১৯] পুলবন্দী কাজে এই দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের ফলে বাঁধ ব্যবস্থা চরম অবহেলিত হয়। ফলে বর্ধমান জেলায় বারবার বন্যা দেখা দেয়।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার বর্ধমান, মার্চ ১৯৯৪, পৃ: ১৯০।

২। ঐ পৃ: ১৯০।

৩। অশোক মিত্র বার্ডওয়ান লেটারস ইস্যুড (১৭৮৮-১৮০০), ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ড্স, নিউ সিরিজ।

৪। ওয়েস্টবেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, বর্ধমান, পৃ: ১৯১।

৫। ঐ পৃ: ১৯১।

৬। ঐ পৃ: ১৯১।

৭। ঐ পৃ: ১৯১।

৮। ঐ পৃ: ১৯১।

৯। জন আর ম্যাকলেন, ল্যান্ড এ্যান্ড লোকাল কিংশিপ ইন এইটিন্থস সেঞ্চুরি বেঙ্গল, পৃঃ ২৬৩।

১০। ঐ পৃ: ২৬৩।

১১। চার্লস ব্রুশ, বার্ডওয়ান এগ্রি: কালেক্টরেট, টু বোর্ড অব রেভিনিউ ৯২, ৯ই অক্টোবর ১৭৮৭।

১২। অশোক মিত্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: IXX।

১৩। ঐ : পৃ: IXX।

১৪। ঐ পৃ: IXX।

১৫। ম্যাকলেন পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ: ২৬৩।

১৬। বোর্ড অব্ রেভেনিউ প্রসিডিংস ৭ই ডিসেম্বর ১৭৮৭।

১৭। অশোক মিত্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ: IXXV।

১৮। ঐ পৃ: IXXV।

১৯। ঐ পৃ: IXXVI।

প্রসঙ্গ তারকেশ্বর রেলওয়ে লাইন বিস্তার (১৮৮৫) : একটি ঐতিহাসিক দলিলের সমীক্ষা

শুভ্রাংশু রায়

ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রেলপথের প্রচলন। ইংল্যান্ডে জর্জ স্টিফেনসনের তৈরি করা রেলওয়ে ইঞ্জিনকে পরিবহনের ক্ষেত্রে ১৮১৪ সালে প্রথম ব্যবহার করা শুরু হয়। ১৮৩০ ও ১৮৪০ দশকে ইংল্যান্ডে রেলপথের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং ঐ সময়ে সেদেশে শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে যে উত্তোরণের যুগে পৌঁছাতে পেরেছিল তাতে রেলপথের এক বিশাল অবদান ছিল। ব্রিটিশ সরকার সরাসরি এদেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর শীঘ্রই সরকার উপলব্ধি করেন ভারত থেকে ব্রিটিশ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ এবং ব্রিটেনে উৎপন্ন পণ্য এদেশের বাজারে বিক্রয়ের জন্য দ্রুত তথা অপেক্ষাকৃত সস্তা পরিবহণ ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। এজন্য রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয় এবং নদীপথে স্টীমারের প্রচলন করা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রিটেনে ভারতে রেলপথ প্রসারের দাবি উঠে গেছে। শিল্প বিপ্লব থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ নিরাপদে নিয়োগের জন্য ব্রিটিশ ব্যাঙ্কার ও বিনিয়োগকারীরা ভারতে রেলপথের বিকাশে বিশেষ সচেষ্ট হয়ে উঠেন। ইংল্যান্ডের বস্ত্র শিল্পের জন্য উপযোগী কাঁচাতুলো ভারত থেকে আমদানি করার দিকে শিল্পপতিদের বিশেষ নজব দিল। তাছাড়া লৌহ ইস্পাত উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিও তাদের উৎপাদিত রেল ইঞ্জিন, ওয়াগন এবং অন্যান্য উপযোগী যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকায় ভারতে রেলপথ বিস্তারের বিষয়ে উৎসুক ছিল।

১৮৩৪ সালে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের স্টীম চালিত রেলপথ বিস্তারের প্রস্তাব উঠে এবং তা শক্তিশালী রাজনৈতিক সমর্থন পায়। স্থির হয় ভারতে রেলপথগুলি নির্মাণের এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে বেসরকারী সংস্থাগুলির হাতে। ভারতীয় রেলে পুঁজি বিনিয়োগকারীদের সরকার মূলধনের ৫% গ্যারান্টিবাবদ ফেরত দেবে। ১৮৪৯ সালে লর্ড ডালহৌসির এদেশে গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার পর ভারতে রেলপথ বিস্তারের প্রক্রিয়াটি আরো গতিপায়। তিনি ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে রেলপথ নির্মাণের জন্য 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে কোম্পানির সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৮৫৩ সালে বিখ্যাত রেলওয়ে মিনিটস্ এ ডালহৌসি রেলপথ নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। ঐ বছরই ১৬ই এপ্রিল বোম্বাইয়ের সঙ্গে থানের মধ্যে প্রথম রেলপথ চালু হয়। ১৮৫৪ সালে হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেল চলাচল শুরু হয় এবং পরের বছর এটি রাণীগঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ১৮৬৯ নাগাদ ৬০০০ কিমি বেশি

রেলপথ গ্যারান্টি প্রাপ্ত কোম্পানীদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। পরে ব্রিটেনে গ্যারান্টি প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র জনমত গঠিত হলে ১৮৬৯ সালে লর্ড মেয়ো সরকারী অর্থে রেলপথ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তী দশ বছরে সরকারী তদারকিতে কিছু রেলপথ স্থাপন হলেও দ্বিতীয় ইঙ্গ আফগান যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কারণে সরকারী কোষাগারে অর্থের টান পড়ে, সঙ্গে ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের চাপ। ফলে ১৮৭৯ সালে পুনরায় বিদেশী কোম্পানীগুলির মাধ্যমে গ্যারান্টি প্রথায় রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়। এই ১৮৮০ দশকের শুরুতেই সরকারী মহলে হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র তারকেশ্বরকে রেললাইনের মাধ্যমে হাওড়ার সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এগিয়ে আসে হোর মিলার এণ্ড কোম্পানী (Hore-Millar and Company) ৩৮ নং স্ট্যাণ্ড রোডে এর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয়। এই সংস্থা ১০০ টাকা শেয়ারের ভিত্তিতে তারকেশ্বর রেলওয়ে কোম্পানী গঠন করে। শেয়ার বিক্রয়ের জন্য অমৃতবাজার, যুগান্তর, দি স্টেটস্‌ম্যান, দি বেঙ্গলী প্রভৃতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ১৮৭০ দশকের শেষে এবং ১৮৮০ দশকের শুরুতে রেললাইন পাতার কাজ শুরু হয় ১৮৮৪ মধ্যে এর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এটি উদ্বোধনের আগে তারকেশ্বর রেলওয়ে কোম্পানী নতুন চালিত রেলপথের ভাড়া কিরূপ হবে সে বিষয়ে একটি বাংলায় ছাপানো বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে এবং সেগুলি এলাকার সম্ভ্রান্তশালী তথা ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এরকম একটি বিজ্ঞাপন যা প্রায় ১১৮ বছর পুরোনো এই নিবন্ধকারের সংগ্রহে আসে। এই ঐতিহাসিক দলিলটির পর্যালোচনাই এই নিবন্ধের প্রধান লক্ষ্য।

বিজ্ঞাপনের উপরেই তারকেশ্বর রেলওয়ে কোম্পানীর নাম বড় হরফে ছাপানো রয়েছে সঙ্গে রয়েছে একটি রেলগাড়ীর হাতে আঁকা ছবি। বিজ্ঞাপনের তলায় বাঁদিকে তারিখ দেওয়া রয়েছে ১২৯১ সন ইংরেজীর ৪ঠা নভেম্বর ১৮৮৪ সন। ডানদিকে তলায় কোম্পানীর লোকাল এজেন্ট হিসেবে জনৈক শ্রী পূর্ণ চন্দ্র সিংহের নাম মুদ্রিত রয়েছে। বিজ্ঞাপনের শুরুতেই জানানো হয়েছে যে "আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে যাহাতে তারকেশ্বর রেলওয়ে আরোহী ও মাল যাতায়াতের জন্য খোলা হয়। তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইতেছে। নিম্নলিখিত হারে আরোহী ও মালের ভাড়া লওয়া যাইবে।"

বিজ্ঞাপনটিতে ৩টি সারণি রয়েছে প্রথমটিতে রয়েছে আরোহীর ভাড়ার তালিকা, দ্বিতীয়টিতে রয়েছে আরোহীর সঙ্গে নেওয়া দেড়মণের অতিরিক্তপণ্যের ভাড়ার তালিকা এবং তৃতীয় তথা কোষ সারণিতে রয়েছে বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের মাশুলবাবদ ভাড়ার তালিকা।

সারণি নম্বর এক এ যে তালিকাটি রয়েছে তা আরোহীর ভাড়া কিরূপ হবে সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞাত করে। এই তালিকায় শেওড়াফুলি স্টেশন থেকে দূরত্ব অনুযায়ী একদিকে হাওড়া ও অন্যদিকে নব্যনির্মিত তারকেশ্বর লাইনের পাঁচটি স্টেশনের যাওয়ার, যাতায়াতের

সারণী নং - ১

আরোহীর ভাড়া

শেওড়াফুলি হইতে	মাইল	প্রথম শ্রেণী			দ্বিতীয় শ্রেণী			মধ্যম শ্রেণী			তৃতীয় শ্রেণী		ব্যাপারি ও কৃষক	
		যাইবার	যাতায়াত	মাসিক	যাইবার	যাতায়াত	মাসিক	যাইবার	যাতায়াত	মাসিক	যাইবার	মাসিক	যাতায়াত	মাসিক
হাওড়া	১৩$\frac{৩}{৪}$	১০	১ ০	৩৫৲	॥৯১০	৯০	১৭॥	১৫	১৯০	৯৲	৯০	৫॥০	৯০	১৯০
গোবিন্দপুর...	৪	।০	৫	৭৲	৯০	৯১৫	৩॥০	১০	৯০	২॥০	।০	২৲	৬	৯০
সিঙ্গুর... ..	৭	।৯০	॥৫	১২৲	৯১০	।১৫	৬৲	৯১৫	৯১৪	৫৲	।১৫	৩০৲	১৫	৯১০
নালিকুল ...	১১	॥৯০	।৯১৫	১৯৲	॥১০	।৯৫	৯॥০	।৫	॥১৫	৯॥০	৯১৫	৫৲	৯১৫	১০
হরিপাল ...	১৫	৯০	১।০	২৫৲	।৯১০	॥৯০	১২	॥১৫	।৯১৫	১০৲	৯১৫	৬॥০	৯১৫	।৯১০
তারকেশ্বর ...	২২	১১৯০	১ ।৫	৩৭৲	।৯০	৫	১৮॥০	॥৫	॥৯০	১৪৲	॥৩০	৯॥০	। ১০	॥৯০

এবং মাসিক ভাড়ার উল্লেখ রয়েছে। এই পাঁচটি স্টেশন শেওড়াফুলি থেকে দূরত্ব অনুযায়ী হল গোবিন্দপুর (বর্তমান নাম নসিবপুর), সিঙ্গুর, নালিফুল, হরিপাল ও তারকেশ্বর, আরোহীদের ভাড়াকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, মধ্যম শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী এবং পৃথকভাবে উল্লেখিত ব্যাপারি ও কৃষক শ্রেণীর ভাড়া। এই তালিকায় একজন আরোহীর উল্লেখিত যে কোন স্টেশন থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত যাবার, যাওয়া এবং ফেরত আসার (যাকে ইংরেজীতে বলা হয় রিটার্ন টিকিট) এবং মাসিক টিকিটের মূল্য শ্রেণী অনুযায়ী উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া সারণির ঠিক নিচে উল্লেখিত হয়েছে যে "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কোন স্টেশনের ভাড়া নিরুপণ করিতে হইলে তারকেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশনের ভাড়ার সহিত শেওড়াফুলি হইতে ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের সেই স্টেশনের ভাড়া যোগ করিতে হইবে।" এর পাশাপাশি "ব্যাপারি ও কৃষকদিগের ভাড়া" শীর্ষক একটি পৃথক অনুচ্ছেদে কৃষক ও ব্যাপারিদের ভাড়া সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে। এমনকি কৃষক ও ব্যাপারিরা দেড়মণ পর্যন্ত কিকি দ্রব্য বিনা মাশুলে নিজেদের সঙ্গে বহন করতে পারবেন তাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

কৃষকদের ক্ষেত্রে দেড়মণ পর্যন্ত শাকসব্জী, ফল দই, দুধ, মাখন, মাছ, হাঁস ও মুরগীর ডিম বিনা মাশুলে শেওড়াফুলি ও হাওড়ায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

দুই নম্বর সারণিতে কোন আরোহী দেড়মণের অতিরিক্ত পণ্য সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলে তারজন্য কি পরিমাণ অর্থ রেল কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে তার একটি তালিকা রয়েছে। সেই

সারণি নং - ২
দেড়মণের অরিতিক্ত ওজনের মণ করা ভাড়া

নিম্নলিখিত স্টেশন হইতে	শেওড়াফুলি আসিবার ভাড়া		হাওড়া আসিবার ভাড়া	
	মাইল	ভাড়া	মাইল	ভাড়া
তারকেশ্বর...	২২	১০	৩৬	৯৫
হরিপাল...	১৫	০	২৯	।১৫
নালিকুল....	১১	২১৫	২৫	।১০
সিঙ্গুর....	৭	।১০	২১	৫
গোবিন্দপুর...	৪	(১০	১৮	)৫

সঙ্গে এটাও স্পষ্ট করে নির্দেশ দেওয়া রয়েছে যে কোন যাত্রী সঙ্গে করে দাহ্য পদার্থ বহন করতে পারবে না। দাহ্য পদার্থ হিসাবে এখানে কেরোসিন তেল এবং বারুদের উল্লেখ রয়েছে। এই ধরণের নির্দেশিকা ভারতীয় রেল আজো বহাল রেখেছে। এর সঙ্গে এটাও এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে হাওড়া ও শেওড়াফুলি থেকে ফেরত যাবার সময় দেড়মণের বেশি কোন পণ্য সঙ্গে আরোহী যাত্রা করলে প্রতি মাইল পিছু প্রতি একমনে ২ পাই মাশুল হিসেবে অতিরিক্ত দিতে হবে।

তারকেশ্বর রেলওয়ে কোম্পানী প্রচারিত এই বিজ্ঞাপণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো

সারণি নং - ৩
মালের ভাড়া

নিম্নলিখিত স্টেশন হইতে শেওড়াফুলির ভাড়া	মাইল	চাউল, ধান্য, কলাই, লবণ, তৈল, গুড়, চিনি, ময়দা, লোহা, চটের থলে, বা থান	পাট, কয়লা, কাপড়ের বিলাতি গাট, পাথরের বাসন, ঘৃত, শুপারি, ও কেরোসিন তৈল	কাপড়ের কাঁচা গাঁট, মশলা ও কাগজ	কাঠের বাসন, লন্ঠন, আফিম	পুস্তক, সুগন্ধ দ্রব্য, পালিষ করা সেজ, টেবিল ইত্যাদি, বারুদ
		১০০ মণে ভাড়া	১০০ মণের ভাড়া	১০০ মণের ভাড়া	১০০ মণের ভাড়া	১০০ মণের ভাড়া
হাওড়া	১৩	৪	৬	৮	৮	৯
গোবিন্দপুর	৪	২	৩	৪	৪	৫
সিঙ্গুর...	৭	২	৩	৪	৪	৫
নালিকুল...	১১	২	৩	৪	৫	৬
হরিপাল...	১৫	৩	৪	৫	৭	৮
তারকেশ্বর.	২২	৪	৬	৮	১০	১১

এর তৃতীয় সারণিটি যেখানে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের নাম উল্লেখ করে মালের ভাড়া কোন স্টেশন থেকে হাওড়া ও শেওড়াফুলি পর্যন্ত পরিবহন করার কিরূপ ভাড়া বা মাশুল দিতে হবে তার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই অংশটি এই কারণেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে এর মাধ্যমে তৎকালীন হুগলী জেলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাজারের উৎপন্ন ফসল, দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। অর্থকরী খাদ্যশস্য হিসেবে এখানে যেমন ধান, চাল, কলাই ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে তেমনি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র হিসেবে লবণ, তেল, ময়দা, আটা, কয়লা বিলাতি কাপড়, মশলা, কাগজ ইত্যাদি সামগ্রির নাম উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো যে আরোহীর সঙ্গে দাহ্য পদার্থ হিসেবে কেরোসিন তেল বা বারুদ গ্রহণযোগ্য না হলেও বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে কেরোসিন তেল বা বারুদের পরিবহণ কিন্তু গ্রহণযোগ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

বস্তুত এরমধ্যে অনেক সময় কেটে গেছে। রেল ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন যুক্ত রেলগাড়ীর জায়গা দখল করে নিয়েছে ইলেকট্রিক চালিত ট্রেন। বহু নতুন নতুন স্টেশন তারকেশ্বর লাইনে স্থাপিত হয়েছে। রেলের ভাড়াও সবক্ষেত্রেই বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু একশ বছরেও আগে স্থাপিত রেলপথটির পরিকাঠামোগত পরিবর্তন যে খুব বেশি কিছু হয়নি এই ঐতিহাসিক দলিল বিশ্লেষণ করলে আমরা তা বুঝতে পারি।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

এই প্রবন্ধটির মূল উপাদান হলো ৩৮নং ষ্ট্যাণ্ড রোড থেকে ১৮৮৪ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত এবং আই.সি বোস, স্টাডার্ট প্রেস, ২১৯ বৌবাজার স্ট্রিট থেকে মুদ্রিত তারকেশ্বর রেলওয়ে কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। এছাড়াও বেশ কয়েকটি গ্রন্থের সাহায্য এই প্রবন্ধ লেখার সময়ে নেওয়া হয়েছে যেগুলির নাম নিচে উল্লেখ করা হল : —

১। হেনা মুখার্জী : 'আর্লী হিস্ট্রি অফদি ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে।

২। বিপিন চন্দ্র : 'দ্য রাইজ অ্যাণ্ড গ্রোথ অফ ইকনমিক ন্যাশনালিজম ইন ইণ্ডিয়া।

৩। আর. সি. দত্ত : দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া।

তারকেশ্বর রেলওয়ে কোম্পানী

বিজ্ঞাপন

আগামী ১লা জানুয়ারি হইতে যাহাতে তারকেশ্বরে রেলওয়ে আরোহী ও মাল যাতায়াতের জন্য খোলা হয়, তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইতেছে। নিম্ন-লিখিত হারে আরোহী ও মালের ভাড়া লওয়া যাইবে।

আরোহীর ভাড়া

শেওড়াফুলি হইতে	মাইল	প্রথম শ্রেণী			দ্বিতীয় শ্রেণী			মধ্যম শ্রেণী			তৃতীয় শ্রেণী		ব্যাপারি ও কৃষক	
		যাই বাব	যাতা যাত	মা সিক	যাই বার	যাতা য়াত	মা সিক	যাই বাব	যাতা য়াত	মা সিক	যাই বার	মা সিক	যাতা য়াত	মা সিক
হাওড়া...	১ ৩/৪	১। ০	১ ০	৩৫৲	॥ ১০	০	১৭॥০	। ৫	। ০	৯৲	০	৫॥০	০	। ০
গোবিন্দপুব..	৪	।০	। ৫	৭৲	০	১৫	৩॥০	১০	০	২॥০	০	২৲	০	০
সিঙ্গুর...	৭	। ০	॥ ৫	১২৲	১০	।১৫	৬৲	১৫	১৫	৫৲	১৫	৩	১৫	১০
নালিকুল...	১১	॥ ০	১৫	১৯৲	। ১০	। ৫	৯॥০	।৫	। ১৫	৭॥০	১৫	৫৲	১৫	। ১০
হবিপাল...	১৫	০	১।০	২৫৲	। ১০	॥ ০	১২॥০	। ১৫	১ ১৫	১০৲	১৫	৬॥০	১৫	। ১০
তাবকেশ্বর	২২	১। ০	১ ৫	৩৭৲	॥ ০	১৫	১৮॥০	॥৫	॥ ০	১৪৲	। ১০	৯॥০	। ১০	॥ ০

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কোন ষ্টেসনের ভাড়া নিরূপণ করিতে হইলে তারকেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেসনের ভাড়ার সহিত শেওড়াফুলি হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেওয়ের সেই ষ্টেসনের ভাড়া যোগ করিতে হইবে।

লগেজ, পার্সেল প্রভৃতির ভাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ভাড়ার মত।

ব্যাপারি ও কৃষকদিগের ভাড়া। - তারকেশ্বর রেলওয়ের সকল ষ্টেসন হইতে কেবল সেওড়াফুলি ও হাওড়া আসিবার জন্য ব্যাপারি ও কৃষকদিগের তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর হারে টিকিট দেওয়া যাইবেক। যাতায়াতের টিকিট এক কালেও পাইতে পারিবে, কিন্তু ২৪ ঘন্টার মধ্যে ফেরত না আসিলে ফেরতের স্বতন্ত্র টিকিট করিতে হইবে। প্রতি কৃষক দেড়মণ পর্য্যন্ত দ্রব্য অর্থাৎ সাকসবজী, ফল, দধি, দুগ্ধ, মাখন, মৎস্য, হাঁস, মুরগি ও ডিম্ব বিনা মাশুলে সেওড়াফুলি ও হাওড়ায় লইয়া আসিতে পারিবে। দেড়মণের অতিরিক্ত হইলে প্রতি মাইল মণকরা ইংরাজীর ৩/৪ পাই হিসাবে ভাড়া দিতে হইবে, কিন্তু অর্দ্ধ আনার কম হইলে অর্দ্ধ আনা ধরিয়া লওয়া যাইবে - যথা -

দেড়মণের অরিতিক্ত ওজনের মণ করা ভাড়া

নিম্নলিখিত স্টেশন হইতে	শেওড়াফুলি আসিবার ভাড়া		হাওড়া আসিবার ভাড়া	
	মাইল	ভাড়া	মাইল	ভাড়া
তারকেশ্বর...	২।	১০	৩৬	৯৫
হরিপাল...	১৪	০	২৯	।১৫
নালিকুল....	১১	১৫	২৫	।১০
সিঙ্গুর....	৭	১০	২১	৫
গোবিন্দপুর...	৪	(১০	১৮	)৫

হাওড়া ও শেওড়াফুলি হইতে ফেরত যাইবার সময় যে কোন দ্রব্য হউক (দাহ্যনীয় পদার্থ অর্থাৎ কেরোসিন তৈল, বারুদ ইত্যাদি ব্যতীত) বিনা মাশুলে দেড়মণ পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিবে; কিন্তু দেড়মণের অতিরিক্ত হইলে প্রতি মাইল মণকরা ইংরাজী ২ পাই হিসাবে অতিরিক্ত ওজনের ভাড়া লওয়া যাইবে। এক মণের কম হইলে এক মণের ভাড়া দিতে হইবে যথা ২।৫ হইলে ৩ ০ মণের ভাড়া দিতে হইবে।

মালের ভাড়ার

মালের ভাড়ার নিয়ম ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নিয়ম মত

নিম্নে কথকগুলি প্রধান প্রধান দ্রব্যের ভাড়া দেওয়া গেল

নিম্নলিখিত স্টেশন হইতে শেওড়া-ফুলির ভাড়া	মাইল	চাউল, ধান্য, কলাই, লবণ, তৈল, গুড়, চিনি, ময়দা, লোহা, চটের থলে, বা থান	পাট, কয়লা, কাপড়ের বিলাতি গাট, পাথরের বাসন, ঘৃত, শুপারি, ও কেরোসিন তৈল	কাপড়ের কাঁচা গাঁট, মশলা ও কাগজ	কাচের বাসন, লণ্ঠন, আফিম	পুস্তক, সুগন্ধ দ্রব্য, পালিষ করা সেজ, টেবিল ইত্যাদি, বারুদ
		১০০ মণের ভাড়া	১০০ মণের ভাড়া	১০০ মণের ভাড়া	১০০ মণের ভাড়া	১০০ মণের ভাড়া
হাওড়া	১৩ ৩/৪	৪	৬	৮	৮	৯
গোবিন্দপুর	৪	২	৩	৪	৪	৫
সিঙ্গুর...	৭	২	৩	৪	৪	৫
নালিকুল...	১১	২	৩	৪	৫	৬
হরিপাল...	১৫	৩	৪	৫	৭	৮
তারকেশ্বর.	২২	৪	৬	৮	১০	১২

ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কোন স্টেশনের ভাড়া নিরূপণ করিতে হইলে তারকেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেসনের ভাড়ার সহিত সেওড়াফুলি হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সেই ষ্টেসনের ভাড়া যোগ করিতে হইবে।

ট্রেণের সময় নিরূপণ বিষয় অতি শীঘ্র নোটীস দেওয়া যাইবেক।

কলিকাতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র সিংহ,

লোক্যাল এজেন্টস আফিস লোক্যাল এজেণ্ট

৩৮নং ষ্ট্রাণ্ডরোড

সন ১২৯১ সাল, ইংরাজী ৪ ঠা নভেম্বর, সন, ১৮৮৪ সাল

I. C.Bose & Co., Stanhope Press,219 Bow Bazar Street, Calcutta.

নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদে (আঠারো ও উনিশ শতক) ফার্সি ও উর্দুভাষার চর্চ্চা।

দেবশ্রী দাশ

১। **মুখবন্ধ ঃ—**

মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ফার্সি ভাষার আগমন ঘটে। এবং ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়। তুর্কো-আফগান ও মুঘলশাসকরা ফার্সি রীতিনীতির ও সংস্কৃতির অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ফার্সিভাষাকে শাসনকার্য পরিচালনার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন। তাই এই ভাষা চর্চা শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, উচ্চবর্গের হিন্দুদের মধ্যেও তা প্রসারিত হয়। কারণ ফার্সি ভাষায় ব্যুৎপত্তি সমাজে আদরণীয় ছিল।

বাংলায় নবাবদের দরবার আঠারো শতকে জ্ঞানীগুণীজনের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। নাদির শাহের আক্রমণ (১৭৩৯), আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণ (১৭৫৬-৫৭) এবং নাদির শাহের হত্যা (১৭৫৭) এই অনিশ্চয়তাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। ফলে জ্ঞানী-গুণীজন তাঁদের কাশ্মীর, দিল্লী, ফৈজাবাদ ও লক্ষ্ণৌ-এর আশ্রয় ছাড়তে বাধ্য হন। বাংলার নবাবরা দেন তাঁদের অনুকূল পরিবেশ। ফলে আঠারো শতকে ফার্সি ও উর্দুভাষা ও সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়।[১]

২। **ফার্সি ও উর্দু ভাষা চর্চার অবদান ঃ—**

ক) বাংলার নবাবগণ ফার্সি ভাষা শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করেন। তাঁরা বিভিন্ন অনুদান ও কর হীন জমি দান করেন। স্বচ্ছল পরিবারের (হিন্দু ও মুসলমান) সন্তান ফার্সি ভাষা শিক্ষা করেন। ডঃ তনবীর আহমেদের ভাষায় - "The whole society was persianized."[২] সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানরা (এমনকি হিন্দুরাও) ইরানীয় রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও আদব-কায়দা রপ্ত করেন। শিক্ষিত হিন্দুরাও তাঁদের রচনায় কেবলমাত্র ইসলামীয় বিষয়বস্তু গ্রহণ করেননি, তাঁরা ফার্সি শব্দ, বাক্যাংশ ও বাংলা ভাষাতে প্রয়োগ করেন এবং জনপ্রিয় ফার্সি গল্প বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন।

হিন্দু ও মুসলিম লেখকদের মধ্যে এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। ১৭৫২ খ্রি: ১০ই মে হুগলীতে তাঁর জন্ম। তিনি ফার্সি ও উর্দু ভাষাতে পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর কবিতার গ্রন্থ 'গ্রহণাবলী' মিশ্র ভাষাতে রচিত।

তাঁর রচনা অন্নদা-মঙ্গলে প্রচুর ফার্সি শব্দের বিন্যাস। গরীবুল্লা ফকির হুগলীর অধিবাসী। তিনি প্রেমকাব্য 'ইউসুফ-ওয়া-জুলেখা' এবং গল্প আমীর হামজা ফার্সি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। সৈয়দ আমীর হামজা ওই সময়ের একজন নামী কবি। তিনি 'আমীর হামজা' গল্প ফার্সি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। মহম্মদ আলী আঠারো শতকের চট্টগ্রামের একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ফার্সি ভাষায় রচিত 'হায়রাতুল-ফিক' গ্রন্থটির বাংলায় কাব্য রূপ দেন। ইসলাম ধর্মের আদর্শ ও ইসলামীয় আইনের ব্যাখ্যা করেন বাংলায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। 'শাহদুর শামী' ও 'হাসান বানো' প্রেম গল্পের বাংলা কাব্যরূপ দেন। হায়াৎ মামুদ বাংলা, আরবী ও ফার্সি ভাষায় পারদর্শিতালাভ করেছিলেন। ফার্সি গজল রচনা করতেন তিনি। তিনি হিতোপদেশ ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে ফার্সি ভাষা থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করেন ৪২টি আকর্ষক গল্প। উর্দুভাষা প্রধানত মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারে সীমাবদ্ধ। তবে বাংলা শব্দ যেমন বাদল, মেঘলা, সম্পত্তি গাছ কামানো উর্দুভাষী শিক্ষা পরিবার ব্যবহার করেন। বাঙলা ভাষা-ভাষীরা প্রচুর উর্দু শব্দ ব্যবহার করেন। নবাব পরিবারের সদস্যরা এখনও উর্দুতে কবিতা রচনা করেন।

খ) নবাব দরবার ফার্সি ও উর্দু ভাষার চর্চাকেন্দ্র ঃ—

মুর্শিদকুলী খান নিজেই ছিলেন শিক্ষার অনুরক্ত। গণিতে তিনি ছিলেন পারঙ্গম এবং হিসাবপত্র নিজেই পরীক্ষা করতেন। জ্ঞানী-গুণীজনের অর্থ সাহায্য দিতেন। ২৫০০ জন কোরাণ পাঠককে তিনি আনুকূল্য দান করেন। ফার্সি কবি, পণ্ডিত, উলেমা ও লেখকদের স্বর্গোদ্যান ছিল আলীবর্দীর দরবার। তিনি এঁদের সান্নিধ্যে দীর্ঘক্ষণ কাটাতে ভালবাসতেন। তাঁর সভায় উপস্থিত পন্ডিতদের নাম উল্লেখ করেছেন গুলাম হোসেন। ইসলামীয় শিক্ষা, ফার্সি সংস্কৃতি ও ধর্ম নিরপেক্ষ বিজ্ঞান চর্চায় অকৃপণ ছিলেন তিনি। নওয়াজেস মহম্মদ, সিরাজ-উদ্-দ্দৌলা (১৭৫৬-৫৭), মিরকাশিম (১৭৬০-৬৩) ও পরবর্তী নবাবদের দরবার ছিল ফার্সি ও উর্দু ভাষা চর্চার কেন্দ্র।

গ) ফার্সি-ভাষা চর্চার প্রতিষ্ঠান ঃ—

ফার্সি ভাষার চর্চার জন্য মক্তব ও মাদ্রাসা শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি. সারা বাংলা সুবাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মতিঝিল মাদ্রাসা, কাটরা মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা, বিহারের মাদ্রাসা, কটকের কদম-রসুল-মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা, বর্ধমানের বুহার মাদ্রাসা, আজিমাবাদ কলেজ ছিল ফার্সিভাষা চর্চাব কেন্দ্র। পাটনা ছিল অপর একটি শিক্ষাকেন্দ্র। ব্যবসায়ী, বিভিন্ন বৃত্তিধারী পণ্ডিত ও সাধুদের দ্বারা অধ্যুষিত এই শহরে ফার্সি চর্চার কেন্দ্রে নয়-দশ জন শিক্ষক ও চারিশত ছাত্র ফার্সি ভাষা চর্চা করত। আজিমাবাদে বহু প্রখ্যাত পন্ডিত ছিলেন। ফকির

আলি খান, মৌলভী মহম্মদ আরিফ, হায়াৎ বেগ, শাহ খিজির ছিলেন সুপন্ডিত, মৌলভী মহম্মদ নাসির ছিলেন আজিমাবাদের প্রখ্যাত পন্ডিত ফার্সি ভাষাতে অভিজ্ঞ। তিনি গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা এবং বিজ্ঞানে ছিলেন পারঙ্গম। পূর্ণিয়া ছিল আর একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। পূর্ণিয়ার শাসক পন্ডিতদের আনুকূল্য প্রদর্শনে ছিলেন উদারহস্ত। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের উচ্চবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানরা ফার্সি ভাষার চর্চায় বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল। প্রথমে ফার্সি সাহিত্য ও উর্দু সাহিত্যের বিবরণ দিয়ে আমার লেখা শেষ করব।

৩। ফার্সি সাহিত্যের পরিচয় ঃ—

আঠারো ও উনিশ শতকে প্রায় চল্লিশের অধিক কবিদের নাম পাওয়া যায় যাঁরা দীর্ঘদিন বাংলায় ছিলেন। আবার কেউ অল্পদিন এখানে কাটান, এঁদের অধিকাংশই ছিলেন বহিরাগত, এসেছিলেন ইরান, ইরাক, উত্তর ভারত ও দক্ষিণভারত থেকে। তাঁরা ফার্সি কবিতার মধ্যে গজল, মসনভী, রুবাইয়ৎ এবং কসিদা রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এঁরা কেউ ছিলেন পেশায় চিকিৎসক, আবার কেউ ছিলেন যোদ্ধা, কেউ ইসলাম ধর্মতত্ত্বে সুপন্ডিত ও ফরমান লেখায় সুনিপুণ। এছাড়া গড়ে উঠেছিল ফার্সি গদ্য সাহিত্য ইতিহাস গ্রন্থ ও জীবনী সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। উল্লেখযোগ্য কবি, ইতিহাসকার ও জীবনী গ্রন্থকারের কাহিনী নিচে আলোচনা করা হল।

৩.১। ক) ফার্সি কবিতা ঃ—

ফার্সি কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হসরৎ মীর মহম্মদ হায়াৎ (১৭২৭-১৮-৯৫-৯৬)। তিনি প্রথমে সৌকৎজঙ্গ ও পরে সিরাজের অধীনে দারোগা পদে নিযুক্ত হন। তিনি ফার্সি ও উর্দু ভাষায় ছিলেন সুপন্ডিত। ফার্সি গজল রচনায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল অসামান্য। তিনি ফার্সি রুবাইয়তে বিহারের দুর্ভিক্ষের চিত্র সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত করেছেন।

খ) আমীন খাজা আমীনুদ্দিন ঃ—

আজিমাবাদে তাঁর জন্ম হলেও মীর মহম্মদ রেজা খানের আমন্ত্রণে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। ২৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে ৩৪৮টি গজল, ৫৩টি রুবাইয়ৎ, ২টি মুসাম্মান, ২টি কাটা ও ৩টি কসিদা। অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ্যে ও স্বাভাবিক আবেগে কাব্যরূপ দিয়েছেন প্রেমের বিরহের ও বিচ্ছেদের। অত্যন্ত শিক্ষিত হয়েও শিক্ষকদের দুরাচারকে কষাঘাত করেছেন তাঁর কবিতায়। পরিশীলিত ভাষা ও সহজরীতি তাঁর কাব্যচর্চাকে স্বাতন্ত্র্যদান করেছিলেন।

গ) তাজরীদ মীর মহম্মদ আলী ঃ—

ইরান থেকে তাঁর পূর্বপুরুষরা ঔরঙ্গাবাদে এসেছিলেন। ঔরঙ্গাবাদে তাঁর জন্ম। ইরানে তীর্থ করতে গিয়ে তিনি কবি ও পন্ডিতদের সাহচর্যলাভ করেন। কোরাণ ব্যাখ্যায় ও তিনি দক্ষতালাভ করেছিলেন। তিনি আলীবর্দী খান ও সিরাজের পিতার (জৈনুদ্দিন আহম্মদের) পৃষ্ঠপোষকতালাভ করেন। নবাব আলীবর্দী তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতায় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁরজন্য নবাব পরিবারে যথাযোগ্য সম্মানের স্থান নির্দ্ধারিত ছিল। তিনি যখন দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করতেন তখন তাঁকে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে আলীবর্দী দরবার পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন। ধর্মতত্ত্ববিদদের তালিকায় তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ। নিজ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে তিনি কবিতায় রূপ দিতেন। তাঁর মতে পার্থিব জগতের সকল আকাঙ্ক্ষা ত্যাগই মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে তোলে।

ঘ) উজলাৎ, সৈয়দ আব্দুল ওয়ালি (১৯৬২-১৭৭৫) ঃ—

উজলাৎ সুরাটে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি পারঙ্গমতা অর্জন করেন। হায়দ্রাবাদ থেকে দিল্লি হয়ে তিনি ১৭৪৭ খ্রি: বাংলায় আসেন। নবাব আলীবর্দী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। আলীবর্দীর মৃত্যুর পর তিনি হায়দ্রাবাদ ফিরে যান। ফার্সি ও উর্দু কবিতা রচনায় দক্ষ উজলাৎ প্রায় ৪০০০ কবিতা লেখেন। গজল, রুবাইয়াৎগুলিতে তাঁর চিন্তার ও আবেগের গভীরতা, প্রাজ্ঞতার পূর্ণতা ও বাস্তব ঘটনা বিশ্লেষণে তাঁর মৌলিকতা ধরা পড়ে।

ঙ) মাখুর, মুর্শীদকুলী হয় (১৬৮৪-১৭৫০) ঃ—

ইরান থেকে আগত ব্যবসায়ীর পুত্র তিনি। নবাব সুজাউদ্দিন দান করেন তাঁর কন্যাকে। পরে উড়িষ্যার সহকারী নবাব হন। আলীবর্দীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি হায়দ্রাবাদে পালিয়ে যান। কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন বিশেষ করে তাৎক্ষণিক কবিতা রচনায়। তাঁর কবিতা ছিল অলঙ্কার ও দুরূহ শব্দ থেকে মুক্ত।

৩.২। ফার্সিগদ্য ও নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষভাবে গড়ে উঠেছিল। ইতিহাস গ্রন্থ ও জীবনী গ্রন্থ ও ভ্রমণকাহিনী এই সময়ে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

ক) ইতিহাস চর্চা ঃ

১) ইউসুফ আলী খান

তিনি সরফরাজ খান আলীবর্দী খানে পৃষ্ঠপোষকতালাভ করেন। মীরজাফর ছিলেন তাঁর বিরোধী। তাঁর লিখিত গ্রন্থের নাম তারিখ-ই-বাংলা-ই-মহবৎজঙ্গী (আলীবর্দীর রাজত্বকাল নিয়ে লিখিত)।

২) গোলাম হোসেন তারা তাবাই ঃ—

আলীবর্দীর পৃষ্ঠপোষকতালাভ করেন। যোদ্ধা হলেও পারঙ্গম ছিলেন কবিতা, ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব রচনায়। তাঁর লিখিত বারোখানি গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরিণ, এই গ্রন্থে ১৭০৭ খ্রি: থেকে ১৭৩১ খ্রি: পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস বিশ্লেষিত হয়েছে তিন খন্ডে, আঠারো শতকের অবক্ষয় তাঁর গ্রন্থে মূর্ত হয়ে উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি তৎকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে। তিনি মুসলমান যুগের শেষ মহান ঐতিহাসিক হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন।

৩) করম আলি (১৭৩৬-?) ঃ—

করম আলি ছিলেন আলিবর্দীর নিকট আত্মীয়, তিনি তাঁর গ্রন্থ "মুজাফ্ফর নামা"-তে ১৭২২ খ্রি: থেকে ১৭২১ খ্রি: পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস রচনা করেছেন। নামকরণ করেছেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক রেজাখানের নামানুসারে। তাঁর গ্রন্থ থেকে আলীবর্দীর নবাব পূর্ববর্তী জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। আলীবর্দীর বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য, উদারতা, সাহস, জীবনীশক্তি, সহ্যক্ষমতা, স্নেহশীলতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর গ্রন্থে।

৪) মুন্সী সলিমুল্লাহ ঃ—

তিনি প্রথমে মীরজাফরের ও পরে ভ্যান্সিটার্টের মুন্সী নিযুক্ত হন। তিনি ১৬৮৯ খ্রি: থেকে ১৭৫৬ খ্রি: পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস রচনা করেন তাঁর গ্রন্থ "তারখি-ই-বাংলাতে"। তিনি মূলত স্মৃতিকথা ও প্রথাগত ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করেছেন। তাই অনেকক্ষেত্রে ভ্রান্তি থেকে গেছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেছেন। সমসাময়িক যুগ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থ একটি মূল্যবান দলিল।

৫) শাহ মহম্মদ ওয়াফা ঃ—

তাঁর রচিত 'ওয়াকাই-ই-ফৎ-ই-বাংলা অথবা 'ওয়াকাই মহবৎ জঙ্গী' রচিত হয়েছিল ১৭৪৮ খিস্টাব্দে। ১৭৪০ খ্রি: থেকে ১৭৪৮ খ্রি: পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস তাঁর গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তারিখ, ঘটনা ও মৌলিক তথ্যের জন্য এই গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

৬) রায় বালমুকুন্দ ঃ—

তাঁর ইবরাৎ-ই-আরবার-ই-বাসার গ্রন্থে বাংলার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে ১৭৩৯ খ্রি: থেকে ১৭৫৭ খ্রি: পর্যন্ত। আলীবর্দীর রাজত্বকাল এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

৭) মহম্মদ হুসেন আজাদ বিলগ্রাসী ঃ—

বিলগ্রাসী মুর্শিদকুলী খানের দরবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি মীরজুমলা ও মহম্মদ আজম শাহের শাসনকাল সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। যদুনাথ সরকার তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন। দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের ত্রিপুরা অভিযানের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর সময়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন তিনি চিত্রিত করেছেন তাঁর গ্রন্থে।

৩.৩ জীবনী গ্রন্থ ঃ—

১) ইউসুফ আলীখানের তাজকীরা-ই-ইউসুফী বিশেষভাবে শাসক, চিকিৎসক, লেখক ও ফার্সি কবিদের জীবনী সম্পর্কে তথ্য দেয়। আলী ইব্রাহিম খান খলিল (১৭৩৫-১৭৯৪) তাঁর খুলাসাতুল কালামে ৭৮ জন লেখকের জীবনী রচনা করেছেন। তাঁর অন্য গ্রন্থ সুহুফ-ই-ইব্রাহিমে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ৩২৭৮ জন ফার্সি লেখকের জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সমসাময়িক কবিদের কাব্য ক্ষমতাকে তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। গুলাম হোসেন (১৭২৬-২৭-?) খুব সংক্ষেপে কবিদের জীবনী আলোচনা করেছেন। ৭৫ জন উর্দু কবিদের জীবনী আলোচনায় তিনি আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার করেননি। গুলজার-ই-ইব্রাহিম ৩২১ জন উর্দু কবির জীবনী আলোচনা করেছেন যাঁরা দিল্লী ও উত্তর ভারতে বসবাস করতেন।

৩.৪ ভ্রমণ কাহিনী ঃ—

ক. মির্জা ইতিসামউদ্দিন ঃ—

তাঁর রচনা সিগরাফ-নামা-ই-ওয়াইলায়াৎ (ইংলন্ডের ভ্রমণ কাহিনী)। তিনি দ্বিতীয় শাহ আলমের দূত হিসাবে ইংলন্ডে যান, দৌত্য ব্যর্থ হয় এবং ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলায় ফিরে আসেন। ইংলন্ড ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় লিখিত হয় ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ। ইউরোপের কলেজ, পরীক্ষণাগার, গ্রন্থাগারের উল্লেখ করেছেন তিনি। ইউরোপের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অনুরাগী হন তিনি। অপরদিকে ভারতীয় সমাজের উচ্চশ্রেণীর দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন এবং ভারতীয় সমাজের বিবাহ, শিশুযত্ন ও শিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য

করেন।

খ. মুন্সী ইস্‌মাইল ঃ—

১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে আসেন তিনি। ১৭৭২ খ্রি: রাসেলের সঙ্গী হিসাবে ইংলন্ডে যান এবং ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ফিরে আসেন। তিনি ইংলন্ডের বিভিন্ন স্থানের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন এবং সেখানকার পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা ও কৃষকদের অবস্থা বর্ণনা করেন। ইংলন্ডে স্থানীয় মানুষদের উল্লেখ না করলেও আঠারো শতকের ব্রিটেন ও ইউরোপের অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে।

এছাড়াও নবাবী আমলে নির্মিত মসজিদে ফার্সি ভাষাতে উৎকীর্ণ হয়েছিল লেখা।

৪. উর্দু সাহিত্য ঃ—

আঠারো ও উনিশ শতকের নবাবি দরবারে উর্দুভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল। এঁদের অনেকেই ফার্সি ও উর্দু কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। অনেকেই উর্দু ভাষাতে শুধু কবিতা রচনা করতেন। এঁদের অধিকাংশ ছিলেন বহিরাগত। উত্তর ও দক্ষিণ ভারত এমনকি ইরান থেকেও কেউ কেউ এসেছিলেন। নবাব দরবারে কেউ সামরিক বিভাগে। কেউ শাসন বিভাগে, কেউবা চিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁরা প্রায় সকলেই ছদ্মনাম গ্রহণ করতেন। উর্দু গজল, ধাঁধাঁ, গল্প, কৌতুক-নক্সা ও কবিতা রচনায় তাঁরা ছিলেন পারদর্শী। এঁদের অধিকাংশই নবাব আলীবর্দী ও সিরাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। দরাজ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শনে মীরকাশিম ও পিছিয়ে ছিলেন না। এঁদের মধ্যে তিন চারজন উল্লেখযোগ্য কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে উর্দু কবিদের আলোচনা করব।

ক) জোহর আলী, খালিক ঃ—

মির্জা হসদার পুত্র জোহর আলী দিল্লী থেকে মুর্শিদাবাদে আসেন নবাব নওয়াজেস মহম্মদের আমন্ত্রণে। নবাব মোবারকউদ্দৌলার রাজত্বকাল পর্যন্ত তিনি দরবারে ছিলেন। তিনি মার্সিয়া-গীত (শোকগীতি) রচনায় ছিলেন পারদর্শী। কারবালাতে তীর্থ করতে গিয়ে তাঁর সেখানেই মৃত্যু হয়।

খ) সৈয়দ মহম্মদ ফাকী ঃ—

তিনি হজরৎ আলীর বংশধর। তাঁর জন্মস্থান হায়দ্রাবাদ। তাঁর শিক্ষক মির্জা জানা হাজহার। নাদির শাহের আক্রমণের সময়ে নওয়াজেস মহম্মদের আমন্ত্রণে বাংলায় আসেন। ফাকী ছিলেন বিখ্যাত লেখক ইউসুফ আলী খানের (আঠারো শতকের মধ্যভাগ) বন্ধু। নিজে ছিলেন একজন সুফী কবি।

গ) শেখ কুদরৎ-উল্ল-কুদরৎ ঃ—

তিনি ছিলেন আঠারো শতকের বিখ্যাত কবি। উর্দুভাষার বিখ্যাত কবি খান আর্জুর

কাছে তিনি তাঁর কবিতা সংশোধন করতেন বলে জানিয়েছেন লেখক বাপার রাজদি। তাঁর দু-খন্ড কবিতার বই পাকিস্তানে রক্ষিত আছে। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর একখন্ড গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছে। আধ্যাত্মিক প্রেমকে কেন্দ্র করে তাঁর কবিতা সমসাময়িক কবিদের কাছ থেকে তাঁকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছে। সকল প্রখ্যাত পন্ডিতরা তাঁর কবিতার প্রশংসা করেছেন।

ঘ) মির্জা বাকর মুখলিস ঃ—

মুর্শিদাবাদেই তাঁর জন্ম। আলীবর্দী খানের নিকট আত্মীয় ছিলেন তিনি। মুখলিস হলেন হাজী আহমদের পৌত্র এবং মুখলিস আলীখানের পুত্র। তিনি প্রথাগত ধাঁচেই কবিতা রচনা করেন। ১৬৭টি কবিতা সম্বলিত তাঁর একখানি গ্রন্থের নাম সাকীনামা। তাঁর ১২৯টি গজল নিয়ে আর একটি গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে।

ঙ) সৈয়দ ইনসাল্লা খান ইস্‌সা ঃ—

তিনি ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি। প্রখ্যাত উর্দু গবেষক রামবাবু সাক্সেনার মতে ইন্‌সাল্লার পরিবার ইরানের নজফ্ থেকে দিল্লীতে এসেছিলেন। তাঁর পিতা মাসাল্লা খান মুঘল সম্রাটের হাকিম ছিলেন। দিল্লীর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা মাসাল্লা খানকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন। মুর্শিদাবাদেই তাঁর জন্ম এবং এখানেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। তবে মোবারকউদ্দৌলার (১৭৬৫-?) রাজত্বকালে তিনি দিল্লীতে ফিরে যান। তিনি উর্দু ও ফার্সি উভয় ভাষাতেই সুপন্ডিত ছিলেন। এছাড়া চিকিৎসা শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ ছিলেন। সংগীতে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর উর্দু কবিতার নাম দিওয়ান-রেকটি, মাসনভী সিকার নামা, মাসনভী সিকায়েৎ নামা 'জমানা'। এবং অসংখ্য ধাঁধাঁ ও কৌতুক নক্সা রচনা করেন। উর্দুতে তিনি গদ্য গ্রন্থ ও রচনা করেন দরিয়া-এ-লতাফৎ (আনন্দের সাগর) উর্দুভাষার ব্যাকরণও তিনি রচনা করেন। দিল্লীতে ফিরে গিয়ে তিনি মুঘল দরবারে সভাকবি হিসাবে নিযুক্ত হন।

৫. উপসংহার

উনিশ শতকেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মহিলা কবিও ছিলেন এঁদের তালিকায়। তবে উনিশ শতকে উর্দু কবিদের সংখ্যা বেশি ছিল ফার্সি কবিদের তুলনায়। বাংলা ও বিহারে ফার্সি ও উর্দু ভাষা চর্চার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও উচ্চ মননশীল ও সৃষ্টিশীল ধারা প্রায় লোপ পায়। তাছাড়া তৎকালীন রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন, মহাদুর্ভিক্ষ, ছোটখাটো বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ তাঁদের রচনায় কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দেশবাসীর চেতনাকে তারা স্পর্শ করেনি। ভাষা ছিল দূরভাষা। মুদ্রনযন্ত্রের অভাবে দুর্মূল্য গ্রন্থ জনসাধারণের নাগালের মধ্যে আসেনি। সুতরাং

এঁদের পাঠক সংখ্যা ছিল সীমিত এবং সমাজে এঁদের প্রভাব ছিল একেবারে নগণ্য।[৩]

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। ক) ডঃ সৈয়দ মহম্মদ রেজা আলী খান — The contribution of Urdu language and Literature in West Bengal, unpublished Ph.D. Dissertation, Calcutta - 1990.

খ) ডঃ তনবীর আহম্মদ - Persian studies in Bengal Under the Nawabs (1717-1765), unpublished Ph.D. Dissertation, Calcutta, 1993.

আমি প্রধানত আমার লেখার জন্য এই দুটি অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ ব্যবহার করেছি।

২। ডঃ তনবীর আহমেদ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ: ৪৯৯।

৩। ওয়াকিল আহমেদ - বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী (১৭৫৭-১৮০০), ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ: ৯৪-৯৫।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গে মুসলমান সমাজের জাতিবৈচিত্র্য

বিষ্ণুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে গঙ্গা, পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে বিহার পর্যন্ত প্রসারিত উত্তরবাংলা নামে পরিচিত ভূমিখন্ডে যুগযুগ ধরে বহুজাতির মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। বহুজাতির সংস্কৃতির সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গের লোকজীবনধারা। ঐক্যের বাণী, সংহতির উচ্চারণ উৎকীর্ণ হয়ে আছে উত্তরবঙ্গের জীবনচর্চায়, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, মেলায়, পুজোয়, নাটকে, পালাগানে, মন্দির মসজিদের গঠন শৈলীতে।

ইতিহাসের ধূসর যুগ পেরিয়ে পাঠান মুঘল ইংরেজ শাসনকালের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে ছিল এখানকার সমাজজীবন। ভাষাগত ঐক্য স্থানীয় সমাজজীবনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন করেছে। প্রচলিত লোকসঙ্গীতে ধ্বনিত হয়েছে সাম্য আর মৈত্রীর সুর। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব আর সুফীবাদের মিলনে জন্ম নিয়েছে যে প্রচলিত লোকায়ত ধর্মবিশ্বাস সেখানে ধর্মের তত্ত্বগত জটিল বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ না করাতে স্থানীয় ধর্মাচরণ হয়েছে জটিলতামুক্ত এবং উদার। সেজন্য শুধু ধর্মমতছাড়া লোকাচার এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভূমিপুত্র হিন্দুমুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

কিন্তু ইংরেজ শাসকরা ভারতবর্ষে নিজেদের শাসনকে চিরস্থায়ী করার জন্য রাজনৈতিক বিভাগের সঙ্গে যোগ করেছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ইতিহাসের বিকৃতি। এ ধরণের বিকৃতি ঘটানোর ফলেই ঔপনিবেশিক স্বার্থে রচিত শ্রেণীপাঠ্য ইতিহাসে ভারতীয় সমাজজীবনের প্রধান দিক যে আত্মীকরণ তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। সেখানে নেই হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত জীবনধারার উল্লেখ। বর্তমানে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মানসিক তিক্ততা, অবজ্ঞা আর অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে তার ভিত্তি এই ইতিহাস রচনার মধ্যেই অনেকখানি নিহিত রয়েছে।

এই পটভূমির আলোকেই উত্তরবঙ্গের লোকায়ত জীবনে সম্প্রীতির গৌরবময় ঐতিহ্যের অলোচনার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের লোকজীবনধারাকে অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই উভয় সম্প্রদায়ই ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মে সংঘর্ষ সমন্বয়ের পর দীর্ঘ সহঅবস্থানের ফলে পরস্পরকে আপন করে কৃষ্টি সংস্কৃতিতে পরস্পরের কাছে ঋণী রয়ে গেছে।

প্রাচীনকাল থেকেই উত্তরবঙ্গের ভৌগলিক অভিব্যক্তির মধ্যে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়,

মঙ্গোলীয়দের আগমনে এক মিশ্র জনজাতি গড়ে ওঠে। এই সংমিশ্রণ থেকেই পরবর্তীতে কোচ, রাভা, মেচ প্রভৃতি জনজাতির সূচনা হয়। মুসলিম শাসকদের বিজয় অভিযানে এবং পীরদরবেশদের প্রচারে দেশজ মুসলিম সমাজের বিকাশ ঘটে।

আলোচিত অঞ্চলে লোকায়ত ধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্য স্থানীয় ভিন্নধর্মীয় মানুষদের পরস্পরকে পরস্পরের কাছে টেনেছে। এখানে জাতিভেদ বিরোধী নাথপন্থার সঙ্গে সুফীধর্মধারার আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মগুরুরা জাতিধর্ম নির্বিশেষে এতদ্অঞ্চলের মানুষের কাছে অহিংসা প্রেম আর মিলনের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। স্থানীয় জনজাতির একটি অংশের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ধারার তন্ত্র সাধনার ছাপ রয়ে গেছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মরমী পীরদরবেশগণ উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ইসলামের এক জনগ্রাহ্যরূপ (Popular form) দেন। সুফীমতের সঙ্গে সহজেই গ্রামের প্রচলিত সাধনমার্গের সমন্বয় ঘটে। তাঁরা হাদিশ শরিয়তের উপর বেশি গুরুত্ব দেননি এবং স্থানীয় সংস্কৃতিরও বিরোধিতা করেননি। সমন্বয়বাদী চিন্তা ও কর্মের জন্য আজও পীরদরবেশগণ মুসলিম সমাজের পাশাপাশি স্থানীয় হিন্দুসমাজেরও শ্রদ্ধাভাজন। সত্যপীর সহ বহু পীরের উদ্দেশ্যেই হিন্দুমুসলমান উভয়েই সিন্নি বা প্রসাদ উৎসর্গ করেন। উরস উৎসবে জাতিধর্ম নির্বিশেষে শ্রদ্ধা জানান। এখানকার মুসলিম সমাজে একটা বহু প্রচারিত 'চারযুগের' গানের দলে মুসলিম গায়েনের সঙ্গে হিন্দুবাদ্যকরদের বাজনা বাজিয়ে দোঁহারের কাজ করতে দেখা যেত। দেহতত্ত্বমূলক এই গানের পদে একই সঙ্গে ইন্দ্র, আল্লা, মহাদেব, মা ফাতিমার উল্লেখ পাওয়া যায়। সঙ্গীতে সাম্য আর মৈত্রীর সুরের পাশাপাশি মন্দির স্থাপত্যেও (বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায়) মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়। এখানকার ইঁটের তৈরি মন্দিরের শীর্ষে গম্বুজের অবস্থান ইসলামী স্থাপত্যরীতিরই পরিচায়ক। ভুটানের সঙ্গে দীর্ঘ সংযোগের ফলে স্থাপত্যকলায় বৌদ্ধরীতিরও ছাপ পড়েছে। বিখ্যাত জল্পেশ মন্দিরে বৌদ্ধস্থাপত্যরীতির নিদর্শন দেখা যায়। পুরাতন কোচবিহার রঙপুর রাস্তায় বিদ্যেশ্বরী দেবীর মন্দিরে বনবিবির আকৃতিতে ব্যাঘ্রবাহিনী পূজিতা হন। বাংলা ১৩৩১ সনে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটির নির্মাতা ছিলেন তৎকালীন দিনহাটা মহকুমা করণের বকসীদ্বয়-আসমাতুল্লা আহমদ এবং হৈমানন্দ রায়।

উত্তরবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হিন্দুমুসলমানের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে সমন্বয়ধর্মী জীবন সাধনার ছাপ ছড়িয়ে রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার সুখানীতে আষাঢ় মাসে যে গারাম পূজা (গ্রামপূজা) হয়ে থাকে। সে পূজোয় হিন্দুদেবদেবীর সঙ্গে পীরমাজারের পুজোও করা হয়। কালিয়াগঞ্জের টুঙ্গাইল বিলপাড়ায় আজও অসুখে পড়লে গ্রামের উভয়সম্প্রদায়ের মানুষ সুস্থতার জন্য খোয়াজপীরের কাছে প্রার্থনা করেন। তিনদিন রোজা বা উপবাস পালন করেন। গঙ্গারামপুরের ধলদীঘির সৈয়দ করম আলি শাহের মাজারে উরস উৎসবের সময় মুসলমানরা শিরনি দিলে হিন্দরা হরির লুঠ দেন, সংকীর্তনও

করেন। বংশীহারীর খোয়ানাকোড় গ্রামে অগ্রাণ মাসে ধান পাকলে সবাই মিলে একইসঙ্গে 'নবান' বা নবান্ন উৎসব পালন করেন। মালদহে পাগলাপীরের বাঁশপুজোয় হিন্দুদেরও অংশ নিতে দেখা যায়। কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ীতে হুজুর সাহেবের মেলায় তাজিয়া নিয়ে আসার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গ্রামের হিন্দুরাও স্বচ্ছন্দে যোগ দেন। শিলিগুড়ির কাছে বলরামগ্রামে মহরমের চল্লিশ দিন পরে অনুষ্ঠিত হয় 'চল্লিশা মহরম।' এই অনুষ্ঠানে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই যোগ দেন। যে কারবালা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে হয়ে থাকে তার বর্তমান সভাপতি একজন হিন্দু (শ্রী কণকনারায়ণ চৌধুরী)। কোচবিহারের রাসমেলার শুভ সূচনা হয় যে রাসচক্রটি ঘুরিয়ে তা বংশানুক্রমিকভাবে নির্মাণ করেন স্থানীয় এক মুসলিম পরিবার।

শুধু ধর্ম নয় ব্যবহারিক জীবনেও মিশ্র জীবন চর্চার অনেক নিদর্শন রয়েছে উত্তরবঙ্গের মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাজীকর সম্প্রদায়ের জীবন ধারা। বাজীকর সম্প্রদায় মূলত যাযাবর। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গায় ময়নাগুড়ির নলডোবা, বক্সীর ডাঙ্গা, বাগডোগরার কাছে কেষ্টপুরে, রাঙ্গাপানী, শিলিগুড়ির কাছে বিহার মোড়ে, কিষাণগঞ্জে এরা ছড়িয়ে ছটিয়ে বেশ কিছুদিন হল বাস করছেন। বিষহরিপালাগান করা, সাপ খেলা দেখানো, তাবিজ জরিবুটি বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ নিয়ে এসে যেমন মনসাপুজো করেন, দই মিষ্টি দুধ কলা খান তেমনি ঈদের নামাজ পড়েন, সবে বরাতে রুটি হালুয়া সাদা পিঠে খান। বিবাহে গায়ে হলুদ, পানিছিটা, পাশা খেলা প্রভৃতি স্ত্রী আচার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিবাহের তিনি থেকে আট দিনের মাথায় 'সিন্দুল তোলানি" (সিন্দুরতোলা) উৎসব হয়ে থাকে। পরিবারের কেউ মারা গেলে তিনদিন আগুন জ্বালানো বন্ধ করে অশৌচ পালন করা হয়। আগে সুন্নত করা হত না, এখন হয়। মাথাভাঙ্গা-ফালাকাটা রাস্তায় বড়াইবাড়ী গ্রামের বাজীকরদের নামগুলি খুবই বৈচিত্রপূর্ণ। প্রভাত বাজীকরের ছেলের নাম রফিকুল, সফিকুল। আরেকটি পরিবারে ভাইদের নাম সুনীল, অনিল, মফিজুল। মহীদুল, দীননাথ বাজীকরের ভোটার পরিচয় পত্রে নাম রয়েছে দীনমহম্মদ।

জলপাইগুড়ি জেলার বীরপাড়া, হাসিমারা, গয়েরকাটা প্রভৃতি এলাকার চাবাগানগুলিতে অল্প কিছু সাঁওতালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাস। তাঁরা আজও সাঁওতালি ভাষা ও সংস্কৃতিই অনুসরণ করে থাকেন। নাম আরবীতে হলেও পদবীতে তাঁরা নিজ গোষ্ঠীর পুরাতন পরিচয় বহন করেন যেমন জাফর সোরেন, হোসেন লাকড়া ইত্যাদি। এদের সমাজজীবন প্রতিবেশী হিন্দু বা খ্রিস্টান সাঁওতাল আদিবাসীদের পৃথক নয়।

উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় মাছ ধরা এবং বিক্রি করে যে মুসলিম জনগোষ্ঠী তাঁরা পাঁঝরা নামে পরিচিত। এদের চালচলনে হিন্দুয়ানাব ছাপ রয়েছে। তার বহিঃপ্রকাশ হল এদের বিবাহিত মহিলাদেব মধ্যে সিঁদুর পরার চল রয়েছে।

হাজার বছর ধরে চলে আসা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে উত্তরবঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান। মুক্তমনের অধিকারী উত্তরবঙ্গের মানুষ বহু প্ররোচনাকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের সহনশীলতার ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছেন। লোককবির একটি ছড়া রয়েছে 'নানান বরণ গাভীরে, একই বরণ দুধ, জগত ভরিয়া দেখিলাম একই মায়ে পুত।' এই সহজ সরল সত্য কথাটাই ফুটে উঠেছে আলোচিত অঞ্চলের মানুষদের জীবনধারায়। তাঁরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন জীবনের চিরায়ত আদর্শ হল সংঘাত নয় মৈত্রী, বিভেদ নয় মিলন, দূরত্ব নয় নৈকট্য।

সূত্রনির্দেশ ঃ—

১) মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট ও উত্তরবঙ্গের মুসলিম সমাজ ঃ— বজলে রহমন-সোনামা এণ্ড কোং, কোচবিহার, ১৯৯৬।

২) উত্তরবঙ্গের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন - ধনঞ্জয় রায়, নর্থ ইষ্ট পাবলিকেশন, অতুল মার্কেট, মালদহ। ১৯৮৯।

৩। যুগ সংবাদ - ১ম বর্ষ, ঈদ সংখ্যা, ১৯৯৯ (পো: কল্পিপ, জেলা হাওড়া)।

প্রবন্ধের বাজীকর সম্প্রদায় সম্পর্কিত অংশটি ৮ই অক্টোবর ২০০০ সনে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার বড়াইবাড়ী গ্রামে শ্রী বিশু বাজীকর। শ্রী দীননাথ বাজীকর ও খলই মহম্মদ সর্দারের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা।

উত্তরবঙ্গের হাট

ধনঞ্জয় রায়

ইংরেজরা এদেশে আসার পর থেকে উনিশ শতকের শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকরা উত্তরবঙ্গকে সেরা অঞ্চল বলে মনে করত। উত্তরবঙ্গের উর্বর জমি, নাব্য নদী ও উৎপন্ন কৃষিজ পণ্যের প্রাচুর্য বিদেশী-শাসকদের কাছে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উত্তরবঙ্গে ব্যবসা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। এদেশীয় বণিকদের মাধ্যমে তারা এদেশ থেকে পণ্য সংগ্রহ করত আবার বিদেশ থেকে আমদানি করা পণ্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এখানকার হাটে হাটে বিক্রি কবত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে এদেশের ভূমি রাজস্ব এবং রাজস্বের ক্ষেত্রে একদল কায়েমী স্বার্থপুষ্ট জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করে এবং এদের নিয়েই এখানে কৃষি অর্থনীতি ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে গড়ে উঠে এক নতুন ঔপনিবেশিক অর্থনীতি। বাঙালি বণিকদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে ওই অর্থনীতির সাফল্যে ধনবান হয়ে ওঠে। এঁরাই হয়ে ওঠে আধুনিক কালের রাজা-মহারাজা, জমিদার-ভূস্বামী।

প্রাক্-পলাশী যুগে এখানকার জিনিসপত্রের উন্নত গুণমান, সস্তা দাম এবং বিস্ময়কর অঢেল উৎপাদনের কথা লিখে রেখে গেছেন ইংরেজ বণিক ভেরেলস্ট। ধান, গম, যব, তুলা, কলাই ও তৈলবীজ এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মাত। এখানকার কাঁচা রেশমী সুতো বিপুল পরিমাণে গুজরাট, লাহোর ইত্যাদি জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। হল ওয়েলের বর্ণনা থেকে জানা যায়। উত্তরবঙ্গের স্থানীয় মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য এই মাটিতে পর্যাপ্ত কার্পাস তুলো উৎপন্ন হত। তিনি জানিয়েছেন, প্রতি বছর আগ্রা ও দিল্লি থেকে বণিকেরা এখানে বাণিজ্যের জন্য আসত। এখানকার হাটগুলো থেকে লঙ্কা ও পাটজাত দ্রব্য তারা নিয়ে যেত। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মাশয়েমার্শ এবং চোভেট-এর বিবরণে জানা যায়, দেশী ও বিদেশী ব্যবসায়ীরা উত্তরবঙ্গ থেকে এক লক্ষ মণ তামাক, দশহাজার মণ সরিষা- ও সামান্য পরিমাণ আফিম স্থানীয় হাট থেকে কিনেছিলেন। এসব জিনিস নদীপথে মোগলহাট ও দেবীগঞ্জ বন্দরে জমা হয়ে ঢাকা-মুর্শিদাবাদে রপ্তানি হত। প্রতিবছর এখানকার স্থানীয় হাটে বেশ কিছু বালক-বালিকা বিক্রি হত। একটি বালিকার দাম ছিল ১২ টাকা আর বালকের দাম ২৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, কামরূপ অধিপতি ভাস্করবর্মা থানেশ্বর অধিপতি হর্ষবর্ধনকে যে দ্রব্য সামগ্রী দিয়েছিল তারমধ্যে মহার্ঘ মৃগচর্ম, বস্ত্র, বেত্রাসন, গুবাক, কৃষ্ণাগুরুতেল, কর্পূর, কস্তুরী. শ্বেত চামর ও গজদন্তের কুন্ডল ছিল। এসব সম্ভার এখানকার

হাট থেকেই বেচা কেনা হত। সেই সময় হাটে হাতিও পাওয়া যেত। মদন পালের আমলে ইটাহারের কাছে (উত্তরদিনাজপুর জেলা) জয়হাট নামে একটি বড় হাট বসত। এই হাটে একদিকে যেমন হাতি এবং ঘোড়া পাওয়া যেত, অপরদিকে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-পোষাক এমনকি সেনাও খরিদ পত্র হত। কথিত যে, মহাভারতের যুধিষ্ঠির যুদ্ধের সমস্ত সাজ-পোষাক, অস্ত্রশস্ত্র ও পদাতিক সমন্বিত চতুরঙ্গ সেনা এই হাট থেকে কিনেই কুরুক্ষেত্রে কৌরবদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে হজরত মুখদুম শাহ জালালুদ্দিন নামে এক সাধক ধর্ম প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গদেশে আসেন। বাঙালি রাজা লক্ষ্মণ সেন এবং পারস্যবাসী সাধক শেখ জালালুদ্দিনের মধ্যে সখ্য ও সহমর্মিতা গড়ে ওঠে এবং তারই নিদর্শন হিসেবে শেখ জালালুদ্দিনকে রাজা লক্ষ্মণ সেন ২২ হাজারী ওয়াকফ এস্টেট দান করেন। হলায়ুধ মিশ্রের 'শেখ শুভোদয়' গ্রন্থ পড়লে জানা যায়, মালদায় পান্ডুয়া, পিছলী গঙ্গারামপুর, দেবমহল বা দেওতলা বিভিন্ন জায়গায় শেখ সাধক সাধনপীঠে পরিণত করেন এবং মেলা ও হাট লাগান।

মধ্যযুগে মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিবরণে জানা যায়, এখানকার বিভিন্ন হাটে প্রচুর বিদেশী বণিক আসত রেশম ও রেশমজাত বস্ত্র কিনতে, বিনিময়ে তারা দিয়ে যেত মণিমুক্তো এবং সোনা। সেইসময় হাটগুলোতে সুদের কারবার ছিল জমজমাট। একদল বৈরাগী সম্প্রদায় এই ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীরাও এদের কাছ থেকে টাকা দাদন নিতেন। গৌড় সুলতান ইলিয়াস শাহ, নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহ, রকুনুদ্দিন বারবাক শাহ, সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ, শিকান্দার শাহ ও জালালউদ্দিন ফতে শাহের আমলে একলাখি ও গজলের হাট (গাজল) ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সুলতান হুসেন শাহ দমদমা (গঙ্গারামপুর) ও হিলির অদূরে ঘোড়াঘাটে দুটি বড় হাট লাগিয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতকে আমাদের লোককবি মাণিক দত্ত দেখেছিলেন, সুন্দর রাজার হাটে হাজার বিদেশী বণিককে সওদাপত্র করতে। সেখানে অগণিত ব্যবসায়ী, দোকানদার, অগণিত মণিমুক্তো, রুবি, বিভিন্ন ধরণের সূক্ষ্ম ও সুন্দর কাপড়, মখমল, পট্টু, ভুষনাই, বাটদরা, ঢাকাই, মালদই, সূক্ষ্ম ও সুন্দর কারুকাজ মন্ডিত বিলাতি দ্রব্য, সস্তা ও সহজলভ্য। চন্ডীমঙ্গলে তিনি লিখেছেন, 'রাজার সভাতে আইল সাধু, ধনপতি, দোলাতে ত্রাস্তিয়া সাধু করিল প্রণতি '। আবার জগৎজ্জীবন ঘোষাল 'মনসামঙ্গলে' উত্তরবঙ্গের বাণিজ্য বিনিময় চিত্রটি বড়ই আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। এখানকার হাটে হাটে চাঁদসদাগরের বাণিজ্যতরী জলে ভাসার কালে তিনি উৎপন্ন ও রপ্তানিযোগ্য জিনিসপত্রের বিবরণ দিয়েছেন, 'কাঁচা হরিদ্রা তোলে পুরাণ সুকুতা, ইহার বদলে নিব পাটনে গজমুক্তা, মাসকলাই আদার শুট আর তোলে জিরা, মরিচ, লবঙ্গ দিয়া বদল নিব হীরা, নারিকেল, তাল বেল আর কাঁঠাল আম এসব ফলনেই বড়কাম, পাটের ধকড়া মেখলা আর যত শাড়ি, যতন করিয়া লেই কাপড়েত জড়ি।' ১৭৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দে

মিশনারি উইলিয়ম কেরী লালগোলা (মালদা জেলা) ও মহীপালে (দক্ষিণ দিনাজপুর) দুটি বড় হাট লাগিয়েছিলেন। মদনাবতীতে একশত কেরীর কৃষি খামারের পণ্য সম্ভার এই হাট দুটোতেই আদান-প্রদান হত।

হাট শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'হট্ট' শব্দ থেকে। শব্দটি দ্রাবিড় শব্দ থেকে এসেছে এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছে। এই হাট-ই বঙ্কিমের ভাষায়, 'রমণীতে বেচে' রমণীতে কেনে লেগেচে রমণী রূপের হাট।' রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'হাট' লেগেছে শুক্রবারে, বক্সিগঞ্জের পদ্মাপারে...।' গুরু সদয় দত্তের ভাষায়, 'ঠিক দুপুরে ধায় হাটুরে' অর্থাৎ দুপুরে বেচাকেনার জন্য হাটে যায় হাটের মানুষ। হাট অর্থ বহু স্থানের লোকের সমাগমস্থল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্রেতা ও পণ্য বিক্রেতা একটি নির্দিষ্টবারে হাটে উপস্থিত হয়ে বিকি-কিনির শেষে দোকানপাট তুলে স্ব-স্ব স্থানে চলে যায়। হাটের সঙ্গে বাজারের তফাত এই যে, প্রায় সকল দ্রব্য সামগ্রীই হাটে সদা কেনাবেচার উপযোগী, বাজারে মূল্যবান সুলভ সকল জিনিষই সব সময় পাওয়া যায়। বাজারের তুলনায় হাটে প্রচুর লোকের সমাগম হয়, দোকান-পসার, সওদাসুলুপ বাজারে স্থায়ী। বন্দরের নিচের স্তরে ছিল হাট। হাটগুলো ছিল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মূল বুনিয়াদ। মূলত জমিদাররাই হাটের প্রতিষ্ঠাতা। গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে শহরের উঁচু জমিগুলোতে সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁরা হাট লাগানর ব্যবস্থা করেছিলেন। এগুলো ছিল তাঁদের আয়ের একটা বড় উৎস।

প্রায় পাঁচ বছরের জন্য হাটগুলোতে তোলা আদায়ের অধিকার দেওয়া হত। ইজারাদাররা সরকারের নির্দিষ্ট হারে বিক্রেতাদের কাছ থেকে তোলা আদায় করত। হাটে পশু কেনাবেচার জন্য ইজারাদারদের কাছে একটি রেজিস্টার থাকত। রেজিস্টারে ক্রেতা-বিক্রেতার নাম, পশুর বিবরণ এবং মূল্য লিপিবদ্ধ করে রাখা হত। ক্রেতাকে কেনার রসিদ দেওয়া হত আর হাটে থাকত জমিদারদের কাছারি ঘর। ব্যাপারিরা হাটে হাটে তাদের দোকানের জায়গা আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে নিত। তারা দোকানের উপর খড়ের বা চটের বা টিনের আচ্ছাদন দিয়ে নিত। অনেক দোকানি আবার মাঠের ধাপের ওপর বসত। এরজন্য তাদের হাট মালিকদের কাছে অগ্রিম টাকা দিয়ে চুক্তি প্রথায় জায়গা বন্দোবস্ত করে নিতে হয়। হাটে কৃষক-বিক্রেতাদের অনেকের কাছেই দাঁড়িপাল্লা থাকত না। পাইকার, দালাল বা ফড়িয়ারা পণ্য কেনার জন্য টাকার থলি ও দাড়ি পাল্লা নিয়ে ভিড় করত। এরজন্য প্রত্যেক বিক্রেতাকেই পাল্লাদারী হিসেবে ছাড় দিতে হত। শস্যের মধ্যে ধূলোবালি ও জলীয়ভাগের কারচুপির মধ্যে প্রবেশ না করে যে অবস্থায় যে পরিমাণই দ্রব্য থাকুক না কেন সেই অবস্থায় সমস্ত পণ্যের মোট মূল্য ঘোষণা করে বিক্রি করত। শস্য, শাক, সবজি, মাছ, ডিম, তরিতরকারী ইত্যাদির ক্ষেত্রে হাটে এটাই ছিল বিপণন পদ্ধতি। পাট, তামাক, সরিষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ওজন ব্যবস্থা ছিল স্বাভাবিক ব্যবসায়িক রীতি। ওই সময় ৮০ তোলায় ১ সের অথবা ৮২ তোলা ১০ আনায় ১ সের (১ সের ৬ ছটাকে ১ কেজি,

১ তোলা ১২.৬৬ গ্রাম), এই হিসেবে পণ্য ক্রয় বিক্রয় চলত। কে.এল.দত্ত একটি সমীক্ষায় বলেছেন (রাইজ অব প্রাইসেস ইন ইন্ডিয়া)। বিশ শতকের প্রথমার্দিকে সারা বাংলাদেশে গড়ে প্রতি চার মাইল দূরত্বে একটি হাট বা বাজার পাওয়া যেত এবং প্রতিহাজার পুরুষের জন্য ছিল একটি বাজার। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে প্রাক্ স্বাধীনতা কাল পর্যন্ত এই হাটগুলোই ছিল স্বদেশী, সন্ত্রাসবাদী, অসহযোগ, আইন অমান্য, ভারতছাড় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের তীর্থভূমি। কৃষকের গণমুখী আন্দোলনে যেমন ছত্রিশ আন্দোলন। প্রজার ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন, ধর্মগোলা আন্দোলন, গাছকাটা আন্দোলন, দিনাজপুর রাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং প্রজা বিদ্রোহের উৎস ভূমিই ছিল এই হাট-গুলো। হাটগুলোতেই আন্দোলনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। ১৯৩৯ সালের শেষদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কৃষক সমিতির উদ্যোগে হাটে হাটে কিষাণ কিষাণীর তোলাবন্ধ আন্দোলন উত্তরবঙ্গের কৃষক সংগ্রামের এক আলোকিত পর্ব। ১৯৪৬-৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে কৃষক গণবিদ্রোহের রক্তেরাঙা বীরগাঁথা সৃজিত হয়েছিল তার উৎস মূলে ছিল উত্তরবঙ্গের এই রূপের হাট রূপোর হাটগুলোই। আজও এই হাটগুলো গ্রামের মানুষের ভাবের আদান প্রদান, দেখা সাক্ষাৎ, বিয়ে খবরাখবর, ডাক বিভাগের চিঠিপত্র আদান প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটা বড় মাধ্যম বলা যায়। এ জন্যই উত্তরবঙ্গের হাটগুলোকে বলে কৃষকের সোনার গৃহ। স্বাধীনতার পর জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ফলে অনেক হাটই সরাসরি জেলা প্রশাসনের ভূমি রাজস্ব বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। নিলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ডাক প্রদানকারীকে পাঁচ বছরের জন্য হাটগুলোকে ইজারা দেবার সাবেক প্রথা আবার চালু হয়। সরকারি তরফে হাটের জন্য হাট পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। ওজন ও বিনিময় ব্যবস্থার তারতম্য দূর করার জন্য হাটে হাটে মেট্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ হচ্ছে কিনা এরই তদারকির জন্য ওই হাট পরিদর্শক পদটি রচিত হয়। রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির আওতায় পড়ে আবার অনেক হাটেই আজকাল ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই সুবিধার জন্য শৌচাগার, প্রস্রাবাগার, স্নানাগার, বিশ্রামাগার, গুদামঘর ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই নিরিখে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কয়েকটি হাট ফিরে দেখা যাক।

কোচবিহার জেলায় গুরুত্বপূর্ণ হাটগুলোর মধ্যে রয়েছে দেওয়ানহাট, গোসানীমারীহাট, ঘোড়ামারাহাট, দিনহাটা, হলদিবাড়ি হাট, বক্সিরহাট, বলাইর হাট, ধাপরাহাট, নাজির হাট, গারোদের হাট, আক্রার হাট, পশারীহাট, রাণীর হাট ইত্যাদি। হাট নিয়ে জেলায় প্রবাদ, 'আগত হাটে পাছৎ হাটে, তিন চন্দ্রে তাবা না আটে'। অর্থাৎ হাটের প্রথমে যখন বহু লোক থাকে তখন প্রসাদ বিতরণ করলে অনেক প্রসাদের দরকার হয়। তাতে বহু অর্থ খরচ হয়। এরকম তিনহাট প্রসাদ বিতরণ করলে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের জন্য সে সর্বস্বান্ত হয়। অপর একটি প্রবাদ, 'ধান পান গাই, এইলা ঘরৎ থাকিলে কারো দুয়ারৎ না যাই'। অর্থাৎ

হাটে ধান, পান আর গাই (গরু) থাকলে কৃষকের মুখ নিশ্চিত। এরজন্য অপরের দ্বারস্থ হতে হবে না তাকে। সাপ্তাহিক হাটে বিকিকিনির জন্য দূর-দূরান্ত থেকে কৃষকেরা দল বেঁধে গরুর গাড়িতে উৎপাদিত কৃষিপণ্য নিয়ে চলতে চলতে তাদের আপন মনের গান 'ওকি গারোয়ান ভাই, হাঁকাও গাড়ি তুমি, চিলমারী বাদরে।' জলপাইগুড়ি জেলার উল্লেখযোগ্য হাটগুলো, আমগুড়ি, মেটালি, বার্ণেশ জংশন, রামশাই, মাদারিহাট, গায়েরকাটা, ধূপগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, শামুকতলা, সাত্রাবাড়ি, বেলাকোবা, নাগরাকাটা, কুমারগ্রাম, বানারহাট, বীরপাড়া ও রাজগঞ্জহাট। এইসব হাট একসময় ছিল আলো ঝলমল, দেশবিভাগের পরে তার গৌরব অস্তামিত প্রায়। রাজগঞ্জ হাটের দৃশ্য দেখে সত্যেন রায়ের গান, 'আইও গে মাইও গে লাগিল গন্ডোগোল, কারফিউ আইমেরে বলে হাটৎ দিলেক ঢোল, টাম টকরা বান্ধি সান্ধি, কায়রা কোঠে যাচ্ছে, দিশা ধান্দা হারেয়া মগায় খালি হোচট খাচ্ছে।' ভুটান ও কোচবিহার থেকে নানা বাণিজ্য সম্ভার এই সব হাটে আসে। কোচ, রাভা, মেচ, মুন্ডা, ওঁরাও, খারিয় বিভিন্ন জনজাতির মানুষ বিকিকিনির জন্য এই সব হাটে মিলিত হন। লোকায়ত জীবনে এই হাট যেন আপন হাট। লোককবির ভাষায়, এই হাট শুধু মাটি দিয়ে গড়া নয়, মানুষ দিয়ে গড়া।' দার্জিলিং জেলার অন্যতম হাটগুলোর মধ্যে রয়েছে মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, ফাঁসীদেওয়া, খড়িবাড়ি, পাংখাবাড়ি ও বিধান নগর হাট। জলমাখান ভেজা স্মৃতির কিছু পুরা কথা, 'হাটে যাবি লিবে ডাকাইতে, পরাণ দিবি নগদা হাতে'। অর্থাৎ হাটে গেলে দল বেঁধে ফিরতে না পারলে জীবনটা ডাকাতের হাতেই রেখে আসতে হবে। এ জেলার ফাঁসীদেওয়া হাট আলু, কমলালেবু, এলাচি, ভুট্টা, ধান, আনারস, আদা, লঙ্কা, সবজি, পাহাড়ি ঝোরার সুস্বাদু মাছের জন্য খ্যাত। একদা মাটিগাড়া হাটে রেলি ব্রাদার্স, বার্কমায়ার, ল্যান্ডেন ক্লার্ক-এর মত বিদেশী ব্যবসায়ীরা পাট কিনতে আসতেন। বিহার ও নেপাল থেকে প্রচুর পরিমাণে পাট এখনও আসে এই হাটে।

উত্তরদিনাজপুর জেলার হাটগুলোর মধ্যে ধর্নকৈল, কুনোর, কমলাবাড়ি, মহারাজা. বিন্দোল, দুর্গাপুর, ইটাহার, বারদুয়ারী, রসখোয়া, গতিরাজ, টুশিদীঘি, বিষ্ণুপুর, পাঞ্জিপাড়া, ডালখোলা, চোপড়া, রামগঞ্জ ও ঝিট্‌কা হাট অন্যতম। প্রতি হাটে লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন। গরু, মহিষ, হাঁস, মুরগি, ছাগল, পায়রা, ধান, পাট, কলাই, লঙ্কা, পেঁয়াজ ইত্যাদি। হাটগুলোর মূল বাণিজ্যিক সামগ্রী। এ জেলার কুনোর, ধর্ণকৈল ও পতিরাজ হাটে রাজবংশী রমণীদের ধোকড়া কেনা বেচা গ্রামীণ অর্থনীতির এক উজ্জ্বল অধ্যায়। জেলার কমলাবাড়ি হাটটি তুলাই পাঞ্জি চালের জন্য খ্যাত। দক্ষিণ দিনাজপুরের উল্লেখযোগ্য হাটগুলো, সাহেব কাদারী, নয়াবাজার, তিওড়, শিববাড়ি, কুমারগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, নাজিরপুর, রামপুর, জিটাল, হরিরামপুর, পানিশালা, চৌষা, দালান, তপন, পতিরাম, ঊষাহরণ ও সরাই হাট। ধানের জন্য খ্যাত হাট হরিরামপুর হাট। কার্তিক-

অগ্রহায়ণ মাসে এই হাটে পালিত হয় হাট 'ব' উৎসব। 'ব' অর্থ ব্রত। এই ব্রতে রাজবংশী নারীরা কাঁখে কলসি, মাথায় ঘট নিয়ে গান গাইতে গাইতে হাট পরিক্রমা করে। মূলত হাটের কারবারিদের বিপদ আপদ নাশ ও হাটে এসে কেউ অসুস্থ হয়ে যেন না পড়ে তারই কল্যাণে উদ্‌যাপিত হয় হাট 'ব' ব্রত। হাটকে ঘিরে লোকায়ত সংস্কৃতির এই সংবেদনশীল সঞ্চারী বাংলায় আর কোথাও হয়ত নেই। মালদা জেলার অন্যতম হাটগুলো গাজোল, খরবা, কশিদা, চাঁচল, পাকুয়া, হরিশচন্দ্রপুর, সামশী, হবিবপুর, কালিয়াচক, আমানীগনু, আইহো এবং ভালুকাহাট। কালিয়াচক হাটটি লাগে সকাল ৬টায়, সকাল ১০টায় ভেঙে যায়। লুঙ্গি গামছা ও তাঁতের শাড়ি এই হাটের লক্ষণীয় দিক। সিজনে মালদার প্রায়ই হাটে আম পাওয়া যয়। প্রায় ১০-১২ কোটি টাকার আম রপ্তানি হয় এ জেলার বিভিন্ন হাট থেকে।

বাড়ন্ত জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে জীবনের সব ক্ষেত্রে। কর্মসংস্থানের উপযুক্ত বিকল্প না থাকায় হাটের সওদা সুলুপ ক্রমশই সর্বনাশা পরিণামের দিকে এগিয়ে চলেছে। হাট ব্যবসায়ীদের আর্থিক সুস্থিতি ও সামাজিক সুরক্ষা কালের স্থূল হস্তাবলেপে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ছে। হাটের অন্তরালে লোকজীবনের বেঁচে থাকার লড়াই দিন দিন কঠিন হয়ে পড়েছে। সীমান্তে বাংলাদেশ থাকার দরুণ চোরা চালান এলাকাগুলোতে প্রকাশ্য ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। ফলে হাটের সুস্থ ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলকে ক্রমে অসুস্থ ও জটিল করে তুলছে। তা সত্ত্বেও উত্তর বঙ্গের গ্রামীণ হাটগুলোকে ঘিরে মানুষের বেঁচে থাকার মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সচেতনা, ধর্মীয় ঐক্যবোধ ও আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে তা অতি গর্বের, আশার আলো দেখায়। এই মাটির আপন কৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক গৌরব নিয়ে অনন্য হাটগুলো এখনও তার অতীত ঐতিহ্যেরই সাক্ষ্য দেয়।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক : ডঃ সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কল-৯, পৃ:-১, ১৫,২৯।

২। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড।

৩। কোচবিহারের ব্যবসা ও বাণিজ্য : সেকাল-একাল : কৃষ্ণেন্দু দে, মধুপর্ণী, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬; পৃ: ১৭৩।

৪। বাঙ্গালীর ইতিহাস অদিপর্ব : নীহার রঞ্জন রায়, প্রথম প্রকাশ দেজ সংস্করণ - ১৪০২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৩৯০, ৪১২।

৫। জানা-অজানার দিনাজপুর : ধনঞ্জয় রায়, নিউবুক, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯।

৬। বাংলার আর্থিক ইতিহাস (বিংশ শতাব্দী) : সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা - ১২; পৃ: ১৩৭।

রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা : প্রসঙ্গ রাজবংশী ভাষা ও জাতির পরিচয়

ডালিয়া ভট্টাচার্য

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাত পাতই ছিল মানুষের পরিচয়ের প্রধানতম ভিত্তি। সামাজিক এই পরিস্থিতিতে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা কোচ বিহারের অন্তর্গত মাথাভাঙ্গার এক অখ্যাত গ্রাম খোনাসামারীতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ পাস করেন। মেধা এবং যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোচবিহার শহরে মর্যাদা সম্পন্ন চাকরি না পাওয়ায় তিনি ওকালতি পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। ওকালতি পাস করে রংপুরে এসে ওকালতি শুরু করেন।

ওকালতি জীবনকালীন তাঁকে চরম অপমানিত হতে হয়ে তাঁরই কিছু জাত্যাভিমানী সহকর্মীর কাছে। তাঁর মত উচ্চশিক্ষিত, এবং রাজবংশী সমাজের প্রথম এম.এ.বি.এল বেলায় যখন এই অবস্থা; তাঁর জাত ভাই যারা চাষা-মজুরের বেলায় তো কথাই নেই। তিনি পরিত্রাণের পথ খুঁজতে থাকেন।[১]

অর্থলাভের মোহ ছেড়ে বাংলা, বিহার ও আসামের বিশাল এক জনগোষ্ঠীর দুঃখ, দারিদ্র ও হীনমন্যতার অবসান করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই জনগোষ্ঠী তখন রাজবংশী নামে পরিচিত ছিল। রাজবংশী জাতিকে ক্ষত্রিয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।[২]

পঞ্চানন হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করে প্রমাণ করেছিলেন যে রাজবংশী জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত। ভারত ব্যাপী পন্ডিত সমাজে তিনি তাঁর এই অভিমত প্রমাণ করলেন এবং ক্ষত্রিয় হিসাবে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের হাত দিয়েই সদলবলে সমারোহ সহকারে উপবীত গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে রাজবংশী সম্প্রদায় যে কোচ জাতি থেকে আলাদা এবং তাঁরা যে আর্য বংশ সম্ভুত ক্ষত্রিয় তা সরকারি ও সর্বভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের স্বীকৃতি লাভ করে।[৩]

ইদানীং একটি নতুন মতের প্রাবল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে — রাজবংশী জাতি বাঙালী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নয়। এই প্রশ্ন কিন্তু পঞ্চানন বর্মার জীবন কালীন ওঠেনি। কেউ কোনদিনও এ প্রশ্ন তোলেননি, যে রাজবংশী জাতি বাঙালী নয়। পঞ্চানন বর্মার কাজেও এর প্রমাণ আছে। প্রথম মহাবিশ্ব যুদ্ধের সময় তাঁর উৎসাহে রাজবংশী ক্ষত্রিয় যুবকরা Bengal Regiment (বেঙ্গল রেজিমেন্ট) এ সৈন্য হিসাবে যোগদান করেছিল এবং তাদের সাহস ও ক্ষাত্র তেজ দেখে করাচিতে বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধ্যক্ষ প্রশংসা করেন।[৪]

পঞ্চানন বর্মা নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য নারী রক্ষা সেবক দলের প্রতিষ্ঠা করেন। উনি কেবলমাত্র রাজবংশী নারীদের জন্য নয় সকল হিন্দুনারীদের জন্য রক্ষা সেবক দল গঠন করেন।[৫] ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা, উপেন্দ্রনাথ বর্মন সহ রাজবংশী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা কখনই এ প্রশ্ন তোলেননি যে তাঁরা বাঙালী নন। পঞ্চানন বর্মার ধ্যান ও ধারণার সঙ্গে সাম্প্রতিক কালীন মতের বেশ মৌলিক পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। ক্ষত্রিয় সমিতির বার্ষিক সম্মেলনেও কোন দাবি জানানো হয়নি, যে তাঁরা বাংলা ভাষার গোষ্ঠীর অন্তর্গত নয়।[৬] কাজেই দেখা যাচ্ছে এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

ঠাকুর পঞ্চানন তাঁর রংপুর জীবনের আরম্ভকালে সাহিত্য চর্চা করতেন। তিনি বহুকাল পূর্বের তালপত্রে হস্ত লিখিত দ্বিজ কমলা লোচনের "চন্ডিকা বিজয়" কীটদষ্ট পান্ডুলিপিটি উদ্ধার করেন ও টিকা-টিপ্পনী ও ভাষ্য লেখেন। গোবিন্দ মিশ্রের গীতা ও শ্রীনামী মহাভারত ও তাঁরই আবিষ্কারের মধ্যে অন্যতম। তিনি রংপুর সাহিত্য পরিষদ এর সহকারী সম্পাদক এবং এই পত্রিকার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। তিনি উত্তর বাংলার ভাষা, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বহু গবেষণামূলক লেখা লেখেন। তিনি রাজবংশী ভাষায় ছিলকা, জাগগান, প্রবাদ, প্রবচন, ইত্যাদি উদ্ধার করে লেখেন।[৭]

পঞ্চানন বর্মার লেখা 'কামতা বিহারী সাহিত্য' প্রবন্ধটি রংপুর সাহিত্য পরিষদ এর তৃতীয় বার্ষিকী সম্মেলনে পড়া হয়। এই প্রবন্ধের উল্লেখ করে অনেক সমালোচক বলছেন যে পঞ্চানন বর্মা উত্তর বাংলার ভাষাকে কামতাবিহারী ভাষা হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং এই ভাষা বাংলা ভাষার থেকে আলাদা। অনেকে মনে করেন ঠাকুর পঞ্চানন রাজবংশী ভাষা কে বাংলা ভাষার জন্মদাত্রী বলে মনে করতেন। তারা বলে থকেন যে রাজবংশী ভাষার মৌলিকত্ব অতি প্রাচীন। বাংলা ভাষার ইতিহাস প্রণয়নে 'চর্যাপদ' কে এই ভাষার আদি গ্রন্থ বলা হয়েছে। জাগের গানে, পল্লীগীতিতে, পল্লীছিলকা ও ছড়া প্রভৃতিতে যে শব্দভাণ্ডার সৃষ্টি হয়, সেইসব শব্দ বাংলার ঐ আদি গ্রন্থগুলিতে বিদ্যমান।[৮] ওরা জি. এ. গ্রিয়ারসন এর মত তুলে ধরেন। গ্রিয়ারসন লিখেছিলেন: "When we cross the river (Brahmaputra) coming from Dacca, we meet a well worked form of speech in Rangpur and the district to its north and east. It is called Rajbansi and while undoubtedly belonging to the eastern branch has stil points of difference which lead us to class it as a separate dialect."[৯] [ব্রহ্মপুত্র পেরলে, রংপুর এবং তার উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলে একটি ভিন্ন ধরণের ভাষা লক্ষ্য করা যায়, তার নাম রাজবংশী। এটি পূর্ব অঞ্চলের ভাষার একটি শাখা এবং একটি আলাদা উপভাষা।]

এখানে লক্ষণীয় যে গ্রিয়ারসন separate dialect (উপভাষা) বলেছেন, separate language (ভাষা) বলেননি। রাজবংশী ভাষা বাংলারই অন্যতম উপভাষা এবং আরও দুটি উপভাষা আছে 'eastern' (পূর্ব) ও 'northern' (উত্তর) - রাজবংশী এই দুটি সন্নিহিত উপভাষা থেকে নিজের চরিত্র বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। গ্রিয়ারসন আরও বলেছেন যে,-

"Magadhi Apabhramsa, infact, may be considered as spreading out eastwards and southwards in three directions. To the north east it developed into Northern Bengali and Assamese, to the south into Oriya and between the two, into Bengali."[১০]

মাগধি অপভ্রংশ ভাষা পূর্ব ও দক্ষিণে তিন দিকে প্রসার হয়। এই ভাষা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে উত্তর বাংলা ও আসামি, দক্ষিণ দিকে উড়িয়া এবং দুটোর মাঝে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়।

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এব মত অনসুরণ করে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ মতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় যে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই রাজবংশীদের পূর্বপুরুষরা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার তৃতীয় স্তরের ভাষা মাগধি অপভ্রংশেরই রূপ।[১১]

রাজবংশী ভাষা ব্যবহারে ধ্বনিগত ও রূপগত দিক থেকে মাগধি অপভ্রংশেরই একটি আঞ্চলিক রূপ। বাংলা ভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে নিজস্ব বৈশিষ্ট নিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তার এই বিবর্তন রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতার জন্য মধ্য বাংলা পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে কলকাতা। ফলে কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের একাধিক উপভাষার বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করে জন্ম নিয়েছে শিল্প বা সাহিত্য বাংলা। অন্যদিকে বঙ্গদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে যাওয়ার ফলে সেই অঞ্চলের অধিবাসী রাজবংশীদের ভাষার গুরুত্ব কমে যায় এবং বিবর্তনের পথে তা আর বেশিদূর এগোতে পারেনি। বাংলার মধ্যযুগীয় অনেক বৈশিষ্টই তাই এখনও রয়ে গেছে এই ভাষায়।[১২]

যে সব ভাষা আধুনিক বাংলায় আর ব্যবহৃত হয় না কেবলমাত্র কবিতাতেই সচল, যে সব বাক্যরীতি ভাবধারা ও অব্যয় এখনও সাধু বাংলায় কোথাও কোথাও পাওয়া গেলেও চলতি বাংলায় মেলে না তার প্রায় সবটাই এই রাজবংশী বা কামরূপীতে বিদ্যমান।[১৩]

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে বাংলা ও রাজবংশী বা কামরূপীর মূল উৎস এক - মগধি অপভ্রংশ। বিবর্তনের পথে বাংলা এগিয়ে গেছে। ঐতিহাসিক কারণে রাজবংশী বা কামরূপীর ঠিক সেভাবে বিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু দুটি ভাষাই এক মাতৃজঠর থেকে উদ্ভূত। বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক মহম্মদ শাহীদুল্লাহ বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষা অভিধান নামক বইটিতে এই অঞ্চলের প্রচলিত ও কথ্য ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেন নি।[১৪]

সম্প্রতি কোচবিহারের রাজকন্যা গায়েত্রী দেবীও এই অঞ্চলের প্রচলিত ভাষাকে বাংলা ভাষারই একটি অন্যতম রূপ বলে চিহ্নিত করেছেন।[১৫]

তাছাড়া প্রেমহরি বর্মন, যিনি রাজবংশী জাতির প্রতিনিধি ও পূর্ব পাকিস্তানের

বিধানসভার সদস্য ছিলেন, বাংলা ভাষার আইন কে সমর্থন করেছিলেন।[১৬]

ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা যিনি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ওকালতি পেশা ত্যাগ করে রাজবংশী জাতির উন্নতির জন্য আজীবন কাজ করে গেছে তিনি কোন দিন ও নিজেকে বাঙালি থেকে ভিন্ন জাতি ভাবেননি এবং রাজবংশী বা কামতাপুরী ভাষাকে বাংলা ভাষার ভিন্ন মনে করেননি। যদিও ঠাকুর পঞ্চানন রাজবংশী ভাষাতেই কথা বলতে ভালোবাসতেন এবং এই ভাষাতেই সম্বোধন করতেন কিন্তু তিনি আজীবন মান্য বাংলা ভাষাতেই বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া ক্ষত্রিয় সমিতির বার্ষিক বিবরণীগুলিও মান্য বাংলা ভাষাতেই লেখা [১৭]। ঠাকুর পঞ্চাননকে এই বিতর্কের মধ্যে যাদের জড়ানোর চেষ্টা, তাদের দাবি শুধু অবান্তর নয়, ঠাকুর পঞ্চাননের মত আত্মত্যাগী, প্রজ্ঞাবান, মহান নেতার জন্য অত্যন্ত অসম্মানীয়।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। বর্ম নারায়ণ সরকার, রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা, মাথাভাঙ্গা, ১৩১৪, বঙ্গ শতাব্দী, পৃ. ৫; ২৪-২৫; উপেন্দ্রনাথ বর্মন, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মন জীবনচরিত, জলপাইগুড়ি, ১৯৮১, পৃ. ৮।

২। উপেন্দ্রনাথ বর্মন, ঐ (Op. Cit) , পৃ. ১৪।

৩। ক্ষত্রিয় সমিতির প্রথম বর্ষের কার্য বিবরণী, রংপুর, ১৩১৭, বঙ্গ শতাব্দী; চতুর্থ বর্ষের কার্য বিবরণী, রংপুর, ১৩২০, বঙ্গ শতাব্দী; ক্ষেত্রনাথ সিংহ, রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার জীবনী, কলকাতা, ১৯৩৯, পৃ. ১৪।

৪। ক্ষত্রিয় সমিতির দশম বর্ষের কার্যবিবরণী, রংপুর, ১৩৩৪ বঙ্গ শতাব্দী।

৫। ক্ষত্রিয় সমিতির আঠারোতম বর্ষের কার্যবিবরণী, জলপাইগুড়ি, ১৩৩৪ বঙ্গ শতাব্দী।

৬। দ্রষ্টব্য, ক্ষত্রিয় সমিতির বার্ষিক বিবরণগুলি।

৭। ডঃ রমেন্দ্র নাথ অধিকারী, 'রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার সাহিত্য ও ভাষা চর্চা', স্মরণিকা, কোচবিহার, ১৯৯০, পৃ: ১৩-১৬।

৮। ধর্ম নারায়ণ বর্মা, A step in the Kamtabehari Language, কোচবিহার, ১৯৯১, পৃ. ৫।

৯। G.A. Grierson. A Linguistic Study of India, Vol. I, pg. 153।

১০। G.A. Grierson, A Linguistic Study of India Quoted in, ড: নির্মল দাস, উত্তর বাংলার ভাষা প্রসঙ্গ, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ২০।

১০। ড: শুখবিলাস বর্মা, তিস্তার পারে অস্থিরতা, কলকাতা, ২০০০। পৃ. ৮-৯।

১১। ঐ।

১২। ঐ।

১৩। ঐ।

১৪। অধ্যাপক শাহীদুল্লাহ (সম্পাদক), আঞ্চলিক ভাষা অভিধান, ঢাকা, ১৯৮৯, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ।

১৫। গায়েত্রী দেবী, The Princess Remembers, নিউ দিল্লী, ১৯৮২, পৃ: ৫৬।

১৬। দ্রষ্টব্য, Documents on Bengali Language Movement in East Pakistan, ঢাকা, ১৯৫২।

১৭। দ্রষ্টব্য, ক্ষত্রিয় সমিতির কার্যবিবরণ গুলি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ মহাশয়কে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

উত্তরবঙ্গের ভূমি রাজস্ব—তেভাগা থেকে অপারেশন ব্যবস্থা

বিষ্ণুদয়াল রায়

এই প্রবন্ধের আলোচনার পরিধি জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলা এবং দার্জিলিং জেলার সমতল অংশ বিশেষ। উত্তরবঙ্গের কৃষক আন্দোলন, বিশেষ করে 'তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা' সম্পর্কে কিছু বিষয় আলোকপাত করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

সমগ্র ডুয়ার্স এলাকায় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে। কারণ এই এলাকা "নন রেগুলেটেড' এলাকা বলে চিহ্নিত ছিল। অর্থাৎ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যে সব আইন ও রেগুলেশন চালু ছিল তা সাধারণ ভাবে এই অঞ্চলে প্রযোজ্য ছিল না। প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে সরকার বিশেষভাবে কোন আইন এই সব অঞ্চলে বলবৎ করলে কেবলমাত্র সেই আইনই প্রযোজ্য হত। ১৮৬৫ খ্রি: ডুয়ার্স অঞ্চল স্থায়ীভাবে ব্রিটিশ ভারতে যুক্ত হলে ঐ অঞ্চলের জন্য ১৮৬৯ এ "ভুটান ডুয়ার্স অ্যাক্ট" পাশ করা হয় এবং তদনুযায়ী এতৎ অঞ্চলের প্রশাসন চালু হয়। এই আইন অনুযায়ী এই এলাকার স্থাবর সম্পত্তি, রাজস্ব, খাজনা ইত্যাদির উপর দেওয়ানী আদালতের কোন এক্তিয়ার ছিল না।

এই ডুয়ার্স এলাকায় জোতদার বা আধিয়ার বিভিন্ন সূত্রে জমির সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেই সময় প্রজা বা আধিয়ারদের সঙ্গে জোতদারদের একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল। এর কারণ হিসাবে দেখা যায়,, জমিদারী শোষণ অপেক্ষা জোতদারী শোষণ অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং জোতদারের সঙ্গে প্রজাদের ফারাক ছিল খুব সামান্য।

জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলার সমতল তথা উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হল আধিয়ার যাঁরা জোতদারের জমিতে চাষাবাদ করত। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ছিল জোতদারের আর অর্ধেক থাকত আধিয়ারের। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যেত সেই ফসলে আধিয়ারের সারা বছরের অন্ন সংস্থান হতো না। ফলে আধিয়াররা তাদের জোতদারের কাছ থেকে দ্বিগুণ চড়া সুদে ধার করত। অনেক সময় দেখা যেত এই ধার পরিশোধ করার জন্য আধিয়ারকে সব শস্যই দিয়ে দিতে হত। একদিকে জোতদাররা বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠত এবং অন্যদিকে আধিয়ার কৃষক সমাজ কঠিন অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দুর্বিসহ জীবন যাপন করত।

তাই জোতদারদের নানা প্রকার অত্যাচার ও শোষণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এই কৃষক সমাজ। তাদের সঙ্গে ছিল দারিদ্র এবং জোতদারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ছিল না তাদের এই ক্ষোভ বহিঃপ্রকাশের হাতিয়ার। এই অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাবার

উদ্দেশ্যে কৃষকরা সংগঠিত হয় এবং প্রতিবাদের রণকৌশল ঠিক করে। এই সংগঠিত কৃষক সমাজ তাদের প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসাবে "গান্ডী' বা "তোলা" বন্ধের আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। আওয়াজ ওঠে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ চাই গরীবরাজ কায়েম করা চাই।

এই ডুয়ার্স এলাকায় যাঁরা তে-ভাগা আন্দোলনের (১৯৪৬-৪৭) সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর সিংহ ভাগ মানুষ ছিল রাজবংশী সম্প্রদায় এবং উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৯৪৫-এর "দি বেঙ্গল অ্যাডমিনিসট্রেটিভ এনক্যুইরি কমিটি" তৎকালীন জোতদারী প্রথাকে সেকেলে এবং ভূ সম্পদ ও জল সম্পদের সদ্ ব্যবহারের পক্ষে পরিপন্থী বলে মতামত প্রকাশ করেন। 'দি এগ্রেরিয়ান রিফর্মস্ কমিটি' একই মতামত পোষণ করলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জোতদার জমিদারদের জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে "দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল এস্টেট এক্যুইজিশন অ্যাক্ট ১৯৫৩" বলবৎ করেন।

কিন্তু দেখা যায় এই এলাকার শতকরা ৮০ ভাগ জোতদারই ছিল কষি নির্ভর এবং কৃষি ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। ১৯৫৫ এ ভূমি সংস্কার আইন" অনুযায়ী জমির মালিকদের জমি রাখার উর্দ্ধসীমা নির্ধারিত হয় ২৫ একর। এর ফলে দেখা যায় বহু জোতদারের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে। কৃষি নির্ভর এই জোতদাররা কৃষি ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্র কল্পনায় করত না। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প বা অন্য কোন ক্ষেত্রে তাদের বিনিয়োগ লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের কোন বিনিয়োগ চোখে পড়ার মতো ছিল না। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁরা ছিল যথেষ্ট পিছিয়ে সুতরাং জোতদারী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়। এই অর্থনীতির সঙ্গে পিছিয়ে পড়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র। পাশাপাশি দেখা যায়, পূর্ববঙ্গীয় জমিদারদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ থাকায় তাদের আর্থিক অবস্থায় মন্দাভাব ছিল না। জমি চলে যাওয়ার পর তাঁরা অন্য বৃত্তি বা পেশায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। সুতরাং পূর্ববঙ্গীয় জমিদারদেব অবস্থা তখনকার জোতদারদের তুলনায় ভালো বলা চলে। তাই বহু জমিহারা জোতদার শেষ পর্যন্ত ভূমিহীন কৃষক, প্রান্তিক কৃষক, কৃষিশ্রমিক এমন কি মজুরদারে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় রূপকান্ত রায়, গোঁরাচাঁদ রায়, পূণ্যেশ্বর রায়, রামদয়াল রায়, রামেশ্বর সিংহ প্রমুখ।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এই সকল জোতদারদের বর্তমান অবস্থা ভাল নয়। যদিও এ বিষয়ে আরো অনুসন্ধান চালানো দরকার। তাদের অবস্থা খারাপ হওয়ার পিছনে যে কারণ গুলি দেখা যায় সেগুলি হল তাঁরা কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যকোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে নি। আবার কেউ বা মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে জমি বিক্রি করে, কেউ আগের সামাজিক মর্যাদা (Status) কে ধবে রাখার চেষ্টা করে। এছাড়া দেখা যায় যে, বেশির ভাগ জোতদারদের দশ থেকে পনের জন ছেলে মেয়েছিল। সুতরাং পরবর্তীকালে

তাদের জমিজমা ছেলে মেয়েদের মধ্যে বন্টন হওয়ায় ক্রমাগত তাদের জমি জায়গার পরিমাণ কমে যায়। এবং জোতদারদের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। শোনাযায় সেই সময় জোতদারদের অনেকেই মাটির নিচে টাকা পুঁতে রাখত। এ থেকেও বোঝা যায় যে, তারা টাকা বিনিয়োগ করতে উৎসাহী ছিলেন না।

ডুয়ার্স এলাকার বেশিরভাগ জমিই হল সেচহীন (Non-irrigated)। এই সেচহীন এলাকায় কৃষিকাজ করা খুবই কষ্টকর। সেচপূর্ণ ও সেচহীন এলাকার মধ্যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। আমরা যদি উদাহরণ হিসাবে ধরি যে, বর্ধমানের ২৫ একর জমি এবং ডুয়ার্স এলাকার ২৫ একর জমি কখনই সমান হওয়ার কথা নয়। বর্ধমানে সেচের ব্যবস্থা থাকায় সেখানে একরে উৎপাদন হয় ৯০ মণ, কিন্তু ডুয়ার্স এলাকায় দেখা যায় একরে উৎপাদন হয় ৯ মণ। বর্ধমানের জমির উর্বরতা (Fertility) শক্তি তখনকার জমির তুলনায় অনেক বেশি। তাই উভয় ক্ষেত্রে ২৫ একর করে জমির বন্টন ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে একটি আলোচনার দাবি রাখে। ধূপগুড়ি ব্লকের খাট্রিমারী গ্রামের জোতদার গোরাচাঁদ রায়। সমীক্ষায় দেখা যায় তাঁর প্রচুর জমি নষ্ট হয়েছে। কারণ জমি দিয়ে নালার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু জলের ব্যবস্থা নাই। সরকারীভাবে বিরুবাক প্রজেক্ট এর কাজ হাতে নেওয়া হলেও বর্তমানেও তা অসম্পূর্ণ রয়েছে। ফলে সেই সমস্ত জমিতে আবাদ নাই বললেই চলে।

ষাটের দশকে দেখা যায়, এই ভূমিহীন জোতদাররা ডুয়ার্স এলাকায় তাদের হারানো জমি উদ্ধারের চেষ্টা করে। তাঁরা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয় এবং 'উত্তরখণ্ড' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে। ডুয়ার্স এলাকায় এই দল জোতদারদের পার্টি হিসাবেই পরিচিতি লাভ করে। যদিও অল্পদিনের মধ্যেই এই দল ব্যর্থ হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের বর্গাদার ও ভাগচাষীদের সকলের নাম নথিবদ্ধ করানোর উদ্দেশ্যে বিশেষ কর্মসূচী "অপারেশন বর্গা" (operation Barga) শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলা সাধারণভাবে ব্যাপক ভাগচাষের এলাকা হিসাবেই সুপরিচিত। ১৯৬১ সালের আদমসুমারীতে এই জেলাগুলিতে মোটকৃষি পরিবারের অনুপাতে প্রজাচাষী পরিবারের শতকরা হার ৪২% থেকে ৬১% এর মধ্যে ছিল।

গ্রামাঞ্চলে বর্গাদার, আধিয়ার, ভাগচাষী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বর্গাচাষীরা অভিহিত হয়। একজন বর্গাদার বলতে তাকেই বোঝায় যে অন্য কারও জমি চাষ করে ফসলের একটা ভাগ বা অংশ জমির মালিককে দেয়। সাধারণভাবে বর্গাদার আর মালিকের মধ্যে ফসল আধাআধি ভাগ হয় এবং এই কারণেই তারা বিভিন্ন এলাকায় আধিয়ার নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন এলাকায় কিষানী প্রথা এক ধরণের ভাগচাষ চালু আছে যাতে জমির মালিক চাষের বীজ, সার, হালবলদ সবকিছু দেয় এবং কিষান ফসলের

এক তৃতীয়াংশ পায়।

১৯৬৭ সনে প্রথম যুক্তফ্রন্ট ও ১৯৬৯-এ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে জমি দখলের কাজে ফ্রন্টের সকল শরিক দলই ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। স্বাধীনতার পর ১৯৬৭ সনে আরম্ভ হওয়া কৃষকদের খাস জমি, উদ্বৃত্ত জমি দখল প্রভৃতি কৃষক আন্দোলনের প্রধান কাজ ছিল।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, আন্দোলনে ঐতিহ্য, সচেতনতা প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও ১৯৭৮ সালে রাজ্য সরকার অপারেশন বর্গা অভিযান হাতে নেবার আগে বর্গাদাররা তাদের নাম রেকর্ড করাতে তেমন এগিয়ে আসেনি। মালিকদের বিরোধিতা প্রশাসনিক ঔদাসীন্য ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব প্রভৃতি এর কারণ বলা যায়। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচী ঘোষণার পরে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। কারণ সরকারী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মালিকরা ব্যাপকহারে বর্গাদার উচ্ছেদ করতে বা ক্ষেতমজুর হিসাবে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগে। এই ঘটনাই কার্যত বর্গাদারদের বাধ্য করে বামপন্থী নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়ে নাম রেকর্ড কার জন্য এগিয়ে আসতে। নাম রেকর্ড করার আগে বর্গাস্বত্ব সম্পর্কে যে নিরাপত্তার অভাব, টাকার জন্য মহাজনের উপর নির্ভরশীলতা প্রভৃতি ছিল তা থেকে তাদের বহুলাংশে মুক্তির পথ খুলে দেয় অপারেশন বর্গা। সরকার বর্গাস্বত্বে বংশানুক্রমিক অধিকার, বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা বে-আইনী, বিনা রসিদে ফসলের ভাগ দেওয়া হবে না। বর্গাদার নথিবদ্ধ হলে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাবার অধিকারী হবে ইত্যাদি আইনগত অধিকার সম্পর্কে বর্গাদারদের সচেতন করতে সক্ষম হয়। বোদা, পচাগড়, পাটগ্রাম, দেবীগজ, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি সদর প্রভৃতি থানার কৃষক ও কৃষিজীবীরা ছিল এ দেশে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ। এই কৃষিজীবী ও কৃষকরা নিজেদের রাজার বংশ বা রাজার বংশ বা রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দেন। এই নামকরণের সরণী বেয়েই রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা ও উপেন্দ্রনাথ বর্মন রাজবংশীরা যে 'ক্ষত্রিয়' এই সিদ্ধান্তে আসেন। এই ক্ষত্রীয় সমাজ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা মহাশয়। তিনি শোষণ অত্যাচারের প্রতিবাদে কৃষকদের সংগঠিত করার প্রয়াস চালান।

সরকারের অপারেশন বর্গা পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত, তা বলা খুবই শক্ত। কিন্তু কৃষকদের একটি বড় অংশ যে এতে উপকৃত হয়েছেন তা মানতে হবে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, বেশিরভাগ বর্গাদারই কিন্তু তাদের সেই 'বর্গা ল্যান্ড' ধরে রাখতে পারেন নি। তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় জমি রক্ষণাবেক্ষণ করতে ব্যর্থ এবং বাধ্য হয়ে তারা জমি বিক্রি করে। তাই সরকারের ওই অপারেশন বর্গা নতুন করে আলোচনার দাবি রাখে।

দেখা যায় গ্রামের গরিব বর্গাদাররা কিন্তু এই অপারেশন বর্গা কে স্থানীয় প্রতাপশালী

ধনী মালিক এবং মহাজনদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করেছে। জলপাইগুড়ি জেলার মাল থানার অধীনে কলাগাইতি মৌজা। কলা গাইত্তির বেশির ভাগ বর্গাদার মুকুট প্রসাদের জমিতেই নিজেদের বর্গাস্বত্ব নথিবদ্ধ করায়। এই ধনী ও প্রতাপশালী মুকুট প্রসাদের জমি রয়েছে প্রায় ৫০ একর। অপারেশন বর্গায় নথিবদ্ধ এই বর্গাদারেরা ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্টের আমলে ন্যস্ত জমি বলে এই জমি জবর দখল করেছিল। কিন্তু মুকুট প্রসাদ মহাশয় 'ভূয়া' বর্গাদার নথিভুক্তির অভিযোগ করে আদালতের দ্বারস্থ হন। জমির মালিকরা মনে করে অপারেশন বর্গা ধনী ও মাঝারি চাষীর প্রতিপত্তি কমাতে সাহায্য করে। মাল ব্লকের হায়হায় পাথারের জমির মালিক ভূমিনুদ্দিন আমেদ, নাসিরুদ্দিন প্রমুখ। ফসলের ভাগ ক্রমাগত কমে যাওয়ায় তাঁরা ভীষণ উদ্বিগ্ন। এই দুটি এলাকায় ঋণ দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে ছিল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া।

নব্বই-এর দশকে মালদাবাদে উত্তরবঙ্গে চারটি জেলায় চা বাগিচার কাজ নতুন করে শুরু হয়। অনেক আবাদ জমি চা-এর জমিতে রূপান্তরিত হয়। বহুলোক তাদের জমি চাকরি পাওয়ার আশায় হস্তান্তর করে। কিন্তু তাদের না হল চাকরি, না পেল নতুন কাজের সুযোগ। জমি চলে যায় অ-কৃষিজীবীদের হাতে এবং বহু লোক বেকার হয়ে পড়ে। দেখা যায় বিগত পাঁচ বছরে প্রায় ২০ হাজার কর্মক্ষম মানুষ তাদের জীবন ও জীবীকার সন্ধানে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি জায়গায় চলে যেতে বাধ্য হয়। বেশ কিছু মানুষ সরকারী নিয়ম নীতিকে অমান্য করে আবাদী জমিকে চা-এর জমিতে রূপান্তরিত করছে। ফলে এই সকল অঞ্চলে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ পুঞ্জীভূত হতে শুরু করে।

তাদের মধ্যে সেই হারানো জমি ফিরে পাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ এক বক্তৃতায় তাদের এই প্রবণতাকে "ভূমি ক্ষুধা আন্দোলন" বলে উল্লেখ করেন।

সুতরাং, এই ডুয়ার্স এলাকার যে মাটিতে তে-ভাগা আন্দোলন দানা বেঁধেছিল, সেই আন্দোলনকারীদের উত্তরসূরীগণের একটি অংশ ডুয়ার্স এর মাটিতে নতুন করে আর একটি আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করছে। তবে এই আন্দোলনের কারণ যাইহোক না কেন সমাজ বিজ্ঞানের নিরিখে এর কারণ অনুসন্ধান করা খুবই জরুরি ।।

পরিশিষ্ট ঃ

	জোতদারদের নাম ও ঠিকানা	আনুমানিক জমির পরিমাণ ১৯৫৩ সালের আগে	১৯৭৮ সালে জমির পরিমাণ
১।	রূপকান্ত রায় খট্টিমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি	১৫০০ একর	৬০ একর

২।	গোরাচাঁদ রায় খট্টিমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি	১২০০ একর	৫০ একর
৩।	পূণ্যেশ্বর রায় ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি	১০০০ একর	৩৫ একর
৪।	গোবিন্দ রায় ডাউকিমারী, জলপাইগুড়ি	৫০০ একর	২৫ একর

সূত্রনির্দেশ ঃ—

১। কিরাত ভূমি - জলপাইগুড়ি জেলার ১২৫-বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে জেলা সংকলন ১৮৬৯-১৯৯৪।

২। ভূমি রাজস্ব ও জরিপ · টোডরমল — প্রথম প্রকাশ, ২৫শে বৈশাখ,. ১৩৮২।

৩। পশ্চিম বাংলার ভূমি ব্যবস্থা - ও ভূমি রাজস্ব — তারক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আগষ্ট, ১৯৮৩।

৪। পশ্চিমবঙ্গে 'অপারেশন বর্গা' একটি সমীক্ষা - বৌধায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মৈত্রেয় ঘটক প্রমুখ।

৫। অপারেশন বর্গা ও ভূমি রাজস্ব — অনিমেষ দস্তিদার।

৬। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ব্যবস্থার দুশো বছর — একটি আলোচনা সভা — বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ - ১৯৯৪।

৭। Regional political movement in the post colonial India - A case study of the uttarakhanda kamatapur movement in the northern region of West Bengal Lecture delivered in the refreshes course, Department of History, North Bengal University - 30th January, 2002 - Dr. Ananda Gopal Ghosh.

৮। পশ্চিমবঙ্গ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা ১৪০৮ তথ্য ও সংস্কৃত বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৯। উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকায় অধ্যাপক নির্মল কুমার রায়ের লেখা - "ধানের গায়ে রক্তের দাগ - তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা"- (উ:ব: সংবাদ ২৫শে আগষ্ট, ২০০১)।

১০। আমার কথা ও ডুয়ার্সের কথা - বিমল দাশগুপ্ত - প্রথম সংস্করণ - ১ লা বৈশাখ ১৪০১।

১১। বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা - বিমল চন্দ্র সিংহ।

১২। জলপাইগুড়ি জেলার গণআন্দোলনের রূপরেখা সুবোধ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম - প্রকাশ - ১৫ই ডিসেম্বর '৯৮।

১৩। সৌরেণ বসুর রচনা সম্ভার - অশ্রুকুমার সিকদার ও পাঁচু রায় প্রথম প্রকাশ - মার্চ-২০০১।

১৪। মধুপর্ণী-জলপাইগুড়ি জেলাসংখ্যা - ১৩৯৪ সংখ্যা - সম্পাদক ড: আনন্দ গোপাল ঘোষ।

১৫। সাক্ষাৎকার ব্যক্তিগণের পরিচয় :-

ক) গুণধর বর্মন - ডাউকিমারী, জলপাইগুড়ি, বয়স ৬৫।

খ) করুণাকান্ত রায় - ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি, বয়স ৪৬।

গ) রবি রায় - খট্টিমারী, জলপাইগুড়ি, বয়স ৪৫।

ঘ) দীনেশ চন্দ্ররায় - খট্টিমারী, জলপাইগুড়ি, বয়স ৪০।

ঙ) অরুণ বিকাশ রায় - খট্টিমারী, জলপাইগুড়ি, বয়স ৪০।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এই প্রবন্ধের কাঠামো নির্মাণে ও তথ্য বিশ্লেষণে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: আনন্দ গোপাল ঘোষ।

উনিশ শতকের কলকাতার সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও মফঃস্বল উত্তরবঙ্গ

পাপিয়া দত্ত

অধ্যাপক সুশোভন সরকার মজঃফরপুরে (১৯৭৪) ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে মূল সভাপতির অভিভাষণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন যে মফঃস্বল উত্তববঙ্গে উনিশ শতকের কলকাতার সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব নিয়ে চর্চা এবং গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর বক্তব্যকে স্মরণে রেখেই উল্লিখিত বিষয়ে প্রাথমিক পর্যাযের একটি পরিকাঠামো রচনা করার চেষ্টা করেছি।

১৮২৯ থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যে কলকাতার সমাজজীবনে যে প্রশ্নগুলি নিয়ে বিতর্ক ও ঝড়ের সূত্রপাত ঘটেছিল - সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, মানত প্রথা, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, সমুদ্রযাত্রা, সহবাস সম্মতি তার মধ্যে অন্যতম, উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষিত সমাজ এই জটিল সামাজিক প্রথাগুলির বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন। আবার এই শিক্ষিত সমাজেরই একাংশ এই সামাজিক প্রথাগুলির স্বপক্ষে প্রচারেও নেমেছিলেন। একই বাংলার উত্তরের অংশ উত্তরবঙ্গে এই সমাজ সংস্কার আন্দোলন কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা এখানে অতি সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরছি। এখানে উত্তরবঙ্গ বলতে অবিভক্ত বাংলার সমকালীন উত্তরবঙ্গকেই বুঝিয়েছি।

উনিশ শতকের সূচনালগ্নে উত্তরবঙ্গের সামাজিক ভূগোলের লক্ষণ হলো এখানে অ-বর্ণ, বি-বির্ণ, নিম্নবর্ণ হিন্দু ও নিম্নবর্গীয় লোকের সংখ্যা তথাকথিত বর্ণ-হিন্দুর চেয়ে বেশি। অ-হিন্দুর সংখ্যাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে রাখতে চাই যে, উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা সমূহ সমাধানের প্রশ্ন উঠেছিল শুধুমাত্র বর্ণ-হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং উত্তরবঙ্গে বর্ণ-হিন্দু সম্প্রদায়ের অ-প্রাধান্য হেতু স্বভাবতই এখানে এই জাতীয় আন্দোলন তেমনভাবে দানা বাধে নি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ঐ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব অনেক দেরিতে হলেও পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি একথাও স্মর্তব্য যে, এই ধরণের নবজাগরণের পথিকৃতগণের অনেকেই হিন্দু কলেজ, কুচবিহার, রংপুর ইত্যাদি অঞ্চলে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলা চলে যে বাংলার নব জাগরণের প্রাণপুরুষ তাঁর প্রথম জীবনে রংপুরেই অবস্থান করেন, কারও কারও মতে তাঁর পরবর্তী সংস্কার কর্মসূচির ভিত রচিত হয়েছিল এই রংপুরেই।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিক জনগণনার সূচনা হয় নি তাই পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা সম্ভব হল না। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে আমরা কোন্ পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে উল্লেখ করলাম যে অ-বর্ণ এবং অ-হিন্দুর সংখ্যা উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ অখণ্ড উত্তরবঙ্গে বেশি ছিল, ১৯০১ সালের জন বিন্যাসের কাঠামোকে ১৮০১ সালে উপস্থাপন করে মোটামুটি সংখ্যা নিরূপণের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এপদ্ধতি সমাজ বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন গুলির মধ্যে যে আন্দোলনটি সবচেয়ে বেশি বিতর্কের ঝড় তুলেছিল তা হল সতীদাহ প্রথা। এই অমানবিক প্রথাটি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চল হুগলী ও বর্ধমানে। উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের অ-বর্ণ হিন্দুদের বার্শিশ সতীমন্দিরের মধ্যে প্রথা হিসেবে এই প্রথার প্রচলনের নজির পাওয়া যায় নি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি মাত্র সতীদাহের ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'সতী' শিরোনামের গ্রন্থে স্বপন বসু লিখেছেন যে মুর্শিদাবাদ, মালদহ ইত্যাদি অঞ্চলে এ প্রথার চল থাকলেও সারাবছরে দু-চারজনের বেশি সতী হতে এগিয়ে আসতো না।

তবে কোচবিহারে দুটি সতীদাহের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। একটি রাজ পরিবারে ঘটেছিল। আর একটি ঘটেছিল খাগড়াবাড়ির এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৪০ সালে। এছাড়া দিনাজপুরের পীরগঞ্জের অনিরুদ্ধ নাপিতের স্ত্রী ১৯২৪ সালে সতী হয়েছিলেন। বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার অন্তর্গত জোড়মল ব্রাহ্মণী নদী তীরবর্তী একটি ঘাট এখনও সতীদাহ ঘাট নামে পরিচিত। এর সঙ্গে সতীদাহের সম্পর্ক ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। মালদহেরও একজন সতী হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। ইনি হলেন সুপরিচিত গোলকনাথ শর্মার স্ত্রী। গোলকনাথ মালদহে মিশনারিদের বাংলা শেখানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। অর্থাৎ এখানে প্রথা হিসেবে এ প্রথা ছিল না, প্রতিবেশী অসমেও সতীদাহ ছিল না। বিশিষ্ট অসমীয়া বুদ্ধিজীবী ও চলচিত্রকার ড: ভবেন্দ্র নাথ সইকিয়া লিখেছেন মঙ্গোলয়েড নারীদের মধ্যে সতীদাহের প্রচলন ছিল না।

এবারে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের প্রসঙ্গে আসছি। এই সমস্যাটিও ছিল পুরোপুরিভাবে বর্ণ হিন্দুদের। অ-হিন্দুদের অর্থাৎ মসুলমানদের মধ্যে সমাজ কর্তৃক চারটি বিবাহ এমনিতেই স্বীকৃত ছিল। বর্ণ-হিন্দু এবং অ-বর্ণ হিন্দুদের মধ্যেও একাধিক বিবাহের প্রথারও প্রচলন ছিল। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপরই এটি নির্ভর করত। উত্তরবঙ্গের অ-বর্ণ হিন্দুদের সচ্ছল পরিবারের মধ্যে একাধিক বিবাহের প্রচলন ছিল। রঙপুরের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জোতদারেরা একাধিক বিবাহ করতেন। কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। অর্থাৎ জোতদার স্ত্রীকেও একজন কৃষিকর্মী হিসেবে গণ্য করতেন এবং তার শ্রমকে কাজে লাগানো হত। ফলে একাধিক বিবাহ তখন সামাজিক সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয় নি।

যাঁরা ভরণ পোষণ করতে সমর্থ ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ একাধিক বিবাহ করতেন। কিন্তু এই একাধিক বিবাহকে বহু বিবাহ বলা যায় না। কারণ উত্তরবঙ্গে অ-বর্ণ হিন্দুদের অর্থাৎ রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা ছিল না। অন্য নিম্নবর্গীয়দের মধ্যেও কৌলিন্য প্রথা ছিল না, তবু উত্তরবঙ্গের আলোকপ্রাপ্ত সমাজ বহু বিবাহ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। বহুবিবাহ আন্দোলনের মুখ্য স্থপতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গভর্নর জেনারেলকে যে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন তাতে ২১,৩০০ জন স্বাক্ষর করেছিলেন। এতে উত্তর বঙ্গের কেউ স্বাক্ষর করেছিলেন কিনা এবং করে থাকলেও তাঁদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তবে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের জন্য আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন দিনাজপুরের ও রাজশাহীর অধিবাসীগণ।

বিধবা বিবাহ নিয়ে যে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়েছিল উত্তরবঙ্গেও তার প্রভাব পরেছিল। রংপুরের অধিবাসীগণ বিধবা বিবাহ, বিষয়ক আইনের সমর্থনে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। দেশীয় শিক্ষিত সমাজ সম্ভবত বিষয়টিকে সমর্থন করতে পারেন নি অথবা তেমন গুরুত্ব দেননি। উত্তরবঙ্গেও তাই ঘটেছিল। কারণ বিধবা বিবাহ, আইন ১৮৫৬ সালে গৃহীত হলেও ১৮৮৪ সালের মধ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে একটিও বিধবা বিবাহ হয়নি। এই পরিসংখ্যান থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে বিধবা বিবাহ আইন বর্ণ অথবা বি-বর্ণ কারোরই সমর্থন পায় নি। তবে বিশ শতকের প্রথমার্ধে বর্ণ-হিন্দুদের মধ্যে দুটি বিধবা বিবাহের খবর পাওয়া গিয়েছে। একটি বালুরঘাটে, অপরটি জলপাইগুড়িতে। বালুরঘাটের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী কংগ্রেস নেতা শ্রী সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিধবা বিবাহ করেছিলেন। এছাড়া জলপাইগুড়িতে চা শিল্পপতি যোগেশচন্দ্র ঘোষ উদ্যোগী হয়ে একজন বিধবাকে বিবাহ দিয়েছিলেন। জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা কবিরাজ সতীশ চন্দ্র লাহিড়ীও বিধবা বিবাহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এসবই অবশ্য বিশ শতকের প্রথমার্ধের ঘটনা।

সহবাস সম্মতি বিল (Age of Consent Bill) সমগ্র দেশে বিশেষত মহারাষ্ট্রে ও বঙ্গ দেশে বিপুল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। সমাজবিজ্ঞানীরা সহবাস সম্মতি বিল সংক্রান্ত আন্দোলনকে প্রথম সর্বভারতীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ সতীদাহ প্রথা ছিল, মূলত বঙ্গদেশের সমস্যা, বিধবা বিবাহ ছিল উচ্চবর্ণের সমস্যা। এছাড়া অনেক জনগোষ্ঠীর মধ্যেই বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল। কিন্তু সহবাস সম্মতি বিলটি ছিল সর্বভারতীয় সমস্যা ও সমস্ত হিন্দু জনগোষ্ঠীর সমস্যা। সহবাস সম্মতি বিলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল মেয়েদের বিবাহের বয়স দশ থেকে বাড়িয়ে বারো করা। মহারাষ্ট্র এবং বাংলার আলোকপ্রাপ্ত সমাজ এই প্রশ্নে বিভাজিত হয়েগিয়েছিলেন। এই আলোড়িত সমস্যাটি উত্তরবঙ্গেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অবশ্যই ক্ষীণাকারে এবং সেটা। এই আইনের বিরুদ্ধে। কোচবিহারের অধিবাসীরা এই আইনের বিরুদ্ধে ইংরেজ

সরকারের কাছে একটি আবেদন পত্র জমা দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আর কোন তথ্য এখনও পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পরিনি।

উত্তরবঙ্গে বাল্য বিবাহের প্রকোপটা অবশ্য বেশিই ছিল। অ-বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল। কিন্তু এর বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন তেমনভাবে কোথাও গড়ে ওঠেনি।

শিশু সন্তানকে মানত করার বা গঙ্গাসাগরে শিশুকে নিক্ষেপ করার কোন ঘটনার কথা এখনও জানা যায়নি।

সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে দেশের অন্য অংশের মতন এই ভূখন্ডেও নানাবিধ কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। এই ভূ-খন্ডের কোন জেলাব কোন ব্যক্তি প্রথমে কালাপানি পার হয়েছিলেন তা অনুসন্ধান করেও জানতে পারি নি।

উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা সমূহের মধ্যে সমুদ্রযাত্রা এবং মানত প্রথা বাদ দিলে বাদবাকী সবকটি সমস্যাই ছিল সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ নারী কেন্দ্রীক মূলত বর্ণ-হিন্দু সমাজের উল্লিখিত সমস্যাবলীর কেন্দ্রমূল সমাজের এই অর্ধজাগরিত অংশ সমকালীন সংস্কার আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়ে ছিল কি না তা জানতে গেলে দেখা যায় যে আমাদের আলোচ্য সময়সূচীতে সক্রিয়ভাবে কোন মহিলার যোগদান অনুপস্থিত। তবে বিশ-এর দশকের সূচনা পর্বে উত্তরবঙ্গের নারী সমাজের একটি অংশে রাজনৈতিক স্বাদেশীকতাবোধ বিকাশ লাভ করেছিল। প্রসঙ্গত বলা যায় জলপাইগুড়িতে সুভাষিণী ঘোষ, বিখ্যাত চা শিল্পপতি বীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের মাতা, পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক স্বদেশী আন্দোলনে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এই জেলারই জনৈকা মাড়োয়ারী মহিলা পণপ্রথার বিরুদ্ধেও সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। উত্তরবঙ্গের প্রথম মহিলা উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় গিয়েছিলেন ১৯২৭ সালে তবে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। তবে এ সবই ছিল বিশ-এর দশকের ঘটনা।

উত্তরবঙ্গে কলকাতাকেন্দ্রীক সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ঢেউয়ের প্রবেশের ক্ষেত্রে রেললাইন জনিত যোগাযোগের প্রভাব অনস্বীকার্য। মধ্যবিত্ত জনসমাজের অনেকেই উচ্চশিক্ষার জন্য সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজে পাড়ি দিতেন। তবে ১৮৭৮ সালে রাজশাহী কলেজ এবং ১৮৮৮ সালে কুচবিহারে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় যাবার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য অংশে আমরা কেবলমাত্র উত্তরবঙ্গের বর্ণ ও অ-বর্ণ হিন্দু সমাজের কথাই আলোচনা করলাম। অ-হিন্দুদের কথা এখানে আলোচিত হয় নি এবং অ-হিন্দু বলতে মুসলমান, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধদের বোঝাচ্ছি। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও চর্চা করার ইচ্ছে রইল।

সূত্র-নির্দেশ

১। Cooch-Behar select records, 1882-83.

২। Administrative records of Coochbehar State. 1872 onwards.

৩। District Gazzetteers:

A। Coochbehar — Durgadas Mazumdar.

B। Darjeeling — Barun De etc.198.

C। Jalpaiguir — Barun De etc.

৪। সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক (১৮৫৪-৭৬) - গোলাম মুরশিদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৪০৫।

৫। জীবন প্রবাহ কমলেন্দু চক্রবর্তী, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

৬। দিনাজপুর জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস - বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রায়গঞ্জ ১৩৯২।

৭। জলপাইগুড়ি জেলার রাজনৈতিক জীবন (১৮৬৯-১৯৬৯) আনন্দ গোপাল ঘোষ, ত্রিস্রোতা, সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯৯৪, প্রাসঙ্গিক সংখ্যা সমূহ।

৮। জলপাইগুড়ি : সম্পাদক শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৯। ঊনিশ শতকের কলকাতার সমাজ-সংস্কার আন্দোলন উত্তরবঙ্গ, মানসী - সম্পাদক - সন্তোষ কুমার চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি, ১৯৯২।

১০। এই প্রবন্ধের কাঠামো নির্মাণে, তথ্য সংগ্রহে ও বিশ্লেষণে বিশেষভাবে সাহায্য করেন আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ড: আনন্দ গোপাল ঘোষ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

সারাংশ

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্যে খণ্ডরুইগড় রাজবংশ

জয়ন্ত দাশগুপ্ত

অধুনা মেদিনীপুর (পশ্চিম) জেলার খড়গপুর মহকুমার দাঁতন থানার অন্তর্গত খণ্ডরুইগড় রাজবংশ এক প্রাচীন রাজবংশ। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চৌধুরী কৃষ্ণদাস গজেন্দ্র মহাপাত্র।

রাজা কৃষ্ণদাসের সুযোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন রাজা কালীপ্রসন্ন। তাঁর সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। রাজা কালীপ্রসন্নের বংশধর প্রবীর রাজা মেদিনীপুর শহরের কেরানিটোলায় একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। উক্ত বাটীতে বিপ্লবী হেমচন্দ্রদাস কানুনগো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসেবে থাকতেন এবং ক্ষুদিরাম সহ অন্যান্য বিপ্লবীদের বোমা তৈরি শেখাতেন। দ্বীপান্তরের পবে ফিরে এসে তিনি ঐ স্থানেই থাকতেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির কক্ষ উদ্বোধনের জন্য মেদিনীপুর শহরে যান তখন প্রবীর রাজা মেদিনীপুরের তৎকালীন বাঙালী জেলাশাসক বিনয় রঞ্জন সেনের অনুরোধে নিজ বিলাতি গাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে বসিয়ে গাড়ি চালিয়ে অনুষ্ঠান স্থলে নিয়ে যান।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল প্রবীর রাজার বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকতেন প্রথম জীবনে, তিনি হলেন হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা প্রবীর রাজর বাড়িতে আসেন।

সঙ্গীত জগতের রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, কেরামাতুল্লা খান, সুদীন বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা দে, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ মহান্তি, সুবোধচন্দ্র মিত্র মহাশয়গণ তাঁর বাড়িতে আসেন।

রাজনীতি জগতের অজয় মুখোপাধ্যায়, চিত্ত রায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, চারুচন্দ্র মহান্তি প্রমুখ ব্যক্তিরাও তার গৃহে আসেন।

নদীয়া জেলার অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী : কুম্ভকার সম্প্রদায় একটি অনুসন্ধান

তুষার বরণ হালদার

নদীয়া জেলায় অসংগঠিত ক্ষেত্র ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন পেশার শ্রমিক শ্রেণী, যাদের মধ্যে কুম্ভকার সম্প্রদায় অন্যতম। এরা দীর্ঘদিন ধরে জেলার শৈল্পিক উৎকর্ষতার পাশাপাশি

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ধরে রেখেছে।

কুমোরদের উৎপত্তি সম্পর্কে যে লৌকিক গল্প চালু আছে তা বেশ চিত্তাকর্ষক। একদা শিব পার্বতীর বিয়ে উপলক্ষে প্রয়োজন হয়েছিল দুটি কুম্ভ। তখন শিব রুদ্রাক্ষের মালা থেকে দুটি রুদ্রাক্ষ ছিঁড়ে বানালেন এক পুরুষ ও নারী। এদের থেকেই উৎপত্তি কুম্ভকার সম্প্রদায়ের।

এদেব বৃত্তিগত কাঠামোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্র কর্মে স্বনিযুক্ত। এরা মূলত বংশপরম্পরায় এই পেশা গ্রহণ করলেও বর্তমানে প্রবল আর্থ-সামাজিক চাপের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্নতর পেশা গ্রহণের প্রবণতা বাড়ছে। এই পেশার কাজ সারা বছর প্রায় থাকলেও উপার্জন সেই অনুপাতে হয় না। এদের প্রধান কাঁচামাল মাটি - এই মাটি তাদের যোগাড় করতে হয় স্থানীয় ভূম্যধিকারী ব্যক্তির কাছ থেকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। এমনকি জ্বালানীর জন্য কাঠ, শুকনো ডাল-পাতা ও কিনতে হয় অধিক দাম দিয়ে।

এই ধরণের শ্রমিকদের পূর্বোক্ত "Working Condition"-এর পাশাপাশি, তাদের "Living condition" ও খুব সুবিধার নয়। ক্ষেত্র সমীক্ষার (Field Enquiry) ফলে দেখা গেছে এদের বেশির ভাগেরই বাসগৃহ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচাগারের ব্যবস্থা, নিকাশি ব্যবস্থা স্বাস্থ্য সম্মত নয়। সব থেকে কষ্টকর হয় বর্ষার দিনগুলিতে।

কুম্ভকার সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক দিকটিও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। গ্রামীণ পালা-পার্বণ, অন্য অর্থে লোক সংস্কৃতির লুপ্ত প্রায় কিছু সামগ্রী তারা এখনো লালন করে রেখেছে আধুনিক পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রবল দাপট সত্ত্বেও। মূলত চৈত্র-বৈশাখ মাসে শিব-পার্বতী নিয়ে, এছাড়া হরিচাঁদ ঠাকুরকে নিয়ে নানা অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় অসংগঠিত ক্ষেত্রের এই সব মানুষরা এখনো অব্দি সংগঠিত হতে পারেনি, তৈরি করতে পারেনি নিজস্ব কোন মজবুত সংগঠন — যেখান থেকে তাদের দাবি উত্থাপন বা লড়াই আন্দোলন পরিচালনা সম্ভব। এক্ষেত্রে তাদের শ্রেণীসচেতনতার অভাবও অনেকটা দায়ী। এরকম একটি প্রাচীন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় নিয়ে অনুসন্ধানের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

মুর্শিদাবাদের বড়নগর চারবাংলা মন্দিরে মৃৎফলকে সমন্বয়ের সুর রণরণিত

সুফল চন্দ্র প্রামাণিক

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় জিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত মুকুন্দপুর অঞ্চলে বড়নগর গ্রামে চারবাংলা মন্দির গুলি আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৭-১৪-৯৩ খ্রিঃ) রানী

ভবানী নির্মাণ করেন। মন্দিরটি বর্তমানে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব কর্তৃক সংরক্ষিত। একটি চতুষ্কোণ অঙ্গনের চারদিকে চারটি এক বাংলা মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ত্রিখিলান যুক্ত বারান্দা সমেত মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ত্রিখিলান যুক্ত বারান্দা সমেত প্রতিটি মন্দির দৈর্ঘ্য প্রস্থ্য, উচ্চতায় ৯ $\frac{১}{২}$ x ৪ $\frac{১}{২}$ x ৫ মিটার। ১ $\frac{১}{২}$ মিটার উঁচু ভিত্তির উপর মন্দির গুলি স্থাপিত। উত্তর ও পশ্চিম দিকের মন্দির দ্বয়ের পোড়া মাটির টেরাকোটা দর্শনীয়। মন্দির গুলি দেখতে সুউচ্চ চালাঘরের ন্যায়। মন্দির গুলিতে তিনটি করে খিলান দরজা আছে ও প্রত্যেক মন্দিরে তিনটি করে শিবলিঙ্গ অবস্থিত। পশ্চিম ও উত্তর দিকের মন্দিরদ্বয়ে অদ্ভুত ধরণের মৃৎফলক আছে। উত্তরদিকের এক বাংলা মন্দিরের টেরাকোটার মধ্যে একদিকে যেমন মহাকাব্যের দৃশ্যাবলী দেখা যায় অপর দিকে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীও আছে। উত্তরদিকের মন্দিরের মৃৎফলকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের যেমন সাক্ষাৎ মেলে তেমনি বিভিন্ন দেবদেবীর সাক্ষাৎ পাই। এ যেন একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে এক অপূর্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে এক কথায় মহামিলনের সমন্বয়ের সুর ধ্বনিত হয়েছে। আর মৃতফলক গুলিতে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী শিল্পীদের শিল্প প্রভাব পড়েছে । ফলে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের যে নবজাগরণ ঘটেছে তা ঐ চারবাংলার মন্দিরের মৃৎফলক গুলি প্রমাণ দেয়।

মুর্শিদাবাদের বড়নগর চারবাংলা মন্দিরের মৃৎফলকে সমন্বয়ের সুর রণরণিত

সুফল চন্দ্র প্রামাণিক

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বিখ্যাত মন্দিরগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাণী ভবানী (১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে) চার বাংলা মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরগুলি বর্তমানে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব কর্তৃক সংরক্ষিত। একটি চতুস্কোণ অঙ্গনের চারদিকে চারটি একবাংলা মন্দির প্রতিষ্ঠিত ত্রিখিলানযুক্ত বারান্দা সমেত প্রতিটি মন্দির দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতায় ৯ $\frac{১}{২}$ x ৪ $\frac{১}{২}$ x ৫ মিটার। প্রায় ১ $\frac{১}{২}$ মিটার উঁচু ভিত্তির উপর দেবালয় গুলি স্থাপিত। প্রতিটি মন্দিরে তিনটে শিবলিঙ্গ আজো ভক্তবৎসলের দ্বারা পূজিত। সবকয়টি মন্দিরই উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির টেরাকোটায় স্বল্প বিস্তর সুসজ্জিত হলেও উত্তর ও পশ্চিম দিকের মন্দিরদ্বয় সর্বাধিক মৃৎফলকে অলংকৃত।

মন্দিরগুলি দেখতে একটি সুউচ্চ চালা ঘরের ন্যায় যা বাংলার নিজস্ব রীতি অনুযায়ী গঠিত। যার উপর প্রাচীন অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে।

উত্তর দিকের মন্দিরে তিনটি খিলান দরজার উপরিভাগে দেওয়ালের উপর মহাকাব্যিয় মৃৎফলক বর্তমান। মধ্যের দরজার উপর দেওয়ালে রামচন্দ্র লক্ষণ ও হনুমান সহ লঙ্কেশ্বরকে আক্রমণ করলেও রাবণ করজোড়ে দাশরথির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা রত। এর বাম ও দক্ষিণ

পার্শ্বের দেওয়ালে চন্ডী দেবী অশুর নিধনে ব্যস্ত। নিচের দেওয়ালে লতাপাতা জ্যামিতিক নকসা কুলকড়ির অভাব নেই আর এর ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে বিভিন্ন মাপের মৃৎফলকে বিভিন্ন ধরণের ঐতিহ্যবাহী দৃশ্যাবলী। কোথায়ও বা ধর্মীয় দৃশ্যাবলী কোথায় বা গহণ অরণ্যে শিকারীরা গন্ডার শিকারে ব্যস্ত আবার কোথায় বা দেশপ্রিয় দেশবাসী তাদের জাতীয় পতাকাকে সম্মুখে উত্তোলন করে দেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে আবার কোন কোন স্থলে মুঘল বাদশাহরা বিলাশ ব্যসনে ব্যস্ত। চারবাংলার মৃৎফলকের দৃশ্যাবলীর উপর বিভিন্ন দেশ বিদেশের প্রভাব পড়েছে তা ফলক বিচারে বিচারকদের সহমত পোষণ করতে হয়।

কোচবিহার রাজ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক সংস্কার এবং রাজপরিবারের সাথে বিরোধ (১৭৮৩-১৮৪০ খ্রিঃ) বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি পুনর্মূল্যায়ন।

পার্থ সেন

১৭৭২খ্রি:স্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে চুক্তি সাক্ষর করার পর কোচবিহার করদ রাজ্যে পরিণত হয়। চুক্তি সাক্ষরেব কোচবিহার রাজ্যে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে রাজ পরিবারেব মধ্যে বিরোধ শুরু হওয়ায় কোচবিহার শাসন পরিচালনার দাযিত্ব ইংরেজ কমিশনার ডগলাসের হাতে যায় এই সময় কোম্পানী দেশীয় রাজ্যটির বিচার প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় পুনর্বিন্যাস করে। এই প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে দক্ষিণ বাংলা থেকে শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় কোচবিহারের প্রশাসনের উচ্চপদগুলি দখল করে। ভূমির উপর কোচবিহার রাজ্যের রাজপরিবারের ব্যক্তিবর্গর অধিকার হাতছাড়া হয়ে বহিরাগতদের দখলে চলে যায়। ফলে মহারাজা ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের দাবিতে এবং পুরানো প্রাদেশিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের দাবিতে কোম্পানীর সাথে বিবোধে লিপ্ত হয়। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই কোচবিহার অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার দখলকে কেন্দ্র করে রাজবংশী সমাজের উচ্চবর্গের সাথে বহিরাগতদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। আজকের প্রেক্ষাপটে এর পুনর্বিচার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বাসুদেবপুরের মন্দির ও আঞ্চলিক ইতিহাস

শ্যামল কুমার পাত্র

আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর পূর্বে মেদিনীপুর জেলা উড়িষ্যাব অন্তর্গত ছিল। সম্রাট আওবঙ্গজেবের পর মোঘল সম্রাটেরা তখন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। পুরীর রাজা তখন

সম্রাটের অধীনে সমস্ত উড়িষ্যার শাসক ছিলেন। তখন মানুষ পায়ে হেঁটে পুরী যাতায়াত করত। পুরীর রাজার দেওয়ান বিভীষণ মহাপাত্র যিনি উত্তর বালেশ্বর থেকে পূর্বদিকে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার শাসক ছিলেন। কিন্তু হিজলী সম্রাটের অধীনে মসনদ আলি নামে একজন ভদ্রলোক শাসন করতেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেকেন্দার আলি খুব ক্ষমতাবান ও পারদর্শী ছিলেন। মোঘল সম্রাটেরা মাঝে মাঝে এসে অন্যায়ভাবে কর আদায় করত। তাই এইসব অঞ্চলের লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। রসুলপুর নদীর দক্ষিণে বিভীষণ মহাপাত্র বাহিরা অঞ্চল থেকে সমস্ত অঞ্চল পর্যন্ত শাসন করতেন। যদিও বা তাঁহার অধীনে কিছু সৈন্য সামন্ত ছিল।

বিভীষণ মহাপাত্র পুরীর রাজার অধীনে চাকরি করলেও বাদশাহ্ সৈন্যদের অত্যাচার রোধ করার জন্য মসনদ আলির সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। উক্ত চুক্তিতে স্থির হয় যে, বাদশাহ্ সৈন্যরা এলে পরস্পর পরস্পরের সৈন্যদল দিয়ে একযোগে আক্রমণ করে বাদশাহ সৈন্যদের হটাবেন। কিন্তু পুরীর রাজা তাহা জানতে পারলেন ও বিভীষণ মহাপাত্রকে পুরীর মন্দিরে প্রবেশাধিকার থেকে বহিস্কৃত করলেন।

তাই মহাপাত্র মহাশয় খুব জগন্নাথ ভক্ত ছিলেন। মনের দুঃখে ঘরে ফিরে পুরীর অপেক্ষা বড় মন্দির করার জন্য মনস্থ হলেন। তিনি তাঁহার এলাকাধীন বাসুদেবপুরে তাহার ইপ্সিত মন্দির নির্মাণ করলেন যেটা ছিল পুরীর অপেক্ষা বৃহৎ। মন্দিরের সেবা কাজের জন্য বহু জায়গা দিলেন। নিত্য সেবার জন্য পুরোহিত ও বাদ্য করার ঠিক করলো। যার জন্য বাসুদেবপুরের মন্দিরে পুরীর মন্দিরের ন্যায় পূজা, স্নান যাত্রা, নেত্র উৎসব ও রথযাত্রা অনুষ্ঠান চলত।

কালক্রমে বিভীষণ মহাপাত্র বয়স্ক হয়ে যাওয়ায় তাহার সম্পত্তি চারজন কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ কবে দেন। সেই সকল জমিগুলি চাষের অনুপযুক্ত হওয়ায় কর্মচারীরা গ্রহণ করেন নাই। যদিও বা এখন সেইসব জমিজায়গা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তারপর এই সকল মন্দিরের কাজ পরিচালনা করার জন্য তিনি ৺নেত্র নারায়ণ রায় ও ৺ননীগোপাল রায়ের উপর দায়িত্ব দিয়ে তাদের বাসুদেবপুরে বসতি করে দেন। ১৮৮২ সালে ভয়ঙ্কর ঝড়ে রথ ভেঙে যায় ও পরে আবার নির্মাণ করা হয়।

মোঘল শাসনের সময় হতে এই রকম একটা আনন্দময় ও ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠান প্রাচীন যুগের কৃৎকৌশল বহন করে আসছে। মন্দির সংস্কারও এখন আর করা হয় না। সরকারের কাছে আবেদন করেও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এখানে প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরটি থাকলেও সেই আগেকার মতো নেই।

সংবাদ ও সাহিত্যে উত্তরবঙ্গ ও বর্তমান উত্তরবঙ্গের প্রাসঙ্গিকতা

নীলাংশু শেখর দাস

উনিশ ও বিশ শতকে আমরা বঙ্গদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রশাসনিক ও গবেষণা চর্চার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ নামে যে শব্দটি ব্যবহার করছি তার প্রথম ব্যবহার ঠিক কবে শুরু হয়েছিল তা এই মুহূর্তে সঠিকভাবে বলা কঠিন। স্বাভাবিকভাবেই এসম্পর্কে আলোচনা কিছু অসুবিধে আছে। বর্তমান উত্তরবঙ্গ বলতে যে ভূখণ্ডকে বোঝায় তা হল পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের ছয়টি জেলা। কিন্তু প্রাক্ দেশ বিভাগকালীন উত্তরবঙ্গের পরিসীমার সাথে এর ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। পাশাপাশি বর্তমান উত্তরবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও রয়েছে। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্র ও অন্যান্য কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি এ প্রসঙ্গে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। আবার সাহিত্যক বঙ্কিম চন্দ্রের রচনাতেও উত্তরবাঙলার উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় সাহেব শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য ও শ্রী রাধা মোহন সাহা তাঁর 'পাবনা জেলার ইতিহাস' গ্রন্থে আলোচনা করতে গিয়ে বর্তমান উত্তর বঙ্গের প্রসঙ্গ বারবার উল্লেখ করেছেন। এই ঐতিহাসিক সূত্রগুলির নিরিখে বর্তমান উত্তরবঙ্গ চর্চা এবং তার প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করাই হল বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

রাণী রাসমণি ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঃ এক ঐতিহাসিক আইনি লড়াই

অনিন্দিতা ঘোষাল

রাসমণি। একটি নাম। এক মহিমাময়ী চরিত্র। আজ থেকে দুশো বছর আগে এক আলোক সামান্যা নারী জন্মেছিলেন আমাদের দেশে। খুব সাধারণ পরিবারে জন্মেও নিজ কীর্তিবলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অসাধারণ। সেটা ছিল ১২০০ বঙ্গাব্দের ১১ই আশ্বিন (১৭৯৩ খ্রি:)। উত্তর চব্বিশ পরগণার হালিশহরের অন্তর্গত কোণা গ্রামে হরেকৃষ্ণ দাস ও রামপ্রিয়া দেবীর দরিদ্র সংসারের আঙিনায় জন্মগ্রহণ করেন রাসমণি।

উল্লেখ্য যে এই সময়টা ছিল বঙ্গ তথা ভারতের জীবনে এক ভয়ংকর সংশয়াচ্ছন্ন কাল। প্রকৃতপক্ষে সেই যুগ পরিবর্তন, সমাজ পরিবর্তন ও রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে জন্মেছিলেন রাসমণি। কলকাতাও তখন নিজেকে বদলাচ্ছিলো দ্রুত — যুগ ও সমাজের প্রেক্ষাপটে। ঠিক সেই সময় বাংলার এক কিশোরী পল্লীবালার রূপবদল হয়েছিল কলকাতার জানবাজারে গৃহবধূ হয়ে এসে। তিনি যথার্থ অর্থেই হয়েছিলেন 'রাণী' — লোকমাতা। তিনি ছিলেন করুণাময়ী — সংসার জীবনে ও প্রজাবাৎসল্যে। তিনি হয়েছিলেন মহিমাময়ী — তেজস্বিতায় ও বৈরাগ্যে, ভোগে ও ত্যাগে, দুটি রূপেই তিনি দেখেছিলেন জীবনকে, অনুভব করেছিলেন পরার্থে ও স্বার্থত্যাগেই আনন্দ।

রাণী রাসমণি নিজের প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস এবং দুর্জয় সাহসের ওপর নির্ভর করে যেভাবে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে বারবার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তা আমাদের অকথিত ইতিহাসের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। পরাধীন ভারতে বাস করেও বিভিন্ন সময়ে তিনি সাধারণ মানুষের জন্য শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদকরণ শুরু হয়েছিল শ্বশুর প্রীতিরাম সাড়-এর জীবদ্দশাতেই। জানবাজারের বিশাল অতিথিশালাকে কোম্পানির দপ্তর করার আদেশনামা নিয়ে কোম্পানির এক কর্মচারী প্রীতিরামের সাথে দেখা করতে এলে তিনি এই প্রস্তাবে সম্মতি না দেওয়ায় সাহেব তাঁকে অপমাণিত করলে রাসমণি বাড়ির বিশ্বস্ত লেঠেলদের দিয়ে তাঁকে বের করে দিয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রের এই দৃঢ়তা দেখে প্রীতিরাম নিশ্চিন্তে মৃত্যুবরণ করেন ঐ বছরেই।

পরবর্তীকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঙ্গায় মাছ ধরার জন্য গরিব জেলেদের ওপর মাছকর চাপালে রাণী তাদের প্রার্থনায় কোম্পানির বিরুদ্ধে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন

করেন। কোম্পানির চাপানো এই করের ফলে জেলেরা পড়েছিলো ভয়ঙ্কর বিপদে। রাণী এর প্রতিকারার্থে বিপুল অর্থ ব্যয় করে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে ঘুসুড়ি ও মেটিয়াবুরুজের মধ্যবর্তী গঙ্গায় মাছ ধরার ইজারা নেন; অর্থাৎ গঙ্গার এই অংশে রাসমণি একা মাছ ধরার অধিকার অর্জন করেন। ইংরেজ শাসকরা ভাবেন যে — মাছের ব্যবসা শুরু করতে চলেছেন রাণী। এরপরই দশ হাজার টাকা সরকারের অফিসে জমা দিয়ে রাণী রাসমণি মোটা মোটা লোহার শিকল, দড়ি ও বাঁশ দিয়ে গঙ্গানদীকে আড়াআড়ি ঘিরে ফেললেন। এরপর জেলেরা নিশ্চিন্তে মাছ ধরতে পারে। কিন্তু ইংরেজ শাসকেরা এরফলে ভয়ঙ্কর সঙ্কটে পড়ে। গঙ্গা দিয়ে জাহাজ ও নৌকার চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজ সরকার বেগতিক দেখে রাণীকে জলপথ মুক্ত করার আদেশ দেন। রাণী ইংরেজ সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে উত্তর দেন যে — তাঁর ইজারা নেওয়া অংশকে আইনত শৃঙ্খলিত করার অধিকার তাঁর আছে। ফলত ইংরেজ শাসকরা বিপাকে পড়ে বুঝতে পারে যে রাণীর সঙ্গে লড়াই করতে গেলে নিশ্চিতভাবে তাদের হারতে হবে। সেই সঙ্গে ইংরেজরা এটাও বোঝে যে — তিনি দরিদ্র জেলে প্রজাদের স্বার্থেই গঙ্গানদীর এই অংশ ইজারা নিয়েছেন। রাসমণি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে — একমাত্র যদি তারা জেলেদের ওপর আরোপিত কর প্রত্যাহার করে নিতে রাজি হয়, তবেই তিনি তাঁর অধিকারস্বত্ত্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবেন। এই ব্যবস্থায় রাজি না হলে মামলা মোকদ্দমা করে সরকার বাহাদুরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করার হুমকিও তিনি দেন। এর ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার নতি স্বীকার করে এবং মাছ ধরার জন্য আরোপিত কর প্রত্যাহার করে নেয়। উপরন্তু, রাণীর দশ হাজার টাকাও ফেরৎ দেয়। যাঁর হৃদয়াবেগ ও বুদ্ধি চাতুর্যের কাছে ব্রিটিশ সরকার পরাস্ত হল, তাঁর নামে গোটা বাংলায় জয়ধ্বনি ওঠাই ছিল প্রত্যাশিত এবং উঠেও ছিল।

এভাবে শুধু প্রজারক্ষাই নয়, জমিদার হিসেবে প্রজাদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যও যথেষ্ট তৎপরতার নিদর্শন দেখিয়েছিলেন তিনি। রাণী রাসমণি নিজে জমিদারি পরিচালনা করতেন আবার সেই সঙ্গে অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের শায়েস্তা করতেও দ্বিধা করতেন না। মমিনপুর পবগণায় রাণীর জমিদারি ছিল। সেখানে নীলকর ডোনাল্ড সাহেব প্রজাদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাতো। খবরটা রাণীর কানে যেতেই তিনি কয়েকজন পালোয়ান পাঠিয়ে সেই অত্যাচারী নীলকর সাহেবকে চরম শাস্তি দিয়েছিলেন। 'নেটিভ'— এর হাতে এই অপমান ডোনাল্ড সাহেব মুখ বুঁজে সহ্য করতে রাজি ছিলেন না। ডোনাল্ড আদালতে রাণীর বিরুদ্ধে মামলা করলেও সেই মামলায় জয়ী হয়েছিলেন রাসমণি।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা সিপাহী বিদ্রোহের অল্প পরের। সেই সময় একদিন সন্ধ্যায় জানবাজারে রাণীর বাড়ির সামনে চার গোরা সৈন্য পথচারীদের মেরে টাকা পয়সা কেড়ে নেয়। রাণীর জামাতারা বাড়ির দারোয়ানদের পাঠিয়ে মত্ত গোরাদের বিদায় করে। কাছেই

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ছিল ঐ সেনাদের শিবির, মার খেয়ে চারগোরা শিবিরে গিয়ে খবর দিলে দলে দলে গোরা সৈন্য বেরিয়ে এসে রাসমণির বাড়ি আক্রমণ করে। খিড়কীর দুয়ার দিয়ে পালাতে হয় তাঁর জামাতাদের। খোলা তলোয়ার হাতে নেমে আসেন রাণী। তাঁর এই রূপ দেখে সৈন্যরা আর এগোয় না। অধিনায়ক এসে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান। বাড়িতে ঢুকে গোরা সৈন্যরা তছনছ করার ফলে যেসব জিনিষ নষ্ট হয়েছিল, তার তিনি একটি তালিকা তৈরি করে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন এর ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য। অনাদায়ে আদালতে গিয়ে আইনের সাহায্যে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মনস্থির করেন। সরকার অবশেষে বাধ্য হয়েছিলেন ক্ষতিপূরণ দিতে। ভবিষ্যতে যাতে আর কোন গোলমাল না হয়, সেজন্য বারোজন গোরা সৈন্য জানবাজারের বাড়ির দরজায় দিবারাত্র দুবছর ধরে পাহারা দিয়েছিল। ১৮৫৮ সালের ছয়-ই মে 'সংবাদ প্রভাকর' এই সংবাদ প্রকাশ করেছিল।

জানবাজারের রাণী রাসমণির দুর্গাপুজো ছিল সেই সময়ে বাংলাবিখ্যাত। কিন্তু এই পুজোকে কেন্দ্র করে একবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সংগে রাণীর গোলযোগের সূত্রপাত হয়। সেবার ষষ্ঠীর দিন সকালে জানবাজারের রাজবাড়ি থেকে ব্রাহ্মণরা যাচ্ছিলেন বাবু রোড দিয়ে গঙ্গায়। তাঁরা ঢাকঢোল বাজিয়ে নবপত্রিকা স্নান করাতে যাচ্ছিলেন। এই ঢাকঢোলের শব্দে ইংরেজ সরকারের বেতনভুক্ত গোরা সৈন্যদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটলে তাদের কর্ণেল বাজনা বন্ধের আদেশ করেন। কিন্তু তাঁর আদেশে কেউ কর্ণপাত না করায় কর্ণেল সাহেব পুলিসের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। পুজোর পরেই পুলিস রাণীর বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে মামলা রুজু করেন। রাণীর পক্ষ থেকে সরাসরি সনদ দেখিয়ে বলা হয় যে — যেহেতু এটা রাণীর রাস্তা তাই তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারেন ও সরকার বাহাদুর বাধা দিলে তিনি যে ব্যয়ে রাস্তা তৈরি করেছেন, তার দ্বিগুণ ব্যয়ে রাস্তা ভেঙে দেবেন। কিন্তু ইংরেজদের বিচারে তবু রাণীর ৫০ টাকা জরিমানা হয়। জরিমানার টাকা রাণী দেন ঠিকই কিন্তু তারপরই তিনি জানবাজার থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে গরান কাঠের শক্ত বেড়া দিয়ে দেন। ফলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। সরকার রাস্তা খোলার হুকুম দিলে রাণী তার জন্য উচিত মূল্য দাবি করেন। রাণীর এই সাহস ও বীরত্ব সেদিন পরাধীন মানুষের জীবনে এক নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। শেষ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নতি স্বীকার করে এবং জরিমানার ৫০ টাকা ফেরত দিয়ে দেয়। সেই সময় মুখে মুখে ছড়া রচিত হয়,

> অষ্ট ঘোড়ার গাড়ি দৌড়ায় রাণী রাসমণি,
> রাস্তা বন্ধ করতে পাল্লে না ইংরেজ কোম্পানি।

উল্লেখ্য যে এটা কোন প্রাচীন কাব্য নয়, বাংলার মহীয়সী নারী রাণী রাসমণির উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের প্রশস্তি গাথা। সেই সময় থেকে শোভাযাত্রার জন্য সরকারি অনুমতি

নেওয়ার প্রথা চালু হল; এর আগে এরকম কোন প্রথা ছিল না।

তাই আজও নারীমুক্তি ও নারী স্বাধীনতার কথা বলতে গেলে উল্লেখ করা প্রয়োজন দুশো বছর আগেকার সেই গ্রাম্য রমণীর স্বাধীন সত্তা, আত্মবিশ্বাস, ত্যাগ ও সংযমের দৃপ্ত প্রকাশ এবং সেবাধর্মের অফুরন্ত উৎসের কথা। যে নারী শিক্ষার জন্য, নারী সমাজের মুক্তি ও প্রগতির জন্য বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের অন্ত ছিল না — রাসমণিকে সেই সমাজের অগ্রবর্তিনী বললে বোধকরি ভুল বলা হবে না।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। Bhabesh Maiti - Life of Rani Rashmani.

২। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — চিন্ময়ী এক বহ্নিশিখা।

৩। গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ — রাজেশ্বরী রাসমণি।

৪। নিত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় — করুণাময়ী রাসমণি।

৫। অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ — জানবাজারের রাণীমা।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র সেন — লোকমাতা রাণী রাসমণি।

৭। প্রবোধচন্দ্র সাঁতরা — রাণী রাসমণি।

৮। অন্নপূর্ণা দেবী — রাণী রাসমণি।

৯। গোপালচন্দ্র রায় — রাণী রাসমণির জীবনী।

১০। সংবাদ প্রভাকর : সমাচার চন্দ্রিকা।

১১। সাপ্তাহিক বর্তমান — ২৫ সেপ্টেম্বর (রাণী রাসমণি আবির্ভাবের দুশো বছর), ১৯৯৩।

১২। সাপ্তাহিক বর্তমান — লোকমাতা রাণী রাসমণি, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।

প্রসঙ্গ পাতিব্রত্য : উনবিংশ শতকে বাংলায় বিবাহ বিষয়ক কয়েকটি বিতর্ক

ঐশিকা চক্রবর্তী

"আধ্যাত্মিক আর্যধর্মের মহিমা — বলে, ... বহুকালের পুরুষানুক্রমিক শিক্ষায়, সমাজের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য তাঁহার সহজ ধর্ম, স্বভাব ধর্ম, প্রাকৃতিক ধর্ম হইয়াছে। অথচ হিন্দু নারীর পাতিব্রত্য জগতের একটি দুর্লভ পদার্থ। ...এই পাতিব্রতে "যখন যার, তখন তার" ভাব আসতেই পারে না।"

"হিন্দু নারীর পাতিব্রত্য - বড় ঠান্ডা জিনিষ — প্রাণ শীতলকারী পদার্থ।"[১]

"পতিসেবাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম; এই জন্য... মৃত পতির সহিত প্রজ্বলিত হুতাশনে আপনার জীবন্ত শরীর দগ্ধ করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়া যাইতেন।"[২]

— এমনই সহজ পাতিব্রত্যের বাণী কখনও মৃদু স্তব কীর্তনে, কখনও মন্দ্রিত বজ্র গর্জনে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে উনবিংশ শতকের বঙ্গ সমাজে। নিছক ব্যক্তিগত আদর্শরূপে বা কঠোর সামাজিক প্রতিজ্ঞারূপে — এই ধারণা পরিক্রমণ করে ইতিহাসের কিছু উল্লেখ্য সন্ধিস্থল; যেখানে নারী যিনি নামান্তরে "স্ত্রী", তাঁর বিবাহ এবং মৃত্যুহীন পাতিব্রত্য হিন্দুসমাজের অকলুষিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বহমান ধারার প্রতীকী রূপ ধারণ করে।

নীরদ. সি. চৌধুরী এক জায়গায় বলেছিলেন, "হিন্দুর সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের ধারণা বাঙালী নূতন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে পাইয়াছিল।" আগে এর অস্তিত্ব থাকলেও, "উহা দেখিয়া সুখ বা গর্ব অনুভব করিবার মত ক্ষমতা বাঙালীর মনে পাশ্চাত্য প্রভাব আসিবার পূর্বে আসে নাই।"[৩] নবোদিত স্বাদেশিকতা ও নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি, এই সময়ের পাতিব্রত্য ছিল "প্রেমের সঙ্গে সতীত্বের" সমন্বয়। নীরদ. সি. বলছেন, "নরনারীর সম্পর্কের রোমান্টিক পাশ্চাত্য রূপের সন্ধান পাইবামাত্র — বাঙালীর মনে হইল এই "থিসিস" এর একটি দেশী "কাউন্টার থিসিস" এরও প্রয়োজন আছে।" তাই "পাতিব্রত্যের ধারণাও নূতন রূপ ও নূতন গৌরব ধরিয়া দেখা দিল।"[৪]

তবু, পাতিব্রত্যের বিপ্রস্তাব শুধু রোমান্টিক অভিঘাতের পরিণাম-ই নয়, ছিল এক গভীর রাজনৈতিক সঙ্কটে পর্যুদস্ত বাঙালী হিন্দুর সন্ত্রস্ত ও সতর্ক প্রতিক্রিয়া। উনবিংশ শতকের শেষার্ধ প্রত্যক্ষ করেছিল হিন্দুর অন্দরে, তার গার্হস্থ্য, সংসার ও স্ত্রী ধর্মের উপর কিছু প্রতীক্ষিত অথচ বিক্ষিপ্ত আঘাত। পাশ্চাত্য শাসন ও প্রাগ্রসর (কখনও বিধর্মী)

স্বজাতির সংস্কারের প্রকোপে বিপর্যস্ত হয়েছিল হিন্দু বিবাহের প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, আচার ও সর্বোপরি শাস্ত্র-স্বীকৃত প্রবচন। ১৮৭০ এর দশকে "ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি" অতি মার্জিত কৌশলে আইনসিদ্ধ করেছিল সম্মতি বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, লঙ্ঘন করেছিল শৈশব-বিবাহের সর্বগ্রাহ্য মান্যতা।

জাতীয়তাবাদের উৎস ধারায় হিন্দু বিবাহের এহেন "অহিন্দু", "নিরীশ্বর" তর্জ্জমা বাঙালী উদার চিত্তে গ্রহণ করে নি। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের প্রধান আকর, হিন্দু নারীর চিরায়ত বন্ধন এবং জাতির একমাত্র স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান — হিন্দু বিবাহে এই বিজাতীয়, আইনি হস্তক্ষেপ স্বতঃই প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। চন্দ্রনাথ বসুর "সাবিত্রীতত্ত্বে" ঘোষিত হয় "পাতিব্রত্যের হুঙ্কার"।[৫] শুধু ধর্মপ্রাণ হিন্দু নয়, প্রগতিশীল কিছু ব্রাহ্মের-ও আচরণ ও স্বীকারোক্তি "চুক্তি বিবাহ", "যুক্তি বিবাহ" ও "মুক্তি বিবাহের" তার্কিক প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে তোলে আচার সর্বস্ব বিবাহের জনপ্রিয়তা ও সামাজিক অনিবার্যতা। কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত New Dispensation পাতিব্রত্যের অঙ্গীকার স্বরূপ "আর্য নারী সমাজে" প্রচার করে সাবিত্রী ব্রত, মৈত্রেয়ী ব্রত, দ্রৌপদী ব্রত, ও লীলাবতী ব্রত (ভিক্টোরিয়া ও নাইটিংগেল ব্রত)।[৬] অর্থাৎ বহিরঙ্গে সাজ বদল হলেও ভেতরে অক্ষত থাকে হিন্দুর অহঙ্কার — পাতিব্রত্য।

রামনারায়ণ তর্করত্ন, তাই কুলীন বিবাহের যথেচ্ছ সমালোচনা করেও লিখেছিলেন পতিব্রতোপাখ্যান। ভারতমুনিকে উদ্ধৃত করে তিনি লেখেন — "পতিব্রতা পতিগতি পতিপ্রিয়হিতেরতা/যস্যস্যাৎ সদৃশীভার্য্যা ধন্যঃ স পুরুষোভূবি।"[৭] ঘুরিয়ে বললে, সারস্বরূপ এই সংসারে পতিব্রতা স্ত্রী না থাকলে, পুরুষের দারগ্রহণ কেবল গলগ্রহ মাত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরান, বরাহ পুরান এবং হারীত সংহিতায় উল্লেখ আছে, যে স্ত্রী ব্রতের ন্যায় সর্বদা পতির উপাসনা করেন তিনিই পতিব্রতা। লক্ষ্মণ ও চরিত্রানুযায়ী এঁরা দ্বিপ্রকার স্বাত্তিক ও রাজসিক।[৮]

এহেন স্বত্ত্ব ও রজ গুণ সমৃদ্ধ পাতিব্রত্যে এক অযাচিত আঘাত আসে ১৮৮৪ - ৮৮ সালে। পশ্চিম ভারতের রূকমা বাই তার বাল্য-বিবাহের আবশ্যিক শর্তপূরণে অসম্মতি জানিয়ে, চিরস্থায়ী দাম্পত্য বন্ধনে নারীর প্রশ্নাতীত সমর্পণের স্বত:সিদ্ধতা অগ্রাহ্য করে সদর্প স্পর্ধায়। সহবাসে অসম্মত হিন্দু স্ত্রীর এই অভূতপূর্ব আচরণের স্তম্ভিত হয় হিন্দু সমাজ। এক নারীর স্বঘোষিত বিদ্রোহ দেশে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে, আতঙ্কিত করে তোলে হিন্দু, এমনকি পুরুষতান্ত্রিক ব্রিটিশ আইনি শক্তিকেও।

বিবাহের পরিবর্তিত ব্যবস্থায় সম্পর্কের বিবর্তনের আশঙ্কায় সঙ্কট জাগে হিন্দু স্ত্রীর সতীত্ব ধর্মে। মনস্তাপে দীর্ণ হয়ে, মনোমোহন বসু লেখেন — "আমরা অর্দ্ধসভ্য, দীন দুঃখী পরাধীন ঘৃণিত হিন্দু, আমাদের পক্ষে ঐ সামান্য ধনটিই (সতীত্ব) পরম ধন — সাত রাজার ধন অমূল্য মাণিক অপেক্ষাও মূল্যবান।" "সেই সতীত্ব রক্ষার জন্য বিষয়, বিভব, গো মহিষ, অশ্ব-হস্তী — এমন কি বাঙ্গালী যে চাকরীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন,

সে চাকরী পর্যন্ত".... বিসর্জন করিতে প্রস্তুত।"[৯]

সতীত্বের প্রকারভেদে বিবিধ বিবাহ রীতি নিয়ে প্রবল বিরোধ বাধে হিন্দু শিবিরে — বাল্য বিবাহ বনাম তরুণী বিবাহ, পূর্বরাগশূন্য বনাম কোর্টশিপ বিবাহ, সম্মতি বনাম অনুমতি বিবাহ, চিরস্থায়ী বনাম বিচ্ছেদ-প্রবন বিবাহ — এমনই নানা তত্ত্বের ধারা বেয়ে।[১০] তবে, বাহ্যিক আচারে — আকারে বদল কাম্য হলেও নব্য বা পুরাতন — কোন গোষ্ঠীই দাম্পত্যের সন্ধিচ্ছেদে পাতিব্রত্যের বিনাশ প্রার্থনা করেন নি।

১৮৮৬-৮৮ সালে যখন পার্শী সংস্কারক বেহরামজী মালাবারি "শিশু-বিবাহ" নিবারণে সরকারের দ্বারস্থ হন, বিবাহে স্ত্রীর সম্মতির প্রশ্নকে স্বাগত জানাতে, তখন বাঙালীর থিয়েটারে বিবাহ-সংস্কার পরিণত হয় সামাজিক নক্সায়। স্টার বা বেঙ্গল থিয়েটারে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয় "বিবাহ বিভ্রাট", "সম্মতি-সঙ্কট", কিংবা 'রুক্মিণী রঙ্গ" নাটক — যা বাঙালীর রক্ষণশীল মনস্তত্ত্বের সাক্ষ্য বহন করে। অমৃতলালের প্রহসনে, বিবাহে সম্মতির প্রশ্ন তুলে এগারো বছরের রঙ্গিণী গায় —

"কাঙালী বাঙালী যদি না করে উপায়
বোম্বায় যাইব আমি ভাসিয়ে ভেলায়
ইষ্ট-দেবী যার নারী, আছেন সে মালাবারি
আইন করেছে জারি, সরকার পদে ধরি,
পতির করিতে ক্ষতি সদা আগুয়ান
অবলার বল দিতে "বীর জাম্বুবান"।
হর্ষ-বর্ষী পার্শী সেজে উদার-হৃদয়।
নারীরে তরিতে ভবে — খামোকা উদয়॥
....রাতারাতি করে দেবে আঁইন সে পাশ।
পতি-পত্নী বন্ধনের খুলে যাবে ফাঁস॥"[১১]

পতি-পত্নীর বন্ধনমুক্তির আশঙ্কায় শেষ অবধি পাশ হয় না সহবাস সম্মতি বিল। বাল্য বিবাহের গৌরব থাকে অক্ষুণ্ণ। তবু এরই মাঝে বাংলায় হঠাৎ-ই ঘটে যায় বালিকা স্ত্রী ফুলমণির সহবাস-জনিত মৃত্যু।

১৮৯০-এ ফুলমণির মৃত্যুর ময়না তদন্তে কি সত্যিই বিচার্য ছিল বিবাহিতা স্ত্রীর বৈধ ধর্ষণের প্রশ্ন ? নাকি সহবাসে সম্মতির প্রয়োজন নিরুচ্চারিত রেখে দেয় মৃতা স্ত্রীর পাতিব্রত্য ! প্রকাশ্য বিতর্কের আড়ালে সুরক্ষিত থাকে হিন্দুর একান্ত অন্দরের গোপনতম আশ্রয় — বিবাহ; যেখানে স্ত্রী স্বামীর নিজস্ব দেহগত.সম্পত্তি, তার উপর বিরাজ করে পতির "নিত্যদখলের অহঙ্কার"। পতিভক্তির প্রাত্যহিক নিত্যকর্ম থেকে পাতিব্রত্য উন্নীত

হয় পতিহীনা বিধবার আমরণ ব্রহ্মচর্যে, আর ধর্ষিতা স্ত্রীর মৃত্যুর প্রতিবাদহীন অনুমোদনে। সর্বকালীন্ন আবেদনে পাতিব্রত্য হয়ে ওঠে হিন্দু স্ত্রীর সহজাত ভক্তির প্রকাশ। পরিশেষে, উনবিংশ শতকের সমাপ্তিতে ধর্মশাস্ত্র আর গৃহধর্ম সংস্কারে আসে ভাটার টান। আর বিবাহ সাগর মন্থন করে স্থির প্রত্যয়ে উঠে আসে হিন্দুর অমৃতকুম্ভ - পাতিব্রত্য।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। অক্ষয় চন্দ্র সরকার, "হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা", *অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার*, কলকাতা, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৭৫।

২। রাধাপ্রসাদ রায়, *বঙ্গের বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালী*, কলকাতা, ১৮৭০ শকাব্দ, ৬।

৩। নীরদচন্দ্র চৌধুরী, *বাঙালী জীবনে রমণী*, কলিকাতা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, ১৩৫-১৩৬।

৪। প্রাগুক্ত।

৫। চন্দ্রনাথ বসু, *সাবিত্রীতত্ত্ব*, কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩০৭, ৬১-৬৩।

৬। শিবনাথ শাস্ত্রী, *History of the Brahmo Samaj*, কলকাতা, ১৯১১-১২, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৩, ২০৭।

৭। রামনারায়ণ তর্করত্ন, পতিব্রতোপাখ্যান, কলিকাতা, ১৮৫৩, ৪।

৮। প্রাগুক্ত, ২৭-২৮।

৯। মনোমোহন বসু, *হিন্দু আচার-ব্যবহার: পারিবারিক ও সামাজিক*, কলিকাতা, ১২৯২, বঙ্গাব্দ, ২৭।

১০। প্রাগুক্ত, ২১-২২।

১১। অমৃতলাল বসু, "সম্মতি সঙ্কট" *অমৃত-গ্রন্থাবলী* (প্রথমভাগ), কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, ১৪-১৫।

উনিশ শতকে বাংলার নারী চেতনার জাগরণে দাম্পত্য সম্পর্কের প্রভাব ঃ

সুচন্দ্রা গুহ

উনিশ শতকের নবজাগরণে প্রভাবিত হয়েছিল বাঙলার যুব সমাজ। পাশ্চাত্য দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার তাদের মধ্যে জাগিয়েছিল অনুসন্ধিৎসা—জেগে উঠেছিল নতুন চেতনা। এই চেতনার আলোয় আলোকিত হতে শুরু হয়েছিল বাংলার অন্তঃপুর। শ্রী সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী তার 'অন্দরে অন্তরে' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন '.....ইংরেজদের আগমনের ফলে বাঙালি সমাজে যে কটি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, তার অন্যতম ছিল অন্তঃপুর সম্বন্ধে নতুন ধারণা.....'। ১৮১৭ সালে প্রকাশিত জেমস্ মিলের History of British India তে স্পষ্টভাবে বলা হলঃ "Women's position could be used as an indicator of society's advancement. Among rude people women are degraded and among civilized people they are exalted." বাঙলার শিক্ষিত সমাজের চেতনায় হয়ত বা এ ধারণা কিছুটা আঘাত করল, ভাবতে প্রায় বাধ্য করাল স্ত্রীর মর্যাদা ও স্থান সম্বন্ধে তাদের অবস্থান ও চিন্তাধারাকে। Sir Herbert Riley ইংরেজ শাসনের যৌক্তিকতা ও বৈধতা প্রমাণ করতে গিয়ে বললেন যে — ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় রাজনৈতিক ও প্রজ্ঞার আলোচনায় বেশি উৎসাহি কিন্তু সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে নয়। সুতরাং ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা ক্রমান্বয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়া ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজ সজাগ হয়ে উঠল। একটি গোষ্ঠী অতীত ঐতিহ্যর মধ্য থেকে নারীর গৌরবময় চিত্র তুলে ধরল এবং অপর গোষ্ঠী নতুন পাশ্চাত্যদর্শন ও জীবনযাত্রার আলোকে নারীর সমাজে স্থান সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা শুরু করল।

আমার আলোচনার সময়কাল অর্থাৎ উনিশশতকে অধিকাংশ মেয়েদের বিবাহ হত নয়, দশ বা তারও কম বয়সে, অর্থাৎ একটা কন্যার শৈশব থেকে কৈশোর এবং যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত হত শ্বশুরালয়ে অথবা স্বামীগৃহে। নারী হিসাবে সম্মান, মর্যাদা বা অধিকার সম্বন্ধে আদৌ কোন বোধ যদি সৃষ্টি হত তবে তা বিবাহ পরবর্তী জীবনে। আট, নয় অথবা দশ বছরের একটি বালিকা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরক্ষর (কিছু ব্যতিক্রম) অবস্থায় সংসার ধর্ম পালন করতে আসত। তাদের না থাকত অক্ষরপরিচয় না বিবাহ সম্বন্ধীয় কোন পরিষ্কার ধারণা। রাসসুন্দরী দেবী, প্রথম বাঙালি মহিলা যিনি আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন, বিবাহ সম্বন্ধে তার শিশু মনের ধারণা ছিল শুধু শাড়ি, গহনা, আলো, বাদ্যি আর লোক সমাগম। 'স্পন্দিত অন্তর্লোক' গ্রন্থে

লেখিকা গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত রাসসুন্দরী প্রসঙ্গে লিখছেন '...বিবাহ অনুষ্ঠানের পরদিন যখন শুনলেন যে সেদিন যাওয়া হবে তখন তিনি মনে করেন ঐ যারা এসেছিল তারাই যাবে। অতএব তিনি নিশ্চিন্তমনে মার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে বিচরণ করেন....।' সুতরাং এইরকম অবস্থায় দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠা যে প্রায় অসম্ভব ছিল তা বোঝাই যায়। এখন দাম্পত্য সম্পর্ক, বিষয়ে কোন কালজয়ী সংজ্ঞা হয়ত নেই। যুগে যুগে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে তবুও খুব সাদামাটা ভাষায় বলা যায় স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্কই দাম্পত্য সম্বন্ধ, তাহলে বোঝাই যায় উনিশ শতকে তা তৈরি হওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কহীনতার কারণ হিসাবে বলা যায়; বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা সামাজিক মূল্যবোধ প্রভৃতি। একটি অপরটির সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন ধরা যাক বাল্যবিবাহ, যেখানে আট কি দশ বা তারও কম বয়সি মেয়ের বিবাহ হত, অনেক ক্ষেত্রে কুলীন প্রথা অনুসারে অতিবয়স্ক কারোর সাথে অথবা তার থেকে বেশ কিছুটা বড় এমন লোকের সাথে যে তার মনের সঙ্গী কখনোই হয়ে উঠত না। কুলীন প্রথার ভয়াবহতা প্রায় সবারই জানা, যেখানে পঞ্চাশ বা ষাট বা তদ্ধোর্ধ বৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেওয়া হত বালিকা বা কিশোরীর। নিয়ম রক্ষার্থে আইবুড়ো নাম খন্ডানো ছাড়া এ বিয়ে আর কিছুই ছিলনা। দাম্পত্য সম্পর্কতো দূরের কথা স্বামীকে অনেক ক্ষেত্রে চিনতনা পর্যন্ত এই মেয়েরা। এইরকমই একজনের কথা তার নিজেরই বলা 'সেকেলে কথা'য় পাওয়া যায়। তার নাম নিস্তারিণী দেবী। একজন কুলীন ব্রাহ্মণের সাথে বিবাহ হয়, যাহা ছিল বিবাহের নামান্তর। সারাজীবন অতি দারিদ্র, অবহেলা ও চরম দুঃখে পিত্রালয়েই তার কাটে। আবার বাল্যবিবাহে স্বামী যেখানে অল্প বয়সী, সে তার অপরিণত বয়স হেতু, প্রয়োজনে তার বালিকাবধূটির পাশে দাড়াতে অক্ষম ছিল। গোলাম মুর্শিদ তাঁর রচনায় বলেছেন যে বিবাহ পরবর্তী জীবনে যৌথ পরিবারে নাবালিকা স্ত্রী যখন পরিবারের অন্যান্য সদস্য দ্বারা প্রহৃত বা অত্যাচারিত হত, নাবালক স্বামী প্রায় কিছুই করতে পারতনা। যার কারণ হিসাবে গোলাম মুর্শিদ বলেছেন, হয়ত বা তার অল্প বয়স, হয়ত জীবন ধারণের জন্য যৌথ পরিবারের উপর নির্ভরশীলতা এবং স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠতার অভাব। এই ঘনিষ্ঠতার অভাবের কারণ হিসাবে বলা যায় তখনকার সামাজিক ধ্যানধারণায়, স্বামী, স্ত্রীর দিনের বেলায় দেখা হওয়া অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে করা হত এবং যেখানে দেখা করার সময়টা কেবল রাত কি ধরণের দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে উঠত তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এইরকম একটি প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও উনিশ শতকের বেশ কিছু রচনা বিশেষত নারী কর্তৃক রচিত বিষয় থেকে বেশ কিছু ইতিবাচক দাম্পত্য সম্পর্কের কথা জানা যায়, যেখানে স্বামীর সাহচর্য ও সহযোগিতা বালিকা স্ত্রীকে শিক্ষালাভে এবং তার চেতনার জাগরণে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দেয়। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দর্শনের প্রভাবে যে বিশেষ গোষ্ঠী, গোষ্ঠীগতভাবে নারীচেতনা জাগরণে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তারা ছিল ব্রাহ্ম। এই ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনে নারী প্রগতির কথা বিশেষভাবে

ভাবাই শুরু হয়নি বাস্তবে তা রূপায়িত করার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন থেকে শুরু করে, সভাসমিতি, পত্রিকা প্রকাশ এবং বহুবিধ সংস্কারমূলক কার্য করা হয়েছিল। সুতরাং আশা করা যায় ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির কাছ থেকে তার স্ত্রী একটি উদার মানসিকতার পরিচয় পাবে। একথা বহুলাংশে সত্যি, কিন্তু বেশ কিছু অব্রাহ্ম যেমন হিন্দু ও উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলমান দম্পতির পারস্পরিক সম্পর্ক তাদের স্ত্রীদের চেতনার জাগরণে বিশেষ সহায়তা করেছিল। যেমন ধরা যাক কৈলাসবাসিনী দেবী। যার জন্ম এবং মৃত্যু উনিশ শতকেই। মাত্র এগারো বছর বয়সে তার বিবাহ হয়েছিল কিশোরীচাঁদ মিত্র নামক সমাজ সংস্কারক, বাগ্মী ও লেখকের সাথে। তিনি অত্যন্ত স্বল্পশিক্ষিতা ছিলেন কিন্তু স্বামীর সহযোগিতা ও ভালবাসা তাকে একজন সচেতন মহিলায় পরিণত করে। তার স্বামী তাকে শুধু ভালইবাসতেন না, শ্রদ্ধাও করতেন। তাদের প্রথম পুত্র সন্তানের মৃত্যুর পর যখন কন্যাসন্তান কুমুদিনীর জন্ম হল, তিনি এঘটনায় এতটুকু দুঃখ প্রকাশ না করে স্ত্রী ও সন্তানের শারীরিক সুস্থতার কথা শুনে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। অথচ সংসারে কন্যাসন্তান ছিল জঞ্জালের সামিল। প্রবচনে শোনা যেত

মেয়ের নাম ফেলি
পরে নিলেও গেলি
যমে নিলেও গেলি।

চিত্রা দেবের রচনায় জানা যায় একবার কিশোরীচাঁদ পুত্র সন্তানের কথা তোলায়, কৈলাসবাসিনী তাকে পুনর্বিবাহের পরামর্শ দেন। তার উত্তরে কিশোরীচাঁদ বলেন "সে ছেলেতে কি হবে ? তোমার গরভের না হলে আপনার ছেলে বোধ হবে কেন ?" যে যুগে পুত্রসন্তানের জন্মই ছিল অত্যন্ত কাম্য এবং তার জন্য বহুবিবাহ, পূর্বস্ত্রীর প্রতি অবহেলা সমাজের একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল সেখানে এমন মানসিকতার মানুষও ছিলেন। অপর আর এক কৈলাসবাসিনীর কথা জানা যায় যিনি সম্ভবত উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বারো বছর বয়সে তার যখন বিবাহ হয় দুর্গাচরণ গুপ্তর সাথে তখন তিনি সম্পূর্ণ নিরক্ষর। তার স্বামী তাকে প্রথম ভাগের বর্ণমালা শিখিয়ে অক্ষরের সাথে পরিচয় করান। কৈলাসবাসিনীর অনিচ্ছাসত্বেও তার স্বামী পরম যত্নে ও স্নেহে প্রতিরাতে তাকে শিক্ষা দান করেছেন। পনের বছরের পরিশ্রম সার্থক হয়েছিল। কৈলাসবাসিনী রচনা করেছিলেন "হিন্দু মহিলাদিগের হীনাবস্থা", "হিন্দু অবলাকূলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি'। তিনি লিখতে পড়তে শিখেছিলেন সেটাই বড় কথা নয় তার মনের সংস্কার মুক্ত হয়ে তিনি সমাজের কু-প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন, নারী শিক্ষায় বাধা কোথায় সে প্রশ্ন তুলেছিলেন। দুর্গাচরণ গুপ্ত নিজে জানিয়েছেন যে কৈলাসবাসিনী পুত্রকন্যা প্রতিপালন, সংসারধর্ম সবই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। অর্থাৎ তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন সংসারধর্ম পালনের সাথে শিক্ষা লাভের

কোন বিরোধিতা নেই।

এই দুই কৈলাসবাসিনীর পরই সময়ের দিক থেকে আমরা পাই জ্ঞানদানন্দিনীকে। স্বামী সাহচর্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের এমন নিদর্শন বোধহয় বাংলা তথা ভারতবর্ষে দুর্লভ। মাত্র আট বছব বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তার বিবাহ হয়। প্রকৃতঅর্থে শিক্ষার সুযোগ পান বিবাহসূত্রে। তার স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র ভারতের প্রথম সিভিলিয়ানই ছিলেন না প্রকৃত মুক্ত মনে তিনি দাম্পত্য সম্পর্কে স্ত্রীর ভূমিকাকে বিচার করেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনীর রচনা থেকেই জানা যায় তিনি তার পরিবারে স্বামীর সাহচর্যে একটি অত্যন্ত সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী ছাড়াও প্রায় তারই সমসাময়িক ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। ঠাকুর পরিবারের মেয়ে তিনি, তখনকার সময় ও সমাজের বিচারে শিক্ষা লাভের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তার পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার রচনায় মুগ্ধ হয়ে খাতায় লিখে দিয়েছিলেন "স্বর্ণ তোমার লেখণীতে পুষ্পবৃষ্টি হউক"। তবুও মাত্র বারো বৎসর বয়সে জানকীনাথ ঘোষালের সাথে তার বিবাহ হয়। স্বামীর উৎসাহে তার সাহিত্যচর্চা অব্যাহত থাকে। স্বর্ণকুমারীদেবী তার রচনা 'সেকেলে কথা'য় বলেছেন "... তখন সবে মাত্র আমার বিবাহ হইয়াছে, স্বামী স্ত্রী শিক্ষানুরাগী, উন্নতিপ্রবর্ত্তক, বিশ্বাসানুসারে কার্য করিয়া তাহাকে ও জীবনে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে।" চিত্রা দেব তার "ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে জানকী-নাথের ভালবাসা ঘিরে রেখেছিল স্বর্ণকুমারীকে। "স্ত্রীকে তিনি সমস্ত দুঃখ-বিপদের হাত থেকে সরিয়ে চেষ্টা করেছেন সাহিত্যক্ষেত্রে সার্থক করে তুলতে। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যিক খ্যাতি চিড় ধরায়নি তাঁদের দাম্পত্য জীবনে।" যাহা হক ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বা বধূদের কথায় বিশেষ যাব না কাবণ — তাদের বাড়ির পরিবেশ ও পরিস্থিতি ছিল কিছুটা আলাদা। ঠাকুর বাড়ির পবিবেশ ছিল নারী শিক্ষা ও চেতনা জাগরণের অনুকূলে। ঠাকুর বাড়ির বাইরে অপর এক মহিলার কথায় যাব, যিনি কৃষ্ণভাবিনী দাস। মাত্র দশ বছর বয়সে তার বিবাহ হয় প্রখ্যাত আইন ব্যবসায়ী ও বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ শ্রীনাথ দাসের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দাসের সহিত। বিবাহের আগে সামান্য অক্ষরজ্ঞান থাকলেও তার প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় বিবাহ পরবর্তী জীবনে স্বামীর সাহচর্যে। দেবেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র এবং সমাজ সংস্কারে আগ্রহী। তারই প্রেরণা ও উৎসাহে কৃষ্ণভাবিনী শিক্ষিত হয়ে ওঠেন ও সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে বেশ উল্লেখযোগ্য মতবাদ রাখেন। তিনি ভারতীয় নারীকে অসহায়তা ও দুর্বলতা ত্যাগ করে অধিকাব অর্জনের জন্য সোচ্চার হতে আহ্বান জানান। স্বামীর সাথে তার প্রেমের সম্পর্কের বর্ণনা পাওয়া যায় দেবেন্দ্রনাথ দাস রচিত "পাগলের কথায়"। কৃষ্ণভাবিনী ইংলন্ডে গেছিলেন স্বামীর সাথে তার পাঁচ বৎসরের শিশুকন্যা তিলোত্তমাকে শ্বশুর শ্রীনাথ দাসের কাছে রেখে। এই ঘটনা শুধু সে যুগ নয় সর্বযুগের অনুপাতে অত্যন্ত অভাবনীয়। সীমান্তী সেন "ইংলন্ডে বঙ্গ মহিলা" গ্রন্থের ভূমিকায় কন্যাকে ছেড়ে কৃষ্ণভাবিনীর বিদেশ যাত্রার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন "এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের

পেছনে কিছুটা বিলেতবাস সম্পর্কে অনিশ্চয়তা কাজ করলেও মূলত কার্যকরী হয়েছিল শ্রীনাথের ব্যক্তিগত মতামত....., শোক সত্বেও স্বামী এবং কন্যার মধ্যে স্বামীর সঙ্গই কৃষ্ণভাবিনী বেছে নেন। হয়ত এর পেছনে বিলেত দেখার দুর্নিবার আকর্ষণও কিছুটা কাজ করেছিল, কারণ ইংলন্ডে বঙ্গ মহিলার বিলেত যাওয়া সম্পর্কে কৃষ্ণভাবিনীর উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়,

বহুদিন হতে হৃদয়ে আমার,
গোপনে রয়েছে এক আশালতা,
দেখিবার তরে প্রিয় স্বাধীনতা,
যাইব যে দেশে বসতি উহার।

এই ঘটনাকে স্বামী সঙ্গলাভের জন্য গমনও বলা যেতে পারে।

উনিশ শতকের চিন্তা চেতনা যখন নারীর সমাজে ও পরিবারে স্থান সম্পর্কে নতুন ধারণার সৃষ্টি করছে সেই সময় দেখা যায় প্রায় সমসাময়িক দুই মহিলা, মানকুমারী বসু ও শরৎ কুমারী চৌধুরাণী, দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে দুরকমের মানসিকতা প্রকাশ করছেন। এরা দুজনাই তাদের বিবাহিত জীবনে স্বামীর সহযোগিতা পেয়েছিলেন এবং নিজেরাও শিক্ষিতা ছিলেন। মানকুমারী বসুর সময়কাল ১৮৬৩, তার বিবাহ হয় মাত্র দশ বৎসর বয়সে বিধূবশঙ্কর বসুর সহিত। নয় বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবাহিত জীবনে স্বামীর সঙ্গে তার মধুর সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল। মানকুমারী কবিতা লিখতে পারতেন, সেই কবিতা তিনি পাঠাতেন স্বামীকে। বন্ধুদের স্ত্রীর লেখা কবিতা শুনিয়ে সযত্নে রেখে দিতেন। চিত্রা দেব লিখছেন যে বিধূবশঙ্কর স্ত্রীকে গ্রহণ করেছিলেন অনির্বচনীয় শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালবাসার মাধুরী মিশিয়ে। অসময়ে মৃত্যু নাহলে তিনি মানকুমারীর কাব্যচর্চায় প্রকৃত সাহায্য করতেন। অল্প বয়সে বৈধব্য লাভ করায় হয়ত মানকুমারীর মানসিকতা পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত হতে পারেনি। তিনি স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ককে মেনে নিতে পারেননি। তার মনে হয়েছিল স্ত্রীর স্বামীর প্রতি ভালবাসায় যদি গভীর শ্রদ্ধা মিশ্রিত না থাকে তবে তাহা আদর্শ সম্পর্ক নয়। এই ধারণা হয়ত তার অকাল বৈধব্য জনিত কারণে হয়েছিল। অপরপক্ষে শরৎকুমারীর বিবাহ হয়েছিল নয় কি দশ বৎসর বয়সে কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধূরীর সাথে। বিবাহের পর শরৎকুমারীর স্বামী তার শিক্ষার জন্য একজন ইংরাজ মহিলা নিযুক্ত করেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা থেকে জানা যায় শরৎকুমারী ও তার স্বামী পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

মুসলমান সমাজে চেতনা ও শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল উনিশ শতকের মধ্য ও শেষভাগে। স্বভাবতই মুসলমান নারী সমাজে এর স্পর্শ লেগেছিল আরও পরে। মালেকা বেগম তাঁর "বাংলার নারী আন্দোলন" গ্রন্থে বলেছেন, "অবরোধ প্রথা হিন্দু কি মুসলিম ধর্ম নির্বিশেষে

সকল নারীর জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। সতীত্ব, পাতিব্রত্যও নারীত্বের মহিমায় নারী সমাজকে বিভোর রেখে ধর্মীয় অনুশাসনের নামে সমাজপতিদের চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধ নারী সমাজকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল.....”। উনিশ শতকের প্রায় শেষাশেষি মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে চিরাচরিত সমাজের কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে সরকারি চাকুরি গ্রহণ করতে শুরু করে। সোনিয়া নিশাত আমিন তার রচনায় দেখিয়েছিলেন উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের শুরুতে এমনই কিছু ব্যক্তির কথা জানা যায় যাদের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা তাদের স্ত্রীদের শিক্ষালাভে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। নিঃসন্দেহে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, যার নারী চেতনা ও প্রগতি সম্বন্ধীয় লেখা ও মতামত সমগ্র নারী জাতির বিকাশের সহায়ক। তার লেখায় প্রকাশ পেয়েছিল নারীর অধিকারের প্রশ্ন, পুরুষের সাথে সমকক্ষতার প্রশ্ন, নারীর স্বাবলম্বন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। বিবাহের আগে লেখাপড়া শিখেছিলেন বড়ভাই ও বোনের সহায়তায়। ষোলো বছর বয়সে বিবাহ হয় সাখাওয়াত হোসেনের সাথে। তিনি ছিলেন ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তার উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় রোকেয়া ইংরাজি শেখেন। Gail Minault এর গ্রন্থে রোকেয়ার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে “an extremely happy one, though childless”. মোরশেদ শফিউল হাসান তার “বেগম রোকেয়া” গ্রন্থে তার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে রোকেয়াজীবনীকার শামসুন্নাহার মাহমুদের বক্তব্য উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেখানে বলা হয়েছে “বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছেন, প্রত্যহ urine পরীক্ষা করে পথ্য রেঁধেছেন। ডাক্তারকে চিঠি লিখেছেন। দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েও শেষপর্যন্ত ছিলেন নিঃসন্তান। উনত্রিশ বছর বয়সে বিধবা হন।” শফিউল হাসান মন্তব্য করেছেন জীবনের এই তিক্ত-কঠিন অভিজ্ঞতা রোকেয়ার মধ্যে একটি জেদের সৃষ্টি করেছিল। এই জেদই হয়ত তার ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্যের কারণ। বৈবাহিক জীবনের এই দিকটি ছাড়াও অন্য দিকে তার স্বামী তাকে শিক্ষা লাভে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। ইংরাজিতে লেখা রোকেয়ার Sultana's Dream পড়ে সাখাওয়াত হোসেন মন্তব্য করেন “a terrible revenge” (যেখানে Ladyland-এ মেয়েরা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করছে আর ছেলেরা আছে মর্দানাতে)। সাখাওয়াত হোসেনের উৎসাহে লেখাটি ছাপা হয়। স্বামীর স্মৃতির প্রতি রোকেয়ার শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় তার নামাঙ্কিত স্কুলের মাধ্যমে। তিনি বারবার বলেছেন “আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হইলে আমি কখনোই সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না।”। সাখাওয়াত হোসেন মুসলমান বিবাহরীতি অনুযায়ী রোকেয়াকে মেহেরের অতিরিক্ত আরও দশ হাজার টাকা দেন একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য। রোকেয়ার কিছু আগে জন্মেছিলেন অপর একজন শিক্ষাবিদ খায়রন্নেসা খাতুন। তিনি ছিলেন একজন অক্লান্ত সমাজকর্মী ও পথিকৃৎ নারীবাদী। সিরাজগঞ্জ মহকুমার মুন্সিবাড়ি এলাকায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৭৪-৭৬ সালে তার জন্ম হয়। মূলত তিনি ছিলেন

স্ব-শিক্ষিত, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে ইংরেজি ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। দশ, এগারো বছর বয়সে তার বিবাহ হয় মুর্শিদাবাদের অসিরউদ্দিন আহমদের সাথে। তিনি বি. এ পর্যন্ত পড়াশুনা করে সাব-রেজিস্ট্রার হিসাবে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী। স্ত্রীকে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, কারণ তার অনুমোদন ও প্রশ্রয় ছাড়া সেকালের কোন গৃহবধূর পক্ষে ইস্কুলে শিক্ষকতা করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। ১৮৯৫ সালে হোসেনপুর বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার প্রধান শিক্ষিকা নিযুক্ত হন। আমৃত্যু অর্থাৎ পনের বছর তিনি এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। সাব রেজিস্ট্রারের চাকরি ছিল বদলিযোগ্য। খায়রন্নেসা অল্পকালের জন্য স্বামীর কর্মস্থলে গিয়ে থাকলেও স্থায়ীভাবে তিনি সিরাজগঞ্জেই থাকতেন তার স্কুলের কাজে। তার স্বামী যে বেতন পেতেন তার অনেকটাই চলে যেত ওই স্কুলের জন্য। যে ঘটনা প্রমাণ করে তার স্বামীর উৎসাহ কতখানি ছিল খায়রন্নেসার কাজের প্রতি। ১৯১০ সালে আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে খায়রন্নেসার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর স্বামী অসিরউদ্দিন খায়রন্নেসা রচিত "সতীর পতিভক্তি" গ্রন্থটি নিজব্যয়ে কয়েকবার প্রকাশ করেন। এরা ছাড়াও বিংশ শতকেব শুরু এবং মাঝামাঝি সময়ে বেশ কিছু মুসলিম মহিলার নাম পাওয়া যায় যারা তাদের মতামত বিভিন্ন প্রবন্ধে, গল্প ও নাটকাকারে লিখেছেন। যেমন নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী। বিবাহের আগে কঠিন পর্দার আড়ালে কোনরকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পাননি। কিন্তু আঠারো বছর বয়সে এক আইনজীবীর সাথে বিবাহের পর তারই ভাষায়, কঠিন পর্দা শিথিল ভাবাপন্ন হয়ে এল এবং স্বামীর সাথে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তার লেখিকা হবার সাধ পূরণ হতে শুরু করল।

উপরোক্ত আলোচনায় কিছু উদাহরণের মাধ্যমে উনিশ শতকে নারীচেতনা জাগরণের একটি ক্ষুদ্র চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ কথা সত্যি কিছু উদাহরণ কখনোই কোন সার্বিক সত্যের প্রতিষ্ঠা করে না। কিন্তু সমাজের কিছু মানুষের মানসিকতার প্রতিফলন অবশ্যই ঘটায়। সুতরাং পরিবার যদি সমাজগঠনের প্রাথমিক ধাপ হয় সেই স্থলে নারী পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতাই একটি সুস্থজীবন ও সমাজ গঠনে সহায়ক হয়। অতএব বিরোধিতা নয়, সহযোগিতাই হোক ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল — চিত্র দেব, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২। অন্তঃপুরের আত্মকথা — চিত্রা দেব, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪।

৩। স্পন্দিত অন্তর্লোক — গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত, প্রকাশ ১৯৯৯।

৪। অন্দরে অন্তরে — সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, প্রকাশ ১৯৯৫।

৫। সেকেলে কথা ঃ শতক সূচনায় মেয়েদের স্মৃতিকথা অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য সম্পাদিত প্রকাশ ১৯৯৭।

৬। কৃষ্ণভাবিনী দাসের ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা - সম্পাদনা সীমান্তী সেন। প্রকাশ ১৯৯৬।

৭। বামাবোধিনী পত্রিকা — সম্পাদনা ভারতী রায়, প্রকাশ ১৯৯৪।

৮। পিঞ্জরে বসিয়া — কল্যাণী দত্ত, প্রকাশ ১৯৯৬।

৯। থোড় বড়ি খাড়া — কল্যাণী দত্ত, প্রকাশ ১৯৯২।

১০। জানানা মহ্‌ফিল — সম্পাদনা মৌসুমী ভৌমিক ও শাহীন আখতার, প্রকাশ ১৯৯৮।

১১। বাংলার নারী আন্দোলন — মালেকা বেগম।

১২। পথিকৃৎ নারীবাদী খায়রুন্নেসা খাতুন — সৈয়দ আবুল।

১৩। 'বেগম রোকেয়া' সময় ও সাহিত্য — মোরশেদ শফিউল হাসান।

১৪। Secluded Scholars, Gail Minault - 1998.

১৫। The changing role of women in Bengal 1849-1905 - Meredith Borthwick, 1984.

১৬। Women in Modern India - Geraldine Forbes 1998.

১৭। "From the seams of History, Essays on Indian women" edited by Bharati Roy, Chapter : "The early Muslim Bhadramahila" by Sonia Nishat Amin.

১৮। Reluctant Debutante - Ghulam Mrshid 1983.

উনিশ শতকে বাঙালী নারী চিকিৎসকদের আগমন ও তজ্জনিত পরিবর্তনসমূহ

ইন্দ্রাণী লাহিড়ী

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই মেয়েদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের শেষে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার ফলে ভারতীয় সমাজে শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি সবক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে শুরু হয় স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলন। ঊনবিংশ শতকের সামগ্রিক সামাজিক চালচিত্রে মহিলারাও চিকিৎসাবিদ হবার কথা ভাবতে শুরু করেন এবং সমাজ এই "মহিলা ডাক্তারদের" কিভাবে গ্রহণ করেছে তাই ব্যক্ত করার প্রয়াস হয়েছে এই প্রবন্ধে।

উনিশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে আমরা দেখতে পাই স্ত্রী শিক্ষা এবং সচেতনতা গড়ে উঠতে শুরু করলেও মহিলারা নিজের শরীর সংক্রান্ত জটিলতার কথা পুরুষদের কাছে প্রকাশ করতে সঙ্কোচবোধ করত এবং প্রসবকালীন জটিলতার সমাধান কোন পুরুষ কখনই করতে পারেন না একথাও বিশ্বাস করত। তারা নির্ভর করত জড়িবুটি ঔষধদাত্রী মহিলাদের উপর। কিন্তু এরা ছিল সমাজের কাছে জল অচল। ফলে মহিলারা আধুনিক চিকিৎসার সুফল ভোগ করতে পারতেন না। রোগ কঠিন হলেই একমাত্র পুরুষ চিকিৎসকেরা তাদের চিকিৎসা করতে পারতেন তাও দাসী বা বাড়ির অন্য কোন মহিলার মুখে রোগের বৃত্তান্ত শুনে, কখনই তারা রোগিনীকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করতে পারতেন না। ফলে রোগিনীদের প্রয়োজনেই মহিলারা চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন।

উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে চিকিৎসক হতে গিয়ে ক্রমাগত বাধা পাচ্ছিলেন ভারতীয় নারীরা। কারণ তখনও ইউরোপ বা আমেরিকায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা মেডিক্যাল পড়ার অনুমতি পান নি। মিশনারীদের উদ্যোগে বিদেশ থেকে মহিলা চিকিৎসক আনার কথাও চিন্তা শুরু হয় এবং ১৮৭০ সালে ক্লারা সোয়েইন প্রথম ১৪টি অনাথা মেয়েকে নার্সিং ও কম্পাউন্ডারের কাজ শেখান এছাড়া এ ব্যাপারে ভি. ডব্লিউ. টমাস, সারা. সি. সিওয়ার্ডের নামও করা যায়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় মহিলা চিকিৎসকের অপ্রতুলতাই দেশীয় মহিলাদের আরো বেশি করে চিকিৎসক হতে অনুপ্রাণিত করেছে।

নিজের চেষ্টায় যোগ্য হবার প্রয়াস নারী, পুরুষ উভয়কেই করতে হয়। কিন্তু সমাজ চিরকাল এর উল্টোটাই আমাদের শিখিয়েছে। ফলে উনিশ শতকে সামাজিক চাপ কিছুটা

কমতেই তাই বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তবে সমগ্র উনিশ শতকে তো বটেই এমনকি কিছুদিন আগে পর্যন্তও এটাই মনে করা হত যে মহিলারা ভালো নার্স হতে পারে কারণ তাদের মধ্যে একটা সেবামূলক মন আছে এবং সেজন্যই তারা নারী ও শিশুদের ব্যাধির বিষয়েই বিশেষজ্ঞ। বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমরা সত্যপ্রিয়া মজুমদার, মৈত্রেয়ী চৌধুরীকে সার্জন হিসাবে পাচ্ছি। এই বিষয়টা কেন এমন ছিল তার ব্যাখ্যা দান সম্পর্কে বলা যায় সম্ভবত সমাজ চলতি ডাক্তারদের গাইনি বা শিশু বিশেষজ্ঞ হিসাবে দেখতেই পছন্দ করে। আর বিদেশী অধ্যাপক বা অধ্যাপিকারাও সার্জারি বা অন্যান্য বিভাগে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছাত্রীদেরই বেশি পছন্দ করতেন এবং তাদের প্রতি পক্ষপাতও স্পষ্ট ছিল। এটা বোধহয় ঔপনিবেশিক শোষণেরই একটা দিক। কাজেই উনিশ শতকে সবে যখন ভারতীয় বিশেষত বাঙালী মহিলারা মেডিক্যাল পড়তে শুরু করছে তখন শুধু সেবা ছাড়া তাকে জীবিকা হিসাবে দেখার মত মানসিক দৃঢ়তা আশা করা যেমন যায় না তেমনি মেডিক্যাল প্রফেশনে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার কথাও তখনও তারা ভাবতে পারেননি।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেবার উদ্যোগ ১৮৬৮ সালে শুরু হয়। ভারতীয় ধাত্রীরা অশিক্ষার কারণে প্রসব সংক্রান্ত কোন জ্ঞান পুরুষদের থেকে নিতে তারা অপমানিত বোধ করতেন। কৈলাসবাসিনী দেবীর আত্মকথা বা চিকিৎসক মধুসূদন গুপ্তের আঁতুড়ঘর নিয়ে সমীক্ষা থেকে জানা যায় — সুতিকাগারে শয্যা পাতা হত বাড়ির সবথেকে নোংরা বিছানাপত্র দিয়ে, জানালাহীন ঘরে সারাদিন আগুন জ্বলত এবং ধাইরা সর্বাপেক্ষা মলিন বস্ত্র পরে ঘরে ঢুকত। ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে এই ব্যবস্থা ছিল।[১] অথচ মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রী পাচ্ছিল না। বাবু দিগম্বর মিত্র, মহারানি স্বর্ণময়ী, পান্নার মহারানি এ ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেন। কলকাতায় মহিলারা পুরুষের কাছে শিক্ষা নিতে আপত্তি না করলেও তাদের প্রধান বাধা ছিল সামাজিক ফলে বহুদিন পর্যন্ত মহিলা চিকিৎসক ও নার্সদেরও ধাত্রীদের সমগোত্রীয় ধরে নিয়ে তাদেরও জল অচল মনে করা হত। ফলে "ডাক্তার এসেছে, ডেলিভারি করেছে, গোবর ছড়া দাও"[২] জাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন তাদের হতে হয়েছে।

অভিজাত বাঙালীদের অধিকাংশই মহিলাদের শিক্ষা লাভ আবশ্যক মনে করলেও অর্থকরী শিক্ষার আবশ্যকতা দীর্ঘদিন স্বীকার করেন নি। ফলে তারা এটাই ভাবতেন যে হয় উপার্জন, নয় সেবা — দুটির একটিরও প্রয়োজন যাদের নেই তারা কেন মেডিক্যাল পড়বে ? এবং এর প্রয়োজনও এরা উপলব্ধি করতে পারতেন না। অথচ এ ব্যাপারে তারা উদ্যোগী হলে কলকাতাতেই মেয়েরা প্রথম মেডিক্যালের ছাত্রী হত। তবে বাবু নীলকমল মিত্র এই সময় দুঃসাহস দেখিয়ে নাতনি বিরাজ মোহিনীকে ডাক্তারি পড়াতে চেয়ে আবেদন করেন। শেষ পর্যন্ত সম্ভবত সমাজের প্রবল আপত্তির সামনে বিরাজ মোহিনীর পড়া হল না। এরপর ১৮৭৮ ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে মহিলারা পড়ার অনুমতি পেলেও কেউই

আসেননি। ইতিমধ্যে ১৮৮২ সালে কাদম্বিনী বসু এফ. এ এবং অবলা দাস এন্ট্রান্স পাশ করে মেডিক্যাল পড়ার আবেদন জানালে কর্তৃপক্ষ গ্র্যাজুয়েট নন এই অজুহাতে তাদের আবেদন নাকচ করেন। ফলে অবলা ও তার অপর সঙ্গী অ্যালেন ডি ডাব্লু চলে যান মাদ্রাজে মেডিক্যাল পড়তে। ৪ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স শেষ করার পর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে অবলার বিয়ে হয় এবং তিনি পড়া ছেড়ে দেন। এক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশ না নিজেদের প্রবণতা কোন্‌টা প্রবল হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে সম্ভবত স্বামীর কাছ থেকে কোন বাধা তিনি পান নি। ভারতের অপর প্রান্তে আনন্দিবাই যোশী, অ্যানি জগন্নাথনও ডাক্তারি পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আনন্দিবাই হলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা ডাক্তার।

১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী বি. এ পাশ করে ডাক্তারি পড়ার জন্য পুনরায় আবেদন করেন। মেডিক্যাল কলেজের নিয়ম ছিল যে কেউ (any person) বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই মেডিক্যাল পড়তে পারবেন।[৩] এই নিয়মের কারণেই কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে কাদম্বিনীকে পড়তে দিলেন। তবে এ ব্যাপারে তার স্বামী দ্বারকানাথের অবদান বড় কম ছিল না। সর্বোপরি ছোটলাট রিভার্স টমসন ছিলেন নারী শিক্ষায় উৎসাহী ফলে মেয়েরা মেডিক্যাল পড়াব অনুমতি পেল। এ জন্য ব্রিটিশ রক্ষণশীল শিক্ষকদের ক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়। ১৮৮৮ সালে নানা অসুবিধা কাটিয়ে তিনি ফাইনাল পরীক্ষায় বসলেন। কিন্তু তাকে ফেল করিয়ে দেওয়া হল। ফলে তাঁর প্রথম এম.বি. হবার সাধ পূর্ণ না হলেও জি.বি.এম.সি ডিগ্রি পান এবং লেডী ডাফরিন হাসপাতালে চাকুরি পান। এছাড়া প্রাইভেট প্র্যাকটিশ শুরু করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি রয়েল কলেজ অফ সার্জেনস থেকে ডিপ্লোমা অর্জন করেন।

১৮৮৫ সালে বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র হলেন বাঙালী মহিলা গ্র্যাজুয়েট। তথ্যের অপ্রতুলতার দরুণ বিধুমুখীর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। তবে চিকিৎসক হিসাবে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করে তার প্রমাণ স্বরূপ সুরেশ চন্দ্র সমাজপতির ১৮৯৮ সালে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠি থেকে জানতে পারি। সেখানে সুরেশবাবু বিধুমুখীর চিকিৎসায় তার স্ত্রীর আরোগ্যলাভের কথা ব্যক্ত করেছেন। ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র সম্পর্কেও তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে আলোচনার ক্ষেত্র সীমিত। বামাবোধিনী পত্রিকা এবং গোলাম মুরশিদের গ্রন্থ থেকে জানা যায় তিনি ১৮৮৯ সালে এম.বি পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন এবং ভাগলপুরের জেনানা হাসপাতালে কাজ নিয়ে চলে গেলেও অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে এসে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করবেন স্থির করেন। এরপর তার বিবাহ হয় এবং সমসাময়িক সূত্র থেকে জানা যায় এরপর তিনি প্র্যাকটিশ ছেড়ে দেন অর্থাৎ তাঁর স্বাধীন জীবনের অবসান ঘটছে এখানেই।

এরপর ১৮৯০-১৯০০ মধ্যে দেখা যায় ১৮৯১ সালে বিন্দুবাসিনী এম.বি পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হন। পারিবারিক সূত্র থেকে জানা যায় তিনিও বিধুমুখীর মতোই সফল চিকিৎসক ছিলেন। এরপর যামিনী সেন ১৮৯৭ সালে এল.এম.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চণ্ডীচরণ সেন যদিও তাঁর মেয়েদের সুশিক্ষার জন্য কার্পণ্য করেননি কিন্তু শেষ পর্যন্ত যামিনীর দৃঢ় প্রত্যয়, স্ত্রীর পরোক্ষ সমর্থন এবং বন্ধু দুর্গামোহন বাবুর অনুমোদনের ফলে তিনি মেডিক্যাল পড়তে ভর্তি হন। তিনিই প্রথম মহিলা যিনি ১৮৯৭ সালে এল.এম.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং চাকরি নিয়ে সোলাপুরে যাত্রা করেন। এরপর কাঠমান্ডু নারী হাসপাতালের দায়িত্ব নেন, এবং সারা জীবন বিভিন্ন হাসপাতালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির Surgeons এবং Physicians এব ডিগ্রি পান এবং লন্ডনের ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে Public Health ডিপ্লোমা পান। কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে ফলে ১৯২৯ সালে তিনি অবসর নিতে বাধ্য হন এবং নীরবে দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করে ১৯৩২ এর ২১ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন।

কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের পাশাপাশি মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষাও এখানে দীর্ঘদিন ধরেই দেওয়া শুরু হয় এবং মহিলাদের মেডিক্যাল পড়ার আগ্রহ বাড়তে থাকায় ১৮৮৭ সালে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে মেয়েদের শিক্ষাদান শুরু হয়। ১৮৯১ সালে ছাত্রীদের প্রথম ব্যাচ পাশ করেন। যাদের মধ্যে জাদুমণি দেবী ও শশীমুখী নাগ এল. এম. পি. এবং এইচ. এ ডিগ্রী পান মিস সি. বাস্তিন, মিস বি. কে. গুপ্ত, মিসেস কিরণশশী চক্রবর্তী, মিসেস এস. কে. মিত্র ও হেমাঙ্গিনী দেবী। ১৯০১ সালে "সূতিকা চিকিৎসা" নামক বইটি হেমাঙ্গিনী দেবীর লেখা। এটি ছিল প্রথম মহিলা ডাক্তারদের মধ্যে লিখিত গ্রন্থ।

ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে সেরা ছাত্রী ছিলেন হৈমবতী সেন। বিশেষ পারদর্শীতার জন্য দুটি মেডেল পান এবং তিনি চুঁচুড়ায় চিকিৎসা করতেন। ১৮৯২ সালে প্রিয়বালা গুহ, পুষ্পময়ী সরকার, রাজলক্ষ্মী দেবী পাশ করেন এবং নিজেদের কর্মক্ষেত্র খুঁজে নেন। বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে জানা যায় ১৮৯৬ সালে আসমত লতিফুন্নেসা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পরে কোন মেডিক্যাল লিষ্টে তার নাম পাওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি প্র্যাকটিশ করতেন না। ১৮৯৬-৯৭ সালে প্রমোদিনী সরকার, জ্ঞানদানন্দিনী, আরনাকালী দেবী, কে. কে বন্দ্যোপাধ্যায়, আমোলিয়া ভুঁইয়া, রোজ ডায়াস পাশ করেন। বিন্ধবাসিনী ফ্রান্সিস দত্ত ও হেমপ্রভা মজুমদার ছাড়া বাকি সকলেই নানা জায়গায় চাকরি করতেন। ১৮৯৮ সালে প্রবসবালা পাল, হেমাঙ্গিনী মজুমদার, বিদ্যুৎপ্রভা মল্লিক ক্যাম্পবেল থেকে পাশ করে কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হন। এরপর উনিশ শতকে তেমন কোন বঙ্গমহিলা সম্ভবত মেডিক্যাল পড়তে আসেন নি।

ঊনবিংশ শতকের সমাজ ও সংস্কার ভাবনার কেন্দ্রস্থলে ছিল বাঙালী নারী। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা, সতীদাহ কবলিত বঙ্গমহিলাদের সামাজিক অবস্থানের উন্নতিসাধনের প্রয়োজনেই পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী সচেতন হয়ে ওঠে এবং তাদের শিক্ষিত

করে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ভারতের মত সংস্কারাচ্ছন্ন দেশে মহিলা ডাক্তারদের প্রচন্ড চাহিদা ছিল। কারণ মহিলাদের সঙ্কোচবোধ এবং অন্দরের আব্রু নষ্ট হবার আশঙ্কায় পুরুষ চিকিৎসকদের অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার ছিল না। ফলে মহিলাদের অন্তঃপুর চিকিৎসার উপর নির্ভর করতে হত। অথচ এইসব ঔষধদাত্রী মহিলারা ছিলেন সমাজের জল অচল। ফলে দীর্ঘদিন মহিলা চিকিৎসকেরা তাদের প্রাপ্য সম্মান পান নি। এমন কি আজও সমাজে মহিলা ডাক্তারদের "লেডিডাক্তার" বলা হয়। যেন তিনি এক "ভিনগ্রহের বাসিন্দা" এক অন্য শ্রেণী। তার মুখ্য পরিচয় একজন মানুষ বা একজন ডাক্তার হিসাবে নয়, মহিলা চিকিৎসক হিসাবে।

চতুর্থ মহিলা ডাক্তার যামিনী সেনের জীবনচরিত থেকে জানা যায় চিকিৎসক হিসাবে মহিলারা কতটা বঞ্চনার শিকার হতেন। একদিকে চিরায়ত ধারণা অনুযায়ী মহিলা বলে তারা পুরুষ প্রতিযোগীদের তুলনায় হীন ও কম যোগ্যতাসম্পন্ন এই মনোভাব যেমন জনমানসে ছিল তেমনি নেটিভ বলেও তারা ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার হত। তারা ইউরোপীয় মহিলাদের থেকে সুযোগ কম পেত। মহিলাদের জন্য আসন শ্রেণীকক্ষে সংরক্ষিত থাকত। হাউস স্টাফ হিসাবে কাজ করার সুযোগ ছিল না। ছেলেরা তাদের সঙ্গে কথা বলত না। তবে ধীরে ধীরে এই আড়ষ্টতা কাটতে থাকে। ছেলেবা বই ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করতেন। আবার একমাত্র কাদম্বিনী ছাড়া অন্য সকলেই প্রায় অবিবাহিত নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়েছেন এবং অন্যদিকে যারা বিবাহ করেছেন তারা অকালে কর্মজগত থেকে বিদায় নিচ্ছেন এমনকি ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র তার মেয়েদের ইচ্ছা সত্ত্বেও মেডিক্যাল পড়াতে চাইছেন না। অর্থাৎ বিবাহিত জীবন ও কর্মজীবনের মধ্যে দেখা দিচ্ছে দ্বন্দ্ব।

পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজ পেশাতে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠছে এবং পারিবারিক নানা বাধা। ফলে মহিলারা তাদের পেশার প্রতি একশো শতাংশ মনোযোগী হতে পারছেন না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তারা চাকুরি ছেড়ে গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে যান। আর যারা নিজ পেশার প্রতি নিষ্ঠাবান তাদের জন্য অপেক্ষা করে এক নিঃসঙ্গ জীবন যার ধারা বর্তমানেও অব্যাহত। তাই মেয়েরা আজও খোঁজেন নন ক্লিনিক্যাল চাকরি। তবে কিছুই থেমে থাকছে না, বাধাও কমছে, সম্মানও বাড়ছে। এটাই পরিবর্তন, এটাই আশার কথা।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। মহিলা ডাক্তার : ভিনগ্রহের বাসিন্দা, চিত্রা দেব (আনন্দ পাবলিশার্স - ১৯৯৪, পৃষ্ঠা -১৮।

২। উনিশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষিতে বাঙালী মহিলা চিকিৎসক — সোমা বিশ্বাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত গবেষণা নিবন্ধ (১৯৯৫-৯৬), পৃষ্ঠা - ৪০।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪৬।

৪। মহিলা ডাক্তার : ভিনগ্রহের বাসিন্দা, চিত্রা দেব।

৫। উনিশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষিতে বাঙালী মহিলা চিকিৎসক — সোমা বিশ্বাস, পৃষ্ঠা — ২৪৪।

৬। অন্দরে অন্তরে : উনিশ শতকে বাঙালী মহিলা — সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, ১৯৯৫, কলকাতা।

৭। আকাদেমী পত্রিকা, ৮ম সংখ্যা।

৮। উনিশ শতকে দেশীয় ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চা — বিনয়ভূষণ রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫।

৯। পুরুষ সমাজে নারী — সমীরণ মজুমদার — স্বপ্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ — ১৯৯৫।

১০। আত্মচরিত — রাজনারায়ণ বসু।

১১। প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় — বাংলার নারী জাগরণ, কলকাতা, ১৩৫২।

তামিলনাড়ুতে স্ত্রী ও সাংবাদিকতা - ১৯০০-১৯৪৭

সুমিতা দাস

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আমাদের দেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমশ মহিলাদের অংশগ্রহণ শুরু হয়। তারা ছিলেন আধিকাংশই অভিজাত মহিলাবর্গ যারা প্রথমে কন্যাসন্তান হত্যা সতীদাহ এবং বাল্য বিবাহ রোধের জন্য কাজ করেন। তারা বিধবাদের পূনর্বিবাহে সম্মতিদানকারী আইনগুলি সমর্থন করেন এবং নারীশিক্ষা ও নারী কল্যাণ কর্মসূচীগুলির অগ্রগতিব জন্য সংগ্রাম করেন। এভাবে অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এই সংগঠনগুলির অন্যতম প্রধান কাজ ছিল লেখার মাধ্যমে তাদের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করা। সমগ্র ভারতেই এই কাজ চলছিল এবং দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুতে এর কোন ব্যতিক্রম ছিল না। এই প্রবন্ধে তামিলনাড়ুতে প্রচারিত বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রত্রিকা, সাময়িকী এবং সংবাদপত্রের কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাবকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাছাড়া এতে কিছু উল্লেখযোগ্য মহিলা ব্যক্তিত্বের অবদান বিবৃত করা হয়েছে যারা প্রকাশনা মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তামিলনাড়ুতে নিজেদের অবদান রেখেছেন।

তামিলনাড়ুতে সাময়িকী পত্রিকা এবং সংবাদপত্র

১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উইলিয়াম বোল্টস নামক জনৈক কর্মচারীর একটি সংবাদপত্র প্রকাশের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ছিল ভারত মুদ্রণ যুগের জন্মের প্রথম দিকের প্রচেষ্টা। পরবর্তী বছরগুলিতে ব্রিটিশরা ভারতে কোন সংবাদপত্র বা সাময়িকী প্রকাশে উৎসাহ দেয়নি ক্রমশ বছর গড়াবার সাথে সাথে সেন্সরশিপ অফ দ্য প্রেস অ্যাক্ট ১৭৯৯, লিটারেসী রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৮২৩, লিবারেশন অফ দ্য ইন্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট ১৮৩৫, লাইসেন্সিং অফ প্রেস অ্যাক্ট ১৮৫৭, দ্য রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬৭, দ্য ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট ১৮৭৮ এবং দ্য নিউজপেপার অ্যাক্ট ১৯০৮[১] এর মতন কিছু আইন ভারতে সাময়িকী, পুস্তিকা, পত্রিকা এবং সংবাদপত্রের প্রকাশনার পূর্ণ সংস্কার ভিত্তি স্থাপন করে। প্রথমে ইংরাজী এবং বেঙ্গলী, তামিল, তেলুগু, মালায়ালম, গুজরাটী এবং হিন্দীর মতন কিছু দেশীয় ভাষা ছিল সারা ভারতে প্রকাশনার মাধ্যম। তামিলনাড়ুতে, যা তৎকালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তামিল তেলেগু এবং মালায়ালাম প্রকাশনা হয়। তামিল কিছু প্রকাশনা ছিল তামিলনাড়ু, ইন্ডিয়া ধনবানিকল, মাধার মিত্র , মাদার মনোরঞ্জনী, চিন্তামণী এবং নাভামণি। তেলুগুতে ভারতী ও গৃহলক্ষ্মী এবং মালায়ালাম 'দ্য মহিলা' ও মাদ্রাজে প্রকাশিত হত। এছাড়াও তামিলনাড়ুর অধিবাসীরা অন্য অঞ্চল থেকে

তামিলনাড়ুতে আসা ও প্রচারিত আরও অনেক সংবাদপত্র ও পত্রিকার থেকেও তথ্য সঞ্চয় করত। এগুলিকে রাজনৈতিক, সামাজিক, মহিলা পত্রিকা, শিশু পত্রিকা, চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্রিকা, ধর্মীয় পত্রিকা ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে কয়েকটি যেমন 'নিউ ইন্ডিয়া', 'পিউপিল', সারভ্যান্ট অফ ইন্ডিয়া, দ্য হিন্দু, হায়দ্রাবাদ, হেরাল্ড ছিল দৈনিক পত্রিকা। ইলাসট্রেটেড উইকলি এবং 'ম্যাড্রাস মেল উইকলি' ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট', 'দ্য ম্যাড্রাস জার্নাল অফ কো অপারেশন' ছিল সরকারি প্রকাশনা ঃ চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রকাশনা ছিল 'মেডিক্যাল প্রাকটিশনার্স এবং 'দ্য নার্সিং জার্নাল অফ ইন্ডিয়া।' বিপ্লবে অনুপ্রেরণাকারী পত্রিকা যারা সামাজিক সংস্কারে বেশি গুরুত্ব দিত, ছিল 'দ্য ইন্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মস', 'ধ্যানোদয়', 'ইয়ার্স ইন্ডিয়া', 'হিন্দী প্রচারকম থিওসফিষ্ট', 'হারমনিষ্ট', হিউম্যানিষ্ট,' 'খাদি পত্রিকা', 'ওয়েলথ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার এবং মর্ডাণ রিভিউ। মহিলা ও শিশুদের বিষয়ের ওপর লেখা পত্রিকাগুলি ছিল 'বুলেটিন অফ দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া', 'দ্য ইন্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিনস্' 'উয়োমেন্স আউটলুক', 'চিলড্রেন্স নিউজ', 'দ্য ইয়াং বিল্ডার', 'প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিন', 'প্রবুদ্ধ ভারত', 'দা কিংডম কাম', 'ত্রিবেণী', 'দ্য সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া'। ধর্মীয় গ্রন্থ যেমন 'দ্য হিন্দু থিয়োলজিক্যাল ম্যাগাজিন', 'দ্য কাথলিক সিটিজেন', 'স্টার বুলেটিন', 'লংজিভিটি', 'সি'.এস.এস. রিভিউ, 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড।' এগুলো হল সেই সময়ে তামিলনাড়ুতে প্রচারিত স্থানীয়ভাবে ছাপা সাময়িকী, পত্রিকা এবং সংবাদপত্রের মধ্যে কিছু।

কিছু বিদেশ ছাপা প্রকাশনা ও প্রচারিত ছিল, যেমন 'ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট', 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল উয়োমেন্স রিভিউ', 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল রের্কড', 'উয়োমেন্স ইন্টারন্যাশনাল লীগ', 'প্যাকস ইন্টারন্যাশনাল।' 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল উয়োমেন্স নিউজ'। বুলেটিন (ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ উয়োমেন, লন্ডন), 'ইক্যুয়াল রাইটস', 'সায়েন্স অফ থট রিভিউ', 'বুলেটিন অফ প্যান প্যাসিফিক ইউনিয়ন', 'লাইফ অ্যান্ড লেবার বুলেটিন', 'দ্য ওপেন ডোর', 'দ্য ডন', 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া', 'দ্য ইন্ডিয়ান নিউজ', 'ভোট', 'হাউজ আন্ড কানট্রি', 'আকবর হোয়াইট রিবন', 'লাইফ অ্যান্ড ফেইথ', 'ইজিপসিয়ান', 'পুলিস উয়োমেনস্ রিভিউ', মর‍্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল হাইজিন', 'দ্য শীল্ড', 'প্রবুদ্ধ স্ত্রী', 'উয়োমেন্স ম্যাগাজিনস চায়না অ্যান্ড জাপান', 'অ্যামেরিকান ইস্যু', 'হেলথ অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন', 'বার্থ কন্ট্রোল রিভিউ', 'মাইম্যাগাজিন এন্ড ফ্রেঞ্চ ম্যাগাজিনস্' এবং 'জার্মান ম্যাগাজিনস'।

তামিলনাড়ুতে সাংবাদিকতা এবং তার প্রভাব

ম্যাড্রাসের আডেয়ারে ১৯১৭ সালের ৮ই মে 'স্ত্রী-ধর্ম' নামে উয়োমেন্স ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের (W.I.A) একটি সরকারি মাসিক সাময়িক পত্র শুরু হয়। এই

সাময়িকপত্রটি যা ভারতে প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি প্রকাশ করত — মহিলাদের উপর প্রভাব ফেলেছিল। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ গোড়ে তোলার কাজে সাহায্য করা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পত্রিকাটি গুরুত্ব দেয়, মহিলাদের আইন পরিষদ (Legislative councils) ও পুরসভাতে ভোটের অধিকার প্রসঙ্গে, তারা দাবি করে যে বিভিন্ন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নির্বাচিত হবার অধিকার মহিলাদের আছে। এই পত্রিকাতে শিক্ষা, আত্মোন্নতি ও অন্যান্য সেবা প্রকাশের ওপর আলোকপাত করা হয়। ১লা এপ্রিল ১৯২১ তে ম্যাড্রাস সরকার, 'ম্যাড্রাস ইলেটোরাল সেক্স ডিস্‌কোয়ালিফিকেশান রিমুভ্যাল রেগুলেশান' পাশ করে এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এই আইনে বলা হয়, কোনো মহিলাকে ম্যাড্রাস আইন পরিষদে নির্বাচিত হওয়া থেকে শুধু মাত্র লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে প্রতিরোধ করা যাবে না।[৩]

তামিলনাডুতে নারী ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিকতা

এই কথা উল্লেখযোগ্য যে লেখিকারা তাঁদের সমকালীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আবহ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সামাজিক হিত সাধনে তাঁদের নিষ্ঠাকে প্রতিফলিত করে তাঁদের রচনা। তাঁরা মুদ্রণ যন্ত্রের মাধ্যমে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে নিজেদের চিন্তা ভাবনাকে প্রতিফলিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত, ডঃ এস. মুত্তুলক্ষ্মী বেড্ডি এবং শ্রীমতী ডরোথী জিন্না রাজাদাসা, শ্রীমতী আম্মু স্বামীনাথন, শ্রীমতী মার্গারেট ই কাসন, শ্রীমতী এইচ.এন. দাদাবয়, শ্রীমতী ভাই. মো. কোদাইনায়গী ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য।

তামিলনাডুতে ইউরোপীয়ান মহিলা সাংবাদিক

একথা বললে ভুল হবে না যে, দক্ষিণ ভারতে ইউরোপীয়ান মহিলারাই প্রথম ভারতীয় মহিলাদের তাঁদের রচনা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। এখানে শ্রীমতী মার্গারেট কাজিন এবং শ্রীমতী ডরোথী জিন্নারাজাদাসা এই দুইজন থিওসোফিক্যাল সোসাইটির সদস্যদের নিস্বার্থ সেবার উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের নেতৃত্বে ১৯২৬ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত ৮০টি শাখা স্থাপিত হয়। যার সদস্য সংখ্যা ৪০০০ এর উপর বৃদ্ধি পায়। তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মহিলাদের একত্র করে একটা পারস্পরিক সৌহার্দ্যের সম্পর্ক তৈরি করা। সঙ্গীতজ্ঞ পিতা মাতার সন্তান শ্রীমতী মার্গারেট ই কাজিন জাতিতে আইরিস ছিলেন। ফিওসফির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, তিনি তাঁর স্বামী সিগনার মিচেল এসপোসিটোর সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন ডঃ বেশান্তের সাহায্যার্থে, যিনি তখন হোমরুল আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি লিঙ্গ বৈষম্য মূলক সমস্ত আচরণের প্রতিবাদ করতে থাকেন এবং নারী পুরুষের সমান অধিকারের জন্য লড়াই শুরু করেন। তিনি "the casue of purifiying the world through of free power of womanhood" এই আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গীকৃত করেন, তাঁর ছয় আদর্শ শ্রীমতী হীরাবাই টাটার মত

অনেক অভিজাত মহিলাদের প্রভাবিত করে, যা ভারত সরকারকে আইন পরিবর্তন করতে বাধ্য করে এবং ফলস্বরূপ মহিলারা প্রাদেশিক আইনসভাতে বসার অধিকার লাভ করেন ১৯২৬ এর এপ্রিলে এর আগে ১৯২২ সালে ভারত সরকার পুরসভাতে আঞ্চলিক প্রশাসনিক কেন্দ্রে মহিলাদের মনোনীত করার আইন পাশ করে।[৪]

তাঁর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ".....amongst the higher carter is the custom of early marriage. That custom with its banehil progenly of the dowry system and seven lakhs of child widows of the present moment and infant mortality and immature motherhood mortality and cruelties beyond expression MUST GO. It is a cranker of the heart of Indian social life...." স্ত্রী জাতির শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য তাঁর এই সুগভীর চিন্তা ভাবনা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী।[৫] শ্রীমতী ডরোথী জিন্নারাজাদাসা জন্ম গ্রহণ করেন শ্রীলঙ্কার কলোম্বোতে ১৮৭৫ সালে। তিনি নারীর মৌলিক অধিকার, স্বাস্থ্য পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা সম্পর্কে সাহসিকতার সঙ্গে বক্তব্য প্রকাশ করেন। 'স্ত্রী ধর্ম' পত্রিকার মুখ্য সম্পাদিকা হিসাবে তাঁর অবদান সত্যই প্রশংসনীয়। তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাংবাদিকতাব মাধ্যমে নারীদের উন্নতি বিধানের জন্য কাজ করে যান। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫৩ সালে।[৬]

তামিলনাড়ুতে স্বতন্ত্র আঞ্চলিক মহিলা সাংবাদিক

ডঃ মুত্তুলক্ষ্মী রেড্ডি — এই আধুনিক মনস্ক মানুষটি ছিলেন ম্যাড্রাস মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ছাত্রী। তিনি তাঁর বচনার মাধ্যমে মহিলাদের উন্নতির কথা প্রচার করেন। ডঃ অ্যানি বেশান্তের পর তিনি WIA এর সভানেতৃ হয়ে এবং স্ত্রী-ধর্ম পত্রিকার কার্যভার গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার স্থাপন করার জন্য তিনি প্রত্যক্ষ নারী আন্দোলনে যোগদান করেন। India Act. এর খসড়া তৈরি করার শেষ সময়ে Linlithgow কমিটিতে শ্রীমতী রেড্ডির সঙ্গে অল্ ইন্ডিয়া উওমেন কনফারেন্স এর কুমারী অমৃত কাউর এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ উওমেন এর বেগম হামিদ আলী অংশগ্রহণ করেন। Lintithgow কমিটিতে বলা হয়, ভারতীয় মহিলারা যতক্ষণ না শিক্ষিত নাগরিক হয়ে উঠবেন, ততক্ষণ তাদের কর্মিত ক্ষমতা পাওয়া সম্ভব হয়। এইভাবে নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তার সঙ্গে মহিলাদের তাদের গন্ডী থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক প্রগতির অংশীদার হতে উৎসাহিত করা হয়। শ্রীমতী রেড্ডি সর্বদা তাঁর রচনার মাধ্যমে শিশুনারীদের উন্নতি, নারীশিক্ষা, নারীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও মহিলাদের ভোটের অধিকার প্রসঙ্গে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন।

শ্রীমতী আম্মু স্বামীনাথন :

শ্রীমতী আম্মু স্বামীনাথন মালাবারে ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাড়িতেই শিক্ষালাভ করেন। তিরিশের দশকে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন। এবং স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি WIA এর সদস্য হিসাবে তাঁর কর্মজীবন

শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি ঐ সংস্থার উপসভানেত্রী থেকে সভানেতৃ পদে উন্নীত হন। 'স্ত্রী ধর্ম', পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সঙ্গে তিনি সেই সময় যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচনাই তাঁকে রাজনৈতিক চিত্রে অত্যন্ত উজ্জ্বল করে তোলে এবং তার ফল স্বরূপ ১৯৪৬ তে আয়োজিত Constituent Assembly-তে তাঁর মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পান; যেখানে তিনি ১৪ জন মহিলা সদস্যব অনাতমা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ম্যাড্রাসের শ্রীমতী সুঃসগামি ভেলাইউদম এবং দুর্গাবাই।" ভারতীয় এবং ব্রিটিশদেব বিরোধ সত্ত্বেও তাঁরা সেখানেই নারীদের আইনগত বিশেষ অধিকার আদায় করতে সক্ষম হন।

শ্রীমতী ভাই. মু. কোদাইনায়গী

মহিলাদের পত্রিকার বিষয়বস্তু সব সময় রান্না, সূচী শিল্প, সৌন্দর্য রক্ষাব টুকিটাকি, জ্যোতিষ। হাতের কাজ হয়ে থাকে পাঠকের আকর্ষণ বাড়াবার জন্য। কিন্তু 'জগনমোহিণী' পত্রিকাটি এই ব্যাপারে স্বাতন্ত্র দাবি করতে পারে। যার সম্পাদিকা ছিলেন প্রগতিশীল শক্তিশালী নারী শ্রীমতী ভাই. মু. কোদাইনায়গী, ভাই মু, কো নামেই অধিক বিখ্যাত ছিলেন। জন্মে ছিলেন ১৯০১এ ৫ বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল। তাঁর ভাবতেও অবাক লাগে, যে তিনি ৩৫ বছর একটানা জগনমোহিণী পত্রিকা চালিয়েছিলো। যদিও কোন দিন তিনি বিদ্যালয়ের মুখ দেখেননি। ধনী পরিবারের থেকে এসে তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে রেশমি শাড়ি ছেড়ে খদ্দর ব্যবহার করতে শুরু করেন। তার পত্রিকার মুখ্য বিষয় ছিল সম্পত্তিতে নারীর অধিকার, স্ত্রী ধন, বিবাহ সম্পর্কিত আইন ইত্যাদি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী জানামাল, শ্রীমতী বসুমতী রামস্বামী, শ্রীমতী এস্ অম্বুজামবাল। তাঁরা তাঁদের লেখার সাহায্যে অস্পৃশ্যতা, বাল্য বিবাহ এবং নারী শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনমত গড়ে তোলেন। এই পত্রিকা দেশের সর্বত্র এবং বিদেশেও প্রচার করা হত। এমনকি ভারত সরকার এই পত্রিকা জেলের বন্দীদের মধ্যে এবং সৈনিকের মধ্যে বিতরণ করতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে তিনি মহিলা সাংবাদিকতাকে একটি গৌরবপূর্ণ স্থানে উন্নীত করেন; তিনি প্রায় ১১৫টি উপন্যাস লিখেছেন, সামাজিক ও নারী বিষয়ক।

উপসংহার

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত মহিলা লেখিকারা বিদেশী শক্তির কবল মুক্ত হওয়ার পথে পথ প্রদর্শকের কাজ করেছেন। তাদের নিষ্ঠাবান সেবা এবং উদ্যম মুদ্রণযন্ত্রের মাধ্যম দিয়ে শিক্ষিত নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই নতুন প্রযুক্তিগত উন্নতি তাঁদের উৎসাহিত করেছে। নারী স্বাধীনতা নারীর আইনগত অধিকার, স্বাস্থ্য সচেতনতা উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করাতে এবং সতী, পণপ্রথা, শিশু কন্যা হত্যা প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং স্ত্রী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহ প্রচার করতে। আসলে পরবর্তীকালে নারী আন্দোলনের পথকে সুগম করেছে এই মাধ্যম। তামিলনাড়ুতে আজ মহিলারা যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত এটি তাঁদেরই উদ্যোগের

ফল।[৪]

সূত্র নির্দেশ :—

১. B.H. Grover & S. Grover "A new look at Modern Indian History", S. Chand, New Delhi 1995, pp. 356-360.

২। 'Stri Dharma', List of Magazines & papers on exchange with SD, June, 1932, p. 416.

৩। G.O. No. 108, Law (Legislative) Department, Government of Madras, 10-5-1921.

৪। V. Rajalakshmi, 'The Political Behavious of Women in Tamil Nadu', (New Delhi, Inter-India Publications, 1985) p. 43.

৫। Margaret E. Cousin & B. Mus, 'The Womens' Movement in India Today' Oct. 1926, p. 182.

৬. G. Venkatachalam, 'My Contempories', Fellow Lalit Kala Academic,Hosali Press, Mahatma Gandhi Road, Bangalore, 1928.

৭। Raj Kumar, Rameshwar Devi, Romila Purthi, Ed., "Women and the Indian Freedom Struggle" Vol-II, Jaipur Pointer Publisher, 1998, p. 34.

৮। Mrs. Vasanthi, 'Kanamal Pona Padhivukal' in India Today (Tamil Version), December 26, 2001, p. 41.

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে 'নারী-প্রগতি' সম্পর্কে সারদামণি দেবী ও গৌরীমাতার চিন্তাভাবনা

সারদা ঘোষ

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাস আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে একাধিক পটপরিবর্তনের সাক্ষী। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির উপস্থিতি এইপর্বে আরো দৃঢ় হয় এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুই ভিন্ন সংস্কৃতির উপস্থিতি একাধিক সমাজকে পরিবর্তনের সূচনা করে। ব্রাহ্মসমাজ ও ডিরোজিওর নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী সামাজিক সংস্কাবের লক্ষ্যে মূর্তিপূজা, বহুবিবাহপ্রথা, সতীদাহ পুরোহিততন্ত্রেব মত সামাজিক কুসংস্কার গুলির মূলে কুঠারাঘাত করে।[১] এজন্য তাঁরা পাশ্চাত্যের 'যুক্তিবাদী' চেতনাকে ভারতীয় সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থায় সামিল করতে চান। এছাড়াও অপর এক সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটে এই শতাব্দীতে যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল ভারতের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় ও দার্শনিক চেতনাকে পাশ্চাত্যের দর্শনের সঙ্গে সম্মিলিত করা। এই চেতনার প্রবক্তাদের মূললক্ষ্য ছিল সামাজিক অবস্থার ক্রমিক পরিবর্তন। এঁরা ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা, রামকৃষ্ণ পরমহংসের চিন্তাধারা ও বিবেকানন্দের বক্তব্যের মধ্যে এর প্রতিফলন মেলে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে ভারতের সামাজিক বিকাশের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। তাঁর কাছে নারীদের উন্নতি ও সমাজসংস্কারের ধারণা নিছক পাশ্চাত্যের অনুকরণের পরিবর্তে ভারতের অর্ন্তনিহিত আধ্যাত্ম চিন্তা ও দর্শনের মধ্যে নিহিত ছিল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা এই রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলনেরই এক প্রাতিষ্ঠানিক অভিব্যক্তি বলা চলে। এই সংগঠন রামকৃষ্ণের পুরুষ শিষ্যদের উদ্যোগে গঠিত হলেও তাঁর বিধবাপত্নী সারদাদেবী এই প্রাতিষ্ঠানিক আন্দোলনের এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা বলে বিবেচিত হতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও সারদাদেবীর নির্দেশনা ও নেতৃত্বে সর্বপ্রথমে এক মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন, যদিও তা তাঁর জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত হয়নি।

আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও সারদা দেবী মহিলাদের সমস্যা, তার প্রতিকার ও তদানীন্তন সামাজিক ও আর্থিক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে পুঁথিগত শিক্ষা তিনি প্রায় লড়াই করেননি। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের (পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ পরমহংস) সঙ্গে বিবাহের পর তিনি প্রায় আঠারো বৎসর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর স্বামীর কাছে আসেন

এবং তাঁর চিন্তাধারা ও আদর্শের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান গ্রহীতায় পবিণত হন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি 'শ্রীশ্রী মা' নামে পরিচিত হন। তিনি সামাজিক সংস্কারের পরিকল্পনার সাথে আধ্যাত্মিক আত্মানুসন্ধান ও উপলব্ধির ধারণাকে সংমিশ্রিত করার পক্ষপাতী ছিলেন।

সাবদা দেবী নারীশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজপন্থী ও ডিবোজিওপন্থী এবং মিশনারি উদ্যোগ সত্ত্বেও উনবিংশ শতকের শেষ পর্বেও নারীশিক্ষার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়।[২] সারদাদেবী মনে করতেন 'উপযুক্ত' পুঁথিগত ও উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণ গ্রামীণ মহিলাদের সম্মানীয় পন্থায় অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দেবে। তিনি স্বয়ং তাঁব পিতৃগৃহে চরকায় সূতা প্রস্তুত করে পরিবারেব উপার্জনে সাহায্য করতেন। তিনি সারদেশ্বরী আশ্রম এবং নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ের মত মহিলা সংগঠনগুলিরও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথম সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণের মহিলা শিষ্যা গৌরীমাতা। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ব্যারাকপুব অঞ্চলে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ঐতিহ্যগত শিক্ষাব্যবস্থার অনুসাবী শিক্ষাদান করা, সমআদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা, 'সৎবংশজাত' দুঃস্থ বালিকা ও বিধবাদের আশ্রয়দান করা, সন্ন্যাসিনীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে সামাজিক বিকাশ ও নারীশিক্ষা বিস্তাবেব কাজে নিয়োজিত করা।

সাবদেশ্বরী আশ্রমের সূচনা হয কুঁড়েঘরের মধ্যে ও এর উদ্বোধন করেন সারদা দেবী। আশ্রমের নামকরণও হয় তাঁরই নামে। প্রাথমিকভাবে প্রায় পঁচিশজন বিবাহিত, অবিবাহিত ও বিধবা মহিলা এই আশ্রমে যোগদান করেন। স্থানীয় মহিলারা এখানে দ্বিপ্রাহরিক শিক্ষালাভ করত। সারদা দেবী গৌরীমাতার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও আশ্রমের উন্নতির জন্য তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার বিশেষ প্রশংসা কবতেন। তিনি আশ্রমবাসিনীদের গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজে দক্ষতা অর্জনের পরামর্শ দিতেন। তিনি বিমলা নামে এক আশ্রমবাসিনীকে এবং দুইজন পাঞ্জাবি বালিকাকে ভবিষ্যতে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের জন্য চিহ্নিত করেন। দুর্গাপুরী নামক এক বালিকাকে আশ্রমের ভবিষ্যৎ কর্ণধার হিসাবে তিনি বিশেষ প্রশিক্ষণদানের পরামর্শ দেন। গৌরীমাতা দুর্গাপুরীর জন্য সংস্কৃতভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব দিলেও বিবেকানন্দ ছিলেন ইংবেজি শিক্ষার পক্ষপাতী। শেষপর্যন্ত সারদাদেবীর উদ্যোগে দুর্গাপুরীর জন্য বিশেষ ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।[৩] গৌরীমাতার আশ্রম কলকাতায় স্থানান্তরিত হবার পর সারদা দেবী নতুন আশ্রমের উদ্বোধন করেন। তিনি নিয়মিত আশ্রমে যাতায়াত করতেন এবং মেধাবী ছাত্রীদের পুরস্কৃতও করতেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রায়ই পরিবারের মহিলাদের সারদেশ্বরী আশ্রমে ভর্তি করার জন্য বলতেন।[৪] প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা বক্ষার জন্য সারদা দেবী আশ্রম বালিকাদের অন্ততপক্ষে তিনবছর আশ্রমে থাকা বাধ্যতামূলক করেন। সারদা দেবীর উদ্যোগেই শ্যামবাজার অঞ্চলে আশ্রমের স্থায়ীভবন নির্মাণের উদ্যোগ গৃহীত হয় এবং আসাম-গৌরীপুরের রাণী সরোজবালা দেবী তাঁরই পরামর্শে এই আশ্রমে

আর্থিক সাহায্য দেন।

সারদা দেবী নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা নেন। মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল বা ভগিনী নিবেদিতা ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় তিনি ভারতের দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানুষ বিশেষত মহিলাদের জন্য সেবাব্রতে দীক্ষিত হন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারি তিনি সারদা দেবীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁব কাছে এই দিনটি ছিল 'জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিন'। কলকাতায় থাকাকালীন নিবেদিতা প্রায়ই সারদা দেবীর বাগবাজারের বাসস্থানে উপস্থিত হতেন। তাঁর জীবনাদর্শন উপলব্ধি করার জন্য। তাঁর কাছে সারদা দেবী ছিলেন ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ সভ্যতার এক মূর্ত প্রতীক এবং এক 'আদর্শ' নারী।[৫] নিবেদিতা ১৩ই নভেম্বর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজার বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটিরও উদ্বোধন করেন সারদা দেবী। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'যথার্থনারী'র উন্মেষের কথা বলেন।[৬] তিনি এই বিদ্যালয়েব শিক্ষণ পদ্ধতি এবং কারিগরী বিদ্যাচর্চাবও প্রশংসা করতেন।

সারদা দেবী মনে করতেন প্রতিটি বিবাহিত পুরুষ ও নরীর দুই বা তিনটি সন্তানের পর কঠোরভাবে পরিববার পরিকল্পনা করা উচিৎ।[৭] বিবাহিত মহিলাদের উপর শারীরিক অত্যাচারের তিনি কঠোরনিন্দা কবন।[৮] তিনি মহিলাদের সহনশীল হবার পরামর্শ দিলেও একথা মনে করতেন যে মহিলাদের উপর সামাজিক ও পারিবারিক নিপীড়ন বন্ধ না হলে মহিলারাও একদিন প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠবে। তিনি মনে করতেন প্রয়োজনীয় ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করা মহিলাদের পক্ষে আবশ্যক। বহির্জগৎ সম্পর্কে সচেতনতাও মহিলাদের আবশ্যিক গুণাবলী বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তবে তিনি মহিলাদের 'পরিবারের প্রতি কর্তব্যকে' অবহেলা করে আত্মকেন্দ্রিক হওয়াকে নিন্দনীয় বলে মনে করতেন। যে কোন মূল্যে সাফল্য অর্জন করার নীতি তাঁর দ্বারা সমর্থনীয় ছিল না। মহিলাদের সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিনি সরলতা, লজ্জাশীলতা, সেবাপরায়ণতা ও সহনশীলতার[৯] উল্লেখ করেন।

মহিলাদের প্রতি সারদা দেবীর মানসিকতার অপর প্রমাণ মেলে তথাকথিত সমাজের নিম্নবর্গীয় মহিলাদের সঙ্গে তাঁর আচরণের ক্ষেত্রে। তিনি পেশাদারী নাটকের কলাকুশীলব বিশেষত নিরদসুন্দরী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী প্রমুখের সঙ্গে যথেষ্ট সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতেন এবং তাদের সন্তানতুল্যজ্ঞান করতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও তারা যোগ দিত।

সারদা দেবী সামাজিক কুসংস্কার ও হিন্দুবিধবাদের পালনীয় আচার অনুষ্ঠানের কঠোরতার প্রতিও সমালোচনা মুখর ছিলেন। কলকাতায় বসবাসকালীন তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রতি জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে 'উদার' আচরণ করতেন। খ্রিস্টান মন্ত্র ও ধর্মোপদেশ

তাঁর পছন্দের বিষয় ছিল। বিবেকানন্দের খ্রিস্টান অনুগামীবা ছিলেন তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র।[১০] তিনি তাঁর হিন্দু ও মুসলিম অনুগামীদের মধ্যেও কোন বিভেদ করেননি।[১১]

তবে পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সারদা দেবী মহিলাদের শারীরিক শুচিতা ও ব্রহ্মচর্য পালনের উপরও গুরুত্ব দিতেন। তিনি মহিলাদের জন্য সামাজিক সেবামূলক কাজেও উৎসাহ দেন। সারদেশ্বরী আশ্রম ও নিবেদিতার বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার, প্লেগপীড়িত ব্যক্তিদের সেবা, দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র বিতরণের কাজে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করত।

সাবদা দেবীর চিন্তাধারা, নারীপ্রগতি সম্পর্কে তাঁর মতামত ও উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে ধারণা করা যায় তাঁর চিন্তাভাবনায় পাশ্চাত্যের অনুসরণে নারী প্রগতির বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। প্রচলিত পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যেই তিনি ভারতীয় মহিলাদের অবস্থার পরিবর্তন কামনা করেন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, নিরক্ষরতা প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথার প্রতি তিনি প্রতিবাদমুখর হলেও পুরুষদের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে নারীদের সমতুল্য অবস্থিতি ও অংশগ্রহণ তাঁর কাম্য ছিলনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালী যুবসমাজ যে সেবামূলক ও সামাজিক সংস্কারমূলক কার্যে বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়ে ওঠে তার প্রমাণ মেলে তাঁর পুরুষশিষ্যদের উদ্যোগে রামকৃষ্ণমিশন প্রতিষ্ঠা এবং নারীদের উপযোগী প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর নারী শিষ্যদের উদ্যোগের মাধ্যমে। এমনই এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন গৌরীমাতা, যিনি হিন্দু মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে নারী প্রগতির বিষয়টিকে প্রাধান্য দেন।

গৌরীমাতা বা মৃড়ানী চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয় কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে, সম্ভবত ১৮৫৭ খ্রিঃ[১২] তাঁর পিতা ছিলেন পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও মাতা ছিলেন গিরিবালা দেবী। শিক্ষিতা ও ধার্মিক মাতার সান্নিধ্যে মৃড়ানী শিশুকাল থেকেই ধর্ম সম্পর্কে গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন। তিনি মিস মারিয়া মিলম্যানের বালিকা বিদ্যালয়ে (ভবানীপুর) প্রাথমিক শিক্ষা নেন।[১৩] তিনি বিদ্যালয়ের খ্রিস্টানপন্থী ভাবধারার জন্য ঐ বিদ্যালয় ত্যাগ করেন ও এক হিন্দু পাঠশালায় যোগ দেন। তিনি চন্ডী, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে দক্ষতা অর্জন করেন। বিবাহের অনিচ্ছা মৃড়ানীকে একাধিকবার গৃহত্যাগে উৎসাহিত করে এবং শেষপর্যন্ত আঠারো বছর বয়সে তিনি হিমালয়ের অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর অত্যন্ত গৌর গাত্রবর্ণের জন্য তিনি গৌরীমাতা বলে পরিচিত হন। গুজরাট ভ্রমণ কালে তিনি সুদামা পুরীর বসন্তরোগাক্রান্ত মানুষের মধ্যে সেবামূলক কাজে যোগ দেন।[১৪] ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁর স্ত্রী সারদা দেবীর সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর সমাজসেবার ইচ্ছা বাস্তবরূপ লাভ করে। গৌরীমাতা কলকাতার মহিলাদেয় সঙ্গে এবং ব্রাহ্মমহিলাদের সভায় সেসময় নিয়মিতভাবে উপস্থিত

থাকতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসই তাঁকে কলকাতার মহিলাদের স্বার্থে সক্রিয় উদ্যোগ নেবার পরামর্শ দেন। পরবর্তীকালে সারদা দেবীও তাঁকে এবিষয়ে উৎসাহ দেন। অবশেষে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ব্যারাকপুরে গঙ্গার তীরে তিনি স্থাপন করেন সারদেশ্বরী আশ্রম।

প্রথমে আশ্রম শুরু হয় মাটির কুঁড়েঘরে এবং ব্যক্তিবিশেষ বা সংগঠনের স্বেচ্ছামূলক দানের ভিত্তিতেই আশ্রমের ব্যয় নির্বাহ হত। ছাত্রীদের থেকে কোন বেতন নেওয়া হতনা। প্রথমে প্রায় পঁচিশজন অবিবাহিত, বিবাহিতা ও বিধবা মহিলা আশ্রমে যোগ দেয়। স্থানীয় বালিকারাও শিক্ষাগ্রহণ করত। শিক্ষাদানের দায়িত্ব গৌরীমাতা স্বয়ং গ্রহণ করেন। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা ছিল এই আশ্রমের মূললক্ষ্য। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতায় এক মাতৃসভার আহ্বান করে হিন্দু মহিলাদের আদর্শ, আশ্রমের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সারদাচরণ মিত্র তাঁর পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পরিকল্পনার কথা গৌরীমাতাকে ইউরোপ ভ্রমণ করে প্রচার করতে বলেন, যা শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।[১৫]

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে গৌরীমাতা তাঁর আশ্রম স্থানান্তরিত করেন কলকাতার ২০নং গোয়াবাগান লেনে। এসময় সুরেন্দ্রনাথ সেন, জ্যোতিন্দ্রনাথ ঘোষাল, অধ্যাপক অনন্ত কুমার রায়, কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনন্দিনীদেবী, দুর্গাপুরীকে নিয়ে আশ্রমের কার্যনির্বাহী সভা গড়ে ওঠে। আশ্রমের অপর বিভাগ মাতৃসংঘও এসময় স্থাপিত হয়। প্রায় বারোজন আবাসিক মহিলা ও ষাটজন বহিরাগত মহিলা এসময় আশ্রম থেকে শিক্ষালাভ করত। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ আসাম গৌরীপুরের রাণী সরোজবালা দেবীর অর্থানুকুল্যে আশ্রমের স্থায়ী ভবনের নির্মাণকার্য শুরু হয়। পন্ডিত দক্ষিণারঞ্জন স্মৃতি তীর্থের জমিটি সারদা দেবীর সম্মতিক্রমে গৌরীমাতা ক্রয় করেন। এসময়ের মধ্যে আশ্রম ৯৭/৩, শ্যামবাজার স্ট্রীট, ৫৩/১, শ্যামবাজার স্ট্রীট, ৫-বি, রাধাকান্ত জিউ স্ট্রীট,৭/২, বিডন রো, কলকাতায় ১৯১৩-২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বারবার স্থানান্তরিত হয়।

গৌরীমাতা রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং সারদা দেবীকে তাঁর সমাজসেবার উদ্যোগের মূলে জীবন্ত অনুপ্রেরণা বলে মনে করতেন। গৌরীমাতার সাংগঠনিক দক্ষতা, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, নবীন আশ্রম সম্পর্কে মমত্ববোধ আশ্রম সম্পর্কে হিন্দু মহিলাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে এবং এক্ষেত্রে সারদা দেবীও যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করতেন। তাঁর পরামর্শ আশ্রমের ক্ষেত্রে 'সর্বশেষ সিদ্ধান্ত' বলে বিবেচিত হত। গৌরীমাতা আশ্রমের নতুন ভবনের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে উদ্বোধন পত্রিকা ও অমৃতবাজার পত্রিকায় ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন দিলেও ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে এবিষয়ে প্রচার মাধ্যমের দ্বারস্থ হতে হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী শিবানন্দ, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, সারদারঞ্জন রায় বিদ্যাবিনোদ, মহেন্দ্রলাল সরকার আশ্রমের জন্য অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানান[১৬] আশ্রমের প্রথম উপদেষ্টা কমিটি স্থাপিত হয় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে, যার সদস্যারা ছিলেন

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংহকা প্রমুখ। হিন্দু, শিক্ষিতা মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে ফোরাম। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যরা সকলেই ছিলেন ফোরামের সদস্যা। মাতৃসংঘের সদস্যরা ছিলেন আশ্রমবাসিনী এবং গৌরীমাতা ছিলেন আশ্রমের অধ্যক্ষা।

নতুন ভবন স্থাপনের পর প্রায় পঞ্চাশজন আবাসিক মহিলা ও প্রায় তিনশত জন বহিরাগত মহিলা আশ্রমের বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে থাকে। আশ্রমের নিজস্ব যানবাহন হিসাবে ছিল ঘোড়ার গাড়ি ও অর্থকরী বিষয় হিসাবে গোপালন করা হত। গৌরীমাতা অবশ্য ভারতীয় নারীদের মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক বিকাশকেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক আন্দোলনেব মূল উপজীব্য বলে চিহ্নিত করেন। তিনি মহিলাদের ভূমিকাকে গৃহস্থালির প্রয়োজন ও প্রজননের চাহিদার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। তিনি আশ্রম বালিকাদের জন্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ পছন্দ করতেন। এছাড়া উপযুক্ত পুঁথিগত ও কারিগরী ও অর্থকরী বিদ্যাচর্চাও তাঁর পরিকল্পনাভুক্ত ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন একজন শিক্ষিতা মাতাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দর, সুস্থ ও শিক্ষিত করে তুলতে পারে। তবে ঐহিক প্রয়োজনানুসারী শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবনাচিন্তার সম্মিলন সাধন ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। নিজ আশ্রমে তিনি বৈদিক সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটান। আশ্রমের শিক্ষাবিষয় গুলিকে এমনভাবে নির্ধারিত করা হয় যাতে 'যথার্থ মাতা' ও 'যথার্থ স্ত্রী' গড়ে উঠতে পারে। সংস্কৃত ভাষাচর্চার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। আশ্রমবালিকাদের হিন্দু পূজাপদ্ধতি, দীক্ষা, মন্ত্রোচ্চারণ ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। ছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ, খাদিবস্ত্র উৎপাদন, শাড়ি ও গামছা প্রস্তুতি প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা ছিল।

আশ্রমের সন্ন্যাসিনীদের জন্য গৌরীমাতা বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন তাদের আধ্যাত্মিক ধ্যান, পূজাঅর্চনা, সেবামূলক কার্যের জন্য উপযুক্ত করে তৈরি করা হত। মাতৃসংঘের সদস্যরা ছিলেন আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনী। গৌরীমাতা বিশ্বাস করতেন 'যথার্থ শিক্ষা' কখনোই প্রাচীন মূল্যবোধ ও রীতিনীতির বিরোধী হতে পারেনা তাঁর মতে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সেবার মধ্যে কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণের বিভেদ থাকা উচিৎ নয়।

গৌরীমাতা প্রাচীন ঐতিহ্য ও সামাজিক পরিকাঠমোর মধ্যেই মহিলাদের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 'যথার্থ মাতাও স্ত্রী' হিসাবে নারীচরিত্রের পুনর্গঠন, নারী ও পুরুষের সমতুল্য শিক্ষা, পশ্চিমী শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণ তাঁর কাম্য ছিল না। তিনি প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে মহিলাদের জন্য যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন তা আজও বিদ্যমান আছে এবং শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক ক্ষেত্রে তার কর্মপরিধি আজও ব্যাপ্ত আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে নারীপ্রগতির বিষয়টি সমাজ সংস্কারের প্রক্রিয়ায় এক

গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। দেশীয় স্তরে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজপন্থী, ডিরোজিওপন্থীদের সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় এক গোষ্ঠীরও উন্মেষ ঘটে যারা প্রাচীন সামাজিক ঐতিহ্য ও সমাজ কাঠামোর মধ্যে থেকেই নারীদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে প্রয়াসী ছিলেন। সারদা দেবী ও গৌরীমাতার উদ্যোগ যে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় তা শেষোক্ত সমাজ সংস্কারের প্রক্রিয়ার মধ্যেই সামিল ছিল। উনবিংশ শতকের শেষপর্বে সারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা সম্ভবত আধুনিক বাংলার ইতিহাসে মহিলাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আন্দোলনের প্রথম প্রয়াস বলা যায়। নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও নারীশিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এক বিশেষ উদ্যোগ ছিল, যা উনবিংশ শতাব্দীতে নারীপ্রগতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদের তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সতীদাহপ্রথা রোধে সক্রিয় ভূমিকা নেন। ইংরেজি শিক্ষাবিস্তার ও মহিলাদের পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার দেবার জন্য তিনি উদ্যোগী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের উল্লেখযোগ্য নেতারা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। কেশবচন্দ্র মহিলাদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম বিবাহ আইন প্রবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

নব্যবঙ্গ আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরী ভিভিয়ন ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)। তিনি পাশ্চাত্য যুক্তি ও উদারনীতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর শিষ্যরা পরিচিত ছিলেন ডিরোজিয়ান নামে। তাঁরা হিন্দু সামাজিক রীতি নীতি গুলি পুরাতনপন্থী অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। হিন্দু সভ্যতা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নেতিবাচক এবং প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনও ছিল তাঁদের কাম্য। নারী শিক্ষাবিস্তার, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার, বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা, সতীদাহপ্রথারোধ, বাল্যবিবাহপ্রথারোধ তাঁদের সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২। নারী শিক্ষা সম্পর্কে হান্টার কমিশনের রিপোর্ট, ১৮৮২।

৩। দুর্গাপুরী-সারদা রামকৃষ্ণ, সারদেশ্বরী আশ্রম কলকাতা, ১৯৬১।

৪। শিষ্যকে লেখা সারদা দেবীর পত্র, ১৯শে জানুয়ারি, ১৯১২।

৫। Sister Nivedita - The Master as I saw him, Calcutta, 1910.

৬। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা-ভগিনী নিবেদিতা, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলকাতা - ১৯৫৯।

৭। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ - সম্পাদিত - শ্রী শ্রী মায়ের পদপ্রান্তে (তৃতীয় খন্ড) উদ্বোধন, কলকাতা, ১৯৯৭।

৮। সম্ভবত ঃ ১৯১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পুলিস বাঁকুড়ার জুতুবিহার গ্রামের সিন্ধুবালাদেবীকে গ্রেপ্তার করায় সারদা দেবী তীব্র প্রতিবাদ করেন। — শ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন, কলকাতা, ১৯৮৯।

সারদা দেবী বাগবাজারের বস্তি অঞ্চলের এক ব্যক্তিকে নিজপত্নীর উপর অত্যাচার করার জন্য ভর্ৎসনা করেন — সারদা-রামকৃষ্ণ, দুর্গাপুরী সারদেশ্বরী আশ্রম, ১৯৬১।

৯। দুর্গাপুরী-সারদা-রামকৃষ্ণ, সারদেশ্বরী আশ্রম, কলকাতা, ১৯৬১।

১০। ভগিনী নিবেদিতা, ক্রিস্টিন প্রমুখ ছিলেন সারদা দেবীর বিশেষ প্রিয়পাত্রী।

১১। জয়রামবাটীর কুখ্যাত দস্যু আমজাদ ছিল সারদা দেবীর বিশেষ প্রিয়পাত্র—শ্রীমা সারদাদেবী; স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন, ১৯৮৯।

১২। গৌরীমাতার জীবনীকার দুর্গাপুরীর মতে গৌরীমাতার সঠিক জন্মতারিখ ও সাল সম্পর্কে কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর মাতার মত অনুসারে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে সপ্তম এডোয়ার্ডের ভারত সফরকালে মৃঢ়ানীর বয়স ছিল প্রায় আঠারো বছর-গৌরীমা; দুর্গাপুরী, সারদেশ্বরী আশ্রম, ১৯৩৯।

১৩। মিস ফ্রান্সিস মারিয়া মিলম্যান ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক রবার্ট মিলম্যানের ভগিনী। তিনি স্যার জন লরেন্সের আমলে ভারতে আসেন এবং ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে উচ্চবর্ণের হিন্দুবালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টির অধ্যক্ষ ছিলেন মিস হরফোর্ড এবং এটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দ্বারকানাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়।

১৪। দুর্গাপুরী - গৌরীমা, সারদেশ্বরী আশ্রম, কলকাতা, ১৯৩৯।

১৫। দুর্গাপুরী - গৌরীমা, সারদেশ্বরী আশ্রম, কলকাতা, ১৯৩৯।

১৬। দুর্গাপুরী - সারদা-রামকৃষ্ণ, সারদেশ্বরী আশ্রম, কলকাতা, ১৯৬১।

লক্ষ্মী সেহেগল
একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব

রত্না ঘোষ

১৯৪৩ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতির আহ্বান জানান তখন এটা স্পষ্ট হয় যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সশস্ত্র সংগ্রামে তিনি নারী পুরুষ নির্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলকেই এই আন্দোলনে যুক্ত করতে চান। সে কারণেই তাঁর গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজে পুরুষ বাহিনীর পাশাপাশি একটি নারী বাহিনীও ছিল। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর অমর কীর্তি স্মরণে নেতাজী এই নারী বাহিনীর নাম দেন ঝাঁসীর রাণী বাহিনী। এবং যাঁকে এই নারী বাহিনীর অধিনায়িকা নিযুক্ত করেন তাঁর নামও লক্ষ্মী — লক্ষ্মী স্বামীনাথন। নামের এই আপাত মিল যেন ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ। আবার নেতাজী লক্ষ্মীকে অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ সরকারে মহিলা সংগঠন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পদ দান করেন। এক কথায় বলা যায় আজাদ-হিন্দ-আন্দোলনে শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথন এক কিংবদন্তীতে পরিণত হন।

লক্ষ্মী স্বামীনাথন ছিলেন দক্ষিণ ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সম্পন্ন এক অভিজাত পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা ডঃ এস স্বামীনাথন পেশাগত দিক দিয়ে আইনজীবী হলেও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন সেবাব্রতী, তেজস্বী ও ন্যায়পরায়ণ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে কখনো দ্বিধা বোধ করতেন না। এ ছাড়া তিনি তাঁর স্ত্রীকে জনগণের কাজের মধ্যে যুক্ত হবার জন্য প্রেরণা দিতেন। বিশেষ করে সমাজ কল্যাণমূলক কাজে। যে সামাজিক সাহসিকতার বলে তাঁর বাবা গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে, বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যান এবং ছ' মাসের মধ্যে গবেষণা শেষ করে আড়াই বছরের বৃত্তি পাওয়ার সুবিধা পরিত্যাগ করে দেশে ফিরে আসেন, তাকে লক্ষ্মী তাঁর বিপ্লবী জীবনের আদর্শ মনে করেছেন।[১]

অপর দিকে তাঁর মাতা শ্রীমতী আম্মু স্বামীনাথন ছিলেন মাদ্রাজের মুন্সেফ পিরুপলি গোবিন্দ মেননের কন্যা। আম্মু স্বামীনাথনের প্রথাগত শিক্ষা খুব বেশি না থাকলেও বিবাহের পর তিনি স্বামীর কাছ থেকে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপরিক্রমা এবং বিভিন্ন সামাজিক সমিতিতে যুক্ত হয়ে পড়েন। গান্ধীজী, জওহরলাল নেহেরু, লালা লাজপত রাও, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁকে কাজে এগিয়ে যাবার জন্য প্রেরণা জুগিয়েছেন, তাঁর চিন্তাকে আদর্শ রূপ দেবার মূলে উদ্যোগী হয়েছেন। মাদ্রাজের সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনের জন্য গঠিত

কমিটির সদস্যাদের মধ্যে আম্মু স্বামীনাথন ছিলেন একজন। এছাড়া All India Women's Conference -এর আন্দোলনের গোড়ার দিকের একজন নেত্রী ছিলেন আম্মু স্বামীনাথন। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজ শহরের কংগ্রেস কার্য নির্বাহক কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ সালে দেশব্যাপী আন্দোলনের জোয়ারে তিনিও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে তিনি কিছুকাল কারাদন্ড ভোগ করেন। ১৯৪৫ সালে কেন্দ্রীয় রাজ্যসভা এবং পরবর্তী বছরে সংবিধান তৈরি কমিটির সদস্যা নির্বাচিত হন। স্বাধীনতালাভের পরও তিনি দেশের কাজে তাঁর কর্মধারাকে অব্যাহত রাখাবার চেষ্টা করেছেন। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৪৮ সালে তিনি ইথোওপিয়া ১৯৪৯ সালে জেনেভায় UNESCO সম্মেলনে এবং সেই বছরই কোপেন হেগেনের আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি লোকসভার সদস্যা ছিলেন। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্যা হিসাবে কাজ করেন।

শুধুমাত্র রাজনীতিতে নয়, তদানীন্তন সাংস্কৃতির জগতেও আম্মুর অবাধ বিচরণ ছিল। তিনি কিছু দিনের জন্য মাদ্রাজের আঞ্চলিক এবং কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেনসর বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত তিনি ভারত স্কাউট এন্ড গাইডস্-এর সভাপতি ছিলেন। ভারত স্কাউট এন্ড গাইড্স-এর সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মধ্যে বিশেষ করে নারী ও শিশুকল্যাণ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তাঁর চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল। ধর্মগত প্রথা এবং সামাজিক বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞাগুলিকে তিনি সবসময়ই মেনে নিতে পারেননি মন থেকে প্রতিবাদও করেছেন। নারী-পুরুষ সমানাধিকারের প্রশ্নে তাঁর মত ছিল সর্বদাই পক্ষে। এর পক্ষে তাঁর কণ্ঠও ছিল সোচ্চার। তাঁর এধরণের কার্যকলাপ তদানীন্তন যুবসমাজের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। জাতীয়তাবাদের প্রভাবশালী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি কেরালা থেকে এসেছিলেন। সারাজীবন তিনি নিপীড়িত মানুষের পাশে থেকেছেন, তাদের ব্যথা অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। জনগণের মধ্যে এবং সামাজিক কার্যপরিধিব মধ্যে তাই তিনি চেরিয়াম্মা অর্থাৎ আন্টি নামে পরিচিত ছিলেন।

এ হেন পরিবারের সন্তান হওয়ায় লক্ষ্মীর পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ সহজ হয়েছিল। পিতা-মাতার নিকট থেকেই লক্ষ্মী পেয়েছিলেন জীবনের সকল শিক্ষা ও প্রেরণা। এই আদর্শ-নিষ্ঠ পরিবারের শিক্ষা তাঁকে জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। আম্মু শৈশব থেকেই কন্যাকে শিখিয়েছিলেন যে ত্যাগের মধ্য দিয়েই সেবা করতে হয়। মায়ের শিক্ষায় মহৎ জীবনের আদর্শ কন্যাকে সকল কর্মে প্রবুদ্ধ করত। তিনি যেমন

তেজস্বী তেমনি বুদ্ধিমতী। শিশুকাল থেকেই তাঁর অন্তরের মধ্যে সহজাত স্বাবলম্বনের একটা দৃঢ়তা ছিল। এই সহজাত স্বাবলম্বন ও তেজস্বিতা সমস্ত জীবন তাঁকে পরিচালিত করেছে। নিজ অন্তরের প্রেরণায় একদিকে সমাজ কল্যাণ মূলক কাজে এবং অন্য দিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। পেশায় ডাক্তার হয়েও জীবনের প্রারম্ভে গান্ধীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মী সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধী তখন সকলের মুক্তিদাতার স্বরূপ। লক্ষ্মী তাঁর জীবনীতে লিখেছেন তিনি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন এবং সভায় যোগদান করেন। এই সময় লক্ষ্মী তাঁর সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার গান্ধীজীকে দান করেন।

কিন্তু মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পর থেকে গান্ধীজীর অহিংস পথ থেকে তাঁর রাজনীতি চেতনা সরে যেতে শুরু করে। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন সম্পর্কে তিনি ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। তাছাড়া মহাত্মা গান্ধীর ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে এসে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের নীতিকেও তিনি সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল ছাত্রদের উচিৎ পড়াশুনা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং নিজস্ব কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়ে দেশবাসীকে সাহায্য করা। এই সময় আবার তিনি সুভাষিনীর (সরোজিনী নাইডুর সর্বকনিষ্ঠা ভগ্নী) দ্বারা ভীষণভাবে আকৃষ্ট হন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন সুভাষিনী। পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার কারণে সুভাষিনী কিছুদিন লক্ষ্মীদের বাড়িতে ছিলেন। তাঁর উত্তেজক ও রোমাঞ্চকর জীবনের অভিজ্ঞতা লক্ষ্মীর জীবনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। তাঁর কাছেই লক্ষ্মী প্রথম শোনেন কমিউনিজম্-এর কথা, গৌরবময় রুশ বিপ্লবের কথা। আর তখনই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে মহাত্মা গান্ধীর কর্মসূচীর কোথাও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সামগ্রিক বিপ্লবের কোনও কথাই উচ্চারিত হয়নি। যে বিপ্লবে প্রাচীন ক্রম ভঙ্গুর সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক গঠন ভেঙে এক নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা হবে। তাঁর আহ্বান ছিল মানবতাবাদ এবং সামাজিক পরিবর্তনকামী সমাজ-সংস্কারকে, বিপ্লবীর নয়। কিন্তু রুশ বিপ্লব এবং সাম্যবাদ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এই সময় লক্ষ্মীর মনকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছিল।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে Tata Air Lines-এর পাইলট বী. আর. এন. রাও-এর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন যদিও তাঁর এই দাম্পত্য জীবন সুখের ও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস পাশ করেন। এক বছর internship করে এবং সরকারি হাসপাতাল থেকে নারী ও শিশু সংক্রান্ত রোগের জন্য ডি.জি.ও. ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। পরের বছর তিনি মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়ার ও গোথা হাসপাতালে কাজ করেন। তারপর ১৯৪০ সালের জুন মাসে 'নারীর আপন ভাগ্য জয় করিবার' আশায় তিনি মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুর যান। বিবাহিত জীবনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার আশায় এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁর এই সাগড় পাড়ি দেওয়া

আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। তারপর এলো সেইদিন — যেদিন পূর্ব এশিয়ার সীমান্তে দেখা দিল ঝড়ের সংকেত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এসে আহ্বান জানালেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিতে।[২] সিঙ্গাপুরে নেতাজীর ভাষণ শুনে লক্ষ্মী উদ্দীপ্ত হন এবং তাঁর জীবনে ঘটে যায় অদ্ভুত রূপান্তর। তিনি আজাদ-হিন্দ ফৌজের রাণী ঝাঁসী বাহিনীর অধিনায়িকা নিযুক্ত হন। আজাদ-হিন্দ ফৌজে যোগদানের পূর্বে অভিজাত ধনী পরিবারের সুন্দরী কন্যার ছিল এক বিলাস-বহুল জীবন। কিন্তু আগুন, বোমা, রাইফেল সর্বোপরি নেতাজীর আহ্বান তাঁকে এনে দিল এক অন্য ধরণের স্বাদ। শিশির স্নাত ফুল থেকে রূপান্তরিত হলেন অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরিতে।[৩] যে বিপ্লবী চেতনা তাঁকে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন সম্পর্কে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল তারই সুযোগ তিনি দেখলেন নেতাজীর নারী বাহিনী তৈরির আহ্বানে। তাঁর সাহস, সেবা ও ত্যাগ ঝাঁসী বাহিনীকে এক গৌরবময় ভূমিকা এনে দেয়।

লক্ষ্মী তাঁর আত্ম-জীবনীতে লিখেছেন নারীবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করার পূর্বে নেতাজী তাঁকে আগামী বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে দেন এবং একথা জানাতেও দ্বিধা করেন না যে ন্যূনতম সুরক্ষাও তিনি তাঁকে দিতে পারবেন না। ফলে নিঃস্বর্ত সমর্থন জানিয়ে লক্ষ্মী রাণী ঝাঁসী বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণে রাজি হন। তাঁর প্রথম কাজ ছিল ঝাঁসী রেজিমেন্টের জন্য নারী সৈনিক সংগ্রহ। লক্ষ্মী এক প্রবন্ধে লিখেছেন "পূর্ব এশিয়ার সমস্ত অঞ্চল থেকে তরুণীরা এসে রিক্রুটমেন্ট সেন্টারগুলো ঘেরাও করে ফেলতো। দাবি — তাঁদের নারী সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করতে হবে। আশ্চর্য রাতারাতি তারা সমাজের বাঁধন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন জীবনে প্রবেশ করল। ....কতিপয় বয়স্কা মহিলা ঝাঁসী রেজিমেন্ট ট্রেনিং ক্যাম্পে রান্না করার কাজে স্বেচ্ছায় যোগদান করেন। এই মহিলারা তাদের কাজের সাথে সাথে রাইফেল চালানোর কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে। তারা যুদ্ধ ফ্রন্টে যাবার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকত এবং সবসময়ই রাইফেল সঙ্গে রাখত। তাদের বক্তব্য ছিল তাদের ইচ্ছা নয় যে শত্রু সৈন্যের হাতে আচমকা ধরা পড়ে। রাণী ঝাঁসী রেজিমেন্ট একটি দুর্ধর্ষ সুযোগ্য এবং ইনফ্যান্ট্রী রেজিমেন্ট বা পদাতিক বাহিনীতে পরিণত হয়। ....তাদের মধ্যে একটাই অনুভব কাজ করত তা হচ্ছে নেতাজীর আর্মি অফ লিব্যারেশন বা স্বাধীনতার সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের গর্বিত সম্মান ও সুযোগ লাভ। যদিও এক কোম্পানি সৈন্য সহ একটি মাত্র বিচ্ছিন্ন ডিটাচমেন্ট দিয়ে শুরু হল কিন্তু প্রত্যেকদিন নতুনের দল যোগদান করতে থাকে। এবং অবশেষে এক হাজার নারী সৈনিক যুদ্ধে শিক্ষা লাভ করে। ....এটা কল্পনা করা খুব কঠিন হয় যে এই বলিষ্ঠ সৎ সতেজ মেয়ে সৈনিকরাই একসময়ে ছিল ক্ষীণ, দুর্বল, অপুষ্ট ভারতীয় নারী যারা নেতাজীর ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে এসেছেন। রাণী ঝাঁসী রেজিমেন্টের বন্দী সৈনিকদের কাছেই ব্রিটিশ পক্ষ জানতে পারে যে I.N.A. মাত্র মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মির আত্মসমর্পণ

করা যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে থেকেই গড়ে ওঠেনি। সেই আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়েছিল প্রচুর সংখ্যক অসামরিক ভারতীয়দের মধ্যে থেকে যারা প্রস্তুত ছিলেন তাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে যেকোন কষ্ট ও দুর্ভাগ্যকে বরণ করতে।"[৪] যে উপায়ে দেশের বাইরে বসবাস করা এসব মেয়েরা ভারতকে বিদেশী শাসনমুক্ত করার কাজে এগিয়ে এলেন এবং সর্বোপরি ঝাঁসীর রাণী ব্রিগেডের সক্রিয় সদস্য হয়ে উঠলেন তা ভারতীয় নারীর রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক মাত্রা যোগ করল।

রাণীদের বিভিন্ন লেখায় ও সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যখন রাণীদের ক্যাম্পে থাকতে হত তখন শ্রীমতি লক্ষ্মী ছিলেন তাদের অভিভাবিকা। তিনি ক্যাম্প পরিচালনায় ছিলেন অত্যন্ত কঠোর কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল কুসুম কোমল। এ বিষয়ে রাণীদের মুখ থেকে অনেক টুকরো ঘটনায় তাঁর কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। রাণী অরুণা চ্যাটার্জী বলেন — একবার ক্যাম্পে মেয়েরা চুরি করে আম খাচ্ছে দেখে কর্নেল লক্ষ্মী মেয়েদের ভয়ানক বকাবকি করলেন। কিন্তু পরের দিন মেয়েদের জন্য বড় ঝুড়ি করে আম পাঠিয়ে দিলেন[৫]।

লক্ষ্মী এক প্রবন্ধে লিখেছেন — নেতাজী মেয়েদের ট্রেনিং-এর আগে প্রত্যেক প্রশিক্ষককে ইন্টারভিউ করেন। এবং তাঁদের প্রতি নির্দেশ দেন তাঁরা যেন ধৈর্য সহকারে ভদ্র আচরণ করে রাণীদের প্রশিক্ষণ দেন। কোন অভব্য ভাষা ব্যবহার করা চলবে না। তাঁদের মনে রাখতে হবে তাঁরা তাঁদের ভগ্নীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। লক্ষ্মী আরও লিখেছেন — পরবর্তীকালে যখন বর্মায় একত্রে কাজ করতে হল যুদ্ধের সময় বিশেষত পরাজয়ের মুহূর্তে যখন সব মূল্যবোধ ভেঙে পড়েছে — তখনও রাণী ঝাঁসী বাহিনীর মেয়েদের সব আজাদী সৈন্য শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে।

তবে লক্ষ্মীর কার্যকলাপ শুধুমাত্র ক্যাম্পেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এক জায়গা থেকে অন্যত্র, এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে ঘূর্ণিঝড়ের মত ট্যুর করতেন নেতাজীর সঙ্গে সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ১৯৪৩ সালের ২রা অক্টোবর গান্ধীর জন্মদিনে সিঙ্গাপুরের ফারার পার্কে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হয়েছিল। রাণী ঝাঁসী বাহিনীর মেয়েরাও সেদিন সর্বপ্রথম মার্চ করে যোগ দিয়েছিল দলে দলে। Young India-তে ১০/১০/৪৩-এ লেখা হয়েছিল "The Regiment was headed by Dr. Swaminathan Laxmi and the Regiment is indeed an eloquent testimony to the great organising obility of the leader."

আবার ভারতীয় নারীদের পক্ষে সব থেকে গৌরবের কথা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক স্থাপিত অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ সরকারের women's affairs বিভাগে লক্ষ্মী স্বামীনাথনকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী করা হয়। এই অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে নেতাজী লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এই মন্ত্রীসভায় মহিলাদের বিষয় সম্পর্কিত মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে তিনি প্রস্তুত কিনা। লক্ষ্মী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন — যদিও এর জন্য তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না — তবুও তিনি রাজি হয়েছিলেন এই ভেবে যে এ সম্মান

তাকে ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া হচ্ছে না। সুতরাং লক্ষ্মী স্বামীনাথন প্রথম সামরিক অধিনেত্রী তো বটেই, আবার স্বাধীন ভারত সরকারের প্রথম মহিলা মন্ত্রীও।

লক্ষ্মী তাঁর আত্মজীবনীতে আরও লিখেছেন — "১৫ই জানুয়ারি আমি নারী সেনাদের রেঙ্গুনের IIL-এর হেড কোয়ার্টারের শাখার কাজ শুরু করি। এখানে মহিলাদের সংগঠিত করা অনেক সহজ ছিল কারণ রেঙ্গুনে নেতাজীর প্রথম আগমণের পর নারী কর্মীদের একটা কার্যকরী সংগঠন তৈরি হয়েছিল, যারা INA এবং IIL-এর কাজে গভীর আগ্রহ নিয়েছিল। তাদের সাহায্যে আমরা রেঙ্গুনের নানা অঞ্চলে মেয়েদের সমাবেশ সংগঠন করেছিলাম এবং স্থানীয় কমিটি তৈরি করেছিলাম। এই কমিটিগুলিই রাণী ঝাঁসী বাহিনীর জন্য শিক্ষার্থী সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়েছিল। এরা আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিয়েছিল। যেমন আমাদের হাসপাতালে ব্যবহার্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেমন সৈন্যদের রণাঙ্গনে নিয়ে যাবার জন্য শুকনো খাবার রান্না করা। অনেক পরে যখন রেঙ্গুনে আকাশ যুদ্ধ বেড়ে গেল, তখন এই মেয়েরাই যে সমস্ত জায়গায় বোমাবর্ষণ হত সেখানকার আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করার এবং যারা নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিল তাদের আশ্রয় শিবিরে নিয়ে আসার কাজ করেছিল।"[৬]

আবার রাণীদের ট্রেনিং প্রসঙ্গে লক্ষ্মী এক প্রবন্ধে লিখেছেন "আমাদের ট্রেনিং-এর এক পক্ষকাল পরে আমরা রাত্রিবেলা রুট মার্চে বের হতাম। স্থানীয় জনসাধারণ দলে দলে আমাদের দেখতে আসতো। তাদের মুখে অবিশ্বাসের ছাপ দেখে মজাই লাগত। তারা চিরকাল ভেবে এসেছে যে এশিয়দের মধ্যে ভারতীয়রাই সব থেকে রক্ষণশীল। সেই ভারতীয় মেয়েদের খাঁকি উর্দি পরে কাঁধে রাইফেল নিয়ে মার্চ করতে দেখা তাদের পক্ষে অকল্পনীয় ছিল। অনেক মালয়ী মেয়ে এগিয়ে এসে আকুল আবেদন জানাত যাতে তাদের বাহিনীতে নেওয়া যায়, বিশেষ করে যাদের বাবা কিংবা ঠাকুরদা ভারতীয়। আমাদের কাছে তাদের এই আকুলতা ভালই লাগত। কিন্তু নেতাজীর সুচিন্তিত ধারণা ছিল যে তাদের আমাদের সংগঠনে না নেওয়াই বুদ্ধির কাজ হবে।"

লক্ষ্মী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন "৩০শে মার্চ আমার জীবনে সবচেয়ে গর্বের দিন। সেদিন রাণী ঝাঁসী বাহিনীর অফিসারদের প্রথম প্যারেড অনুষ্ঠিত হল যাত্রার জন্য। ৮ জন তরুণীকে অফিসারদের প্রশিক্ষণ শেষ করার পর কমিশন দেওয়া হল, তাঁরা INA সৈন্যবাহিনীতে বাকি সকল সৈন্যের সঙ্গে গৃহীত হলেন। নেতাজী এবং জেনারেল ভোঁসলে যেহেতু তখন বর্মায় ছিলেন সেহেতু কার্যকরী প্রধান সেনাপতি কর্নেল নগর প্যারেড অভিবাদন গ্রহণ করলেন। আমরা এখন থেকে প্রকৃত সেনাবাহিনীর এক অংশ হিসাবেই কাজ করতে পারব। আমাদের বিভিন্ন প্লেটুন এবং কোম্পানিতে ভাগ করে দেওয়া হল এবং প্রত্যেকটি দলই তার নিজস্ব এন.সি.ও. এবং অন্যান্য অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকবে বলে ব্যবস্থা হল।"[৭]

১৫ই এপ্রিল দুজন অফিসার এবং রাণী ঝাঁসী বাহিনীর দশ জন সৈন্যকে নিয়ে সৈন্য পরিবাহী ট্রাকে করে লক্ষ্মী মেমিও যাত্রা করেন। সাময়িক সফলতার পর যদিও ২৬শে জুন সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদপসারণ শুরু হয় কিন্তু লক্ষ্মী সিঙ্গাপুর থেকে আসা নার্সদের একটি দলকে নিয়ে মেমিও হাসপাতালে আহত সৈন্যদের চিকিৎসা কার্য চালাতে থাকেন। পরে এই হাসপাতাল সরিয়ে নেওয়া হয় রেঙ্গুনের ১০০ মাইল উত্তরে জিয়াওয়াদী নামে একটি জায়গায়। কিন্তু এ স্থানও তাদের ত্যাগ করতে হয়। পরে জনা দুই ডাক্তার ও কয়েকজন সেবাকারিণীকে সঙ্গে নিয়ে একটি হাসপাতাল খোলার জন্য লক্ষ্মী কালাও যান। অসহনীয় দুর্ভোগ ও নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তিনি এসময়টা অতিবাহিত করেন। অবশেষে ১লা জুন তিনি বন্দী হন। তবে তাঁকে রেঙ্গুনে থাকতে দেওয়া হয়। পরে আবার তাঁকে কালাওয়ে অন্তরীণ করে রাখা হয়। ১৯৪৬-এর ৪ঠা মার্চ তিনি ভারতে আসেন এবং কর্নেল পী. কে. সেহেগলকে বিবাহ করেন।

তবে শুধুমাত্র আজাদ-হিন্দ আন্দোলনেই এই মহীয়সী নারীর জীবন সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। তিনি একাধারে চিকিৎসক, সমাজসেবী ও প্রবলভাবে জাতীয়তাবাদী। ১৯৪৬-এ ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নারী ও শিশুদের সেবার জন্য কানপুরে শ্রমিক কলোনীতে একটি ক্লিনিক খোলেন। আবার ১৯৭১-এর বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় তিনি কোলকাতায় পিপলস্ রিলিফ কমিটিতে যোগ দেন।

ভারতের নারী মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে লক্ষ্মী সেহেগল এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি আজও তাঁর সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। তিনি মনে করেন সামগ্রিকভাবে মহিলারা বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলের মহিলারা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ভীষণভাবে শোষিত হচ্ছেন। আজ ৮৭ বছর বয়সেও তিনি ভারতের নানা স্থানে তাঁর অগ্নিময় বাণী ছড়িয়ে বেড়ান। তিনি মনে করেন সমাজে এমন একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসা দরকার যার সাহায্যে ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে যে নারীর সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে তা সত্য হয়ে ওঠে। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই ১৯৮০ সালে সারা ভারত জনবাদী মহিলা সমিতি গঠিত হয়। এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রাজে। তার ৫ জন সহ-সভাপতির মধ্যে লক্ষ্মী ছিলেন ১ জন।

তাঁর জীবনের শেষ লড়াই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং এই লড়াইয়ে তিনি নারীদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে বলেছেন। এবং তিনি তাঁর জীবনের অন্তিম দিনগুলিকেও এই সংগ্রামে উৎসর্গ করতে চান।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। একটি বিপ্লবী জীবন, একজন রাজনৈতিক কর্মীর আত্মকথা মুখবন্ধ - লক্ষ্মী সেহেগল।

২। নেতাজী ও রাণী ঝাঁসী বাহিনী — আগমনী লাহিড়ী - পৃষ্ঠা ৪৬।

৩। নেতাজী ও রাণী ঝাঁসী বাহিনী — আগমনী লাহিড়ী - পৃষ্ঠা ৪৬।

৪। Lt. Col. Lakshmi Swaminathan, Origin-Netaji, His life & work - S.R. Sharma, PP-196-205.

৫। অরুণা চ্যাটার্জী — সাক্ষাৎকার — ১৪ই জানুয়ারি — ২০০২।

৬। একটি বিপ্লবী জীবন, একজন রাজনৈতিক কর্মীর আত্মকথা, লক্ষ্মী সেহেগল—পৃষ্ঠা ৬৮।

৭। একটি বিপ্লবী জীবন, একজন রাজনৈতিক কর্মীর আত্মকথা, লক্ষ্মী সেহেগল — পৃষ্ঠা ৭২-৭৩।

২। সাহায্যকারী পুস্তকের তালিকা

১। একটি বিপ্লবী জীবন, একজন রাজনৈতিক কর্মীর আত্মকথা — লক্ষ্মী সেহেগল, উপমা, ৩এ কালিঘাট পার্ক (সাউথ), কলিকাতা - ১৯৯৮।

২। স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চে ভারতের নারী — কৃষ্ণকলী বিশ্বাস, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা — ১৯৮৭।

৩। Dictionary of National Biograpghy, Vol-IV, Editor S.P. Sen, Institute of Historical Studies, Cal.

৪। Fay, Peter Ward, the Forgotten Army, India's Armed Struggle for Independence, 1942-45, Rupa & Co. Cal -1994.

৫। Gordon, Leonard A., Brothers Against the Raj, A Biography of Sarat and Subhas Chandra Bose, Viking New Delhi — 1990.

৬। Rohini Gavankar, Col. Lakshmi & the Rani of Jhanshi Regiment — An untold story.

৩। প্রবন্ধ

১। Lakshmi Sehgal, Netaji oration 1964, Women's Role in the Indian Independence Movement in South-East Asia and the Ajad Hind Fouz.

৪। সাক্ষাৎকার

১। লক্ষ্মী সেহেগল — ২৩শে জানুয়ারি ২০০১, ৮ ও ৯ই জুলাই ২০০১।

২। মানবতী আর্যা — ৭ই জুলাই ২০০১।

৩। অরুণা চ্যাটার্জী — ১৪ই জানুয়ারি ২০০২।

"স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে শ্রমিক আইনের আলোকে চা-বাগানের মহিলা শ্রমিক" (১৯৪৭-১৯৭৭)

সুপর্ণা চ্যাটার্জী

বাগিচা-শিল্পে নিযুক্ত মহিলা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার্থে যে সকল আইন প্রণীত হয়েছে তার বিভিন্ন দিক এবং তা রূপায়নে বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

১

জনৈক বুদ্ধিজীবী উইলিয়াম ও. জোনস্ বলেছেন যে সুদক্ষ তদারকি ও পরিচালনায় বেশ কিছু সংখ্যক অদক্ষ শ্রমিককে কাজে লাগিয়ে কৃষিপণ্য উৎপাদনের যে অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বাগিচা বলা যেতে পারে।[১] বাগিচায় উৎপন্ন কৃষিজদ্রব্য সাধারণ ভাবে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষে ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা চা, কফি, নীল প্রভৃতি চাষ-আবাদের প্রবর্তন করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসকদের দেশে সস্তায় কাঁচামাল পাঠানো। বাংলা এবং অসমে ব্রিটিশ প্রবর্তিত প্রধান বাগিচা হল চা-শিল্প। জলপাইগুড়িতে প্রথম চা-বাগান হয় ১৮৭৪ সালে।[২]

এই চা বাগিচায় কাজ করতে আনা হয় ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণার আদিবাসীদের। এদের আনা হত সরদারের মাধ্যমে।[৩] ১৯৫১ সালের জনগণনার প্রতিবেদনে দেখা যায় যে মূলত আর্থিক কারণের জন্য এই সব অঞ্চলের মানুষ সপরিবারে উত্তরবঙ্গ ও অসমের চা-বাগানে কাজ করতে আসে।[৪]

চা-বাগানের মালিকেরা আদিবাসীদের সপরিবারে আসাকে উৎসাহিত করত। এর কারণ ছিল একাধিক। প্রথমত, চা-বাগিচায় কাজ করার জন্য নিকটবর্তী অঞ্চলের মানুষের সহযোগিতা তারা পেত না। ঔপনিবেশিক শাসকেরা চা বাগান গুলিতে যে মজুরি ব্যবস্থা চালু করেছিল, তা রেল ও জনকল্যাণ বিভাগের কর্মীদের মজুরির চাইতে অনেক কম। এর ফলে এবং শ্রমিকদের প্রতি বাগান মালিকদের দুর্ব্যবহারের জন্য বাগিচার নিকটবর্তী অঞ্চলের মানুষদের এখানে কাজের অনীহা গড়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয়ত পরিবারের নারী ও শিশুদের কম মজুরিতে নিয়োগ করা যেত। তৃতীয়ত

পারিবারিক স্থিতিশীলতা থাকলে বাগিচা শ্রমিকেরা ফিরে যাবার অথবা ছুটি নেবার তাগিদ অনুভব করবে না।

চতুর্থত, পারিবারিক ভাবে বসবাস করলে পরবর্তী প্রজন্মের শ্রমিক উৎপাদিত হবে, যারা স্বাভাবিক ভাবেই এই বাগিচা-শিল্পের মজুর হিসেবে কাজ করতে পারবে। মনে রাখতে হবে যে, এই বিষয় গুলি গুরুত্ব লাভ করেছিল বাগিচা শিল্প প্রতিষ্ঠিত হবার সময়কালে। পরবর্তীকালে এই শিল্প সমৃদ্ধ হলে দূর থেকে শ্রমিক আনার প্রয়োজন কমতে থাকে।[৫]

২

চা-বাগিচায় কয়েক প্রজন্ম ধরে যারা বসবাস করছে তাদের মধ্যে আদিবাসী ও অ-আদিবাসী, উভয় গোষ্ঠীর মানুষই রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু আছে স্থায়ী শ্রমিক বা 'বাগানিয়া' এবং বাকিরা অস্থায়ী বা 'বিঘা'। এছাড়া, পাতা তোলার মাস গুলিতে (মার্চের শেষ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম দিক পর্যন্ত) পশ্চিমবাংলার পার্শ্ববর্তী রাজ্য গুলি থেকে বহু সংখ্যক আদিবাসী দৈনিক বেতনের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য আসে এবং তিন চার মাস থেকে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যায়। এই পরিযায়ী মজুরেরা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আদিবাসীদের গোষ্ঠী পরিচিতি, ঐতিহ্য এবং রীতি নীতি সম্পর্কে সুপরিচিতি রাখে।[৬] ১৯৬১ সালের জনগণনা রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে কুড়িটিরও বেশি তফশিলী উপজাতির মানুষ জলপাইগুড়ির চা-বাগানে কাজ করে। এদের মধ্যে প্রধান ছিল ওরাঁও, মুন্ডা, সাঁওতাল, খেরিয়া, মাহালী, ভুটিয়া, চাকমা, লেপচা প্রভৃতি।[৭]

৩

১৯৪৯ সালের শ্রম অনুসন্ধান কমিটির (Labour Investigation Committee) হিসাব অনুযায়ী চা-বাগানের মোট শ্রমিকদের ৪৪.৭ শতাংশ প্রাপ্ত বয়স্ক নারী।[৮] বাগিচায় পুরুষ শ্রমিকেরা প্রধানত চাষের কাজে নিযুক্ত হয় (যেমন চারা তৈরি, জমি তৈরি, সার দেওয়া, গাছ ছাঁটাই করা, আগাছা পরিষ্কার ইত্যাদি)। নারীরা মূলত পাতা তোলার কাজে নিযুক্ত থাকে।[৯]

৪

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে আইনের সাহায্যে শ্রমিকদের সুরক্ষিত করার চেষ্টা হয়েছে। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (I.L.O.) বিভিন্ন সম্মেলন ও সুপারিশ অনুযায়ী নারী শ্রমিকদের রক্ষা করার আইনগুলি তৈরি হয়। আই.এল.ও.-র প্রস্তাবিত ছয়টি সুপারিশের মধ্যে চারটিতে ভারত সরকার সম্মতি দিয়েছে। এই চারটি হলো নারীদের রাত্রিকালীন কাজে নিয়োগ ও ভূগর্ভে কাজ করা প্রসঙ্গে। এই সব প্রস্তাব ও সুপারিশকে মাথায় রেখে বিভিন্ন শ্রম আইন তৈরি হয়েছে।[১০]

চা-বাগানে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করার জন্য এবং কল্যাণ মূলক কাজের জন্য যে সব আইন রয়েছে সেগুলি হল, 'বাগিচা শ্রমিক আইন' বা Plantation Labour Act, ১৯৫১, মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন বা Maternity Benefit Act, ১৯৬১ এবং সম-মজুরি আইন বা Equal Remuneration Act, ১৯৭৬।

৫

১৯৫১ সালের বাগিচা শ্রমিক আইন অনুসারে বলা হয় :—

১) সন্ধ্যা সাতটা থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত বাগানে নারীদের নিয়োগ নিষিদ্ধ।

২) নারী এবং পুরুষদের কাজের সময় প্রতি সপ্তাহে ৫৪ ঘন্টা। বাগান গুলিতে প্রথা অনুসারে হাট বারে ছুটি দেওয়া হয়।

৩) যে কোন দিন কাজ, বিশ্রামের সময় এবং কাজে যোগদানের আগে অপেক্ষার সময় মিলিয়ে সর্বোচ্চ ১২ ঘন্টা হতে হবে।

৪) মালিকেরা শ্রমিকদের চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে দায়বদ্ধ থাকবে।

৫) যে সকল বাগিচায় দিনে ৫০-এর বেশি মহিলা শ্রমিক কাজ করে, সে গুলিতে ছ'বছরের নিচে শিশুদের জন্য 'ক্রেশ' ব্যবস্থা রাখতে হবে।[১১]

বাগিচা শ্রমিক আইনের ৩২ ধারা অনুসারে নারীরা সন্তান সম্ভবা অবস্থায় ও শিশু জন্মের পর মালিকদের কাছ থেকে মাতৃত্বকালীন ভাতা পাবার অধিকারী।[১২] পশ্চিমবঙ্গ মাতৃত্বকালীন সুবিধা (চা-বাগান) আইন [West Bengal Maternity Benéfit (Tea Estates) Act] অনুযায়ী এর সময়কাল বারো সপ্তাহ। বিভিন্ন রাজ্যে মাতৃত্বকালীন সুবিধা সুযোগ আলাদা হওয়ায় ১৯৬১ সালে নতুন কেন্দ্রীয় আইন তৈরি হয়, যার নাম Maternity Benefit Act, ১৯৬১। এই আইন কারখানা, খনি ও বাগিচা, সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়।[১৩]

১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন (Minimum Wages Act) অনুসারে রাজ্য সরকার বাগিচা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বেঁধে দেয়। ১৯৫১ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী পুরুষেরা পেত মাসিক ছ'টাকা মজুরি এবং নারীরা চার থেকে পাঁচ টাকা মাসিক মজুরি পেত। নারীদের কম মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে যুক্তি দেখানো হয় তা হলো যে তারা হালকা কাজ করে। পাশাপাশি, মেয়েরা সারা বছর কাজ করতে পারবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কারণ, নারীরা উৎপাদনের কাজের সঙ্গে যেমন যুক্ত তেমনই তাদের ওপর থাকে সন্তান ধারণ ও প্রতিপালনের দায়িত্ব।[১৪]

ভারতীয় সংবিধানের রাষ্ট্রের নিয়ামক নীতিতে নারী পুরুষের ক্ষেত্রে "সমান কাজের জন্য সমান মজুরির নীতি" গৃহীত হয়। ১৯৭৫ সালের সম মজুরির অধ্যাদেশ, ১৯৭৬

সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি আইনে পরিণত হয়, যা সম-মজুরি আইন বা Equal Remuneration Act বলে পরিচিত।[১৫]

১৯৭৫ সালের ১৫ই অক্টোবর থেকে এই অধ্যাদেশকে বাগিচা শ্রমিক আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আইনগত ভাবে মহিলা শ্রমিকদের সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা হলেও বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা এখনও বিভিন্ন ভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে চলেছে। অসম ও বাংলার চা-বাগিচায় মহিলারা সাধারণত পুরুষদের চেয়ে বেশি সময় কাজ করে। পুরুষরা কৃষি কাজের সঙ্গে নিযুক্ত হয় এবং চার পাঁচ ঘন্টায় নিজেদের কাজ সারতে পারে। মেয়েরা পাতা তোলার কাজ করে এবং তাদের সাত আট ঘন্টা কাজ করতে হয় দৈনন্দিন ন্যূনতম পরিমান পাতা তোলার জন্য।[১৬] (যা পি.এল.এ. অনুযায়ী ২৪ কে.জি.)।

মাতৃত্বকালীন সুবিধা সুযোগ আইনত থাকা স্বত্ত্বেও গর্ভাবস্থায় মহিলাদের পরিশ্রম কমানো হয় না, এবং তাদের শারীরিক অবস্থার প্রতি নজর দেওয়া হয় না। চা-বাগিচায় অস্থায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, যাদের অধিকাংশই মহিলা।[১৭] আইনত অস্থায়ী মহিলা শ্রমিকদের কোন সুবিধা সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না।

৭

বাগিচা শ্রমিক আইন অনুসারে শুধুমাত্র স্থায়ী শ্রমিকেরা সুরক্ষিত থাকে। চা-বাগিচায় পাতা তোলার মাসগুলিতে শ্রমিকদের চাহিদা ৫০ শতাংশ বাড়ে। ফলে এই সময় বহু সংখ্যক অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, যারা অধিকাংশই মহিলা। পাতা তোলার কাজ শেষ হলেই তাদের ছাঁটাই করা হয়।

১৯৬৮-৭৩ সালের মধ্যে ভারতের লেবার ব্যুরোর এক সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, চা-বাগিচায় কিছু মালিক মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন পাশ হবার পরও কোন মহিলা শ্রমিকের চাকরিতে ছেদ ঘটিয়েছে।[১৮]

লেবার ব্যুরোর আরো একটি সমীক্ষায় (১৯৭৮ সালের এপ্রিল এবং অক্টোবরের মধ্যে করা) বলা হয়েছে যে বহু বাগানে নারী ও পুরুষদের মধ্যে মজুরির পার্থক্য থেকে গেছে। এক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয় যে নারীদের হালকা কাজ করতে হয়।

৬

ভারতের মত দেশে, সামাজিক পরিবর্তন সাধন করা এবং সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য আইনের ওপর নির্ভরতা খুব বেশি। অন্যান্য শ্রমিকদের অপেক্ষা নারীদের সামাজিক অবস্থান আলাদা। প্রথা ও ঐতিহ্য অনুযায়ী তাকে গৃহস্থালীর কাজ কর্মও করতে হয়। অর্থাৎ, নারীর কাজের দুইটি ভাগ — একটি তার পেশাগত কাজ এবং অপরটি তার গৃহস্থালীর দায়িত্ব।

৮

আইন এই দ্বিতীয় বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে অক্ষম হয়েছে এবং সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে নারীর কাজের মূল্যায়ন করা হয় নি। এ ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা এবং মূল্যবোধ কাজ করে।

চা-বাগানে কর্মরতা নারী শ্রমিকেরা প্রধানত ঝাড়খন্ড রাজ্যের আদিবাসী (সাঁওতাল, ওরাঁও, মুন্ডা ইত্যাদি), অর্ধ আদিবাসী (মাহাতো, কুম্ভকার প্রভৃতি) এবং তফসিলী জাতি (বাউরি, বাগদি ইত্যাদি) ভুক্ত। অপর একটি অংশ হল নেপালি (বা গোর্খা)। এই জনগোষ্ঠী গুলি ভারতীয় সামাজিক কাঠামোতে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা, বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার। স্বভাবতই চা-বাগানের নারী-শ্রমিকেরা বিভিন্ন স্তরে বঞ্চিত হয়। তার মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে পুঁজি-শ্রম সম্পর্ক, রয়েছে পিতৃতান্ত্রিকতা ও লিঙ্গ-নিপীড়নের সম্পর্ক, তেমনি রয়েছে নিপীড়িত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে জন্ম নেবার কারণে জনগোষ্ঠীগত বঞ্চনা ও নিপীড়নের সম্পর্ক। একজন নারী শ্রমিক একদিকে শ্রমিক, একদিকে নারী এবং আর একদিকে ওরাঁও বা মুন্ডা। নারী শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থাটিকে এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে এবং আইনগত, প্রশাসনিক ও সামাজিক কর্মসূচী গুলিকে সেই ভাবে রূপায়িত করতে হবে। ফলে, আইনের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার কাজও করতে হবে, যাতে নারীদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন করা যায়।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১. W.O. Jones, 'Plantations', in David L. Sills (Ed.) *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, Volume 12, 1968, Pg. 154.

২. Sir Percival Griffiths,

The History of the Indian Tea Industry, Weidenfeld and Nicolson, 1967, Pg. 39.

৩. Ranajit Dasgupta, *Labour and Working Class in Eastern India : Studies in Colonial History*, K.P. Bagchi & Co., Calcutta, 1994, Pg. 146.

৪. *Census 1951*, West Bengal District Handbooks, Jalpaiguri, Government of West Bengal, Pg. 46.

৫. Sir Percival Griffiths, *Op. cit.* P. 96.

৬. Das and Banerjee, *Impact of the Tea Industry on the Life of the Tribals of West Bengal*, Government of West Bengal, 1964. P. 32.

৭. *Census of India*, 1961, Government of India, Pg. 28.

৮. Labour Bureau, *Economic and Social Status of Women Workers in India.* Government of India, 1953, Pg. 20.

৯. Labour Bureau, *Report* on *Third Ocupational Wage Survey* (1974-75), Government of India, 1976, Appendix II.

১০. Labour Bureau, *Socio-economic Conditions of Women Workers in Plantations, 1968-73*, Ministry of Labour, Government of India, 1980, Pg. 36.

১১. *The Plantation Labour Act, 1951*, with the W.B. Plantations Labour Rules, 1956.

Book-N-Trade, 2000, Pg. 13.

১২. ibid, Pg. 16.

১৩. *The Maternity Benefit Act*, 1961, with Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules, 1963, Law Publishers (India) Pvt. Ltd., 2001.

১৪. Labour Bureau, *Economic and Social Status of Women Workers* in India, New Delhi, The Bureau, 1953, P. 32.

১৫. *The Equal Remuneration Act.*, Government of India, New Delhi, 1978, Pg. 2.

১৬. *Labour Bureau, Socio-economic conditions of Women Workers in Plantations*, Ministry of Labour, Government of India, 1980, Pg. 86.

১৭. *Interview* taken on *12.11.01* at *Haldibari Tea Estate*, Jalpaiguri, Name of interviewee - *Selina Toppo.*

১৮. Labour Bureau, Socio-economic conditions of Women Workers in Plantations, Ministry of Labour, Government of India, 1980, Pg. 50.

সুকুমারী চৌধুরী ও বেঙ্গল ল্যাম্প

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

নারী দশক, নারী বর্ষ সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষও বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন মহিলা সমিতি এবং সংগঠন গুলো সাড়ম্বরে পালন করে থাকে। আজকাল বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের আলোচনাচক্রে মেয়েদের ক্ষমতায়ন, লোকসভা, বিধানসভা এবং পঞ্চায়েত স্তরে মেয়েদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রশ্নও বেশি বেশি করে উঠছে। মেয়েদের জীবনে পরিবর্তন অনেকটাই হয়েছে একথা স্বীকার করেও, একটা প্রশ্ন থেকে যায়, সত্যি সত্যি নারীর ক্ষমতায়ন কতটা হয়েছে এবং কোন শ্রেণীর, কোন বর্ণের মেয়েদের হয়েছে।[১]

নারী ধর্ষণ যদি সমাজের একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে গন্য হয়, তবে মেয়েরা ক্ষমতা পেয়েছে, একথা স্বীকার করা যায়না। আদিবাসী পুরুষ ও মেয়ে পেটের জ্বালায় যুগ যুগ আগেও নিজের গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে কাজের আশায়, আজও আসছে। দলিত মেয়েদের উপর আগেও অবর্ণনীয় অত্যাচার হয়েছে, আজও সমানে হয়ে চলেছে। আইন, আদালত, ন্যায় বিচার কোন কিছুই এদের জন্য নয়।

আধুনিক যুগে নতুন প্রযুক্তি, নতুন কৃৎকৌশল মানুষের জীবনকে পাল্টে দিচ্ছে। সে পরিবর্তন তলার দিকের মানুষের জীবনের কোন স্বপ্নকেই সার্থক করেনি। নতুন প্রযুক্তিতে কলকারখানা থেকে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, বলা বাহুল্য তার অধিকাংশই মহিলা। প্রকৃতপক্ষে সংগঠিত শ্রমে এখন মহিলা শ্রমিক নেই বললেই চলে। অথচ আশ্চর্যের কথা আগের চেয়ে এখন অনেক অনেক বেশি মহিলা (প্রায় সব শ্রেণীরই) কর্মে নিযুক্ত থাকছেন — অর্থাৎ এরা অধিকাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক। আরও স্পষ্ট ভাষায় এরা শ্রম দেয়, কিন্তু শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়না।

দেশের একটা বড় অংশ মহিলা বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু বিড়ি শিল্প প্রধানত গৃহ ভিত্তিক শিল্প। কিছু কারখানা আছে, অল্প কিছু শ্রমিকও (মূলত পুরুষ) আছে, তবে অধিকাংশ বিড়িই তৈরি হয় বাড়িতে, মেয়ে এবং বাচ্চারা তৈরি করে। এদের জন্য কোন শ্রম আইন নেই, এদের নিয়মানুগ মজুরি নেই, কর্মক্ষমতা চলে গেলে এদের কোন বাঁচার পথ নেই। অথচ বিড়ির বাজার তো বেশ জমজমাট। এরা শ্রমিক স্বীকৃতি চায়। আমাদের দেশে তো অনেকগুলি শ্রমিক সংগঠন আছে। প্রধানত শ্রমিকদের ভালো মন্দ নিয়েই তো সংগঠনের নেতৃত্ব ভাবনা চিন্তা করে থাকেন। তাদের ভাবনায় এই শ্রমিকরা আছেন তো?

কারখানায় ছাঁটাই হলে প্রথমেই মেয়েদের অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে ছাঁটাই করে দেয়, ট্রেড ইউনিয়নগুলো সেখানে প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করে?

বেঙ্গল ল্যাম্পের সুকুমারী চৌধুরীও এরকম বিনা কারণে ছাঁটাই হয়েছিলেন সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ হাতে নিয়ে। সুকুমারী চৌধুরী সামান্য শ্রমিক থেকে শ্রমিক নেত্রীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, নিজের কর্ম-ক্ষমতা ও সাহসের জোরে। একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের (সিটু) সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনিও কি পারলেন, তাঁর এবং তাঁর সঙ্গের অন্যান্য মেয়েদের ছাঁটাই রুখতে ? কর্তৃপক্ষ তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও হিসেব করে ফেরৎ দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি।[২]

সুকুমারী চৌধুরী বা তার মত শ্রমিক নেত্রীরা কিছু লেখেননি, তাদের কোন স্মৃতিচারণ মূলক গ্রন্থ নেই। তিনি মুখে যা বলেছেন তাকেই ঘটনা বলে ধরে নিতে হয়। বেঙ্গল ল্যাম্পের নানান আন্দোলন, ধর্মঘট এবং লড়াকু শ্রমিকের কথা তিনি বলেছেন, তার সমর্থন তখনকার পত্র পত্রিকায় পাওয়া গেছে, ফলে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই। কিন্তু আশ্চর্য, যে বেঙ্গল ল্যাম্পের শ্রমিক কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার লড়াই, বা চটকল মজুরদের অজস্র লড়াইয়ের কথা পত্র পত্রিকায় আছে ঠিকই, কিন্তু কোথায়ও বেঙ্গল ল্যাম্পের সুকুমারী অথবা চটকলের লড়াকু শ্রমিক নেত্রী দুখমত দিদির কথা নেই, হয়তো সংবাদপত্রে নাম বেরোবার মত শিক্ষাদীক্ষা বা বংশ কৌলিন্য কোনটাই এদের নেই, অথবা এরা মহিলা শ্রমিক, মহিলা শ্রমিক নেত্রী, সেকারণেও সংবাদপত্র এদের নাম প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি।

অধ্যাপিকা শমিতা সেন তার শ্রমিক আন্দোলনের উপর গবেষণা গ্রন্থ Women and labour in late colonial India, The Bengal Jute Industry তে বলেছেন "Women workers remained at the margins of organised working class protest."

১৯৯১-র সেপ্টেম্বর মাসে শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম একজন নেতা বীরেন রায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি সুকুমারী চৌধুরীর সঙ্গে।[৪] সন্তোষপুরে একটা ছোট বাড়িতে তিনি এবং তার স্বামী প্রবীর গাঙ্গুলী থাকেন। তখন বেঙ্গল ল্যাম্পের লড়াকু মহিলা নেত্রী সুকুমারী চৌধুরী আর শ্রমিক নেই। দুঃখ করে বললেন, 'কোম্পানি তো আমাদের কোন কারণ না দেখিয়েই চাকরি থেকে বরখাস্ত করল। বিশেষ কোন প্রতিবাদও হল না। যা সামান্য টাকা পয়সা ছিল তাই নিয়ে আমরা মেয়েরা কোম্পানি থেকে চলে আসতে বাধ্য হলাম। এরকম ভাবেই ৮০'র দশক থেকে বিভিন্ন কলকারখানা মেয়েদের ছাঁটাই করছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু Voluntary Retirement হলনা তাদের বাধ্য করা হল চাকরি ছাড়তে। সুতরাং কোন অবসরকালীন সুযোগ সুবিধাও আমরা পেলাম না।'[৫]

সুকুমারী পূর্ববাংলার মেয়ে। দেশ ভাগের আগেই নোয়াখালির দাঙ্গার সময় সুকুমারীকে কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই দাঙ্গায় তার স্বামী এবং শ্বশুরের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে তিনি ফিরে যান।

'১৯৫০ সালে বরিশালে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধে। দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে

ওঠে। আমার দাদা, কাকারা কলকাতায় থাকেন। আমার বৌদির সঙ্গে আমিও কলকাতায় চলে আসি। তাছাড়া কলকাতায় গিয়ে নার্সিং বা অন্যান্য কাজ পাবার একটা সম্ভাবনা ছিল।"[৬] বললেন সুকুমারী।

এই সময় কলোনি দখল (জবর দখল কলোনি) ইত্যাদি ব্যাপারগুলো শুরু হয়েছে যাদবপুর, বিজয়গড়, দমদম, বিরাটী, উত্তর চব্বিশ পরগণার অনেকগুলো এলাকায়। সুকুমারীরাও এরকম একটা জবর দখল কলোনিতে গিয়ে জমির (প্লট) উপর দখল নেয়, এবং মাথা গোঁজার মত একটা বাড়িও তৈরি করে নেয়। সুকুমারীর অভিজ্ঞতায় "জমিদারের লেঠেল এসে আমাদের তুলে দেবার চেষ্টা করেছে, ছেলেরা মেয়েরা জোট বেঁধে তার প্রতিবাদ করেছি। আমাদের ঘরে দা, বঁটি, খুন্তি, কাটারি যার যা ছিল তাই নিয়ে আমরা রুখে দাঁড়াতাম। আমাদের এক নেত্রী ছিলেন, তার নাম সন্ধ্যা ব্যানার্জী। তিনি মেয়েদের বাড়ি থেকে বার করে মিছিলে, কিংবা আন্দোলনে শরিক করতেন। পুলিসের লাঠিচার্জ কিংবা টিয়ার গ্যাসের সামনেও দাঁড়িয়েছি। এইভাবে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জবরদখল কলোনি উদ্বাস্তুদের দখলে চলে এলো। আমিও ৫০ থেকে ৫৫ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর এখানেই ছিলাম। আর লড়াই করার সাহস এখান থেকেই সংগ্রহ করেছি।"[৭]

এরপর সুকুমারী গেলেন নারী সেবা সংঘে। এই সময় নারী সেবা সংঘ ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠান উদ্বাস্তু মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে, স্বনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার ভরসা দিয়েছে। সুকুমারী এখানে তাঁতের কাজ শেখার জন্য আসেন। এখানে হিন্দু, মুসলমান, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মেয়েরা আশ্রয় পেয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন ইন্দুসুধা ঘোষ। তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসুর ছাত্রী হিসেবে অনেক দিন কাটিয়েছেন। তিনি একেবারেই অন্য ধরণের মানুষ।

ইন্দুসুধা ঘোষের দাদা, গণেশ ঘোষ, বেঙ্গল ল্যাম্পের মালিকানার অংশীদার ছিলেন। সুকুমারী ও আরও চার পাঁচ জন মেয়ে নারী সেবা সংঘ থেকেই ইন্দুদির চেষ্টায় বেঙ্গল ল্যাম্পে চাকরি পান।

সুকুমারী বললেন, সময়টা সম্ভবত ১৯৫৩-৫৪ হবে। তখন জনা দশেক মেয়ে ওখানে কাজ করত। মেয়েদের আঙ্গুল সরু সরু বলে তাদের ফিলামেন্ট বানাবার কাজ দিত। দেখতে দেখতে প্রায় দেড়শ-দুশো মেয়ে বেঙ্গল ল্যাম্পে চাকরি পেয়ে গেল। ছেলেরা কাজ করত মেশিনে। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক কম মজুরি পেত, এমনকি পরে মেয়েরা মেশিনে কাজ করেও ছেলেদের মত মজুরি পায়নি।

পূজো এল। পূজো বোনাস নিয়ে আন্দোলন শুরু হল। আমি পরে যাকে বিয়ে করলাম —প্রবীর গাঙ্গুলী তিনি আন্দোলনের অন্যতম একজন নেতা। আমার চাকরি হয়েছে মাত্র ছ'-সাত মাস। কিন্তু আমি মেয়েদের সংগঠিত করে আন্দোলনে যোগ দিলাম। মেয়েদের

পাশে পেয়ে ছেলেদের একটু সাহস বাড়ল। আমরা মেয়েরা সবাই পূর্ববঙ্গের, তার ফলেই সাহসী, হয়তো কিছুটা জঙ্গিও। আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি। আমাদের কলোনির আন্দোলনেও কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণ ছিল। স্ট্রাইক চলল প্রায় ছ'মাস। শেষ পর্যন্ত কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যস্থতায় ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হল।

ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে মালিক পক্ষ চেষ্টা করেছিল দালাল দিয়ে ফ্যাক্টরি চালাতে। দালালরা ভ্যানে করে মিলে লোক ঢোকাচ্ছিল। বিজয়গড় কলোনির অনেক মেয়ে এখানে কাজ করত। আমি তাদের খবর দিলাম। আমরা দল বেঁধে এগোচ্ছি। পুলিস এসে পড়ল। অনেক মেয়ে ভয়ে পিছিয়ে গেল। আমাকে পুলিস ভ্যানে তুলল থানায় নিয়ে যাবে বলে, অনেক ছেলেকেও তুলল। পুলিসরা আমাদের চিনত, কারণ ওরা স্ট্রাইকের সময় মাঝে মাঝেই আসত। আমি একজন পুলিসের বেল্ট ধরে টেনে বললাম আপনাকে আমি ঝিলের জলে ফেলে দেবো। তবে এদের জোর বেশি। ভ্যান থানায় ঢুকলো, আমাদের গ্রেপ্তার করল। পরে মিটমাট হয়ে গেল। আমরা অধিকাংশই ছিলাম পূর্ববঙ্গের আর বলা বাহুল্য অত্যন্ত গরিব। লড়াই করে আমাদের জীবন ও জীবিকা, অর্থাৎ অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছে। সুতরাং সাহসের অভাব আমাদের ছিল না।[৮]

আরেকটা ঘটনার কথাও বললেন সুকুমারী। কারখানায় ল্যাম্প তৈরি করত একটি ছেলে, তাকে হঠাৎ চার্জশীট ধরাল। প্রতিবাদে আমরা স্ট্রাইক শুরু করলাম। এই স্ট্রাইক চলল প্রায় সাড়ে তিন বছর। ততদিনে আমি বিয়ে করেছি প্রবীর গাঙ্গুলীকে ; কমিউনিস্ট পার্টিতেও যোগ দিয়েছি। আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমাদের পরিচয়। রাজনীতিও করেছি একসঙ্গেই। যতদূর মনে পরে, এই স্ট্রাইক মেটাতে সাহায্য করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। প্রশান্ত সুর, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনার সময় আমাদের আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে ছিলেন।

সুকুমারী চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি তো শুধু এখানকার মেয়েদের সংগঠিত করেননি, সবকটা আন্দোলনেই অংশগ্রহণ করেছেন এবং বলতে গেলে নেতৃত্বেই ছিলেন। যখন মিটমাটের জন্য মালিক পক্ষের সঙ্গে আন্দোলনের নেতারা আলোচনায় বসলেন, এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রশান্ত সুর এলেন, সেখানে আপনাকে ডাকা হলনা কেন ? উনি উত্তর দিলেন আমাদের তো কখনই ডাকা হতনা। আন্দোলনে আমরা সামনের সারিতে, পুলিসের লাঠি টিয়ার গ্যাসের সামনেও আমরা, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার সময়তো আমাদের কখনই ডাকা হোতনা। মেয়েদের অনেক দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা কথা বলেছি, সমান মজুরির দাবিও আমরা করেছি — এসব কথাও আলোচনায় খুব একটা গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে হয়না। তবে এটাই যখন নিয়ম, তখন ক্ষোভ হলেও, প্রতিবাদ করিনি।[৯]

খুব বিস্মিত হয়ে প্রবীর গাঙ্গুলী বলেছিলেন, এভাবে তো কখনও ভাবিনি। আন্দোলনে

মেয়েরা থাকবেন এটা তো স্বাভাবিক। সুকুমারী তো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বেই উঠে এসেছেন। তবে মেয়েরাও যে আলোচনার টেবিলে বসবেন তা আমরা কখনও ভাবিনি।[১০] আজও ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব ভাবেন না যে মেয়েদেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে একটা বড় ভূমিকা থাকতে পারে। অন্যান্য দাবি দাওয়ার সঙ্গে মেয়েদের যে কতগুলো বিশেষ দাবি দাওয়া থাকে সেকথাও তাঁরা অনেক সময় বিস্মৃত হন।

যে কোন কারখানার কাজ থেকে মেয়েরা অবসর গ্রহণ করলে, সেখানে আর একজন মেয়েকে নেওয়ার চেয়ে একজন পুরুষকে নেওয়ার পক্ষেই শুধু মালিক পক্ষ নয়, ট্রেড ইউনিয়নের নেতারাও মত দিয়ে থাকেন। মেয়েদের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার কথা বা তাদের প্রাপ্য তাদের দেবার কথা খুব কমই ভাবা হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে আজও সর্বত্র, শুধু কারখানা নয় অন্য কাজের জায়গায়ও মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা কর্মরত মেয়েদের খুব কম সংখ্যকই ভোগ করেন। কারণ অধিকাংশ মেয়েই অসংগঠিত শ্রমিক।[১১]

গোড়ার যুগের শ্রমিক আন্দোলনের মহিলা নেতৃত্ব যেমন সন্তোষকুমারী দেবী, প্রভাবতী দাশগুপ্ত, সাকিনা বেগম, ডঃ মৈত্রেয়ী বসু প্রমুখরা মেয়েদের সমস্যাগুলো আলাদা করে তোলেনইনি। মনে হয় শ্রমিকদের আন্দোলনমুখী করা, তাদের প্রাপ্য আদায়ের জন্য সচেতন ভাবে লড়াই করা — এগুলোই সেদিন অগ্রাধিকার পেয়েছিল। মেয়েদের পুরুষের সমান মজুরি, যৌন নিগ্রহের হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা করা এসব দাবি সেদিন মুখ্য ছিলনা। সুকুমারী চৌধুরী, চটকলের দুখমত দিদি ৫০/৬০'র দশকে এসব দাবি তুলেছিলেন। আসলে তারা গরিব ঘরের মানুষ, জীবন ও জীবিকার লড়াই তাদের নিত্য সঙ্গি — সুতরাং শ্রমিক সমস্যা তাদের অন্যের কাছে শুনে বা বই পড়ে বুঝতে হয়নি। মর্যাদা, সম অধিকার, শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি এ সবের জন্যই তারা লড়েছেন।

একটা উল্লেখযোগ্য দিক এই সব মহিলা নেতৃত্ব এবং যারা শ্রমিক থেকে নেতৃত্বে উঠে এসেছেন, এরা প্রায় সবাই জাতপাত এবং সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে ছিলেন।[১২]

সুকুমারী বলছেন, 'শুধু হয়তো পারিবারিক জীবন যাপন করলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জন্মাতে পারত। কিন্তু শিক্ষা, রাজনীতি, কারখানার কাজের জীবন, যে কোন শ্রমিকের আপদে বিপদে পাশে দাঁড়ানো, এর ফলেই আমরা সাম্প্রদায়িক হইনি। আর তখনকার নেতৃত্বর মধ্যেও বিশেষ করে বামপন্থী নেতৃত্ব এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের অনেকের মধ্যেও একটা অসাম্প্রদায়িক মনোভাব কাজ করত। তার অর্থ এই নয় যে মৌলবাদীরা ছিলেন না বা ছোটো খাটো সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়নি। জাত পাতের সমস্যাও ছিল। কিন্তু আজ এটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। প্রগতিশীল বলে দাবি করেন এমন মানুষও যখন প্রচ্ছন্ন ভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করেন — তখন সেটাই মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। তাই শ্রমিক আন্দোলনের মহিলা নেতৃত্বের প্রায় প্রত্যেকেরই চরিত্রের এই দিকটা অনুকরণ যোগ্য।

একটা কথা বার বার মনে হয় আজকের ট্রেড ইউনিয়ন তো শক্তিশালী কোন সন্দেহ নেই; তবে তার এমন চেহারা কেন ? শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বের উপর শ্রমিকদের ভরসা ক্রমশই কমে আসছে কেন ? ট্রেড ইউনিয়নগুলো অসংখ্য টুকরো টুকরো হয়ে পরস্পরের বিরোধিতা করে শ্রমিক স্বার্থে আঘাত হানছে কেন — এসব প্রশ্ন উত্তরোত্তর মনে জাগছে। ধর্মঘট, বন্ধ এ সবতো নিত্যকারের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে, ফলে এর গুরুত্বও কমে যাচ্ছে — সত্যি কথা বলতে কি অধিকাংশ শ্রমিক আর এই বন্ধ এবং ধর্মঘট সমর্থন করছেন না। কারণ এতে তাদের কিছু লাভ হচ্ছে না। আর মেয়েরা তো ধাক্কা খেতে খেতে ঘর বন্দী শ্রমিকে পরিণত হয়েছে, বা অন্যের বাড়ি কাজ করা, চাল সব্জি বিক্রি করা, ক্ষেতে খামারে ক্ষেতমজুরি করা, ইট ভাটায় চুক্তি অনুযায়ী কাজ করা বা গৃহ নির্মাণে কুলি কামিনের কাজ করা — এগুলোই আজ মেয়েদের কাজ। বিশের দশক থেকে স্বাধীনতার পরেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য মহিলার কথা জানা যায় যারা ট্রেড ইউনিয়ন করেছেন — আজ এমন মহিলা দুর্লভ। কেন এমন হল ? এ প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে।

মহারাষ্ট্রের ট্রেড ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য, প্রতিষ্ঠিত একজন নেত্রী ঊষা বাঈ ডাঙ্গে আত্মজীবনী লিখেছেন। তার নাম 'কে শোনে ?' আর আমার প্রশ্ন সুকুমারী চৌধুরী বা তার মত আরও অনেক শ্রমিক মহিলা এমনকি যাঁরা নেতৃত্বেও এসেছেন এদের কথা 'কে জানে' ?

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১) ইতিহাস সংসদের বার্ষিক অধিবেশনে (সেন্ট পল্‌স কলেজ; ২৪/২৫/২৬ জানুয়ারি ২০০২) বেশ কয়েকজন প্রবন্ধকারের প্রশ্ন — তাদের বক্তব্য মেয়েদের নিয়ে গবেষণা হচ্ছে; বিভিন্ন আলোচনা চক্রে এবং ইতিহাস সংসদের সব বার্ষিক অধিবেশনেই মেয়েদের উপর পৃথক আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে মেয়েদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে কি ? কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার কি মেয়েদের আছে ?

২) সাক্ষাৎকার, সুকুমারী চৌধুরী, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১।

৩) শমিতা সেন — *Women and Labour in Late Colonial India, The Bengal Jute Industry*, ১৯৯৯ পৃষ্ঠা - ১৯।

৪) বীরেন রায় ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একজন অন্যতম নেতা। তিনি ছিলেন Corporation Workers' Union'র সভাপতি।

৫) সাক্ষাৎকার ঃ সুকুমারী চৌধুরী, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১।

৬) সাক্ষাৎকার — সুকুমারী চৌধুরী।

৭) সাক্ষাৎকার — সুকুমারী চৌধুরী।

৮) সাক্ষাৎকার — সুকুমারী চৌধুরী।

৯) সাক্ষাৎকার — সুকুমারী চৌধুরী।

১০) সাক্ষাৎকার — প্রবীর গাঙ্গুলী ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১।

১১) সাক্ষাৎকার — কমলাপতি রায় (BPTUC'র সভাপতি) ১৯৯৭।

১২) মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় — শ্রমিক নেত্রী সন্তোষকুমারী এবং
মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় — Trial Blazing Women Trade Unionist of India, Delhi, ১৯৯৫।

প্রবন্ধের নাম : বায়োস্কোপের অভিনেত্রী

জাহানারা রায়চৌধুরী

উনবিংশ শতকের শেষপর্বে ল্যুমিয়ের ভাতৃদ্বয়ের আবিষ্কারের দৌলতে বিনোদনের দুনিয়ায় সংযোজিত হয়েছিল 'বায়োস্কোপ' এর নাম। খুব তাড়াতাড়ি নাগরিক বাংলার বিনোদনেও ঠাঁই করে নিয়েছিল এই বায়োস্কোপ। বিনোদনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই প্রথম থেকেই মহিলা শিল্পীরাও এই মাধ্যমের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং ক্রমে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন এখানেও।

অভিনয়-নাচ-গানের ব্যাপারে সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণেই ছায়াছবির জগতের অভিনেত্রী হিসাবে বেছে নিতে হয়েছিল থিয়েটারের মেয়েদের এবং সামাজিক বিধিনিষেধ কম থাকায় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলাদের। সেই অর্থে বায়োস্কোপের প্রথম পর্বের ইতিহাসের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ ও তার কলাকুশলীরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিলেন তার কারণ বায়োস্কোপ কোম্পানিগুলি থিয়েটারে অভিনীত নাটকের খন্ডদৃশ্যগুলিই ক্যামেরাবন্দী করেছিল। এপ্রসঙ্গে ১৮৯৮এ প্রতিষ্ঠিত হীরালাল ও মতিলাল সেনের 'রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি'র কথা উল্লেখযোগ্য। এদের উদ্যোগে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত নাটক 'সীতারাম' ও 'আলিবাবা'র খন্ডদৃশ্যে অভিনয় করেছিলেন তৎকালীন থিয়েটার জগতের প্রখ্যাত অভিনেত্রীরা। যেমন 'আলিবাবা'তে কুসুমকুমারী। এরপর আরো কিছু নাটকের খন্ডদৃশ্য তোলা হয়েছিল। এরমধ্যে 'ভ্রমর'এ অভিনেত্রী হিসাবে নাম পাওয়া যায় প্রমদাসুন্দরীর এবং 'সরলা'তে হরিদাসী বা গুলফন হরির। তবে এগুলির কোনটাই পূর্ণাঙ্গ ছবি ছিল না। বাংলায় প্রথম বড় ধরণের নির্বাক ছবি— বিল্বমঙ্গল। ১৯১৯এ তৈরি এই ছবিতে মিস গহর অভিনয় করেন। এরপর একে একে তৈরি হয় নলদময়ন্তী (১৯২১), বিষবৃক্ষ (১৯২২) ইত্যাদি ছবি। এই পর্বেই বায়োস্কোপের অভিনেত্রী হিসাবে দেখা যায় এমন কিছু মেয়েদের যাঁরা ইতিপূর্বে নাট্যাভিনয় বা অন্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত ছিলেন না। ১৯২১-এ 'নলদময়ন্তী'র নায়িকা হন মিস পেসেন্স কুপার। বিদেশিনী বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এই অভিনেত্রীরা অনেকেই আবার ভারতীয় নাম গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রিনি স্মিথ যিনি পরিচিত ছিলেন সীতা দেবী নামে। বিদেশিনী অভিনেত্রীদের মধ্যে আরও ছিলেন সবিতা দেবী, ভায়োলেট কুপার, অলবার্টিনা প্রমুখ।[১]

বায়োস্কোপের জগতে প্রথম পর্বের এই অভিনেত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, থিয়েটারের অভিনেত্রীদের মতই এঁদের অনেকেই তথাকথিত

'ভদ্র' ঘরের কন্যা ছিলেন না। তবে এই চিত্রের ব্যতিক্রম ঘটে ১৯৩০ এ অভিনেত্রী হিসাবে শ্রীমতী প্রেমলতিকা বা প্রেমিকা দেবীর আগমণে। সে যুগের প্রখ্যাত অভিনেতা ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী প্রেমিকার ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল। স্বামীর সহায়তা ও উৎসাহেই তিনি রমলা দেবী ছদ্মনামে চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত লেখাপত্র থেকে বোঝা যায় এই ঘটনা যথেষ্টই সাড়া ফেলেছিল। চিত্রলেখা পত্রিকায় লেখা হয় — "ইহা ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের প্রথম চিত্র হিসাবে প্রশংসা পাইবার যোগ্য। তদ্ভিন্ন ইহাতে চিত্রমোদীর আকৃষ্ট হইবার আর একটি কারণ হইতেছে যে, সর্ব্বপ্রথম ছবিতে গৃহবধূর অভিনয়। শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী প্রেমলতিকা দেবী — রমলা দেবীর ছদ্মনামে চলচ্চিত্র দর্শকদিগের চিত্ত বিনোদন করেন।"[২] তবে সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যাদের বায়োস্কোপে অভিনয় ছিল ব্যতিক্রমই। শিক্ষিতা ও অভিজাত ঘরের কন্যা হিসাবে আরও যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁদের অন্যতমা লীলা দেশাই, দেবিকারাণী, শীলা হালদার, সাধনা বসু প্রমুখ। এঁদের বাদ দিলে সাধারণভাবে বায়োস্কোপ ও তার অভিনেত্রীদের সম্পর্কে মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসিকতায় একধরণের ঘৃণা ও ভীতির মনোভাব ছিল। তাৎপর্যপূর্ণ হল, চল্লিশের দশকে অপেশাদারি নাট্য আন্দোলন বেশ কিছু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যাকে বায়োস্কোপের জগতে টেনে এনেছিল। তাঁরা যদিও প্রচলিত সামাজিক রক্ষণশীলতা ও বাধা বিপত্তি পার হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের মনেও ছিল ফিল্মজগত সম্পর্কে ফিল্মে অভিনয় করা নিয়ে দ্বিধা। তৃপ্তি মিত্র তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখছেন, গণনাট্য সংঘের পরিচালনায় 'ধরতি কে লাল' ছবিটি তৈরির প্রস্তাব এনেছিলেন খাজা আহমেদ আব্বাস। ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সবাই ছিলেন গণনাট্যের, কিন্তু তা সত্ত্বেও মামা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁকে অভিনয় করার অনুমতি প্রথমে দেন নি, পরে অবশ্য সম্মত হন।[৩] অবশ্য এই চলচ্চিত্রের অপর দুই অভিনেত্রী ঊষা দত্ত এবং রেবা রায় চৌধুরীর লেখায় আছে এই অভিনয়কে ঘিরে আনন্দের অভিজ্ঞতার কথা।[৪] নতুন ধারার অভিনেত্রীদের মধ্যে শোভা সেনের স্মৃতিচারণাতেও ধরা পড়ে সমসাময়িক সমাজমনে চলচ্চিত্র সম্পর্কে দ্বিধার কথা। এমনকি অভিনেত্রীরা নিজেরাও সংশয় মুক্ত ছিলেন না। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় — "ফিল্ম একটা অচেনা অজানা রাজ্য। সেখানে কি কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে যায় বা যাওয়া উচিত ? আমার নিজেরও প্রচুর দ্বিধা, সংশয় ছিল মনে।"[৫] চলচ্চিত্র জগতের মূলধারার কলাকুশলী বিশেষত অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাদের সামাজিক পার্থক্য সম্পর্কিত এই অভিনেত্রীরা যে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তা বোঝা যায় শোভা সেনের লেখা থেকে।[৬]

বায়োস্কোপের জগত সম্পর্কে এই ধরণের সংশংয়পূর্ণ মনোভাবের একটি কারণ ছিল অভিনয় জগতের কলাকুশলীদের ব্যক্তিগত জীবন, রঙ্গভূমির পশ্চাতে তাঁদের যথেচ্ছাচার সম্পর্কে প্রচলিত নানা কাহিনী। অবশ্য এর মধ্যে কিছুটা সত্য ছিল বলে শিবনারায়ণ রায় জানিয়েছেন।[৭] কিন্তু এই জগতে মেয়েদের স্বাধীন জীবন যাপনের কতটা সুযোগ ছিল সে

সম্পর্কে সংশয় জাগে। এ প্রসঙ্গে কানন দেবীর কথা আসবেই। ১৯২৬ সালে নির্বাক ছবি 'জয়দেব'-এ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অভিনেত্রী কাননদেবীর চলচ্চিত্র জগতে আত্মপ্রকাশ। নির্বাক থেকে সবাক ছবির পর্বে এসে তাঁর গগন স্পর্শী খ্যাতির সূচনা। তিনিই প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র জগতের 'গ্ল্যামার কুইন' বলে সমসাময়িক লেখাপত্রে চিহ্নিত হয়েছিলেন। অথচ তাঁর লেখায় পাওয়া যায় এক অন্য জগতের ছবি — "তখনকার দিনের নায়িকা নামে মাত্র নায়িকা, কার্যত প্রযোজক, পরিচালক থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠিত নায়কদের পর্যন্ত আড্ডাবাহিকা ছাড়া কিছুই ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হত আমি কি কলের পুতুল ? নিজস্ব কোন স্বত্তা নেই ?......অল্পবয়স ও অনভিজ্ঞতার কত সুযোগই না সবাই নিয়েছে। নিরুপায় অবস্থার জন্য গ্লানিভরা মুহূর্তের সে অসহ্য যন্ত্রণা কি ভোলার ?"[৮] শুটিং এর অবসরে প্রতিষ্ঠিত নায়কদের অযাচিত ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার প্রস্তাবে জোর করা ইত্যাদি ছিল তাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা।

ফিল্মে মেয়েদের উপস্থাপনা করার ক্ষেত্রেও প্রথম পর্ব থেকেই তাঁদের যৌন আবেদনের উপর যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত কানন দেবীর রচনায় তারও ইঙ্গিত মেলে। বাঁধা মাইনের অভিনেত্রী হওয়ায় কাননদেবীকে অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও 'বাসবদত্তা' (১৯৩৬) ছবিতে অত্যন্ত স্বল্পবাসে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল।[৯] মেয়েদের শারীরিক আবেদনকে পুঁজি হিসাবে ব্যবহারের প্রবণতা নির্বাক যুগের প্রথম পর্বের চলচ্চিত্রেও লক্ষণীয়ভাবে চোখে পড়ে ১৯২৭ সালে তৈরি নির্বাক ছবি 'শঙ্করাচার্য'-তে নায়িকাকে স্বল্পবাসে ঘনিষ্ঠ অভিনয় দৃশ্যে উপস্থিত করা হয়। ১৯৩২ সালে তৈরি 'শক্তিপূজা' ছবিতে অভিনেত্রী ঊষার এমন একটি ছবি চোখে পড়ে।[১০] গবেষকরা মনে করেন প্রথম পর্ব থেকেই নায়িকার যৌন আবেদনকে জনপ্রিয়তার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে ছিল। বিশেষত নৃত্যদৃশ্যগুলিতে তা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।[১১] সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বোম্বাই এর চলচ্চিত্রের উদাহরণ দিয়েছেন, কিন্তু বাংলা 'চলচ্চিত্রেও এরকম উদাহরণ বিরল নয়। ১৯৩৬ সালে তৈরি 'সোনার সংসার' ছবিতে রঞ্জিত রায়, কৃষ্ণধন মুখার্জির সঙ্গে আজুবীর একটি নৃত্যদৃশ্য এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসাবে দেখা যেতে পারে।[১২] কাননদেবী জানিয়েছেন ১৯৩১ সালে সবাক ছবি 'জোর বরাত'-এ তাঁকে না জানিয়ে পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় নায়কের সঙ্গে একটি চুম্বন দৃশ্য চিত্রায়ণ করেন। আকস্মিক এই ঘটনার ধাক্কায় তাঁর মন বিপর্যস্ত হয়েছিল। শেষপর্যন্ত প্রযুক্তিগত কারণে দৃশ্যটি ছবি থেকে বাদ হয়ে যায়।[১৩] ১৯২৮ সালে তৈরি হিমাংশু রায় প্রযোজিত ফ্রনজ অস্টেন পরিচালিত 'সিরাজ' ছবিতে এণাক্ষী রামারাও ও হিমাংশু রায়ের অভিনয়ে এধরণের দৃশ্য তোলা হয়েছিল।[১৪]

বাংলা ছায়াছবির জগতে প্রথম পর্বে যে মেয়েরা অভিনয় করতে এসেছিলেন তাঁদের অধিকাংশের কাছেই জীবিকার তাগিদটাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। আবার তার

পাশাপাশি পারিবারিক দিক থেকে আগ্রহ বা নতুন এক শিল্প মাধ্যমের প্রতি আগ্রহের কারণে অভিনয়ের জগতে এসেছিলেন কেউ কেউ। উমাশশী দেবী যেমন তাঁর স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন বাবার আগ্রহেই অভিনয়ের জগতে পা রেখে ছিলেন তিনি। তবে বিবাহের পর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির অনাগ্রহে ১৯৩৮ সালেই অভিনয় জগত থেকে সরে দাঁড়াতে হয় তাঁকে। তাঁর কথায় — "বিয়ের পর তো আমি ছাঁট হয়ে যেতুম। কেবল এটা করবে না, ওটা করবে না — এভাবে কি সিনেমা হয় ?"[১৫] সংসার ও শিল্পজীবনের মধ্যে টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্বের আভাস মেলে চন্দ্রাবতী দেবীর কথাতেও।[১৬] দ্বিধা, তিক্ততা, শোষণ যেমন এই অভিনেত্রীদের শিল্পজীবনকে বিপর্যস্ত করেছে, তেমনই এর মধ্যেই কেউ কেউ খুঁজে নিয়েছেন মুক্তির পথ। কাননদেবী যেমন প্রথমে "নিছক বেঁচে থাকার বাস্তব প্রয়োজনে" সিনেমা জগতে পা রেখেছিলেন কিন্তু অচিরেই সেই বেঁচে থাকার তাগিদ থেকে এই অভিনয় জীবন তাঁর কাছে আরো মহোত্তর মুক্তির আনন্দ হয়ে ওঠে, যখন ১৯৩১ সালে নির্বাক বায়োস্কোপ সবাক 'টকী'-তে রূপান্তরিত হয়। শুধু কথাই নয়, শুরু হয় বিনোদনের নতুন উপকরণ হিসাবে সঙ্গীতের প্রয়োগ। এতদিন পর্যন্ত কাননবালা ছিলেন শুধুমাত্র একজন অভিনেত্রী। কিন্তু চলচ্চিত্রে গানের প্রয়োগ শুরু হওয়ার পর তিনি আবিষ্কার করেন তার আর এক স্বত্ত্বাকে। তাঁর কণ্ঠ সঙ্গীতের প্রচন্ড জনপ্রিয়তা সিনেমা জগতেও তাঁকে অন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর কথায় — "এই ভয়াবহ জীবনের নাগপাশ যখন আনন্দের টুঁটি চেপে ধরে জীবনকে দুঃসহ করে তুলত তখন গানের এই স্পর্শটুকু আমায় যেন বাঁচিয়ে দিত। মনে হয় এই তো আমার সত্যিকারের বাঁচা।"[১৭] এই সঙ্গীতে পারদর্শিতার জন্যই সবাক চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে বাংলা বায়োস্কোপের সঙ্গে যুক্ত হন কেউ কেউ যাঁরা ছিলেন মূলত গায়িকা। যেমন ১৯৩৩ সালে 'যমুনা পুলিনে' ছবিতে অভিনেত্রী তালিকায় নাম পাওয়া যায় আঙুরবালা, ইন্দুবালা এবং কমলা ঝরিয়ার। সুদর্শনা না হলেও ইন্দুবালা পরবর্তী বেশ কিছু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তাঁর কণ্ঠমাধুর্যের দাবিতে।[১৮]

নানা কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলায় যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার প্রভাব চলচ্চিত্র শিল্পের উপরেও পড়েছিল। বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময়ে কালোবাজারি স্ফীত হয়ে উঠেছিল। গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, অসৎ উপায়ে অর্জিত প্রচুর পরিমাণ কালো টাকা বিনোদন জগতে পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল, বিশেষত চলচ্চিত্র শিল্পে। এর ফলে এই সময় থেকে (১৯৪৩-এর পরবর্তী বছরগুলিতে) চলচ্চিত্র শিল্পে গতির সঞ্চার হয়। এর প্রভাব অভিনেত্রীদের উপরও পড়েছিল। আরও বহুসংখ্যক মহিলা জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে চলচ্চিত্রের জগতে আসতে শুরু করেছিলেন। তবে সাধারণভাবে এই পর্বেও সিনেমা জগত সম্পর্কে সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিশেষ উৎসাহজনক ছিল না। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা দেশভাগ বাস্তুচ্যুতি ইত্যাদির ফলে বাঙালির স্থিতিশীল জীবনে যথেষ্ট আলোড়ন উঠেছিল। দেশান্তরী হয়ে আসা বহু বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে মানসিক বাধা

থাকা সত্ত্বেও বেঁচে থাকার তাগিদে চলচ্চিত্র জগতে বাড়ির মেয়ের অংশগ্রহণকে মেনে নিতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। সুপ্রিয়া জানিয়েছেন, বার্মা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে আসার পর আত্মীয় স্বজনের প্রচন্ড আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ সমস্ত বাধা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। সে সময় সিনেমা জগত সম্পর্কে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে যে আশঙ্কা ছিল তার চমৎকার আভাস মেলে সুপ্রিয়ার কথা থেকে। দিদির বিবাহের জন্য পাত্র-পক্ষ আসার দিনে পাছে বাড়ির ছোট কন্যা সুপ্রিয়ার সিনেমায় অভিনয়ের সংবাদ তাদের কানে পৌঁছয়, সেজন্য সুপ্রিয়াকে ভেতরের ঘরে আটকে রাখা হয়।[১৯] এমনকি তথাকথিত শিক্ষিত প্রগতিশীল বাড়িতেও যেখানে মেয়েদের নাচ-গান-অভিনয়ের প্রচলন ছিল সেখানেও চলচ্চিত্রে অভিনয় নিয়ে একধরণের দ্বিধা দেখা যায়।

এই দ্বিধাও সংশয় নিয়েই দুই স্তরের অভিনেত্রীদের মধ্যে আদান-প্রদান শুরু হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চ এবং চলচ্চিত্র উভয় জগতেই এই প্রয়াস চোখে পড়ে বিংশ শতকের উত্তর চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশক থেকে। তথাকথিত হীন জন্মের প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা অভিনেত্রীরা এবং শিক্ষিতা, তথাকথিত ভদ্র, মধ্যবিত্ত বাড়ি থেকে আসা নবীনা অভিনেত্রীদের মধ্যে প্রথম দিকে একধরণের দূরত্ব থাকলেও ক্রমে তার ভিতর দিয়েই তাদের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদানের সূচনা হয়। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও ঐ অভিনেত্রীরা যে যথেষ্ট গুণী এবং প্রতিভাময়ী ছিলেন সে কথা এই নবীনা শিল্পীরাও কেউ কেউ স্বীকার করেছেন। বিংশশতকের মধ্যাহ্নে পৌঁছে অভিনয়ের জগতে মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় এটা একটা বড় প্রাপ্তি। যদিও পুরুষতান্ত্রিক শোষণের ছবি বদলেছে একথা বলা যায় না। পণ্য সংস্কৃতির জোয়ারে পরবর্তী সময়ে অভিনেত্রীরা আরও বিচিত্রভাবে, ব্যাপকস্তরে নিছক বিনোদনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছেন সেলুলয়েডে। এই প্রক্রিয়া এখনও চলছে।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ, সোনার দাগ, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮২ দ্রষ্টব্য, প্রণব কুমার বিশ্বাস, বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৮১ সন দ্রষ্টব্য।

২। চিত্রলেখা পত্রিকা, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৩০।

৩। তৃপ্তি মিত্রের স্মৃতিচারণা, তৃপ্তি মিত্র (সংকলন গ্রন্থ), কলকাতা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১৩।

৪। রেবা রায় চৌধুরী, জীবনের টানে শিল্পের টানে, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৫২।
উষা দত্ত, দিনগুলি মোর, কলকাতা-১৯৯৩, পৃষ্ঠা-২২।

৫। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, "চলমান চিন্তা", শতবর্ষে চলচ্চিত্র (নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পাদিত), কলকাতা, ১৯৯৬ দ্রষ্টব্য।

৬। শোভা সেন, স্মরণে বিস্মরণে : নবান্ন থেকে লাল দুর্গ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-২৮।

৭। শিবনারায়ণ রায়ের ভূমিকা, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, তিনকড়ি, বিনোদিনী, তারাসুন্দরী গ্রন্থে, কলকাতা, ১৯৮৫।

৮। কানন দেবী, সবারে আমি নমি, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৮০, পৃষ্ঠা-১১।

৯। ঐ. দ্রষ্টব্য।

১০। গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ, প্রাগুক্ত গ্রন্থে সংকলিত ছবি দ্রষ্টব্য।

১১। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, "ভারতীয় চলচ্চিত্রে জনপ্রিয়তার উপকরণ", নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পাদিত, শতবর্ষে চলচ্চিত্র, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩০৪।

১২। গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ, প্রাগুক্ত গ্রন্থে সংকলিত ছবি দ্রষ্টব্য।

১৩। কানন দেবী, প্রাগুক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৪। প্রণবকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত গ্রন্থে, চিত্রপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

১৫। উমাশশী দেবী (সাক্ষাৎকার), খোঁজ এখন, ৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৯, জানুয়ারি-জুন ২০০০, পৃষ্ঠা-১৮।

১৬। চন্দ্রাবতী দেবী, আমি চন্দ্রাবতী বলছি, কলকাতা, ১৯৮৪ দ্রষ্টব্য।

১৭। কানন দেবী, প্রাগুক্ত গ্রন্থে, পৃষ্ঠা-১১।

১৮। ডঃ বাঁধন সেনগুপ্ত, ইন্দুবালা, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪।

১৯। সুপ্রিয়া দেবী, "আলোর সন্ধানে", নীলিমা চক্রবর্তী সম্পাদিত, আজ আমি, কলকাতা, জুন, ১৯৮৭।

পুরুলিয়ার লোক সংস্কৃতি ও নাচনী সম্প্রদায় ঃ একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা

জলি বাগচী

আলোচ্য বিষয়টির ওপর ইতিপূর্বে অনেকেই কাজ করেছেন। আমি মূলত পুরুলিয়ার নাচনীদের জীবনের করুণ কাহিনী এবং সমাজে নারীদের শোষণের চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

কোম্পানির আমলে মানভূম ছিল জঙ্গল মহলের অন্তর্গত। মানভূমের সদর শহর ছিল পুরুলিয়া। ১৯৫৬ সালে মানভূমের নাম মুছে গিয়ে পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের এক নতুন জেলা রূপে চিহ্নিত হয়। প্রশাসনিক সুবিধার্থে সীমানার পরিবর্তন ঘটলেও সাংস্কৃতিক মানচিত্র কিন্তু এক এবং অভিন্ন থেকে গেল।

পুরুলিয়ার সঠিক অর্থে যারা মাটির মানুষ ভাবা হচ্ছে — বাউরী, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, কুর্মী, ভূমিজ প্রভৃতি। এই অঞ্চলের মানুষের জীবন কৃষি নির্ভর। কলকারখানা এখানে গড়ে ওঠেনি। পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত খরা ও রুক্ষ অঞ্চল। পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষের দারিদ্র ভয়ঙ্কর এবং চামুন্ডার মূর্তির চেয়েও ভয়ঙ্কর তার রুক্ষ নীরস পাথুরে মূর্তি। পুরুলিয়া যেহেতু এক ফসলী অঞ্চল সেহেতু গরিবগুর্বো মানুষেরা বছরের অর্দ্ধেক সময়ের বেশি সময় জীবন ধারণের জন্য পাশ্ববর্তী জেলা বর্ধমান, বাঁকুড়া ইত্যাদি অঞ্চলে দিন মজুর বা মাটি কাটার কাজে চলে যায়। পুরুলিয়ার কিছু অঞ্চলে আখের চাষ এবং তাকে ঘিরে গুড়ের ব্যবসা চলে বছরের একটা বিশেষ সময়ে। তাছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য এবং বিশেষ করে মহাজনী কারবারের প্রসার এখানে অত্যধিক। পুরুলিয়ার এই ভৌগলিক, সামাজিক এবং আর্থিক প্রেক্ষাপট এই অঞ্চলের লোক সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা যেমন ছৌনাচ, ঝুমুর, ভাদু, টুসু, বাধনা পরব, রহিন পূজা, সিন্ডবোঙা ইত্যাদি তেমনি তার পাশাপশি নাচনীনাচও একটি ধারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির মূলস্তরটি আদি অষ্ট্রাল নিষাদ সংস্কৃতির। কিন্তু তার সাথে আর্য সংস্কৃতি যথা জৈন, হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি পরবর্তীকালে বৈষ্ণবদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পুরুলিয়ার জীবন সংগীত ঝুমুর। ঝুমুর লোকসংগীত উত্তরে সাঁওতাল পরগণা, দক্ষিণে ছোটনাগপুর এবং পশ্চিমে মধ্যভারত ব্যাপিয়া গুজরাটের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের

ঝুমুর গানে ভাষার বিভিন্নতা থাকলেও সুরের মধ্যে ঐক্য ধরা পড়ে।

পুরুলিয়ার ঝুমুর ও নাচনী নাচের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধন রয়েছে। নাচনী নাচের ঝুমুর গানের বিষয়বস্তু মূলত রাধাকৃষ্ণের প্রেম। বিরহ ও বিচ্ছেদের ভাবই প্রধান। এই গানে পদাবলী কীর্তনের প্রভাব রয়েছে।

নাচনী নাচে লৌকিক ঢং-র পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়।

আজকের বাই বা নাচনী নাচ সিংভূম-মানভূম অঞ্চলের বাইজিদের থেকে এসেছে। সিংভূম মানভূম অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সামন্ত প্রভুদের বিলাসের উপকরণ হিসাবে এই প্রথার জন্ম হয়েছিল। জমিদারি প্রথার অবসান, অর্থনৈতিক অবস্থার অবনমন সত্ত্বেও বিলাসের আকাঙ্ক্ষা অটুট থাকার তাগিদে এমনকি, সাধারণ মানুষের হাতেই কালক্রমে বাইজি পরিণত হল বাই বা নাচনীতে। মহল থেকে তাকে বাইরে এনে হাজির করা হল মাঠে, ময়দানে, মেলা প্রাঙ্গনে — নাচনীরূপে।

আপাত দৃষ্টিতে নাচনী প্রথাটি একটি স্বতন্ত্র প্রথা রূপে বিবেচিত হলেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা দেবদাসী প্রথা বা উত্তর ভারতের নর্তকী প্রথার সঙ্গে এই নাচনী প্রথার একটা ব্যাপক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই তিন প্রথার গভীরতর যোগসূত্র নিয়ে বিশদ ভাবনা চিন্তার অবকাশ আছে বলে মনে হয়। কিন্তু আপাতত এ-কথা থাক।

পুরুলিয়ার দরিদ্র কৃষিজীবী ঘরের মেয়েদেরই এই নাচনী পেশা গ্রহণ করতে দেখা যায়। মূলত গভীর অন্ধকারময় জীবন থেকে আপাত মুক্তির স্বাদ পেতে সে ঘরের বাইরে আসে এবং এর সাথে অবশ্যই ঝুমুর গানের স্বাভাবিক টানের প্রভাবও থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দরিদ্র পিতামাতা তার সুশ্রী কন্যাকে ছোটবেলা থেকে নাচে গানে সামান্য পারদর্শী করে সারা জীবন ভরণ পোষণের দায়িত্বে এবং অর্থের বিনিময়ে মালিক বা রসিকের কাছে বিক্রী করে দেয়। মালিক বা রসিক একই ব্যক্তি হতে পারে আবার নাও হতে পারে। রসিকই নাচে গানে পারদর্শী করে নাচনীরূপে গড়ে তোলার মূল ভূমিকা পালন করে। নাচনী মালিক বা রসিকের সাথে সহবাস করলেও কখনই বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা পায়না। নাচগানের বাইরে মালিক বা রসিকের ঘরসংসারের অন্দর মহলে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিতা। বাড়িঘর পরিচ্ছন্ন রাখা পশুপালন, জমির কাজে সহায়তা করা ইত্যাদির দায়িত্বে সে থাকে। সে কোনদিনই মালিক বা রসিকের জীবনে প্রথমা নয়, দ্বিতীয় নারীর উর্দ্ধে আসন ও সম্মান সে পায় না। সে হচ্ছে মালিক বা রসিকের উপার্জ্জনের হাতিয়ার যে উপার্জনের ওপর তার প্রায় অধিকার থাকে না বললেই চলে এবং একই সাথে সে ভোগেরও সামগ্রী। মানুষ হিসাবে, নারী হিসাবে তার কোন স্বাতন্ত্র অস্থিত্ব স্বীকার করা হয় না। সে চিরদিনই শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত এবং অপাঙ্‌ক্তেয়। একবার নাচনীর খাতায় নাম লেখালে পরে কোনদিনই ইচ্ছে করলেও সে স্বাভাবিক সমাজ

জীবনে ফিরে যেতে পারে না। সমাজ তাকে ভোগ করে কিন্তু গ্রহণ করে না। যতদিন রূপ যৌবন থাকে, গলায় থাকে সুর, নাচে থাকে সজীব ভঙ্গিমা ততদিন তার কদর থাকে, রসিকের কাছে, মালিকের কাছে, শ্রোতা ও দর্শকদের কাছে। অবশেষে শেষ জীবনে সে হয় আস্তাকুঁড়ের সামগ্রী। আর তখন রসিক, মালিক খোঁজে নতুন রূপযৌবনা নাচনী।

নাচনীদের জীবনে পরিবর্তনের হাওয়া অল্প বিস্তর লাগলেও নাচনীদের অশ্রুমাখা দীর্ঘশ্বাস ও রক্তাক্ত ইতিহাসের আজও মূলগত পরিবর্তন হয়নি।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। NACHI — Nisith Chakrabory ।

২। বাংলার লোকসাহিত্য —— ৫ম খন্ড - সম্পা: আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৩। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি —— ১ম খন্ড —— বিনয় ঘোষ।

৪। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ —— সম্পা: বরুণ কুমার চক্রবর্তী।

৫। রসিক —— উপন্যাস সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

৬। আমপাত চিরিচিরি —— উপন্যাস —— সৈকত রক্ষিত।

৭। ধূলা উড়ানি —— উপন্যাস —— সৈকত রক্ষিত।

৮। সিরকাবাদ —— উপন্যাস —— সৈকত রক্ষিত।

৯। পশ্চিমবঙ্গে পূজাপার্বণ ও মেলা (৫ম খন্ড)।

১০। লোকশ্রুতি —— সংখ্যা ——৭ ও ১২।

১১। ভারতের নৃত্যকলা —— গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়।

১২। ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার —— ৪ জন নাচনী ও ২ জন রসিক।

নারী কন্ঠে প্রতিবাদের গান

সোমা মুখোপাধ্যায়

সময়টা ১৯৭২ সাল। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে এক অস্থিরতা। ঠিক এমন সময়েই কলকাতা শহর থেকে অনেকদূরে মুর্শিদাবাদে ঘটে গেলো আর এক বিপ্লব। কোনো গোলাবারুদকে সঙ্গী করে নয়, সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করে একক ভাবেই এই বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন এক মহিলা। তাঁর নাম বুলুবিবি। মুর্শিদাবাদের এলাহিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা বুলুবিবি সেদিন 'পাবলিক ফাংশনে' মুসলমান বিবাহ গীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে নিঃশব্দেই যেন জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে। সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করে লড়াইয়ের নজির হয়তো ইতিহাস ঘাঁটলে অনেকটাই পাওয়া যাবে কিন্তু বাংলার এক নিম্নবিত্ত কৃষক পরিবারের অনামী এক নারী সেদিন যেভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন সেই 'বোবা ইতিহাসে'র কথাটা বোধহয় আজকের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সোচ্চারে ঘোষণা করাটা অত্যন্ত জরুরি। সেইসব মেয়েদের কথা সবার সামনে তুলে ধরা উচিত যাঁরা আজও তাঁদের মত করে ভেবে চলেছেন সমাজ পরিবর্তনের কথা। যাঁরা ধর্মের ঘেরাটোপ থেকে বেড়িয়ে এসে জোর করে কায়েম করতে চাইছেন নিজেদের অধিকার আর আঙুল তুলে শাসাতে চাইছেন কিছু মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী মানুষকে যাঁরা ধর্মের দাবায় ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে চান নিরীহ অবুঝ সাধারণ মানুষগুলোকে।

জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহ — পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রেই জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই তিনটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে রয়েছে হরেকরকম আচার-অনুষ্ঠান যে অনুষ্ঠানের অধিকাংশই লৌকিক ঐতিহ্যসম্পন্ন। আবার এর মধ্যে সবচেয়ে বর্ণময় বিবাহের আচার অনুষ্ঠান। বিবাহ হল সৃষ্টি আর মিলনের উৎসব। এই উৎসব ঘিরে তাই আনন্দের রেশ আর সেই রেশের অঙ্গ হিসাবে নৃত্য-গীতের প্রচলন সেই আদিম যুগ থেকে হয়ে আসছে। পশ্চিমবাংলায় বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহে নৃত্য-গীত প্রদর্শনের ধারাটা এখনো বর্তমান। গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া মানুষ যাঁরা বছরের অধিকাংশ সময় জীবনধারণের তাগিদে কঠিন পরিশ্রম করে থাকেন পরিবারে কারো বিবাহে তাঁদের মেলে সাময়িক অবসর। আর এই অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসাবেই তাঁরা নবপরিণীতা বর ও বধূকে ঘিরে নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠানে কাটাতে চান কয়েকটা দিন। কোথাও এই নৃত্য-গীত শুধু মেয়েরাই করে থাকেন কোথাও এতে অংশ নেন ছেলেরাও। এই ঐতিহ্যই চলে আসছে বহুদিন ধরে।

পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিয়ের গানের মধ্যে এই প্রবন্ধের জন্য নির্বাচন

করা হয়েছে মুসলমান বিবাহ গীতি। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রে কাজ করার সুবাদে মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলিম বিয়ের গানের কর্মশালায় হাজির হয়ে সর্বপ্রথম পরিচয় ঘটে মহিমা খাতুন ও তাঁর দলের সঙ্গে। এঁদের সঙ্গে কর্মসূত্রে বার বার যোগাযোগের মাধ্যমে জানতে পারা যায় নিছক গান নয় এ গানের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে একটা আন্দোলনের ইতিহাস। গবেষণার সুবাদে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মুসলিম বিবাহ গীতি নিয়ে কাজ করেছেন বা করে চলেছেন অনেকে। বিয়ের আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত ঐ গানগুলো সংগ্রহ করে তার একটা সাময়িক বিশ্লেষণই মূলত এই গবেষণার বিষয়। কিন্তু শুধুমাত্র কথা, সুর আর বিষয়বস্তু ছাড়াও এই গানগুলো কিভাবে হয়ে উঠেছে, প্রায় নিরক্ষর সাধারণ মহিলাদের প্রতিবাদের মাধ্যম বা এ গান জনসমক্ষে প্রচার করবার জন্য কি মানসিক নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে তাঁদের সেই প্রসঙ্গের অবতারণাটাই আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর সেই প্রয়োজনের তাগিদই এ প্রবন্ধ রচনার মূল প্রেরণা।

১৯৭২-এ বুলুবিবি যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা ঘটিয়েছিলেন তার রেশ ছড়িয়ে পড়েছিলো অন্যত্র। আর এই ভাবনাকে আরো বেশি মজবুত করতে ১৯৭৯ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসবে সংঘবদ্ধভাবে পরিবেশিত হয় বিয়ের গান। মহিমা, রাসিনা, গোলবানু, মেহেরুন্নেসা দল সেদিন জনসমক্ষে একটা বিশেষ মিলনকেই প্রকাশ করেননি এই শিল্প যে তাদের অর্থনৈতিক ভাবে সাবলম্বী করে তুলতে পাবে তারও একটা আভাস দিয়েছিলেন। পর্দানসীন মেয়েদের এতখানি স্পর্ধা স্তম্ভিত করে দিয়েছিলো মৌলবাদী কায়েমী স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষকে। এর জবাবে তারাও দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই সামাজিক সঙ্কটের মোকাবিলায় সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন জিয়াদারা গ্রামের শিক্ষক আনন্দ মন্ডল আর ধলা গ্রামের একরামুল হকের মতে হৃদয়বান কিছু মানুষ। সেদিন যদি এঁরা এঁদের পরিবারের মেয়েদের উৎসাহিত না করতেন তা হলে বোধহয় এই গান আর তাকে ঘিরে যে আন্দোলন তা এতটা জোরের সঙ্গে গর্জে উঠতে পারতো না। মানুষের মঙ্গল আর চেতনার উন্মেষে শিল্পের পূতাগ্নি জ্বালাতে যে সহাযতা তাঁরা সেদিন করেছিলেন সেই অগ্নিকে অপবিত্র করার জন্য সবরকমের অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ। একরামুল হকের বোন সাকলামা আর তার স্বামীকে বিয়ের গান পরিবেশনের জন্য একঘরে করা হয়েছিল। তবু শিল্পের প্রতি টান কমেনি সাকলামার। তাই একরাম আলির পরিবারের সবাই যখন বিয়ের গান পরিবেশন করছিলেন বাড়িতে আসা অতিথিদের সামনে তখন ঢোলকের আওয়াজে ছুটে এসেছিলেন সাকলামা। আবার নতুন করে একঘরে হবার ভয়ে চুপ করে বসেছিলেন ঘরের এক কোণে। হয়তো মনে মনে সুরও মিলিয়েছিলেন সবার সঙ্গে। সেদিন শুধু মুসলিম মহিলারাই নন হিন্দু আনন্দ মন্ডলের ওপরও নেমেছিল সামাজিক নিপীড়নের খড়গ। বিয়ের গানের দলে তাঁর কন্যা হারমোনিয়াম বাজাতেন। অচ্ছুৎ ঐ মেয়েগুলোর সঙ্গে মেলামেশার অপরাধে আনন্দ মন্ডলের পরিবারকেও কোণঠাসা

করেছিল গ্রামের মানুষ। কিন্তু মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধির জাগরণ যদি একবার হয় হাজার অত্যাচার আর নিপীড়ন দিয়ে তাকে কি ঠেকিয়ে রাখা যায় ? মানুষের অন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতই নিরন্তর সে বয়ে চলে।

এইবার আসা যাক গানগুলোর প্রসঙ্গে। কি আছে এই গানের মধ্যে যার কণ্ঠরোধে ব্যস্ত স্বার্থান্বেষী মানুষরা ? সাধারণভাবে বিয়ের নানা অনুষ্ঠান যেমন কনে দেখা, জলভরা, গায়ে হলুদ, ক্ষীর খাওয়া, ছাদনাতলা, বর আসা, কন্যা বিদায়, বধূবরণ, সমস্ত পর্ব ঘিরেই তৈরি হয় বিয়ের গান। বিয়ের প্রায় ৭ দিন আগে বর ও কনে দুপক্ষের বাড়িতেই সন্ধ্যা বেলায় ঢোলক বাজিয়ে গানে গানে ভরিয়ে শুভ উৎসবের সূচনা করেন মেয়েরা। পরিবারের মেয়েরা ছাড়াও গ্রামের প্রতিবেশীরাও যোগ দেন এতে। সমস্ত অনুষ্ঠানই অন্তঃপুরে। গানের সঙ্গে চলে নাচ আর রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক নাটক বা কাপ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষের প্রবেশ নিষেধ এই অনুষ্ঠানে। এ একমাত্র যেন নারীদেরই নিজস্ব যেখানে হাসি ঠাট্টার ছলে দৈনন্দিন জীবনের নারীমনের ভাবনাই প্রকাশ পায় তাবলে এই গান গাওয়া নিয়ে সমাজের কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের অভিযোগ কেন ? কেনই বা এই গান গাওয়ার অপরাধে আক্রমণ চালানো হয় মহিমা-রাসিনাদের মত মেয়েদের ওপর ?

শিল্পমাধ্যম যতক্ষণ শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে থাকে ততোক্ষণ তাকে কণ্ঠরোধেরও কোনো প্রশ্ন থাকেনা। কিন্তু যেইমাত্র তাকে ব্যবহার করা হয় চেতনা জাগানোর কাজে, মানুষষকে যখন সে দেখায় আলোর সন্ধান, তখনই তাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার সবরকম প্রচেষ্টা একযোগে কার্যকরী হয়ে ওঠে। আজ মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমান বিয়ের গানকে ঘিরে যে আন্দোলন তার প্রেক্ষাপটও এই নিয়মেরই অনুসারি।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিয়ের গানের ক্ষেত্রে কয়েকটি পর্ব লক্ষ্য করা যায় একথা খানিকটা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। মুসলমান বিয়ের গানেরও ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু বিষয়বস্তু যেভাবে এসেছে এই সমস্ত পর্বের গানের মধ্যে দিয়ে তা যদি সঠিকভাবে কেউ পর্যালোচনা করেন তাহলেই দেখতে পাবেন কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বা কখনো চাপা কান্না আবার কখনো কি জোরালো ভাবে প্রতিবাদ করা হয়েছে সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। যেমন একটি মেয়ের বিয়েতে যদি 'ষোল দান' (এই বিষয়টা হিন্দু সমাজের অনুকরণে আজ মুসলমান সমাজে গৃহীত হয়েছে। মুসলমান সমাজে কন্যাপণ দিতে হতো বরপক্ষ কনের বাবাকে। বর্তমানে বরপণের রেওয়াজ চালু হয়েছে) না দেওয়া হয় তবে মেয়েটিকে কিভাবে হেনস্থা হতে হবে শ্বশুরবাড়িতে তারই একটি নমুনা তুলে দেওয়া হলো :—

'আমার বাবার দুয়ারে জোড়া আমের গাছটি হে
বাতাসে ঝড়ে ঝড়ে পড়ে, ও আব্বাজান।
ষোলদান পুজায়ে দাও ও আব্বাজান
পরের চাচী বলিবে আমার অন্তর কাঁদিবে

ঝড়িবে সে নয়ন চোখের জল ও আব্বাজান'

একটি অত্যন্ত পরিচিত গান। যে গানে বিবাহের পূর্বে মেয়েটি তার বাবাকে এই যোলদান না দিলে ভবিষ্যতে তার শ্বশুরবাড়িতে কি ধরণের মানসিক নিপীড়ন হতে পারে তারই ইঙ্গিত দিয়েছে।

অন্যদিকে কন্যাপণও যে কত মর্মান্তিক তারও একটি নমুনা রয়েছে অপর একটি গানে। সেখানে ছাদনাতলায় নব বিবাহিত বধূ তার বরের কাছে এই বিবাহে তার পরিবারের লোকজন কেমন ভাবে লাভবান হয়েছে সেই বিষয়ে সরাসরি অনুযোগ করে ঃ—

আলমতলে (ছাদনাতলায়) পালং বিছায়ে হে নয়ালাল
এসো রঙ্গের মরালের বাগান
কন্যার বাবা সাইকেলের কাঙালি হে নয়ালাল
তার জন্য — বিটি করলে দান
কন্যার চাচা ঘড়ির কাঙালি হে নয়ালাল
তারই জন্য ভাইঝি করলে দান

বিবাহের মিলন উৎসব ছাপিয়ে সদ্যপরিণীতা বধূর হাহাকারের মধ্যে দিয়ে একটা চাপা প্রতিবাদ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে নয়, তার নিজের পরিবারেরই বিরুদ্ধে। সে বাবা কাকার স্নেহ ভালোবাসায় সে লালিত তারাই সাইকেল আর ঘড়ির বিনিময়ে তাকে বিকিয়ে দিচ্ছে অন্য মানুষের কাছে। সামাজিক চাপে হাত বদলের এবেলায় সে পুতুল বই আর কিছু নয়।

আবার এই বিয়েকে কেন্দ্র করে মা মেয়ের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাতেও চিড় ধরে। কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে মা নিজেকে এতটাই দোষী মনে করে নিজেকে যে খোদা তালার কাছে কপালের লিখন নিয়ে যেমন জানায় তেমনি উপযুক্ত পণ জোগাড় না করবার যন্ত্রণাতেও সে ডুকরে মরে :- .

'পেটে ধরে বিধি জীবন হল মাটি
আমার মরণ কর আল্লা
আমার সহেনা এ জ্বালা
কোথায় পাবো ঘটি বাটি জগ থালা
আমার মরণ কর আল্লা'

কিন্তু এমনটা কি হবার কথা ? সন্তান ছেলে-মেয়ে যাই হোক না কেন মায়ের কাছে তো সন্তানই। তাই সত্যিই কি এগুলো হাহাকার না কি আগামী দিনে এমন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারও চোখে জ্বলে উঠছে চাপা ক্রোধাগ্নি ? কেননা সাধের জামাইকে নিমন্ত্রণ জানাতে গিয়েও তো দিতে হবে উপহার। তাও আবার এমন সময় যখন ঘরে ফসল

ওঠেনি। তাই বাধ্য হয়ে জামাইকে অনুনয় জানানো ছাড়া আর কি বা করতে পারে অভাগিনী মা ঃ—

'বেনাফুলের জারি জুরি, কুসুম ফুলে সেজো না
আকাশেতে নাইরে পানি জমিতে ধান হলো না
সাধের জামাই রাগ করেছে
সাইকেল ছাড়া আসবে না
এ বছরকার বছর বাবা
সাইকেল দিতে পারবো না।'

কিন্তু এতো অনুনয় কেন ? বিয়ে তো দুই পরিবারের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করে। সেই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য কেন ঘুষ দিতে হবে জামাইকে ? একথা একসময় জানতো না সয়দা বা গোলবানু কিন্তু তিলে তিলে তাঁদের চেতনাকে প্রসারিত করতে যে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন একরাসুল হক বা আনন্দ মন্ডল সেই শিক্ষা উড়িয়ে দেওয়া যায় কি ? আজ একরামুল হক বা আনন্দ মন্ডল প্রয়াত। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মাটি চাপা পড়েনি তাদের প্রয়াস। তাই আজ ধলাগ্রামের মেয়েরাও সোচ্চারে গানে গানে ঘোষণা করে ঃ—

'বেচবো না বাড়ি বেচবো না গাড়ি
নেবো নারী পুরুষের সমান-অধিকার'

মুর্শিদাবাদ জেলার বিয়ের গানের একটি অন্যতম আকর্ষণ কাপ বা বিদ্রূপাত্মক নাটিকা। আলোচনা করে দেখা গেছে এই কাপের মুখ্য চরিত্র প্রায় সব জায়গায় হয় পুলিস। কিন্তু পুলিস কেন ? আর কোন চরিত্র কি নেই ? আমাদের প্রশ্নের জবাবে হেসে গড়িয়ে পড়া মেয়ের দলের জবাব 'পুলিসের মত অত জোর কার আছে ?' পুলিসের সঙ্গে রঙ্গ তামাশার মধ্যে দিয়ে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় মেয়েরা। '৭০ এর দশকে এই জেলার হাটপাড়ায় পুলিসি ক্যাম্পের অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে আছে তাদেরই গান। যে গান এখনো তাঁদেরই মুখে মুখে ফেরে ঃ—

মাসকলাই আর মুগের ডাল
খোকনবালা পেটেরে
ক্যানে পুলিস আসছিলো দেশে
হাটপাড়ার ঐ মেয়েগুলি ধুকুর ধুকুর দৌড়ে-রে
ক্যানে পুলিস আসছিল দেশে —

মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংস্কৃতির গবেষক শ্রী মুজফ্ফর হোসেন এই গানটার আর একটা যে অর্থ আমাদের ব্যাখ্যা করে জানিয়েছিলেন তা থেকে পুলিস কিভাবে পুরুষ শাসিত সমাজের প্রতীক সেই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। এই গানটির ব্যাখ্যা তিনি করেছিলেন এইভাবে — দীর্ঘদিন ধরে জামাই শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করছে। ভালো

ভালো খাবার খেয়ে তার গায়ের রং হয়েছে মাসকলাই আর মুগের ডালের মত চকচকে। তাঁর এমন ভুঁড়ি হয়েছে যে তাকে দেখে মনে হয় গর্ভবতী। সে শুধু এতেই সন্তুষ্ট নয় তার যুবতী শালীদেরও সে যখন তখন উৎপীড়ন করছে। তার অত্যাচারে শালীর দলও এদিক ওদিক ছুটে পালাচ্ছে। ব্যঙ্গের এ হেন নজির কিন্তু সত্যিই অকল্পনীয়।

লোকশিল্পকে যদি সমাজের দর্পণ বলা হয় তবে তার সার্থক রূপায়ণের ইঙ্গিত মেলে মুসলমান বিয়ের গানে পরিবার কল্যাণ, শিশুস্বাস্থ্য, সাক্ষরতা, নেশা না করা প্রভৃতি সব নিয়েই নিত্য নতুন গান বেঁধে চলেছেন মুর্শিদাবাদ জেলার মেয়েরা। তাই তাদের গানে অবলীলায় উঠে এসেছে রাধা-কৃষ্ণের কথা। এই শ্যাম তার ঘরের ছেলে। তাই তারাও তাকে নিয়ে গান বাধে ঃ—

'আমাব শ্যাম দাঁড়িয়ে কদমতলে
কেন নেমেছিলাম জলে'
অথবা
'শ্যাম গিয়েছে দুর্বা নিতে'
আয়না ধরে দেখবো
বা
আমি ছিমছাম তুলিতে যাবো নাচিতে হে শ্যাম
আমার কোলে ঘুমাইলো হে জাদু হে শ্যাম

সম্প্রীতির এমন স্নিগ্ধ বাণীর যদি রেশমাত্র পৌঁছাত কোথাও কোথাও আজ হয়তো সেখানকার দাবানল অনেকটাই নিভত। তবে সে চেষ্টা ছাড়েনি এই মেয়েরা। একটি দুটি করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে তাদের কথা। নদিয়া, বীরভূমের বিয়ের গানের শিল্পীরা অনেকেই আভাস পেয়েছেন মহিমা-রাসিনাদের বিয়ের গানের দল সম্বন্ধে। এগিয়ে আসতে হয়তো তাদের একটু সময় লাগবে। প্রাথমিক পর্বে সলতে পাকানোর যে কাজটি তাঁরা ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছেন সেই সলতে দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলনের অপেক্ষায় আমরা রইলাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা ইংরাজি সাহিত্য বিভাগ ও অধিকর্তা মানবী বিদ্যাচর্চা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
২. শ্রী শক্তিনাথ ঝা।
৩. শ্রী মুজফ্ফর হোসেন।
৪. শ্রী প্রদীপ ঘোষ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।
৫. মহিমা খাতুন, রাসিনা-খাতুন, গোলবানু বিবি, মেহেরুন্নেসা বিবি, সয়দা বিবি প্রভৃতি, শিল্পী, মুসলমান বিয়ের গান, মুর্শিদাবাদ।

আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়াসে উনিশ ও বিশ শতকের বঙ্গ নারী

তপতী দাশগুপ্তা

১

ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ঋক্ বৈদিক যুগের পরবর্তীকাল থেকে নারী স্বাধীনতা প্রায় অবলুপ্ত হয়। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখি যে, নারীকে কেবলই তার স্বাধীনতা, শিক্ষা, প্রগতির পন্থা থেকে বিচ্যুত করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ, অশিক্ষা, কঠোর বৈধব্য, সতীদাহ, কুলীন প্রথা ইত্যাদির অন্তরায়ের মধ্য দিয়ে নারী ক্রমশ তার নিজস্বতাকে বিস্মৃত হয়েছিল। ডাঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'বেদের যুগের নারী'-তে এই প্রশ্নও তুলেছেন যে ঋক্ বৈদিক যুগের নারী সত্যিই কতখানি প্রগতিশীলা ছিল ? মুষ্টিমেয় কিছু মহিলা যেমন, গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা, লোপামুদ্রা বা খনার নাম ছাড়া আমাদের কাছে এমন কোন প্রমাণ আছে কি যে সাধারণ স্তরের নারীও শিক্ষিতা ও প্রগতিশীলা ছিল ? বৈদিক যুগের চতুরাশ্রমের উল্লেখ আমরা পাই ইতিহাসের পাতায়; কিন্তু সর্বস্তরের নারীশিক্ষার সবিশেষ উল্লেখ আমরা কোথাও পাই না। তবে একথা ঠিক যে, নারী তার আপন আসন থেকে বিচ্যুত হয়েছিল সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রতি পর্যায়ে নারীর এই অবমাননা ও হীনমন্যতার পরিচয় আমরা পাই।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে, অর্থাৎ ৬০ বা ৭০ দশক থেকে ভারতীয় নারী, বিশেষ করে বঙ্গনারীর মধ্যে এক ধরণের বিশেষ সচেতনতাবোধ জাগ্রত হয়। এজন্য উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ, তৎসঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন এক প্রগতিবাদী, নূতন চিন্তাধারার উন্মেষে সাহায্য করে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী লেখনী এবং নারীকল্যাণমূলক কর্মের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে (যেমন, বিধবা বিবাহ, সতীদাহপ্রথা রোধ) নারীব দীর্ঘকালের বেদনা, বঞ্চনাবোধ, রিক্ততাবোধকে সঞ্জীবিত করে তোলা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বঙ্গনারী ক্রমশ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় এবং শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করে। কিন্তু এই পর্যালোচনার আগে এমন কিছু নারীর নাম করা উচিত, যাঁরা ব্যক্তিগত প্রয়াসে নিজেদের শিক্ষিত করেছিলেন এবং কখনও আত্মজীবনী, কখনও গদ্য, কখনও পদ্য সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত ও প্রস্ফুটিত করে তুলেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 'আমার জীবন' আত্মজীবনীতে রাসসুন্দরী দেবী ছিলেন একজন অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থ বধূ ও বহু সন্তানের জননী, যিনি তাঁর ভক্তিভাবকে আরও সঞ্চারিত করার কৌতুহলে

শাস্ত্র পড়ে নিজে শিক্ষিতা হতে চেয়েছিলেন এবং অসামান্য প্রচেষ্টায় স্বাক্ষর প্রাপ্তা হয়ে নিজস্ব বেদনাময় আত্মজীবনী লেখায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'আমার জীবন' গ্রন্থের একজায়গায় রাসসুন্দরী দেবী লিখেছেন — "আমাদের সেকালেতে মেয়েছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষা করা নিয়ম ছিল না। সেকালের লোকেরা বলিত, 'এ আবার কি ? মেয়েছেলে লেখাপড়া করিতেছে ? মেয়েছেলে লেখাপড়া করা বড় দোষ। মেয়েছেলে লেখা শিখিলে সর্বনাশ হয়, মেয়েছেলের কাগজ-কলম হাতে করিতে নাই।' এই প্রকার নিয়ম সর্বত্রই চলিতে ছিল।" "Words to win' Amar Jivan - A modern autobiography" গ্রন্থে ডা: তনিকা সরকার দেখিয়েছেন কিভাবে রাসসুন্দরী দেবীর মত গৃহবধূ, তাঁর গ্লানিময়, অশ্রুময় জীবনীকে আপন প্রচেষ্টায়, আপন ভাষায় লিপিবদ্ধ করে নারী প্রগতির ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক অঙ্গীকার এনেছেন। সামান্য ভক্তিরসের মাধ্যমে তিনি তাঁর নিজের অগোচরে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে গেছেন। 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থে তৎকালীন বিদূষী মহিলাদের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, প্রসন্নময়ী দেবী, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, অবলা বসু প্রমুখ মহিলারা তাঁদের দৃপ্ত এবং বাঙ্ময় লেখনীর মধ্য দিয়ে সমাজ সচেতনতাকে ক্রমশ উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। নারী সচেতনতাবোধ যে একটি সজীব রূপ নেয় তার দৃষ্টান্ত আমরা পাই ১৮৬৭ সালে ক্ষীরোদা মিত্রের এই লেখায় — "বিদ্যাহীনা জ্ঞানহীনা যত নারীগণ

রয়েছি মোরা পশুর মতন।"

১৮৬৮, ১৮৭১ সালে 'বামাবোধনী' পত্রিকায় বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে এই নারীজাগরণের স্ফুরণ পরিস্ফুট হয়।

"পরাধীন হইয়া জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যু শত শত গুণে শ্রেয়স্কর বলিতে হইবে" — ১৮৬৮।

১৮৭১ সালে লেখা হয়, "আমাদের দেশীয় অঙ্গনাগণ যে প্রকার অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছেন, তাহা হইতে যে কোনদিন উদ্ধার হইবেন, তাহা বলা যায় না।" মাত্র সতেরো বছর বয়সের মহিলা পঙ্কজিনী বসুর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের লেখার মধ্যে সাম্য-অসাম্যের চিন্তাধারা আমাদের বিঘ্নিত করে।

"আমাদের দেশে সবে বড় লোকে সেবে
দলে দরিদ্রেরে
উচ্চজনে পদে লুঠে, দেখিলে দীনেরে
দূরে যায় সরে।"

২

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যে সম্মিলিত মহিলা সচেতনতাবোধ ও মহিলা

আন্দোলনের চিত্রটি পাই, তার একদিকে ছিল সংগঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে দেশের মানুষকে বিশেষ করে মহিলাদের স্বনির্ভর করা এবং জাতীয়তাবোধের সুসুপ্ত চিন্তাধারাকে উন্মোচন করা। ডা: জয়শ্রী সরকারের মতে এই মহিলা আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্ত:পুরবাসিনী এবং সমাজচ্যুতা বঙ্গ মহিলাদের সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা। এর কারণ, মহিলারা তাদের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অসম্মান ও অবমাননার অবসান চাইছিলেন। ১৮৯০ সালে 'সাহিত্য' পত্রিকায় কৃষ্ণভাবিনী দাসী লেখেন — "হিন্দুমহিলাদের অবস্থা সংশোধনের ও পুরুষের সহিত সাম্যের কথা উঠিলেই অনেকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া উহাদের দেবীপদের প্রমাণ করেন। কিন্তু আমরা কাজে ঐ দেবীর মান্য কই দেখিতে পাই ?"

বঙ্গীয় বিধবাদের সেকালে অত্যন্ত দুর্বিসহ অবস্থা ছিল। নানা নিয়মের বেড়াজালে তাদের আবদ্ধ করে এবং সমস্ত সামাজিক সম্মান থেকে বঞ্চিত করে তাদের সংসারের আবর্জনা স্বরূপ দেখা হত। এই যুগে তাই, বিধবাদের পুনর্বাসনের প্রচেষ্টাকে একটি মহৎ প্রচেষ্টা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সীতানাথ তত্ত্বভূষণের মতে ১৮৬৪ সালে বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের উদ্যোগে, নিজ গৃহে, বরানগরে, বিধবাদের জন্য যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, সেটিই বঙ্গীয় মহিলাদের স্বনির্ভর করার প্রথম প্রয়াস। এই স্কুলটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, কিন্তু এরই প্রভাবে ১৮৮৭ সালে হিন্দুবিধবাদের জন্য একটি হোম প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে বিধবারা নানা বিষয়ে এমনকি গৃহকর্ম বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং Entrance পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন। স্বর্ণকুমারী দেবী ও সরলাদেবী এটি পরিদর্শনে আসেন এবং এই হোমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সংঘবদ্ধভাবে মহিলা প্রতিষ্ঠানের সূচনার আগেই, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিশেষ কয়েকটি মহিলা সমিতির স্ফুরণ দেখা যায়। বামাহিতৈষিণী সভা (১৮৭১), আর্যনারী সমাজ (১৮৭১), বঙ্গ মহিলা সমাজ (১৮৭৯), ব্রাহ্মিকা সমাজ (১৮৮৫) ইত্যাদি বঙ্গ নারীর মানসিক গঠন ধারায় সাহায্য করে। যে সমস্ত মহিলারা এই সমিতিগুলিতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন, সৌদামিনী খাস্তগীর, সৌদামিনী মজুমদার, রাধারাণী লাহিড়ী, স্বর্ণলতা বসু প্রমুখ। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যিকরা সাহিত্যের দর্পণে নারীর গ্লানি ও অশ্রুকে মর্মর করে তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে 'রোহিনীর' ব্যথা, শরৎচন্দ্রের লেখনীতে 'রাজলক্ষ্মী' বা 'অভয়ার' যন্ত্রণা, রবীন্দ্রনাথের লেখায় 'বিন্দুর' অসহায়তা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের ব্রাহ্ম আন্দোলনে এক অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল স্বনামধন্য ঠাকুর পরিবার। এই পরিবারে পুরুষ ছাড়াও, মহিলারা ছিলেন যথেষ্ট শিক্ষিতা ও প্রগতিশীলা সত্যেন ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর সাহিত্যপ্রীতির কথা আমরা বহু সমসাময়িক লেখায় এবং পরবর্তী লেখকদের সাহিত্যে আলোচনায় পাই। স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন ওই পরিবারেরই একজন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

কন্যা ও রবীন্দ্রনাথেব সহোদরা, যিনি তাঁর দ্যুতিময়ী প্রতিভার বলে তখনকার সাহিত্যজগতে এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৬ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী নিজেব উদ্যমে প্রতিষ্ঠা কবেন 'সখী সমিতি।' এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল অসহায়া, অবিবাহিতা এবং বিধবা নাবীদেব চার বৎসরের জন্য শিক্ষা দান; চুক্তি ছিল শিক্ষা শেষে 'সখী-সমিতিব' জন্য নির্দিষ্টকালেব জন্য কাজ করা। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণীও ছিলেন একজন বিদূষী মহিলা এবং তিনি এই 'সখী সমিতির' কাজের জন্য সর্বান্তকরণে করেন। 'সখী সমিতির' বাৎসরিক মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় 'মহিলা শিল্প মেলা' নাম নিয়ে। 'ভারতী' পত্রিকায় সমসাময়িক অনেক উদ্যমের সঙ্গে এই মেলারও উল্লেখ আছে। যে সমস্ত মহিলারা এই 'সখী সমিতির' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরাণী, সরলা রায়, বরদাসুন্দরী ঘোষ, সুবর্ণপ্রভা বসু, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, রাধারাণী লাহিড়ী, কামিনী সেন প্রমুখ।

১৮৯২ সালে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বনলতা প্রতিষ্ঠা করেন 'সুমতি সমিতি' বরানগরে, একই উদ্দেশ্য নিয়ে। ১৮৯৫ সালে কাদম্বরী লাহিড়ী প্রতিষ্ঠা করেন 'ভারত মহিলা সমাজ,' যার উদ্দেশ্য ছিল নারীর মানসিকতা, বুদ্ধি ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সঞ্জীবিত করা। দরিদ্র, বিধবা ও অসহায়া নারীর সামাজিক স্বীকৃতিদানকে এই প্রতিষ্ঠান মূল্যবান মনে করে। এই সময়ে কৃষ্ণভাবিনী দাসী, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, লীলাবতী মিত্রের মত মহিলাবা মহিলা আত্মমর্যাদা, সচেতনতাবোধের জন্য প্রভূত প্রচেষ্টা করেন তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে। কৃষ্ণভাবিনী দাসী লেখেন, "আমি নিজের সাধ্যমত কার্যক্ষেত্রে মহিলাদের পথপ্রদর্শক হইতে মনস্থ করিয়াছি। সাধক, বিধবাকে কোথায় আছেন, আসুন আমি আপনাদের হাত ধরিয়া খাটিতে চাই।" গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী তাঁর বিষম সমস্যা' প্রবন্ধে একই অভিমত ব্যক্ত করেন। গিরিন্দ্রমোহিনী মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যও তাঁর প্রাঞ্জল মতামত বাক্ত করেন। লীলাবতী মিত্র বলেন, শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় মহিলাদের উচ্চশিক্ষিতা বা উপার্জনশীলা হয়ে কোন লাভ নেই; প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিটি অন্ত:পুরবাসিনীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সক্ষমতা থাকার প্রয়োজন আছে। হস্তশিল্প, অঙ্কন, রন্ধন, সূচীশিল্প, ছাপাই, বাঁধাই প্রতিটি কাজেব মধ্য দিয়েই নারী তার আপন গুণাগুণ প্রকাশ করতে পারে এবং উপার্জন করতে পারে। উনিশ শতকের শেষে নারী সংক্রান্ত এই ধরণের বৈপ্লবিক মতামত সমাজে বিস্ফোরকের কাজ করে।

১৯০১ সালে সরলা দেবী চৌধুরাণীর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারত স্ত্রী মহামন্ডল।' সরলাদেবীর আবেদন ছিল সর্বভারতীয় এবং সর্বস্তরের মহিলার জন্য। এটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতা, এলাহাবাদ, হাজারিবাগ, হায়দ্রাবাদ, করাচী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, মেদিনীপুরে। মহিলাদের নির্মিত হস্তশিল্প বিপণনের জন্য 'পুরনারী নির্বাহ ভান্ডার' প্রতিষ্ঠিত হয়। সরলাদেবী স্বদেশী কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁর

প্রতিষ্ঠিত 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' স্বদেশী দ্রব্য তৈরি এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জনের এক বৃহৎ পরিকল্পনা সূচী গ্রহণ করে। ভারতীয় মনোবিকাশেব জন্য যে সমস্ত স্বদেশী নাটক, যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, তাতেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, যেমন 'প্রতাপাদিত্য ফেস্টিভাল।'

১৯০৬ সালে হিরন্ময়ী দেবীর (স্বর্ণকুমারীর কন্যা) প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'মহিলা শিল্প সমিতি।' অন্ত:পুর শিক্ষার জন্য হিরন্ময়ী আলাদা মহিলাদের নিযুক্ত করেন। বিধবা এবং অন্যান্য দুঃস্থ মহিলাদের বিশেষভাবে হাতের কাজের ব্যবস্থা হয়, যেমন গামছা, শাড়ি তৈরি, লেস বোনা ইত্যাদি। বাৎসরিক শিল্প প্রদর্শনী এবং গ্রামাঞ্চলে এই ধরণের শিক্ষার বিস্তার করে নারী শিক্ষাকে হিরন্ময়ী দেবী ক্রমশ জনপ্রিয় করে তোলেন। ১৯১৯ সালে অবলা বসুর উদ্যোগে 'নারী শিক্ষা সমিতি' একই উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের সচেতন করে তোলার গুরুদায়িত্ব নেয়। ১৯২২-এ ঝাড়গ্রামে 'বিদ্যাসাগব বাণী ভবন' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নারীকে স্বয়ং নির্ভরশীলা এবং স্বপার্জনশীলা করে তোলার সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া হয়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে, মহীয়সী মহিলা সরোজিনী নাইডু ১৯১৭-তে প্রথম ব্রিটিশ সরকারে ভারতীয় মহিলাদেব ভোটাধিকার নিয়ে আবেদন করেন। ১৯১৭ ছিল রুশ বিপ্লবের বছর যখন সাম্যবাদী ভাবধারা আপ্লুত করেছিল কিছু ভারতীয়কে। সারোজিনী নাইডুর মত উচ্চশিক্ষিতা মহিলা পুরুষ ও নারীর অসাম্যের ভিতটি ভেঙে দিতে চান দৃঢ় হস্তে। এই সময় আরেকজন আলোকপ্রাপ্তা মহিলা, সরলা রায় লন্ডনে "Indian Women's Edcuation Association"-এর সূচনা করেন এবং ১৯২০-তে 'গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন যেটি পরবর্তীকালে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। 'মহিলা সেবা আলয়' প্রতিষ্ঠা করেন তিনি সেইসব মহিলাদের জন্য যারা অসহায়, অথচ আত্মনির্ভরশীলতার জন্য প্রয়াসী।

১৯২১ সালে গান্ধীবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিতা আশালতা সেন গান্ধীর আদর্শে ঢাকার গন্ডোরিয়াতে প্রতিষ্ঠা করেন 'শিল্পাশ্রম' এখানে গান্ধীর দর্শন অনুযায়ী চরকা ও খাদি শিল্পের উপর গুরুত্ব দিয়ে বাংলা তথা ভারতীয় কুটির শিল্পকে সমৃদ্ধ করে মহিলাদের উপার্জনের পথ প্রশস্ত করার প্রয়াস নেওয়া হয়। গুরুসদয় দত্তর স্ত্রী সরোজনলিনী দত্ত ১৯১৩ সালে প্রথম 'মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুদসয় দত্ত লিখেছেন, "It was one of her ambitions to open in every village and every town a centre for vocational training of widows, so that they might not have to live as a burden upon others or to sleve for a living." এরপরে বীরভূমে (১৯১৬), সুলতানপুরে (১৯১৭), রামপুরহাটে (১৯১৮), বাঁকুড়ায় (১৯২১), সরোজনলিনী 'মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর এই মহান প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন গুরুদসয় দত্ত নিজে বাংলার গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে 'মহিলা সমিতির' শাখা প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৩১ সালে চারুশীলা মিত্র বলেন যে মহিলাদের এমনভাবে শিক্ষিত হতে হবে যাতে তাদের অন্যায়ভাবে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হয়, সেই চেতনাবোধ তাদের যেন থাকে এবং সেই

চেতনাবোধ নিয়ে যেন তারা সম্পত্তির অধিকারিণী হবার জন্য আবেদন করতে পারেন।

৩

উনিশ ও বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নারীর এই সংগ্রাম কিছুটা সার্থকতার পরিচয় বহন করে। ভারতীয় সংবিধানে (১৯৫০) মহিলাদের জন্য বিশেষ স্থান নির্ধারিত হয় ১৪, ১৫ ও ১৬ অনুচ্ছেদে। সংবিধানের Article 31A এবং Article ৪০-র মাধ্যমে, পঞ্চায়েতের তিন স্তরেই ভারতীয় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত হয়। ১৯৯২-তে সংশোধনী আইন (73rd Amendment) ভারতীয় মহিলাদের জন্য ১/৩ অংশ আসন নির্ধারিত করে দেয় এবং ফলস্বরূপ দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশি সার্থকতার নজির বহন করে। বিগত যুগের তুলনায়, বিংশ শতাব্দীর এবং একবিংশ শতাব্দীর মহিলারা অনেক বেশি শিক্ষিতা, সাবলম্বী এবং স্বাধীনচেতা হয়েছেন, তারা অনেক বেশি ব্যক্তিত্বময়ী হয়েছেন এবং পুরুষের থেকে কোন অংশেই আজ আর তারা পশ্চাৎপদ নেই, তবুও গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে আজও বহু অশিক্ষিতা, অর্ধশিক্ষিতা, অবগুন্ঠিতা, কুসংস্কারাচ্ছন্না মহিলারা রয়েছেন, যারা দীর্ঘ সংস্কারের সুসুপ্তির অন্তরালে রয়েছেন। সাংখ্যিক দিক বিচার করলে হয়তো বহু মহিলারাই এগিয়ে এসেছেন রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচীতে, কিন্তু মানগত দিক থেকে তারা কতটা উপযুক্ত হয়েছেন, তা এখনও বিশ্লেষণের বিষয়। ডা: তণিকা সরকারের মতে রাসসুন্দরী দেবীর মত মহিলারা একদিন রাধা-কৃষ্ণের গভীর দর্শন উপলব্ধি করার জন্য বা ভক্তিরসে সিঞ্চিত হবার জন্য নিজেকে শিক্ষিতা করেছিলেন বহু গ্লানির সোপান পেরিয়ে। আজকের নারী সেই তুলনায় শুধু ভক্তিরস নয়, রাজনীতি, বিজ্ঞান সাহিত্য-সংস্কৃতির সব রসই আস্বাদন করার অধিকার অর্জন করেছে স্বকীয় অধ্যবসায়ে। পুরাতনকালের বহু গ্লানি, বহু অশ্রু, বহু অবমাননার মধ্য দিয়ে নারী আজ তার আপন আসন করে নিতে বহুলাংশে সফল হয়েছে পুরুষশাসিত সমাজে এ এক বৈপ্লবিক বার্তা। তবুও নারীর সংগ্রাম আজও চলেছে আরও প্রতিষ্ঠা, আরও সাফল্যের পথে।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। ডা: সুকুমারী ভট্টাচার্য : 'বেদের যুগের নারী', আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৭।

২। Dr. Tanika Sarkar, "Hindu Wife, Hindu Nation, Religion, Community, Cultural Nationalism, Permanent Block, Delhi, 2000.

৩। Dr. Tanika Sarkar, "Words to Win" : Amar Jivan : "A modern Autobiography", Kali for women, New Delhi, 1999.

৪। Jaysree Sarkar, "Bengali Women's perception of self-relience", in the late 19th and early 20th Centuries The Quarterly Review of Historical Studies, Volume - XXXVI, April, Sept. 1996, Mar. 1&2.

৫। Sitanath Tattabhusen, "Social Reform to Bengal", Calcutta - 1904.

৬। রাসসুন্দরী দেবী, — 'আমার জীবন', ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:, কলিকাতা, ১৩৬৩।

৭। Dr. Sumit Sarkar, 'The Swadeshi Movement in Bengal 1903-8', People's Publishing House, New Delhi, 1973.

৮। Dr. Tapati Dasgupta & Prof. R.N. Chattopadhyay, — 'The issue of conflict in Garden Role in India; Socialist Perspective, Vol. 27, No. 3-4, Dec. 1999-March, 2000.

সারাংশ

নারীর প্রগতির পথে পুরুষ প্রচেষ্টা ঃ উনিশ শতকের আলোয়

জয়শ্রী সরকার

নারীর সচেতনতার ইতিহাস শুধু নারীর প্রয়াসলব্ধ নয়, এখানে পুরুষের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। উনিশ শতকের কয়েকজন মনীষী সমাজকে নারীর কথা ভাবতে শিখিয়েছেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় নারীর অধিকারের কথা ও মানুষ হিসাবে বাঁচার ভাবনাও তাঁরা ভেবেছিলেন! কিন্তু একই সাথে, নারীর ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারের পুরুষের সাহচর্য ও অনুপ্রেরণা, নারীকে দিয়েছিল, তাঁর অন্তঃপুরের গন্ডীর বাইরে, বৃহত্তর জগতের হৃৎস্পন্দনকে অনুভব করার শক্তি। নারীর লেখনীর মধ্যে উচ্চারিত হয়েছে নিজেদের অবস্থার মূল্যায়ন, বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সেই অবস্থা দূরীকরণে সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়া। তবে সমসাময়িক ঐতিহাসিক তথ্যগুলি আলোচনা করলে এই প্রশ্নটিও মনকে ভাবায় যে পুরুষের এই প্রচেষ্টার পিছনে কোন্ ভাবনা কাজ করেছিল ? নারী প্রগতি কি শুধুই নারীর ভাবনায় উদ্ভাসিত ? ইতিহাসের উত্তর বহুমুখী। বর্তমান প্রবন্ধে, নারীদের কথায় সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলার মেয়েদের চেতনার জাগরণে মহিলা ডাক্তারদের ভূমিকা ঃ প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে

সোমা বসু

ইতিহাস বলে আদিম সমাজে মেয়েরা ছেলেদের সমকক্ষ ছিল। গৃহে বা সমাজে, সবেতেই ছিল তার পুরুষের সমান অধিকার। পশুপালনের যুগ থেকেই সমাজে উৎপাদনের ধরণ-ধারণ বদলে যেতে শুরু করে। সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েদের সামাজিক অবস্থানেও ঘটে পালাবদল। ভারতীয় জনজীবনেরই এক অংশ হিসেবে বাঙালি সমাজেও মেয়েদের এই দমবন্ধ অবস্থা চলে দিনের পর দিন। অবস্থাটা বদলাতে থাকে উনিশ শতক থেকে। বাংলার মেয়েদের মধ্যে অধিকার চেতনার জাগরণ শুরু হয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে — পাশাপাশি নারী জাগরণের ইতিহাসে মহিলা ডাক্তারদের ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই নিবন্ধে মহিলা ডাক্তাবদের সেই অনালোচিত ভূমিকার ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে অধিকারের চেতনার জাগরণ শুরু হয় জাতীয়তাবাদী, স্বাধীনতাকামী উপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তবুও, সামগ্রিকভাবে নারী জাগরণের ইতিহাসে মহিলা ডাক্তারদের ভূমিকা অনেকটাই। এমনকি জাতীয়তাবাদী

আন্দোলন বা সমসাময়িক ও পরবর্তী বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনে ও মহিলা ডাক্তারদের এই ভূমিকা চোখে পড়ে। সেখানেও তারা চিকিৎসার পাশাপাশি নারীর অধিকার ও চেতনার জাগরণে সাহায্য করেছেন। এরাই পুরুষদের সঙ্গে প্রথম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন সমানে-সমানে।

এই গবেষণানিবন্ধে বাংলার মেয়েদের স্বাস্থ্য সমস্যার পাশাপাশি সামাজিক ও ধর্মীয় যেসব বাধানিষেধ মেয়েদের অধিকারকে বঞ্চিত করে রেখেছিল তার ইতিহাস অনুসন্ধানের তথ্যনিষ্ঠ প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। মহিলা ডাক্তারদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-এর পটভূমিতেই এই অন্বেষণ চালান হয়েছে। এককথায় এই নিবন্ধে মেয়েদের সামাজিক পালাবদলে মহিলা ডাক্তারদের ভূমিকাকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নারী ইতিহাস ঃ রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি

প্রার্থিতা বিশ্বাস

বিজ্ঞাপন শব্দটির প্রবর্তন বিজ্ঞপ্তি শব্দ থেকে, যার অর্থ সকলকে জানানো। বিজ্ঞাপন বিভিন্ন মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় — প্রধানত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি।

স্থায়ীভাবে বিজ্ঞাপনের জগৎ পেশাদারীস্তরে শুরু হয় শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন হিসেবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে "হিকির বাংলা গেজেট"-এ সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপনের আবির্ভাব হয়। ১৯৫১ সালের মধ্যে দেখা যায় ভারতবর্ষ এবং বিশেষত বাংলার বুকে প্রচুর বিজ্ঞাপন সংস্থার সংখ্যা বাড়তে থাকে। উদাহরণ স্বরূপে "ভিকস ভেপোরাব" এর বিজ্ঞাপন, তখনকার বিজ্ঞাপন বাজারে একটি তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

কিন্তু সবথেকে উল্লেখ্য বিষয় — এই বিজ্ঞাপনের জগতে নারীদের অবস্থান। পেশাদারী মনোবৃত্তিতে যদি দেখা যায়, বিজ্ঞাপনে নারীদের স্থান পুরুষদের থেকে বেশি। একমাত্র ১৯৬০-এর গোড়ায় দুলালের তালমিছরির বিজ্ঞাপনে একটি পুরুষের ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৫০-৬০ এর দশকে নারীদের ভূমিকা বিজ্ঞাপন জগতে এক অতি সাধারণ গৃহবধূ হিসেবে দেখানো হত। এই গৃহবধূরা শুধুমাত্র তার সংসার এবং স্বামী-সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। উদাহরণ স্বরূপে "সার্ফ" — সেই যুগের এক কাপড় কাচার সাবানের বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনের প্রধান অভিনেত্রী "ললিতা দেবী" বাজারের মধ্যে সবথেকে সেরা কিন্তু দাঁমি সামগ্রী কিনতে আগ্রহী এবং তাই তার পছন্দ "সার্ফ।"

"আনন্দম" অর্থাৎ শুদ্ধ আহারের তৈরি করার জন্যে তেল যার বিজ্ঞাপনে দেখতে পাওয়া যায় যে একটি যুবতী যখন তার হবু-স্বামীকে জিজ্ঞাসা করছেন যে - "আসল

আনন্দ আপনার মতে কি ?" — তখন তার হবু শাশুড়ী তার ছেলের হয়ে উত্তর দিচ্ছেন যে সে তা নিজেই বুঝতে পারবে যখন সে "আনন্দম" আহারের তেল দিয়ে রান্না করবে। অর্থাৎ ইঙ্গিত এই যে নারীদেব স্থান রান্নাঘরে রান্না করা, হবু স্বামীর সঙ্গে সর্ব সম্মুখে কথা না বলা।

ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও নারীদের স্থানে সেরকম পরিবর্তন দেখা যায় না। আমরা যদি বিজ্ঞাপনের ইতিহাস বিশদভাবে পড়ি তাহলে নারীদের অবস্থান বিজ্ঞাপনে এক পণ্য হিসেবে দেখতে পাই। উপরের তথ্যগুলি আমার প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রমাণ করে।

নারীর ক্ষমতায়ন

সৈয়দ আব্দুল হাফিজ মইনুদ্দিন

২০০১ সাল "নারীর ক্ষমতায়নের আন্তর্জাতিক বর্ষ" হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এর আগে ১৯৭৫-১৯৮৫ বছরগুলি সারা বিশ্বজুড়ে "নারী দশক" হিসাবে পালন করেছি। আজকে আমাদের "নারী দশকের" সাফল্য বা ব্যর্থতা এবং অভিজ্ঞতার নিরীখে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে পর্যালোচনা করে দেখা দরকার।

ইতিহাসে নারীর অসম অবস্থানের কথা আমরা সকলেই জানি। পৃথিবীর সব ধর্মেই নারী বঞ্চিত হয়েছে। কখনই নারীকে পুরুষের সমকক্ষ ভাবা হয়নি। নারীদের প্রতি অধীনতার তীব্রতা ও শোষণের মাত্রার প্রশ্নে সমাজভেদে এবং কালভেদে পার্থক্য আছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীকে সন্তান ধারণ তথা লালন পালনের মতো কয়েকটি ভূমিকার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। কর্মক্ষেত্রের ব্যাপক জগৎ আজও নারীর কাছে উন্মুক্ত নয়। এগুলোকে কেন্দ্র করে সামাজিক মূল্যবোধ ধ্যান ধারণা গড়ে উঠেছে। নারীর আত্মবিকাশের পথ আজও রুদ্ধ। বর্তমান সময়ে আবার মৌলবাদী ধ্যানধারনার বিস্তার নারীর উপর নতুন নতুন আক্রমণ নামিয়ে আনছে। এছাড়াও যুক্ত হয়েছে বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়ণের বিশদ।

আমরা সকলেই জানি ক্ষমতায়ন একটা ব্যাপক ধারণা। নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি সঠিক দিক থেকে বিবেচনা করে দেখা দরকার। কোন এক জনগোষ্ঠী বা নারীর ক্ষমতায়ন সামাজিক শূন্যতায় সম্ভব নয়। আর ক্ষমতায়ন বললেই ক্ষমতায়ন হয় না। এক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য কি, এ জন্য আমরা কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি বা কবছি, পরিকল্পনা রূপায়ণে আমাদের কতখানি রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছিল বা আছে তা গুরুত্ব সহকারে বিচার করে দেখা দরকার।

আমরা আমাদের আলোচনায় নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিত

থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আমাদের আলোচনা মূলত শিক্ষা, রাজনীতি ও কর্মের সুযোগকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। যেকোন জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে শিক্ষা হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ শিক্ষায় ব্যক্তি বিশেষের যোগ্যতা বিকশিত হতে সাহায্য করে। শান্তিপূর্ণ অহিংস সমাজ বিপ্লব শিক্ষার মধ্য দিয়েই সম্ভব। শিক্ষা ছাড়া কোন জনগোষ্ঠীই বিকশিত হতে পারে না। Pandit Nehru সঠিকভাবে বুঝেছিলেন If education is given to women then it would lead to education of home, society and the world at large. কিন্তু নারীশিক্ষা ভারতবর্ষে সেভাবে প্রাধান্য পায় নি। আদমসুমারীর তথ্য পর্যালোচনা করলে এ সম্পর্কে আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ১৯০১ সালে আদমসুমারীর তথ্যে নারী শিক্ষার হার ছিল ১% (.৬৯%)। ১৯৮১ সালে সাক্ষর নারীর সংখ্যা গিয়ে পৌঁছয় ২৪.৮৩%, ১৯৯১ সালে এই নারীর শিক্ষার হার ৩৯% দুঃখজনক হলেও এটা আজ মানতে আমাদের অসুবিধা নেই যে সমস্ত রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনও আমরা ভারতবর্ষে ৫০% নারীকে শিক্ষিত করতে পারি নি। এটা আমাদের সকলের দুর্বলতা।

রাজনৈতিক অধিকার নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে অত্যন্ত জরুরী। ভারতীয় সংবিধানে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য বিধি ব্যবস্থা আছে। নির্বাচিত হবার এবং নির্বাচন করার ক্ষমতা আজ সংবিধান স্বীকৃত কিন্তু এ সম্পর্কে ভারতীয় অভিজ্ঞতা কি বলে ? সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা আজও উল্লেখযোগ্য নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রগুলিতে নারী আজও অনুপস্থিত। আমরা সকলেই জানি রাজনৈতিক সমতার প্রশ্নে নারীর ভোটদানের অধিকার এবং বিধিবদ্ধ ক্ষমতা কেন্দ্রগুলিতে নারীর ভূমিকা সমাজস্বীকৃত। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার ৫০ বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও সংসদে এবং আইনসভাগুলিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব খুবই কম। ১৯৮৫-৯০ অষ্টম লোকসভাতে সর্বোচ্চ মহিলা প্রতিনিধি ৮% (৫ জন সদস্যের মধ্যে), ১৯৯৬ সালে এই হার ছিল ৭.০৭%। এই সময় তুলনামূলকভাবে রাজ্যসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল বেশি (২৩০ জনের মধ্যে ৩৪ জন)।

আমরা কেউই নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে কর্মের সুযোগের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। ক্ষমতায়নের প্রশ্নে হয় কোন জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল/স্বনির্ভর হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কর্মের সুযোগ এখনও নারী পুরুষের ক্ষেত্রে সমান নয়। আইনগতভাবে স্বীকৃত না হলেও নারী পুরুষে পেশাগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি সমান কাজের জন্য নারীদের আজও সমান মজুরি দেওয়া হয় না। নারী প্রদত্ত শ্রম আজ সমাজ স্বীকৃত নয়। আমরা যদি সত্যই নারীদের ক্ষমতা প্রশ্নে যত্নবান হই তাহলে প্রথমেই এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কাজ হল নারীদের অর্থনৈতিক দিক স্বাবলম্বী করে তোলা দরকার। অসম অর্থনৈতিক মর্যাদা নানা ধরণের সমস্যায় উৎসকেন্দ্র। ফলে করণীয় কাজ হল সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারী পুরুষের উভয়ের

যৌথ মালিকানা থাকা দরকার। পারিবারিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা মেনে নেওয়া প্রয়োজন।

এখন প্রশ্ন হল নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে এভাবে একটি বছরকে চিহ্নিত করার গুরুত্ব কতখানি ? ভারতবর্ষের মতো একটি দেশে যেখানে অধিকাংশ নারী যখন অশিক্ষিত সেখানে এভাবে একটি বছরকে চিহ্নিত করে কিভাবে নারীকে ক্ষমতাশালী করা যাবে ? যাদের উন্নয়ন সংগঠিত করার কথা আমরা বলছি তারা যদি শিক্ষিত না হয়, রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন না হয়, শাসকবর্গের যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকে তাহলে এভাবে একটি বছরকে "নারীর ক্ষমতায়নের বছর" বলে ঘোষণা করে কি লাভ ? এর মধ্য দিয়ে অল্প কিছু নারীকে সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া গেলেও আপামর নারী সমাজের কোন উন্নতি বিধান এর দ্বারা হবে না। আসলে শ্রেণী আন্দোলনই নারীমুক্তি ঘটাতে পারে। নারীকে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী করতে পারে। ফলে আজ যারা বলার চেষ্টা করেছেন যে শ্রেণী আন্দোলনের সাথে নারী আন্দোলনের কোন যোগ নেই তারা ঠিক কথা বলছেন না। আসলে মানবমুক্তি বা সমাজমুক্তি আন্দোলন বাদ দিয়ে নারীমুক্তি আন্দোলন হয় না। যারা এ দুটিকে আলাদা করতে চায় তারা হলেন নারী-স্বাতন্ত্রবাদী। অনেকে আবার নারীদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এঁদের সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে সমাজ বিপ্লব ছাড়া নিরাপত্তা হয় না।

নিম্নবর্গের ইতিহাস : অর্থ ও ব্যাখ্যা

সুপ্রতিম দাশ

নিম্নবর্গের ইতিহাস বা সাবলটার্ন স্টাডিজ (Subaltern Studies) এর কথা আজকাল অনেকেই জানেন। ইতিহাসের অনেক অন্যমনস্ক পাঠকও হয়ত এই বিষয়ে ওয়াকি-বহাল। কিছুদিন আগে গৌতম ঘোষের 'দেখা' ছবিটিতেও দেখলাম এক জায়গায় নিম্নবর্গের ইতিহাসের উল্লেখ করা হয়েছে। এক কথায় এটা এক ধরণের র‍্যাডিকাল সামাজিক ইতিহাস। র‍্যাডিকাল, কেননা ঔপনিবেশিক ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে প্রচলিত যাবতীয় ইতিহাস চর্চাকে তা অগ্রাহ্য করেছে। এর আত্মপ্রকাশ ১৯৮২ সালে। মূল প্রবক্তা এক কালের কমিউনিস্ট ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ। সাবলটার্ন স্টাডিজ নামক গ্রন্থমালার প্রথম ৬টি খন্ড তিনিই সম্পাদনা করেন। অন্যান্য সহকারী সম্পাদকদের মধ্যে ছিলেন শাহিদ আমিন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডেভিড আর্নল্ড, ডেভিড হার্ডিম্যান, গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রসঙ্গত, আজ পর্যন্ত সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর মোট ১১টি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে।

সরাসরি নিম্নবর্গের ইতিহাসের আলোচনায় আসার আগে দু চারটি পূর্বকথা বলা প্রয়োজন। ১৯৬০-এর দশক এবং ১৯৭০-এর দশকে ইউরোপ-আমেরিকার কিছু ঐতিহাসিক এবং আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটা অ্যাকাডেমিক বিতর্ক শুরু হয়েছিল। এই বিতর্কের প্রসঙ্গ ছিল ঔপনিবেশিক ভারতের জাতীয়তাবাদ। বিদেশী পন্ডিতদের বক্তব্য ছিল, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আসলে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিকতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং ক্ষমতার লড়াই-এর পৌনঃপুনিক কাহিনী। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য ছিল কেবল ক্ষমতা আর পদ। অনগ্রসর, স্থবির ভারতীয় সমাজকে পাল্টানোর চেষ্টা তাঁরা করেননি। এ দেশের ঐতিহাসিকরা এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ভারতবর্ষের মানুষের মহৎ আদর্শ, স্বপ্ন আর বড় বড় গণ-আন্দোলনের ইতিহাসকে এত সহজে অস্বীকার করা যায় না। সাহেবরা এদেশের জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি। এই দু ধরণের ইতিহাসকেই আক্রমণ করে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সূচনা ঘটে। ১৯৭০-এর দশকের গোড়ায় নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং ১৯৭৫ সালে দেশজুড়ে ইমার্জেন্সি — এই দুটি ঘটনার ধাক্কায় ১৯৮০-র দশকে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের বিষয়টি অ্যাকাডেমিক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কৃষক বিদ্রোহ এবং জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে যে তুমুল বিতর্ক চলছিল সাবলটার্ন স্টাডিজ তার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন প্রশ্ন তোলে। প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস চর্চাকে সাবলটার্ন স্টাডিজ নাড়িয়ে দেয়। স্বভাবতই পন্ডিত মহলে বিতর্কের ঝড় ওঠে। তারপর দু দশক

কেটে গেছে। সেদিন সাবলটার্ন স্টাডিজ বলতে যা বোঝাত আজ আর তা বোঝায় না। ১৯৮২ সালে সাবলটার্ন স্টাডিজ বলতে কি বোঝাত ? আসুন একটু ফিরে দেখি।

১৯৭০-এর দশকে ইউরোপে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ইতিহাসের গবেষণা ও লেখালেখির ক্ষেত্রে কিছুটা ভাটা পড়েছিল। নিচুতলার মানুষ — যারা কখনো প্রচলিত ইতিহাসে স্থান পায়নি — এই প্রথম ঐতিহাসিকের গবেষণার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। কয়েক বছর আগে ১৯৬৩ সালে প্রখ্যাত ব্রিটিশ মার্কসবাদী ই.পি. টমসন লিখেছিলেন, 'The Making of the English Working Class'. এরপব এরিক হবস্‌বম, ক্রিস্টোফার হিল, এরিক উল্‌ফ প্রমুখেরা ধারাবাহিকভাবে যে নতুন ধরণের সামাজিক ইতিহাস লিখতে শুরু করেন তা পরিচিত হয় 'তল থেকে দেখা ইতিহাস' বা History from Below নামে। দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রেও এরকম ইতিহাস লিখতে শুরু করেছিলেন কেউ কেউ। যেমন, রণজিৎ দাশগুপ্ত, আর. বি. চৌধুরি, স্টিফেন ফুক্‌স, বিনয় ভূষণ চৌধুরি, কল্যাণ কুমার সেনগুপ্ত, সুনীল সেন, এ. আর. দেশাই প্রমুখ। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা এই তল থেকে দেখা ইতিহাস দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেও দক্ষিণ এশিয়ার ভূতপূর্ব তল থেকে দেখা যাবতীয় ইতিহাসকে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের বর্ণনাকে কোনও নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে বেঁধে রাখতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা লিবেরাল জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা এবং ধ্রুপদী মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চা — এই দু ধরণের ইতিহাসচর্চাকেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

আসলে নিম্নবর্গের ইতিহাস শুরু থেকেই বিরোধী ইতিহাস। এর উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের 'ক্রিটিক' (Critique) করা। রণজিৎ গুহরা বলেছিলেন লিবেরাল ও মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা সকলেই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে বসে উঁচুতলার শিক্ষিত শ্রেণীগুলির প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। যেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভদ্রলোকেরাই মধ্যমণি, নিচুতলার সাধারণ মানুষের কোনো ভূমিকা নেই। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকবা এই মানসিকতাকে বলেছেন উচ্চবর্গীয় বা এলিটপন্থী। তাঁদের মতে, নিম্নবর্গের মানুষের — অর্থাৎ অগণিত কৃষক, আদিবাসী এবং শ্রমজীবীদের একটা স্বাধীন ভাবনার জগৎ ছিল। তাঁরা তাদের মত করে ভাবত, বিশ্বাস করত। এই নিজস্ব বোধ থেকেই তারা বারে বারে অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা প্রধানত নজর দিয়েছিলেন কৃষক বিদ্রোহগুলির উপর। আশ্চর্য নয়, সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর প্রথম চারটি খন্ডে কৃষক ও আদিবাসীদের বিদ্রোহ নিয়ে মোট ২০টি প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। সে সময় রণজিৎ গুহরা মনে করতেন যে ঐতিহাসিক গবেষণার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের সত্তা বা চৈতন্যের একটা বিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ চেহারা তুলে ধরা সম্ভব। তাঁদের মত ছিল, ঔপনিবেশিক আমলের কৃষক অভ্যুত্থানগুলি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতের থেকে আলাদা একটা ধারা। এটা বলা ভুল যে জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলন করেছিল বলেই কৃষকরা এতে যোগ দিয়েছিল। তারা লড়াই করেছিল বিদ্রোহী চেতনা ও

সংগঠনের জোরে। অথচ উঁচুতলার ভদ্রলোকের ইতিহাসে তার স্বীকৃতি নেই।

সুমিত সরকার তাঁর ১৯৮০ সালের সখারাম গণেশ দেউসকর বক্তৃতায় বলেন, "To the practitioners of what some have started calling 'Subaltern Studies' conventional nationalist magiography, Cambridge-type Namierism and even much of existing Marxist scholarship ... appear to be tainted with various forms of elitism." সুমিত সরকারের মতে এই নতুন ইতিহাস ফরাসি বিপ্লব চর্চায় লেফেভর, সোবুল, রুডে বা কব-এর লেখা, কিংবা ইংরেজ ও মার্কিন শ্রম ইতিহাস প্রসঙ্গে টমসন ও গুটম্যানের কাজের চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৮৩ সালে রণজিৎ গুহ লেখেন একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India'. নিম্নবর্গের ইতিহাসের ভাবনাটি এখানে একটু অন্যভাবে প্রকাশিত হয়। গুহ-র মূল বক্তব্য হল : ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও কৃষক আন্দোলনগুলিকে নিছক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়। কেননা কৃষক কেবলমাত্র একটি অর্থনৈতিক সত্তা নয়, একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সত্তাও বটে। ব্রিটিশ প্রশাসকদের চোখে কৃষক অভ্যুত্থান গোটা উপনিবেশবাদের ইতিহাসে অনেক ঘটনার একটি বৈ নয়। তাই যে ঘটনায় কৃষকই মধ্যমণি সেই কৃষক বিদ্রোহে এক নির্ণায়ক শক্তিহিসাবে কৃষকের স্বাধীন অস্তিত্ব অস্বীকৃত। কারণ কৃষক বিদ্রোহ কখনো সামাজিক ন্যায় বিচারের লড়াই নয়, ক্ষমার অযোগ্য সামাজিক অপরাধ। রণজিৎ গুহ কিন্তু বিদ্রোহী কৃষককে তার সামাজিক সাংস্কৃতিক সত্তার মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এক অর্থে এইখান থেকেই নিম্নবর্গের ইতিহাসের ধারাবাহিক চর্চার শুরু। কেননা রণজিৎ গুহরা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে নিম্নবর্গ সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক এবং নিয়মবদ্ধ একটি ইতিবৃত্ত রচনার প্রয়াস নিয়েছিলেন।

সাবলটার্ন (Subaltern) শব্দটার নানা অর্থ। মধ্যযুগে সাবলটার্ন বলতে বোঝাত চাষী এবং ভূমিদাসদের। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় এর দ্বারা সেনাবাহিনীর নিচের দিকের পদগুলিকে বোঝানো হত। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের কিছুদিন বাদে ইতালির বিখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রাম্‌শি (Gramsci) শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে সাবলটার্ন-এর ধারণাটি প্রথম ব্যবহার করেন। গ্রাম্‌শি ইতালির ফাসিস্ত মুসোলিনির জেলখানায় বন্দি ছিলেন। সেখানেই ১৯৩৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। জেলখানায় বসে তিনি লেখেন 'কারাগারের নোটবই' (Prison Note-books)। এখানে তিনি সাবলটার্ন শব্দটি ব্যবহার করেন। সাবলটার্ন বলতে তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের বুঝিয়েছিলেন সমাজে যাদের অবস্থান ক্ষমতাবান কর্তৃত্ববাদী শ্রেণীগুলির বিপরীত মেরুতে। তবে ইতালিতে তখনো পর্যন্ত সামাজিক আধিপত্য ছিল প্রধানত ভূস্বামীদের হাতে। তাই গ্রাম্‌শি বিশেষ করে কৃষকদের কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, এমন ভাবা ঠিক নয় যে কৃষকরা নিতান্ত ভীরু এবং অনুগত, তারা শেষ পর্যন্ত সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর ভিড়ে হারিয়ে যায়। বরং কৃষকের

চেতনার মধ্যে লুকিয়ে থাকে প্রভুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার আকাঙ্ক্ষা। তাই সমাজে প্রভুত্ব ও অধীনতার চরিত্র বোঝার জন্য গ্রাম্‌শি কৃষকদের সংস্কৃতি ও চৈতন্যকে বুঝতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রধানত এই কারণেই কৃষকের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, ভাবনা — সব কিছু গভীরভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। গ্রাম্‌শি অবশ্য মনে করতেন, কৃষকের বিদ্রোহী মানসিকতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতিবাচক। তবে কখনো কখনো তা অর্থবহ হয়ে ওঠে।

রণজিৎ গুহ ও অন্যান্যরা ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে এই অর্থবহ ভূমিকার প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের মতে উচ্চবর্গের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গীয়রা যখন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তখন তার পিছনে থাকে কৃষকের চেতনার স্বাতন্ত্র্য। দুঃখের বিষয়, প্রচলিত ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ প্রায় সবই উচ্চবর্গীয়দের সৃষ্টি। তাই এখানে এর কোনো উল্লেখ বা স্বীকৃতি নেই। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে প্রতিনিয়ত শোষণ ও বঞ্চনার অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে উঠে আসে কৃষকের নিজের বোধ। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ক্রমাগত বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। তাই পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার সন্ধান মিলবে কেবল বিদ্রোহ ও বিদ্রোহ দমনের ঐতিহাসিক দলিলে। সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর তৃতীয় খন্ডের ভূমিকায় রণজিৎ গুহ লিখছেন, "We are opposed as much of the prevailing practice in historiography and the social sciences for its own failure to acknowledge the subaltern as the maker of his own destiny." গুহর-র মতে যে সমাজ ব্যবস্থায় নিম্নবর্গের অবস্থান, তাকে বদলে দেওয়ার মানসিকতা থেকেই তাদের লড়াই।

সাবলটার্ন ঐতিহাসিকরা মনে করেন, আমাদের দেশের জাতীয় চেতনার বিকাশে সাধারণ মানুষের একটা উজ্জীবিত ভূমিকা ছিল — এই কথাটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কারণ এই বিষয়টিকে বাদ দিয়ে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের রাওলাট-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান কিংবা ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মত ঘটনাগুলিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। চৌরিচৌরা বা নৌ-বিদ্রোহের মত স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনাগুলি উচ্চবর্গীয় ঐতিহাসিকদের একপেশে মনোভাব নিয়ে কতটুকু বোঝা সম্ভব? রণজিৎ গুহ লিখেছেন, "What clearly is left out of this unhistorical historiography is the politics of the people. For parallel to the domain of elite politics, there existed throughout the colonial period another domain of Indian politics, in which the principal actors were not the dominant groups ... but the subaltern classes ... that is the people".

কৃষকের সংগ্রাম অবশ্য একমাত্রিক নয়। রণজিৎ গুহ একে বলেছেন, 'আকাঙ্ক্ষা ও অক্ষমতার দোটানা।' প্রভুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার বাসনা যেমন সত্যি, লড়াই-এ ব্যর্থতাও তেমনই সত্যি। আকাঙ্ক্ষা পূরণের অসাধ্যতা থেকে তাই নিম্নবর্গীয়রা ঝোঁকে নানা ধর্মাশ্রয়ী

সংস্কারের দিকে। তখন গান্ধী হয়ে ওঠেন একজন অবতার যিনি অবলীলায় আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন। রক্তমাংসের মানুষ থেকে রূপান্তরিত হন অলৌকিক পুরুষে। আসলে অলৌকিকতা, ধর্মভাবনা, অতিকথা, মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস — এ সবই কৃষক চেতনায় মিশে থাকে পরতে পরতে যা উচ্চবর্গীয় ইতিহাস বিদ্যায় বরাবর উপেক্ষিত। পার্থ চট্টোপাধ্যায়-এর ভাষায়, নিচুতলার মানুষের রাজনীতিকে এভাবেই বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে উঁচুতলার নিজস্ব ভাবনার ছকে। এই প্রবণতার বিরোধিতা করাই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব। কারণ নিম্নবর্গ নিজেই নিজের ইতিহাস গড়ে।

গত দেড় দশকে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে অনেক বদলে গেছে। আলোচনার মধ্যে এসে পড়েছে নতুন নতুন বিষয়। সাবলটার্ন ঐতিহাসিকরা এখন আর শুধুই কৃষক চৈতন্য ও কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করছেন না। আজকের ভারত রাষ্ট্রের ভিতরে চারিয়ে যাওয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিলতাগুলি এখন আলোচনায় প্রাধান্য পাচ্ছে। যেমন, জাতপাতের লড়াই, মৌলবাদ বনাম সেকুলারবাদ, নারীবাদী বিতর্ক, পুলিস, জেলখানা, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি। লক্ষ্য করার বিষয় হল, দার্শনিক মিশেল ফুকোর উত্তর-আধুনিক সমাজ ভাবনা নিম্নবর্গের ইতিহাসকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। উত্তর-আধুনিকরা মনে করেন, সুনিশ্চিত, সন্দেহাতীত, বিশুদ্ধ সত্য বলে কিছু নেই। সত্যের বহুরূপ। জ্ঞানের আপেক্ষিকতাই সত্য। ক্ষমতা, ক্ষমতার বাচন (discourse), প্রতিষ্ঠান, ভাষা, লোকসমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য — এগুলোর উপরে সত্য ও জ্ঞান নির্ভর করে। উত্তর-আধুনিকরা বহু পথ, বহু আদর্শ, বহু রকমের কাঙ্ক্ষিত জীবন-ধারণায় বিশ্বাসী। এই সমাজ ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা আর আগের মত দাবি করছেন না যে গবেষণার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের চৈতন্যের একটি নিটোল চেহারা নির্মাণ করা সম্ভব। বরং এমন একটি প্রশ্নও উঠেছে যে নিম্নবর্গের চেতনার পরিচয় কি কোনদিন জানা যাবে ? গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক, সর্বপ্রথম প্রশ্ন তুলেছিলেন, সাবলটার্ন কি সত্যি কথা বলতে পারে ? নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা নিম্নবর্গের চেতনার পরিচয় দিতে গিয়ে কি আসলে উচ্চবর্গের 'অপর' (Other) হিসাবে নিম্নবর্গের ধারণার একটি 'নির্মাণ' (Construction) তুলে ধরছেন না ? তাঁর মতে, যে প্রশ্নটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল : 'নিম্নবর্গকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় কিভাবে ?' এর অর্থ, নিম্নবর্গ সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তা নিছক একটি ডিসকোর্সের মধ্য দিয়ে দেখার ফল। রিপ্রেজেন্টেশনের সীমানা ছাড়িয়ে প্রত্যক্ষ বাস্তবের উপলব্ধিতে পৌঁছানো অসম্ভব। এটা অনস্বীকার্য যে নিম্নবর্গের ইতিহাস আংশিক, অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ। তার চেতনাও বহুধ্যবিভক্তএবং তা আসলে ক্ষমতাশীল আর ক্ষমতাহীন — নানা শ্রেণীচৈতন্যের বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর মধ্যে নিয়ে আসেন সাহিত্যিক

ঝোঁক। তাঁকে অনুসরণ করেন সুদীপ্ত কবিরাজ, অমিতাভ ঘোষ, জ্ঞানপ্রকাশ এবং আরও কেউ কেউ। অন্যদিকে জুলি স্টিফেন্‌স, সুসি থারু, কমলা বিশ্বেস্বরণ, তেজস্বিনী নিরঞ্জনা প্রমুখেরা আলোচনার ভিতরে আনেন জেন্ডার বা নারীবাদী বিতর্ক। প্রসঙ্গত, পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রদীপ জেগানাথন সম্পাদিত সাবলটার্ন স্টাডিজ একাদশ খণ্ডের নামই হল 'Community, Gender, and Violence'. ১৯৮৮ সালে 'Selected Subaltern Studies'-এর মুখবন্ধে এডোয়ার্ড সাইদ লেখেন, ভারতের বাইরের একটি বিশেষ অ্যাকাডেমিক ভাবনা সাবলটার্ন স্টাডিজকে নাড়া দিয়েছিল। এর নাম উত্তর ঔপনিবেশিক সমালোচনা (Post Colonial Criticism)। সাইদের কথায় : "This group of scholars is a self-conscious part of the vast post colonial cultural and critical effort that would also include novelists like Salman Rushdie, Garcia Marquez, poets like Faiz Ahmad Faiz, Mahmud Darwish, theoreticians and political philosophers ... and a whole host of other figures.'

সাম্প্রতিক লেখালেখি থেকে এটা স্পষ্ট যে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা এখন বুঝতে চাইছেন কেমন করে ইউরোপের আধুনিকতা আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এই আধুনিকতার আধার হল অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের বিখ্যাত জ্ঞানদীপ্তি বা Enlightenment. জ্ঞানদীপ্তি শিখিয়েছিলেন যুক্তির মানদণ্ডে সব কিছুকে বিচার করতে। যুক্তিই হল প্রভু। জীবনের যে সব দিক যথেষ্ট যুক্তিসিদ্ধ নয় সে সব উপেক্ষার বিষয়। যেমন, মানুষের প্রবৃত্তি, সংস্কার, আবেগ, অনুভূতি, প্রেম, যৌনতা, মনস্তত্ত্ব। এই জ্ঞানদীপ্ত আধুনিকতার চোখে এশিয়া/আফ্রিকার সংস্কৃতিগুলি ছিল অমার্জিত, স্থবির, অনাধুনিক। এই আধুনিকতা সৃষ্টি করেছে সর্বশক্তিমান আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা। আজকের নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকরা এনলাইটেনমেন্ট্‌ জ্ঞানতত্ত্বের 'ক্রিটিক' (Critique) করতেই আগ্রহী। লক্ষ্য করার বিষয় হল, সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর পঞ্চম থেকে দশম — এই ৬টি খণ্ডে কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসীদের বিদ্রোহ নিয়ে মাত্র পাঁচটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। অর্থাৎ নিম্নবর্গ, বিশেষত কৃষকরা ক্রমেই চলে গেছে পিছনের সারিতে। সামনে এসেছে উপনিবেশবাদ এবং প্রতিরোধের নতুন পাঠ বা text. সাবলটার্ন ঐতিহাসিকদের লক্ষ্য হল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী ভাষ্যের বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের জাতির ইতিহাস নতুন করে লেখা। তাঁরা ঔপনিবেশিক পাঠ-এর সমালোচনা করছেন, মৌখিক ইতিহাস (oral history) ব্যবহার করছেন, নরবিদ্যা (ethnography) কে কাজে লাগাচ্ছেন। এই সব কিছুর মাধ্যমে নিম্নবর্গের আত্মানুভূতির মধ্যে তাঁরা ভারতের সাংস্কৃতিক শিকড় খুঁজে পেতে চাইছেন।

সূত্র নির্দেশ :—

Subaltern Studies I - XI, OUP & Permanent Black, 1982-2000.

Contemporary Post Colonial Theory : A Reader, ed. Padmini Mongia, OUP, 1997

Reading Subaltern Studies : Critical History, Contested Meaning, and the Globalisation of South Asia, ed. David Ludden, Permanent Black, 2001.

নিম্নবর্গের ইতিহাস, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ, ১৯৯৮।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসের উত্তরাধিকার, আনন্দ, ২০০০।

উনিশ শতকের বাংলায় উপযোগবাদের প্রভাব : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

এম শফিকুল আলম

১. ভূমিকা : উনিশ শতকের বাংলায় নানাবিধ কারণে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সে সময়ে ইংল্যান্ডে গড়ে ওঠা সাড়া জাগানো নৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক মতবাদ উপযোগবাদের প্রভাব বাঙালি সমাজে লক্ষণীয়।[১] উপযোগবাদী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদগণ উপযোগবাদী দর্শনে প্রভাবিত হয়ে ধর্মশাস্ত্রে অন্ধবিশ্বাস পরিহার করে যুগোপযোগী চিন্তা-ভাবনা ও সমাজ সংস্কারের কাজ করেছিলেন। কলকাতার 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের সদস্যরা এ মতবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।[২] তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলিম সমাজেও এর প্রভাব পড়েছিল।[৩] সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপযোগবাদী দর্শনের প্রভাব ছিল অপরিসীম।[৪]

২. উপযোগবাদ : ইংরেজী ইউটিলিটারিয়ানিজম (utilitarianism) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ উপযোগবাদ। উপযোগবাদ সর্বাধিক মঙ্গল বা কল্যাণের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বাধিক মঙ্গল বা কল্যাণের ধারণার সূত্রটি সর্বপ্রথম ১৬৭২ সালে রিচার্ড কাম্বারল্যান্ডের (Richard Cumberland) ডি ল্যাজিবাস ন্যাচার[৫] নামক গ্রন্থে উল্লেখিত হয়। লেখক এই বইতে উল্লেখ করেন যে, সর্বাধিক মঙ্গলের বা কল্যাণের সবময় কর্তা হচ্ছেন মহান স্রষ্টা নিজেই। উপযোগবাদ-নীতি সম্পর্কে কোনো লেখকের এটাই প্রথম বই। জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham ১৭৪৮-১৮৩২) কাম্বারল্যান্ডের এই লেখা দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁব অ্যান ইন্ট্রডাকশন টু দ্যা প্রিন্সিপালস অব মর‍্যালস এন্ড লেজিসলেশন (An Introduction to the Principles of Morals and Legislation) গ্রন্থে তিনি ইউটিলিটারিয়ানিজম বা উপযোগবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর পূর্বে এই শব্দটি আর কেউ ব্যবহার করেনি। তাই বেন্থামকে উপযোগবাদের প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে দুজন ব্রিটিশ দার্শনিক যথাক্রমে জেমস মিল (James Mill ১৭৭৩-১৮৩৬) এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের (John Stuart Mill ১৮০৬-১৮৭৩) হাতে এই মতবাদ পরিবর্ধিত, বিস্তৃতি, বিকাশ ও পরিপূর্ণতা লাভ করে।[৬]

উপযোগবাদের ভিত্তি হলো উপযোগিতার নীতি। উপযোগিতার নীতি বলতে এখানে বেশিরভাগ লোকের জন্য বেশি মাত্রায় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ সুবিধার নিশ্চিতকরণকেই বুঝায়। উপযোগবাদ অনুসারে যে-কাজ সর্বসাধারণের সুখ উৎপাদনে উপযোগী সে-

কাজ যথাযথ বা ভাল। আর যে-কাজ এরূপ সুখ উৎপাদনে উপযোগী নয়, তা অনুচিত বা মন্দ। সুতরাং উপযোগিতা বা কার্যকারিতা নৈতিক বিচারের মাপকাঠি। বেন্থাম উপযোগবাদ নীতির সূত্রটিকে তাঁর দর্শনের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি 'ফ্র্যাগমেন্ট অন গভর্নমেন্ট' (Fragment on Government) গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উপযোগিতার নীতি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যে, 'ইহা এইরূপ একটি নীতি যা যে কোনরূপ কাজের অনুমোদন অথবা অননুমোদন করে থাকে। তাঁর মতে, যা গুণ অন্বেষণকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু সুখ অন্বেষণকে ব্যাহত করে তাকে বলা হয় উপযোগিতার নীতি। এই নীতি অনুযায়ী কারো যদি কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে তাতে অনুমোদন দেওয়া হয় তখনি, যখন সুখের মাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের সম্ভাবনা থাকে।'[৭] মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে বেন্থাম মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদকে মৌলিক নিয়ম হিসেবে ধরে, সুখ এবং দুঃখকে মানুষের সার্বভৌম প্রভু বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই থেকে তিনি তাঁর নৈতিক তত্ত্বকে উপযোগবাদ নামকরণ করেছেন এবং এতে মানুষের আচরণের যে বৈশিষ্ট্য সেটা হলো সর্বাধিক সুখ অর্জনের চেষ্টা করা।[৮]

উপযোগবাদ একটি মানব কল্যাণমূলক নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে এই মতবাদের সূত্রপাত ঘটে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে এই মতবাদ বেশ প্রসার লাভ করে।[৯] উপযোগবাদ অনুসারে সর্বাধিক সুখ লাভই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। গণতন্ত্রের বেলায় যেমন সে-মত গ্রহণযোগ্য যে-মত সংখ্যাগরিষ্টের মত, তেমনি এই ধরণের নৈতিক বিচারেও সে কাজকেই আমরা নীতিসম্মত বলব, যা সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের সুখ বিধান করে। সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখই (maximum pleasure for the maximum number of people) নৈতিক আদর্শ হওয়া উচিত। অপরের সুখের দিকে না তাকিয়ে কেবল নিজের সুখের কথা ভাবলে নিজের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখ লাভ করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে। যে মানুষ অপরের সুখের কথা চিন্তা করেনা, সে অপরের কাছ থেকে কোন সুখের আশা করতে পারেনা। প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজের সুখের জন্য অপরের সাহায্য বা সহানুভূতি কামনা করতে উৎসাহী হয়। মানুষ নিজের ও অন্যের অর্থাৎ সর্বজনের সর্বাধিক মঙ্গল কামনা করে। সে তার নিজের ব্যক্তিগত কল্যাণ চায়, কিন্তু জনকল্যাণের চিন্তা না করে ব্যক্তিগত কল্যাণ লাভ করা কি সম্ভব ?[১০] উপযোগবাদ অনুসারে জনকল্যাণের মধ্যেই মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ নিহিত। তবে যে কোন কল্যাণই উপযোগিতার নীতি (the ethical principle of utility) দ্বারা নির্ণীত হবে। আধুনিককালে উপযোগবাদ ব্যক্তিগত স্বার্থের তুলনায় সমষ্টিগত স্বার্থ তথা সামাজিক স্বার্থকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তাই উপযোগবাদ অনুসারে সমাজে সর্বসাধারণের স্বার্থের আলোকেই ব্যক্তির আচরণ বিচার্য।[১১]

বাংলায় উপযোগবাদের প্রভাব শুরু হয় ১৮১৯ সালে জেমস মিলের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে প্রধান পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের মধ্য দিয়ে। তাঁর 'হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' (History of British India) পুস্তকে উপযোগবাদী ধ্যান-ধারণা প্রকাশ পায়।[১২] এই গ্রন্থটি রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। জেমস তাঁর অফিসিয়াল পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে 'উপযোগিতা' শব্দটি প্রায় ব্যবহার করতেন। এই প্রসঙ্গে জে এস মিল লিখেছেন যে, 'জেমস মিল পত্র যোগাযোগের সাহায্যে তাঁর উপরিস্থ ও অধীনস্থদের সহজে প্রভাবিত করতে পারতেন।[১৩] ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়া হাউসের উচ্চ পর্যায়ের সমস্ত নথি-পত্র ও অফিসের পত্র যোগাযোগ জেমস মিলের মাধ্যমেই হতো। জে এস মিল তাঁর পিতার উপযোগবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

যে তাঁর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের (সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক) অফিসে তিনি যেখানে পরবর্তীকালে বসতেন, তাঁব প্রতিভার বিকাশ ঘটাতেন, সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষেত্রে এ অনবদ্য চরিত্রেব প্রকাশ ঘটেছে, উর্ধতনদের প্রভাবিত করেছেন — যাঁরা ভারতে একটি কল্যাণকামী সরকার প্রত্যাশা করেন; সম্ভব হয়েছিল তাঁর দাপ্তরিক বিভিন্ন নথিপত্রে এর খসড়া তৈরি ও ডেসপ্যাচ কাজের মধ্য দিয়ে, এবং পরীক্ষা বোর্ডেব পরিচালকবৃন্দ ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সন্তুষ্টি বজায় রেখে এ কাজ করা তাঁর জন্য ছিল এক দারুণ অগ্নিপরীক্ষা। কেননা উপরিস্থরা ভারতীয় জনকল্যাণের জন্য তাঁর কাছ থেকে কোন পরামর্শ চাইতেন না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ভারতীয় প্রশাসনের জন্য তিনি অনেক নীতিমালার প্রবর্তন করেছেন - যা তাঁর পূর্বে অপর কেউ করতে পারেননি, এবং তাঁর ডেসপ্যাচ কাজের উদাহরণ তথা লেখালেখি থেকে অফিসের কর্মকর্তাদের বাস্তব জ্ঞানার্জন করা সম্ভব ছিল।[১৩] এটি অবশ্য মনে করা যেতে পারে যে, দীর্ঘদিন যাবৎ ইস্ট ইন্ডিয়া হাউসে কাজ করার সুযোগ পেয়ে মিল তাঁর ধ্যান-ধারণা ব্রিটিশ ভারতে অনুপ্রবেশ করাতে সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি বস্তুত রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত নথি-পত্র তৈরির ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[১৪] উপযোগবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বেন্থামকে উনিশ শতকের মূল শক্তিহিসেবে গণ্য করা হয়। তিনিই উপযোগবাদকে আধুনিক রূপে উন্নীত করেছেন। তাঁর মতে, 'সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক মঙ্গল' (the greatest good of the greatest number) মানব জীবনের নৈতিক আদর্শ হওয়া উচিত। বেন্থাম তাঁর উপযোগবাদী নীতিকে কেবলমাত্র নৈতিকতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি এটিকে আইনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে, উপযোগবাদী নীতির উপর ভিত্তি করে আইন পরিচালিত হওয়া উচিত।[১৫] বেন্থাম ভারতবর্ষের জন্য আইন তৈরি করার জন্য অনেক আগে থেকেই আগ্রহী ছিলেন।[১৬] ১৭৭৩ সালে তদানীন্তন বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতির নিকট তিনি এই ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সভাপতিও বেন্থামের ভারতবর্ষে আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বেন্থাম অফিসেব কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে উপযোগবাদী ধ্যান-ধারণা প্রচারের সুযোগ পেয়েছিলেন। সে সময়ে প্রশিক্ষণবিহীন উচ্চ প্রশাসনিক

কর্মকর্তাদের উপযোগবাদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হতো। এমনকি লন্ডনে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সেখানে উপযোগবাদ পড়ান হতো।[১৬] বেন্থামের প্রিন্সিপালস অব মর‍্যালস এন্ড লেজিসলেশন গ্রন্থটি ভারতের কোনো একটি কলেজে পাঠ্যবই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।[১৭] তিনি ভূমি ও কারাগার সংস্কারের জন্য নিরলস কাজ করে গিয়েছেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে বেন্থামের অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাঁর পূর্বে বিচার বিভাগকে এভাবে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা অপর কেউ করেননি।[১৮] এক্ষেত্রে বেন্থামের পরেই জেমস মিলের নাম উল্লেখযোগ্য। জেমস মিল হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া পুস্তকের[১৯] মাধ্যমে ভারতে তাঁর এবং স্বীয় পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিলের অবস্থান সুদৃঢ় করে-ছিলেন। জে এস মিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরিতে ১৮২৩ সালে যোগদান করেন এবং ১৮৫৮ পর্যন্ত ভারতবর্ষে কাজ করেন। এই সময়ে স্টুয়ার্ট মিল প্রশাসনিক কাজকর্মের অবসরেই বিখ্যাত ইউটিলিটারিয়্যানিজম বইটি রচনা করেন।[২০]

৩. বাংলায় উপযোগবাদের প্রভাব ঃ সর্বাধিক লোকের জন্য সর্বাধিক সুখ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযোগবাদীরা ব্যক্তি ও সরকারের সংস্কার-নীতি প্রণয়ন,[২১] পাশ্চাত্যের স্বৈরাচারী মতবাদকে খন্ডন করে গণতান্ত্রিক আদর্শের ধারণাকে মানুষের মধ্যে সম্প্রসারণ, স্বাধীন চিন্তা ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন, সর্বজনীনতা, সাংবিধানিক নিয়মকানুন সংস্কার, রাষ্ট্র কর্তৃক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন,[২২]। ১৮৩২ সালের সমাজ সংস্কারের বিল উত্থাপন, মিল-কারখানার আইন এবং নারী মুক্তি আন্দোলন, ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণ, 'ফিলোসফিক্যাল র‍্যাডিকেলস' নামক উপযোগবাদী দার্শনিক সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার ফলশ্রুতি হিসেবে ব্রিটিশ লিবারেল পার্টির বিকাশ, ইংল্যান্ডে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃতিলাভ, ভূমি সংস্কার, আইন সংস্কার ও কারাগার সংস্কার, ব্রিটেনে দাস প্রথার বিরুদ্ধে সমাজ সচেতনতার সৃষ্টি, মিশনারি প্রথার প্রচলন; এবং সর্বোপরি, ব্যক্তি থেকে সমষ্টির ধারণার প্রসার ঘটিয়েছে।[২২]

উপযোগবাদীদের একটি লক্ষ্য ছিল সমাজে মানুষের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।[২৩] এই মতবাদ কেবলমাত্র প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা, উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তাবিদদের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। যাঁরা এই দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২১-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯০) কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৯৪), বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৩৩-১৮৮৪) ও সীতানাথ তর্কভূষণ প্রমুখ।[২৪]

উনিশ শতকের প্রারম্ভে তদানীন্তন সমাজ সংস্কারকদের লক্ষ্য ছিল কীভাবে সতীদাহ প্রথার নির্মম ধর্মীয় গোঁড়ামির নাগপাশ থেকে হিন্দু নারী সমাজকে রক্ষা করা যায়।[২৫]

রামমোহন ছিলেন সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে কড়া বিরোধিতাকারী এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল অনড়। সতীদাহ প্রথার মতো অমানবিক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই বিষয়ে তিনি Address to Lord William Bentinck for the Abolition of Suttee নামক একটি বই রচনা করেন।[২৬] উপযোগবাদীদের সঙ্গে রামমোহনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। বেন্থামের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পত্র যোগাযোগ প্রমাণ করে যে, তাঁদের দুজনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।[২৭] রামমোহন বেন্থাম ও জেমস মিলের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি ১৮৩০ সালে ইংল্যান্ডে গমনকালে বেন্থামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালে বেন্থাবের সঙ্গে রামমোহনের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। বেন্থাম রামমোহনের অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন; রামমোহনও বেন্থামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। একটি পত্রে বেন্থাম রামমোহনকে লিখেছেন ঃ

অর্থাৎ আমাদের উন্নতমানের বন্ধু কর্নেল ইয়ং, কর্নেল স্ট্যানহোফ এবং মি: বাকিংহ্যামের কাছ থেকে আমি আপনার গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েছি। আপনার লেখা একটি বই পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, এতে আমি লক্ষ্য করেছি যে, বইটি একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী কর্তৃক প্রণীত হলেও তা একজন সুশিক্ষিত ও পরিপক্ক ইংরেজ লেখকের লেখনীর চাইতেও নিঃসন্দেহে উন্নততর।[২৮] পরবর্তীকালে রামমোহনের বেশ কয়েকটি পুস্তক বিলেত থেকে প্রকাশের ক্ষেত্রে বেন্থাম সহায়তা দিয়েছিলেন। এভাবে বেন্থামের সঙ্গে রামমোহনের একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং তিনি উপযোগবাদী ধ্যান-ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এক পর্যায়ে রামমোহন জেমস মিলের হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সম্পূর্ণ পড়েছিলেন।[২৯]

যদিও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে উপযোগবাদীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ ছিলনা, তথাপি তিনি অক্ষয় কুমার ও বিদ্যাসাগরের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এমনকি তাঁর পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ইংল্যান্ডে পড়াশুনা করতে গিয়েছিলেন তখন উপযোগবাদী দর্শন দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি জে এস মিলের সাবজুগেশন অব উমেন (Subjugation of Women) পুস্তকের বাংলা অনুবাদ করেন।

অক্ষয় কুমার দত্ত উপযোগবাদী ধ্যান-ধারণা দ্বারা উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তিনি মিলের যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি তাঁর উপযোগবাদী দর্শনকে "শ্রম ফসল+এবাদত = ফসল, সুতরাং এবাদত = শূন্য" জে এস মিলের যুক্তিবাদের সাথে সমন্বয় সাধন করে তাঁর বিখ্যাত যৌক্তিক সমীকরণ দাঁড় করিয়েছিলেন।[৩০] এখানে দেখা যায় যে, তিনি বেন্থামের দর্শনকে এরিস্টোটলের ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এরিস্টোটলের ভাবধারা হলো মানুষের সার্বিক উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে সমাজের প্রকৃতির উপর যা আসলে একটা গৌণ ব্যাপার।[৩১]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপযোগবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বিশেষ করে জন স্টুয়ার্ট মিলের যুক্তিবিদ্যা (Logic) ও হিউমের এ ট্রিটাইজ অব হিউমেন আন্ডারষ্ট্যানডিং (A Treatise on Human Understanding) পুস্তক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য-তালিকায় সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের অন্তর্ভুক্তির ফলে যে কুপ্রভাব ছাত্রদের মধ্যে পড়বে তা থেকে তাদের কীভাবে রক্ষা করা যায়, সেটাই ছিলো তাঁর চিন্তা। তিনি মনে করতেন সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের প্রতিষেধক বার্কলির Inquiry নয়, মিলের Logic ও হিউমের Treatise।[৩২] তিনি বাংলায় সতীদাহ প্রথা বিলোপে অবদান রেখেছেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলন বিদ্যাসাগরের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সমাজ-সংস্কার আন্দোলন।[৩৩] তৎকালীন হিন্দু সমাজের বিধবা বিবাহের বিষয়ে ১৮৬০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বয়স নির্ধারণের বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি পুনর্বিবাহ প্রথা সমাজে প্রচলিত রাখার জন্য দৃঢ় সংকল্পে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, উপযোগবাদী ধ্যান-ধারণা নিয়ে তিনি কর্মজীবনের সূচনাকাল থেকে নারী শিক্ষা প্রসারে কঠোর শ্রম দিয়ে গিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ অনুসারী। তিনিও বিধবা বিবাহ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর মতে, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাই ঠিক করবেন যে, তিনি বিবাহ করবেন কি না। তিনি আরও মনে করতেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর একজন রমনী সারা জীবন বিধবা থেকে যাবেন এটা মানবিক আইনের সম্পূর্ণ বিরোধী। একমাত্র এই যুক্তির উপর ভিত্তি করেই বাংলায় বিধবা বিবাহ প্রচলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৩৪]

কেশবচন্দ্র উপযোগবাদের সঙ্গে সরাসরি জড়িত হয়েছিলেন। তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি ১৮৭০ সালে বিলেতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি দার্শনিক মিল ও মেক্স মুলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁর ইন্ডিয়া অব উমেন ফ্রিডম (India of Women Freedom) পুস্তকটি ছিল প্রকৃতপক্ষে মিলের সাবজুগেশন অব উমেন (Subjugation of Women) এর প্রতিধ্বনি। তিনি সমাজে অবহেলিত নারীদের পক্ষে কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় তাঁর কন্যা চতুষ্টয় স্নাতক ডিগ্রি পাশ করেছিলেন। নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ব্রাহ্মসমাজ নেতাদের মধ্যে কেশব সেন ছিলেন প্রথম সারিতে।[৩৫] তিনি তদানীন্তন পূর্ব বাংলার ব্রাহ্ম সমাজকে সুসংহত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৮৫৭ সালে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদানের অব্যবহিত পরে তিনি ব্রাহ্ম সমাজ পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন।[৩৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কলকাতায় একদল তরুণের মধ্যে উপযোগবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তারা ছিল 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের সদস্য। এদেরকে প্রগতিবাদী বলে গণ্য করা হতো। লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) ছিলেন এই গ্রুপের নেতা।[৩৭]

এই গ্রুপটি সনাতন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। সমস্ত কলকাতায় এ দলটি সাড়া জাগিয়েছিল। এঁদের সাধারণ ধর্ম ছিল মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গোঁড়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ধিক্কার। এঁদের বৈশেষিক লক্ষণ হলো ঃ ১. বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এঁরা নিউটনের অনুগামী, ২. ধর্মের ক্ষেত্রে এঁরা ডেভিড হিউম ও টমাস পেইনের ভক্ত, ৩. রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এঁরা অ্যাডাম স্মিথ, জেরেমি বেন্থাম প্রমুখ দ্বারা প্রভাবিত, ৪. অধিবিদ্যা ও সাধারণ ধর্মশাস্ত্রের ক্ষেত্রে এঁরা লক্ রীড্ স্টুয়ার্ট, ব্রাউন প্রমুখের দ্বারা প্রভাবিত।[৩৮] ডিরোজিয়ানসদের প্রভাবে ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট বা বেঙ্গল রেনেসা সংগঠিত হয়েছিল। অবশ্যই এ আন্দোলন সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮), রাধানাথ সিকদার (১৮১৩-১৮৭০), হারাচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৯৬), প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি (১৮১৩-১৮৮৫), দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি (১৮১২-১৮৮৭), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০) প্রমুখ 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের বিশিষ্ট সদস্য হয়েছিলেন।[৩৯] তাছাড়া মাধবচন্দ্র মল্লিক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-১৮৫৫) এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২-১৮৭৩) এ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।[৪০] মাত্র তেইশ বছর বয়সে ডিরোজিও প্রয়াত হয়েছিলেন। অথচ তাঁরই পদতলে বসে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এ সমস্ত স্বনামধন্য, সে যুগের অত্যন্ত ঋজু চরিত্রের কয়েকজন বঙ্গ-সন্তান।[৪১]

উপযোগবাদের প্রভাব কেবলমাত্র কেন্দ্রিক ছিলনা। এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেশবচন্দ্র সেন এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৮৬৬ সালে বাংলাদেশে আসেন এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, বরিশাল, সিলেট ও ফরিদপুরে ভ্রমণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজয় গোস্বামী। তাঁরা বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। তন্মধ্যে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন বোস, বরিশালের দুর্গামোহন দাশ, বিক্রমপুরের দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি এবং সিলেটের বিপিনচন্দ্র পাল উল্লেখযোগ্য।[৪২]

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের মধ্যে উপযোগবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্য সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সত্য-প্রীতি ও সাহিত্য চর্চা। সাহিত্য সমাজ কর্তৃক রচিত বহু নাটক উপন্যাসে উপযোগবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন, আবুল মনসুর তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আয়না'র নায়ক জে এস মিল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন। তদুপরি বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে উপযোগবাদের পাঠ্যক্রমই এ মতবাদের প্রভাব স্মরণ করিয়ে দেয়।[৪৩]

৪. উপযোগবাদের মূল্যায়ন ঃ ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ সরকার বিশেষ করে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলায় নানা প্রকার সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ

করেছিল। এই সময় উপযোগবাদমনস্ক অনেক উচ্চপদের কর্মকর্তাদের এখানে নিয়োগ করা হয়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বেন্থাম, জেমস মিল ও জে এস মিল। জেমস মিলের 'On Education'[৪৪] প্রবন্ধ এবং ম্যাকলের: 'Education Minute' প্রবন্ধটি ছিল এই সংস্কারের মাইলফলক স্বরূপ। অবশ্য মেকলের লেখাটি ছিল মিলের অনুকরণেই। উপযোগবাদীরা বাংলায় বিচার বিভাগের সংস্কারের জন্য আগ্রহী ছিলেন। বেন্থামের মতে, দেশের আইন হতে হবে সহজে বোধযোগ্য এবং সর্বাধিক মানুষের জন্য কল্যাণকর। তাছাড়া, দেশের আইন বিভাগকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে হবে এবং প্রয়োজনে একটি আদালতে একমাত্র বিচারকের দ্বারা বিচারকার্য সম্পন্ন করতে হবে।[৪৫]

উপযোগবাদীরা ভূমি সংস্কারে আগ্রহী ছিলেন। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁদের জন্য দুটি সমস্যা ছিল। প্রথমত, বাংলার কৃষকদের কাছ থেকে কর কি সরাসরি আদায় করা হবে? দ্বিতীয়ত, নাকি তা জমিদারদের মাধ্যমেই আদায় করা হবে? জেমস মিল সরাসরি আদায়ের পক্ষে ছিলেন। উপযোগবাদীদের মতে, জমির খতিয়ান, জমির ইতিহাস, ফসল উৎপাদনের পরিসংখ্যান ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে জমির খাজনা নির্ধারণ করতে হবে এবং গরিব চাষাদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন কর নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ সর্বাধিক লোকের জন্য সর্বাধিক মঙ্গল নীতি এক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু উপযোগবাদীদের এসব কথাগুলো বাস্তবায়িত হয়নি।

৫. উপসংহার ঃ যদিও উনিশ শতকের বাংলায় উপযোগবাদী সংস্কারের ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে তথাপি উপযোগবাদের প্রভাবকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ থাকছে না। Eric Stokes এর ভাষায় 'in the sixties and seventies of the nineteenth century there eventually emerged structure which substantially realized James Mill's ideals of Indian Government'। অর্থাৎ উনিশ শতকের ষাট এবং সত্তর দশকে ভারত সরকার প্রশাসনিক নীতিমালার ব্যাপারে জেমস মিলের চিন্তা-ভাবনাকে মোটামুটিভাবে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে থাকে। এই উদাহরণ থেকেই বাংলায় উপযোগবাদের প্রভাব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। এটা অনস্বীকার্য যে, উপযোগবাদের প্রভাবেই বাংলায় সতীদাহ, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা প্রভৃতি রোধ হয়েছিল ও ইংরেজি শিক্ষার কিছুটা হলেও প্রসার লাভ করেছিল। তাছাড়া খানিকটা পরে হলেও উপযোগবাদের প্রভাব মুসলিম সমাজে পড়েছিল। ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' মূলত এই দর্শনের প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল, যা পরবর্তীকালে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের ভিত্তি রচনায় সহায়তা করেছিল।

সূত্র নির্দেশ

*সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১, বাংলাদেশ।

১। Shafiqul Alam, "British Utilitarianism and its influence on Nineteenth Century Muslim Bengal: A study on Nawab Abdul Latif and Delwar Hossain Ahmed", an unpublished Ph.D. thesis, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1994, পৃ. যত্রতত্র।

২। Susobhan Sarkar, *Bengal Renaissance and Other Essays* (New Delhi: People's Publishing House, 2nd Print, 1981), পৃ. ১৯-২০।

৩। Sultan Jahan Salik, ed., *Muslim Modernism in Bengal: Selected Writings of Delwar Hossain Ahmed Meerza* 1840-1913 (Dhaka: Centre for Social Studies, University of Dhaka, 1980), পৃ. ıı।

৪। Shafiqul Alam, "Abdul Latif's Utilitarian Social Reforms: An Evaluation", *Journal of the Pakistan Historical Society*, vol. XL vii, No. 1, January-March 1999, Karachi, পৃ. ৩৫-৪২।

৫। জার্মান ভাষায় লিখিত উক্ত পুস্তিকাটির নাম ছিল *De Legibus Nature (The Law of Nature)*. দেখুন Earnest Albee, *A History Of English Utilitarianism* (New York : Collier Books, 1962), পৃ. ৩০।

৬। Shafiqul Alam, "British Ûtilitarianism : A Brief Survey", *Darshan International*, vol. xxxiii 1993, Moradabad, India, পৃ. ৩৮।

৭। Jermy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (New York: Hafner Publishing Company Inc., 1948) পৃ. ২।

৮। D.W. Hamlyn, *A History of Western Philosophy* (London: Penguin Books, 1988), পৃ. ২৭৬।

৯। Robert N. Beck, *A Handbook of Social Philosophy* (New York : Macmillan Publishing Co. Inc., 1979) পৃ. ৬৭।

১০। প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *মনোবিদ্যা ও সমাজদর্শন* (কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিকেশনস, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৩), পৃ. ৪।

১১। David Lyons, *Ethics and the rule of Law* (Cambridge: Cambridge University Press, rept., 1989), পৃ. ১১১।

১২। William Leslie Davidson, *Political Thought in England: The Utilitarians from Bentham to J. S. Mill* (London: Thronton to Batterworth, 1931), পৃ. ১০৪-৫।

১৩। John Stuart Mill, *Autobiography*, preface by Harold Laski (London : Oxford University Press, 1963), পৃঐ ২২-২৩।

১৪। ঢালি, বাংলাদেশ দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

১৫। K. C. Benerjee, Utilitarianism (Allahabad: Ram Narain Lal, 1928), পৃ. (২)-(৩)।

১৬। Shafiqul Alam, "Bentham's Social and Political Thoughts: A Brief Account", *Indian Philosophical Quarterly*, supplement, vol.xxii 1995, Poona, India, পৃ. ১১।

১৭। *The English Utilitarians and India*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

১৮। পূর্বোক্ত।

১৯। Abdul Hai Dhall, "British Utilitarianism and its Diffusion in the Nineteenth Century Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, vol. 35, no. 2, Dhaka, December 1990, পৃ. ২৭।

২০। Eric Stokes, *The English Utilitarians and India* (Oxford: The Clarendon Press, 1963), পৃ. যততত্র।

২১। John Stuart Mill, *Utilitariansim, Liberty and representative Government* (London: J.M. Dent and Sons Ltd., 1929), পৃ. vii।

২২। Sen, ""Indian Association for the Cultivation of Science", প্রাগুক্ত।

২৩। Bentham, *Principles of Morals and Legislation*, প্রাগুক্ত।

২৪। Delwar Hossain, *A Study of Nineteenth Century Historical Works on Muslim Rule in Bengal, Charles to Stewart to Henry Beveridge* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1987), পৃ. ৮।

২৫। আব্দুল হাই ঢালি, "ব্রিটিশ উপযোগবাদ বনাম উনবিংশ শতাব্দীর বাংগালী চিন্তাবিদ", দর্শন ও প্রগতি, দেব সেন্টার ফর ফিলোসফিক্যাল স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ৬১।

২৬। John Hospers, *Philosophical Problems and Arguments : An Introduction* (New York: Macmillan Publishing Company Inc., 3rd ed., 1974), পৃ. ২৯২-৯৩।

২৭। ঢালি, বাংলাদেশ দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১১১।

২৮। Sumit Sarkar, *A Critique of Colonial India* (Calcutta: Papyrus, 1985), পৃ. ১৭।

২৯। ১৮৩০ সালে এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, তৎপূর্বে ১৮১৮ সালে তাঁর নিবন্ধ "সহমরণে বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ" প্রকাশিত হয়েছিল। দেখুন ঋষি দাস, *রাজা রামমোহন* (কলকাতা: অশোক পুস্তকালয়, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৯৯), পৃ. ২৬৭-৬৯।

৩০। Sophia D. Collect, *Life and Letters of Raja Rammohan Roy* (Calcutta: Sadharan Brahmo Samaj, 1962), পৃ. ৩১৩।

৩১। দাস, রাজা রামমোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-৪০।

৩২। এই পুস্তকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে এবং সভ্যতার মাপকাঠিতে ভারতীয় সমাজের অবস্থান নির্ণয় করা হয়।

৩৩। আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (ঢাকা: লেখক সংঘ প্রকাশনা, , ১৩৮৭ বাংলা), পৃ. ১৭।

৩৪। John Plamentaz, *English Utilitarians* (Oxford : Oxford University Press, 1968), পৃ. ৯৩-১০৭।

৩৫। বদরুদ্দীন ওমর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ (কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৮), পৃ. ৫৪।

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।

৩৭। Vora Novikovo, *Bankeem Chandra Chattapadhaya* trans. by Nishitesh Benerjeee (Calcutta : National Publishers, 2nd ed., 1982), পৃ. ১০৩।

৩৮। V.S. Naravane, *Modern Indian Thought* (Bombay : Asia Publishing House, 1967), পৃ. ৩৮।

৩৯। Amalendu De, *Roots of Separatism in the Nineteenth Century Bengal* (Calcutta: Ratna Prakashan, 1974), পৃ. ১৩৩।

৪০। কলকাতার যুবসমাজের মধ্যে তিনি সচেতনতাবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন — যা পরবর্তীকালে ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্টে রূপ লাভ করেছিল। তাঁর একজন অনুসারীর (রাধাকৃষ্ণ মল্লিক) মতে, "তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মানুষের মধ্যে জ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন... নিজেদের সম্পর্কে ভাবতে শিখিয়েছিলেন।" দেখুন, A. F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change in Bengal* 1818-1836 (Calcutta : The Technical and General Press, 2nd ed., 1976), পৃ. ৪৮।

৪১। অমর দত্ত, ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৬), পৃ. ৪৮-৪৯।

৪২। Abdul Hye Talukder, "Humanism in Bengal: A study in Philosophical Thought", an unpublished Ph.D. thesis, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1991, পৃ. ৭৯-৮২।

৪৩। Susobhan Sarkar, On the Bengal Renaissance (Calcutta: Papyrus, rept., 1985), পৃ. ১০৯-১১০।

৪৪। মৃণালিনী দাশগুপ্ত, *মানুষ গড়ার কারিগর ডিরোজিও* (কলকাতা: প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৬।

৪৫। ঢালি, *বাংলাদেশ দর্শন* (ঢাকা: মিতা ট্রেডার্স, ১৯৯৪), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১১১।

৪৬। পূর্বোক্ত।

৪৭। James Mill, "Essays on Education", *Westminister Review*, vol. xxi, July 1929।

৪৮। *The English Utilitarians and India*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

'বিপিনচন্দ্র পালের রাজনৈতিক দর্শন ঃ ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রভাব'

সুমিতা চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে তুলে ধরা হলেও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গৃহীত কতকগুলি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রশ্নাতীত রাখতে পারছে না। সব থেকে সমস্যার কথা হল ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বসবাস হলেও, কোন একটি বিশেষ ধর্মের প্রাধান্য ক্রমশ লক্ষণীয় হয়ে পড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকারে প্রধান ক্ষমতাসীন দল বি.জে.পি.র তাত্ত্বিক আঙিনাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থিরীকৃত হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রভাবশালী নানান হিন্দু তাত্ত্বিকদের দ্বারা। এদের মূল উদ্বেগের বিষয়টি হল ভারতীয় হিন্দুদের সত্তা নিষ্কলুষ (unpolluted) রাখা এবং তার অন্যতম শর্ত হল হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা; এমনকি তা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস এবং অস্তিত্বের মূল্যেও। প্রসঙ্গত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অন্যতম মুখপত্র "Organiser'এ বিধৃত একটি অংশের উল্লেখ করা যেতে পারে — "....ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দু ইতিহাস, ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতি। ভারতীয় জীবনের ভিত্তি বিভিন্ন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ। সুতরাং ভারতে অ-হিন্দুদের একমাত্র পথ হিন্দুত্বের দার্শনিক ভিত্তি স্বীকার করে নিয়ে তার জীবনধারণ পদ্ধতি গ্রহণ করা।[১]

অবশ্য আমাদের জাতীয় জীবনে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির একীকরণ কোনো নতুন ঘটনা নয়। জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ধর্মকে বারংবার ব্যবহার করা হয়েছে। বিগত শতাব্দীর প্রথম দশকে সংঘটিত চরমপন্থী আন্দোলনেও ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে মেল বন্ধন ঘটেছে। তবে এক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রশ্নে হিন্দুধর্মের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ সহযোগিতা স্থাপিত হবে; কিন্তু হিন্দুদের স্থিরীকৃত শর্তের নিরীখে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। উনবিংশ শতকের ইওরোপীয় সভ্যতার দুই মূল স্তম্ভ — ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী আন্দোলন হিসাবে এই চরমপন্থী আন্দোলন যূথবদ্ধতা (Collectivism) কে প্রাধান্য দিতে চেয়েছে।[২] প্রসঙ্গত বলা যায় ম্যাজিনী (Mazzini) যেখানে জাতীয়তা বা nationality কে ব্যাখ্যা করেছেন জনগণের "individuality' হিসাবে, সেখানে বিপিনচন্দ্র পাল 'personality' কথাটা ব্যবহার করেছেন।[৩] কারণ বিপিনচন্দ্রের মতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা 'individuality' শব্দটি

আসছে ফরাসি বিপ্লবের 'individualistic inspiration' বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুপ্রেরণা থেকে, যা জন্ম দেয় বিচ্ছিন্নতার (isolation) এবং বিরোধের (conflict)। অন্যদিকে 'personality'র মধ্যে পার্থক্যের অর্থ সত্তার মধ্যে পার্থক্য নয় — এটি কেবলমাত্র বাহ্যিক রূপ বা appearence এর পার্থক্যকেই নির্দেশ করে।[৪] এরই সঙ্গে ক্রীশ্চান ধর্ম ও উপযোগবাদ (utilitarianism)-এর দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্ম এবং সামাজিক মূল্যবোধ যেভাবে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তাকেও এই আন্দোলন প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়েছে। এই প্রতিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিপিনচন্দ্র পালের রাজনৈতিক ভাবধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

একজন নরমপন্থী (moderate) হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে বিপিনচন্দ্র পাল একজন চরমপন্থী নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯০২ সালে তিনি কলকাতায় ঘোষণা করেন যে ঈশ্বর স্বয়ং এদেশের মুক্তির জন্য ব্রিটিশদের প্রেরণ করেছেন।[৫] কিন্তু ১৯০৩ সালের পরবর্তী সময় থেকে, বিশেষত ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিপিনচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং নরমপন্থীদের আবেদন নিবেদনের নীতিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। এ সময় তাঁর সম্পাদিত 'New India' এবং 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র 'স্বরাজ' ও 'স্বদেশী' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে থাকেন। যদিও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে স্বরাজের প্রশ্নটি উঠে আসে, তথাপি সময়ের সাথে সাথে বঙ্গভঙ্গের প্রসঙ্গটির পরিবর্তে স্বরাজের বিষয়টিই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। বিপিন পাল বলেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও, স্বরাজ না আসা পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলন চলতেই থাকবে।

বিপিনচন্দ্র পাল কেবলমাত্র রূপকার্থে নয়, প্রকৃত অর্থে দেশের জনগণের 'মা' হিসাবে ভারতকে চিত্রায়িত করেন। ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যায় এবং জাতিকে 'মা' তথা হিন্দুদেবী হিসাবে উপস্থাপিত করার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিপিনচন্দ্র বলছেন, "this geographical habitat of our is only the outer body of the Mother. The earth that tread on it is not a mere bit of geograhical structure. It is the physical embodiment of all other. Behind this physical and geographical body there is a 'Being' a 'Personality' - the Personality of the Mother."[৬] তাঁর মতে পর্বতমালা, নদী, বিস্তৃত উপত্যকা — এসবই দেশমাতৃকার জীবন ও ভারতীয় জাতির প্রতি ভালবাসারই প্রকাশ। ভারতীয় ইতিহাস 'মা'-এর পবিত্র জীবনী; ভারতীয় দর্শনে 'মা'-এর মানসিকতা উদ্ঘাটিত হয়েছে; ভারতীয় কলা, অঙ্কন, স্থাপত্য, সঙ্গীত — এসবই দেশমাতৃকার বিভিন্ন আবেগানুভূতির বিন্যাস। সর্বোপরি ভারতীয় ধর্ম দেশমাতার সুসংবদ্ধ প্রকাশ।

সনাতন হিন্দুগ্রন্থের সাহায্যে বিপিনচন্দ্র ভারতীয় জাতীয় চরিত্রের বিশিষ্টতাকে তুলে

ধরতে এবং ভারতীয় সমাজবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হন। কারণ তিনি মনে করতেন ধর্মকে বাদ দিয়ে ভারতকে বোঝা সম্ভব নয়। তাঁর মতে ভারতীয় সমাজের বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের ঘটনাবলী শুধুমাত্র ঐতিহাসিকভাবে সমস্থানিক (coincident) নয়; এটি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব বা personality-র দ্বারা। এই বিবর্তনের ধারণাটিকে উপস্থাপিত করতে বিপিনচন্দ্র 'সাংখ্যদর্শন' থেকে দুটি ধারণা বা concept কে ব্যবহার করেছেন — পুরুষ ও প্রকৃতি; যেখানে পুরুষ স্থায়িত্বের বিষয়টিকে নির্দেশ করে এবং প্রকৃতি হল পরিবর্তনের প্রতীক।

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধারার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সর্বত্রই এই দুটি ধারণা বিভিন্নভাবে উপস্থিত — বৈদান্তিক দর্শনে ঈশ্বর এবং মায়া, বৈষ্ণব ধারণায় যা কৃষ্ণ এবং রাধা এবং শৈবদের কাছে তা হ'ল শিব এবং শক্তি। এই দ্বৈত সত্তাই বাস্তবতার অপরিহার্য অঙ্গ এবং তা-ই চরম সত্যের প্রতীক।

বিবর্তনের প্রতিটি স্তরকে নির্দেশ করতে তিনি জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গা তথা বিভিন্ন হিন্দু দেবী চরিত্রের প্রসঙ্গ এনেছেন। আদিম অবস্থায় মানুষ যখন তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে নিরন্তর পশুশক্তির সাথে যুদ্ধে বাধ্য হত, সেই সামাজিক অবস্থার ব্যাখ্যায় প্রতীক হিসাবে তিনি জগদ্ধাত্রী চরিত্রটি নিয়ে আসেন। পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ যখন উপজাতিগত দ্বন্দ্ব শেষ করতে সংগ্রামে রত, বিপিনচন্দ্র সে সময়ে কালীকে প্রতীকরূপে উপস্থিত করেন। শেষ পর্যায়ে মানুষ জাতি গঠনের মধ্যে দিয়ে উন্নততর স্থায়ী ব্যবস্থায় উপনীত হয়। দুর্গা - চরিত্রটির সাহায্যে তিনি এই পর্যায়কে ব্যাখ্যা করেছেন।[৭]

বিপিনচন্দ্রের মতে ব্রিটিশরা ভারতে আসার বহু আগে থেকেই ভারতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি সাধারণ ঐতিহ্য (common heritage) ছিল। 'institutions, crystallised in traditions and supported by sanctified authorities' — তাঁর মতে এদের মধ্যেই ভারতের অনুপম বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে।[৮] ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠানগুলির মূল খুঁজতে হবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একতার মধ্যে, শুরু থেকেই যার অস্তিত্ব ভারতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং একেই বিপিনচন্দ্র ভারতের আত্মা বা ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিধৃত করেছেন।

বিপিনচন্দ্রের মতে ভারতীয় সমাজজীবনে বহু পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে; তবে প্রাচীনকাল থেকে এই বিবর্তন ঘটেছে অবিরামভাবে, যদিও বিভিন্ন পর্যায়ে বিবিধ সামাজিক বা জাতীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাতের কারণে নতুন ধরণের সামাজিক সমন্বয়ের সূত্রপাত হয়েছে। ভারতে ইসলামের আগমনের সাথে সাথে হিন্দু সংস্কৃতি একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়; কারণ এক্ষেত্রে বিষয়টা ছিল সমসংস্কৃতির আত্তীকরণের পরিবর্তে ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধন। কালক্রমে এই উভয় সংস্কৃতির বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি নতুন জাতি আত্মপ্রকাশ করে, যার অস্তিত্বের দুটি দিকের প্রকাশ দুটি ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে — গড়ে ওঠে একটি নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমন্বয়।

পরবর্তীকালে একই ভাবে হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান ও পার্সী সংস্কৃতির আদান প্রদানে একটি বিশিষ্ট (Distinctive) গড়ে ওঠে যার বিস্তার এই সকল সংস্কৃতির গন্ডীকেই অতিক্রম করে যায়। বিপিনচন্দ্র মনে করতেন যে উল্লিখিত বিভিন্ন ধর্ম হিন্দু ধর্মের উপরে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেও, হিন্দুধর্ম তার মৌলিকত্ব রক্ষা করতে সফল হয়েছে। তাঁর মতে ভারতে এই পাঁচ সংস্কৃতির সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে একটি যৌগিক সংস্কৃতি বা "composite culture", যেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতি একে অন্যের উপর ভিন্ন ভাবধারা বল পূর্বক চাপিয়ে দেবে না। ভারতে জাতি গঠনকারী নেতৃবৃন্দকেও সচেতন থাকতে হবে, যাতে এই বিভিন্ন সংস্কৃতি তাদের বৈচিত্র (Diversity) ও বিশিষ্টতা (Distinct Indentity) রক্ষার সাথে সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে একটি সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে; কারণ তাঁর মতে বিভিন্ন ন্যাশানালিটি (Nationality) কেবলমাত্র এই সমন্বয়ী অস্তিত্বের মধ্যেই তাদের সার্থকতা খুঁজে পায়- "Organs find the fulfilment of their ends, not in themselves but in the collective life of the organism to which they belong."[৯] বিপিনচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে প্রতিটি সভ্যতার মৌলিক উপাদান হ'ল মানবিকতা এবং এই মূল ভিত্তিই ভারতে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।[১০] কিন্তু সমস্যা হ'ল, ভারতে বিভিন্ন সংস্কৃতির সম অবস্থানের কথা বললেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মূলত চালিত হবে হিন্দু সংস্কৃতি তথা ধর্মের দ্বারা। তিনি উন্নততর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কথা বলছেন, কিন্তু আবিষ্ট রয়েছেন হিন্দু ধর্মের ভাবনাচিন্তার দ্বারা — "The nationalist movement in India, which so far is essentially a Hindu Movement stands ideally for Hindu Nationalism....practically for the preservation of the distinctive genius and character of Hindu culture and civilization."[১১] সর্বোপরি তিনি কৃষ্ণকে ভারতের আত্মা (soul) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[১২] একেবারেই হিন্দু ধর্মীয় চরিত্রকে যখন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মূল ভিত্তি হিসাবে উপস্থাপিত করা হয় তখন তা রাজনৈতিক দর্শনের অস্বচ্ছতারই প্রতিফলন ঘটায়। এখানে অ-হিন্দুদের কাছে কৃষ্ণ সম্পূর্ণ অপরিচিত চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও তাদের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে কৃষ্ণের উপস্থিতিকে বাধ্যতামূলক করে তোলা হয়েছে। বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শনের নিরীখে সাংস্কৃতিক সমন্বয় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আধিপত্য এবং অ-হিন্দুদের সহনশীলতার সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি ধারণা। প্রসঙ্গত, অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের "A Possible India" গ্রন্থে "Secularism and Toleration" শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে তিনি মনে করেছেন যে হিন্দুত্ববাদীরা জাতীয় সংস্কৃতির নামে "homogenized content to the motion of citizenship" গঠন করতে চাইছেন এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সবরকম আদর্শগত উপাদানকে ব্যবহার করে সেই সকল ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে যারা এই জাতীয় সংস্কৃতির অংশ হিসাবে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না। অর্থাৎ আজকের হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দুত্বকে

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ (cultural Nationalism) হিসাবে প্রচার করে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। বিপিনচন্দ্র ও তাঁর বিভিন্ন লেখায় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় হিন্দু দেব-দেবীর চরিত্রের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় আধিপত্যকে মূল্যবোধের আকারে সমস্ত ভারতবাসীর কাছে গ্রহণীয় করে তোলার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মূল কাঠামোটি ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে গঠন করতে চেয়েছিলেন।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। Organiser - 23.02.90.

২। The Extremist Quest: Amalesh Tripathy; Orient Longman, 1967.

৩। The Soul of India; a constructive study of Indian thoughts and Ideas : B.C. Pal; Chowdhury and Chowdhury, Calcutta, 1911.

৪। Ibid.

৫। Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj: Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee; Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1958.

৬। The Soul of India; a constructive study of Indian Thoughts and Ideas : B.C. Pal; Choudhury and Choudhury, Calcutta, 1911.

৭। Ibid.

৮। Nationalism and Nationalities : an article by B.C. Pal in Karmoyog in, Vol.-1, No. 27.

৯। Swadeshi and Swaraj (The rise of new patriotism) B.C. Pal; Yugoyatri Prakashak Ltd. Calcutta, 1954.

১০। Writings and speeches, Vol. I, On Nation Building (2) : B.C. Pal; Yugoyatri Prakashak Ltd. 1954.

১১। Nationality and Empire : a running study of some current Indian Problems : B.C. Pal; Thacker Spink, Calcutta and Simla, 1916.

১২। The Soul of India : B.C. Pal (1911).

১৩। A Possible India : Partha Chatterjee; Oxford, Delhi.

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের রাজনৈতিক চিন্তাধারা — সাম্প্রদায়িকতা ও একজাতীয়তা

অনুরাধা ঘোষ

আমার আলোচ্য নিবন্ধে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যাকেন্দ্রিক চিন্তাধারা বিশেষত প্রাদেশিকতা, একজাতীয়তা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার সংক্ষিপ্তসারের উপস্থাপনা করেছি।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের রাজনৈতিক জীবন শুরু ১৯০৩ সাল থেকে এবং প্রায় সারা জীবন ধরেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত ছিলেন, তা বিপ্লবী কর্মী হিসাবেই হোক, কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে হোক অথবা ছাত্র আন্দোলন ও যুব আন্দোলনের নেতা হিসাবে হোক। অরবিন্দ, তিলক, গোখ্‌লে, বিপিন পাল, দাদাভাই নৌরজী থেকে শুরু করে লেনিন, গান্ধীজী এবং বিদেশের বহু নামী রাজনৈতিক নেতা ও সমাজতান্ত্রিক দলেব সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেছিলেন — তাঁদের মতবাদ ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিলো। সুদীর্ঘ ষোলো বছর প্রবাসকালীন সময়েও রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়নি। তাই যখন ভারতীয় রাজনীতি জীবনের মূল সমস্যাগুলি গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে সেগুলি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন এবং তাদের সমস্যার সমাধান সম্বন্ধেও মন্তব্য করেছেন তখন তার মধ্যে কোনো রাজনৈতিক দলবাজির উল্লেখ পাই না, বরং একজন বহু অভিজ্ঞ বহুদর্শী রাজনীতিবিদের মনোভাবের পরিচয় পাই যাঁর রাজনৈতিক চিন্তা বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

দেশের অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভূপেন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি সেকালের অসংখ্য ইংরাজি ও বাংলা পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর বেশিরভাগ রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ বা গ্রন্থগুলির রচনাকাল আমরা দেখি ১৯২৫-১৯৩০ সালের মধ্যে এবং ১৯৪৫-১৯৪৭ সালের সময়ে। এই ক'বছরের মধ্যে তাঁর চিন্তাচক্র রাজনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল।

উপরোক্ত পটভূমিকায় রচিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদির মাধ্যমে ভূপেন্দ্রনাথ যে বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন সেগুলি হ'ল আমাদের জাতীয় জীবনের লক্ষ্য কি, স্বরাজ প্রাপ্তির অর্থ ও স্বরূপ, প্রগতি অর্জনে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, দেশকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে দেশের যুব সমাজের ও জাতীয় সরকারের কি ভূমিকা ও কর্তব্য হওয়া উচিত ইত্যাদি। তাঁর মতে আমাদের জীবনের

লক্ষ্য হওয়া উচিত এক রাজনৈতিক পতাকা তলে, এক সভ্যতা কৃষ্টি, জাতীয় স্বার্থ ও ঐতিহাসিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

একজাতীয়তার সংজ্ঞা প্রদানকালে ভূপেন্দ্রনাথ অবশ্য মার্কস ও স্তালিনের ব্যাখ্যাকেই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞারূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন — "এক ঐতিহাসিক সংস্কৃতি, সমস্বার্থ ও সমভাগ্যের আবেষ্টনীর মধ্য হইতে যে লোকসমষ্টি বিবর্তিত তাহারা একজাতীয়তা (ন্যাশনালিটি) প্রাপ্ত হয়। এই একজাতীয়তা গঠনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হ'ল এক মনের অধিকারী হওয়া। এর নিদর্শন আমরা পাই বৈদিক যুগের সামবেদের শ্লোকের মধ্যে — 'সমানিব আকৃতি সমানা হৃদয়ানিব'। এই অনুভূতির পশ্চাতে রয়েছে ভাবপ্রবণতা। এক রাষ্ট্রীয় শাসনাধীনে এক স্বার্থ, এক আইন, এক শিক্ষা প্রাপ্ত হলে এক মনের অধিকারী হওয়া সম্ভব। একজাতীয়তা উদ্ভূত হইবার জন্য এক রক্তের, এক ধর্মের লোকসমষ্টি হওয়ার প্রয়োজন নাই। মার্কসীয় ব্যাখ্যানুসারে ভারতে সম ঐতিহাসিক কৃষ্টির একতা রহিয়াছে, তাহাদের ভাগ্যও একসূত্রে গ্রথিত, এক্ষণে তাহারা যদি বোঝে তাহাদের স্বার্থ এক তাহা হইলে একজাতীয়তা অর্জনে কোনো বিঘ্ন নাই।"

মনস্তত্ত্ববিদ ম্যাকডুগালের মতে একজাতিত্ব হল একটা মনস্তাত্ত্বিক ধারণা। একজাতীয়তা বোধের জন্য ধর্মগত ঐক্যের দরকার নেই, দরকার এক মনের। ম্যাকডুগাল যে মানসিক একত্বর (মেন্টাল হোমোজিনিটির) কথা বলেছেন ভূপেন্দ্রনাথ তার সমর্থনেই বলেছেন যে মানসিক একতা না হলে একজাতীয়তা অর্জন করা সম্ভব নয় — এক মন না হলে লোকে একতা অনুভব করে না। একজাতীয়তা গঠনের প্রথম সোপান শোষণহীন সমাজ গঠন করা - জাতিভেদ প্রথার অবসান ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ও তার পেছনে যে শ্রেণী স্বার্থ বা শ্রেণী চক্রান্ত আছে তাকে দূর করা।

যে সব ব্যক্তি বলে থাকেন যে ভারতের মতো শতধাবিচ্ছিন্ন দেশে যেখানে একাধিক ভাষা, উপভাষা, ধর্ম, লিপির সমাবেশ ঘটেছে সেখানে একজাতীয়তা গঠনের আশা সুদূর পরাহত, ভূপেন্দ্রনাথ তাঁদের যুক্তিকে খন্ডন করেছেন "একটা নির্দিষ্ট দেশে উপভাষার আধিক্য একজাতীয়তা সংগঠন ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে বৃহৎ দেশে নানা ভাষা ও উপভাষা থাকিবে এবং কালক্রমে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু সমস্বার্থ ও সমবেদনা থাকিলে তাহারা একত্র সংগঠিত হইয়া বিবর্তিত হইতে বাধ্য। যখন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে সেই অনুষ্ঠানের বিবর্তন সম্ভব হইয়াছে, ভারতেও তাহা কেন সম্ভব হইবে না ?" ভূপেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির মূলে যেমন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের অভিসন্ধি আছে, তেমনি আছে প্রদেশের কিছু শ্রেণীস্বার্থ সম্পন্ন ব্যক্তির এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টিকারীদের মিলিত চক্রান্ত। এর ফলে দেশের একজাতীয়তা গঠনের পথ দুরূহ হয়ে উঠেছে।

"ভারতবর্ষে একজাতীয়তা গঠনের উপাদান প্রচুর পরিমাণেই রহিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে

যাহা প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতীত হইতেছে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা প্রতিবন্ধক নহে। ক্ষুদ্র সমষ্টিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ এবং অনুদারতাই হইতেছে ইহার প্রধান অন্তরায়। এই জন্যই শ্রেণীস্বার্থ, ধর্ম ও কৃষ্টির আবরণ দ্বারা অজ্ঞ লোকেরা ক্ষেপাইয়া দিয়া গোলমাল সৃষ্টি করে।" রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যদি একরাষ্ট্রীয়তা অর্জনে সক্ষম হয় তাহলে ভারতের ক্ষেত্রেও একজাতীয়তা গঠন কিছু অসম্ভব নয়। একাধিক ভাষা, একাধিক লিপি ও একাধিক ধর্ম একজাতীয়তা গঠনের পথে বাধা হতে পারে না তা ভূপেন্দ্রনাথ বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

ডঃ দত্তের মতে একজাতীয়তা গঠনের পথে যে সব বাধা বিঘ্নগুলি দেখা দিচ্ছে তা হল ঃ সামাজিক স্তরভেদ — যা থেকে জাতিভেদ প্রথার জন্ম, ধর্মগত বিভেদ যা থেকে সাম্প্রদায়িকতা উদ্ভূত হয় এবং প্রাদেশিক বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য — যা থেকে প্রাদেশিকতার সৃষ্টি।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সমাজে এখনো কুল, গোষ্ঠী, জন প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরভেদ বর্তমান। যতক্ষণ এইসব স্তরভেদ থাকিবে ততক্ষণ ভারতবাসীর পক্ষে একটি জাতিতে পরিণত হওয়া অসম্ভব, তাই একজাতীয়তা অর্জন করতে হলে প্রথমেই এই বিভিন্ন স্তরভেদের অবলুপ্তির দরকার। যে সব জায়গায় জনসমূহ (জাতি) কূল ও জাতিতে বিভক্ত সেখানে একজাতীয়তা আনা সহজ ব্যাপার নয় এবং তা আনতে হলে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির অবসানের দরকার, একজন ভারতবাসীর পরিচয় জানতে হলে তার পূর্বপুরুষ কোথা থেকে এসেছে, কোন প্রদেশে তার জন্ম অথবা সে কোন কুলোদ্ভব বা কোন জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত সেসব জানার দরকার নেই, তার আসল পরিচয় হল সে একজন ভারতবাসী, ভারতের মাটিতে তার জন্ম, ভারতে তার বাস ও সে ভারতের নাগরিক, এই একাত্মবোধ জাগলেই একজাতীয়তা অর্জন সম্ভব হবে।

ভূপেন্দ্রনাথ প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের রাজনীতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ভারতের একজাতীয়তা গঠনের পথে প্রধান অন্তরায় হ'ল ধর্মগত বিভেদপ্রসূত সাম্প্রদায়িক সমস্যা, যার জন্য শেষ পর্যন্ত ভারত একটি একজাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারলো না। এই সাম্প্রদায়িকতার জন্মের পেছনে আছে প্রধানত বর্বর যুগের বদলা বা বৈর প্রথা যার অর্থ এক কুলের অন্তর্গত লোক তার নিজের কুলের বাইরের লোকদের বিজাতীয় বলে মনে করে। এই মনোবৃত্তি লোকের মনে 'আপন' 'পর' ভাবের উদ্রেক করে। সাম্প্রদায়িকতার অর্থ ধর্মগোষ্ঠীর লোক অপর ধর্মগোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে একত্রে বাস করতে পারে না। বৈদিক যুগে বর্ণভেদ ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্রের ত্রিমুখী সংগ্রামের মাধ্যমে ধর্মগত বিভেদ সূচিত হয়নি। কারণ সমগ্র আর্যাবর্তে তখন আর্যধর্ম বা হিন্দুধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম ছিল না, বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হিন্দু ধর্মের কাছে পরাভূত হয়েছিল।

ধর্মভিত্তিক সংগ্রামের সূচনা হয় — মুসলমান বিজয়ের পর থেকে। ইসলাম ধর্মের

প্রভাব থেকে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ নিজেদের ধর্মকে সুরক্ষিত করার জন্য নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপিত করতে থাকেন। এইভাবে হিন্দু সমাজ কূর্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কালক্রমে উভয় ধর্মের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জের হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও কৃষ্টিগত আদান প্রদান শুরু হয়। উভয় ধর্মের মধ্যে ভাব বিনিময় ঘটতে থাকে গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকাল থেকে। একদিকে যেমন চৈতন্যদেব, রামানন্দ, কবির প্রভৃতি সাম্যবাদী ধর্মপ্রচারকগণ জাতি বৈষম্যকে দূর করতে সচেষ্ট ছিলেন, অন্যদিকে ইসলাম ধর্মেরও কিছু উদার মতাবলম্বী সম্প্রদায় সুফি, ডোরা প্রভৃতির বাণী জাতিভেদ প্রথার কঠোরতাকে হ্রাস করে।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির মধ্যে এইভাবে পারস্পরিক আদান প্রদান, খাদ্য, পোশাক, রীতিনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সব কিছুতেই এই সমন্বয় সাধনের ছাপ — এই ভাববিনিময়ের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকধর্মের মধ্যেও এই ভাববিনিময় ঘটেছিল, হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ইসলাম ধর্ম — যার মূলনীতি হল এক হাতে কোরাণ ও অন্য হাতে তরবারি দ্বারা দেশবিজয় — সেই ইসলাম ধর্ম ও অনেক সহনশীল হয়ে পড়েছিল সেটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এই পারস্পরিক সহনশীলতার ও ঐক্যবোধের প্রাচীর মধ্যে আবার ভাঙন দেখা দিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীয় কূটনৈতিক চক্রান্তের ফলে। 'হিন্দু মেলা' বা ভারতের জাতীয় মহাসভা (কংগ্রেস) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের যুগে ভারতবাসীর অজ্ঞাতসারে এক ধরণের মানসিক একাত্মবোধ ধীরে-ধীরে গড়ে উঠেছিল।

রাজনীতি ক্ষেত্রে সকলে প্রথমে ভারতবাসী ও ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করে একজাতীয়তা গঠন করাই ছিল কংগ্রেসের আদর্শ। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের ভাব জাতীয় কংগ্রেস প্রথম আনে। কিন্তু কংগ্রেস যখন এ বিষয় সাফল্য লাভের পথে এগিয়ে চলেছে তখন দ্বন্দ্ব ভাবরূপ বিঘ্ন পথমধ্যে উদিত হল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতিকগণ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কিছু মুসলমান নেতাদের বলেন যে তাঁরা যদি একটি নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটি সংঘ সৃষ্টি করেন সম্রাট তার মতামত গ্রহণ করবেন। এইভাবে দ্বন্দ্ববাদের ফলস্বরূপ মুসলিম লীগ নামক একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হল। এইভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিষিয়ে দিল জাতীয়তাবাদী দর্শনকে। নবোত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থকে কায়েমী করে রাখার চেষ্টায় মহম্মদ আলি জিন্নার মত একজন উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতা সাম্প্রদায়িক নেতাতে পরিণত হন। তিনি ভারত থেকে কিছু প্রদেশকে আলাদা করে পাকিস্তান নামক এশিয় স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে চাইলেন।

পাকিস্তান নামক এক পৃথক রাষ্ট্র পরিকল্পনার স্বপক্ষে মুসলিম লীগের যুক্তি হল যে হিন্দুদের সঙ্গে যেহেতু তাদের ধর্ম, রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার অর্থাৎ কৃষ্টিগত সব পার্থক্য রয়েছে, সেজন্য যেসব প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠ ভাবে মুসলমানদের বসবাস সেগুলিকে

মুসলমান অধ্যুষিত দেশ বলে নির্দিষ্ট করা হোক। তাহলে এখানে খাঁটি মুসলমান শাসন বিবর্তনের সুবিধা হবে এবং এই স্থানকে 'পাকিস্তান' (পবিত্রস্থান) নামে চিহ্নিত করা হবে। এগুলি হবে তাঁদের 'দার-উল-ইসলাম', এখানে মুসলমানগণ নিজেদের ধর্ম ও আইনানুযায়ী স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারবে। অতএব ভবিষ্যৎ শান্তির জন্য উভয় জাতির জন্য পৃথক ভাবে বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হোক।

ভূপেন্দ্রনাথ সেজন্য যে সব মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায়ের লোক যারা — 'পাকিস্তান' গঠন দাবি করেছেন তাঁদের দাবিকে তিনি 'অজ্ঞতাপ্রসূত রাজনীতিক ধ্বনিমাত্র' বলেছেন, যেটা নিছক একটা অবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। পাকিস্তান দাবির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের উভয় সম্প্রদায়ের যুক্তি আছে। হিন্দুদের আপত্তির কারণ হল যে পাকিস্তান পরিকল্পনা কার্যকর হলে বর্তমানের আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিমে হিমালয়ের কিছু অঞ্চল ভারত থেকে বিচ্যুত হবে, বিশেষ করে হিন্দুদের কতকগুলি তীর্থস্থান ভারতের সীমানার বাইরে চলে যাবে। আর মুসলমানদের আপত্তির কারণ হল যে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে ভারতীয় মুসলমানদের বিখ্যাত ধর্মালয় ও পীরের সমাধিস্থল ও ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে অমুসলমানদের শাসন প্রবর্তিত হবে যাতে ইসলাম ধর্মের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু এইসব দলগুলির কোনোটিই তুলনামূলক পরীক্ষা ও বিচারের সাহায্যে নিজেদের বক্তব্যগুলি যাচাই করেন না।

বাস্তবক্ষেত্রে ভারতের সর্বত্রই হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করে। এমন কোন গলি নেই যেখানে মসজিদ আর হিন্দুদের মন্দির একত্র থাকতে পারে না। পাঞ্জাবের শিখরা চিরকাল গর্ব করে থাকেন যে তাঁরা স্বাধীন জাতি এবং এককালে তাঁরা পাঞ্জাবের অধীশ্বর ছিলেন। এখন পাঞ্জাব যদি পাকিস্তানের অন্তর্গত হয় তবে কি সেখানকার হিন্দু ও শিখরা নিজভূমিতে পরবাসীরূপে বাস করতে রাজি হবেন ? ডোগরা রাজপুতদের হাতে কিছু পার্বত্য রাষ্ট্র প্রাচীনকাল থেকে আছে এবং জম্মু ও কাশ্মীর তাদের অধীনে। যদি পাকিস্তান প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয় ভূপেন্দ্রনাথের প্রশ্ন তবে কি তারা কলমের একটি মাত্র খোঁচায় নিজের দেশের দাস হয়ে যাবেন ? সিন্ধু দেশের শহরাঞ্চলে যেসব হিন্দু ব্যবসায়ী বাস করেন তাঁদের অবস্থা কি হবে ? যদি তাঁরা স্বদেশ ত্যাগ করার আগে নিজেদের সঞ্চিত অর্থ বিদেশে সরিয়ে দেন তাহলে সিন্ধুদেশেরই বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন হবে। এছাড়া পাঞ্জাবে যদি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়পড়তায় শতকরা ৬ জন মুসলমান বেশি হন তাহলে সেই প্রদেশক একমাত্র তাঁদের দেশ বলা চলে না। এজন্য এইসব প্রদেশকে ভাগ করে এটা মুসলমানের আর ওটা হিন্দুর মাতৃভূমি বলে বিভাগ চলে না। এছাড়া ভূপেন্দ্রনাথ মনে করেন পাকিস্তান নামক ধর্মনির্ভর রাষ্ট্র গঠিত হলে সেখানকার হিন্দুদের নিয়ে আবার একটা নতুন সমস্যা দেখা দেবে। যেমন পাঞ্জাবে যদি শরিয়ত আইন চালু হয় তাহলে অমুসলমানকে আবার জিজিয়া কর দিতে হবে। আবার মুসলমানের

জন্য কাজির বিচার আর হিন্দুর জন্য ব্রাহ্মণ ডেকে প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী বিচার করতে হবে। এই ব্যবস্থার ফলে পাকিস্তানে মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা চালু হবে এবং এর ফলে হিন্দু ও শিখদের আত্মরক্ষার জন্য মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সুতরাং ধর্মনির্ভর রাষ্ট্র গঠন করা মানে ইতিহাসের গতিকে অস্বীকার করা। এভাবে ধর্মের ভিত্তিতে একটা রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

এইভাবে সমাজতাত্ত্বিক, রাজনীতিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ পাকিস্তান সমস্যাটি বিচার করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে ভারত নৃতাত্ত্বিক ও কৃষ্টিগত ভাবে এক ও অবিভাজ্য, তাকে রাজনৈতিক দিক থেকে দুটুকরো করা যুক্তিযুক্ত নয়। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে — একদল জাতীয়তাবোধ বিরোধী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যাঁরা ব্রিটিশ শাসনের যুগ থেকে ভারতবাসীকে এক নেশনের মর্যাদা দিতে নারাজ ছিলেন, তাঁরাই ধর্ম নির্ভর জাতিতত্ত্ব প্রচার করছেন, পাকিস্তান দাবি মুসলিম জনসাধারণের নয়, এর পেছনে আছে একদল অভিজাত ও বুর্জোয়া শ্রেণী। ভূপেন্দ্রনাথের আশঙ্কা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে ভারতে তাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে একটা বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হতে পারে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতারই জয় হল। ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় তা দেখে গেছেন। "দুঃখের কথা স্বাধীন বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে পৃথক ভাবে বিবেচিত হচ্ছে। এ দুঃখ আমি ভুলতে পারি না।"

শ্রী অরবিন্দ ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

রাজলক্ষ্মী কর

ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বিশ শতকের প্রথমে প্রসার লাভ করলেও এর সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকের শেষে। প্রচলিত সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়তাবাদী নেতাদের সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তাঁদের মতে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের যুব শ্রেণীর মধ্যে আধুনিক সংস্কৃতিব পরিচয় ঘটালেও তার প্রকৃত প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ফলে দেশের যুব সমাজ জাতীয় জীবনের মূল ধারা থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ও শিক্ষা কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের উপায় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ফলে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সরকার শিক্ষার এই ক্রটিগুলিকে দূর করে ভারতের ছাত্র সমাজের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিস্তারে উদ্যোগী হয়।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট ছিল তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি। জাতীয়তাবাদী নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার এক উপযুক্ত বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবেই শুধু নয়, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তোলা। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের শুরু ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এর কিছু পূর্বেই ১৯০২ সালে 'ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস্ কমিশনকে নিয়োগ করা হয়। এই সময় থেকেই ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত এক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপক্ষে জোরদার দাবি ওঠে। সরকারি উচ্চপদগুলি থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল বঞ্চিত, ফলে স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে এক হতাশাবোধের সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গের ঘোষণার ফলে শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর আশঙ্কা হয় যে এরফলে নতুন প্রদেশে তাদের চাকরির সুযোগ আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে।[1] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে তার সঙ্গে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনও যুক্তহয়। বিপিন পাল, শ্রী অরবিন্দর মত চরমপন্থী নেতারা বয়কট আন্দোলনকে প্রশাসন, বিচার, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রসারিত করতে আগ্রহী ছিলেন। যে যুবক ও ছাত্ররা বয়কট ও পিকেটিংএ সামিল হয়েছিল তাদের সরকারি নিষেধাজ্ঞার জন্য স্কুল কলেজ ছাড়তে হয়েছিল। এছাড়া আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের দমন করার জন্য কার্লাইল সার্কুলার, পেড্‌লার সার্কুলার প্রভৃতি জারি করা হয়। ফলে ঐ সব ছাত্রদের জন্য একটি বিকল্প ও স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ৮ই নভেম্বর ১৯০৫-এ রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় তৈরি হয়। বিভিন্ন জেলাতে যখন ছাত্রদের উপর নির্যাতন

চলছে তখন ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী এক ইস্তাহারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের ডাক দেন।[২] এরপর রাজা পিয়ারী মোহন মুখার্জীর নেতৃত্বে নভেম্বর মাসে একটি এডুকেশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতে সুবোধ চন্দ্র মল্লিক প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষা গঠনের জন্য এক লাখ টাকা অনুদান দেবার ঘোষণা করেন। নভেম্বরের এই সম্মেলনের ভিত্তিতে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, গুরুদাস ব্যানার্জী ও অন্যান্যরা মিলে ১৯০৬ সালের ১১ই মার্চ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপন করেন। ওয়েজ ও মিনস্ কমিটি জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করে মার্চ মাসে। এতে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয় যে — 'শিক্ষা প্রদান — কলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি শিক্ষা — জাতীয় ধারা অনুসরণ করে, সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে এবং প্রচলিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিরোধিতায় না গিয়ে তার থেকে স্বতন্ত্র এক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।' এই পরিষদের অধীনে ১৪ই আগষ্ট, ১৯০৬ সালে[৩] বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে তারকনাথ পালিতের নেতৃত্বে সোসাইটি ফর দ্য প্রমোশন অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে এসে এই কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করলে স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। একই সঙ্গে তিনি বন্দেমাতরম পত্রিকার সম্পাদনার কাজও শুরু করেন। তাঁর প্রভাবে বন্দেমাতরম পত্রিকা চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী দলের মুখপত্র হয়ে ওঠে ও পূর্ণ স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, বয়কট ও একইসঙ্গে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রটি ও দমননীতির সমালোচনা ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে প্রচার চালাতে থাকে। এতে সরকারি দমনমূলক সার্কুলারকে স্বাগত জানান হয় কারণ এর বিধিনিষেধের কঠোর প্রয়োগ পরোক্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে উৎসাহ দেবে। শ্রী অরবিন্দ সরকারি দমননীতির বিরোধিতায় দেশের মানুষকে নির্ভয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হতে বলেন। তাঁর অধ্যক্ষপদের সময়কাল ছিল খুবই স্বল্প — ১৯০৬-এর[৪] আগষ্ট থেকে ১৯০৭ এর- আগষ্ট পর্যন্ত। বন্দেমাতরম কেসে অভিযুক্ত হলে কলেজের সম্মানের কথা ভেবে তিনি পদত্যাগ করেন। তিনি আবার ডিসেম্বর মাসে যোগদান করেন। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে কিন্তু আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত হলে আলিপুর কারাগার থেকে তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন।[৫]

অধ্যক্ষ হিসাবে শ্রী অরবিন্দের সামনে ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ। একদিকে ছিল সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উপযুক্ত বিকল্প হিসাবে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা, অন্যদিকে ছিল সরকারি শিক্ষার ক্রটিগুলিকে সংশোধন করে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সঞ্চার করা। তিনি বন্দেমাতরম পত্রিকায় লেখেন — "স্বদেশী শিক্ষার মানে এই নয় যে শুধুমাত্র ভারতীয় শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষাদান বা ভারতীয়দের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদান, এটি এমন

এক শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে, আধুনিক শর্তসাপেক্ষে দেশ গঠনের কাজে লাগবে।"[৬] শ্রী অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে বলেন যে — "কেবলমাত্র কিছু তথ্য বা জ্ঞান দেবার জন্য নয়, জীবন ধারণের আবশ্যিক উপার্জনের জন্য নয়, দেশের জন্য সন্তান গড়া যারা দেশের কাজে যে কোন স্বার্থ ত্যাগে প্রস্তুত থাকবে[৭]। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে স্ব-নির্ভরতার অর্জন। তিনি আরো বলেন যে এই শিক্ষা মানুষকে যন্ত্র না বানিয়ে, জাতীয় মানুষ বানাবে, শক্তিশালী করবে, যাতে তারা তাদের নিজস্ব বুদ্ধি ও ক্ষমতা দিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে নিতে পারে। শ্রী অরবিন্দ অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করার সময়ে জাতীয় কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন, যেটি "Advice to National College Students" শিরোনামে বন্দেমাতরম পত্রিকায় ছাপা হয়। এর মধ্যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ছাত্রদের চাকরি ও উপার্জনের সঙ্কীর্ণ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে তাদের শিক্ষাকে দেশের জন্য উৎসর্গ করতে বলেছেন।

তিনি আশা করেছেন যে সমস্ত বাধা কাটিয়ে এক ভারতবর্ষের জন্ম হবে, বর্তমানে দেশসেবা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়, সব কাজই এই উদ্দেশ্যে চালিত করতে হবে, শরীর, মন, আত্মাকে এই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং এমন কাজ করতে হবে যাতে দেশের সমৃদ্ধি ঘটে সেটাই হবে প্রকৃত শিক্ষা। তিনি বলেছেন "work that she may prosper, suffer that she may rejoice."[৮]

শ্রীঅরবিন্দ অধ্যক্ষ হিসাবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁর এই অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে বন্দেমাতরমের সম্পাদকীয় সমালোচনার মধ্যে। তাঁর মতে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আনা হয়েছে সেটা কেবলমাত্র উপরিভাগে এবং পুরোনো পদ্ধতিতেই এখনও চলা হচ্ছে। পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা যেহেতু স্বদেশী আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে শুরু হয়েছিল ফলে জাতীয় শিক্ষার প্রাণ ছিল জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রাথমিক পর্বের পরে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান ধারা থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাতরম ও কর্মযোগীন দুই পত্রিকাতেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেন। যে শিক্ষা ত্রুটি পূর্ণ সরকারি শিক্ষার প্রতিবাদে গড়ে ওঠে, পরবর্তীকালে সেই জাতীয় শিক্ষা সরকারি সাহায্য ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর হয়ে পড়লে জাতীয় শক্তির অপচয় ও আশাভঙ্গ হয়। এর কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন — "Independence is the first condition and any scheme which disregards it is doomed to failure."[৯]

জাতীয় পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরা প্রধানত ছিলেন নরমপন্থী রাজনৈতিক মতাবলম্বী। ফলে তাঁদের সঙ্গে শ্রী অববিন্দের মতের পার্থক্য হয়। নীতিগত ভাবে না

হলেও এই বিরোধ ছিল দৃষ্টিভঙ্গির। শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশ চন্দ্রকে একটি চিঠিতে লেখেন যে শ্রী অরবিন্দের পদত্যাগ স্কুলের পক্ষে শুভ হয়েছে। যেখানে পরিষদ চেয়েছিল জাতীয় কলেজ ও স্কুলকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা সেখানে শ্রী অরবিন্দ চেয়েছিলেন এই শিক্ষাকে জাতীয় লক্ষ্যে পরিচালিত করা বা স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে এক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তোলা।

কর্মযোগীন পত্রিকাতে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন — (১) পরিষদের বেশিরভাগ সদস্যদের কাছে এটি ছিল একটি মনোগ্রাহী শিক্ষা সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা, (২) পরিষদ কেন্দ্রিয় সংগঠন হিসাবে কাজ করে না, মফস্বল স্কুলগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য কোন প্রয়োজনীয় বিস্তারিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি, (৩) পরিষদের কর্মপদ্ধতি ছিল বিস্তারিত ও সময়সাপেক্ষ।[১০]

এর সঙ্গে শ্রী অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলিকে কিভাবে সংশোধন করা যায় তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। তিনি আশা করেছেন নতুন কোন প্রচেষ্টার শুরু হবে, সুযোগ্য, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, দেশের কাজে উৎসাহী শিক্ষক সহজলভ্য হবে, নতুন কিছু বইএর মাধ্যমে পঠনপাঠন পবিচালিত হবে, দেশের মধ্যে আবার নতুন উৎসাহ ও আশার পুনর্জাগরণ ঘটবে, গ্রামের স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হবে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সাফল্যের প্রথম শর্ত হল সর্বস্তরে জাতীয় আন্দোলনের পুনর্জাগরণ এবং তা জাতীয়তাবাদী দলের সংগঠন ও কার্যকারিতার দ্বারাই সম্ভব হবে।

স্বল্প রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় শিক্ষায় বিভিন্ন ত্রুটিগুলিকে নিয়ে আলোচনা করলেও পরবর্তীকালে শিক্ষায় দর্শন সম্বন্ধে চিন্তাশীল আলোচনা করে আমাদের শিক্ষার ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মনো বিকাশ। যে শিক্ষা শুধুমাত্র academic perfection-র উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় ও শিক্ষা দেবার পদ্ধতিকে অবহেলা করে, সেখানে বৌদ্ধিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নিজস্ব সত্তার বিকাশ, মহৎ উদ্দেশ্যে অন্তর্নিহিত শক্তির সর্বোচ্চ ও যথার্থ বিকাশ।

তিনি আরো বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন যে শিক্ষার প্রথম নীতি হল শিক্ষক হবেন একজন সাহায্যকারী ও পথ প্রদর্শক। দ্বিতীয় নীতিটি হল, ছাত্রর মনের বিকাশ তার নিজের মত হতে দিতে হবে। বাবা মা বা শিক্ষকের ইচ্ছানুযায়ী ছাত্রর মনের বিকাশকে পরিচালনা করা বর্বরতা, নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী তার মনের বিকাশ হওয়া উচিত। তৃতীয় নীতিটি হল, শিক্ষা হবে মানুষের নিজের প্রকৃতি, তার পরিবেশ, পরিবার, নিজের দেশ যে মাটিতে সে জন্মেছে, যে বাতাসে সে নি:শ্বাস নেয় যে জীবনে সে অভ্যস্থ তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১১]

শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবিধ আলোচনা করেন। তাঁর মতে জাতীয়

শিক্ষা ব্যবস্থাব প্রথম সমস্যা হল যে এই শিক্ষাকে ইউরোপীয় শিক্ষার মত ব্যাপক ও সম্পূর্ণ শিক্ষা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে এবং এই শিক্ষা কষ্টকর ও মুখস্থ নির্ভর শিক্ষার দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত হবে। জ্ঞানের চর্চার দ্বারা ও স্বাভাবিক ও সহজ কার্যকরী একটি শিক্ষণ পদ্ধতির অনুসন্ধানের দ্বারা এই কাজটি করা সম্ভব হবে। এই ব্যবস্থাগুলিকে যদি শক্তিশালী করে তোলা যায় তবেই একমাত্র আধুনিক অবস্থার প্রয়োজনীয় বর্ধিত কাজের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিগুলিকে কার্যকরী করা যাবে। অধ্যক্ষ হিসাবে জাতীয় কলেজে থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতি ও সমস্যার সম্মুখীন হন। পরবর্তীকালে তিনি যখন জাতীয় শিক্ষার উপর প্রবন্ধ লেখেন তখন তাঁর অভিজ্ঞতার প্রভাব তাঁর লেখার মধ্যে পড়োছিল। তিনি মনে করেছিলেন একটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় স্তরে নিয়ে যেতে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে "the past is our foundation, the present our material, the future our aim and summit. Each must have its due and natural place in a national system of education."[১৪]

জাতীয় শিক্ষার সমালোচনায় শ্রীঅরবিন্দ ধর্মীয় শিক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে যে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ধর্মবিশ্বাসের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা ভুল হয়েছে, কারণ তাঁর মতে কোন ধর্মীয় শিক্ষারই কোন মূল্য নেই যদি না তাকে জীবনের সঙ্গে সজীব রাখা যায়। তিনি বলেছেন, "the essence of religion, to live for god, for humanity, for country, for other and for oneself — in these, must be made the ideal in every school which calls itself national"[১৫] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রী অরবিন্দের কাছে 'ধর্ম'র অর্থ ছিল 'সনাতন ধর্ম' বা "eternal religion" এবং এটি প্রচলিত হিন্দু ধর্মের সমার্থক নয়।

আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বিস্তার হয়েছিল এক বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সরকারি শিক্ষা বর্জন, ভারতবাসীর মধ্যে স্বদেশী শিক্ষার বিস্তার তথা ভারতবাসীকে স্বয়ংনির্ভর করে তোলা ও জাতীয়তাবোধের বিস্তার। সরকারি শিক্ষা গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সরকারি চাকরি লাভ ও উপার্জন। ফলে ঔপনিবেশিক শিক্ষায় জাতীয় চরিত্র গঠন ও জাতীয়তাবোধের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হত। এই শিক্ষা শুধুমাত্র দাসত্ব করার মনোবৃত্তি ও উপার্জনে উৎসাহিত করত। তাই প্রচলিত সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার কোন চরিত্র ছিল না। শ্রী অরবিন্দের সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান ও জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল। তিনি জাতীয় শিক্ষাকে এক মহত্তর উদ্দেশ্যে চালিত করতে চেয়েছিলেন শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন না করে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছান। প্রচলিত সরকারি শিক্ষার সঙ্কীর্ণতা ও ত্রুটি দূর করে তিনি এই বিকল্প জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে দেশ ও জাতি গঠনের উদ্দেশ সাধিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক উচ্চতর আদর্শ ও

জাতীয় চরিত্র দান করেছেন।

শ্রী অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক সহজ স্বাভাবিক, জোর করে আরোপিত নয় এমন এক পরিপূর্ণ শিক্ষা হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এটি হবে প্রকৃত এক শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে মনের বিকাশ সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। ছাত্রর নিজের প্রকৃতি, পরিবার, নিজস্ব সত্তা অনুযায়ী এই বিকাশ হবে। ইতিহাস, বিজ্ঞান দর্শন কলা সবকিছুই পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। জ্ঞান চর্চার সঙ্গে শিশু মনের অনুসন্ধিৎসা, মননশীলতা, শৈল্পিক ক্ষমতা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দিয়ে তাকে ভবিষ্যতের পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে।

শ্রী অরবিন্দের জাতীয় শিক্ষার চিন্তা নি:সন্দেহে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক প্রগতিশীল পদক্ষেপ। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ছিল দেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করার জন্য মানুষ গড়া। এর সাফল্য নির্ভর করছে শিক্ষার মাধ্যমে দেশের মধ্যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটানো। তাই এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল প্রেরণা জাতীয় আন্দোলন থেকে নিতে হবে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করে কিভাবে এই শিক্ষাকে দেশগঠন তথা পূর্ণ স্বরাজের আদর্শে পরিচালিত করা যায় তা শ্রীঅরবিন্দ আলোচনা করেছেন। তিনি বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনা করে বোঝেন যে সরকারি দমন নীতির মুখে জাতীয় আন্দোলনকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেবার সাফল্য নির্ভর করছে দেশের জাতীয় পুনর্গঠনের ওপর। দেশ গঠনকে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা এবং জাতীয় শিক্ষাকে দেশ গঠন তথা স্বয়ং নির্ভরতা অর্জন, জাতীয় চরিত্র গঠন, ভারতবাসীর নিজ ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাসের পুনর্জাগরণ, সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে চালিত করতে চেয়েছেন। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে জাতীয় সংহতি বিপন্ন হচ্ছে, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা মাথা উঁচু করছে, সেখানে জাতীয়তাবোধ পুনর্গঠনের বিশেষে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আজ নূতন করে এই জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় চরিত্রের গঠনের জন্য শ্রী অরবিন্দের নির্দেশিত পথে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমাদের উৎসাহিত করে।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। S. N. Mukherjee : History of Education in India p. 127.

২। Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee : The Origins of National Education Movement, p.36.

৩। পূর্বোক্ত।

৪। বন্দেমাতরম, Curzonism for the Universtiy, ৮ইমে, ১৯০৭।

৫। M.P. Pandit : Builders of Modern India, P. 98.

৬। বন্দেমাতরম, Swadeshi in Education, ১৩ই জুলাই, ১৯০৭।

৭। "Advice to the National College Students", বন্দেমাতরম, ২৩ আগষ্ট, ১৯০৭।

৮। পূর্বোক্ত।

৯। Swadeshi in Education.

১০। কর্মযোগীন, National Education, পৃ. ৩৩৬।

১১। পূর্বোক্ত।

১২। A system of National Education, শ্রী অরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, খন্ড-১৭।

১৩। পূর্বোক্ত।

১৪। পূর্বোক্ত।

১৫। পূর্বোক্ত।

একটি আত্মজীবনী : একজন ভদ্রলোককে অনুসন্ধান

অমল শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান আলোচনাধীন ব্যক্তি হলেন নদীয়ার শান্তিপুর নিবাসী পাটের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবার উদ্ভূত রজনীকান্ত মৈত্র। তাঁর লেখা আত্মজীবনীটি (জীবন স্মৃতি; শ্রী রজনীকান্ত মৈত্র প্রণীত, শান্তিপুর হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, কার্তিক ১৩৪৩, কলিকাতা, সাহিত্য ভবন প্রেসে মুদ্রিত) একান্তভাবে নিজস্ব লোকদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে বিলি করার জন্য প্রচারিত হয় সম্ভবত লেখকের জীবদ্দশায়। কলকাতার সুপরিচিত গ্রন্থাগারগুলির তালিকায় এটির উল্লেখ নেই। বইটি স্বল্প পরিচিত মনে করার আর একটি কারণ হ'ল 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান'-এ লেখকের সুপরিচিত কনিষ্ঠ পুত্র[১] লক্ষ্মীকান্তর মা, লেখকের স্ত্রীর[২] নাম উল্লেখিত হয় নি। চরিতাভিধানের সঙ্কলকরা যদি বর্তমান বইটি হাতে পেতেন তবে ঐ ফাঁক কি ভরাট হয়ে যেত না ?

১

রজনীকান্তের জন্ম হয় ১৮৫৬ সালের সেপ্টেম্বর[৩] মাসে মাতুলালয় ২৪ পরগণা জেলার মালঞ্চ গ্রামে (পৃঃ ১)। এঁদের পৈত্রিক নিবাস ছিল নদীয়া জেলার বেলপুকুর গ্রামে। পিতা কালী প্রসাদ কলকাতায় চাকরি করতেন। দেড় বছর বয়সে মাতৃহীন হয়ে পিতামহীর যত্নে প্রতিপালিত হন। চার বছর বয়সে তাঁর পিতা খানিকটা পরিকল্পনা করে আঁটঘাট বেঁধেই গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দিষ্ট হন (পৃঃ ৫)। চার বছর বয়সে চিরাচরিতভাবে বিদ্যারম্ভ হয়। তবে অভিভাবক ও সহায় সম্বলহীন পরিবারের বালক হওয়ায় ক্রমাগত প্রতিকূলতা আসতেই থাকে। বেশ কয়েকটি স্কুল বদল করতে হয়, পাঠাভ্যাস হয়ে ওঠে অনিয়মিত। চৌদ্দ/পনের বছর বয়সে পূর্বস্থলীর নিকট চকচন্ডিপুর গ্রামের ডাক্তার ভুবনেশ্বর লাহিড়ীর এগার বছরের কন্যা যদুবালার (পৃঃ ২২২) সঙ্গে বিবাহ হয় (পৃঃ ১০)। তাঁদের চার পুত্র ও তিন কন্যা জন্মায়। এইভাবেই ১৮৭৫ সালে উনিশ বছর বয়সে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসেন, কিন্তু পাস করতে পারেন নি (পৃঃ ২০)। এরপর শুরু হয় নানা স্থানে জীবিকার সন্ধান। অবশেষে ১৮৭৬ সালের জুলাই মাসে গ্রাম ও আত্মীয়তার সুবাদে পরিচিত জনৈক ব্যক্তির সহায়তায় মেসার্স ওসিলিভি কোম্পানির সিরাজগঞ্জ কুঠিতে মাসিক ২০ টাকা বেতনের দ্বিতীয় কেরানি হিসেবে চাকরি জোটে (পৃঃ ২৬)। পাটের কারবারের ওঠানামার মধ্য দিয়ে কোম্পানি বদল করে (পৃঃ ৩৩) স্থির হন বার্কমায়ার কোম্পানির শীতলক্ষ্মা নদী তীরে নারায়ণগঞ্জ অফিসে। সেখানে নানা ইউরোপীয় ওপরওয়ালার অধীনে থেকে ১৯২২ সালে ছেচল্লিশ বছর কাজ করে মাসিক ১৫০ টাকা অবসর ভাতাসহ

কর্মজীবনের ছেদ টানেন (পৃঃ ১৫৯)। বইটি থেকে জানতে পারছি ১৯৩৬ সালে আশি বছর বয়সেও তিনি জীবিত ছিলেন।

প্রথম প্রথম যা হত তা শোনা যেতে পারে তাঁরই জবানীতে, "... প্রাতে ৭টা থেকে ৭.৩০ মিঃ মধ্যে স্নান আহার করিয়া অফিসে যাইতাম, সূর্য্য অস্ত গেলে ফিরিতাম। ইহার মধ্যে এক পয়সার বাতাসা খাওয়ারও সুযোগ ছিল না।" (পৃঃ ২৮) "... যে দিন অফিসে কাজ কর্ম পড়িত সে দিন সাহেব আমাকে বড় বড় খবরের কাগজ নকল করিতে দিতেন এবং আমার লেখায় কোন ভুল থাকিলে তাহা পড়িয়া উচ্চ হাস্য করিয়া ব্যঙ্গ করিতেন... বলিতেন, - ছেলে ছোকরাকে সর্ব্বদা অত্যন্ত খাটাইতে হয়, নতুবা সে চিরজীবন অত্যন্ত অলস হইয়া যায়।" (পৃঃ ২৯)

তাঁর এই ধন সম্পত্তি অর্জন যে কি পর্যায়ের ছিল তার খানিকটা আভাস মেলে এর প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা পরে 'অর্থলাভ' শীর্ষক একটি উপবিভাগ থেকে। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্বতঃপ্রবৃত্ত বিবৃতি "অনেকেই মনে ভাবেন যে, যাহারা পাটের অফিসে কাজ করিতে যায়, তাহারা ২/৪ বৎসরে ধনাঢ্য হইয়া আসে। পাটের অফিসে কিমবারলীর ন্যায় হীরার খনি আছে অথবা টাকার জালা আছে, তাহা হইতে ২/৪ ধামা আনিলেই কাজ যাতে হয় অর্থাৎ তাহার আর জীবনে অর্থ কষ্ট থাকে না কিম্বা চিচিং ফাঁক বলিলেই আলিবাবার ন্যায় গাধার পিঠে ছালা ভরিয়া যথেষ্ট টাকা মোহর আনিতে পারে অথবা আলাদীনের ল্যাম্প আছে। এইসব ধারণা যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তবে সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভাল মন্দ আছে, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া যে সমস্ত বিদেশী বণিক ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আসেন, তাঁহারা অন্ধ নহেন। তাঁহারা বাঙালীর ওপর তীব্র দৃষ্টি রাখেন। খরচের হিসাব তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করেন এবং যত খরচ হয়, তাহা বেপরী প্রভৃতির সহিত অনেক সময় মুকাবিলা করেন। পুকুর চুরি করিতে চেষ্টা করিলেই কর্মচ্যুতি বা কারাবাস হয়।" (পৃঃ ১২৬) এই বক্তব্য কি অনেকটা স্বীকারোক্তিমূলক নয় ? এরও সঙ্গে প্রায় এক নিঃশ্বাসে যেন তিনি বলে চলেছেন, "তবে পাটের অফিসে একটু যত্ন চেষ্টা করিয়া শুষ্ক পত্র যত্নে কুড়াইয়া খাইলেই উদর পরিপূর্ণ হয়; চুরি করিতে হয় না। আমি সিরাজগঞ্জ এবং নারায়ণগঞ্জে যাইবার পূর্ব্বে সাহেবদের কারবারে খুব লোকসান হইত; কিন্তু আমি যাইবার ২/৪ বৎসর পরেই যথেষ্ট লাভ হইতে লাগিল ... সাহেবরা যেরূপ কমিশন দিতেন ... তাহাতে আমার মাহিনা বাদে যথেষ্ট প্রাপ্তি হইতে লাগিল" (পৃঃ ১২৬-১২৭)। 'চাকুরীর সহিত ব্যবসায়' (পৃঃ ১৩২-১৩৪) 'সম্পত্তি খরিদ' (পৃঃ ২০৭-২০৮) শীর্ষক দুটি উপ-বিভাগে পাচ্ছি রজনীকান্ত চুন কয়লা ইত্যাদি আমদানি ও বিক্রির ব্যবসা, নৌকা ভাড়ায় খাটান, জীবন বিমার দালালি, সুদি কারবার ও অল্প সল্প কনট্রাকটারিতেও অংশ নিতেন। এব ফলাফল সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, "সুতরাং সকল দিক হইতে যথেষ্ট উপার্জ্জন হইতে লাগিল" (পৃঃ ১৩৪)।

অপর দিকে বইটির নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অর্জিত ঐ অর্থ ব্যয়ের তথ্য। স্বগৃহে দোল-দুর্গোৎসবের সূচনা থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রে জলসত্র, দাতব্য চিকিৎসালয়, শান্তিপুরে শিবলিঙ্গ স্থাপন, শ্মশানে শবানুগমনকারীদের জন্য মস্তক আচ্ছাদন ইত্যাদি বেশ কিছু জনহিতকর কাজ তাঁর হাত দিয়ে হয়েছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র নিজের ও নিজের পরিবারের উদরপূর্তিতেই তার কষ্টার্জিত অর্থ চলে যায় নি, কিম্বা অযোগ্য বংশধরদের হাতে মুফতে পাওয়া পয়সা হিসাবে উড়েও যায় নি। তাঁর অবর্তমানে এগুলিকে সুপরিচালনার জন্য অর্থ নির্দিষ্ট করেও যান (পৃঃ ২৩৫)। সব মিলিয়ে একজন সার্থক বাঙালী ভদ্রলোক।

উনিশ শতকের শেষ পাদে যখন জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা 'ব্রিটিশ শাসনের আশীর্বাদ' সমূহকে স্বীকার করে নিয়েও মৃদু মন্দ সমালোচনা শুরু করেছেন। আর বাস্তব সমস্যার সামনে এবং নব্য হিন্দু আন্দোলনের প্রভাবে চরমপন্থী আদর্শ ক্রমাগত দৃঢ়তর সমর্থন সংগ্রহে সক্ষম হচ্ছে — ভারতীয় তথা বাঙালীদের হীনবীর্য শৌর্য শূন্য অসহায়তা অধিক পরিমাণে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দেশের সম্পদের বহির্গমনকে ঘিরে গড়ে উঠছে এক পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের কাঠামো। আমাদের রজনীকান্ত এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁকে আমরা কোথায় বসাব, কাদের সঙ্গে ? কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমরা তাঁর আরো কিছু খবরাখবর নেবার চেষ্টা করি।

২

রজনীকান্ত মৈত্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও সংস্কার সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বইটির নানা জায়গায় খুবই স্বাভাবিক ভাবে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলি সবিস্তারে এসে গেছে। বইটির একটি মাত্র ছবিও শুদ্ধাসনে কোষাকুষি নিয়ে রুদ্রাক্ষ নামাবলী শোভিত আহ্নিকরত পরিণত বয়স্ক (৫৭ বছর) রজনীকান্তের। ফেলে আসা কাল এবং পুরনো যুগের আচার-আচরণের প্রতি শুধুমাত্র মৌখিক সমর্থনই নয়, তাঁর লেখায় নতুন যুগ সম্বন্ধে অপছন্দ এমন কি বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে তীব্রভাবে। যথা "আমরা সকলে অতি কাতর প্রাণে বলিতেছি, - বিলাতি সভ্যতা দূর হল, (সম্ভবত 'দূর হোক' হবে) আমাদের পূর্ব সভ্যতা ফিরে আয়। আর আমরা হ্যাট, কোট, প্যান্ট চাইনা, ধুতি পড়িব, দোবজা গায়ে দিব এবং বলিব 'খাবে কলার পাতে ডাইল মেখে, ভাত পাতে ভাত আইল করি' (পৃঃ ৮৯)। কিম্বা, "হায়রে সে কাল। এখন কি চাষা কি ভদ্র সকলেই সভ্য হইয়াছে, এখন ফেল কড়ি মাখ তেল," (পৃঃ ৮)। কিম্বা "তখন এই রকমই রীতি ছিল। ইহাতে কর ব্যয় সংক্ষেপ হইত। এখন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরেও অন্তত একবাক্স শীত বস্ত্র, এক বাক্স গ্রীষ্মের বস্ত্র, আর কত নাম, - সার্ট, টেনিস, আস্তিন কোট, নেকটাই, মফলার, ডবল ব্রেস্ট কোট, প্যান্ট ইত্যাদি। মেয়েদের সেমিজ, সায়া, ফ্রক, ব্লাউজ ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্বপুরুষেরা 'নেকেড (Naked) থাকিতেন, আমরা এখন কত সভ্য

সাজিয়াছি।" (পৃঃ ৪)

গ্রন্থের নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে ধর্মপ্রাণ রজনীকান্তের ধর্মাচারণের বর্ণনা। অভিভাবকদের প্রভাব মুক্ত হয়ে চাকুরি জীবনের শুরুতে কিছুকাল সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করেন। অনেক পরে লেখা আত্মজীবনীতে ব্রাহ্ম উপাসনার খুব একটা শ্রদ্ধাজনক চিত্র পাইনা; বরং ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন রয়েছে ছত্রে ছত্রে। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, "প্রথমে সকলে চক্ষু বুজিয়া নিরাকার ধ্যান করিতাম। কাহারও চোখ দিয়া জল পড়িত। কেহ কেহ চোখ পিট পিট করিয়া নিজেদের জুতা হারাইবে ভাবিয়া সেই দিকে তাকাইতেন। উপাচার্য্য বেদিতে বসিয়া দুই তিন মিনিট ধ্যান করার পর, সমস্বরে বলিতেন — "অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যে লইয়া যাও, ... তোমার অভয় চরণ দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ হই।" আমিও তাঁহাদিগের সহিত উচ্চৈঃস্বরে এই স্তোত্র পাঠ করিতাম; কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরের অভয় চরণ কি রকম, তাহা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতাম না, কেবল স্কুলের ছেলের মত কথাগুলি মুখস্থ বলিতাম।" (পৃঃ ১৩৮) সুতরাং ধর্ম ও সমাজ সংস্কার কিভাবে মফঃস্বলের একটি সাধারণ ভদ্র পরিবারের ছেলেকে ছুঁয়ে গেলেও ভেদ করতে অক্ষম হয় — তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটি।

বড় ধরণের অদল বদল ঘটাতে না পারলেও প্রভাবের গভীরতা একেবারে অকিঞ্চিৎকর হয়নি। রজনীকান্ত লিখছেন, "নারায়ণগঞ্জে গিয়া ২/৩ বৎসর না ব্রাহ্ম না হিন্দু অবস্থায় ছিলাম। বাহিরে হিন্দু ধর্ম মানিতাম, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস ছিল না।" (পৃঃ ১৫১) পরবর্তীকালে লিখিত আত্মজীবনীতে দেখছি তিনিও 'বিশ্বাসের সঙ্কট' কাটিয়ে উঠেছেন। ১৮৯৪ সালে চিরায়তপন্থা অনুযায়ী 'সদ্‌গুরু'র কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "এই রূপে তিনি আমাকে হিন্দু ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসবান করাইলেন।" (পৃঃ ১৫৩)। এছাড়া তাঁর হিন্দু ধর্ম প্রবণতার সাক্ষ্য বহন করে সাংবাৎসরিক দুর্গা ও রটন্তীকালী পূজা, ব্রহ্মপুত্রে স্নান যোগে যাত্রীদের সেবা কর্ম, নিজগৃহে পিতামহীর স্মৃতিতে শিবপ্রতিষ্ঠা (পৃঃ ১৪১, ১৪৪, ১৫৩, ১৫৫) কর্মজীবনের অন্তে সস্ত্রীক ভারতের নানা হিন্দু তীর্থ পর্যটন ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি, "ধর্মের প্রতি যাঁহাদের আস্থা আছে বা হইবে তাঁহাদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে আসিতেই হইবে এবং তাঁহারা পিতৃপুরুষদের ও মহাত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্তরে স্তরে সাবধানে উঠিয়া উঠিয়া মহামায়ার কৃপা পাইবার উপযুক্তহইবেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন — 'সধর্ম্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম্মো ভয়াবহ' এই ভগবদ্‌বাক্য সত্য, সত্য, সত্য।" (পৃঃ ১৪০) তীর্থ পর্যটন কালে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ স্থল দেখে তাঁর মন্তব্য "দেখিয়া মনে অত্যন্ত আপশোষ এবং দুঃখ হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, যদি এই স্থানে এত হিন্দুর জীবন বিসর্জ্জন না হইত, তাহা হইলে আজ হিন্দুদের এত দুর্দ্দশা হইত না। এই স্থানেই কি জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অভিমন্যু প্রভৃতি মহাযোদ্ধারা প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন? (পৃঃ ১৭০) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের

ভাগ্য বিপর্যয় স্মরণ করে তাঁর উক্তি "... হিন্দুর আশা ভরসা সমূলে নির্ম্মূল। হে ভগবান, যে হিন্দু তোমার পরমভক্ত, তাহাকে অহিন্দু দিয়া পদদলিত করাইলে ! হিন্দুদের প্রতি একটু কৃপা কটাক্ষ কর"।

পদ্যাংশটির অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গকে বুঝে নিতে আমাদের খুব একটা কষ্ট হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কবির ঐ তীব্র বক্রোক্তি কি রজনীকান্তের মতো ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ? কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগে আমরা একটু দেখি ঊর্দ্ধতন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের সঙ্গে রজনীকান্তের সম্পর্কে কি ছিল ? এবং তা নিয়ে রজনীকান্তের মনোভঙ্গি কি ছিল ?

৩

ইংরেজদের বর্ণবৈষম্য বা জাতিবৈরী যা ভারতীয়দের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষের জন্ম দেয় তা নিয়ে আমরা শিশু ও বাল্যকালে অনেক গল্প শুনেছি। এগুলির সত্যতা যাই হোক না কেন এগুলির যথার্থ কি শিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই সম্ভাব্য স্যার আশুতোষ বা বিদ্যাসাগর মশাই কেউই শিষ্টাচার সম্মত কাজ করেন নি। কিন্তু একটি পরাধীন জাতির আত্ম সচেতন অগ্রগামী প্রতিনিধি হিসাবে নিজের দুর্বল স্বদেশবাসীর অবরুদ্ধ বেদনার ক্ষত প্রলেপ দেবার জন্য এই জাতীয় কাজ সত্য না হলেও সত্য বলে মানুষ বিশ্বাস করেছে — আর তার থেকে সংগ্রহ করেছে প্রেরণা। ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান শুধু দিব্য উন্মাদরাই গেয়ে যেতে পারে। আর এ উদ্দীপনায় উপনীত হবার জন্য প্রয়োজন হয় ঐ জাতীয় শত শত প্রতিস্পর্ধা (Challenge) মূলক ঘটনার বা পদক্ষেপের।

কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনা সমূহ ব্যতিক্রমমূলক (exceptional)। আপামর জনসাধারণ ১৯৪৭ সালেও পূর্ণ ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে ওঠেনি। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আদান-প্রদানে রজনীকান্তের মত ব্যক্তির মনোভঙ্গির একাধিক মাত্রা আছে। অন্যত্র দেখানোর চেষ্টা করা গেছে যে ইংরেজরা ভারতে পদার্পণের মুহূর্ত থেকেই এদেশীয়দের সঙ্গে তাদের আদান-প্রদান শুরু হয়ে যায়। এখানকার জনগোষ্ঠীর যে অংশ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সচেতনতা ইত্যাদি ব্যাপারে যতটা প্রাগ্রসর বা পশ্চাৎপদ ইংরাজ অগ্রগতি (তৎপরে আগ্রাসনের)র ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া হয় সেই রকমই। রজনীকান্তের মধ্যেও তাই দেখতে সক্ষম হই। শ্রদ্ধা, বিস্ময়, প্রশংসা, সমালোচনা, অপছন্দ, বিদ্বেষ — এ সবই। আবার এরও তারতম্য অর্থাৎ মাত্রা আছে যথা :-

"ডেভিডসন সাহেব... অতি উদার প্রকৃতির লোক ... দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। হিসাব পত্র খুব ভাল জানিতেন ... অধীন কর্মচারীদের নিকট হইতে (যখন) বিদায় লন এবং আমার সহিত যখন করমর্দন করেন, তখন কাঁদিয়া ফেলেন তাহা আমি এ পর্য্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।" (পৃঃ ৫৪) আরেক জায়গায় পাচ্ছি, "ইংরাজ চরিত্রে অনেক সদ্‌গুণ আছে যাহা আমাদের অনুকরণ করা উচিত। আমরা তাহা না করিয়া, তাহাদের দোষগুলি ও নিন্দনীয় আচারগুলি সর্বাগ্রে অনুকরণ করি। আমরা তাহাদের ন্যায় সেরী,

শ্যামপিয়ন খাই, রোস্ট, টোস্ট কারী, কাটলেট খাই এবং হ্যাট কোট প্যান্টুলেন পরি, তাহাদের ন্যায় মুখভঙ্গি করিয়া কথা কহি, ইত্যাদি। কিন্তু তাহাদের অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা, স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি-প্রীতি ইত্যাদি সদগুণগুলি আমরা অনুকরণ করিনা। এই বার্কমায়ার সাহেব যাঁহাকে ক্রোড়পতি বলিলেও গালি দেওয়া হয়, তিনি এত কষ্ট করিয়া শহরের বিলাসিতা ত্যাগ জলে জঙ্গলে কাজ শিখিবার জন্য বাস করিতে আসিয়াছিলেন ... এক্ষণে দেখা যায় বাঙালী সামান্য ধনীর সন্তান হইলে তাহার দাপটে অস্থির হইতে হয়, আগে পিছে দারোয়ান ছোটে এবং চাকর খানসামা চলে। নিজের পরণের কাপড়খানাও পরিতে কষ্টবোধ হয়। কিন্তু এই বার্কমায়ার সাহেব নিরহঙ্কার এবং সকলের সহিত হাসিয়া খেলিয়া কথা বলিতেন" (পৃঃ ৫৭-৫৮)। লক্ষ্য করুন রজনীকান্ত ইংরাজ চরিত্রের সদ্‌গুণ ও বদগুণ উভয় সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন; সচেতন ছিলেন তাদের 'স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি প্রীতি' ইত্যাদি ব্যাপারগুলি সম্পর্কে, যেগুলি সম্ভবত আলোচনাধীন গ্রন্থটি রচনা কালে (অর্থাৎ ১৯৩২-৩৬ সালে) দেশের প্রাগ্রসর মানুষদের প্রভাবিত করতে ছাড়ে নি। স্মরণে রাখবেন বাংলায় 'কেনারাম, রাজারাম ও বেচারাম' বলে একটি, প্রবাদ আছে। সেই বিবেচনায় 'বাঙালী সামান্য ধনীর সন্তান' ও বার্কমায়ার (অনুজ) সাহেবের তুলনা বেশ প্রাসঙ্গিক।

প্রথম চাকরিতে প্রবেশ করে তাঁর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা হল, "অত্যন্ত ভয়ে ... কাজ করিতে লাগিলাম। সাহেব দেখিয়াই প্রাণ উড়িয়া যাইত।" (পৃঃ ২৮-২৯)। আরেক স্থানে বলেছেন, "প্রথম চাকুরী লইয়া সাহেবদের সহিত ইংরাজীতে কথা কহিতে হইলে ক্রিয়া খুঁজিয়া পাইতাম না, তোতলা সাজিতাম।" (পৃঃ ৮৯)। ওপরওয়ালা শ্বেতাঙ্গ দম্পতির রজনীকান্তের গৃহ আগমনের প্রতিক্রিয়া দেখা যাক। "... বাড়ীটি ভাল করিয়া চুন করাইলাম, টেবিল চেয়ারগুলি বার্ণিশ করাইলাম। ঢাকা হইতে এক টুকরী গোলাপ ফুল আনাইলাম এবং বাড়ীটি যতটুকু পারি সাজাইলাম। মেম সাহেব আসিলেন; আমার স্ত্রী ... পুত্রবধূ এবং ... কন্যাদের সহিত খুব আলাপ আপ্যায়ন করিলেন এবং গৃহজাত লুচি, কচুরী, সিঙ্গারা এবং চা পান করিয়া বলিলেন, ... এ অতি উত্তম।" (পৃঃ ১০৬)। সম্ভবত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওয়ারলোন সংগ্রহার্থে অনুষ্ঠিত সভায় এস.ডি.ও কর্তৃক বক্তৃতা করতে আহুত হন। কিন্তু সেই সময়ে দেশে (শান্তিপুরে) ছিলেন, অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত থাকার অক্ষমতা জানিয়েও, "পরে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে না গেলে সাহেবের নয়ন কোপে পরিব।" (পৃঃ ১০০)। তাই অতিরিক্ত খরচ ও পরিশ্রম করেও সভায় উপস্থিত হন। ওপরওয়ালা শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়ে এমন কিছু জরুরি অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্বযুক্ত ক্ষমতা লাভ করেন যা তাঁর চেয়েও উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গের ভাগ্যেও জোটেনি। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি, "ইহাতে অনেক সাহেব আমাকে হিংসা করিতেন। বাঙালীর ওপর এতটা বিশ্বাস এবং এত দূর ক্ষমতা লাভ খুব কম বাঙালীর ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।" (পৃঃ

১২০)। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে মিশে আছে আত্মপ্রত্যয়, আত্মশ্লাঘা, স্ব-জাতির সঙ্গে আপন পার্থক্যবোধ ইত্যাদি অনেক কিছুই। আর পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি সমূহ কি সন্দেহাতীতভাবে রজনীকান্তের দাস সুলভ কাপুরুষতা, মেরুদন্ডহীনতা ও পদলেহী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ?

অথচ এই আত্মজীবনীতেই শ্বেতাঙ্গ উচ্চপদাধিকারীদের সম্বন্ধে আরো কিছু বর্ণনা ও মন্তব্য মিলছে যা অল্প হলেও আলাদা ধরণের ভাবনা-চিন্তার ইঙ্গিত দিচ্ছে। যেমন নারায়ণগঞ্জে ওপরওয়ালা হিসাবে যে সব ইংরেজদের সংস্পর্শে এসেছেন তাদের মধ্যে মিঃ ইয়ং বলে একজনকে নিয়ে কৌতুহলোদ্দীপক কিছু কিছু মন্তব্য রয়েছে, যার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে তখনকার ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় দ্বন্দ্বের (আরো স্পষ্ট করে বলা চলে যোগ্যতা সম্পন্ন এদেশীয় সংবেদনশীল স্পর্শকাতর মনোভাবের সঙ্গে অযোগ্য অথচ সুযোগ সুবিধা ভোগে তৎপর শ্বেতাঙ্গের দ্বন্দ্ব)। পূর্বোক্ত মিঃ ইয়ং সম্বন্ধে রজনীকান্তের মন্তব্য, "আকৃতিতে বেশ লম্বা অথচ বেশ মোটা, চক্ষু দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং প্রথম দৃষ্টিতেই 'গোবর্দ্ধন দাদা' বলিয়া মনে হইত। তিনি এই সরকারের এক নাবালক পোষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্বে ইনি ব্রিটিশ গিনিতে চিনির কলের মিস্ত্রি ছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে বড় সাহেবের কৃপা দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। তিনি প্রায় ২০ বৎসর পাটের কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাটের কিছুই শিখেন নাই। হাতের লেখা হিজিবিজি। আমাদের দেশের মহাজনের ঘরে মুহুরিরা পুঁটুলি ছন্দে যে রকম খাতা লেখে, তাঁহার ইংরাজী লেখা তাদৃশ প্রকৃতির। দেহটি যে রকম মোটা ছিল, বুদ্ধিও তদ্রুপ। আমি প্রায় কলিকাতার চিঠি পেনসিলে লিখিয়া দিতাম, তিনি কালি দিয়া লিখিয়া তাঁহার ম্যানেজারী বজায় রাখিতেন। প্রতিদিন কলিকাতায় টেলিগ্রাম যাইত, তাহার সমস্তই আমায় পেনসিল দিয়া লিখিয়া দিতে হইত।" (পৃঃ ১১২-১১৩)। এখানে শ্বেতাঙ্গ ওপরওয়ালা হলেও মিঃ ইয়ং সম্বন্ধে মৈত্রের তাচ্ছিল্য এতটাই স্পষ্ট যে তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

এছাড়াও আরো দু-তিনটি ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত অপদার্থ ব্যক্তিটিকে এক হাত নেবার সুযোগ রজনীকান্ত পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া অন্তরে হাসিতে লাগিলাম এবং ভাবিলাম, তুমি কালা বাঙালী বলিয়া বড়ই ঘৃণা কর, এখন তাহার প্রতিশোধ লইতে পারি' (পৃঃ ১১৫)। প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য, সাহেব বনাম ভারতীয় উচ্চপদস্থ বনাম নিম্ন পদস্থের দ্বন্দ্বের সর্বশেষ উদাহরণটি হচ্ছে কলকাতা হেড অফিসের উচ্চতম, মিঃ উইলসনের পাট ব্যবসায়ে অজ্ঞ অথচ তাতে অভিজ্ঞতা লিপ্সু আত্মীয়কে কাজে হাতে খড়ি দেবার বিনিময়ে ফি নেবার প্রস্তাবে লেখকের তির্যক মন্তব্য, "সাহেব আমি না চাহিতেই তাঁহারা আমায় ফি দিয়া থাকেন। প্রথম বৎসরে 'দয়া করিয়া' 'অনুগ্রহ করিয়া' ইত্যাদি সমস্ত কথা কহেন, দ্বিতীয় বৎসরে সে ভাব থাকেনা। তৃতীয় বৎসরে আমায় silli fool আহাম্মুক ইত্যাদি বলিবেন।" (পৃঃ ১২৩) অর্থাৎ পাটের ব্যবসায়ে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা

অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের অহংবোধ যেভাবে পীড়নমূলক হয়ে উঠতে থাকে সে সম্বন্ধে মৈত্র পূর্ণ সচেতন ছিলেন আর ঐ আত্মনিপীড়ন সহ্য করে তাঁর পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব তাই লিখেছেন, "এই রূপ কত সময় কত কান্ড হইয়াছে তাহা এখন সম্পূর্ণ মনে নাই, লিখিতেও পুঁথি বাড়িয়া যায়। তবে ২/১টা যাহা মনে আছে, তাহাই লিখিতেছি।" (পৃঃ ১১৬)

১৮৭৬ সালে কর্মজীবন শুরু করার পর অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল রজনীকান্তকে। তাঁর মধ্যে নব্য হিন্দুত্বের অনেক লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও তিনি যে নিজের সীমানা বুঝে মেকি ভারতপ্রেমী সেজে বসেন নি সেটা তাঁর বিশেষ চারিত্রিক প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ। তিনি কেন অন্য কিছু করেন নি সেটি কল্পনার/আন্দাজের বিষয় হতে পারে। কিন্তু তর্জনী তুলে তেড়ে আসা নীতিবাগীস বা সমালোচকের তুলাদন্ডে সারা জীবনের পণ্যকে ধিক্কারে, নিন্দায়, পরুষ কোলাহলে পঙ্কের তলে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করা যায় না।

৪

অতঃপর ভদ্রলোক রজনীকান্তের কি মূল্যায়ন আমরা করতে পারি দেখা যাক। প্রথমত তিনি যে নিজের ভদ্রলোকত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন তা বারবারই "মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, সম্ভ্রান্ত, ভদ্র সভ্য বিশিষ্ট ভদ্রলোক, ভদ্রলোকদের মধ্যে যাহারা গরীব বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ" (পৃঃ ৪, ৫, ৮, ৪৫, ১৪৭, ১৫৭, ২০৮, ২১২, ২১৫, ২১৭, ২২৩, ২৩৬) ইত্যাদি অভিধার ব্যবহারেই প্রতীয়মান। অপরদিকে অন্যদের সঙ্গে নিজের পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য "দক্ষিণদেশী লোক, ব্রাহ্মণ, বাঙালী, পশ্চিম দেশী লোক নাছোড়বান্দা, গোঁড়া হিন্দু" কিম্বা বিপ্রতিপ গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার জন্য "চাষা সাধারণ লোক, পাকা মাড়োয়ারী, উড়িষ্যাবাসী, পৈতাধারী মজুর, মফঃস্বলের সাহেব, কালা বাঙালী" (পৃঃ ৩০, ৩৯, ৪৫, ৮৪, ৮৫, ১০১, ১১৪, ১১৫) ইত্যাদি বিশেষণ; কিম্বা স্পষ্টভাবেই "হাওড়া হইতে সেতুবন্ধ বামেশ্বর পর্যন্ত কোনো সুশ্রী পুরুষ বা স্ত্রী লোক দেখিলাম না" (পৃঃ ১৯৫) - জাতীয় পুরোবাক্যই পেতে পারি।

দ্বিতীয়ত সনাতন আদর্শবোধ আক্রান্ত একটি পরিবারের সন্তান হিসেবে নতুন যুগে রজনীকান্তের জীবনচর্যার মধ্যে আমরা পরিবর্তনের চেয়ে ধারাবাহিকতার দিকেই টান লক্ষ্য করি। এটা কিছু বিস্ময়কর নয়। কারণ আর্থ-সামাজিক ভিত্তিমূলে বড় ধরণের অদল বদল না ঘটার দরুণ বহিরঙ্গে আপাত রূপান্তরের অন্তরালে চিরায়ত জীবনবোধ তার আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাদি নিয়ে ভালো ভাবেই বিদ্যমান ছিল। রজনীকান্ত মৈত্রের জীবনী বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বাঙালী ভদ্রলোকদের জীবনের একটি সাধারণ সত্য পুনরুদ্ঘাটিত হচ্ছে।

তৃতীয়ত ধর্মজীবন বিশ্লেষণে এই ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয়ে পরছে। তাঁর মতো অনেক বাঙালী যুবকই ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু-ব্রাহ্ম-হিন্দু এই চক্রে আবর্তিত

হয়েছেন। পারিপার্শ্বিকতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করাও নয়; আবার পরিবর্তনে পুরো গা ভাসানোও নয় - এটাই যেন সামাজিক ক্ষেত্রে তখন মুখ্য হয়ে উঠেছিল। ঐ সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের আবেদন কত তীব্র প্রভাব সৃষ্টি করেছিল এখাতে তাও প্রতিভাত হচ্ছে। সাধারণভাবে ধারণা দেওয়া হয়ে থাকে যে পদলেহন ও প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা লাভের দৌলতে বাঙালীরা চাকরি জুটিয়ে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে পোক্ত শিকড় গাড়তে সহায়তা করে। বক্তব্য আংশিক সত্য; কিন্তু আমাদের আলোচনাধীন রজনীকান্ত মৈত্রের ক্ষেত্রে আংশিক অসত্যও বটে। শিশুকাল থেকে ভাগ্যতাড়িত রজনীকান্তকে আপন কর্ম ক্ষেত্রে আপন যোগ্যতা ও দক্ষতার মূল্যে লক্ষ্মীকে জয় করতে হয়েছিল অপরিসীম দুঃখে। পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করেন বটে তবে তার সার্থক ব্যয় করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়েছিল। ঐ পরিস্থিতিতে ব্যয়-কুন্ঠা স্বাভাবিক হলেও — রজনীকান্তের তা হয়নি। বরং ধর্ম-কর্মকে উপলক্ষ্য করে অর্থকে প্রদর্শন করার মানসিকতা থেকে থাকতে পারে। আপন ধর্ম বিশ্বাস ও আচরণের শ্রেষ্ঠত্ব বা সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ প্রমাণের মানসিকতা রজনীকান্তের বরাবরই ছিল। অবস্থা বিপাকে প্রভু সেজে বসা বিধর্মী ফিরিঙ্গিদের দেখিয়ে দেবার চেষ্টাও যে ছিল না — তাও নয়।

চতুর্থত রজনীকান্তের এক লোক কর্মজীবন ছিল, যে সম্বন্ধে প্রায় কোনো কথাই বলা হয় নি। নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির ঘুঘুর বাসা ভেঙে সেখানে দীর্ঘতর কালের জাড্যের অবসান ঘটান। এক্ষেত্রেও তাকে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে একের পর এক বাধা অতিক্রম করতে করতে অগ্রসর হতে হয়েছে। স্থানীয় পাটের কারবারীদের পক্ষ থেকে তাঁকে ঐ কাজে প্রণোদিত করা হয় — তিনি তাদের স্বার্থ পালন করেন যথার্থভাবেই। অনুরূপ ভাবে মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত বিদ্যালয়টিকে আমলাতান্ত্রিক পরতন্ত্রাধীনতা থেকে সরিয়ে এনে তার সুস্থ শিক্ষাগত বাতাবরণ প্রতিষ্ঠা আর সঙ্গে সঙ্গে শহরের এক কোন থেকে তাকে সরিয়ে এনে জনপথের কেন্দ্রে নতুন শিক্ষাঙ্গনে স্থাপন করা কর্মী রজনীকান্তেরই কৃতিত্ব। একই অর্থে শহরের জল সরবরাহের প্রাথমিক কাঠামো প্রস্তুত করা ও ক্ষুদ্র দলাদলির ওপরে উঠে তাকে কার্যকরী করার উদ্যোগ নেওয়াটাও রজনীকান্তের কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঐ শ্বেতাঙ্গ বনাম ভারতীয়দের দ্বন্দ্বের অনেকগুলি মাত্রা আছে। এতে যেমন মিশে আছে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের লক্ষণপ্রায় (syndrome), তেমনি আছে পেশাগত ঈর্ষা, নৈকট্য ও অতিপরিচয়ের দরুণ মিঃ ইয়ং-এর দুর্বলতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে পারা ও তার সুযোগে তাকে বেকায়দায় ফেলে আনন্দ লাভের ক্রুরতা। সব মিলিয়ে মিশিয়ে ঔপনিবেশিক যুগে ধারাবাহিক সংস্কৃতির এক বাহক রজনীকান্ত মৈত্রের আচরণের মধ্যেকার বহুমুখীনতা ও জটিলতার দিকেই এখানে জোর দেওয়া হচ্ছে, তার বর্ণহীন একমুখী গতানুগতিক সরলীকৃত ব্যাখ্যাকে বাদ দিয়ে।

সূত্র নির্দেশ :—

নিবন্ধটিকে উদ্ধৃতাংশের প্রায় সবগুলির পৃষ্ঠা সংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। মাত্র তিনটি তথ্য নির্দেশ নিম্নে করা হল :

১। সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, (সম্পাঃ) সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান (কলকাতা সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৮) পৃঃ ৪৯৬।

২। যদুবালা (পৃঃ ২২২)।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান্ধীদর্শন ও নারী ভাবনা

জাহানারা বেগম

ভারত ইতিহাসে, মানবিকতার ইতিহাসে গান্ধীজী এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা ও ভারতের মুক্তি আন্দোলন ছাড়াও মানুষকে সত্য জীবনে উত্তরণের জন্য তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব ও ধ্যানধারণা তাঁর জীবন সংগ্রামও কর্মযোগে প্রতিফলিত। সত্যানুসন্ধান বৈজ্ঞানিকের প্রধান ধর্ম। তাই সত্যানুসন্ধানী গান্ধীকে বিজ্ঞানী না বলে পারা যায় না। সত্যের জন্য যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর কথায় — "আমি জীবনভর জুয়াড়ীর মত বাজী ধরে চলেছি। সত্যকে পাবার তীব্র প্রেরণায় আমি এমন কিছু দেখি না যা আমি পণ করতে পারি না। এই সত্য সন্ধানের পথে সর্বস্ব পণ করাতে যদি আমি কোন ভুল করে থাকি তবে সে ভুল সকলদেশের সর্বকালের সকল বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরাও করে থাকেন।"[১] একথাটি সত্য। নিজের জীবনকেই তিনি সত্যের জন্য গবেষণাগারে পরিণত করেন। তাঁকে গৌতম বুদ্ধ ও যীশুখ্রিস্টের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ঋষি বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন — "আজ থেকে হাজার বছর পরে মানুষ অবাক হয়ে ভাববে যে এমন ধরণের একটি মানুষ একদা এই পৃথিবীর ধূলিতে বিচরণ করেছিলেন।"

নারীজাতির উন্নয়ন সম্পর্কে, নারীর কর্তব্য সম্পর্কে গান্ধীর সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট মত ও পথ আছে, যা সমগ্র সমাজেরই অঙ্গ। সত্যানুসন্ধানী গান্ধীর সত্য দর্শন এসেছিল শৈশবেই তাঁর মায়ের কাছ থেকে। শৈশবে তিনি মা পুত্‌লিবাঈকে দেখেছিলেন বৈষ্ণবীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে 'চতুর্মাস', 'চন্দ্রায়ণ' ইত্যাদি ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে চর্চা করতে, মাকে তিনি saintliness বলতেন। জীবন চর্চা ও জীবন চর্যায় আত্মিক ও মানসিক শক্তি তিনি মার কাছ থেকে পান। তিনি বলেন -"The outstanding impression of my mother has left on my memory is that of saintliness."[২] মা'র পরেই সেবিকা রম্ভার প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে Vincent Sheean কে গান্ধীজী বলেন - ""I one of them (disciplinary resolutions) first of all to my saintly mother and to my good nurse (Rambha). These were good women. they taught me to tell the truth and not to fear."[৩]

গান্ধীদর্শনের মূলসূত্র বা উপাদান 'সত্যাগ্রহ' সত্য অহিংসা ত্যাগ দুঃখ নির্মোহ ব্রহ্মচর্য ইত্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত। আশ্রম জীবনের সঙ্গে তিনি এগুলিকে যুক্তকরেন — যেখানে নারী পুরুষে কোন ভেদ নেই। সমাজের পূর্ণ অবয়ব গঠনে নারী-পুরুষের কর্তব্য সমান

এবং তাদের মর্যাদাও সমান বলে তিনি মনে করেন।[৪] হরিজনে তিনি আরও বলেন যে যেহেতু মূলত নারী ও পুরুষ এক সেহেতু মূলে তাদের সমস্যা এক। উভয়ের আত্মা এক। উভয়ে একই জীবনযাপন করে, একই তাদের অনুভূতি। একে অপরের পরিপূরক। একে অপরের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারে না।[৫] তাঁর অনেক লেখা, বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকার ইত্যাদির সংকলন Women and Social Insjustice এ মহিলাদের সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা রয়েছে। তাঁর অন্যান্য বিষয়ের মতও এখানেও উপস্থাপন পদ্ধতির দুটি ধারা — (১) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দুই বাস্তবজীবনমুখী। তাঁর সত্যানুরাগ ও সত্যানুসন্ধানের পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে প্রয়োজন সমাজের পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ও মানবিকতার পরিস্ফুরণ। আর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সুস্থ, সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ। ঐশ্বর্য্যের ঝলকানি নয়, আর্থিক সমবণ্টন, ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার হাতছানি নয়, লোভ সংবরণ জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর তুষ্টি, সমবায় গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ও স্বয়ংভরতা; এক কথায় গ্রামস্বরাজই লক্ষ্য।

গান্ধীজী একসময় বলেন- 'The whole civilization lies on the laps of women.' ভারতের নারীদের প্রতি তাঁর বক্তব্য-'The future is on your knees for you will mature the future.'[৬] কোন সভ্যতার মান বুঝতে গেলে সেই দেশের নারীদের কতখানি মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত তা দিয়ে পরিমাপ করা যায়। এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্ক্সের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।[৭] নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী গান্ধীজী বলেন- "পুরুষের স্বাতন্ত্রের যতখানি অধিকার তারও ঠিক ততখানি রয়েছে। তার নিজ কর্মের পরিবেশের মধ্যেও নারী সর্বোচ্চ স্থান পাওয়ার অধিকারিণী, যেমন পুরুষ তার নিজ কর্মক্ষেত্রে পেয়ে থাকে।"[৮] সব মহিলাই তাঁর কাছে সমান। মুসলিম মহিলাদের প্রসঙ্গও অনুচ্চারিত নয়।[৯] হিন্দু-মুসলিম ও সকল শ্রেণীর মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন- "They must be enfranchised..."[১০]।

পুরুষের প্রতি গান্ধীজীর আবেদন হল তাঁরা যেন প্রত্যেক নারীকে হয় মাতা, নয় ভগিনী, নয় কন্যারূপে দেখেন। অনুরূপভাবে নারী প্রত্যেক পুরুষকে হয় পিতা নয়তো ভ্রাতা নয়তো পুত্ররূপে দেখবেন।[১১] দয়িত দয়িতের সম্পর্ক একের মধ্যে হতে পারে। নিজের সম্পর্কে গান্ধী বলেন - "I should find it impossible to live, much less carry on my work if I did not regard the whole womankind as sisters, daughters or mothers. If I looked at them with lastful eyes, it would be the surest way to perdition."[১২] দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সত্যাগ্রহ ও সেবাকর্ম শুরু থেকেই তিনি দরিদ্রদের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে মহিলাদের সেবা করা ছাড়া তা সম্ভব নয়।

নারীদের বিবিধ সমস্যা ও সেগুলির সমাধান প্রসঙ্গে গান্ধীজী কয়েকটি দিক তুলে

ধরেছেন। সেগুলি হল — শিক্ষা, বর্ণপ্রথা, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, পণপ্রথা, পর্দা, পতিতাবৃত্তি, দেবদাসীপ্রথা ও অর্থনৈতিক বা রুজির সমস্যা। বর্তমানেও এগুলি কমবেশি নানা আকারে প্রাসঙ্গিক। গান্ধীজী বলতেন — "শিক্ষাবিহীন মানব ও পশুর মধ্যে প্রভেদ খুব বেশি নয়।"[১৩] তাই শুধু পুরুষের নয়, নারী-পুরুষ সকলেরই শিক্ষার প্রয়োজন। বালক বালিকার প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর মতে একরকম হওয়া দরকার। নঈ তালিমে তার রূপরেখা আছে। তারপর পরিবারের সমাজের দেশের ও পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজনে তাদের শিক্ষার ধারা পাল্টাবে। শিক্ষিত নারীদের তিনি নামের উপযুক্ত হতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের কর্তব্য গ্রামে যাওয়া ও পল্লীজীবনের পুনর্গঠন ও সংস্কারের জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালানো, পুরুষের সঙ্গে সহযোদ্ধা হিসাবে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে যোগদান করা। নারীজাতির উন্নয়নকে গান্ধী গঠনমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন নারীদের অন্ধকার থেকে এমনভাবে টেনে বার করেছে যে আর কিছুতেই এত অল্প সময়ে তা সম্ভবপর হত না। মাদকদ্রব্য ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের পিকেটিং-এ নারীদের অনন্য ভূমিকা প্রশংসনীয়। তাঁর ভাষায় —- 'নারী ব্যতীত অন্তর স্পর্শ করে এমন সনির্বন্ধ অনুনয় আর কেউ সফলভাবে করতে পারে কি ?"[১৫] অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও অবদান অসামান্য। তবুও জাতীয় কংগ্রেস নারীজাতিকে সমমর্যাদায় তুলে ধরতে পারেনি বলে গান্ধীজীর বিশ্বাস। সেইজন্য কংগ্রেসকে এ ব্যাপারে আরও সচেষ্ট হতে তিনি আহ্বান জানিয়ে-ছিলেন।[১৬] গ্রামের নারী সম্পর্কে তাঁর ধারণা তারা কর্মদক্ষতা ও শ্রম ও বুদ্ধিতে পুরুষের সমকক্ষ কখনও বা তারা পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করে। গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত বিপ্লবী মহিলাদের প্রতি তাঁর সপ্রশংস দৃষ্টি ছিল। বিপ্লবী নেত্রী লীলা রায়ের সঙ্গে আলোচনায় লেখিকা এ সম্পর্কে জানতে পারেন। ইটালিতে ভারতীয় মহিলাদের সম্পর্কে বলার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে গান্ধীজী বলেন যে সহিংস যুদ্ধে নারী পুরুষকে সাহস যোগায়, আর অহিংস যুদ্ধে তারা হয় সহযোদ্ধা; নারীদের দান বরং বেশি।[১৭] স্বরাজ গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে নারীদের মধ্য দিয়েই স্বরাজ আসবে।

গান্ধীজী বর্ণভেদ প্রথার চরমবিরোধী ছিলেন। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি তাঁর কাছে ছিল অসহনীয়। অসবর্ণ বিবাহের তিনি ছিলেন পক্ষপাতী। ভিন্নধর্মের তরুণ তরুণীর মধ্যে বিবাহে তিনি কারুরই ধর্ম পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। ফিরোজ গান্ধী ও ইন্দিরা নেহেরুর বিবাহের ব্যাপারে তাঁর ঘোষণা উল্লেখযোগ্য।[১৮] তাঁর আশা — "অদূর ভবিষ্যতে সমাজের পুনর্গঠনের পর তেমন ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না। কারণ তখন সামাজিক প্রথাদির মর্যাদার মান পুরিবর্তিত হবে।"[১৯] তাঁর মতে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকে বিবাহ নির্বাচনে প্রথম স্থান দেওয়া উচিত। তারপর আসবে সেবা এবং তৃতীয় স্থানে আসবে পারিবারিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ ও সমাজের শ্রেণীগত স্বার্থ এবং পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বা ভালবাসা চতুর্থ

ও সর্বশেষ স্থান অধিকার করবে।[২৩]

হরিজনদের উন্নতি কল্পে তিনি দিনের পর দিন ভাঙ্গী নরনারীদের বস্তিতে ঘুরে বেড়ান তাদের কাজে সামিল হন। নারীদের স্নেহময়ী স্পর্শে ব্রাত্য সমাজে সমশ্রেণীতে উন্নীত হবে এটাই তাঁর ইচ্ছা। নিচুশ্রেণীর এক অতিথির খাওয়া পাত্র স্পর্শ করতে অস্বীকার করলে কস্তুরবার সঙ্গেও তাঁর মনোমালিন্য হয়।

তাঁর 'আত্মজীবনীতে' গান্ধীজী বিদ্যাসাগরের মত সমাজ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বাল্যবিবাহের প্রচণ্ড নিন্দা করেন ও বিরোধিতা করেন। 'ভগিনী পুস্তকমালায়' তিনি বলেন যে ১২ বৎসরের পূর্বে হাজার হাজার মেয়েদের বাল্যবিবাহ তাদের জীবনের সমাপ্তি নিয়ে আসে। সারদা আইনে ছেলে ও মেয়ের বিবাহযোগ্য বয়স যথাক্রমে ১৮ ও ১৪ করা হলেও গান্ধীজী বলেন যে তা যথাক্রমে ২১ ও ১৮ হওয়া উচিত। নিজের জীবন দিয়ে বাল্যবিবাহের কুফল তিনি বুঝতে পারেন। যা 'আত্মজীবনী'-তে ব্যাখ্যা করেছেন। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বিধবা বিবাহের প্রতি হিন্দু-সমাজের প্রতিরোধ এবং কটাক্ষ গান্ধীজীকে পীড়া দেয়। অল্পবয়সী বিধবাদের সারাজীবনের দুঃসহ বেদনা অসহ্য। যাঁরা বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেন তাদের তিনি এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি দিতে বলেন।[২১] ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় গান্ধীজী ঘৃণ্য পণপ্রথা সম্পর্কে প্রায়ই লিখতেন। বর্ণপ্রথা প্রচলিত থাকার ফলে এই পণপ্রথা সমাজে বহাল তবিয়তে বর্তমান। সেইজন্য পিতামাতার উচিত স্ববর্ণের পরিবর্তে অন্যবর্ণে নিজেদের সন্তান-সন্ততির বিবাহের ব্যবস্থা করা। আর তাদের যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া যার ফলে এই কুপ্রথা থেকে তারা দূরে থাকবে।[২৪] তাছাড়া তিনি অভিভাবকদের বিবাহে কম খরচের পরামর্শ দেন।[২৫]

গান্ধীজী মহিলাদের পর্দা বা অবরুদ্ধতা প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন।[২৬] নারীর মনুষ্যত্বের বিকাশে তা অন্তরায়। নারীমুক্তির জন্য ঐ প্রথা দূর করা দরকার। সমাজের পতিতা নারী এবং কোন কোন মন্দিরে দেবদাসী প্রথার ব্যাপারটি গান্ধীজীর কাছে অসহনীয় ছিল। প্রথমে অন্ধ্রপ্রদেশের কোকনাদে ছয়জন পতিত মহিলার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। তারপর পূর্ববাংলার বরিশালে আরও অনেকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখা করেন। ঐ মহিলারা কংগ্রেসের সদস্যা হন এবং তিলক স্বরাজ্য তহবিলে চাঁদা দেন। দেখা যায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতে প্রায় ৫২,৫০,০০০ জন পতিত মহিলা ছিলেন।[২৭] তাদের মুক্তির জন্য গান্ধীজী দুটি পথের নির্দেশ দেন - (১) পুরুষদের কামনা সংবরণ এবং সংযম শিক্ষা করা ও (২) পতিত মহিলাদের জীবনধারণের সংস্থান করা। এজন্য তাদের চরকাকাটা, তাঁতবোনা ইত্যাদি শেখা একান্ত প্রয়োজন। আইন দিয়ে পতিতাবৃত্তির পাপ দূর করা যাবে না। এরজন্য দরকার জনমত গড়াও মানুষকে কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া। আর সৎ মানুষের কর্তব্য হল ঐ সমস্ত অসামাজিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রগুলিতে কাজ করে মানুষকে সৎপথে নিয়ে আসা।[২৮] নারী-পুরুষ সমমর্যাদায় সমসঙ্গী (equal partner)

এটাই গান্ধীজীর কাম্য।[২৯] দেবদাসী সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল যে ধর্মের নামে বিভিন্ন মন্দিরে ঐ প্রথা বেদনাদায়ক ও পাপ, যাঁরা একে সমর্থন করেন তারাও পাপী।[৩০] এর সমূলে বিনাশের জন্য তিনি এস. মুথালক্ষ্মী রেড্ডিকে উৎসাহিত করেন এবং মুথালক্ষ্মী আইন দ্বারা তা রদের জন্য কাজ করতে থাকেন।

নারীদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। স্বরাজের প্রাথমিক শর্ত স্বয়ম্ভর পরিবার গ্রাম ও সমাজ। শহর ও গ্রামের মধ্যে তফাৎ দূর করা দরকার। শহরের শিক্ষিত মহিলারা গ্রাম গঠনের দায়িত্ব নেবেন। যেমন সরোজিনী নাইডু, সুশীলা নায়ার, সুচেতা কৃপালনী প্রমুখ অনেককে গান্ধীজী ডাক দিয়েছিলেন গ্রামে গিয়ে সাধারণ মহিলাদের চরকাকাটা তাঁত বোনা সন্তান পালন তাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষণ প্রাপ্ত করে তুলতে। গ্রামের অনেক মহিলা শস্য বপণ কর্তন ইত্যাদি করতে পারে, কুমোরের কাদা মাখায় তারা দক্ষ, শিক্ষা পেলে নানা কুটির শিল্পের প্রক্রিয়া তারা রপ্ত করতে পারে। এইভাবে বিধবা ও অসহায় মহিলা এবং পতিতারা জীবন ধাবণের অর্থ রোজগার করতে পারে। গ্রামের সার্বিক উন্নতির জন্যই গান্ধীজীর গ্রাম স্বরাজের পরিকল্পনা।

গান্ধীজীর চিন্তায় নারী সমস্যার মূল দিকগুলির আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে সেগুলি তাঁকে কতটা নাড়া দিয়েছিল। তিনি পুরুষ বিরোধী বা পুরুষ বিদ্বেষী ছিলেন না। তবুও বাস্তব প্রেক্ষায় ভাবগত ও তাত্ত্বিক দিক থেকে পৃথকভাবে নারী প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক।[৩১] তাই এই প্রসঙ্গ। "আশ্রম ভগিনীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে দৃঢভাবে বলতে গেলে পুরুষ নারীর মধ্যে কেউই বড় বা ছোট নয়। দু'জনের স্থান এবং কর্ম ভিন্নতর এবং ভগবান উভয়েরই উপর সীমাবদ্ধতা দিয়েছেন (পৃ: ৯৯)[৩২] নারীপুরুষের সৃষ্টি ভোগের জন্য নয়, বৃহত্তর মানবিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। বাস্তব জীবনে তাদের স্বাবলম্বী হওয়া একান্ত দরকার। যেমন বাড়িতে যদি কোন মহিলা না থাকেন পুরুষের উচিত ঘরদোর গোছানো ও পরিষ্কার রাখা। তেমনি মহিলাদেরও একজন রক্ষকর্তা হিসাবে সবসময় কোন পুরুষের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নয়।[৩৩]

গান্ধীজীর মূল কথা হল — "Woman is the incarnation of Ahimsa. Ahimsa means infinite love, which again means infinite capacity for suffering."[৩৪] মহিলাকে "weaker sex" বলা অপমানজনক বলে তিনি মনে করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন — "As long as she has not the same rights in law as man, as long as the birth of a girl does not receive the same welcome as that of a boy, so long we should know India is suffering from partial paralysis. Suppression of woman is a denial fo Ahimsa."[৩৫] আততায়ীর হাতে মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বেও তিনি বলেছেন- "There is no occasion for women to consider themselves subordinate or inferior to men."[৩৬] আত্মউপলব্ধিতে গান্ধীজীর নারী সম্পর্কে চেতনা ও ভাবনা গড়ে উঠেছিল। তাই তাঁর প্রকাশ — "My special function from childhood

has been to make woman realise her dignity. I was one slave-holder myself but be proved an unwilling slave and thus opened my eyes to my mission. Her task was finished. Now I am in search of a woman who would realize her mission."[৩৭] এক সময় তিনি বলেন যে বাইরের সুগন্ধী দিয়ে মহিলাদের পুরুষকে ভোলানোর দরকার নেই, হৃদয় দিয়ে সে ভোলাবে।[৩৮] এটা তার জন্মগত প্রবৃত্তি। একই সুর রবীন্দ্র নাথের কণ্ঠে — "আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না ভালবাসায় ভোলাবো..."। গান্ধীজী আরও বলেছেন যে জ্বলন্ত পবিত্রতা দিয়ে নারী পুরুষের পশুত্বকে জয় করবে।[৩৯] তার চুম্বকের মত শুদ্ধ ব্যক্তিত্ব অপরকে আকর্ষণ করবে।

মহিলারা গান্ধীজীকে তুলনাহীনভাবে ভালবাসতেন। তিনি সর্বদাই তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন বলে তাঁকে নিন্দাও সহ্য করতে হয়। কিন্তু তাতে তিনি বিচলিত হননি। মেয়েরা তাঁর কাছে লজ্জা অনুভব করতেন না, বরং তাদের অনেক সমস্যার কথা অকপটে বলতেন ও সমাধান চাইতেন, উপদেশ নিতেন। এ ব্যাপারে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু।[৪০] গান্ধীজীর শেষ বয়সের দুটি জীবন্ত লাঠি ছিলেন — মানু গান্ধী ও আভা গান্ধী। Bapu, My Mother বলে মানু গান্ধী এক খানা বইও লিখেছেন। গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মের সহযোগী শ্রীমতী পোলক ও শ্রী পোলক তাঁর 'Womanliness' কথা বলেছেন। শ্রী প্রভুর লেখাতেও তাঁর womanliness সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে।[৪১] মানবতাবাদী গান্ধীর মনে মাতৃহৃদয়ের গভীর কোমলতা ছিল। তারই প্রকাশ ঘটে তাঁর কথায়, লেখায় ও কাজে এবং ব্যবহারে।

বর্তমানে নারী প্রগতি নারীমুক্তি ও নারীদের ক্ষমতায়ণের আহ্বানের ক্ষণে গান্ধীজীর নারী সম্পর্কিত মানব চেতনায় সাড়া জাগায়। গান্ধীজীর দর্শনের যা মূল কথা — 'সত' ও 'অহিংসা' চারিত্রিক শুদ্ধি আত্মিক মুক্তি এবং এর সঙ্গে দেশ গঠন ও জাতি গঠন তথা মানব সমজ গঠন — যাকে এক কথায় 'নয়া মানব সভ্যতা' বা নয়া 'মানবতাবাদ' বলা যায় নারী সমাজের গঠনে সেদিকেই তিনি দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। তাঁর এই চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা বর্তমানে অনেক বেশি।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। ইয়ং ইন্ডিয়া - ২০.২০.৩০

২। My Experiments with Truth (Autobiography) P.4.

৩। Lead Kindly Light. p. 187, Random House, New York, 1949.

৪। Speeches and Writings of Mahatma Gandhi : P. 423.

৫। হরিজন - ২.২.১৯৪০।

৬। To The Woman of India (Young India 11.8.1921 P 53).

৭। The correspondence of Marx and Engles. p. 255.

৮। বোম্বাই ভগিনী সমাজের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ।

৯। ইয়ং ইন্ডিয়া ২১.৭.২১.

১০। The Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. XIV P 127।

১১। The Encyclopaedia of Gandhian Thoughts. (Ananda T. Hingorani and Ganga A. Hingorani. AICC 1985 (New Delhi) p. 209.

১২। ইয়ং ইন্ডিয়া ১৪.৩.১৯২৯।

১৩। বোম্বাই ভগিনী সমাজে বক্তৃতা - প্রাগুক্ত।

১৪। গান্ধী রচনা সম্ভার ৩য় খণ্ড, পৃ ২২৯, (গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৭০)।

১৫। ঐ ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৮০।

১৬। ঐ পৃ: ৩৪৭।

১৭। ইয়ং ইন্ডিয়া ১৪.১.১৯৩২।

১৮। হরিজন - ৮.৩.৪২।

১৯। ঐ।

২০। হরিজন - ৫.৬.৩৭।

২১। ইয়ং ইন্ডিয়া ২.৯.১৯২৬।

২২। ঐ ১৪.১০.১৯২৬।

২৩। ঐ ২৬.৮.১৯২৬।

২৪। হরিজন ২৩.৫.১৯৩৬।

২৫। ইয়ং ইন্ডিয়া ২৬.৯.১৯২৯।

২৬। ঐ ২৮.৩.১৯২৭।

২৭। ঐ ১৫.৯.১৯২১।

২৮। ঐ ১৬.৪.১৯২৫; ৯.৪.১৯২৫

২৯। Autobiography p. 420.

৩০। ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৯.৮.২৯।

৩১। Encyclopaedia...Ibid p208.

৩২। My Philiosophy of Life p. 96.

৩৩। মহাদেব দেশাই এর ডায়েরি পৃ: ২৩৪।

৩৪। ইয়ং ইন্ডিয়া ১৭.১০.১৯২৯ ।

৩৫। হরিজন ১৮.৮.১৯৪০।

৩৬। ঐ ২৩.৩.১৯৪৭।

৩৭। Letters to Raj Kumari Amrit Kaur p. 100।

৩৮। ইয়ং ইন্ডিয়া ২০.২.১৯২০।

৩৯। হরিজন, ১.৩.১৯৪২।

৪০। Last Days with Gandhi.

৪১। Sri Prabhu : This was Bapu.

বিনয় কুমার সরকার ও সমাজভিত্তিক ইতিহাসের ধারা

জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ধারণা ছিল যে ইতিহাস হল মূলত রাষ্ট্রভিত্তিক বা রাজনীতিভিত্তিক ঘটনাবলীর সমাহার। কিন্তু অজস্র ঐতিহাসিক আধুনিক কালে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ইতিহাসের গণ্ডী আরও অনেক ব্যাপক। শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, এমন কি আর্থ-সামাজিকও নয়, সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়েও ঐতিহাসিক মহলে আজ তাই বিস্তর গবেষণা চলছে। এই প্রসঙ্গে ভারতের একজন অন্যতম পথিকৃৎরূপে অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের নাম স্মরণ করা উচিত।

অসাধারণ মেধাবী ছাত্র বিনয় কুমার (১৮৮৭-১৯৪৯) মালদা থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯০৫ সনে ইংরেজি ও ইতিহাস এই দুই বিষয়েই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ঈশান স্কলারশিপ লাভ করলেন। আরও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সঙ্গে অধ্যাপকরূপে যুক্ত হলেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক ছিল যে তাঁকে আমরা একই সঙ্গে ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক বা সাহিত্যিক বলে আখ্যা দিতে পারি। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও, অর্থাৎ ইওরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অজস্র গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি উপস্থাপন করেছিলেন। বাঙলা, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় ছোট-বড় নিয়ে তার প্রায় নব্বুইটির মত বই রয়েছে। শুধু বাঙলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষাতেই তিনি দক্ষ ছিলেন না, ফরাসি, জার্মান ও ইতালিয়ান ভাষাতেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট সিদ্ধহস্ত। এই তিন ভাষাতেও তাঁর বহু বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রয়েছে। লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, বার্লিন, লাইপজিগ, টোকিও, সাংহাই, লাহোর প্রভৃতি স্থান থেকে সেই যুগেই তার বহু গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

বিনয় সরকারের গভীর ইতিহাস চেতনার সমগ্র রূপটি এই স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। তাঁর ইতিহাসচর্চার কয়েকটি দিকের উপর শুধু আমি এখানে আলোকপাত করছি।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই শুরু করলেন বিনয় সরকার সমাজের বিভিন্ন ছোট ছোট অংশ, অঞ্চল, গোষ্ঠী নিয়ে গবেষণামূলক ইতিহাস চর্চা। সামগ্রিক ইতিহাসের চেতনা আমরা তাঁর অসংখ্য লেখার মধ্যে পাই। ফ্রান্সে অ্যানাল স্কুল 'Total History'র ধারণাকে জনপ্রিয় করেছিল ১৯২৯-৩০ সন থেকে। অধ্যাপক সরকার তার প্রায় এক দশক আগে থেকেই সামগ্রিক ইতিহাসের স্বরূপ নিয়ে লেখালেখি শুরু করলেন।[১] অপেক্ষাকৃত কম-জানা বা না-জানা বিষয়কে তিনি তুলে আনলেন পাদপ্রদীপের আলোকে। সমাজ বলতে তিনি বুঝেছিলেন সমাজের সব কিছুকেই। শুধু রাজনীতি বা অর্থনীতি নয়,

সমাজের অন্য সমস্ত দিকও — যেমন সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, জীবজন্তু, পশুপক্ষী, গাছপালা, নদীপর্বত, এমন কি কুসংস্কার-কুপ্রথাকেও — ভাল করে বুঝতে হবে। নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও একান্ত আবশ্যিক। এর সঙ্গে তিনি গুরুত্ব দিলেন তুলনামূলক গবেষণার উপর। যেমন, কোন অঞ্চলের কোন গোষ্ঠীর ইতিহাস জানতে হলে ঐ অঞ্চলের অন্যান্য গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সমগোত্রীয় গোষ্ঠীর তুলনা করা বাঞ্ছনীয়।

ইতিহাস রচনায় "বিশ্ব শক্তির" গুরুত্ব নিয়েও সরকার আলোচনা করলেন। তাঁর মতে মানব-জীবনের ভাঙা-গড়া বা সামাজিক-রাষ্ট্রিক রূপান্তর কোন ব্যক্তিগত বা জাতিগত প্রচেষ্টায় হয় না। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অহর্নিশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ভারত সম্বন্ধে এই মত তিনি পোষণ করলেন *The Futurism of young Asia* গ্রন্থে (লাইপজিগ, ১৯২২, পৃঃ ৩০৬-০৭)।

সমাজের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিলেন আপামর জনসাধারণের উপর। সাংহাই থেকে প্রকাশিত তাঁর *Chinese Religion through Hindu Eyes* (১৯১৬) গ্রন্থে তিনি লিখলেন যে ইতিহাস লিখনের নতুন পদ্ধতি হল মুষ্টিমেয় নেতাকে নিয়ে আলোচনা করার চেয়েও আপামর জনসাধারণকে নিয়ে বেশি করে চর্চা করা। এই গ্রন্থে জনগণেব মনস্তত্ত্ব নিয়ে তিনি বিস্তর আলোচনা করলেন। বইটির উপ-শিরোনামাই হল *A study in the Tendencies of Asiatic Mentality* । এখানে তিনি প্রাক্-বৌদ্ধ ভারত, চীন ও জাপানের মানুষদের মনস্তত্ত্বের মধ্যে একটি তুলনামূলক গবেষণা করলেন। বৈদিক ধর্ম, সিন্টো ধর্ম ও কনফুসীয় ধর্মের ধর্মীয় চিন্তাগুলি নিয়ে এবং সেই সঙ্গে এই তিন দেশের মানুষদের আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, কুসংস্কাব প্রভৃতি নিয়ে তুলনামূলক গবেষণা করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন যে এশিয়ার এই তিন দেশে জাতিগত ও ভাষাগত বৈষম্য থাকলেও মনস্তাত্ত্বিক স্তরে বিস্তর মিল ছিল যা তাদের দৈনন্দিন কাজে কর্মে দর্শনে পরিস্ফুট হয়েছে।[২] মনস্তত্ত্ব আজকাল দারুণভাবে ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে গেছে। অধ্যাপক সরকার সেই যুগেই পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ইতিহাস চর্চায় মনস্তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর।

ইতিহাসের আর একটি বিষয়কেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সরকার চর্চা করতেন। তা হল মৌখিক ইতিহাস বা ঐতিহ্য যা সাধারণ মানুষের কথায়, গল্পে, গানে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রচলিত সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক ইতিহাসও যে তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ১৯১৭ সনে লন্ডন থেকে প্রকাশিত তাঁর *Folk Element in Hindu Culture* বইয়ে তিনি মৌখিক ইতিহাস ও লোকায়ত উপাদানকে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করলেন। তিনি দেখালেন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বাঙলা-উড়িষ্যায় আসার পর গণ সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বলতে

প্রথমে বৈদিক, পরে বৌদ্ধ-জৈন, আরও পরে ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মকে তিনি বুঝিয়েছেন। এগুলি এই অঞ্চলে প্রচারিত হওয়ার পর জনগণ তাদের মত করে এগুলিকে গ্রহণ করেছে। এই গ্রহণের ফলে যত দিন গেছে ততই নানা ধরণের দেব-দেবীর সৃষ্টি হয়েছে। লোকায়ত সৃজনীশক্তির প্রতিফলন ঘটেছে প্রত্যেক যুগের সাহিত্য-শিল্পকলার মধ্যে।[৩] বাঙলা-উড়িষ্যার লোকায়ত হিন্দু ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ তিনি তুলে ধরলেন। ১৯১৩ সনেই তিনি এ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। ১৯১৪-১৫ সনে ইংল্যান্ড আমেরিকায় থাকাকালীন তিনি এই বইটি লিখতে শুরু করেন ও ১৯১৭ সনে লন্ডন থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।[৪] তিনি বইটি উৎসর্গ করলেন "সব যুগের লোকায়ত ভারত"-এর উদ্দেশ্যে। বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখলেন যে কিছু কিছু লোকায়ত শিল্প, ঐতিহ্য, সঙ্গীত ও উৎসবের চর্চা তিনি এই গ্রন্থে করেছেন। একদিকে শিব শক্তিধর্ম ও অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্ম - এই দু'য়ের পারস্পরিক সম্পর্ক লোকায়ত বাঙলা-উড়িষ্যায় কি রকম পড়েছে তা এই গ্রন্থের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। ভূমিকায় তিনি আরও লিখলেন ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে জনগণ কিভাবে প্রভাব যুগিয়েছিল এ সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতমহলকে আরও বেশি নজর দিতে হবে। দেশীয় সাহিত্যকে ইতিহাসের অন্যতম আকর হিসাবে আরো বেশি করে স্বীকৃতি দিতে হবে।[৫] ভূমিকায় তিনি আরো লিখলেন যে হিন্দু সংস্কৃতির বিবর্তনের সমস্ত পর্যায়ে অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর থেকে কোন অংশেই আপামর জনগণ কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় নি। সেই যুগেই ইওরোপ-আমেরিকার নানা দেশে বইটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, "তারপর ইয়োরামেরিকার নানা দেশের বড়-বড় লাইব্রেরিতে এই বইয়ের এক-একটা কপি দেখেছি। যখনই দেখেছি, বুকটা চেঁড়ে উঠেছে; আর তখনই পেয়েছি জীবনের বিপুল ধাক্কা। ভেবেছি, — এই আমার জামতল্লীর গম্ভীরার দিগ্‌বিজয়। ... এই আমার মালদহের দিগ্বিজয়, — আমার চুনিয়া-নুনিয়া ভাইদের দিগ্বিজয়।"[৬] তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে নৈতিকতায় ও বুদ্ধিতে নিরক্ষরেরা মোটেই অশিক্ষিত নয়।[৭]

লোক সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা সরকারের অন্যান্য বইয়েও ছড়ানো রয়েছে, যেমন *Creative India* (১৯৩৭), *Introduction to Hindu Positivism* (১৯৩৭) ইত্যাদি। তাঁর মতে আর্যসংস্কৃতি ছিল প্রাচীনযুগের বাঙালীর পক্ষে "বিদেশী মাল"। বাঙলার "অনার্য" নরনারী এই বিদেশী "আর্য" ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির বশে এনেছিল।[৮] শুধু হিন্দু ধর্ম নয়, ইসলাম ধর্মের মধ্যেও অনার্য বাঙালীর প্রভাব পড়েছে। সরকারের ভাষায়, "হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মেই 'বাঙ্‌লামি'র প্রলেপ পড়িয়াছে।"[৯] বাঙালীর দেব-দেবী হলেন, তাঁর মতে, বস্তুনিষ্ঠ, কল্পনানিষ্ঠ, বহুত্বনিষ্ঠ বাঙালী ঘরের ছেলে-মেয়ে ছাড়া আর কিছু নয়। যখন বাঙালী এঁদের পূজা করে তখন তারা বাঙালী ছেলেমেয়েরই তারিফ করে। "লোকায়তের জয়-জয়াকার চলিতেছে বাঙালী

সমাজে।”[১০] আজকের দিনে জনগণের ইতিহাস চর্চা করা ঐতিহাসিক মহলে বিশেষভাবে স্বীকৃত। আমরা সকলেই নিচুতলার ইতিহাস, নিম্নবর্গের ইতিহাস, লোকায়ত ইতিহাস ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু ১৯১৬/১৭ সনে এই ধরণের জনগণকেন্দ্রিক ইতিহাস চর্চা সত্যিই এক অভিনব ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এ ব্যাপারে সরকার ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ।

অধ্যাপক সরকার জনগণ বলতে কোন ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠীকে বোঝান নি। জনগণকে বিভিন্ন ভাগ বা Categoryতে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি ভাগ নিয়ে গবেষণা করার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। জাতি, ধর্ম, অর্থ, কৃষ্টি, পেশা, শিক্ষা, লিঙ্গ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে অগণিত ভাগ তৈরি করা যায় ও তাদের উপর গবেষণা করা যায়। বিনয় সরকার উনিশশো বিশ-ত্রিশের দশকেই দেখালেন যে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় এই ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ ভিত্তিক কাজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে *নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন* (১৯৩২), *বাড়তির পথে বাঙালী* (১৯৩৫) বইগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়। শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি নানা ধরণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন যেমন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, বিমানীতি, ভূমি আইন, ট্রেড ইউনিয়ন, মূলধন, লোকসাহিত্য, নৃতত্ত্ব, জাতিভেদ প্রথা, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা, জন্মমৃত্যুর হার, ভাষাসাহিত্য, বিনোদন ইত্যাদি। প্রথম বইয়ে তিনি কয়েকটি ভাগ নিয়ে কাজ করেছেন যেমন কৃষক, শ্রমিক, মজুর, নারী, সমাজসেবক, ইস্কুলমাস্টার, উপজাতি ইত্যাদি। তিনি বললেন এই ধরণের অজস্র ভাগ করে কাজ করা যায়। আজকাল এই ধরণের micro-study নিয়ে কত রকমের কাজ হচ্ছে।

ইতিহাস চর্চার দিক থেকে বিনয় সরকারের আরো অনেক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে, যেমন *The Positive Background of Hindu Sociology* (এলাহাবাদ, ১ম ও ২য় খন্ড, ১৯১৪ ও ১৯২১), *The Futurism of Young Asia* (বার্লিন, ১৯২২), *Villages and Towns as social Patterns* (কলিকাতা, ১৯৪১) এবং *Dominion India in World Perspectives* (কলিকাতা, ১৯৪৯)।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ হল *Creative India* (লাহোর, ১৯৩৭)। এর মধ্যে তিনি মহেঞ্জোদারোর সময় থেকে বিংশ শতাব্দী অবধি ভারতের ইতিহাসের পুনর্গঠন করেছেন। আধ্যাত্মিকতা থেকে শুরু করে প্রসূতি সদন — বিভিন্ন কম-জানা বা না-জানা বিষয়কে তিনি তুলে ধরলেন। নিউ ইয়র্কের অধ্যাপক কে. এফ. লাইডেকার লিখেছেন, “Perhaps for the first time has the subject been presented in such a readable Western garb which makes us almost forget that India lies in Asia.”[১১] আমেরিকার বিদ্বজ্জনের কাছ থেকে পরাধীন ভারতীয়র এক লেখার এরকম স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে মনে রাখার মত।

গবেষণা করতে গিয়ে অধ্যাপক সরকার ইংরেজি ও বাঙলায় নতুন নতুন পরিভাষারও

সৃষ্টি করলেন। যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইওরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যবিত্ত মেয়েরা পুরুষদের বহির্জগতে অনেক বেশি প্রবেশ করতে শুরু করে। কেউ এটাকে নারী মুক্তি বলেছেন। কেউ বা নারী উন্নতির একটা সোপান বলে এটাকে চিহ্নিত করেছেন। অধ্যাপক সরকার এই ঘটনাকে বললেন "Masculinization of Women".[১২] অর্থাৎ পুরুষের চিরাচরিত কর্মজগতে নারী প্রবেশ করে পুরুষালী হয়ে উঠছে। পরিভাষাটির পক্ষে-বিপক্ষে মত থাকতেই পারে; কিন্তু এইটি একটি নতুন পরিভাষা যা সরকারীয় চিন্তাধারার ফলশ্রুতি।

সর্বোপরি, আজ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে তারও অন্যতম পথপ্রদর্শক রূপে অধ্যাপক বিনয় সরকারের নাম স্মর্তব্য। ১৯০৬ সন থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি লেখা শুরু করেন। অজস্র গবেষণামূলক বই ও প্রবন্ধ লিখে বাঙলাভাষায় ইতিহাস, অর্থনীতি ও সমাজবিদ্যা চর্চার এক বলিষ্ঠ ধারা তিনি শুরু করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর *শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা* (১৯১০), *ভাষা শিক্ষা* (১৯১০), *ঐতিহাসিক প্রবন্ধ* (১৯১২), *নিগ্রো জাতির কর্মবীর* (১৯১৪), *বিশ্বশক্তি* (১৯১৪), *বর্তমান জগৎ* (১৯১৪-২৫), *দুনিয়ার আবহাওয়া* (১৯২৬), *হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন* (১৯২৬), *ধনদৌলতের রূপান্তর* (১৯২৮), *নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন* (১৯৩২), *বাড়তির পথে বাঙালী* (১৯৩৫), *বাংলায় ধনবিজ্ঞান* (১৯৩৯) প্রভৃতি উল্লেখ্য। বাংলায় ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে তিনি নতুন নতুন শব্দ ও পরিভাষার সৃষ্টি করলেন যেমন 'বাপ্‌কা ব্যাটা', 'নয়া নয়া', 'বাঘা বাঘা', 'বিলকুল বদলে গেল', 'আসমান জমিন ফাবাক', 'নাস্তানাবুদ' ইত্যাদি। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সঙ্গে একদিকে বিদেশী শব্দ ও অন্যদিকে গ্রাম্য মেঠো শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ করে একটি নতুন 'গুরুচন্ডালি' গদ্যরীতি তিনি শুরু করলেন। আরবি-ফারসি শব্দ ও 'চলতি শব্দ' বাঙলা সাহিত্যে যাদের হাত ধরে প্রবেশ করেছে তার মধ্যে সরকার অন্যতম। বাঙলায় ইতিহাস ও অর্থনীতির চর্চা করার সময় তিনি সাধারণভাবে ইংরেজি শব্দ পরিহার করে চলতেন।[১৩] তাঁর বলিষ্ঠ সাবলীল বাঙলাভাষা তাঁকে সাহিত্যিকের মর্যাদা এনে দিয়েছে।

বিনয় সরকারের আলোচ্য তথ্য বা তত্ত্ব নিয়ে আজকের দিনে বিতর্ক হতে পারে। তাঁর লেখালেখি সমালোচিত হতে পারে। বরং তিনি সব সময়ই চাইতেন যেন তাঁর চিন্তাধারা ও গবেষণা সমালোচিত হয়, যুক্তির দ্বারা খন্ডিত হয়। তাঁর ছাত্রদের ক্লাসেই তিনি একথা বলতেন। কিন্তু বাঙলা ভাষায় ইতিহাস চর্চা এবং সেই সঙ্গে সামগ্রিক সমাজভিত্তিক ইতিহাস চর্চা — এই দুইয়েরই যে ধারা আজ ঐতিহাসিক মহলে সমাদৃত তার অন্যতম রূপকার হিসাবে বিনয় সরকার অবশ্যই যোগ্যতা দাবি করতে পারেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি আজও আমাদের দেশে যথাযথ সম্মান পান নি। অথচ বিদেশে তিনি সমাদৃত হয়েছিলেন বহু বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিতের আসরে। তাঁর বইয়ের আলোচনা করেছেন রীস ডেভিডস, ল্যাম্প,

সোরোকিন, র‍্যাপসন প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত। তেহেরান·বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে (১৯৩৭)। তারও আগে ১৯২১ সনে প্যারিসের অ্যাকাডেমি অফ আর্টস এণ্ড অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস তাঁকে 'Immortal' বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। যে বিরল সম্মান ভারতীয়দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু পেয়েছিলেন, সরকারকেও সেই স্বীকৃতি দেওয়া হল। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পাণ্ডিত্যের জন্য 'Decoration of the German Academy' প্রদান করল (১৯৩৭)। দু'বছর পর ইতালিয় সরকার তাঁকে দিয়েছিল 'Cavalier of the Order of the Crown' নামক সম্মান।[১৪]

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। যেমন - ঐতিহাসিক প্রবন্ধ (কলিকাতা, ১৯১২), *The science of History and the Hope of Mankind* (লন্ডন, ১৯১২), The Positive Background of Hindu sociology, (১ম খন্ড, এলাহাবাদ, ১৯১৪), *Chinese Religion through Hindu Eyes* (সাংহাই, ১৯১৬), *Love in Hindu Literature* (টোকিও, ১৯১৬), *Folk Element in Hindu Culture* (লন্ডন, ১৯১৭) ইত্যাদি।

২। বাণেশ্বর দাস, *The social and Economic Ideas of Benoy Sarkar*, কলিকাতা, ১৯৪০, পৃঃ ৪১৮।

৩। বিনয় কুমার সরকার, *Folk Element in Hindu Culture*, লন্ডন, ১৯১৭, পৃঃ ২৫৩।

৪। তদেব, ভূমিকা, পৃঃ xiv।

৫। তদেব, ভূমিকা, পৃঃ vii।

৬। হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য, *বিনয় সরকারের বৈঠকে*, ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৯৪৪, পৃঃ ৩৭৫।

৭। তদেব, পৃঃ ৪৪৮-৪৯।

৮। হরিদাস মুখোপাধ্যায়, *ইতিহাস চর্চায় বিনয় সরকার*, কলিকাতা, ১৯৫০, পৃঃ ৭৮।

৯। *বিনয় সরকারের বৈঠকে*, ১ম ভাগ, পৃঃ ৫৮০-৮১।

১০। *ইতিহাস চর্চায় বিনয় সরকার*, পৃঃ ৮১।

১১। শিকাগোর *Ethics* পত্রিকায় প্রকাশিত (জুলাই, ১৯৩৮) লাইডেকারের আলোচনা বাণেশ্বর দাসের গ্রন্থে উল্লিখিত, পৃঃ ৪৪৪-৪৭।

১২। বিনয় কুমার সরকার, *Villages and Towns As Social Patterns*, কলিকাতা, ১৯৪১, পৃঃ ১৩৬-৩৭।

১৩। *ইতিহাস চর্চায় বিনয় সরকার*, পৃঃ ৮৪-৮৯।

১৪। বাণেশ্বর দাস, উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪০৬, ৪২৬।

রাজনীতি এবং মতাদর্শের পরিবর্তন : পশ্চিমবঙ্গ (১৯৬৭-৭০)

চন্দন বসু

আলোচনার শুরুতেই আলোচনার বিষয়বস্তু এবং পরিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে অনুধাবন করতে সুবিধা হয়। রাজনীতি এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যে পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য সমূহকে বোঝার চেষ্টা করা বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য। আরো স্পষ্ট করে বললে ১৯৬৭-৭০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস লেখা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বরং কাঠামোগত ভাবে এই কালপর্বে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে নতুন পরিবর্তনের ধাক্কা আদৌ কিছু লাগলো কিনা এবং রাজনৈতিক শক্তির নতুন ধরণের পুনর্বিন্যাস আদৌ সংঘটিত হল কিনা তা বোঝাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সুতরাং এটি আদৌ কোন কালানুক্রমিক ইতিহাস নয়, বরং অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে রাজনীতি এবং মতাদর্শের কিছু পরিবর্তনের চিহ্নিতকরণ।[১]

১৯৬৭ থেকে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে আদৌ কোন পরিবর্তন এল কিনা তার একটা আভাস পাওয়া যাবে ঐ বছরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল থেকে, ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে দীর্ঘদিনের কংগ্রেসি শাসনের অবসান ঘটে এবং এই প্রথম পশ্চিমবাংলায় অকংগ্রেসি যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই নির্বাচনী পট পরিবর্তনকে সাধারণ জনগণের পরিবর্তনকামী চেতনার প্রতিফলন বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সমকালীন সংবাদপত্র এবং লেখাপত্রের মধ্যেও এই পরিবর্তনের চেহরা ফুটে উঠেছে। যেমন সমকালীন সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্তর লেখা থেকে দেখা যায় কিভাবে অতিসাধারণ মধ্য এবং নিম্নবিত্ত মানুষের চেতনায় কংগ্রেস বিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে বরুণ সেনগুপ্তর সাক্ষ্য থেকে একটা জিনিস বোঝা যায় যে মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত নারীর মানুষের স্বকর্তৃত্ব স্থাপনের চেতনা এই সময়ে দৃঢ়ভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল। নিম্নবর্গীয় মানুষের মর্যাদা স্থাপনের প্রয়াস, স্বকর্তৃত্বের ইচ্ছা, প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে অভিমান ও ঘৃণা ১৯৬৭ সালের পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস বিরোধিতার মোড়কে প্রকাশিত হয়। শোষিত মানুষের কাছে কংগ্রেসি শাসনের পতন এবং এবং অন্যায়ের অবসান সমার্থক হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ সালের পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসি শাসনের অবসানের মধ্যে জনগণের উল্লসিত চেহারা দেখতে পাওয়া যায়।[২] সাধারণ জনগণের এত প্রবল উপস্থিতি পশ্চিমবঙ্গ কখন এর আগে প্রত্যক্ষ করেনি। বস্তুত সাধারণ জনগণের যারা অধিকাংশই নিম্নবর্গীয় বা শোষিত, চৈতন্যের জাগরণ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকে কতদূর

পর্যন্ত প্রভাবিত করতে পারে তার সবচেয়ে বড় নিদর্শন ১৯৬৭ সালের পশ্চিমবাংলার সাধারণ নির্বাচন। একটু অন্যভাবে বললে সংগঠিত বামপন্থী রাজনীতি এবং অসংগঠিত অরাজনৈতিক জনগণের মধ্যে এই প্রথম নিবিড় রাজনৈতিক যোগসূত্র স্থাপিত হল যার প্রতিফলন ঘটল ১৯৬৭ এর সাধারণ নির্বাচনে। বামপন্থী দলগুলির কৃতিত্ব এই মানেই যে তারা অসংগঠিত অরাজনৈতিক জনগণের কংগ্রেস বিরোধী চেতনাকে একটা সুস্পষ্ট অবয়ব দিতে সমর্থ হয়েছিল। ষাটের দশকের শেষ অর্ধের পশ্চিমবাংলার রাজনীতি এবং মতাদর্শের পরিবর্তনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল একদিকে সাধারণ জনগণের চৈতন্যের রূপান্তর এবং অন্যদিকে বামপন্থী শক্তির সংহত আত্মপ্রকাশ। এই দুইয়ের মেলবন্ধনের প্রত্যক্ষ ফল পশ্চিমবাংলা থেকে কংগ্রেসি শাসনের উচ্ছেদ। নিচের সারণী থেকে এই নির্বাচনী ফলাফলের চেহারা স্পষ্ট।[৩]

১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল	মোট প্রার্থী	জয়ী প্রার্থী	প্রাপ্ত ভোট (শতকরা)
সি.পি.(আই)এম	১৩৫	৪৪	১৮.৩১
আর.এস.পি.	১৫	৬	২.২১
এস.এস.পি	২৬	৭	২.১২
এম.উ.সি.আই	৮	৪	১.২২
ডব্লিউ.পি.আই	২	২	০.৩৮
এম.ফব.বি.	১	১	০.২৩
আর.সি.পি.আই	২		০.১৭
আই.এন.ডি.আই	১২	৪	১.৩০
ইউ.এল.এফ (মোট)	২০১	৬৮	২৫.৯৪
বি.সি.	৮১	৩৪	১০.৪৫
সি.পি.আই	৬২	১৬	৬.৫২
ফ.ব.	৪২	১৩	৪.৪৩
বি.পি.আই	-	-	-
আই.এন.ডি ২	৭	২	০.৫৫
পালফ (মোট)	১৯২	৬৫	২১.৯৫
উলফ + পালফ		১৩৩	৪৭.৮৯

আই.এন.সি.	২৮০	১২৭	৪১.০৮
পি.এস.পি.	২৭	৭	২.০০
এ.বি.জে.এম	৫৮	১	১.৪১
এস.ডব্লিউ.এ	২১	১	০.৮১
এল.এম.এম	৫	৫	০.৬৪
জি.এল	৫	২	০.৪৭
বি.ডি.এ.ল.	১	x	০.১৯
এ.বি.এইচ.এস.	১	x	০.১৬
আর.পি.আই	১	x	০.১
আই.এন.ডি	২৬৬	৪	৫.৩৪

ষাটের দশকের শেষপর্বে পশ্চিমবাংলায় যে বামপন্থী শক্তির অগ্রগতি সূচিত হয়, তাতে নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি। সদ্যগঠিত মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনে যেখানে ৪৪টি আসন পেল সেখানে সাবেক কমিউনিষ্ট পার্টি বা সি.পি.আই পেল মাত্র ১৬টি আসন। শতকরা হিসাবে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি মোট নির্ভুল ভোটের (Valid Votes) ১৮.৩১ শতাংশ পেল; সাবেক কমিউনিষ্ট পার্টি পেল মাত্র ৬.৫২ শতাংশ।[৪] এক কথায় বলতে গেলে ১৯৬৭ সাল চিহ্নিত হয়ে রইল মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির উত্থানের বছর হিসেবে। এই নির্বাচন থেকে একটা তথ্য স্পষ্ট হয়ে গেল যে সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের বড় অংশই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত প্রশ্নে সমর্থন করেছে। অন্যভাবে বললে পরিবর্তনকামী মানুষের চেতনার প্রতিফলন ছিল রাজ্যরাজনীতিতে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির দ্রুত শক্তি বিস্তার।

মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির দ্রুত রাজনৈতিক সাফল্য লাভের পিছনে কাজ করেছিল সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল। ভারতীয় রাজনীতির বাস্তবতায় কংগ্রেসি শাসনের তীব্র বিরোধিতা যে ১৯৬৬-৬৭ সালের গণচেতনার প্রধান বিষয়বস্তু মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি তা সঠিকভাবে অনুধাবন করে। ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যেকার সংশোধনবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে মানুষের কাছাকাছি আনে। জমি, মজুরি এবং গণতন্ত্রের প্রশ্নকে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থাপিত করে। কৃষক, শ্রমিক এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণী মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে জমি, মজুরি এবং গণতন্ত্রের প্রশ্নে মৌলিক রাজনৈতিক সমর্থন জানায়। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সুস্পষ্টভাবে এই তিনটি সামাজিক শ্রেণীর সমস্যাকে রাজনীতিগতভাবে তুলে ধরে। এই সঠিক রণকৌশলের ফলে

কৃষক, শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তরা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান গণভিত্তিতে পরিণত হয়। এই তিনটি সামাজিক শ্রেণীর ব্যাপক সমর্থন পাওয়ার ফলে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনে নির্ণায়কের ভূমিকা নিতে সমর্থ হয়। অন্যদিক থেকে দেখলে ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ যে স্বকর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইছিল, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি তার অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে। স্পষ্টতই, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে ১৯৬৭ সাল আদৌ একটি রাজনৈতিক দলের হাত থেকে অন্য একটি রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর নয়, বরং ১৯৬৭ সাল শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের বছর।

পশ্চিমবাংলায় সংসদীয় পথে বামপন্থী রাজনীতির এই বিকাশ, বিশেষত মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির উত্থান কিন্তু আদৌ সরল রাজনৈতিক চিত্রকে প্রতিফলিত করে না। ১৯৬৭ উত্তর পশ্চিমবাংলার রাজনীতির গতি প্রকৃতি আদৌ সরল ও এক মাত্রিক নয়, বরং জটিল এবং বহুমাত্রিক।

উত্তরবাংলার অখ্যাত গ্রাম নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে একটি ভিন্ন ধারার রাজনীতি এই সময়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে দরিদ্র কৃষি মজুররা এবং ভাগচাষীরা ছিল আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী মূল সামাজিক শ্রেণী। নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম সংঘটিত হওয়ার ফলে দুটি তথ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথমত প্রাতিষ্ঠানিক বামপন্থী রাজনীতির ভিতর থেকেই বহু কর্মী নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামকে সমর্থন করে এবং সংসদীয় বামপন্থী রাজনীতির বিকল্প হিসেবে নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রামের পথকে ভাবতে থাকে। নকশালবাড়ির আলোকে ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের মূল্যায়ন শুরু হয়। খুব গভীরে না গিয়েও বলা যায় নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের ফল হিসেবে বহু প্রতিষ্ঠিত সামাজিক এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব ও ধারণা প্রশ্নের মুখে পড়ে। দ্বিতীয়ত, রণকৌশল রূপে দেখা দিল সশস্ত্র কৃষক গেরিলা দলের মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক ক্ষমতা দখল।[৫] নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম দ্বারা অনুপ্রাণিত এই রাজনীতি আদর্শগত সমর্থন আত্মস্থ করল মাও সে তুঙ এবং লিন পিয়াওর তত্ত্ব থেকে। এই নতুন রাজনীতির অন্তর্বস্তু ছিল মাও সে তুঙ এবং লিন পিয়াওর তত্ত্ব থেকে। এই নুতন রাজনীতির অন্তর্বস্তু ছিল মাও সে তুঙ ও লিন পিয়াও নির্দেশিত সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব ও গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার রাজনীতি। চারু মজুমদার এবং তার সহযোগীরা নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রামকে এই তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করেন। অবস্থার গভীরতা বোঝা যায় যখন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিতে ভাঙ্গন ধরে এবং গঠিত হয় মার্কসবাদী লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি।

মার্কসবাদী লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব বিশেষত চারু মজুমদার প্রভৃতিরা ভূমিহীন কৃষকদের বিপ্লবী শক্তি সম্পর্কে অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁরা মনে করতেন ভূমিহীন কৃষকরা স্বতস্ফূর্তভাবে বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেবে। এই অতি রোমান্টিক

কল্পনার ফলে দুটি প্রতিক্রিয়া ঘটে। প্রথমত, গণ সংগঠন ও গণ আন্দোলন বর্জনের প্রবণতাকে তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, গণআন্দোলন বর্জনের ফলস্বরূপ খতম অভিযানের উদ্ভব ঘটে। বস্তুত এর পিছনে কাজ করছিল অতিদ্রুত বিপ্লব করার তাগিদ। চারু মজুমদারের বিপ্লবী তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ না করেও একথা বলা যায় গণসংগঠন বর্জনের কর্মসূচি এবং বিশুদ্ধ শ্রেণীশত্রু খতম অভিযান গ্রহণ করার ফলে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সদ্য সংগঠিত বামপন্থী রাজনীতি।

১৯৬৭ ৭০ এর মধ্যে পশ্চিমবাংলার রাজনীতি এবং মতাদর্শের পরিবর্তনকে বুঝতে হলে বামপন্থী রাজনীতির মধ্যেকার এই টানা পোড়েন ও জটিলতাকে বোঝা দরকার। সংসদীয় বামপন্থার ভিতর থেকে অতিবাম চিন্তার জন্ম সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সংসদীয় বামপন্থা এবং নকশালপন্থা উভয় প্রকার রাজনীতিকে দমন করাব জন্য নেয় চরম ফ্যাসীবাদী দক্ষিণপন্থা যার প্রকাশ পশ্চিমবাংলায় ঘটে ১৯৭১-৭৬ এর মধ্যে। উপসংহারে বলা যায় পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী শক্তির বিকাশের ফলে নিম্নবর্ণের মানুষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল উগ্রবাম এবং উগ্র দক্ষিণপন্থার আকস্মিক উন্মাদনায় তা অন্তত একদশক পিছিয়ে যায়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যে পশ্চিমবাংলার রাজনীতি এবং মতাদর্শের পরিবর্তনকে তাই ব্যাখ্যা করা দরকার জনগণের চেতনার রূপান্তর এবং বামপন্থী রাজনীতির টানাপোড়েন ও পুনর্বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবাংলার ৬০ ও ৭০ দশকের ইতিহাস, বিশেষত রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো আলোচনা পাওয়া যাবে অমলেন্দু সেনগুপ্তর 'জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর'-এ, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৭, কলকাতা।

২। পালা বদলের পালা — বরুণ সেনগুপ্ত, কলকাতা, পৃ-১৬-১৭।

৩। 'Election Results of West Bengal — Statistics and Analysis 1952-1991' published by Communist Party of India (Marxist), Calcutta. 1995. p. 303.

৪। ঐ, পৃ: ৩০৩।

৫। 'নকশালবাড়ী আন্দোলন ও সত্তর দশক' — সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্তর দশক — অনিল আচার্য (সম্পা), কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ: ৮-৯।

আলোকচিত্রের দেড়শ বছর : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

বিতান ভট্টাচার্য

"ফটোগ্রাফি কোন শিল্প নয়, তা একটা ভাষা, একটা নিরপেক্ষ ব্যবহারিক মাধ্যম। ভাষার সাহায্যে তৈরি করা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, সরকারি স্মারকলিপি, প্রেমপত্র, বাজারের ফর্দ ও বালজাকের প্যারিস। তেমনি ফটোগ্রাফির সাহায্যে তৈরি করা যেতে পারে পাসপোর্ট ছবি, আবহাওয়ার ফটো, যৌনচিত্র, এক্স-রে প্লেট, বিবাহের ছবি ও Atgetএর প্যারিস। শব্দের ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহার অনুসারে অর্থ, ফটোগ্রাফও তেমনি, একই ছবি আর্ট গ্যালারিতে, রাজনৈতিক সভায়, পুলিসের ফাইলে, আলোকচিত্রের পত্রিকায়, সাধারণ সংবাদপত্রে, বইএর ভেতর, বসার ঘরের দেওয়ালে, কোথায় ও কীভাবে দেখা হচ্ছে সেই অনুসারে অর্থ পায়।"

বিশ্বের প্রখ্যাত আলোকচিত্র সমালোচক সুজান সোনটাগ তাঁর *অন ফটোগ্রাফি* বইটিতে আলোকচিত্র প্রসঙ্গে এই অভিমত পোষণ করেছেন।

বিশ্বের প্রাচীনতম যে ফটোগ্রাফি প্লেটটি পাওয়া গেছে তার বয়স আনুমানিক ৭ কোটি বছর। সম্প্রতি 'নেচার' পত্রিকায় এর বিবরণ দিয়ে জনৈক ভূ-তত্ত্ববিদ লিখেছেন ফ্রান্সের এর পাহাড়ের গুহায় এই আলোকচিত্রের সন্ধান মেলে যার ক্যামেরা প্রকৃতি নিজেই।

আজকে, এই ল্যাপটপের যুগে, যে আলোকচিত্রকে বাদ দিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব, তার বয়স খুব জোর দেড়শ বছর। ১৮৫৬ সালের ২৮ জুন 'দ্য ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল — উইলিয়ম হেনরি ফক্স ট্যালবটকে ১৮৪০ সালে লেখা একটি চিঠিতে প্রথম 'ফটোগ্রাফি' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন ইংলন্ডের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ এবং রসায়নবিদ স্যার জন হার্শেল। প্রসঙ্গত, ১৮৩৯ সালে ফক্স ট্যালবট ইংলন্ডের রয়্যাল সোসাইটিতে একটুকরো কাগজের ওপর সিলভার ক্লোরাইড (AgCl) লাগিয়ে, তার ওপর যেকোন ছোট জিনিস রেখে আলো ফেলে কিভাবে নেগেটিভ (এখন যাকে ফটোগ্রাম বলে) করা যায় তা দেখিয়েছিলেন। স্যার হার্শেল কথাটি পেয়েছিলেন দুটো গ্রিক শব্দ — ফটো অর্থাৎ আলো এবং গ্রাফ কথার অর্থ অঙ্কন একত্রিত করে। আমরাও ঐ অর্থ অনুসারে বাংলা প্রতিশব্দ করেছি 'আলোকচিত্র'। আক্ষরিক অর্থে আলোর সাহায্যে অঙ্কন।

আধুনিক আলোকচিত্রের সূচনার সময় ১৮৩০ এর পরপরই ধরা যায়। প্যারিসের বিখ্যাত দৃশ্যাঙ্কন শিল্পী জ্যাক ম্যত দাগ্যের আলোক সম্পাত নিয়ে কাজ করছিলেন। সিলভার আয়োডাইড লাগানো তামার পাতে ছবি তোলার পদ্ধতি ইনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। দাগ্যেরোটাইপ ছবি সে সময় আলোকচিত্রের একটা প্লাটফর্ম তৈরি করেছিল।

এই ছবি তুলতে প্রায় পনেরো মিনিট সময় লাগতো।

১৮৪০-এ ইংলণ্ডে সিলভার ব্রোমাইডের ব্যবহার আমেরিকাতে ক্যামেরায় রিফ্লেক্স আয়না, হাঙ্গেরিতে মেনিস্কাস লেনসের বদলে দূর নিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী লেনস্ বিশ্বের আলোকচিত্র জগতে একটা যুগান্তর ঘটালো।

দাগ্যের, ফক্স, নীপস্ এর গবেষণার থেকে স্বতন্ত্র এক প্রচেষ্টা এবং গবেষণার দাবি রাখেন 'হাইপোলাইট বায়ার্ড।' তার ছবির নাম ফটোকেমিক্যাল ড্রয়িং। ১৮৫১ সালে আলোকচিত্রে আবার বিপ্লব ঘটালেন ফ্রেডরিক স্কট আর্চার। তাঁর আবিষ্কৃত 'ও এই কলোডিয়ন পদ্ধতিতে পটাসিয়াম আয়োডাইড এবং কলোডিয়ন, সিলভার নাইট্রেটে ডুবিয়ে সিক্তাবস্থায় ছবি তুলে ভালো ফল পেলেন আর্চার। তারপর প্রায় বছর তিরিশেক এই পদ্ধতি টিঁকে ছিল।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আলোকচিত্রেও ক্রমবিবর্তন ঘটতে লাগলো। ধাতুর পাতের জায়গায় প্রিন্ট এর জায়গা নিল এ্যলবুমেন মাখানো কাগজ। ফ্রান্সে ততদিনে রঙিন ছবি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। ম্যাক্সওয়েলের ত্রিবর্ণতত্ত্ব রঙিন ছবির রূপকার হয়েছে। লাল, সবুজ ও নীল আলোর বিভিন্ন সমবায়ের মাধ্যমে সবরকম রঙই কাগজের ওপর ফুটিয়ে তোলা যাচ্ছে। ওদিকে ইংলণ্ডে J. H. Dallmeyer ৫০° কৌণিক ক্ষেত্র সম্বলিত এফ-৮ লেন্স প্রবর্তন কবলেন সেই সময়। ১৮৭০ সাল নাগাদ ম্যাগনেসিয়ম পাউডার ব্যবহার করে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে ভূগর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্রের ছবি তুলে প্রথম পরীক্ষামূলক আলোকচিত্রীর সম্মান পেলেন প্যারিসের নাদার। এমনকি সংবাদপত্রে আলোকচিত্রের ব্যবহারের ব্যাপারেও নাদারের নামটাই প্রথমে আসে।

১৮৮০তে টুইন লেন্স ক্যামেরার প্রচলন হল এবং ১৮৮২তে সিঙ্গল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরার পেটেন্ট নিলেন S.D. Mckeller। ১৮৯০ সালে প্যানক্রোমেটিক ফিল্ম বাজারে এল, যাতে উজ্জ্বল রঙ উজ্জ্বলভাবেই প্রতিভাত হত। ১৮৯২তে ক্রোমোস্কোপ নামে বহন যোগ্য ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে রঙিন ছবি দেখার সৌভাগ্য ঘটল। ১৮৯৩তে এল ট্রিপলেট লেন্স। জনৈক H.D. Taylor ২টি পজিটিভ ও একটি নেগেটিভ লেনস্ একসঙ্গে ব্যবহার করে শক্তিশালী ট্রিপলেট লেনস্ গঠন করলেন। একই সময়ে John Joly রঙিন ছবির জন্য তিনটি পৃথক নেগেটিভের বদলে একটিমাত্র নেগেটিভ দিয়েই যুত পদ্ধতিতে রঙিন ছবি তুলতে শুরু করলেন।

১৮৯৫তে ফ্রান্সে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় সিনেমাটোগ্রাফের প্রবর্তন করেন। আলোকচিত্রের আবিষ্কারের পঞ্চান্ন বছরের মধ্যে আরেকটি নতুন প্রাযুক্তিক মাধ্যম — চলচ্চিত্রের আবির্ভাব থেকে বোঝা যায় প্রযুক্তির অগ্রগতি হচ্ছিল কত কম সময়ে এবং দ্রুততার সঙ্গে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে চিত্রগ্রহণের আধুনিকীকরণের স্বার্থে আবিষ্কৃত হল ৩৫ মি.মি ক্যামেরা। এল লাইকা, রোলিফ্লেক্সের মত নামকরা ব্র্যান্ড। ৩৬টি ছবি তোলার রোল ফিল্ম f4.5/50°

আলোকচিত্রের দেড়শ বছর : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

বিতান ভট্টাচার্য

"ফটোগ্রাফি কোন শিল্প নয়, তা একটা ভাষা, একটা নিরপেক্ষ ব্যবহারিক মাধ্যম। ভাষার সাহায্যে তৈরি করা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, সরকারি স্মারকলিপি, প্রেমপত্র, বাজারের ফর্দ ও বালজাকের প্যারিস। তেমনি ফটোগ্রাফির সাহায্যে তৈরি করা যেতে পারে পাসপোর্ট ছবি, আবহাওয়ার ফটো, যৌনচিত্র, এক্স-রে প্লেট, বিবাহের ছবি ও Atgetএর প্যারিস। শব্দের ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহার অনুসারে অর্থ, ফটোগ্রাফও তেমনি, একই ছবি আর্ট গ্যালারিতে, রাজনৈতিক সভায়, পুলিসের ফাইলে, আলোকচিত্রের পত্রিকায়, সাধারণ সংবাদপত্রে, বইএর ভেতর, বসার ঘরের দেওয়ালে, কোথায় ও কীভাবে দেখা হচ্ছে সেই অনুসারে অর্থ পায়।"

বিশ্বের প্রখ্যাত আলোকচিত্র সমালোচক সুজান সোনটাগ তাঁর *অন ফটোগ্রাফি* বইটিতে আলোকচিত্র প্রসঙ্গে এই অভিমত পোষণ করেছেন।

বিশ্বের প্রাচীনতম যে ফটোগ্রাফি প্লেটটি পাওয়া গেছে তার বয়স আনুমানিক ৭ কোটি বছর। সম্প্রতি 'নেচার' পত্রিকায় এর বিবরণ দিয়ে জনৈক ভূ-তত্ত্ববিদ লিখেছেন ফ্রান্সের এর পাহাড়ের গুহায় এই আলোকচিত্রের সন্ধান মেলে যার ক্যামেরা প্রকৃতি নিজেই।

আজকে, এই ল্যাপটপের যুগে, যে আলোকচিত্রকে বাদ দিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব, তার বয়স খুব জোর দেড়শ বছর। ১৮৫৬ সালের ২৮ জুন 'দ্য ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল — উইলিয়ম হেনরি ফক্স ট্যালবটকে ১৮৪০ সালে লেখা একটি চিঠিতে প্রথম 'ফটোগ্রাফি' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন ইংলন্ডের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ এবং রসায়নবিদ স্যার জন হার্শেল। প্রসঙ্গত, ১৮৩৯ সালে ফক্স ট্যালবট ইংলন্ডের রয়্যাল সোসাইটিতে একটুকরো কাগজের ওপর সিলভার ক্লোরাইড (AgCl) লাগিয়ে, তার ওপর যেকোন ছোট জিনিস রেখে আলো ফেলে কিভাবে নেগেটিভ (এখন যাকে ফটোগ্রাম বলে) করা যায় তা দেখিয়েছিলেন। স্যার হার্শেল কথাটি পেয়েছিলেন দুটো গ্রিক শব্দ — ফটো অর্থাৎ আলো এবং গ্রাফ কথার অর্থ অঙ্কন একত্রিত করে। আমরাও ঐ অর্থ অনুসারে বাংলা প্রতিশব্দ করেছি 'আলোকচিত্র'। আক্ষরিক অর্থে আলোর সাহায্যে অঙ্কন।

আধুনিক আলোকচিত্রের সূচনার সময় ১৮৩০ এর পরপরই ধরা যায়। প্যারিসের বিখ্যাত দৃশ্যাঙ্কন শিল্পী জ্যাক ম্যাত দাগ্যের আলোক সম্পাত নিয়ে কাজ করছিলেন। সিলভার আয়োডাইড লাগানো তামার পাতে ছবি তোলার পদ্ধতি ইনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। দাগ্যেরোটাইপ ছবি সে সময় আলোকচিত্রের একটা প্লাটফর্ম তৈরি করেছিল।

এই ছবি তুলতে প্রায় পনেরো মিনিট সময় লাগতো।

১৮৪০-এ ইংলন্ডে সিলভার ব্রোমাইডের ব্যবহার আমেরিকাতে ক্যামেরায় রিফ্লেক্স আয়না, হাঙ্গেরিতে মেনিস্কাস লেনসের বদলে দূর নিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী লেনস্ বিশ্বের আলোকচিত্র জগতে একটা যুগান্তর ঘটালো।

দাগ্যের, ফক্স, নীপস্ এর গবেষণার থেকে স্বতন্ত্র এক প্রচেষ্টা এবং গবেষণার দাবি রাখেন 'হাইপোলাইট বায়ার্ড।' তার ছবির নাম ফটোকেমিক্যাল ড্রয়িং। ১৮৫১ সালে আলোকচিত্রে আবার বিপ্লব ঘটালেন ফ্রেডরিক স্কট আর্চার। তাঁর আবিষ্কৃত 'ও এই কলোডিয়ন পদ্ধতিতে পটাসিয়াম আয়োডাইড এবং কলোডিয়ন, সিলভার নাইট্রেটে ডুবিয়ে সিক্তাবস্থায় ছবি তুলে ভালো ফল পেলেন আর্চার। তারপর প্রায় বছর তিরিশেক এই পদ্ধতি টিঁকে ছিল।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আলোকচিত্রেও ক্রমবিবর্তন ঘটতে লাগলো। ধাতুর পাতের জায়গায় প্রিন্ট এর জায়গা নিল এ্যলবুমেন মাখানো কাগজ। ফ্রান্সে ততদিনে রঙিন ছবি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। ম্যাক্সওয়েলের ত্রিবর্ণতত্ত্ব রঙিন ছবির রূপকার হয়েছে। লাল, সবুজ ও নীল আলোর বিভিন্ন সমন্বয়ের মাধ্যমে সবরকম রঙই কাগজের ওপর ফুটিয়ে তোলা যাচ্ছে। ওদিকে ইংলন্ডে J. H. Dallmeyer ৫০° কৌণিক ক্ষেত্র সম্বলিত এফ-৮ লেন্স প্রবর্তন করলেন সেই সময়। ১৮৭০ সাল নাগাদ ম্যাগনেসিয়ম পাউডার ব্যবহার করে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে ভূগর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্রের ছবি তুলে প্রথম পরীক্ষামূলক আলোকচিত্রীর সম্মান পেলেন প্যারিসের নাদার। এমনকি সংবাদপত্রে আলোকচিত্রের ব্যবহারের ব্যাপারেও নাদারের নামটাই প্রথমে আসে।

১৮৮০তে টুইন লেন্স ক্যামেরার প্রচলন হল এবং ১৮৮২তে সিঙ্গল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরার পেটেন্ট নিলেন S.D. Mckeller। ১৮৯০ সালে প্যানক্রোমেটিক ফিল্ম বাজারে এল, যাতে উজ্জ্বল রঙ উজ্জ্বলভাবেই প্রতিভাত হত। ১৮৯২তে ক্রোমোস্কোপ নামে বহন যোগ্য ম্যাজিক লন্ঠনের সাহায্যে রঙিন ছবি দেখার সৌভাগ্য ঘটল। ১৮৯৩তে এল ট্রিপলেট লেন্স। জনৈক H.D. Taylor ২টি পজিটিভ ও একটি নেগেটিভ লেনস্ একসঙ্গে ব্যবহার করে শক্তিশালী ট্রিপলেট লেনস্ গঠন করলেন। একই সময়ে John Joly রঙিন ছবির জন্য তিনটি পৃথক নেগেটিভের বদলে একটিমাত্র নেগেটিভ দিয়েই যুত পদ্ধতিতে রঙিন ছবি তুলতে শুরু করলেন।

১৮৯৫তে ফ্রান্সে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় সিনেমাটোগ্রাফের প্রবর্তন করেন। আলোকচিত্রের আবিষ্কারের পঞ্চান্ন বছরের মধ্যে আরেকটি নতুন প্রাযুক্তিক মাধ্যম — চলচ্চিত্রের আবির্ভাব থেকে বোঝা যায় প্রযুক্তির অগ্রগতি হচ্ছিল কত কম সময়ে এবং দ্রুততার সঙ্গে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে চিত্রগ্রহণের আধুনিকীকরণের স্বার্থে আবিষ্কৃত হল ৩৫ মি.মি ক্যামেরা। এল লাইকা, রোলিফ্লেক্সের মত নামকরা ব্র্যান্ড। ৩৬টি ছবি তোলার রোল ফিল্ম f4.5/50°

লেন্স, MQ ডেভেলপার। বিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় আলোকচিত্র মাধ্যমের সার্বিক বিশ্বায়ন ঘটলো বলা যায়। হাল আমলে ক্যামেরার আরো প্রযুক্তিগত উন্নতি হয়েছে। Nikon, Canon প্রভৃতি কোম্পানি অটো ক্যামেরা ও ডিজিটাল ক্যামেরার প্রচলন করেছে।

আলোকচিত্রের কথা বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই আলোকচিত্রীদের কথাও চলে আসে। আলোকচিত্রের পরিব্যাপ্তির গোড়ার দিকে এর ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা ছিল শুধুমাত্র কপিওয়ার্কেই। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আলোকচিত্রের শিল্পগত ও তথ্যগত ব্যবহার নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হল। স্বাধীনচেতা আলোকচিত্রী হাইনের অভিমত এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক — তাঁর ক্যামেরার দরকার সেই কথা বলার জন্য, যে কথা তিনি শব্দ দিয়ে বলতে পারেন না। তাঁর মত বাস্তববাদী আলোকচিত্রীর ছবিতেও কখনো কখনো কবিত্বের আভা লেগেছে — একরাশ গাঁটরি আর শিশুপরিবৃত বিষণ্ণ ম্যাডোনাদের ছবি যেন মহাকাব্যের গাথা।

রজার ফেন্টন -এঁর তোলা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ছবি তথ্য সমৃদ্ধ এবং যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বীরত্বের দ্বিমুখী আবেদন স্পষ্ট। প্রথম ভূতাত্ত্বিক আলোকচিত্রী টিমোথি ও সুলিভানের ছবির বৈশিষ্ট্য এক সম্মোহিনী আবেদন। ক্যামেরায় ডবল এক্সপোজারের আবিষ্কর্তা গুস্তভ রেজল্যান্ডার একই সঙ্গে ফটো মনতাজের মত শিল্পেরও আবিষ্কর্তা। ফটো মনতাজকে একটা প্লাটফর্ম দিয়েছিলেন জন হার্টফীল্ড। হার্টফীল্ডের সৃষ্টিকে ব্রেখট বলেছিলেন ক্লাসিক। প্রথম চিত্র সাংবাদিক নাদার হলেও তার আধুনিক রূপকার ডব্লিউ ইউজিন স্মিথ। আরেকজন বিখ্যাত আলোকচিত্র সাংবাদিক হলেন উইলিয়াম ম্যাকে। ছবি তুলতে গিয়ে তিনি গুন্ডাদের হাতে আক্রান্ত হন ও দৃষ্টি শক্তি হারান।

আলোকচিত্রী হিসেবে আর যার নাম না করলেই নয় তিনি হলেন ডরোথি ল্যাং। ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার বলতে যা বোঝায় ল্যাং ছিলেন তাই। শারীরিকভাবে তিনি প্রতিবন্ধী ছিলেন। তাঁর মতে এই প্রতিবন্ধকতাই তাঁকে আলোকচিত্রী করে তুলতে সাহায্য করেছে। হাইন যদি হন সমাজ সচেতন আলোকচিত্রী তবে ল্যাংকে বলা যেতে পারে সমাজ বিজ্ঞানী আলোকচিত্রী।

Robert Doisneak ছিলেন কার্টুনিস্ট ফটোগ্রাফার। তাঁর ক্যামেরা কঠিন বাস্তব কিংবা চরম সত্যকে নিয়েও ব্যঙ্গ করতে পারতো।

বিশ শতকের আরেকজন বিখ্যাত আলোকচিত্রী, ফ্রান্সের আঁরি কারটিয়ার-ব্রেঁস। পরিমিত, সংবেদনশীল ও অনুভূতি গ্রাহ্য আলোকচিত্রের জন্য তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। ব্রেঁস এর ছবি-চোখকেও অবাক করে আলোর ব্যবহার আর অসম্ভব সুন্দর কম্পোজিশনের জন্য। প্রতিকৃতির ছবির জন্য বিখ্যাত হয়ে গেছেন ইউসুফ কাস। চুরুট হাতে চার্লি চ্যাপলিনের দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর অনবদ্য উদাহরণ।

এরকম হাজারো নাম রয়েছে আলোকচিত্রীর। এরমধ্যে কেউ পরিচিতির শিরোনামে এসেছেন। কেউ বা অখ্যাতই রয়ে গেছেন চিরকাল। তবু দেড়শ বছরে আলোকচিত্রের অঙ্গনে পরিবর্তন এসেছে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারবার। কখনো-কোন সমাজ একে সোৎসাহে গ্রহণ করেছে আবার কখনো বাঁকা চোখে বোঝবার চেষ্টা করেছে যে এটা বিজ্ঞানের কি রকম দান! একই সময়ে ইউরোপে ফটোগ্রাফির ব্যবসা চলছে Camera dose not Lie বলে আর সাগর পারের মহাদেশ আমেরিকাতে একই ব্যবসা চলেছে Camera Can Lie বলে।

ধীরে ধীরে মানুষ এই ক্যামেরাকেই ঘর গেরস্থলীর আর পাঁচটা আসবাবের তালিকাতে নিয়ে এসেছে। ফটোগ্রাফিও তাই সহজলভ্য হয়ে গেছে।

আলোকচিত্রের ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, এ'একটা অদ্ভুত বিষয়। বিশ্বের যে কোন মাধ্যমে কাজ করতে গেলে তার ইতিহাস জানা প্রয়োজন। চিত্রশিল্পী হতে গেলে নন্দলাল, যামিনী রায়কে জেনে তবে কিছু সৃষ্টির পথ খোঁজা হয়। সাহিত্যিক মানুষ রবীন্দ্রনাথ পড়েননি এমনটা হয় না। কিন্তু জোর গলায় বলা যায় বিশ্বের ৯০ শতাংশ আলোকচিত্রী ফটোগ্রাফির গোড়ার কথা না জেনেই নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। কারণ আলোকচিত্র বিজ্ঞান নির্ভর এবং এর ভাষা বিশ্বের যে কোন প্রান্তের মানুষ বুঝতে পারেন, উপলব্ধি করতে পারেন।

শুরু করেছিলাম সুজান সোনটাগের কথা দিয়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা আর ফিলম্ এর আধুনিকীকরণ আর ফটোগ্রাফির দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্যে দাঁড়িয়েও অখ্যাত এক ফটোগ্রাফারের একটি পোড় খাওয়া তিক্ত মন্তব্যই সব থেকে বড় সত্যি হয়ে আছে আজও —

"With both feet in shit, one hand in the fire, the other in water, and my head in the clouds, I am presently proceeding into the future, which could just as well be the past."

রবীন্দ্র নাটকে ইতিহাস চেতনার প্রতিফলন

স্রবন্তী বসু

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকারের জীবন দীর্ঘ ষাট বছরের। নানা ধরণের ও নানা শ্রেণীর নাটক তিনি লিখেছেন। এই রচনায় সেই সমগ্র নাট্য সম্ভারের আলোচনা সম্ভব নয়। আমি শুধু কয়েকটি নাটককেই বেছে নিয়েছি — যেখানে সাধারণ মানুষ তার পরিবেশ, কাল, দেশ পরিস্ফুট। স্বদেশ ও বিশ্ব সঙ্কটের আভাস আছে যে সব নাটকে সে সব নাটকের মধ্যেই তাঁর ইতিহাস চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে বলেই বিশ্বাস করি।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রচনা — একটা পুরনো ধ্যান ধারণা নিয়ে অনেককাল প্রবাহিত থেকেছে। হালে আর এক প্রবণতা দেখা দিয়েছে যে তিনি কতটা মার্কসবাদী ছিলেন সেটা প্রমাণ করা। দুপক্ষই নিজের নিজের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেন রবীন্দ্রনাথকে, তাতে অনেক সময় ভ্রান্তি দেখা দেয়। অথচ আমরা তো জানি তিনি সচেতন শিল্পী। তিনি ইতিহাস সচেতন। তিনি যেভাবে ভারত ইতিহাসকে জেনেছেন, কেমন করে তাঁর নাটকে এসেছে সেটাকে আমরা যাচাই করতে চাই। তাঁর নাটকে ইতিহাসের ঘটনা আসেনি, এসেছে একটা প্রবণতা — এবং সে প্রবণতা ইতিহাসের নানা পর্বের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে — সেই দ্বন্দ্বের স্বরূপ নির্ধারণের প্রবণতা। এই কথাটা মনে রেখেই তাঁর ইতিহাসবোধ কাদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তার একটা হদিস পাওয়া যাবে তাঁকে উদ্ধৃত করে — "দেশের উপর দিয়ে রাজ্য সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজায় রাজায় নিয়তই রাজস্ব নিয়ে হাত ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন কাড়াকাড়ি করতে লাগলো, লুঠপাট অত্যাচারও কম হলো না, কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে....দেশ ছিল দেশের লোকের; রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র।" রবীন্দ্রনাথের কালে তাঁর পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক নাটকে রাজার মুকুটকেই বড় করে দেখিয়েছেন। রাজায় রাজায় যুদ্ধই ছিলো তাদের নাটকের মূল বিষয়। রবীন্দ্রনাথ তা মানেননি। তাঁর চিরদিনের বিশ্বাস ছিলো ভারতবর্ষে ও চীনে চিরদিনই রাষ্ট্রতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্রই প্রবল। সমাজের সাধারণ মানুষই ইতিহাস তৈরি করেছে। তাই তাঁর নাটকের সাধারণ মানুষেব মধ্যে দিয়ে কেমন করে ইতিহাসকে বোঝা যায় সেটাই আমার রচনার বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসবোধ সমাজ, দেশ, কাল ও বিশ্ববোধের সঙ্গে অন্বিত। শুধুমাত্র পল্লীপ্রকৃতি নয়, পল্লীর মানুষের সঙ্গেও তাঁর একটা নিবিড় যোগাযোগ ছিলো। ১৮৯১-এ পৈত্রিক জীবিকার সূত্র ধরেই তিনি এই যোগাযোগ পাকাপাকি করেন। চিনতে

পারেন 'আপন পরিবেশের মানুষগুলিকে' এই পরিচয়ের সুবাদে তিনি চিনলেন দেশকে — দেশের স্বরূপকে। ফলে স্বভাবতই তাঁর রচনায় এর প্রভাব পড়েছিল। প্রথমত ছোটো গল্পে পল্লীবঙ্গই মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। এক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষের সুখ দুঃখের কথা বলা হলো। কিন্তু শিল্পীর নৈপুণ্যতা কখনই আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ থাকতে পারে না, এবং এই বেড়া ভাঙ্গার কাজটা বেশি করে দেখতে পাওয়া যায় নাটকে। কেননা নাটকের মাধ্যম ভেদে মানুষগুলির স্বরূপ নির্বিশেষ চেহারা পায়। সমাজের অন্তর স্পর্শ করতে নাটকে সততার চর্চা করতে হবে — এখন একটা বোধ রবীন্দ্রনাথের নাট্যচর্চায় স্পষ্ট। সে সততা যে ইতিহাসভিত্তিক পৌরাণিক কাহিনীর অন্ধ অনুসরণ নয়, উপরন্ত বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রূপে পরিস্ফুট হবে - একথাটাও আমরা লক্ষ্য করবো রবীন্দ্র নাটকে। সেটাই নির্মীয়মান ইতিহাস। রবীন্দ্র নাটকে তাই পুরাকাল বর্তমানের প্রেক্ষিতে এসেছে। প্রাথমিক পর্বে পল্লী মানুষ এলেও পরবর্তী পর্যায়ে তারা নির্বিশেষ চেহারা পায়। ধর্মের রশিতে মেয়েদের যুক্ত করার সঙ্গে এই ভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাটকে পল্লীর মানুষেরা এলেও বাঙলা রঙ্গমঞ্চে তখন 'প্রতাপাদিত্য', 'প্রতাপসিংহ'-র রমরমা। রবীন্দ্রনাথ পল্লীচিত্রের মধ্যে রাষ্ট্রকে ইতিহাসের সংঘাতকে কখনই অস্বীকার করেননি। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে অতিক্রম করে গেছে মানব জীবনের সুখ দুঃখের ইতিহাস। এবং এই সাধারণ মানুষের জীবনের পশ্চাদপটেই নাটকে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের ঘাত প্রতিঘাত চলে এসেছিল। সুতরাং বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের দেশভাবনাকে নানাজনের সমাগমে যাচাই করে নীচে সামাজিক মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এইখানেই ইতিহাসের ছায়াপাত ঘটেছে।

১৯০৫ সালে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। এক্ষেত্রে বলা যায় পল্লীবাংলার অবস্থা, সেখানকার মানুষের অবস্থা প্রত্যক্ষ না করলে বোধহয় নাগরিক মানুষ হিসেবে আর পাঁচজনের মতো তিনি সেই আন্দোলনের প্রবাহের মধ্যে থেকে যেতে পারতেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পর্বের একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলছেন — "আজকাল আমরা রাষ্ট্রনৈতিক তপস্যাকেই মুক্তির তপস্যা বলে ধরে নিয়েছি।" অগঠিত সমাজে অসম্পূর্ণতার সঙ্কট তাঁবে বেশি করে ধাক্কা দিয়েছিল। তাই উত্তেজনার চেয়ে উদ্বোধনের কাজকে শ্রেয় জ্ঞান করলেন। পরের পর্বের নাটকে তার আভাস দেখতে পাওয়া যায়।

১৮৮৯-এ তিনি লিখলেন "রাজা ও রানী" দ্বিতীয় দৃশ্যেই আমরা দেখতে পাবো গ্রামীণ কৃষক, কামার, জেলে, তাঁতী যারা নিশ্চল অর্থনীতির স্বাক্ষর। এই স্থানু সমাজের আচার আচরণ, কূপমন্ডুকতার চেহারা এসেছে তাঁর নাটকে। এখানে তিনি ইতিহাসের দায় বহন করেছেন। প্রথম দিকের নাটক 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। আবার 'পরিত্রাণ', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'রথের রশি',

'তাসের দেশ' - এ সমস্যা পালটে গেছে। সাধারণ মানুষেরও পরিবর্তন হয়েছে। রক্তকরবীতে আসে নন্দিনী ও দুর্ভাগ্য পল্লীর মানুষ বা শূদ্রের দল আর তাসের দেশে জীবন মরণ ঝড়ের চঞ্চলের দল, যারা বাধ্যতামূলক আইনের বেড়া ভাঙতে প্রস্তুত।

রবীন্দ্রনাটকে প্রথমদিকে সাধারণ মানুষের কথা আসে রুদ্রচন্ড নাটকে। এক পথিকের বক্তব্যের মাধ্যমে সহজেই বোঝা যায় নগর ও গ্রামের বিস্তর ফারাকের কথা। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনে গ্রাম ও নগরের ব্যবধানকেই এখানে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরতে চেয়েছেন। ঊনিশ শতকে বাঙালী ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যের মাধ্যমে কলকাতাকে মহানগরী হিসেবে গড়ে তুললেও গ্রামীণ শ্রীবৃদ্ধিতে কলকাতা কোনো সহযোগিতা করেনি।

'প্রকৃতির প্রতিশোধে যে মানুষ আসে শুরু থেকেই বোঝা যায় তারা যে রাজত্বে বাস করছে তা মোটামুটি স্বচ্ছল। তাদের ভূমিকা আনন্দ সঞ্চারে। মানুষের ভিড় আনন্দ বিতরণ করলেও দেখা যায় সংস্কারের নানান বাঁধনে তারা আবদ্ধ।

পরবর্তী নাটক 'রাজা ও রানী' সেখানে প্রজাদের চেহারা অন্য। পেটের জ্বালা, অরাজকতার ক্ষোভ একদিকে আর একদিকে প্রজাদের বিদ্রোহ, গণ আন্দোলনের প্রকৃতি এই নাটকে জলন্ধর ও কাশ্মীরের প্রজাদের দৃশ্যে তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটু গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে এই নাটকের সাধারণ পল্লীর মানুষ কাল্পনিক ইতিহাস আশ্রিত হয়েও বর্তমানের। নাটকের বিদেশী আমলারা ব্রিটিশ শাসকের প্রতিভূ। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে নীলবিদ্রোহ বা পাবনার বিদ্রোহ, মহারানীর শাসনের চেহারা মুছে যায়নি। ১৮৯২ তে মে মাসের পার্লামেন্টারি রিটার্ন অনুযায়ী মোট খাজনা আদায়ের প্রায় অর্ধেক ইংলন্ডের রাজকর্মচারীদের ও রাজভান্ডারে জমা হয়। ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে এই লুটের পরিমাণ চারগুণ বেড়ে যায়। তাই নাটকেও মন্ত্রীর জবানিতে দেখা যায় "বিদেশীর অত্যাচারে জর্জর' কাতর কাঁদে প্রজা"। এই নাটকে আমলাতন্ত্রের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন প্রজারা মহাজনদেরও আক্রমণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না।

শুধুমাত্র রাজার একাধিপত্যই নয়, পুরোহিতের দেবত্বের বিরুদ্ধেও ভারতবর্ষের যে বিদ্রোহ তাকে রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন নাটকের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট করে তুলেছেন। মানুষের ইতিহাস তো একটা গতিপথের মধ্যে দিয়ে চলে, সুতরাং সেই ইতিহাস যদি রবীন্দ্রনাটকে দেখা যায় তাহলে আজও নিঃসন্দেহে তার relevance আছে। এবং বিসর্জন নাটকের প্রাসঙ্গিকতা এইখানেই ; গোবিন্দমাণিক্য যখন বলে "হায় রঘুপতি। শেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল ধর্ম" সে মুহূর্তেই পাঞ্জাবের কথা মনে পড়ে যায়। যে কোনো মন্দিরের কথা মনে পড়ে যায়। প্রতি মুহূর্তেই তো এখন সৈন্য দিয়ে ধর্মকে ঘিরতে হচ্ছে। সেদিকে থেকে রবীন্দ্রনাথ ভীষণভাবে relevant।

সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা শুরু করেন "তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও ডালা মোটা করে গভর্ণমেন্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা

বীরত্ব বলে গণ্য করতেম। তখনকার পলিটিক্সের সমস্ত আবেদন ছিল ওপরওয়ালার কাছে — দেশের লোকের কাছে একেবারেই না।" এই দেশের লোকের কথা আসে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে। এখান থেকেই শুরু নির্মীয়মান ইতিহাস রচনার। পারিবারিক কাহিনীর মধ্যে আনলেন প্রজাবিদ্রোহের ইতিহাস। ১৯০৭ এ অরবিন্দ, বিপিন পালের সম্পাদনায় বন্দেমাতরম্, ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হল। ১৯০৮-৯ সালে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেলো বাঙলায়। প্রায়শ্চিত্ত নাটকেও নতুন সুর এলো "মেরেছে বেশ করেছে" এই নাটকেও ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে প্রজারা এগিয়ে যায়, কোনো আবেদন নিবেদন নয়, ঘোষণা করে "আমরা খাজনা দেবো না"। "আমরা রাজাকে মানিনে"।

১৯১০-এ লেখা হল "রাজা' নাটকটি। এ রাজার ধ্বজায় "পদ্মফুলের মাঝে বজ্র আঁকা"। চিমোহন স্নেহানবীশ "রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ" এ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ১৮৯১-৯২ তে অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর দুই ভাই বিনয়ভূষণ ও মনমোহন লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "Lotus and Drogger" সমিতিতে যোগ দেন। বলা যেতে পারে পদ্মফুলের সাংকেতিক চিহ্ন এই নাটকে ইতিহাসের ছায়াপাত ঘটিয়েছে। 'রাজা' নাটক আধ্যাত্মবাদের নাটক নয়। এখানে স্বদেশচিন্তা নেই একথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্বদেশের মুক্তির কথা সোজাসুজিভাবে বলা নেই। কিন্তু মুক্তির কথা আছে - অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের কথা আছে। এখানে "সবাই রাজা আমাদের এই রাজর রাজত্বে", এ তো গভীর গণতন্ত্রের আকাঙ্খা। পলিটিক্যাল ভিক্ষাকেও যেমন, তেমনি অতিশয় পন্থাকেও তিনি সদুপায় বলে ভাবেননি।

আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোরকে রবীন্দ্রনাথ সম্মান জানিয়েছেন 'প্রায়শ্চিত্ত' থেকে 'মুক্তধারায়' ও সর্বশেষ 'পরিত্রাণ'-এ। 'প্রায়শ্চিত্ত' বা 'পরিত্রাণ' নাটকে তিনি হয়তো ইতিহাস তৈরি করতে চাননি। কবির রচনার বিষয় অতীত কিন্তু প্রেরণা বর্তমান সেই বর্তমান ১৯০৬-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।

অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে গতিময়তার কথা বলা হয়েছে। ভেঙে ফেলে নতুনভাবে গড়ে তোলার শিক্ষাই ইতিহাসের শিক্ষা। ক্রমশ দেখা যায় 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'কালের যাত্রা'য় রবীন্দ্রভাবনার পরিবর্তন হচ্ছে। শুধুই দেশ নয়, এই ধরণের নাটকে দেশ ও বিশ্ব — এই দুইয়ের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্যাকে ধরতে চেয়েছেন। ক্রমশ নির্বিশেষ চেহারা পাচ্ছে তাঁর নাটক। এ ধরণের নাটকে আন্তরিকতা অনেক বেশি। প্রায়শ্চিত্তের উদয়াদিত্যের মতো মুক্তধারার অভিজিৎ নয়।

পাশ্চাত্য ইতিহাসের মানব বিরোধী ভূমিকা মুক্তধারাতে প্রকাশিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্র রাষ্ট্রকে কতটা স্বার্থকেন্দ্রিক করে তোলো — তাই রবীন্দ্রনাথ দেখতে চেয়েছেন এই নাটকে। উত্তরকূটের মানুষকে উগ্র জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে শিবতরাইয়ের মানুষদের দমনের নামে। নাটকে সমস্যার উত্থাপন করে তার পথ বলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ

যদিও তা সম্পূর্ণ নিজস্ব বিচারধারায়। মুক্তধারা নাটকেও সঙ্কটের স্বরূপ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ তার সমাধান খুঁজেছেন। ভবিষ্যতের ইতিহাস তো বিজ্ঞানের ব্যবহারে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতেই।

'কালের যাত্রায়' তাঁর বক্তব্য আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। অনগ্রসর মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত যান্ত্রিক সমাধান নেই। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসে চেতনা তাঁকে শিখিয়েছে এই যান্ত্রিক সমাধান একটা ওভার অর্গানাইজেশন গড়ে তুলবে। তাই উল্টোরথের পালাকে ঠেকাবার জন্যই ছন্দের জোরের কথা বলেছেন। ১৯৩৮-এ যৌবনের জয়গান গেয়ে লিখলেন 'তাসের দেশ' উৎসর্গ করলেন সুভাষচন্দ্রকে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসও তাঁর নাটকে প্রেরণা জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণ', 'মহাভারতকে' ইতিহাস বলে গণ্য করেছেন। 'কালমৃগয়া', 'বাল্মিকী প্রতিভা'র কাহিনী রামায়ণ থেকে সংগৃহীত। বৌদ্ধধর্ম একসময়ে ভারতীয় ইতিহাসে যে আলোড়ন তুলেছিল তার ছায়াপাত ঘটেছে 'মালিনী', 'নটীর পূজা', 'চণ্ডালিকা'-তে। মহাভারত থেকে 'চিত্রাঙ্গদা', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি নাট্যকাব্যের কাহিনী গৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কোনো উলবদ্ধি হঠাৎ হয়নি বিবর্তনের ধারায় তার নির্মাণ হয়েছে। গতিময়তাই জীবনের অনিবার্য ধর্ম — ইতিহাসের এই ধর্ম ফিরে ফিবে এসেছে তাঁর নাটকে। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন রবীন্দ্রচিন্তার দুটি প্রধান রক্ষীদের কথা - প্রথমটি সামাজিক ক্ষেত্রে লোকায়ত জীবন, দ্বিতীয়টি প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতা। সমস্যা সেখানেই যেখানে সর্বোপরি বলা হয় প্রথমত তাঁর নাটকে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রাধান্য পায়নি, দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাটকে গভীরতা থাকা সত্ত্বেও তা জনপ্রিয়তা অর্জন করছে না কেন ?

প্রথমত রাষ্ট্রতন্ত্র না থাকলেও দেখা গেছে মানবস্ত্রকে প্রাধান্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রিক প্রতিঘাতকে ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদের উদ্যোগটা দরকার ছিলো, আমরাই সেটা নিইনি। এছাড়াও সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক তুষ্টির বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ কোনোরকম ভিত্তি তৈরি করতে দেয়নি। আপন পারিপার্শ্বিককে বুঝতে পরিবেশভুক্ত ঘটনা, সময় মানুষকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে নানাভাবে এনেছেন। যেন বুঝতে চেয়েছেন নিজেকেই। নিজের কোনো তত্ত্বকেও এবং ইতিহাসকে। নির্মীয়মান ইতিহাস গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর নাটকে।

সারাংশ

ইতিহাস ঃ কী এবং কেন ? ভারতীয় সংবিত্তি

সুজিত কুমার ভট্টাচার্য

আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করছি যার সম্পর্কে সবারই একটা নিজস্ব ধ্যান-ধারণা বা বোঝাবুঝি আছে, আবেগ-কৌতুহল আছে, শ্রদ্ধা-ভালবাসা, কিংবা বিদ্বেষ-ঘৃণাও আছে। পান-বিড়ি বিক্রী করে যিনি জীবিকা-নির্বাহ করছেন থেকে জ্ঞান-বিদ্যা বিক্রী করে যিনি জীবন চালাচ্ছেন, অথবা রাষ্ট্র তরণীর কুলি-খালাসি থেকে কর্ণধার পর্যন্ত সবারই এ'সম্পর্কে কিছু না কিছু মতামত আছে। জনসম্পর্কের দিক থেকে বিষয়টিকে অনন্য, অদ্বিতীয় বলাই যায়। প্রতিটি ব্যক্তি থেকে শুরু করে পৃথিবীজোড়া সমগ্র মানবজাতিই এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুক্ত। এহেন বিষয় কখনো সমানভাবে সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে না। এবিষয়ের শেষ কথা বা একমাত্র কথাও কিছু হতে পারে না। আবার এই বিষয়ের সুস্থ বোধ বিকৃত বা রোগগ্রস্ত হলে সমগ্র মানবপ্রজাতির অস্তিত্বই ধ্বংসের কিনারায় চলে যেতে পারে। একথার প্রমাণ নাজিবাদ, ফ্যাসিবাদ ইত্যাদির ইতিবৃত্ত।

ইতিহাস ব্যক্তিমানুষ থেকে সমগ্র মানবজাতিরই জীবনের ভিতও বটে, আলেখ্যও বটে। ঠিক এখানেই এর গুরুত্ব। আবার এখানেই এর বিপদ। এটা ছাড়া যেমন মানবপশু থেকে মানুষের জীবনে ওঠা যায় না, আবার এটাকেই বিকৃত-বিবর্ণ-ক্রুঢ় নরঘাতী হাতিয়ার করে মানুষকে মানবপশুতে নামিয়ে দেয়া যায়। আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে ইতিহাসের বোধকে বিকৃত করে কুৎসিত প্রতারণা চলছে। গ্রাহাম স্টেইন্‌স্-এর নারকীয় হত্যা মানবতার উপর বীভৎস বলাৎকার-এর নমুনা যা আমাদের দেশকে সমগ্রভাবে আচ্ছন্ন করতে চাইছে ইতিহাসের ভুল বা অপব্যাখ্য করে। একইভাবে বিশ্বপরিসরে বিশ্বায়নী নয়া উপনিবেশবাদী কর্পোরেট পুঁজির একচ্ছত্র ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠার ওকালতিতে অর্থনীতি-ইতিহাস একইভাবে বিকৃত করা হচ্ছে। আমাদের দেশ-কাল এক মহাসঙ্কটে পড়েছে। মানুষের জীবন টিঁকে থাকবে কিনা এরকম সংশয় দেখা দিয়েছে।

অষ্টদশ শতাব্দী-উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার — সাধারণের সংস্কৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা

অনসূয়া দত্ত

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে উনবিংশ শতাব্দীর-প্রথম কয়েকটি বছর-কলকাতার ঔপনিবেশিক-সাংস্কৃতিক প্রবহমানতার প্রারম্ভিক কাল হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। নতুন নাগরিক পরিবেশ ও ইংরেজদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য কলকাতায় অর্থ

উপার্জনের পথ খুলে দেয়। এই সুযোগে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দোভাষী, দেওয়া ও বেনিয়া হিসেবে নিযুক্ত হয়ে সমাজের উচ্চস্তরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে আঠারো শতকের মধ্যভাগে বাংলার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় গ্রামাঞ্চলের বেশ কিছু মানুষকে নিয়ে চলে আসে ঔপনিবেশিক কলকাতায়। এঁরা সঙ্গে করে নিয়ে আসেন তাঁদের, গ্রামীণ ঐতিহ্যাশ্রয়ী আনন্দের ধারাগুলি — পাঁচালী, যাত্রা, কথকথা, নতুন ঝুমুর ইত্যাদি। কেউ কেউ তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে নাগরিক প্রমোদদানকারী হিসেবে নগরজীবনে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় সাহিত্য স্বভাবতঃই অর্থকরী হয়ে ওঠে — কবির দল করে গান শুনিয়ে অর্থোপার্জন একটা প্রয়োজনে পরিণত হয়েছিল।

স্থানীয় শাসকরা যে ভাবে স্থানীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হয়ে সমাজের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতেন, সেই ঐতিহ্যই কলকাতার নব্যধনীরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। নব্যধনীদের মধ্যে অনেকেই শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও টাকার জোরে তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ করেছিলেন। লোক কবিরা নব্যধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করলেও তাঁদের গানের মাধ্যমে নব্যধনীদের আচার আচরণ নিয়ে বক্রোক্তি করেছেন। জাতপাত অধ্যুষিত বাঙালী সামাজিক ব্যবস্থা যখন নব্যধনীদের টাকার জোরে ওলট পালট হয়ে গেল, লোক কবিরা সেটা মেনে নিতে পারেননি। খুব সম্ভবত শাস্ত্রোক্ত কলিযুগের ধারণা তাদের প্রভাবিত করেছিল। অন্যদিকে লোক কবিরা নিজেরাও কলকাতার নাগরিক ও একই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার শিকার হয়ে গিয়েছিলেন, তাই লোক কবিদের গানও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের কথা, তাদের রক্ষিতাদের কথা বার বার এসেছে।

নির্দেশিকা

১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'কবিজীবনী' ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত কলিকাতা ১৯৫৮।

২। রমাকান্ত চক্রবর্তী, 'বিস্মৃত দর্পণ' নিধুবাবু/বাংলা গান/গীতরত্ন, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ১৩৭৮।

৩। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি' বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি ১৩৭৯।

৪। দুর্গা দাস লাহিড়ী, 'বাঙালীর গান' কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩১২।

৫। হরিহর শেঠ, 'প্রাচীন কলিকাতা' ১৯৩৪।

৬। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলিকাতা কমলালয়া' কলিকতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

৭। ডঃ অতুল সুর, 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস', কলিকাতা ১৯৭৬।

৮। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সরস্বতীর ইতর সন্তান', অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০০১।

৯। Pradip Sinl 'Calcutta in Urban History', Calcutta 1978.

১০। Thankappan Nair, 'Calcutta in the 17th Cent. Vol I Calcutta 1986.

১১। Sumanta Banerjee, 'Nineteenth Century Calcutta Folk Culture', The Parlour and the Streets', Calcutta 1989.

১২। Rajyeshwar Mitra, 'Music in Old Calcutta, Calcutta the Living City' Vol I Past, Sukanta Chowdhury ed.

নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তাধারার পার্থক্য

মোঃ আবু তাহের চৌধুরী

বাংলার মুসলমানদের পুনর্জাগরণে যে কয়েকজন মনীষী বিশেষ অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান সমাজের এক সঙ্কটকালীন সময়ে এ দু'জন মহান নেতার আর্বিভাব ঘটেছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুতির পর মুসলমানরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ তাদের জন্য আরও দুর্যোগ বয়ে নিয়ে আসে। জাতীয় জীবনের এ সন্ধিক্ষণে মুসলমান সমাজকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, নবাব আবদুল লতিফ এবং সৈয়দ আমীর আলী। তাঁরা উভয়েই যুগের পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁদের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। উভয় নেতাই মুসলমান সমাজের উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতা এবং ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে মৌলিক উদ্দেশ্য এক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য ছিল। আবদুল লতিফ ও আমীর আলী উভয়েই তাঁদের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যথাক্রমে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি এবং সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে আবদুল লতিফ প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি ছিল একটি শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। অপরদিকে আমীর আলীর মোহামেডান এসোসিয়েশন ছিল মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবদুল লতিফ মাদ্রাসা শিক্ষা বহাল রেখেই মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। অপরদিকে মুসলমান ধর্মের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও আমীর আলী মাদ্রাসা শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষার উপর বিশেষ প্রাধান্য দেন। এ বিষয় নিয়ে উনিশ শতকের আশির দশকে আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর মধ্যে তীব্র মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে, আবদুল লতিফ ও আমীর আলী উভয়েই ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থেকে মুসলমন সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য এক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য ছিল। এঁদের মধ্যে আমীর আলী অধিকতর প্রাগ্রসর চিন্তার অধিকারী ছিলেন। আবদুল লতিফ ছিলেন রক্ষণশীল প্রকৃতির সংস্কারক।

ইতিহাস, সাহিত্য ও পরিচয়

সিদ্ধার্থ বিশ্বাস

The old forms of existence have worn out , so to speak, and the new ones have not yet appeared and people are prospecting as it were in the desert for new forms.

Saul Bellow[১]

always, always, tell the news through the people[২]

ইতিহাসের কাজ কি ? এই প্রশ্নের অনেক উত্তর হতে পারে। অতীতের অভিজ্ঞতা মানুষের সামনে তুলে ধরা, যে অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র ব্যবহারিক নয়, কেবলমাত্র নৈর্ব্যক্তিক নয়, যে অভিজ্ঞতা ভীষণভাবেই ব্যক্তিগত বা প্রাত্যহিক। তাত্ত্বিক বা পাঠ্যক্রমের বাইরেও ইতিহাসের এক অপরিসীম গুরুত্ব আছে, কারণ ইতিহাস মানুষকে ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক জীবনে তার পরিচয় নির্ধারিত করে দেয়। অতীত ছাড়া ভবিষ্যতের অস্তিত্ব পরিচয়হীন, আর মানুষ এমনই এক প্রাণী যা পরিচয় ছাড়া বাঁচতে পারে না। বর্তমানকে বোধগম্য করে তোলবার যে অবিরাম প্রচেষ্টা চলছে তাতে সবথেকে বড় সাহায্যকারী হল ইতিহাস। ঐতিহাসিক ই.এইচ. কার -এর মতে "অতীতকে আমরা বুঝতে পারি বর্তমানের আলোয়, আর বর্তমান বোধগম্য হয় অতীতের সাহায্যে। অতীতের সমাজকে বোঝা এবং বর্তমানকে আয়ত্বে আনা ইতিহাসের প্রধান দুই কাজ।"[৩]

পরিচয় সংক্রান্ত যে কোন আলোচনার আগে একটা বিষয় মনে রাখা উচিত— পরিচয় নিয়ে আলোচনা তখনই হয় যখন পরিচয় সমস্যার মধ্যে পড়ে। সঙ্কট ছাড়া পরিচয় নিয়ে আলোচনার ঘটনা বিরল। এই সমস্যা সৃষ্টি হয় তখনই নির্দিষ্ট কিছু ধ্যান-ধারণা বা কোনো নিশ্চয়তা বা অবশ্যম্ভাবিতা হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে সঙ্কট তৈরি করে। অর্থাৎ ইতিহাস যখন পথ পরিবর্তন করে তখনই এই সঙ্কট মানুষের জীবনে আসে। উদাহরণ হিসাবে কোবেনা মার্সার উল্লেখ করেছেন বর্তমান বামপন্থীদের অবস্থার, যারা পৃথিবী পরিবর্তনের স্বপ্নকে হারিয়ে যেতে দেখছেন, কিন্তু মেনে নিতে পারছেন না।[৪] তবে পরিচয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া সবসময়ই চলমান। পরিচয় কোন শাশ্বত বা চিরসত্য নয়, ইতিহাসের সাথে সাথে তাকেও পালটাতে হয়। কিন্তু যখন এর অনুচ্ছেদ বদলায় তখনই সমস্যা আসে।[৫]

পরিচয় ব্যক্তি ও ইতিহাসের মধ্যে এক অনন্য সম্পর্ক তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায়

সাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইতিহাস ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, ইতিহাস সমষ্টিকেন্দ্রিক। কোন সভ্যতা, সংস্কৃতি বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্বের কথা ও কাহিনী ইতিহাসের বিষয়। যদিও বর্তমানে ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু অতীতে ইতিহাস তৈরির সময় প্রচলিত অনেক কথা বা কাহিনী উপেক্ষিত হয়েছে তথ্য নামক বস্তুটির অভাবে। যা কোনদিনই সাধারণ মানুষের জীবনে এবং স্মৃতিচারণায় গুরুত্ব পায়নি।[৬] অন্য দিকে সাধারণ মানুষের ইতিহাসই সাহিত্যের বিষয়। কোন সময়ের সাধারণ জীবনযাত্রা, তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তখনকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিবরণ সাহিত্যের অঙ্গীভূত। তবে সবথেকে ব্যক্তিগত ফর্ম হল লিরিক। প্রথম চিন্তায় মনে হয় ইতিহাসের সাথে লিরিকের সম্পর্ক সবথেকে কম। কারণ লিরিখ সময়ের বন্ধনের উর্দ্ধে । যদিও মানুষের কঠিনতম কষ্ট, উদ্বেগ বা আশঙ্কার প্রতিফলন ঘটায় লিরিক। তাই লিরিক প্রাসঙ্গিক হয় কেবল তখনই যখন আমরা তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সচেতন। তা সব সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সত্যি। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে ইতিহাসের সাথে গদ্যের সম্পর্ক সবথেকে বেশি। কেবলমাত্র কাব্য বা মহাকাব্য ইতিহাসের কাছাকাছি আসে। কিন্তু নভেল বা গল্প ইতিহাসের বড় বন্ধু । অবশ্য নাটক ঐতিহাসিক কাব্যের আধারে হলেও হতে পারে। এইখানেই তথ্য আর ব্যক্তিগত ইতিহাসের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনার প্রয়োজন এসে পড়ে।

ফিরে আসা যাক আসল প্রসঙ্গে। গদ্যের মধ্যে পরিচয় ও পরিচয়-সম্পর্কিত আন্দোলনের, বা পরিচয় সঙ্কটের প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম বলা যেতে আত্মজীবনীকে। এই ধারা যে পরিচয় আন্দোলনের বড় অস্ত্র হতে পারে তার প্রমাণ আমেরিকা তথা সারা পৃথিবীতে কালো চামড়ার মানুষের সাহিত্য। পৃথিবীর অন্য কোন সংস্কৃতিতে আত্মজীবনী এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। (*গ্রেট ব্রিটেনের 'বিশিষ্ট' আত্মজীবনীর একটি তালিকা দিয়েছেন পিটার অ্যাব্‌স। এই তালিকার বৈশিষ্ট হল এতে ৩৪টি নাম আছে তার বেশির ভাগই সাহিত্যিকদের।*[৭] *অসাহিত্যিক আত্মজীবনীমূলক লেখা প্রায় নেই।)* বিশেষত আমেরিকাতে এই জাতীয় লেখা বিশেষ করে একটি উদ্দেশ্য সফল করতে লেখা হয় — সাধারণ জনসত্তার মধ্যে এক বৈপ্লবিক সচেতনতার জগৎ তৈরি করা। এই আত্মজীবনীগুলি অনেকাংশেই ইউটোপিয়ান একটা লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েছে। এই আন্দোলনে ধারাটি এতটা গুরুত্ব পেয়েছে তার কারণ অন্য সাহিত্যমূলক ধারার দৃপ্ততার অভাবে। পল গিলরয়-এর মতে পল রবসন, ম্যালকম এক্স বা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বার বার ব্যক্তিগত কাহিনী উপর নির্ভর করেছেন শুধুমাত্র অনুপ্রেরণা জোগাবার জন্য নয়, পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর অলোকপাত করবার জন্য এবং আলোচনা-সমালোচনা-বিতর্ক তৈরি করবার জন্যও।[৮]

অবশ্যই সময়ের সাথে সাথে এই জাতীয় তফাত বদলে যায়, কিন্তু আমরা যদি

শুরুর দিকে তাকাই তাহলে এই বিষয়ের সত্যতা সন্দেহাতীত হয়ে ওঠে। পরিচয়ের সমস্যা অবশ্য বদলাতে থাকেই। কালো চামড়ার সমস্যা অনেক সরল দেখতে হয়ে যায় যদি আমরা আমরা অন্য কিছু সভ্যতার কথা ভাবি। তার অন্যতম কারণ এই সমস্যার মূলে রয়েছে স্থানচ্যুতি বা ডিসলোকেশন। এরা, বা পরবর্তীকালে আরো অনেক ইমিগ্র্যান্ট, *আমেরিকান* নামটি অর্জন করতে পারেনি। এরা থেকেছে আফ্রিকান-আমেরিকান বা ব্ল্যাক-আমেরিকান বা Coloured হিসাবে। এই জাতীয় সমস্যার আর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলেন টি.ই.লরেন্স, যিনি *লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া* নামেই বিখ্যাত। এই রকম আরও উদাহরণ পাওয়া যায় ডিরোজিও-র ক্ষেত্রে। এই প্রসঙ্গে *জুলি* বা *Tandoori Nights* -এর কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। আর একটি উদাহরণ মনে পড়েছে, তপন রায়চৌধুরী *রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তির পরচরিতচর্চা,* যাতে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে 'রোমাই কার্ত্তিক' হওয়ার পরও কিছু মানুষ তাদের জাতি পরিচয় আঁকড়ে ধরে থাকে।

যদিও *অন্য সভ্যতা* কথাটা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাজনক হতে পারে তবু ভেবে দেখলে এখনও সারা পৃথিবী আসলে এক *আধুনিক* সভ্যতার অংশ নয়। পরিচয়ের ভিত্তিতে এবং আর্থ-রাজনৈতিক পৃথকীকরণের জন্য সারা পৃথিবীটাই একটা অদ্ভুত বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়ে রয়েছে —সেটা ভারতে হিন্দু-মুসলিম হোক আর ইজরায়েল-প্যালেস্টাইনের রক্তাক্ত রণাঙ্গনই হোক। এক আরেক রূপ দেখতে পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়া আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলোনি-কলঙ্ক মুছে আলাদা স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টায়। আর ধর্মভিত্তিক পরিচয় পৃথিবীতে একটা অভিশাপের রূপ নিয়েছে। সবথেকে ভয়ের ব্যাপার এই যে বৈষম্যবাদী শক্তিগুলি সাহিত্য থেকে শুরু করে ইতিহাস পর্যন্ত কব্জা করবার চেষ্টায় আছে। কারণ পরিচয় পরিবর্তন তাদের এক বড় অস্ত্র।

পরিচয় ব্যাপারটি কখনই অনমনীয় নয়। বরং এই দিক দিয়ে মেটাফরের সাথে এর মিল পাওয়া যায়। মেটাফর দুই জাতীয় চিন্তাধারার মধ্যে পারস্পরিক এক সম্পর্ক বা মিল খুঁজে বার করে— যাদের আমরা মুখ্য এবং সহায়ক উপাদান হিসাবে ধরতে পারি। মেটাফর সার্বিক গুণগুলি থেকে বেছে, কিছু অংশ ঢেকে দিয়ে, বাকিটা মনোযোগে এনে তারপর সমস্ত ব্যাপারটিকে সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তুলে ধরে। এর ফরে নতুন অভিজ্ঞতা আমরা পুরনো অভিজ্ঞতার আলোয় বিচার করতে পারি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের পরিচয় নির্ণয় করতে পারি।[৯] সুতরাং অতীতের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অতীতের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় ইতিহাস। সে জন্য সমাজের যে সমস্ত এরিয়াতে শিক্ষার বিস্তার কম সেখানেপরিচয় সংক্রান্ত সমস্যাও কম। ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন

ওয়েলফেয়ার স্টেট পলিসি চালু হয় তখন ভাঙা অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে তরুণ সমাজে এবং বুদ্ধিজীবী লেখক সমাজে এক অদ্ভুত ধারা দেখা যায়। এদের মধ্যে এক জাতীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় জন অস্বর্ণের *Look Back in Anger* নাটকে। এই নাটকের নায়ক জিমি পোর্টার এক প্রতিবাদী কণ্ঠের মানব-প্রতীকিকরণ। তার প্রতিবাদ সমাজের যাবতীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে—এবং তার প্রতিবাদের কারণ প্রায় নেই। সে তার নিজের জীবন নিয়ে অখুশি, তার ধারণা তার অবস্থা আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল, সে এক সাধারণ দোকানদার যদিও তার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি আছে। তার আক্রমণের অন্যতম জায়গা তার স্ত্রী, যে এক বড়লোক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। জিমির প্রতিবাদ হিংসার গন্ধে ভরপুর। অ্যালিসন-এর বাবা ও মা ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যবাদের শেষ অবস্থার প্রতীক, তারা সাম্রাজ্যের *অস্তগামী সূর্যের* আলোয় বড় হয়েছে এবং চিরাচরিচত ব্রিটিশ মূল্যবোধে বিশ্বাসী। জিমির কাহিনী বা কাহিনীর অভাব পঞ্চাশের দশকে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তালাভ করে। তৎকালীন তরুণ সমাজের - যে কোন সময়ের তরুণ সমাজেরই - মন জয় করবার এমন ঘটনা বিরল। সমকালে জিমির সমান্তরাল চরিত্র একমাত্র দেখা যায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, *Rebel Withour a Cause* নামক সিনেমায়।

এই জাতীয় চরিত্রকে সংজ্ঞাবদ্ধ করা যায় এক জায়গাতেই - যে জায়গা সংজ্ঞার সন্ধান করছে। অতীতের সমৃদ্ধ ইতিহাস আর বর্তমানের চূড়ান্ত দুরাবস্থার মধ্যে এরা সামঞ্জস্য আনতে পারে না। ফলস্বরূপ এরা ইতিহাসের , এবং বর্তমানে, এদের নিজের স্থান খুঁজে পায় না। তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বড় হয়েও এরা বৈষম্য দেখতে পায় — কেবলমাত্র সমকালীন সমাজব্যবস্থায় নয়, যে সমাজব্যবস্থা বস্তাপচা কিছু নিয়ম ও মানুষের দ্বারা চালিত — অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তা এদের ভবিষ্যতকে সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত করে তোলে। এখানেই এদের প্রতিবাদ।

জিমি পোর্টার বা তার সমসাময়িক সমান্তরাল চরিত্রগুলি পরিচয় সমস্যার সহজ উদাহরণ। ইংল্যান্ডে এবং ফ্রান্সে আমরা এর আরেক অভিপ্রকাশ দেখতে পাই। বলাই বাহুল্য এরা সম্পূর্ণ এক প্রজন্মের প্রতিনিধি। ফ্রান্সে কামুর লেখায় আমরা পাই যে *Outsider* বা *বহিরাগত* চরিত্রকে সে কলিন উইলসন -এর লেখায় ওই নামেই আবির্ভূত হয় প্রায় জিমি পোর্টারের সঙ্গেই । উইলসন আলোচনা করেছেন সাহিত্যে এই চরিত্রের আধিক্য সম্পর্কে। তিনি বলেছেন এই চরিত্রের প্রধান সমস্যা পরিচয়ের। এলিয়টের 'Hollow Men'- এর সাথে এদের তফাৎ হল এরা বাকিদের থেকে আলাদা। এরা নিজেদেরকে পৃথিবীর নামক কয়েদখানার মধ্যে আবিষ্কার করে, কিন্তু পালাবার চেষ্টা করে উঠতে পারে না। যখন জানতে পারে বাকিরা অন্য রকম। উইলসন লিখেছেন,

An astounding situation ! Imagine a large castle on an island, with almost inescapable dungeons. The jailor has installed every device to prevent the prisoners escaping, and he has taken on final precaution: that of hypnotizing the prisoners, and then suggesting to them that *they and the prison are one.* When one of the prisoners awakes to the fact that he would like to be free, and suggests this to his fellow prisoners, they look at him with surprise and say: 'Free from what " We *are* the castle. What a situation.[১০]

এক্সিস্টেনসিয়াল দর্শন এই চরিত্রদের জন্য নয়, এরা কখনই নিজেদের আলাদা একটা দ্বীপ বলে মনে করছে না। এই জাতীয় চরিত্র আমরা পাই হ্যারল্ড পিন্টারের নাটকে একাধিকবার। এই চরিত্রের বৈশিষ্ট একটিই—অতীতের সম্পূর্ণ অভাব। কেবল সামাজিক স্তরেই নয়, ব্যক্তিগত দিক দিয়েও আমরা এই চরিত্রের সাথে পরিচিতি হয়ে উঠতে পারিনা। এরা থেকে যায় রহস্যের অন্তরালে। যতটুকু জানা যায় তা যথেষ্ট নায়। পিন্টার এই চরিত্রদের সাথে আনেন আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ কিছু চরিত্রকে। যার ফলে এমন একটা বৈসাদৃশ্য তৈরি হয় যাতে আমরা এদের আরো মনোযোগ দিয়ে দেখতে পারি, যদিও নাট্যকার নিজে কোন জবাব দেননা। এদের সমগোত্রীয় না হওয়ার যন্ত্রণা এদের এগিয়ে নিয়ে যায় সমাজ তথা ইতিহাস থেকে দূরে, মাঝে মাঝে বিস্মৃতি বা নিষ্কৃতির পথে, অন্য সময় এই পথ শেষ হয় হিংস্রতায়।

উইলসন তাঁর বইটি শুরু করেছেন বার্নাডশ -এর *John Bull's Island* নাটকের চতুর্থ অঙ্কের এক কথোপকথন নিয়ে, আমি শেষ করছি সেটা দিয়ে ঃ

Broadbent: . . . I find the world quite good enough for me – rather a jolly place, in fact.

Keegan (looking at him with quiet wonder): You are satisfied?

Broadbent : As a reasonable man, yes. I see no evils in the world- except of course, natural evils -- that cannot be remedied by freedom, self-government and English intuitions. I think so, no because I am an Englishman, but as a matter of common sense.

Keegan : You feel at home in the world then ?

Broadbent: Of course. Dont You ?

Keegan (from the very depths of his nature): No.

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১. Saul Bellow, in conversation wiith Michael Ignatieff and Martin Amis, *Voices :Modernity and its Discontents*, Spokesman/Hobo Press, London, 1987. Quoted in ed. Jonathan Rutherford, *Identity .Community, Culture, Difference*, Lawrence & Wishart, London 1990.

২. Quoted by Colin Seymour-Ure, *The British Press and Broadcasting since 1945,* Oxford, 1991, p. 134.: Christiansen, *Headlines, Daily Express,* p 1.

৩. E . H. Carr : "The past in intelligible to us only in the light of the present; and we fully understand the present only in the light of the past. To enable man to understand the society of the past and to increase his mastery over the society of the present is the dual function of history." (http://www-history.aas duke.edu)

৪. Kobena Mercer, 'Welcome to the Jungle: Identity and Diversity in Postmodern Politics', ed. Jonathan Rutherford, *Identity . Community, Culture, Difference,* Lawrence & Wishart, London, 1990.

৫. Stuart Hall, 'Cultural Identity and Diaspora', *ibid.*

৬. Gary Day, Ed , *Literature and Culture in Modern Britian,* Volume Two: 1930-1955 , Longman, London and New York, 1997, P 2

৭. Peter Abbs , 'Autobiography: Quest for Identity' , *The New Pelican Guide to English Literature, Volume 8, The Present,* Penguin, 1983.

৮. Kenneth Mostern, *Autobiography and Black Identity Politics : Racialization in 20th Century America* (http//web utk.edu/~kmostern /auto.html).

৯. Harmeet Sawhney and Krishna Jayakar, *Universal Service ·Migration of Metaphors,* (copyright 1996, e-mail: haswhney@ucs.indiana.edu,kjayakar@indiana.edu).

১০. Colin Wilson, *The Outsider* , Indigo, London, 1997.

"সাংস্কৃতিক সমন্বয়, মুসলিম পটুয়া ও চৈতন্য মহাপ্রভু"

শেখ মকবুল ইসলাম

।। ১ ।।

মুসলমান সমাজের সংস্কৃতি, বিশেষত লোকংস্কৃতির ঐতিহ্যের দিকে খুব কম গবেষকই আলোকপাত করেছেন। এ বিষয়ে লোকসংস্কৃতির গবেষকদের কাছে অনেক বেশি প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু, লোকায়ত মুসলিম সমাজের সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ছবি খুব কম গবেষকের কলমে ফুটে উঠতে দেখি। গবেষণা কর্মে মুসলিম সমাজ সংস্কৃতির প্রতিফলন থাকলে, মুসলমান সমাজ ও তাদের চিন্তাধারা, সর্বসাধারণের অজ্ঞতার অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতো না। শুধুমাত্র পরস্পরকে জানার এবং বোঝার অভাব থেকে— মুসলমান সমাজের সঙ্গে অন্যান্য সমাজের দূরত্ব এখনও বজায় রয়েছে। এমনকি মুসলমান সমাজের কেউ উঠে এসে আপন-সমাজের সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্পর্কে সাধারণের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে — এমন লোকের সংখ্যাও খুবই অল্প। মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে, মুসলিম মানসের গভীরে লোকসংস্কৃতির যে উর্বর ধারা রয়েছে — তা তুলে ধরার প্রয়াস এই লেখক দু একটি প্রবন্ধে করেছেন (দ্রঃ ক.) অনুসন্ধান - ১৪ (প্রবন্ধ ঃ হাওড়া জেলার মুসলিম বিবাহ ঃ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের একটি দিক), (খ.) অনুসন্ধান - ১৫ (প্রবন্ধ ঃ মুসলিম বিয়ের গান ঃ সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ), (গ.) গবেষণা (প্রবন্ধ ঃ সাম্প্রদায়িকতা, লোকসংস্কৃতি ঃ তত্ত্ব ও তথ্য)। বর্তমান রচনাটিও সেই প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদে পঠিত বিষয়। বক্তৃতার তারিখ ঃ ২৫/১/২০০২।

মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি সম্পর্কে, অমুসলিম সমাজ বা মুসলিম সমাজ—উভয়েরই ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। অমুসলিম সমাজ মনে করে — ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, সব-ই-বরাত, মিলাদ-উন-নবী, মহরম (মূলত শোক পালনের অনুষ্ঠান) ইত্যাদি ছাড়া মুসলমানদের কোন সংস্কৃতি নেই! অন্যদিকে মুসলিম সমাজ যারা নিজেরাই বাংলার সংস্কৃতির শরিক হয়ে জীবন অতিবাহিত করে — তারাই আপন সংস্কৃতির বিশিষ্টতা সম্পর্কে অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন। সমস্যা হল - ধর্মীয় আচার কৃত্য ও সংস্কৃতিকে হুবহু এক করে দেখার যে অবৈজ্ঞানিক চিন্তা (Notion) সাধারণের মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে — তার থেকেই ধর্ম-সম্প্রদায় ভিত্তিক সমাজের সংস্কৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্ম হয়। ধর্মাচারও সংস্কৃতিরই অঙ্গ — কিন্তু সংস্কৃতির একমাত্র প্রতিবিম্বন নয়। যে মুসলমান — ঈদ বা সবেবরাত করে না তারই সংস্কৃতি আছে। যে হিন্দু দুর্গা পুজো - কালীপুজো করে না — তারও সংস্কৃতি আছে। বিশেষ বিশেষ ধর্ম - সম্পৃক্ত আচার - কৃত্যাদির বাইরে নির্বিশেষ মানুষের যে সংস্কৃতির পরিচয় বাংলায় মেলে — তার রূপস্থান ভেদে

ভিন্ন ভিন্ন হলেও — সব মিলিয়ে তার একটি অখন্ড স্রোত আছে। তাকে "মূল স্রোত" (main stream) বলা হবে নাকি শাখায়িত স্রোত বলা হবে — সে বিতর্ক বাদ দিলে আমরা দেখবো লোকায়ত বাংলার — লোকায়ত বাঙালীর — মনন ও আচরণের প্রাণ কেন্দ্রে এমন এক উদার ঐক্য চেতনা লুকিয়ে রয়েছে, যা প্রথাগত ধর্ম বিভাজনের শক্ত প্রাচীরকে নস্যাৎ করে দিতে সম্ভব। দেশের সাম্প্রদায়িক সঙ্কটের প্রেক্ষিতে এ হেন স্বতঃস্ফূর্ত সমন্বয়ের সত্য কখনও কখনও চাপা পড়ে গেলেও, এই সংহতিই সমাজকে ধরে রাখে। কাজে কাজেই সমন্বয়ী চেতনার ক্রিয়াশীলতা (Function) সমাজে দৃঢ়মূল এবং সুদুর প্রসারী।

সংহতিশীলতা বা সমন্বয়শীলতা লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রসাদগুণ। শিষ্টায়িত বা মান্যায়িত সমাজ যেখানে ধর্ম চেতানার দ্বারা আপন সাংস্কৃতিক মৈত্রকে সীমায়িত করে রাখার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে, সেখানে প্রায় অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকায়ত সমাজ কি হিন্দু, কি মুসলমান. কি খ্রিস্টান — এরা প্রত্যেকেই সমন্বয়শীলতার আত্মীকরণের মাধ্যমে তথাকথিত ধর্ম-নির্দিষ্ট সম্প্রদায় চেতনাকে অতিক্রম করে যায়। তাই, প্রথাগত পরিচয়ে যা "অন্য" ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত — তাকেও ব্যাপক হারে গ্রহণ করেছে লোকায়ত সমাজ। এটি একটি প্রক্রিয়া (process)। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে জন্ম নিয়েছে 'বাউল' - ভাবনা। বৌদ্ধ ও তন্ত্রের সমন্বয়ের ফলশ্রুতি বাংলাভাষার চর্যাপদ। হিন্দু - বৌদ্ধ সমন্বিত হয়ে তৈরি হয়েছে জগন্নাথ কাল্ট। বাংলার খ্রিস্টান সমাজ কীর্তনকে আত্মীকরণ করে যীশুর যে বন্দনা গান করে তাও সমন্বয়ী ক্রিয়াশীলতার দৃষ্টান্ত। (দ্রঃ খ্রিস্টজনসমাজ) এবং একই কারণে মুসলমান সমাজ ও বৈষ্ণব সমাজের নানাবিধ বিষয়কে তার সাংস্কৃতিক বৃত্তে আত্মীকরণ করেছে। এর বহু দৃষ্টান্ত মিলবে বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় মুসলিম পটুয়া ও চৈতন্য মহাপ্রভু।

পটুয়াদের বিস্তারিত পরিচয় প্রদান এখানে নিষ্প্রয়োজন। এদেশের বহু গবেষক পটুয়াদের ওপর কাজ করেছেন। গুরুসদয় দত্ত (দ্র ঃ Bengal/Dutta) শংকর সেনগুপ্ত (দ্র ঃ Bengal/Sengupta) বিনয় ভট্টাচার্য (দ্র ঃ Oscillation/Bhattacharjee) এম. কে. এ. সিদ্দিকী (see : Calcutta/Siddiqui) সুহৃদ কুমার ভৌমিক (see : Bengal/ Bhowmik) সরোজিৎ দত্ত (Paintings of Bengal/Dutta) —এঁরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পটুয়াদের ওপর আলোকপাত করেছেন। তবে একেবারে সাধারণ পরিচয়ে পটুয়ারা হলেন চিত্রশিল্পী। রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ অথবা প্রচলিত কোন কাহিনী বা ঘটনা অবলম্বনে এরা অনেকগুলি ছবি আঁকে এগুলিকে পটচিত্র বলে। ছবিগুলোর মধ্যে দিয়েই কাহিনীকে দৃশ্যায়িত করা হয়। পটুয়ারা ছবিগুলি গ্রামে গ্রামে দেখার এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটিকে গান হিসেবে গেয়ে থাকে। গোটা ব্যাপারটাই একটা দৃশ্য - শ্রব্য (Audio -visual) উপস্থাপনা। পশ্চিম বাংলার মূলত মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম,

বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ইত্যাদি জেলায় পটুয়ারা এখনও রয়েছে। ধর্মগত দিক থেকে এরা পরিচয়ের পরিবর্তনশীলতা (Shifting Identity) রমদা করে এবং নিজেদের 'মুসলমান' বলে পরিচয় দেয়। পটুয়ারা একই সঙ্গে দুটো নাম রাখে একটি মুসলমান সুলভ আরবি শব্দে নাম, অন্যটি বাঙালী সুলভ বাংলা নাম যেমন ঃ আল্লারাখা চিত্রকর/রাঘহরি চিত্রকর, আরাতন বিবি/আরতি চিত্রকর ইত্যাদি। এরা মুসলিমদের মত শূন্যত করে, নামাজ পড়ে, মৃতকে কবর দেয় আবার কালীপুজো করে। ঠাকুর দেবতার ছবি এঁকে তাদের গান গায়, ঠাকুর তৈরিও করে। পটুয়াদের জীবনাচরণের মধ্যেও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের নানাদিক মিলবে। সেও বর্তমানের আলোচ্য বিষয় নয়। মুসলিম পটুয়াদের পটে ও গানে চৈতন্য মহাপ্রভু কেমনভাবে ফুটে উঠেছে তাই এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

॥ ২ ॥

চৈতন্য মহাপ্রভু বাংলার সমাজকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছিলেন। লোকায়ত সমাজে তাঁর প্রভাব কত গভীর এবং ব্যাপক ছিল সে নিয়ে কোন গবেষণা কর্ম হয়েছে কিনা জানি না। তবে পটুয়া শিল্পীদের শিল্প উপস্থাপনার মধ্যে চৈতন্য মহাপ্রভুর গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । বিশেষত কাঠের ও মাটির পুতুলে চৈতন্যদেবের প্রতিকৃতি বাংলার অতি পরিচিত লোকশিল্প। নজরুল ইসলামের গানে এবং বিভিন্ন লোকগানে চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গও নতুন নয়। যাই হোক বর্তমান প্রবন্ধটি একটি গ্রামের, একজন পটুয়া শিল্পীর পটচিত্র ও গানের ওপর ভিত্তি করে চৈতন্য মহাপ্রভুর উপস্থাপনার বিষয়টি তুলে ধরতে চাই। সমগ্র পটচিত্রটি এবং পটের গানটি ৩০. ১২. ২০০১ তারিখে আমি সংগ্রহ করি।

সংগ্রহ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি	
পটুয়ার নাম ঃ মুক্তার বেদিয়া	লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম ঃ পুং, ৪৫, মুসলমান
গ্রাম ঃ ইটাগুড়িয়া	ডাক ঃ ইটাগুড়িয়া
থানা ঃ সিউড়ী	ব্লক ঃ সিউড়ী - ১
সাব. ডিভিসন ঃ সিউড়ী	জেলা ঃ বীরভূম
পিন কোড নং ঃ ৭৩১১০১	সংগ্রহের তারিখ ঃ ৩০-১২-২০০১

পট সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে ওই গ্রামের একাধিক পটশিল্পী সহ মুক্তার বেদিয়ার সাক্ষাৎ গ্রহণ করি। নিমাই সন্ন্যাসের পট ও পটের গান যে ওই অঞ্চলে পটুয়া শিল্পী সমাজের প্রথাগত ঐতিহ্যতা বোঝার জন্য যে যে পদ্ধতিতে ক্ষেত্র-কর্ম (Field work) করা

প্রয়োজন, সেই পদ্ধতি সমূহ মেনেই প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ করি - যার সব কিছু বলা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

পট সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্য সমূহ	
পটের নাম	ঃ নিমাই সন্ন্যাসের পট (পটুয়াদের দেওয়া নাম)
পটের প্রকৃতি	ঃ লাটাই শ্রেণীর জড়ানো পট (রঙিন)
পটের দৈর্ঘ্য	ঃ চৈতন্যপট ঃ ১০১.৩/৪ ইঞ্চি যমপট - ৭৫ ইঞ্চি
পটের প্রস্থ	ঃ ১৯ ইঞ্চি
পটে ছবির সংখ্যা	ঃ মোট ১১টি পৃথক ব্লক
বিষয় ভিত্তিক বিভাজন	ঃ নিমাইয়ের পট ৭টি ব্লক (১০১.৩/৪ ইঞ্চি) যমপট ৪টি ব্লক (৭৫ ইঞ্চি)
পটের উল্লেখযোগ্য ছবি	ঃ ষড়ভূজ চৈতন্যদেবের ছবি
পটের প্রাচীনতা	ঃ ১৭ বছর
পটের উপাদান	ঃ কাগজ, কাপড়ের পাড় (পেটের পিছনে দু দিকে পেন্টিং করা) বাঁশের কঞ্চি (গোটানোর জন্য)

ইটাগুড়িয়া গ্রামের অন্তত ৩০ জন পটুয়া এখনও পট দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। মুক্তার বেদিয়া (পটুয়া) তাদেরই মধ্যে একজন। ওনার কাছে নিমাই সন্ন্যাসীর পট দেখে ও পটের গান শুনে এ বিষয়টি গিয়ে উৎসাহিত হই এবং পট ও গান সংগ্রহ করি।

নিমাই সন্ন্যাসের পটের গানটি প্রথাগত। পটুয়া শিল্পী মুক্তার বেদিয়া মহাশয়ের কাছ থেকে গানটি টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে ক্যাসেটে রেকর্ড করি। সংগৃহীত গানটি একেবারে হুবহু এখানে তুলে ধরলাম।

লোকসাহিত্যের বহু গবেষকই মৌখিক সাহিত্যের পাঠ (Text) পরিবর্তন করেছেন বা তাকে এডিট্ করেছেন। এতে করে লোক সাহিত্যের মৌলিক গবেষণার অসুবিধে দেখা দেয়। পাঠের কোন শব্দ বা বাক্যাংশ সম্পর্কে আমার পৃথক মত/প্রস্তাব থাকলে তা পৃথক চিহ্ন [is] এর মধ্যে উল্লেখ করেছি। কোন শব্দের অর্থ [=] চিহ্নে উল্লেখ করা হয়েছে। বাক্য বিন্যাসকে বুঝতে সাহায্য করে এখন শব্দ, যা মূল পাঠে নেই অথচ ব্যবহার করেছি তাকে [ ] চিহ্নের ভিতর উল্লেখ করেছি। ফলে মূলপাঠ একেবারেই অবিকৃত রয়েছে। প্রয়োজনে পৃথক টীকাও দেওয়া হয়েছে। গানটি এই ঃ

নিমাই সন্ন্যাসের গান

১। আরে জয় জয় মহাপ্রভু জয় নিত্যানন্দ
আর অদ্বৈতে চাঁদভক্ত ওগো গৌরভক্তবৃন্দ।।

২। নবদ্বীপে আছে ওগো জগাই আর মাধাই
হরি বলে বাহুতুলে নাচে দুটি ভাই।।

৩। আরে নবদ্বীপে বন্দিন (বন্দি) আরে শচিঠাকুরানী
তার গর্ভে জন্ম নিল নিমাই গুণমণি।।

৪। সেই মা ছেলে ধারণ করি মায়ের গর্ভেতে মিশিল
ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমায় মায়ের প্রসবগত হইল।।

৫। দিনে দিনে বাড়ে নিমাই শচীমাতারের (শচীমাতার) কোলে
দিন - খান (দিনক্ষণ) করি একদিন দিল পন্ডিত পাঠশালে (পন্ডিতের পাঠশালে।।

৬। আরে পড়রে পড়রে নিমাই পাঠ বল শুনি
অবারিত পড় বাবা গোসাঁই গুণমণি।।

৭। পড়িতে না পারে নিমাই গণিতে না পারে ..
(সম্ভবত এখানে আর একটি চরণ ছিল, যার অভাবে ছন্দপতন ঘটেছে)

৮। অতি ক্রোধ হইয়া পন্ডিত তখন নিল ছড়ির বাড়ি
কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাই যায়গো চন্দন গাছের গুঁড়ি।।

৯। আরে চন্দন গাছের গোড়ায় নিমাই তখন অবতার পাতিল (= অবতার রূপ প্রদর্শন করলো)
ষড়ভূজা (~ ষড়ভূজ) মূর্তিখানি আজি তখন পন্ডিতকে দিখালো (= দেখালো)।।

১০। গলার বস্ত্র নইকো (~ নত হয়ে) পন্ডিত তখন করে নমস্কার
না জানায় (= জেনে) মেরেছি প্রভু ক্ষমা (~ ক্ষম) অপরাধ।।

১১। না জানায় মেরেছি আমি ওগো যদুমণি
অন্তিমকালে দিও রাঙা আজ চরণ দুখানি।।

১২। রাম রূপে ধেনুক (~ ধনুক/ধনু) ধরে নিমাই কৃষ্ণরূপে বাঁশি
চৈতন্যরূপে নিমাই আজ হইলেন সন্ন্যাসী।।

১৩। কেশবা ভারতী (~ কেশব ভারতী) এসে ওগো কিবা মন্ত্র দিল
সেই দিন হইতে নিমাই উদাসীন হইল।।

১৪। আগো (~ ওগো) খাট পেড়ে (~ পেতে) শচীমাতা ওগো শ্রীনিদ্রা যায়
যমীর (~ যমের) ভগ্নি কাল এসে মাকে নিদ্রা-আবেশ হয়।।

১৫। ধর্ম যাবার সময় (~ সন্ন্যাস ধর্মে যাবার সময়) নিমাই তখন ডাকিতে লাগিল
মা - মা বলে নিমাই ওগো তিন ডাক দিল।।

১৬। অভাগিনী শচীমাতা (~ শচীমাতার) আছি চেতন নাহি ছিল বনির (~ বনের)
কোখিল (~ কোকিল) বলি নিমাইকে বিদাও (~ বিদায়) যে দিলো।।

১৭। আরে নিশি প্রভাত হয়ে গেল কোখিলে (~ কোকিলে) বাড়ে রা শয়ন মন্দিরে
ছিল তখন ঝেড়ে তোলে গা।।

১৮। নিমাই নিমাই বলে শব্দ ওগো ডাকিতে লাগিল নিমাই (~ নিমাইয়ের) সাড়া না
পাইয়া বিসনাপিআ (~ বিষ্ণুপ্রিয়া) (এবং) শচীমাতা ওগো কাঁদিতে লাগিল।।

২০। কাঁদিস না মা শচীমাতা কাঁদলে নিমাই পাবি কুথা (~ কোথা)
তোর নিমাই ন'দে (~ নদীয়া) ছেড়ে কাঁটা (~ কাটোয়) চলে গেল।।

২১। ক্যাহ ক্যহ (~ কেহ কেহ) বলে গো নিমাই জলে ডুবে মইল (~ মরিল)
আর কেউ বলে নিমাই সন্ন্যাসী ধর্মে গেল।।

২২। সন্ন্যাসী ধর্ম কঠিন ধর্ম নিমাই কে শিখালো তোরে
কেমনে বেড়াবি বাবা নগরে নগরে।।

২৩। নিমাইরে তুর (= তোর) জন্ম দেখ নিম বিরিখোর (~ বৃক্ষের) তলে
শিশুকালে জানলে বাবা ফেলে দিতাম নদীয়ার (~ নদীর) জলে।।

২৪। আজ কাটোয়ার ঘাটে নিমাই তখন দরশন দিল মধুনাপিত
মধু নাপিত বলে ওগো ডাঁকিতে লাগিল (~ ডাকিতে)

২৫। কোথায় ছিল মধু নাপিত এসে চরণে ধরিল
ওহে বাবু মধু নাপিত আমার চাঁচর কেশ মড়াও (~ মুন্ডন/নেড়া করে দাও)

২৬। চাঁচর কেশ মড়িয়ে (~ মুন্ডন করিয়ে) নিমাই করিল গমন।।

২৭। খোল বাজে মিরদঙ্গ (~ মৃদঙ্গ) বাজে ওগো বিনয় করতাল)
সবার মাঝে নৃত্য করে ওগো শচীর দুলাল।।

২৮। কেউ বাজাচ্ছে, কেউ নাচিছে, কেউবা দিচ্ছে তালি
ভাবে পড়ে জগাই মাধাই খাচ্ছে গড়াগড়ি।।

২৯। জগাই মাধাই পাপী ছিল হরি নামে ত্বরে গেল
মা, সকলে বদন ভরে একবার হরি হরি বল।।

।।৩।।

(অল্পকালে .... নবীন)

এই গানটিতে কাহিনী বিন্যাসে এবং ভাষিক উপস্থাপনায় লোকসাহিত্যের নানা উপাদান মিলবে। প্রথমত কাহিনী চয়নের সংক্ষিপ্ততা -

দিনে দিনে বাড়ে নিমাই শচীমাতাদের কোলে

দিন-খান করি একদিন ছিল পন্ডিত পাঠশালে ।। (চরণ-৫)

গীতিকায় এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। দ্বিতীয়ত আমরা জানি নিমাই খুব মেধাবী ছিলেন এবং পড়াশোনা দ্রুত স্মরণ করতে পারতেন। চৈতন্য চরিতামৃতের প্রমাণ হল ঃ গঙ্গাদাস পন্ডিতের স্থানে পড়ে ব্যাকরণ। শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্র বৃত্তি পান।। (চৈতন্যচরিতামৃত ১।১৫ পরিচ্ছেদ) কিন্তু পটের গানে দেখছি "পড়িতে না পারে নিমাই গণিতে না পারে" এবং এই কারণেই তিনি পন্ডিতের কাছে ছড়ির মার খান (চরণ-৭) এবং কাঁদতে কাঁদতে "চন্দন" গাছের গোড়ায় চলে যান। 'চন্দন গাছ' লোকসাহিত্যের Restricted Code। তৃতীয়ত চন্দন গাছের তলার তাঁর ষড়ভূজ অবতার রূপে আত্মপ্রকাশ এই গানের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মুসলিম চিত্রকরের আঁকা ষড়ভূজ চৈতন্যদেবের ছবিটি অনন্যসাধারণ (দ্রঃ আলোকচিত্র)। চতুর্থত ষড়ভূজ মূর্তি প্রদর্শনের কাহিনী যেমন পটের গানে রয়েছে তেমনি বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যেও রয়েছে। সে দিক থেকে ষড়ভূজ রূপ প্রদর্শন - চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য মোটিফ হয়ে উঠেছে। যাইহোক, মহাপ্রভুর বাল্যকালে বিদ্যা অধ্যয়ন কালে পন্ডিতকে ষড়ভূজ অবতার রূপ প্রদর্শনের কথা পটের গানে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে (বাসুদেব) সর্বভৌম উদ্ধার কাহিনীতে মহাপ্রভুর ষড়ভূজ মূর্তি প্রদর্শনের কথা আছে। আত্মরামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভত গুণো হরি।।" এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সর্বভৌম ১৩ রকম ব্যাখ্যা করেন। তখন মহাপ্রভু সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে বাসুদেব সর্বভৌমকে ষড়ভূজ অবতার রূপে দেখা দিলেন—

"শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্মভাবে লইয়া ষড়ভূজ অবতার।।"

একই ঘটনা আমরা চৈতন্য চরিতামৃতে দেখি। সেখানে অবশ্য ষড়ভূজ নয়, চতুর্ভূজ রূপ প্রদশর্নের কথা মেলে—

"দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভূজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ।।
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দন্ডবৎ করি।
পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি।। (চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

আবার চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেরই আদিলীলার ষড়ভূজ রূপ প্রদর্শনের আর একটি প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে —

"প্রভুর অভিষেক তবে করিলা শ্রীবাস।
ঘাটে বসি প্রভু কৈলা ঐশ্বর্য প্রকাশ।।

তবে নিত্যানন্দ স্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিশিয়া পাইলা ষড়ভূজ দর্শন।।
প্রথমে ষড়ভূজ তারে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ বেনু ধর।।(চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা,
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ)

আসলে চতুর্ভূজ বা ষড়ভূজ মূর্তি ভাবনার পিছনে চৈতন্যমহাপ্রভূর ঐশ্বর্য রূপ প্রকাশ করার চেতনা কাজ করেছে। মহাপ্রভুই যে কৃষ্ণ স্বয়ং এই ভাবনারই প্রকাশ ঘটেছে ষড়ভূজের মধ্যে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় আমরা পাই, ভক্ত অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে চতুর্ভূজ রূপে দেখতে চেয়েছিলেন-

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বং দ্রষ্টুমহং তথৈব
তেনৈব রূপেন চতুর্ভূজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে।।
(শ্রীমদ্ভগবদগীতা/১১/৪৬)

তখন ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর চতুর্ভূজ রূপ প্রদর্শন করলেন (শ্রীমদ্ভগবগীতা/১১/৪৯)। চতুর্ভূজ রূপ, বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের নিত্যরূপ।

চৈতন্য চরিত সাহিত্যে বৃন্দাবন দাস দেখেছেন (রাম-কৃষ্ণ-চৈতন্যদেব) এই তিনের একীভবন বা সমীকরণ। অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চেতনায়। (বিষ্ণু-কৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভু) এই তিন জন সমীভূত। ষড়ভূজ বা চতুর্ভূজ হলেও দুই বৈষ্ণব কবির চিন্তার মধ্যে সামান্য ফারাক রয়েছে। পটের গানে ষড়ভূজের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ

"রাম রূপে ধেনুক ধরে নিমাই কৃষ্ণরূপে বাঁশি"(চরণ-১২)

স্পষ্টত পটের গানে উল্লিখিত ষড়ভূজ ভাবনা বৃন্দাবন দাসের ভাবনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। যাইহোক, গলবস্ত্র হয়ে পন্ডিতের মহাপ্রভুকে "ক্ষমা প্রার্থনার" ঘটনা লোকসাহিত্যেরই বিশিষ্ঠতা বহন করে (চরণ-১০,১১)। উল্লেখ্য, বৃন্দাবন দাশের রচনায় ষড়ভূজ রূপ দেখার পর বাসুদেব সার্বভৌম অজ্ঞান হয়ে যান (মূর্চ্ছা যান)। কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনায় মেলে সার্বভৌম দন্ডবৎ হয়ে প্রভুকে স্তুতি করেন। পঞ্চমত শচীমাতার নিদ্রাকালে যমের ভগ্নি "কালনিদ্রা" এসে শচীমাকে নিদ্রার আবেশে নিদ্রিত করে দিল - এ ঘটনাও লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যকেই সূচিত করে। (চরণ-১৪) মূল পটচিত্রে বিষয়টি চিত্রের মাধমেও প্রদর্শিত হয়েছে। ষষ্ঠত সন্ন্যাস ধর্মে যাবার আগে নিমাই মাকে "তিন ডাক দিল" (চরণ-১৫)। "তিন " সংখ্যা বাংলার লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য মোটিফ। (বিস্তারিত ঐ ঃ গবেষণা (১৪/৩ পৃঃ ৩১৯-৩০০)। সপ্তমত নিমাইয়ের গৃহত্যাগের পর কেউ কেউ বল্লো নিমাই জলে ডুবে মারা·গেছে! এটাও লোকসাহিত্যের বিশিষ্টতারই (চরণ-২১)। অষ্টমত নিম বৃক্ষের তলে যে নিমাইয়ের জন্ম (নিম-নিমাই

= লোকনিরুক্তি/Folk Etymology) যে নিমাইয়ের, সে সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাবে একথা জানলে মা তাকে শিশুকালেই নদীর জলে ফেলে দিত (দুঃখের উক্তি) — এই ভাবনাও লোকায়ত সমাজের চিন্তার প্রতিফলন। (চরণ-২৩)। নবমত ভাষার ক্ষেত্রে কারক /বিভক্তির শিথিলতার কারণে বিভক্তির প্রয়োগ বা লোপ দুটিই শিষ্ট ভাষার মত নিয়ম রক্ষা করে নি। লোকসাহিত্যে এই বৈশিষ্ট বিশেষ ভাবে দেখা যায়— যেমন — অদ্বৈতে চাঁদভক্ত (চরণ-১), শচীমাতারের কোলে (চরণ-৫), পন্ডিত পাঠশালে (চরণ-৫), ধর্ম যাবার সময় (চরণ-১৫)। দশমত অর্ধতৎসম তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ বিশেষ উল্লেখ্য, যেমন - দিন -খান (দিনক্ষণ; চরণ-৫), বিসনাপিতা (বিষ্ণুপ্রিয়া; চরণ-১৮), বিরিক্ষের (বৃক্ষের; চরণ -২৩), মিরদঙ্গ (মৃদঙ্গ ; চরণ-২৭) ইত্যাদি। একাদশত অন্তত একটি ক্ষেত্রে ভাষার প্রাচীনতা-চিহ্ন দেখা গেছে—"আরে নিশিপ্রভাত হয়ে গেল *কোখিলে কাড়ে রা*"(চরণ-১৭) ক্রিয়া পদ "কাড়ে" ভাষার প্রাচীনতার দিক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই-

" " ( )। 'কাড়ে' এই ক্রিয়ার প্রয়োগ ওই অঞ্চলের মুখের ভাষায় এখনও রয়েছে। দ্বাদশত বাক্য বন্ধের সঙ্গতিহীনতা (মান্যভাষার তুলনায়) এবং ছন্দের প্রয়োজনে শব্দের অর্থহীন প্রয়োগ লোকসাহিত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই গানে তাও মেলে যেমন—আরে নবদ্বীপে বন্দিন আরে শচী *ঠাকুরানী* (চরণ- ৩), সেই মা ছেলে ধারণ করি মায়ের গর্ভতে মিশিল (চরণ-৪), ষড়ভূজা মূর্তিখানি আছি তখন তখন পন্ডিতকে দিখালো (চরণ-৯) ইত্যাদি। যাইহোক নানা দিক থেকে এই গানটি চৈতন্য আশ্রিত মৌখিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

।। ৪ ।।

গানটিকে কেন্দ্র করে মাত্র দুটি আলোচনা করবো।

একটি পদ্ধতিগত (Methodological) প্রশ্ন আছে। মৌখিক সাহিত্যে ইতিহাসের বহু উপাদান মেলে। চৈতন্য জীবন কেন্দ্রিক এই গানটিতে এমন অনেক উপাদান রয়েছে। যা চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে নেই। প্রশ্ন হল—যে সব উপাদান বা ঘটনা লোকায়ত পটের গানে পাওয়া যাচ্ছে অথচ শিষ্ট কবিদের চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে নেই—সেই সব ঘটনাকে চৈতন্যদেবের জীবন-ইতিহাস পুনর্লিখনের ক্ষেত্রে কতখানি গ্রহণ করা সম্ভব? লোকসাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসের যোগ তো খুবই ঘনিষ্ট কিন্তু লোকসাহিত্য থেকে ইতিহাসের উপাদান গ্রহণ করার মানক বা মানদন্ড কী ? লোকসাহিত্যের তথ্য, ঐতিহাসিকদের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলে তবেই তা ইতিহাসের—উপাদান হবে নাকি—লোকসাহিত্যে প্রতিফলিত বিষয়ের মধ্যে যেখানে ইতিহাস আছে বলে মনে হয়—তার ভিত্তিতে ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস অনুসন্ধানে

প্রবৃত্ত হবেন? পদ্ধতিগত দিক থেকে এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। শিষ্ট সাহিত্য বলছে চৈতন্য দেব প্রখর মেধাবী ছিলেন ও পড়ার বিষয় দ্রুত আত্মীকরণ করতে পারতেন। লোকসাহিত্য বলছে- পড়া না পারার কারণে পন্ডিতের কাছে তিনি মার খেয়েছেন। এই দুই পরস্পর বিরোধী তথ্যের মধ্যে প্রকৃত ইতিহাস কী? উল্লিখিত দুটিই পরস্পর বিরোধী তথ্য একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না। তাহলে, শিষ্ট সাহিত্য— প্রকৃত তথ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান না হয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুকে মহিমান্বিত করে অঙ্কন করেছে, নাকি লোকায়ত কবিরা প্রকৃত তথ্যকে না জেনে চৈতন্যদেবকে আর পাঁচটা পাঠশালা-পড়ুয়ার মত করেই অঙ্কন করেছে? ইতিহাস সচেতন পাঠকের জন্য এই প্রশ্ন তুলে ধরলাম। তবে চৈতন্যজীবনী সাহিত্যই হক আর নিমাই সন্ন্যাসের পটের গানেই হক—উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু চৈতন্য মহিমাই প্রদর্শিত হয়েছে। দুই. সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রশ্ন। আপাত দৃষ্টিতে বাংলার সংস্কৃতিতে, যা কিছু হিন্দুর বিষয় এবং মুসলমানের বিষয় বলে মনে হয়— সেই বিভাজন ধারণা সর্বদা বাস্তব সমাজে রক্ষিত হয় না। সংস্কৃতির গতিশীলতার কারণেই এমনটা ঘটে। মুসলমান সমাজ, বাংলার সংস্কৃতি তথা শিথিল অর্থে হিন্দুর সাংস্কৃতির ধারা থেকে সর্বদাই মুখ ফিরিয়ে থাকে— এমন ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। এদেশের লোকায়ত ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করলে — হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের বহু দৃষ্টান্ত নজরে পড়ে। এগিয়ে বর্তমান গবেষকের কয়েকটি প্রবন্ধ আছে যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিম পটুয়ারা নানা দেবদেবীর মহিমাগান করে থাকে। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর মত ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং বাংলার সংস্কৃতির দিকচিহ্ন পরিবর্তনকারী। ব্যক্তিত্বকে নিয়ে পটের গান রচনা বিচক্ষণ অভিনব।

মুসলিম পটুয়ারা চৈতন্য দেবের সন্ন্যাস গ্রহণের যে কাহিনীগ্রন্থন ও পটচিত্র অঙ্কন কবেছে - তার মধ্যে দিয়ে মহাপ্রভুর পূর্ণ মহিমা প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি যে অবতার, তিনি সে স্বরূপে অনাদি বিষ্ণু, তার ষড়ভূজ, যে রাম, কৃষ্ণ ও চৈতন্যের সম্মিলিত অবয়ব—এই সব বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব- ধারণা পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে পটচিত্রে ও গানে। বলাই বাহুল্য মুসলিম পট শিল্পী সমাজ বৈষ্ণব ভাবনা নির্দিষ্ট "চৈতন্য— cognition"কে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয় সকলকে "হরি"নাম করতে বলার আবেদনের মধ্যে দিয়ে পটের গান শেষ হয়েছে (চরণ-২৯)। বৈষ্ণবীয় ভাবধারা প্রসারের ক্ষেত্রে এবং চৈতন্য -মহিমা প্রচারের ক্ষেত্রে— মুক্তার বেদিয়ার মত মুসলমান পটুয়ার ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। মুসলিম মানসে "চৈতন্য— congnition" এর আত্মীকরণ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বীরভূমের ইটাগুড়িয়া গ্রামের মুক্তার বেদিয়া দরিদ্র পটশিল্পী। এই শিল্পীর সংহতিপন্থী শিল্পচেতনার প্রতি আমি শ্রদ্ধাবান।

সূত্রনির্দেশ ঃ —

১. অনুসন্ধান -১৪	ঃ	ইতিহাস অনুসন্ধান -১৪, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, (সম্পাদনা) ২০০০
২. অনুসন্ধান-১৫	ঃ	ইতিহাস অনুসন্ধান - ১৫ , গৌতম চট্টোপাধ্যায়, (সম্পাদনা) , ২০০১
৩ গবেষণা - ১৩/৪	ঃ	লোকসংস্কৃতি গবেষণা (পত্রিকা ১৩/৪ সংখ্যা) সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদক)।
৪. গবেষণা - ১৪/৩	ঃ	লোকসংস্কৃতি গবেষণা (পত্রিকা ১৪/৩ সংখ্যা) সনৎ কুমার মিত্র (সম্পাদক)।
৫. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	ঃ	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত এবং স্বামী জগদানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয় , ১৯৮৫ ।
৬. শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত	ঃ	শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সুবোধচন্দ্র মজুমদার, (সম্পাদিত) ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।
৭. Aspects	ঃ	Aspects of Society and Culture in Calcutta, M.K.A. Siddiqui, 1982
৮. Cultural	ঃ	Cultural Oscillation, Binoy Bhattacharjee, 1980
৯. Folk Arts	ঃ	Folk Arts and Crafts of Bengal the collected papers , Gurusaday Datta, 1990 .
১০. Falk Paintings	ঃ	Folk Paintings of Bengal, Surojit Dutta, 1993
১১. Patua	ঃ	Patuas and the Patua Art in Bengal, Danid M C Chatchion and Suhrid Kr. Bhowmik, 1999,
১২. The Patua	ঃ	The Pats and Patuas of Bengal, Sankar Sengupta, 1973

ঐতিহাসিক পত্রালাপ ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনসূত্র

শম্ভুনাথ কুণ্ডু

উনবিংশ শতাব্দী হোল বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ। বস্তুত এই শতকটি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, ভাষা ও শিল্পচেতনার মিলন লগ্নরূপে চিহ্নিত। একদিকে পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় প্রতীচ্যের জ্ঞান বিজ্ঞান গ্রহণ করার দুর্নিবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় শিক্ষিত সমাজে। অন্যদিকে ভারতীয় চিরায়ত ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতি রক্ষা করার সশঙ্কিত তৎপরতা সনাতন পন্থীদের মধ্যে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এই দুই পরস্পর বিরোধী ভাবাদর্শের সংঘাত-সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই জেগে উঠেছিল এক অভিনব সমন্বয়ী চেতনা। আর এই চেতনার উদ্বোধনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ভারতবিদ্যাচর্চায় উৎসাহী কয়েকজন বরেণ্য বিদেশী ভারতপ্রেমী। এমনই একজন সংস্কৃতজ্ঞ মনীষী হলেন হোরেস হেম্যান উইলসন যাঁর সঙ্গে কলকাতার সংস্কৃত কলেজের দুজন মহাপ্রাজ্ঞ অধ্যাপকের সংস্কৃত শ্লোকে পত্রালাপ হয়েছিল। এই পত্রালাপের প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ প্রতিপাদ্য বিষয়ে পৌঁছানোর ব্যাপারে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালের প্রথম দিকে কোম্পানি এদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার তথা পাশ্চাত্যজ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবর্তনায় তেমন কোন উৎসাহ দেখাননি। এদেশীয় নেটিভদের শিক্ষা, সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ভীষণভাবে অবহেলিত হচ্ছিল। ১৭৮১ সালে গভর্নর জেলারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতা - মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯২ সালে রেসিডেন্ট জোনাথান ডানকান বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। এগুলি মূলত হিন্দু মুসলমান আইনের ভাষ্যকার পণ্ডিত ও মৌলভী তৈরির উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হয়েছিল একান্তভাবেই নিজেদের বিচারকার্যের সুবিধার্থে।

চার্লস গ্রান্ট দীর্ঘদিন কর্মসূত্রে এদেশে ছিলেন। তিনি স্বদেশে ফিরে গিয়ে ইংরাজীর মাধ্যমে যাতে ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয় তার জন্য অষ্টাদশ-শতকের শেষভাগে বিলাতে আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টারে এদেশীয়দের শিক্ষা সম্পর্কে নীরবতা পালন করা হয়। গ্রান্টের আন্দোলনের কোন প্রভাব এই চার্টারে প্রতিফলিত হয়নি। তারপরই ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলেও সেই একই উদ্দেশ্য ছিল। তবে এই কলেজে এদেশীয় সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী পণ্ডিতদের সংস্পর্শে নবাগত সিভিলিয়ানরা ভারতবিদ্যার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বড়লাট লর্ড মিন্টো ১৮১১ সালের ৬ই মার্চ নেটিভদের শিক্ষা, সাহিত্যও সংস্কৃতির দুরবস্থার চিত্র বর্ণনা করে একটি মিনিটে স্বাক্ষর করেন—' It is seriously to be lamented that a nation particularly

distinguished for its love and successful cultivation of letters in other parts of the empire should have failed to extend its fostering care to the literature of the Hindoos, and to aid in opening to the learned in Europe the repositories of that literature." [১] তিনি কর্তৃপক্ষের চরম ঔদাসীন্যের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন এই মন্তব্যে। তাঁর কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ্ কোলব্রুক। তিনি বড়লাটকে এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন।

বড়লাট মিন্টো তাঁর মিনিটে নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে দুটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পণ্ডিতদের অনুমান, চার্লস গ্রান্টও লর্ড মিন্টোর আন্দোলনের চাপেই কর্তৃপক্ষ ১৮১৩ সালের চার্টারের একটি ধারায় এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বার্ষিক একলক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ করেন – "..... a sum of not less than one Lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the instruction and promotion of a Knowledge of the Sciences among the inhabitants of the British territories in India." [২]

এই ৪৩ নম্বর ধারাটি পর্যালোচনা করলে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক, প্রাচ্যবিদ্যার উৎকর্ষসাধন ও পণ্ডিতদের সাহায্যদান এবং দুই, এদেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবর্তন। কিন্তু শিক্ষাদানের মাধ্যম কি হবে তাই নিয়ে বিতর্ক থাকায় প্রায় দশ বছর সরকার নিশ্চুপ ছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী (Orientalist) এবং পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগীদের (Occidentalist) মধ্যে এই বিতর্ক চরমে ওঠে। ইতোমধ্যে ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ঈস্টএবং ঘড়ি ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ারের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। এই সময়েই শিক্ষা প্রসারের জন্য ইংরেজ ও ভারতীয়দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি' (১৮১৭ খ্রিঃ) এবং 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮ খ্রিঃ) স্থাপিত হয়। [৩]

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে মারাঠাশক্তির পতনের পর সরকার এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে মনোযোগ দেন। লর্ড মিন্টো তাঁর মিনিটে নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে যে দুটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের আমলে প্রত্যাখ্যাত হয়। গর্ভনমেন্টের জুনিয়র সেক্রেটারি হোরেস হেম্যান উইলসন প্রস্তাব দেন যে মফস্বলে দুটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বদলে কাশী সংস্কৃত কলেজের আদর্শে কলকাতার কেন্দ্রস্থলে একটিমাত্র সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা সবদিক দিয়ে যুক্তিসঙ্গত হবে। বড়লাট তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ১৮২১ সালের ২১শে আগষ্ট সংস্কৃত কলেজের জন্য

বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও স্পষ্টভাবে জানানো হোল ঃ সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা এই কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলেও, ধীরে ধীরে হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষারও এটি একটি মাধ্যম হবে—".... the immediate object of the institution is the cultivation of Hindu literature. Yet it is in the judgement of his Lordship in Council, a purpose of much deeper interest to seek every practicable means of effecting the gradual diffusion of European Knowledge."[৪]

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ভার দেওয়া হোল নবগঠিত জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনের উপর। এই কমিটির সভাপতি হলেন বিচারপতি জে. এইচ. হ্যারিংটন এবং সেক্রেটারি হলেন এইচ. এইচ. উইলসন। পরের বছর ২৫শে ফেব্রুয়ারি সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হোল। তখন ছিলেন লর্ড আমহার্স্ট। কলেজভবন নির্মাণে সময় লেগেছিল আড়াই বছর। ১৮২৬ সালের ১লা মে নবনির্মিত ভবনে ক্লাশ শুরু হয়। অবশ্য তার আগে থেকেই ১৮২৪ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ৬৬ নম্বর বউবাজার বাড়িতে সংস্কৃত কলেজের পাঠদানের শুভ সূচনা হয়। হিন্দু কলেজ ও হিন্দু স্কুলও এইভাবে উঠে আসে।

পটলডাঙ্গা স্কোয়ার বা গোলদীঘির উত্তরাংশে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। অতি মনোরম ছায়াস্নিগ্ধ পরিবেশ। দেশের দিক্‌পাল সংস্কৃত পণ্ডিতেরা অতিনিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যাপনায় নিরত। পণ্ডিতপ্রবর জয়গোপাল তর্কলংকার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, হরনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ বিবুধমণ্ডলী আচার্যপদ অলংকৃত করেন। ছাত্ররূপে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, তারানাথ বাচস্পতি, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, তারাশংকর তর্করত্নেরা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বিদ্যার্জনে মগ্ন। মনোমুগ্ধকর আশ্রমিক পরিবেশে সারস্বত সাধনা চলছিল সুন্দরভাবেই । এদিকে সুদীর্ঘ পঁচিশবছর এদেশে কাটিয়ে সংস্কৃত কলেজকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে ১৮৩২ সালে উইলসন ফিরে গেলেন দেশে, তার সোহো স্কোয়ারের বাড়িতে। ওখানে গিয়ে অক্সফোর্ডের 'বোডেন' প্রফেসরের অলংকৃত করেন তিনি। জ্ঞানতাপস অধ্যাপক তখনো ঘূণাক্ষরেও জানতে পারেননি যে তাঁর মানসপুত্রতুল্য কলেজটির আকাশে দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে।

উইলসন দেশে ফিরে যাবার পরের বছরই বড়লাট বেন্টিঙ্কের নির্দেশে আইন সচিব টমাস ব্যারিংটন মেকলের উপর ভার পড়লো এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর। **Orientalist** এবং **Occidentalist** দের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে বিবাদ বিতর্ক চলছিল তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন এই ভাগ্যান্বেষী ঝানু আমলাটি। সংস্কৃত, আরবী না ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে এই নিয়ে যখন উভয় পক্ষের সমসংখ্যক

সদস্য হওয়ায় কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাচ্ছিল না, তখন উইলসন স্বদেশে ফিরে গেলেন। মেকলে এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। উইলসনের অনুপস্থিতিতে বিপরীত দিকে অর্থাৎ ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতীদের পাল্লা ভারি হয়। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত মেকলের মিনিটে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের জয়জয়াকার হোল। মেকলে দর্পিত উন্নাসিকতা প্রতিফলিত হোল তাঁর বিতর্কিত মন্তবে— " A single shelf of a good European Library was worth the whole native literature of India and Arabia." এক শেলফ্ ইউরোপীয় গ্রন্থে যে জ্ঞান সঞ্চিত আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ ও আরবদেশের সাহিত্যে তা নেই। ভারতবর্ষ ও আরব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ মেকলের এই মন্তব্য সীমাহীন স্পর্ধার দ্যোতকমাত্র। তাঁর এদেশ তথা প্রাচ্যবিদ্যা সম্বন্ধে অমর্যাদাপূর্ণ মন্তব্যে সকলে হতচকিত হন।

মিনিট প্রকাশের অনিবার্য ফলরূপে সংস্কৃত কলেজের নাভিশ্বাস উঠলো। কারণ প্রাচ্যবিদ্যাচর্চাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় অনুদান বন্ধ হয়ে যাবে। উঠে যাবে সংস্কৃত কলেজ। পণ্ডিত সমাজের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। উপায়ন্তর না দেখে সংস্কৃত কলেজের স্রষ্টা পরমসুহৃদ্ উইলসনের শরণাপন্ন হলেন পণ্ডিতেরা। তিনি ছাড়া কে এই কলেজকে রক্ষা করবেন ! কেন পন্ডিতবর্গ তাঁকেই রক্ষাকর্তা বলে মনে করলেন ? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদের অতিসংক্ষেপে উইলসনের পরিচয় জানা আবশ্যক।

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই উইলসন নিজেকে এই কলেজের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলেন সংস্কৃতভাষা ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে একান্তভাবে ভালবেসে। এ ভালবাসায় কোন স্বার্থবুদ্ধি ছিল না এই জ্ঞানতপস্বীর। বাইশবছরের তরুণ সদ্য ডাক্তারি পাশ করে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দিয়ে কলকাতায় আসেন ১৮০৮ সালে। তখন লর্ড মিন্টোর আমল। বিবিধ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। রসায়ন ও ধাতুবিদ্যায় তিনি ছিলেন সুপন্ডিত। ১৮১৬ সালে কলকাতা ট্যাঁকশালের প্রধান পদে বৃত হন তিনি। শুধু তাই নয়, প্রায় বাইশবছর ধরে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক পদ অলংকৃত করেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে চলে তাঁর সারস্বত আরাধনা/গভীর অধ্যবসায়ে দ্রুত সংস্কৃত শেখেন। তিনি কালিদাসের মেঘদূত অনুবাদ করেন, সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান রচনা করেন, অদ্যাপি যা অপরিহার্য অভিধানরূপে স্বীকৃত। তিনি বিষ্ণুপুরাণ সম্পাদনা করেন, ঋগ্বেদের অনুবাদ করেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক বহু গবেষণাপত্র রচনা করেন। তাঁর ' Essays and Lectures on the Religion of the Hindus' অবলম্বনে অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১৮৭০, ১৮ খ্রিঃ) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি রচনা করেন।

ভারতবিদ্যার এমন একনিষ্ঠ সাধকের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়

ছিল না সংস্কৃত কলেজের বিপন্ন পণ্ডিতবর্গের। সংস্কৃত শিক্ষা তথা ভারতবিদ্যার রক্ষাকর্তারূপী উইলসনের কাছে তাই সংস্কৃত শ্লোকে পত্র লিখলেন লব্ধকীর্তি পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকার। কোথায় কলেজ স্কোয়ার আর কোথায় বিলাতের সোহো স্কোয়ার! স্থানিক দূরত্ব মুছে গেলে হৃদয়ের সন্নিকটে। তিনি বলেছেন—

অস্মিন্ সংস্কৃত পাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরংগতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সম্প্রতি পুনর্ব্যাধাস্তাদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্তান্ যদি পাসি পালক তদা কীর্তিশ্চিরং স্থাস্যতি।।[৫]

শ্লোকটি অর্থ হলঃ এই সংস্কৃত পাঠগৃহরূপ সরোবরে যে সুধীরূপ হংস স্থাপন করে গেছেন, আপনি দূরে চলে যাওয়ার কালবশে তাঁরা এখন পক্ষহীন (দলহীন?) হয়ে পড়েছেন। এখন এই সরোবরের তীরে কয়েকজন ব্যাধ এসেছে তাঁদের উচ্ছেদের উদ্দেশ্য । হে পালক ! আপনি যদি তাদের হাত থেকে এঁদের রক্ষা করেন , তাহলে আপনার কীর্তি চিরকাল বেঁচে থাকবে।

তর্কালংকার মশাই-এর কাতর প্রার্থনার উত্তরে উইলসনও সংস্কৃত শ্লোকে শোনালেন আশ্বাসের মাভৈঃ বাণী —

বিধাতা বিশ্বনির্মাতা
হংসাস্তৎ প্রিয়বাহনম্
অতঃ প্রিয়তরত্বেন রক্ষিষ্যতি
স এব তান্ ।।[৬]

অর্থ ঃ- বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার প্রিয়বাহন হোল হংস। অতএব তিনিই তাঁর প্রিয়হংসকে রক্ষা করবেন।

অলংকারশাস্ত্রের প্রখ্যাত অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশও সংস্কৃত কলেজের ভাবী বিপর্যয়ের কথা চিন্তা ক'রে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনিও সংস্কৃত শ্লোকে উইলসন মহাভাগকে করুণ আবেদন জানালেন —

গোলদ্রীদীর্ঘিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকাতা ন গর্য্যাং
নিঃসঙ্গো বর্ততে সংস্কৃতপঠন গৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গঃ।
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো মেকলে ব্যাধরাজঃ
সাশ্রু ব্রুতে স ভো ভো উইলসন-মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ ।।[৭]

শ্লোকার্থ ঃ কলকাতা নগরীতে গোলদীঘির বহুবৃক্ষশোভিত তটদেশে সংস্কৃত পঠন গৃহ রূপ যে কৃশকায় মৃগ এতদিন নিঃসঙ্গভাবে বিচরণ করছিল, সম্প্রতি মেকলে নামক ব্যাধরাজ তাকে হত্যা করার জন্য তীক্ষ্ণশর ধারণ করেছে। ভয়ব্যাকুল সেই কুরঙ্গ অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলছে — হে মহাভাগ উইলসন! আমাকে রক্ষা, রক্ষা কর।

তর্কবাগীশ মশাই সরাসরি মেকলের নাম উল্লেখ করলেন, 'ব্যাধরাজ'রূপে।

উইলসন সাহেবও বিপন্ন পণ্ডিতবরকে সংস্কৃতশ্লোকে পরম আশ্বাসের বাণী শোনালেন পত্রের মাধ্যমে —

নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্ বহুপ্রাণিনাং
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্র কিরণেনাগ্নি স্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈঃ
দূর্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্বলে।। ৮

শ্লোকার্থ ঃ নিরন্তর বহুপ্রাণীর পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট, সূর্যের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো কিরণের দ্বারা সন্তপ্ত, সর্বদা ছাগ প্রভৃতির দ্বারা ভক্ষিত ও কোদাল দ্বারা খণ্ডিত হয়েও শীর্ণকায় দূর্বা মরে না। কারণ, দুর্বলের প্রতি বিধাতার দয়া ঝরে পড়ে। অর্থাৎ বিধাতাই তাকে রক্ষা করে।

সংস্কৃতপ্রেমী এই অমৃতপথিক আরও তিনটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে প্রেরণ করেন। এই শ্লোকত্রয়ে সংস্কৃত ভাষার স্বরূপ। প্রভাব ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে দৃঢ় মতামত প্রকাশ করেন তা ভারতবর্ষের কোন সংস্কৃতজ্ঞ মনীষী বলতে সাহস পেতেন কিনা সন্দেহ। তাঁর এই অকপট স্বীকারোক্তি যুগ যুগ ধরে এই ধ্রুপদীভাষার প্রতি অনুরাগসম্পন্ন ভারতবাসী পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে ঃ

অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং হি ততোঽধিকম্।
দেবভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে ।। ১ ।।
ন জানে বিদ্যতে কিং তন্মাধুর্যমত্র বিদ্যতে।
সর্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্।। ২ ।।
যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাৎ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্ ।। ৩ ।।

শ্লোক তিনটির অর্থ অতীব প্রাঞ্জল ঃ অমৃত মধুর কিন্তু সংস্কৃত আরও মধুর। এই ভাষা দেবভোগ্য বলে একে দেবভাষা বলা হয়। জানি না, কি মাধুর্য না এই ভাষায় আছে যা পান করে আমাদের মতো বিদেশীরা সদা উন্মত্ত। যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে। যতদিন বিন্ধ্য ও হিমালয় দাঁড়িয়ে থাকবে। যতদিন গঙ্গা ও গোদাবরী বয়ে চলবে, ততদিন সংস্কৃত বেঁচে থাকবে।

সংস্কৃত শ্লোকে রচিত এই পত্রাবলী নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক দলিলরূপে মহাফেজখানায় রক্ষিত হওয়ার যোগ্য। দূরসংস্থ প্রাচ্যবিদ্যার অমৃতরসপানে উন্মত্ত জ্ঞানতাপসের সঙ্গে এদেশীয় সংস্কৃত পণ্ডিতদের যে পত্রালাপ হয়েছিল, তা যেন কলেজ স্কোয়ার আর সোহো স্কোয়ারকে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে এক অভিনব মিলনসূত্রে গ্রথিত করেছে।

সূত্রনির্দেশ ঃ—

১। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_*কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, ১৩৫৫, পৃঃ - ১।
২। East India Act of 1819, Sec. 43
৩। সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, কলি. ১৪০৩, পৃঃ২২-২৫
৪। Sharp, *Selections from Educational Records*, i, 79, cal.1920
৫। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত* প্রথম খণ্ড, পৃ.১৬
৬। প্রণব রায়, *সেই কলেজ ও সাহেব পণ্ডিত*, *আনন্দবাজার পত্রিকা,* রবিবাসরীয়, ২৭ আগষ্ট'৭৮
৭। প্রণব রায়, *প্রাগুক্ত*।

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সংস্কৃত পণ্ডিতদের ভূমিকা

শমিতা সিন্‌হা

বাংলা গদ্য ও বিকাশে সংস্কৃত পন্ডিতদের অবদান উল্লেখযোগ্য। বাংলা গদ্য রচনা শুরু হয় শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে এবং বাংলা গদ্য ও ভাষার বিকাশে ক্রমশ সংস্কৃত পন্ডিতরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। মারাঠী সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক উইলিয়ম কেরি এবং তাঁর সহকারী কয়েকজন পন্ডিত কলেজের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার জন্য কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এই সমস্ত পন্ডিত — মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামজয় তর্কালঙ্কার, রামরাম বসু প্রমুখ বাংলা গদ্য রচনা শুরু করেন এবং যথাসম্ভব বাংলা গদ্যকে যুগপোযোগী করে তুলেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামরাম বসু, দুজনের রচনা রীতি দুরকম। রামরাম বসু ফারসিনবিশ মুনশি। তাঁর গদ্যের ভাষা সহজ, মুখের ভাষার কাছাকাছি এবং সেই কারণেই তাতে ফারসি শব্দ ও প্রয়োগের বাহুল্য ছিল। মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত বিশারদ পন্ডিত তাঁর রচনারীতি প্রায়ই দুরূহ, মুখের ভাষার মত নয় এবং কঠিন সংস্কৃত শব্দ ও সমাসে পরিপূর্ণ ছিল।[১]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিতরা যখন গদ্য রচনা করছিলেন কলেজের বাইরে রামমোহন রায় সেই সময়েই গদ্য রচনায় হাত দেন। সতীদাহ ব্যবস্থা এবং মূর্তি পুজোর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে দিয়ে তাঁর কিছু বিতর্কমূলক গদ্য রচনা করতে হয়। বহুভাষী রামমোহন স্টাইলের দিকে নজর না দিয়ে বক্তব্যের দিকেই দৃষ্টি রেখেছিলেন। তাই তাঁর হাতে বাঙলা গদ্যের যে রূপ গঠিত হল তাতে মাধুর্য ছিল না কিন্তু স্পষ্টতা ছিল, কার্যোপযোগিতা ছিল।[২]

'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), ' প্রবোধচন্দ্রিকা'(১৮৩৩ এ মুদ্রিত) 'রাজাবলি'(১৮০৮) এবং 'বেদান্তচন্দ্রিকা'(১৮১৭) মৃত্যুঞ্জয় এই ক'টি গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষায় যে শিল্পরস ও সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যায় রামমোহনের গদ্যে তা নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি'র ভাষা এবং প্রবোধচন্দ্রিকা কোন কোন অংশ বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩]

নিজে একজন সংস্কৃত পন্ডিত হয়েও বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন যে সংস্কৃত ভাষাকে যুগোপযোগী না করে আধুনিক চিন্তাভাবনা বা অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। সংস্কৃতে তিনি কোন মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ করেননি। কেবলমাত্র কিছু ব্যাখ্যা ও টীকা লিখেছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলি অধিকাংশই বাংলা ভাষার লেখা। একসময় যে পন্ডিত সমাজ বাংলা গদ্যকে কঠিন ও ভীতিপ্রদ করেন তুলেছিলেন, যাঁরা সহজবোধ্য বলে বিদ্যাসাগরের গদ্যকে তুচ্ছ করেছিলেন

তাঁদের দলের লোক পরে বিদ্যাসাগরের গদ্যের অনুশীলনে ব্রতী হলেন, সুললিত ও মনোরম করে গদ্য লেখার চেষ্টা করলেন।[৪] নাটক লেখায়ও সংস্কৃত কলেজ গোষ্ঠী এই সময় অগ্রসর হয়।

সংস্কৃত কলেজের যে সব পন্ডিত বাংলা ভাষায় গদ্য রচনা করেন তাঁদের মধ্যে তারানাথ বাচস্পতির নাম করা যায়। ছাত্ররা যাতে সংস্কৃতে বাক্য রচনা করতে পারে তারজন্য তিনি বাংলায় 'বাক্যমঞ্জরি' লেখেন। তবে এটি কোন গদ্য রচনা নয়। পত্রের ধারা সংকলন করেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। কাশী দাসের মহাভারত তিনি সংশোধন করে প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন মিলিতভাবে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকা প্রকাশ করতেন। মদনমোহন সেখানে স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে সুন্দর যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। বাংলা ভাষায় এধরণের লেখা এই প্রথম। তাঁর 'রসতরঙ্গিনী' সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের বাংলা অনুবাদ। তাঁর 'শিশুশিক্ষা' শিশুদের জন্য লিখিত প্রথম অসাধারণ বাংলা গ্রন্থ।

পন্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁদের দুজনেরই বাংলা ভাষার উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশনায় প্রেমচন্দ্রের সাহায্য পান।

সংস্কৃত কলেজের আরেকজন পন্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও বাংলায় সুলিখিত পাঠ্যপুস্তকের অভাব বোধ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'নীতিসার',Leonard Smith-এর History of Greece - অবলম্বনে 'গ্রিস দেশের ইতিহাস' বেকনের Advancement of Learning - এর বাংলা অনুবাদ এবং 'সাংখ্যদর্শন' উল্লেখযোগ্য। দ্বারকানাথ সাপ্তাহিক সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে বেশি পরিচিত। একথা বললে হয়তো অতুক্তি হবে না যে অনেকে সহজ সাবলীল এবং শুদ্ধ বাংলা লিখতে শিখেছিলেন এই পত্রিকা পড়েই। এই পত্রিকার মাধ্যমে দ্বারকানাথ জনগণকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন।

পন্ডিত কাশীনাথ তর্ক পঞ্চাননের বিখ্যাত বাংলা গ্রন্থ নাম পদার্থ কৌমুদি'। পন্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। যেমন ' দশকুমারচরিত' প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে। নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু 'সংস্কৃত প্রস্তাব' গ্রন্থে লেখেন যে বাংলাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত। বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য ইংরাজি এবং সংস্কৃত থেকে প্রয়োজনে অনুবাদ করতে হবে বলে তিনি মনে করতেন।

পন্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্নের প্রধান রচনা বাণভট্টের কাব্যের ভাবানুবাদ 'কাদম্বরী'(১৮৫৪) এবং জনসনের রাসেলাস-এর কালী-কৃষ্ণ দেবকৃত অনুবাদ অবলম্বনে 'রাসেলাস '(১৮৫৭)।'পশ্বাবলী' তারাশঙ্কর তকর্রত্নের আরেকটি বাংলা

গ্রন্থ। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা ছাড়া তারাশঙ্করের আর সব গ্রন্থই অনুবাদগ্রন্থ কিন্তু অনুবাদগুলিতেও তাঁর নিজস্বতা প্রমাণিত হয়েছে।

১৮৫৪ এ প্রকাশিত রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক 'কুলীন কুল সর্বস্ব' সামাজিক অনৈতিকতা নিয়ে লেখা তৎকালীন সমাজের ওপর এ নাটক প্রভাব ফেলেছিল। তার রচিত ' পতিব্রতপাখ্যান,' 'বেণীসংহার'(১৮৫৬) 'রত্নাবলী'(১৮৫৮)-র মধ্যে শেষোক্ত দুটি সংস্কৃত ভাষা থেকে কথ্য বাংলা ভাষার অনুবাদ। 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটক (১৮৬০) কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলমের কথ্যভাষার অনুবাদ। 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' লাম্পট্যের কুফলের ওপব একটি বিদ্রুপাত্মক নাটক। 'মালতীমাধব' নাটকও সংস্কৃতের অনুবাদ, 'উভয়সংকট' বহুবিবাহ কুপ্রথার অশুভ দিকগুলির ওপর লেখা নাটক। আরও অনেক নাটক তিনি বাংলায় লিখে গেছেন।

১৮১৮- এ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বাংলা অভিধান রচনা করেন। অভিধানে যতটা সম্ভব তিনি সংস্কৃত শব্দ থেকে সৃষ্ট বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য লেখা হিন্দু কলেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা এবং 'জ্যোতিষ সংগ্রহসার' কুলভট্টের টীকা যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন এবং ভারতচন্দ্র শিরোমণির বাংলা অনুবাদসমেত প্রকাশিত হয়।[৫]

সংস্কৃতকলেজের পন্ডিত বিদ্যাসাগরের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রচলিত ফোর্ট উইলিয়মি পাঠ্যপুস্তকের বিভাষা রামমোহন রায়ের পন্ডিতি ভাষা এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রের অপ-ভাষা কোনটিকেই একান্তভাবে অবলম্বন না করে তা থেকে যথাযোগ্য গ্রহণ বর্জন করে সাহিত্যযোগ্য লালিত্যময় সুডৌল গদ্যরীতি সৃষ্টি করেছিলেন যা সাহিত্যের ও সংস্কারকার্যের প্রায় সবরকম প্রয়োজন মেটাতে পেরেছিল।[৬]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে শুধুমাত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের পন্ডিতরাই অবদান রেখে যাননি সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চার পীঠস্থান ভট্টপল্লীর পন্ডিতরাও বাংলা ভাষার চর্চা করেছেন। ভাটপাড়ার রাখালদাস ন্যায়রত্ন মনে করতেন যে হিন্দু ধর্ম বাংলার জনসাধারণের কাছে তাদের মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যাতে তারা পরিষ্কার ভাবে দার্শনিক এবং দার্শনিক এবং ধর্মীয় চিন্তা বুঝতে পারে।

রাখালদাস ন্যায়রত্ন 'আগমনী' লেখেন। রাখাল দাসের বাবা সীতানাথ বিদ্যাভূষণ বাংলা পদ্য রচনা করেন। আনন্দ শিরোমণির ' সুবল মিলন', 'উদ্ধব সন্দেশ' হরকুমার শাস্ত্রীর 'শঙ্করাচার্য, রামানুজ বিদ্যারত্নের 'কণ্ঠহার' নামে কাব্যগ্রন্থ কিংবা পঞ্চানন তর্করত্নের হিন্দু শাস্ত্রের অনুবাদ প্রমাণ করে যে ভট্টপল্লীর গোঁড়া পন্ডিতরা শুধু শাস্ত্রচর্চা না করে বাংলা ভাষায় গদ্য বা কাব্য রচনার প্রয়োজনও অনুভব করেছিলেন। পঞ্চানন তর্করত্ন রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেন। 'মালতীমাধব' নামে বাংলায় তিনি একটি উপন্যাস লেখেন। এছাড়া তিনি অনেক প্রাচীন গ্রন্থর বাংলা অনুবাদ করেন।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি বাংলা গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ কতকগুলি মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন তাছাড়া তাঁরও মৌলিক বাংলা রচনা ছিল। হরিচরণ বিদ্যারত্ন বাংলায় বেশ কিছু বই লেখেন যার মধ্যে 'সুখের সন্ধান'-এর উল্লেখ করা যায়।[৮]

উনিশ শতকে পন্ডিতরা গদ্য ও কাব্য চর্চার পাশাপাশি সংবাদপত্র প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পন্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের 'সমাচার দর্পণ ' প্রকাশিত হয় ১৮১৮ থেকে। জয়গোপাল সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি সংস্কৃতাশ্রয়ী এবং পান্ডিত্যপূর্ণ বাংলা গদ্যের ভাষাকে সহজ, সাবলীল এবং প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযোগী করেছিলেন। সংবাদপত্র সব দেশেরই ভাষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের যে সীমাবদ্ধতাই থাকুন না কেন পন্ডিতি ভাষা এবং জনসাধারণের প্রচলিত ভাষার মধ্যে অন্তত সংবাদপত্র বাধা দূর করেছিল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ একটা সময় পর্যন্ত সংস্কৃত পন্ডিত এবং প্রাচীন শাস্ত্রশিক্ষিত লোকদের দিয়েই সম্ভব হয়েছিল। উনিশ শতকের ষাটের দশকে বঙ্কিম চন্দ্রের সাহিত্যজগতে আর্বিভাব পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল। পন্ডিতি বাংলা অনেকটা সংস্কৃত শব্দ ও পদবিন্যাস দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিল। এর থেকে এমন গদ্য সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীকালে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী লেখকরা ভাষার প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষভাগে এবং বিংশ শতকের প্রথমভাগে পন্ডিতি বাংলা এবং নতুন রচনাশৈলীর ভাল ও মন্দ দিকগুলো নিয়ে বিতর্ক ছিল। শেষ। পর্যন্ত নতুন ধরণের রচনা তার জায়গা করে নেয়। কিন্তু পন্ডিতরাই এই পথ তৈরি করতে সাহায্য করেন। টুলো বাংলা এবং বাজার বাংলা দুইই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সমালোচিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত্য একটি নাগরিক বাংলা তৈরি হয় বা কলকাতা শহর থেকে পশ্চিমদিকে মানভূম এবং পূর্বদিকে আসামের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তারিত হয়।

বাংলা ভাষার বিকাশে উনিশ শতকের প্রথমে ফারসিনবিশদেরও ভূমিকা ছিল। পরে পন্ডিতি প্রভাবই বেশি শক্তিশালী হয়। তবে চলতি বাংলার বিবর্তনের ফারসি ভাষাও কার্যকরী হয়েছিল। উনিশ শতকে বাংলাভাষায় সংস্কৃতের অতিরিক্ত প্রভাবের সমালোচনা করেছিলেন Grierson ,প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ। তাছাড়া ডঃ কাজী আব্দুল মান্নানের লেখা - The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal upto 1855 গ্রন্থটিতেও ফারসি প্রভাবিত বাংলার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। ফারসি এবং সংস্কৃত ভাষার টানা পোড়েনের সঙ্গে ইংরেজী ভাষার Syntax এবং যতিচিহ্ন যুক্ত হয়ে বাংলা ভাষা উনিশ শতকের শেষে উচ্চতর সাহিত্যের ভাষা হিসাবে রূপ নেয়।

ভাষা তৈরি করার ক্ষেত্রে পন্ডিতদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাবের পর কমে আসে। তবে সাহিত্য পরিষৎকে ঘিরে আরেক নতুন পন্ডিতমন্ডলী তৈরি হয় যা বাংলা ভাষায় আধুনিক পর্যায়ে একটি নিজস্ব ধারা চালিয়ে গিয়েছিল। যেমন অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, হরপ্রসাদ,শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী , পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁরা সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন তবে আধুনিক বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

সূত্রনির্দেশ ঃ—

১। শ্রী সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস , দ্বিতীয় খণ্ড, উনবিংশ শতাব্দ , ৫ম সংস্করণ ১৩৭০, পৃষ্ঠা-১০

২। ঐ পৃষ্ঠা -১৪

৩। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, (উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী) কলকাতা , ১৪০১, পৃষ্ঠা-১ ৫

৪। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড , পৃষ্ঠা-২ ৬

৫। Samita Sinha, Pandits, In Changing Environment, Calcutta,1993, P-177

৬। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -২২

৭। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সংস্কৃত অধ্যাপক জীবনী, ১মখণ্ড, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৩৫৯

রামদুলাল দে সরকার উনবিংশ শতকের বিস্মৃতনাম

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

কুঁড়েঘর থেকে রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলেছেন এবং কানাকড়ি থেকে কোটিপতি হয়েছেন ব্যবসা করে, এরকম দৃষ্টান্ত বাঙালী সমাজে বিরল। দ্বারকানাথের একপুরুষ আগে এই বিরল দৃষ্টান্তের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হলেন রামদুলাল দে সরকার।[১] শেষ জীবনে রাম দুলাল কোটিপতি হয়েছিলেন এবং বিলেতের 'লন্ডন টাইমস' পত্রিকায় তাঁর পুত্রদের 'Rothschild's of Bengal' বলে ভূষিত করে। ইংরাজ আমলের আদিপর্বের বাঙালী ধনপতিদের ধনার্জনের কীর্তি সম্বন্ধে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়। রামদুলাল সম্বন্ধে এরূপ কাহিনী অভাব নেই।

বর্গীর আক্রমণের ভয়ে কোলকাতা থেকে যখন জনসাধারণ পালিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় বলরাম দে পত্নীসহ গৃহত্যাগ করেন। পথিমধ্যে উন্মুক্ত প্রান্তরে রামদুলালের জন্ম হয়। নিকটবর্তী একটি গ্রামে চাষীর পরিত্যক্ত কুটিরে রামদুলালের মাতাপিতা নবজাত শিশুসহ আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ কুটিরে পাঁচ বছর বয়সে মাতৃ বিয়োগ ও দুমাস পরে পিতৃবিয়োগ হয়। রাম দুলাল তাঁর মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাসের আশ্রয়ে কোলকাতা সিমুলিয়ায় আসেন। রামসুন্দরের গৃহিনীর পর দুঃখকাতরতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও অন্যান্য সৎগুণ কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী মদনমোহন দত্তের পত্নীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অল্পদিনের মধ্যে রামদুলালের মাতমহী মদন মোহন দত্তের বাড়ি পরিচারিকার কাজ পেলেন ও রামদুলাল সহ সেই বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। এখানে তিনি কিছু লেখাপড়া শেখেন এবং খেয়ে পরে মানুষ হন। মদন মোহন দত্তের সান্নিধ্যে ব্যবসায়ের প্রেরণা ছেলেবেলা থেকে তাঁর মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। প্রথমে তিনি মদন দত্তের কাছে মাসিক ৫্ বেতনে বিলসরকারের কাজপান। পরে শিপ সরকারের কাজে মাসিক ১০্ বেতনে নিযুক্ত হন। এই সময় মালিকের নামে একটি ডুবো জাহাজ কিনে তিনি যে ব্যবসায়ী বুদ্ধির পরিচয় দেন তাতে মদন দত্ত খুশি হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। এই পুরস্কারের টাকা নিয়ে রামদুলাল স্বাধীন বাণিজ্য শুরু করেন। তারপর তাঁর জীবনের ইতিহাস কেবল ভাগ্য, সাফল্য ও টাকার ইতিহাস। রামদুলালের শেষ জীবন পর্যন্ত এই ইতিহাস কেবল অবিরাম অগ্রগতির ইতিহাস। তাঁর মৃত্যুর পর বাকি ইতিহাস ক্রমাবনতির ইতিহাস। যে ক্রমাবনতির সঙ্গে তাঁর মতো আরও অনেক বাঙালী ধনিক পরিবারের ইতিহাসের সাদৃশ্য আছে।[২]

রামদুলাল Fairlie Fergusson & Co. র বেনিয়ান ছিলেন। ব্রিটিশ এজেন্সি হৌসের মধ্যে বোধহয় বৃহত্তম ছিল এই কোম্পানি। বাজারে এই কোম্পানির এমন প্রতিপত্তি ছিল যে এর দালালরা কোন জিনিষ চাইলে তা আর অন্য কেউ পেত না। এই

কোম্পানির বেনিয়ান হিসাবে রামদুলালের সুনাম, প্রতিপত্তি ও 'ক্রেডিট' বাজারে অদ্বিতীয় ছিল। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকার কাজকর্ম রামদুলালের কথায় এবং সামান্য ইশারায় চলত। টাকায় দু/চার পয়সা দস্তুরি পেয়ে রামদুলাল এই বেনিয়ানের কাজ থেকেই লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন।

ভারতীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে রামদুলাল কোলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হয়ে ওঠেন। নিরন্নকে অন্নদান, অনাথ-আতুরদের জন্য সদাব্রত, দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবনে প্রভূত অর্থ সাহায্য, সমাজ কল্যাণে ও শিক্ষাবিস্তার কল্পে অর্থদান, সংস্কৃত চর্চার জন্য চতুষ্পাঠী স্থাপন ও অধ্যাপক পণ্ডিতদের নিয়মিত বৃত্তিদান, ধর্মকর্ম ও মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং সৎকার্যে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করেও রামদুলাল এক কোটি তেইশ লক্ষ টাকা রেখে যান।[৩] ব্যবসা-বাণিজ্যের বহু দায়-দায়িত্ব বহন করেও কোলকাতার সামাজিক জীবনের নানা কর্তব্য পালন করেও গোপালন ও কৃষিকর্মের-ডেয়ারি ও ফার্মিং এর প্রতি তাঁর আগ্রহ তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন।

কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনে রামদুলাল ত্রিশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় কোলকাতার টাউন হলের সভায় তিনি নগদ একলক্ষ টাকা সভাস্থলেই দান করেন। এরূপে দেশে বিদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে তিনি অকাতরে অর্থ দান করেন। হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হাইড ইস্ট এর বিলাত প্রত্যাগমনের সঙ্গে ২১শে ডিসেম্বর ১৮২১ সালে কোলকাতার এক সভায় রাধাকান্ত দেব, রামদুলাল দে ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ চাঁদা তুলে হাইড ইস্টের প্রতিমূর্তি স্থাপনেরও অভিনন্দন পত্র দানের প্রস্তাব করেন। সেই মত কোলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপযুক্ত চাঁদা দেন। এই সভার বিবরণ ৫ জানুয়ারি সমাচার দর্পণে মুদ্রিত আছে।[৪]

বেলগাছিয়া রামদুলাল ৮৫ বিঘা জমি কিনে 'অতিথিশালা-বাগান' নির্মাণ করেন— এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক হাজার লোক প্রতিদিন চাল, ডাল, আলু, ঘি, জ্বালানি কাঠ ও রান্নার মৃৎপাত্র পেত। এ ছাড়া সিমুলিয়ার নিজস্ব বাসভবনে তিনি প্রতিদিন বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্নদান করতেন এবং বাড়িতে সমাগত ভিখারিদের যথেষ্ট চাউল বিতরণ করতেন।

দরিদ্র প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়ে তাদের অভাব-অনটনের খবর আনার জন্য রামদুলাল একজন পৃথক সরকার নিযুক্ত করেন। তিনজন বেতনভোগী চিকিৎসককে নিয়োগ করেছিলেন---তাদের কাজ ছিল পীড়িত ব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়ে বিনা ব্যয়ে রোগী দেখা ও রামদুলালের ব্যয়ে রোগীদের ঔষধপত্র ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করা। প্রতি রবিবার রামদুলাল তাঁর পরিচিত ও বিশ্বস্ত প্রায় পঞ্চাশ জন ভদ্র ব্যক্তিকে নিয়ে প্রতিবেশী ও অন্যান্য দুঃস্থদের বাড়ি গিয়ে তাদের সংবাদ নিতেন ও প্রয়োজনীয় সাহায্য করতেন।

১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তনের পর বাঙলার ধনী

সম্প্রদায় ও বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জমিদারি কেনার প্রবণতা বাড়ে। বহু বাঙালী ব্যবসায়ী পরিবার ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা ধন উপার্জ্জন অপেক্ষা অভিজাত জমিদার হয়ে মধ্যস্বত্ত্ব ও ভূমির উপস্বত্ত্ব ভোগের দিকে আকৃষ্ট হন। রামদুলাল এ মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন। একবার তাঁর নিকট বন্ধক-রাখা মল্লিকদের একটি জমিদারি মল্লিকরা মেয়াদ অন্তে টাকা শোধ দিতে পারলেন না। উপকৃত মল্লিকরা তাঁদের ঋণ শোধ করার অন্য কোন উপায় না দেখে তাঁকে অনুরোধ উপরোধ করে তাঁর নামে সম্পত্তি লিখে দিলেন। মল্লিকদের পুরাতন গোমস্তারাই জমিদারি দেখাশোনা করত। কিছুকাল পরে একদল দরিদ্র প্রজা নায়েবদের জুলুমের ফলে কোলকাতার জমিদার বাড়িতে দুঃখ জানাতে আসে। তাদের বুভূক্ষ শীর্ণ শরীর, জীর্ণ কটিবস্ত্র দেখে রামদুলাল অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। তাদের সমস্ত কর মকুব করে, পুকুরে স্নান ও ভোজনের পর প্রত্যেককে একটি করে নতুন কাপড় দেন। কর্মচারীদের আদেশ দেন পরের দিন সূর্যাস্তের আগে যাতে তাঁর জমিদারি বিক্রয় হয়। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে, জলের দরে জমিদারি বেচে দেন।

রামদুলাল বাঙলায় রোজনামচা রাখতেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর এই অমূল্য দিনলিপিগুলি পরবর্তী প্রজন্ম রক্ষা করেন নি। ১৮৬৮ সালে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক গিরিশ চন্দ্র ঘোষ এই দিনলিপিগুলির সন্ধান পান নি। এই রোজনামচা পেলে অষ্টাদশ—উনবিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে বাঙলার সমাজ ও বাণিজ্য বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেত।

গিরিশ চন্দ্র গোষ 'হিন্দু পেট্রিয়টে' বলেছেন আঠার শতকের শেষে আমেরিকা স্বাধীন হবার পর থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে তার বহির্বাণিজ্যের যোগাযোগ ঘটে প্রধানত রামদুলাল দের মাধ্যমে। রামদুলাল তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী, বিদেশে চীন থেকে ইংলণ্ড আমেরিকা পর্যন্ত বণিকমহলে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মৃত্যুর পরে ব্যবসায়ের খাতাপত্র থেকে যে সমস্ত আমেরিকান বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া গেছে, তা থেকেই বোঝা যায় আমেরিকার সঙ্গে রামদুলালের ব্যবসা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বস্টনের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান

B. Rick & Sons, E. Rhodes, F. W. Everitt, G. R. Minot, G. Warren, H. Irving, H. G. Warren, J. J. Bowditch, J. S. Amory, J. T. Coleridge ইত্যাদি।

ন্যু-ইয়র্কের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান

Baring Brothers, C. Skimmer, A. Baker Junior, E. B. Crocker, E. Davis, G. Brown, G. S. Higiuson etc.

<u>ফিলাডেলফিয়ার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান</u>

Grant and Stone.

<u>সালেমের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান।</u>

Pickering Dodge, W. Landor.

<u>নিউবেরীর বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান</u>

The Honb'l E. S. Rant, J. H. Telecombe

<u>মার্বেলহেড এর বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান</u>

J. Hooper [৫]

মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ ও অগ্রদূত যাঁরা আমেরিকায় ব্যবসা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বর্তমান যুগে আমেরিকায় তাঁদের নাম অজ্ঞাত ও বিস্মৃত। S. G. Slappey তাঁর "Pioneers of American Business" গ্রন্থের ভূমিকায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, প্রথম যুগের মার্কিন বাণিজ্যের ইতিহাস ও মার্কিন বণিকদের জীবনকথা কেবল আমেরিকার জনগণের অজ্ঞাত নয়, আমেরিকার বণিক সঙ্ঘ ও বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যায়তনের অধ্যাপকদেরও অবিদিত।

প্রায় দুশত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর দুটি সুদূর দেশের মধ্যে যে মিলনের সেতুবন্ধ রচিত হয়েছিল এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ ও নবীন আমেরিকা পরস্পরের নিকট সান্নিধ্যে এসেছিল তা কোন বিখ্যাত দার্শনিক, ধর্মনেতা, চিন্তাশীল লেখক বা রাজনীতিবিদদের চেষ্টায় ঘটেনি। একজন সাধারণ মানুষের পথের ধূলায় যার জন্ম, সততা ও আত্ম শক্তির দ্বারা উন্নতি লাভ করে মর্মর প্রাসাদে যিনি অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন ও আর্ত-পীড়িত বিপন্ন নিরন্ন মানুষদের দুঃখ মোচনে যিনি সদাতৎপর ছিলেন তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা, বন্ধুত্ব, দূরদর্শিতা ও সহযোগিতার ফলেই ঘটেছিল একথা স্মরণীয়।

বিশ শতকের শেষভাগে ভারতবর্ষে ও বাংলায় রামদুলাল দে একটি বিস্মৃত নাম। কিন্তু ভারতীয় চরিত্রের ও বাঙালী চরিত্রের বিশ্বমানবতার একটি চিরস্মরণীয় রূপ তাঁর জীবন ও চরিত্রের মধ্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে একথা অনস্বীকার্য।[৬]

আমেরিকার ব্যবসায়ীরা রামদুলালকে এমন শ্রদ্ধা করতেন যে একটি আমেরিকান জাহাজের নামকরণ করেছিলেন 'রামদুলাল'। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের একটি পোর্ট্রেট তারা উপহার পাঠিয়েছিলেন রামদুলালকে। রামদুলালের বাণিজ্যের পণ্য তাঁর নিজের চারখানি জাহাজে বিদেশে যাতায়াত করত তাদের নাম ছিল 'রামদুলাল দে', কন্যার নামে 'বিমলা', ডেভিড ক্লার্ক নামে।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষ পর্বের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও প্রতিপত্তি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মৃত্যুর সময় রামদুলাল প্রায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছিলেন। এই টাকায় তার পুত্র ও নাতিরা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে

বৃহত্তর করতে পারেন নি। বরং তার অবনতির পথই ধীরে ধীরে প্রশস্ত করেছিলেন। বাণিজ্যের বদলে স্বাধীন শিল্পোদ্যমের কথা তারা চিন্তাও করেন নি। অথচ রামদুলালের সারা জীবনের সঞ্চিত বিপুল মূলধন পেয়েছিলেন তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে বাংলাদেশের টাটা বা বোম্বাইয়ের মিল-মালিকদের মতো বড় বড় কল কারখানার তারা মালিক হতে পারতেন। উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ মূলধন দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, ভোগ বিলাসিতায় ও নানারকমের আনুষ্ঠানিক বাহ্যাড়ম্বরে তা ক্ষয় করেছেন।[৬]

সূত্র-নির্দেশ :—

১। বিনয় ঘোষ—বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ১১৪।
২। Girish Chandra Ghosh : Ramdoolal Dey, The Bengali Millionaire - A lecture delivered at the Hall of the Hooghly College on March 14, 1868.
৩। মদনমোহন কুমার, ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ, রামদুলাল দে, কলকাতা, পৃ.২০
৪। 'সমাচার দর্পণ'—২৬ জানুয়ারি, ১৮২২।
৫। বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৬।
৬। তদেব, পৃ-১১৮।

সমাজের নাম ইস্ট ইন্ডিয়ান ঃ কবির নাম ডিরোজিও

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

There is a lonely land, and gloomy cells
The dusky nation of cimmeria dwells [১]

মেঘের ভিতর থেকে ছুরির ফলার মতো সূর্যের আলো যেভাবে বেরিয়ে আসে হতাশাচ্ছন্ন ও অবদমিত একটি সমাজের ভিতর থেকে তেমনি বের হয়ে এসেছিলেন এক কবি। কবির নাম ডিরোজিও। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯, ১৮এপ্রিল — ১৮৩১, ২৬ ডিসেম্বর)। সমাজের নাম ইস্ট ইন্ডিয়ান।

ইতিহাসের নিদানে আধুনিক কালে ইউরোপীয় ও এশীয়দের মিশ্রণজাত এক নতুন সম্প্রদায়ের উদ্ভব এদেশে অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। ১৯১১ সালের সেন্সাস অনুসারে তাদের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলা হলেও বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞানে তাদের বিভিন্ন সময় চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম দিকে তাদের বলা হত 'country -born তারপর 'Indo-Briton', একসময় এঁরা চিহ্নিত হতেন 'Eurasion' নামে, বর্তমানে এঁদের সাংবিধানিক অভিজ্ঞান 'Anglo-Indian'।[২] একটা বিশেষ সময়পর্বে এঁরা নিজেদের 'East-Indian' নামে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন। ডিরোজিও ছিলেন সেই বিশেষ সময় পর্বের কবি। ডিরোজিওর ব্যবহৃত বিভিন্ন ছদ্মনামের মধ্যে একটি ছিল 'ইস্ট ইন্ডিয়ান'। ভালোভাবে খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় 'ইস্ট ইন্ডিয়ান' তাঁর একটি ছদ্মনাম মাত্র নয় এটি একটি প্রণিধানযোগ্য সামাজিক অভিজ্ঞান।

এদেশে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেউ কেউ দেখিয়েছেন তাদের ওঠা-পড়ার ইতিহাসে আছে চারটি পর্ব।[৩] প্রথম পর্ব ১৪৯৮-১৭৮৫। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি এই সময় পর্বে তথাকথিত 'Half caste' দের পৃষ্ঠপোষকতা করত। তখন হাফ-কাস্টদের মনে করা হত an valuable asset to the atmosphere of the trade', inter racial marriage' এ সময় উৎসাহ দেওয়া হত। আলবুকার্ক (১৫১০) তো পর্তুগীজদের ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারে উৎসাহই দিতেন। ব্রিটিশ সৈনিক ও ভারতীয় স্ত্রীর সন্তান হলে মাসিক ৫ টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা ব্রিটিশ কোম্পানি এক সময় ঘোষণা করে সে সংবাদও আছে।[৪] সুতরাং 'Christian zeal' এবং ঔপনিবেশিক শাসন কর্তাদের 'diplomatic policy' র ফলে এদেশে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের বাড়-বাড়ন্ত হয়েছিল।[৫]

ঘটনাক্রমে এই পৃষ্ঠপোষকতা মন্ডিত সুখপর্বের ইতি ঘটল। শুরু হল প্রত্যাখ্যান ও অবদমন পর্ব। নোয়েল পি. জিস্টের ভাষায় 'Repressive years'। ১৭৮৫ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত বিস্তৃত এই দ্বিতীয় পর্ব।[৬] ঔপনিবেশবাদী শক্তি প্রথম পর্বে হাফ কাস্টদের

পৃষ্ঠপোষকতা করত তার যেমন কারণ ছিল তেমনি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে অবদমন পর্বে সরে আসার ও সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল। এবং সে কারণ উপনিবেশবাদের অস্তিত্ব রক্ষায় সঙ্গেই জড়িত। বিশ্বজোড়া উপনিবেশবাদের জেলে আলাদা আলাদা হলেও জাল একটাই। ফলে পৃথিবীর এক প্রান্তে টান পড়লে অন্য প্রান্তেও জাল গুটিয়ে আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ঠিক সেই ব্যাপারটাই ঘটল। পশ্চিম গোলার্ধে হাইতিতে ইউরোপীয় ও স্থানীয় নিগ্রোজাতির মিশ্রণে Mulatto বা Haytian নামে এক মিশ্র জাতির উদ্ভব হয় যারা শ্বেতাঙ্গ স্পেনীয়ার্ডদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং জোর পূর্বক তাদের উচ্ছেদ করে 'Negro Republic of Hayti' এবং 'Mulaltto Dominical Republic' নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলে।[৭] পশ্চিম গোলার্ধের হাফ কাস্টদের এই কান্ডকারখানায় পূর্ব গোলার্ধের ঔপনিবেশিক শাসকরা প্রমাদ গোনে। পশ্চিম গোলার্ধে যা ঘটেছে পূর্ব গোলার্ধে ঘটতে কতক্ষণ ? 'Calcutta Cronicle' এ এক শ্বেতাঙ্গ সম্পাদক হুঁশিয়ারী দিয়ে লেখেন- If forth with drastic measures are not put into operation to keep down the *East Indian* race, they will do to the British in India what Mulattoes have done to the Spaniards in San Domingo'.[৮] ব্রিটিশ শাসকরা অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে পড়লেন এবং হাফ-কাস্টদের বাড়-বাড়ন্ত রুখে দেওয়া যায় এমন সব নীতি ও আইন প্রণয়ন করা হল। ১৭৯১ সালে কোম্পানি এক আদেশনামা জারি করে বলে,

'No person born the son of native India; i.e. the son of European father and an Indian mother, would in future be employed by the civil, military or marine services of the company'.[৯]

তাদের সন্তানেরা উচ্চশিক্ষার্থে বিলেত যেতে পারবে না। কর্মহীনতা, অশিক্ষা ও অমর্যাদার মধ্যে নিক্ষেপ করা হল একটা সমাজকে। ১৮০৮ সালে সামরিক বিভাগ থেকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের ব্যাপকভাবে কর্মচ্যুত করা হয়। ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনী লিখেছেন, 'There after a dense, impregnable wall of social and economic discrimination was drawn around the Anglo-Indians'.[১০] মনে রাখতে হবে এই পরিবেশে ডিরোজিওর জন্ম ১৮০৯ সালের ১৮ এপ্রিল। ১৮২১ সালে মুর্শিদাবাদের এক শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট এক মামলায় রায় দিয়ে জানালেন, 'The East Indians were not British subjects as by law defined'[১১] হেনরি ডিরোজিরও বয়স তখন বারো।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের এই অবদমন ও প্রত্যাখ্যানমূলক ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে থাকতে ইউরেশিয়ান সমাজ ক্রমশ আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারে এখন তাদের সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ হয়ে ওঠার সময়। নানারকম সভা-সমিতি ও সংগঠনের মধ্যে তারা মিলিত হতে থাকে। গ্রহণ করতে থাকে নানা রকম ইতিবাচক

কর্মসূচি। ইউরেশিয়ানরা সম্প্রদায়গত ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ও উজ্জীবিত করার জন্য কি কি করেছিল ' H. A.Stark তাঁর 'John Ricketts and his Times [১২] গ্রন্থে সে-বিবরণ কিছুটা তুলে ধরেছেন। স্থান সংক্ষেপের কথা ভেবে সেই সব উদ্যোগের উল্লেখমাত্র করছি। *পেরেন্টাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশন* (১৮২৩, ১ মার্চ) - জন রিকেটসের উদ্যোগে ইস্ট ইন্ডিয়ান ছাত্রদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়। *ক্যালকাটা মেরিন স্কুল* - বিখ্যাত জাহাজ ব্যবসায়ী জেমস কীডের উদ্যোগে সমুদ্রে জাহাজ চালানো সংক্রান্ত বিষয় শিক্ষণের জন্য স্থাপিত। *প্যামপ্লেট* - জেমস কীড ইস্ট ইন্ডিয়ান তরুণদের স্বনির্ভর হবার আহ্বান জানিয়ে একটি পুস্তিকা প্রচার করেন - 'Thoughts How to better the conditions of Indo-Britons' *ক্যালকাটা অ্যা প্রেনটিস সোসাইটি* জেমস কীডের উদ্যোগে ইস্ট ইন্ডিয়ান ছেলেদের হাতে কলমে কাজ শেখার জন্য স্থাপিত প্রতিষ্ঠান। কিছু নির্বাচিত ছেলেকে এই সোসাইটি থেকে হাতে কলমে কাজ শিখতে বিলেত পাঠানো হত। *ইস্ট ইন্ডিয়ান ক্লাব* - ১৮২৮ সালের ১৪ই মার্চ জি. এস. ডিকের সভাপতিত্বে টাউন হলে ইস্ট ইন্ডিয়ানদের জন্য এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। *ইস্ট ইন্ডিয়ান কলোনাইজেশন সোসাইটি* - ফতেগড় ও ফুলশের নামে দুটি জায়গায় ইস্ট-ইন্ডিয়ান কলোনী স্থাপনের পরিকল্পনা করেন সি. আর ফেনউইক। *ইস্ট ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন* - ইস্ট ইন্ডিয়ান সমাজকে সংগঠিত করার জন্য জি. ওয়ার্ডসত্তয়ার্থ ডাবলু, ডি. কোস্টা, জি, এস, ডিফ, জন রিকেটস প্রমুখের উদ্যোগে এই আসোসিয়েশন গঠিত হয়। প্রসপেকটাসে বলা হয়, 'The object of the Association into enquire and ascertain the state and circumstances of East Indian to endeavour, by all lawful means, to remove the grievances under which they labour and to promote their intellectual moral and political improvement.' [১৩] *ইস্ট ইন্ডিয়ান পিটিশন* - ইস্ট ইন্ডিয়ান সমাজ মিটিং এর পর মিটিং এ মিলিত হয়ে তাদের ন্যায় গত দাবিগুলি আদায়ের জন্য বিলেতে পার্লামেন্টে পিটিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। জন রিকেটস সেই পিটিশন পার্লামেন্টে পৌঁছে দিয়ে আসেন। ফিরে এলে টাউন হলে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। ডিরোজিও সেই সম্বর্ধনা সভায় আবেগদীপ্ত বক্তৃতা করেন (১৮৩১, ২৮ মার্চ)।[১৪] *ইস্ট ইন্ডিয়ান জার্নাল* [১৫] ১৮৩১ সালের ১জুন 'ইস্ট ইন্ডিয়ান' নামে একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ডিরোজিও স্বয়ং ছিলেন এর মালিক ও সম্পাদক।

প্রত্যাখ্যান ও অবদমনের হতাশা থেকে একটি জাতি যখন জেগে উঠতে চাইছে, নানা ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে তার মর্যাদাপূর্ণ স্বাধীন অস্তিত্ব ডিরোজিও এসেছিলেন ঠিক সেই সময়। ডিরোজিও যেন ভস্ম অপমানের ভিতর থেকে জেগে ওঠা ফিনিক্স পাখি।

প্রসঙ্গত বলে নেওয়া দরকার একটি সমাজ যখন আত্মসচেতন হয়ে ওঠে তখন

নিজেদের পরিচয়জ্ঞাপক অভিজ্ঞান বিষয়েও তারা স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। ইউরেশিয়ানদের ক্ষেত্রেও তা হয়েছিল। ১৮২৫ সালের ১৪ ই মার্চ মি. জি. এস ডিকের সভাপতিত্বে টাউন হলে একটি সভায় এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় 'the term 'East Indian seems to be the most agreeable as well as the most applicable and proper disignation'.[১৬] অতঃপর 'ইস্ট ইন্ডিয়ান'ই হয়ে ওঠে তাদের স্বনির্বাচিত অভিজ্ঞান। অ্যাসোসিয়েশন, ক্লাব, পিটিশন, জার্নাল প্রায় সব ক্ষেত্রেই তারা ব্যবহার করত 'ইস্ট ইন্ডিয়ান' শব্দটি। ডিরোজিও প্রথমে 'জুভেনিশ' ছদ্মনামে লিখতেন। ১৮২৬ সালে তাঁরই সক্রিয়তায় 'Indian Magazine' নামে যে পত্রিকা বের হয় তাতে 'ইস্ট ইন্ডিয়ান' ছদ্মনামে কবিতা লিখতে শুরু করেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা থেকে কর্মচ্যুত হবার পর তিনি যে পত্রিকা প্রকাশ করেন তার নাম দেন 'ইস্ট ইন্ডিয়ান'। ডি.এল.রিচার্ডসন যে তাঁকে ইস্ট ইন্ডিয়ান কবি হিসাবে তাঁর কাব্য সঙ্কলনে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন তা অকারণ ছিল না।[১৭] ইস্ট ইন্ডিয়ান সমাজের ন্যায়সঙ্গত দাবির সমর্থনে ডিরোজিও স্বয়ং আবেগদীপ্ত রাজনৈতিক বক্তৃতা করতেন। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়ান পিটিশন কমিটির মেম্বরও ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়ান আইডেনটিটির সঙ্গে ডিরোজিও পাকে পাকে জড়িয়ে গিয়েছিলেন।

নিজস্ব reference group এর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ইউরোশিয়ানরা যখন ইস্ট ইন্ডিয়ান অভিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে identity crisis এর সমাধান খুঁজছে ডিরোজিও সেই সময়ের কবি। হতাশার ধুলো ঝেড়ে ইস্ট ইন্ডিয়ানরা খুঁজতে চাইছিল তাদের অস্তিত্বের সঠিক ঠিকানা। আত্ম সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে বাড়ানো ছিল তাদের পা। পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়ান পিটিশন পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল তাদের প্রতি যে অবিচার হচ্ছে তা বড় কর্তাদের জানানো। জে. ডাবলু রিকেটের মতো ইস্ট ইন্ডিয়ান নেতারা মনে করতেন পার্লামেন্ট সুবিবেচক নীতি প্রণেতারা থাকেন তাদের কাছে সমস্যাটা ঠিকমতো পেশ করতে পারলে সমাধান হয়ে যাবে। ডিরোজিও এই আবেদন নিবেদনের পথে সামিল হয়েছিলেন। টাউন হলের বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, complain again and again; complain till you are heard - aye until you are answered'.[১৮]

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ইস্ট ইন্ডিয়ানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান ছিল উপনিবেশবাদী ইউরোপীয় শাসক ও শাসিত দেশী ভারতীয়দের মধ্যবর্তী ভূগোলে।[১৯] উপনিবেশবাদী সাহেবদের সঙ্গে গাঁঠছড়া বাঁধার আবেদন নিবেদন মূলক পথ ছাড়া আর একটি পথই খোলা ছিল তা হচ্ছে দেশীয়দের সঙ্গে মিলিত মিশ্রিত হওয়া। সাংগঠনিক ভাবে ইস্ট ইন্ডিয়ান সমাজ সেই পথের কথা না ভাবলেও ডিরোজিও ব্যক্তি হিসাবে সেই স্বপ্ন লালন করতেন সে প্রমাণ অপ্রতুল নয়। হিন্দু কলেজের দেশীয়

ছাত্রদের আপন করে নেওয়া, যুগপৎ তাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয় স্পর্শ করা সম্ভব ছিল না। যদি না তিনি দেশীয়দের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কথা ভাবতেন। এদেশকে তিনি স্বদেশ বলে মনে করতেন বলেই লিখতে পেরেছিলেন, 'I was born in India, have been bred here, I am proud to acknowledge my country and to do my best in her service;[২০] হিন্দু কলেজ থেকে কর্মচ্যুত হবার পর ইস্ট ইন্ডিয়ান সমাজের দিকে স্বভাবতই বেশি করে ঝুঁকে পড়েছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু কোনরকম সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা তাকে গ্রাস করেনি। ইস্ট ইন্ডিয়ান পিটিশন কমিটির সভায় তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা ও তাঁর সম্পাদিত 'ইস্ট ইন্ডিয়ান' পত্রিকার প্রসপেকটাস অনুধাবন করলে দেখা যায় সম্প্রদায় গত সংকীর্ণতা তাঁর চিন্তায় কোথাও ছায়া ফেলেনি।[২১]

ইস্ট ইন্ডিয়ান সমাজের জন্য একটি বিকল্প পথের বার্তা তিনি রেখে গেছেন ধর্মতলা একাডেমির পরীক্ষা নিতে গিয়ে ছাত্রদের জন্য প্রদত্ত একটি ভাষণে।[২২] এটাই ছিল তাঁর শেষ বক্তৃতা ব্রিটিশদের সঙ্গে আপোষরফা ও সম্পর্ক রক্ষাকেই যাঁরা অস্তিত্ব রক্ষায় একমাত্র পথ বলে ভাবছিলেন ডিরোজিও তাদের সামনে তুলে ধরেছেন অন্য একটি পথের দিশা। বক্তৃতায় ডিরোজিও বলেন, ধর্মতলা একাডেমিতে এসে তার ভালো লাগছে এইজন্য যে হিন্দু ও ক্রিশ্চিয়ান যুবকরা একসঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে লেখাপড়া ও মেলামেশা করছে এবং একসঙ্গে মানুষ হচ্ছে। যে সব ক্রিশ্চিয়ান অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের দেশীর ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেয় না ডিরোজিওর মতে এটা আত্মহনন (suicidal) ছাড়া কিছু নয়। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার যন্ত্রণা তো ইস্ট ইন্ডিয়ানরা জেনেছে। তারা কি সেই পথেই চলবে? We hope not. They will find after all that it is their best interest to unite and co-operate with the other native inhabitants of India'[২৩] ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সহযোগিতা ও মিলনের পথেই রয়েছে তাদের সঙ্কটমুক্তির দিশা। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই বক্তব্য রাখার দিন দশেকের মধ্যেই ডিরোজিওর অকাল মৃত্যু হয়। তাঁর নির্দেশিত পথে ইস্ট ইন্ডিয়ান সমাজ এগিয়ে গেলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ শাসকরা প্রমাদ গোণে। যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজকে তারা দীর্ঘদিন প্রত্যাখ্যান ও পেষণের মধ্যে রেখেছিল বিপদের দিনে তারা আবার তাদের পরমাত্মীয় বলে আলিঙ্গন করে। সিপাহী বিদ্রোহের অদূরদর্শী নেতারা এখানে -ওখানে নির্বিচারে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করে তাদের ব্রিটিশ শাসকদের দিকে ঠেলে দেয়। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বীরেরা এই সুযোগে ব্রিটিশ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আবার 'English boy' হয়ে যায়।[২৪] ১৮৫৭র পর শুরু হয় ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের মধুর সম্পর্ক গর্ব। কেননা ব্রিটিশ শাসকরা হৃদয়ঙ্গম করে এদেশে

টিকে থাকতে হলে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের স্বপক্ষে রাখাই সমীচীন। এই পর্ব চলে ১৯৪৭ পর্যন্ত। এদেশ থেকে ব্রিটিশদের পাততাড়ি গুটানোর সময় আবার অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা অনাত্মীয় হয়ে যায়। সে আর এক ইতিহাস। ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনী তাঁর 'British betrayal in India, The Story of Anglo Indian community' [২৫] গ্রন্থে তাদের সম্পর্কের তালফেরতা ইতিহাস খানিকটা তুলে ধরেছেন।

আমাদের বক্তব্য ঃ দেশীয়দের সঙ্গে সমন্বিত হবার যে পথনির্দেশ ডিরোজিও তাঁর শেষ প্রকাশ্য বক্তৃতায় রেখেছিলেন তা যদি ইস্ট-ইন্ডিয়ান সমাজ শিরোধার্য করতেন এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের কাছে টানার কূটনৈতিক তাৎপর্য বোঝার ক্ষমতা সিপাহী - বিদ্রোহের একজন নেতারও থাকত তাহলে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বাস্তবিকই সেদিন 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু কি হলে কি হতে পারত সেই কল্পকথা দিয়ে ইতিহাস সাজানো যায় না। তবে ব্যক্তিমানুষের অবস্থান ও ভূমিকা শুধু অতীত নয়, ভাঙা চোরা ভবিষ্যতের প্রেক্ষিত দিয়ে চিনে নেওয়া যায়। ইতিহাসের এক নতুন সম্ভাবনা কক্ষের সামনে স্বপ্নের চাবিকাঠি নিয়ে সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন অনধিক তেইশ বছরের ইস্ট ইন্ডিয়ান যুবক, অকাল মৃত্যু এসে সে চাবিকাঠি চিরকালের মত ছিনিয়ে নিয়ে গেছে নইলে ...

অবদমন ও উজ্জীবন দিয়ে বোনা একটি সমাজ ও সময়ের প্লট। ডিরোজিও সেই সময়ের মন্থন জাত এক ব্যক্তি পুরুষ। তাঁর সম্পর্কে বলার কথা এই যে প্লটের দাসত্ব করেননি তিনি; প্লটের কাঠগড়া ভেঙে প্রকৃত নায়কের মতোই সময়ের পিঠে সওয়ার হতে পেরেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়ান সমাজের জাতক তিনি, ইস্ট ইণ্ডিয়ান সমাজের সঙ্গে পাকে পাকে জড়ানো ছিল তাঁর অস্তিত্ব কিন্তু কোন বিশেষ সম্প্রদায় চেতনার কাছে তিনি বন্ধক রাখেন নি তাঁর মনন ও সৃজন।

নিছক ইস্ট ইণ্ডিয়ান হয়েই থাকেন নি, হতে পেরেছেন ভারতীয় ছাত্রদের সফল শিক্ষক ও যথার্থ ভারতীয় কবি। গাছ রস সংগ্রহ করে মাটি থেকে কিন্তু ফুল ফোটায় আকাশে। ইস্ট ইণ্ডিয়ান সমাজ ছিল ডিরোজিওর মাটি; তার মধ্যেই চারানো ছিল তার শেকড়-বাকড় কিন্তু ফুল ফুটিয়েছিলেন যে আকাশে তার নাম ভারতবর্ষ। এবং হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসাবে তিনি অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিলেন বিকচোন্মুখ ভারতীয় কুসুম কলিগুলির দিকে যারা অদূর ভবিষ্যত ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

Expanding, like the petals of young flowers,
I watch the gentle opening of your infant minds, [26]

কোথা থেকে যাত্রা শুরু করলেন সেটা যেমন দেখা দরকার তেমনি দরকার কোথায় পৌঁছুলেন সেটাও দেখা। জীবৎকালটা প্রতিভার মাপা নয়, মহৎ প্রতিভার হদিশ মেলে যাত্রাবিন্দু ও পরিনাম বিন্দুর দৈগন্তিক দৈর্ঘে ও উত্তরণ সাফল্যে। ডিরোজিও যাত্রা শুরু

করেছিলেন হতাশার ধুলোয় ঢাকা ইস্ট ইন্ডিয়ান সমাজের lonely land and gloomy cells' [২৭] থেকে কিন্তু কবি ও শিক্ষক হিসাবে যেখানে পৌঁছেছিলেন তিনি সেখানে ইস্ট ইন্ডিয়ান ও ইন্ডিয়ান সমাজের সমস্ত ভেদ রেখা মুছে গেছে - হতাশার অন্ধকার সরিয়ে ফুটে উঠছে ভোরের শুকতারা।

The infant dawn and mornings herald star
comes trembling into day : O ! can the sun be far ?
INDIA [২৮]

সূত্র-নির্দেশঃ-

1. Cedric Dover. *Cimmerii ? or Eurasians and their Futrue,* Calcutta; The Modern Art Press, 1929
2. Frank Antony *Britains Betrayal in India; The Story of Anglo-Indian Community.* New Delhi, 1968, Chap-1
3. Noel P. Gist and Roy dean Wright, *Mariginality and Identity : Anglo-Indian as a racial mixed minority in India,* Lieden, E.J.Brill, 1973, Chap-10, P-150
4. N.P.Gist and Roy Deam Wright, Ibid, P.10
5. Cedric Dover, Ibid, P-5
6. N.P.Gist, Ibid
7. Reutor. *The Mulatto in the united States*, Bostan, 1918; H.H. Stark, *John Ricketts and his Times*. (Being a Narrative Account of Anglo-Indian Affairs During the Eventful Years from 1791 to 1835), Cacutta, 1934, P-18-20
8. *Calcata Cronicle,* 15 May 1792, op.cit, H.a Stark, Ibid, P-18
9. H.A Stark, *Ibid*; N.P. Gist. *Ibid*, PP-11-12
10. F.Antony, *Ibid,* P-22
11. H.A.Stark, *Ibid*
12. H.A.Stark, *Ibid.*
13. A. Mukherjee, A. Dutta, A.Kumar & S.S. Mukherjee ed. *song of the Stormy Petrel, Complete Works of H.L.V. Derozio,* Calcutta, D.C.C, 2001. P-459 - 460.
14. *Song of the Stormy Petrel,* Ibid, P-367-372
15. *Ibid,* p-86
16. H.A.Stark, *Ibid,* p-3
17. D.L.Richardson. *Selections from the Brithish Poets from the time of chancer to the present day, Baptist Mission Press,* Calcutta 1840.
18. *Song of the Stormy Petrel,* Ibid, p-372
19. N.P.Gist, *Ibid,* p.54 - 'They were forced to make for themselves within the gap between Western and Eastern Caltures;
20. *Song of the Stormy Petrel,* Ibid. p.306
21. *Song of the Stormy Petrel,* Ibid, pp.367-381; p.387

22. *Song of the Stormy Petrel,* Ibid, Examination of the Durrumtolloah Academy, pp 412-413
23. *Song of the Stormy Petrel,* Ibid.
24. H.A. Stark, *The call of the Blood or Anglo-Indian and the Sepoy Mutiny,* British Burma Press, Rangoon, 1932
25. Frank Antony, *Ibid,*
26. *Song of the Stormy Petrel,* Ibid, 'Sonnet to my pupils'. p-245
27. Cedric Dover, *Ibid.*
28. *Song of the Stormy Petrel,* Ibid, 'on the Abolition of Sattee.

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও তাঁর দেশীয় পৃষ্ঠপোষকেরা

শ্যামলী সুর

উনিশ শতকের বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হবার অনেক আগেই জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটেছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। বহির্জীবনে (অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্র, বিজ্ঞান ও শিল্পে) পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক আধিপত্য অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না। তাই ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা অন্তর্জীবনে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণায় আগ্রহী হলেন। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে তাঁরা আত্মসাৎ করেছিলেন পশ্চিমী জ্ঞানদীপ্তির ধারণা, উদ্বেল হয়েছিলেন পাশ্চাত্য রোম্যান্টিকতায়। পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আদর্শের আদলে তাঁরা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বিশিষ্ট আধুনিক জাতীয় সংস্কৃতি যা পাশ্চাত্যের অনুরূপ আবার অভিনব।[১]

আধুনিক জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রধান অবলম্বন ভাষা। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন দেখিয়েছেন ছাপাখানা ভিত্তিক ধনতন্ত্র কিভাবে জাতীয় ভাষার রূপ নির্মাণ করে।[২] ঔপনিবেশিক সমাজে দ্বিভাষিক বুদ্ধিজীবী সচেতনভাবে ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে আপন সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়। মুদ্রিত ভাষাভিত্তিক সাহিত্য শিক্ষিত সমাজের এক যোগসূত্র রচনা করে-জন্ম নেয়া ভাষা পরিচয়ের বৃত্ত।[৩] এই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেই বাংলা তথা ভারতের প্রথম জাতীয় সাহিত্যিক মধুসূদনের জীবন ও কর্ম বিধৃত।

মধুসূদনের প্রচলিত জীবনীগুলিতে তাঁর পোষক গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান এবং মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশে এই গোষ্ঠীর ভুমিকার জটিলতা এর আগে আলোচিত হয়নি। বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য মধুসূদন ও তাঁর পোষক গোষ্ঠীর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক এবং পোষকতার চরিত্র।

॥ ১ ॥

ঐতিহ্যানুসারী বাংলা সমাজে উচ্চবর্ণের জমিদারেরাই ছিলেন সামাজিক শাসক, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিচালক, সাংস্কৃতিক রুচির নিয়ামক। গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা এই জমিদারেরা রক্ষণশীল সমাজ-কাঠামো রক্ষা করার জন্য দেবদ্বিজের পালনপোষণে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করতেন।[৪]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হবাব আগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বাংলার নিয়ন্তা ছিলেন আটটি জমিদার পরিবার-বর্ধমান, রাজশাহী, দিনাজপুর নদিয়া, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, ইউসুফপুর (যশোহর), রাজনগর (ঢাকা)। প্রথম থেকেই কোম্পানির এক অঘোষিত নীতি ছিল ভূমি নিয়ন্ত্রণ থেকে একচেটিয়া কর্তৃত্ব দূর করা। অর্থনৈতিকভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তগুলি এমনভাবে বড় জমিদারদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়

যে এই বন্দোবস্ত প্রবর্তনের প্রথম দশ বছরের মধ্যেই বর্ধমানরাজ ছাড়া বাকি সব জমিদারি সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

পোষিত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলিরও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটল। হুতোমের ভাষায় "হিন্দু ধর্ম্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো।"[৬] হুতোমের বক্তব্য স্পষ্টতই অতিরঞ্জিত। কবির মানও রইল, নাটকের অভিনয়ও রইল-এ নতুন কবি, এ নতুন নাটক। পোষকের রূপান্তর ঘটাল সাংস্কৃতিক মাধ্যমের পালাবদল।

ভেঙে পড়া জমিদারিগুলি নামে বেনামে কিনে নেন বানিয়া মুৎসুদ্দিরা-এরা ইংরেজ বণিকের অধস্তন দালালরূপে বেশ কিছু উপার্জন করেছিলেন। সামাজিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য এরা জমিদারি কিনতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, কেননা ভূমি নিয়ন্ত্রণের ওপরেই নির্ভর করত সামাজিক আভিজাত্য। বানিয়ারা ছাড়াও রাজবাড়ির নায়েব, গোমস্তা, দালাল, মহাজনেরাও জমিদার বনে যায়। বাংলার সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু এক মুদি দোকানি থেকে ফ্যাক্টরির মুহরার, এবং পরে হেস্টিংসের বানিয়ারূপে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেন।

"নবো মুনসী ছিরে বেনে ও পুঁটে তেলি'র"[৭] মত নিম্ন বর্ণের নতুন বাবুরা সামাজিক বৈধতা অর্জনের জন্য নানান ক্ষেত্রে ব্যয় করতে আরম্ভ করেন। কারণ ব্যয়ের পরিমাণেই নির্ণিত হত বাবুর মান। বামুন পন্ডিতের সঙ্গে সঙ্গে আখড়াই, হাফ-আখড়াই গায়ক-দেবার্চনা, মন্দির সংস্কারের পাশাপাশি উত্তর ভারতের ধ্রুপদী গাইয়ে নাচিয়েরা লাভ করত পোষাকের বদান্যতা। চাষের উন্নয়নের জন্য উদ্বৃত্ত পুঁজি থাকে না, থাকলেও তা নিয়োজিত হয় মহাজনী ব্যবসা, শস্য মজুতদারি, কোম্পানির শেয়ার কেনা, শহরে ভাড়া দেওয়ার বাড়ি তৈরি প্রভৃতি অধিকতর লাভজনক ক্ষেত্রে। তবুও জমিদারি থেকে যায় সামাজিক প্রতিপত্তির উৎস।

জমিদারির নতুন তাৎপর্য বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ, ইংরেজ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। সিপাহী বিদ্রোহোত্তর যুগে ইংরেজ সরকার ঔপনিবেশিক শাসনের প্রধান ভিত্তিরূপে আভিজাত্যকে ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রায় প্রতি বছর দরবার করে শত শত পরিবারকে দেওয়া হয় রাজা, মহারাজা, নবাব প্রভৃতি সামন্ত উপাধি।[৮] মধুসূদনের পোষকদের মধ্যে পাইকপাড়ার সিংহ পরিবার, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার, জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার, কাশিমবাজার রাজ পরিবার—সকলেই ছিলেন ইংরেজের দেওয়া রাজা, মহারাণী প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত।

ভূমিভিত্তিক অভিজাতদের পাশাপাশি এক নতুন প্রজন্মের এলিট, তিরিশের দশকের পর থেকে শাসকগোষ্ঠীর সমর্থনে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৪৮ সালের আগেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের তৈরি করা, টোগোর অ্যান্ড কোম্পানি এবং রামদুলাল

দের পুত্র আশতোষ দের পরিচালিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটে। সুতরাং, নতুন এলিট গোষ্ঠী শেঠ, বসাক, দের বা ঠাকুরদের মত কোন স্বাধীন ক্ষেত্রে বিচরণ করেন নি। তাঁদের অবদানের মূল চৌহদ্দি কোলকাতা কেন্দ্রিক পরিবর্তন।[৯]

উনিশ শতকের প্রথম দিকে কোলকাতার নব্যধনীদের সাংস্কৃতিক অভ্যাসে মোগল দরবারি সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী সংস্কৃতি এবং গ্রামীণ লোক সংস্কৃতির এক অসম মিশ্রণ ঘটেছিল। শতকের মাঝামাঝি পূর্বতন ত্রিধারার মিশ্র সংস্কৃতির শেষ হয়।[১০] কোলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা "অনুপস্থিত ভূস্বামীরা" প্রশাসনিক মধ্যবিত্তদের নেতৃস্থানীয় বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল, রাজনারায়ণ বসুর সহায়তায় গড়ে তোলেন এক বিশিষ্ট এলিট সংস্কৃতি। এই সাংস্কৃতিক রুচি গঠনে খ্রিস্টান মিশনারি এবং কোম্পানির শাসকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সচেতনভাবে নিম্নবর্গের গ্রামীণ লৌকিক সাংস্কৃতিক রুচিকে স্তব্ধ করে দিয়ে পাশ্চাত্য আদর্শে ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের উপাদানকে কাজে লাগিয়ে অভিজাত দেশীয় সংস্কৃতি গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেন। পূর্বতন মিশ্র সংস্কৃতির নৈরাজ্যের মৃত্যু ঘটে।

লুঠেরা জমিদার আর মুৎসুদ্দিদের সংস্কৃতিবান উত্তরাধিকারীরা এবং প্রশাসনিক মধ্যবিত্তরা এগিয়ে এলেন নতুন জাতীয় রুচি সৃষ্টি করতে। বাস্তব জীবনে বিদেশি সরকারের প্রতি আনুগত্য ও চাকরি পাবার তাগিদও ছিল, আবার বৌদ্ধিক স্তরে দেশীয় সংস্কৃতির উপযুক্ত প্রকাশ মাধ্যম আবিষ্কারের আকুলতাও ছিল।

আধুনিক জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণের এই সামূহিক প্রচেষ্টাই মধুসূদনের সাহিত্য প্রতিভা উন্মোচনের উপযুক্ত পটভূমি।

।। ২ ।।

আগে পোষ্টার অর্থনৈতিক শ্রেণীর দ্বারাই চিহ্নিত করা হত একটি বিশেষ শিল্পরূপকে। কিন্তু শিল্প-সমাজতত্ত্বের আধুনিক ধারণা অনুযায়ী কোন সমাজে, বিশেষত কোন ঔপনিবেশিক সমাজে, সৃষ্টিশীল শিল্পের চাহিদা অথবা উৎপাদনকে কেবলমাত্র আর্থিক অনুদানের মাপকাঠিতে যাচাই করা চলে না। ইউরোপীয় শিল্পের বারোক (baroque) পর্বে ইতালীয় পোষকের চূড়ান্ত বদান্যতা সত্ত্বেও ইতালিতে উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি হয় নি। হয়ত, পোষকের অতিরিক্ত সহনশীলতার জন্যই শিল্পের গুণগত মান নেমে গিয়েছিল। আবার, হ্যাজলিট দেখিয়েছেন কি প্রতিকূল পরিবেশে ইংল্যাণ্ডে রোম্যান্টিক আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল।

ফ্রান্সিস হাসকেলের মতে অর্থনৈতিক পোষকতা শিল্পসৃষ্টির বহু প্রবর্তনার মধ্যে অন্যতম মাত্র। পোষকের আর্থসামাজিক অবস্থানের তুলনায় শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী ও পোষকের শিল্প আদর্শগত মিল।[১১]

প্রসঙ্গত, শিল্পমাধ্যমরূপে সাহিত্যের বিশিষ্টতা উল্লেখ করা যায়। সাহিত্য একটি

শিল্প মাধ্যম হলেও তার বাহন অক্ষর ও শব্দ—যা একটি নির্দিষ্ট কৌম সমাজের সীমানাতেই অর্থবহ হয়ে ওঠে। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত বৌদ্ধিকসূত্রে আবদ্ধ বলেই, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিল্পভাষার তুলনায় সাহিত্যভাষার সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের যোগ ঘনিষ্ঠতর। সাহিত্যিক নিজে সেই সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে সচেতন না হলেও সাহিত্যের সঙ্গে পাঠক সমাজের প্রত্যক্ষ ও সুপ্ত সম্পর্ক থেকে যায়। এই সমাজই সমালোচনার নির্ধারিত মাপকাঠিতে বিচার করে শিল্পরূপের রসাস্বাদন করে। বোদ্ধা সমাজের বাইরে সাহিত্যের কোন অস্তিত্ব নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখক নিজেই পাঠক, সাহিত্য গোষ্ঠীর নিয়মিত সদস্য। আবার কখনও কখনও পোষকই লেখক ও রুচির স্রষ্টা।

উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলার সাহিত্য রুচির নিয়ামক ইংরেজ সরকার, ইংরেজি শিক্ষিত ধনাঢ্য ভূস্বামী এবং প্রশাসনিক মধ্যবিত্ত। সাহিত্যের মজলিস বসত বাবুর বৈঠকখানায়-কাজেই অধিকাংশ সময়ে প্রধান হয়ে উঠত তাঁর কণ্ঠস্বর।[১২]

১৮৫৬ সালে মধুসূদন মাদ্রাজ থেকে কোলকাতায় ফিরে এলেন। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলন, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ এবং ৬০-এর দশকে নীল বিদ্রোহ বাংলার শিক্ষিত প্রশাসনিক মধ্যবিত্ত সমাজকে আলোড়িত করে।

এই সময়ের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রকাশ ঘটে নাট্যসাহিত্যে। কারণ, নাটক বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যোগস্থাপনের একটি প্রধান ক্ষেত্র— যেখানে নাট্যকার, নট এবং দর্শক একটি বিশেষ ভাবনাসূত্রে গ্রথিত হয়।[১৩] বাংলায় নাটক আগেও ছিল, তবে তার রূপ ছিল লৌকিক, যাত্রা-কথকতা-কবিগান। ভদ্রলোকের আধুনিক বিকল্প শিল্পরূপ থিয়েটার। মূল সংস্কৃত নাটকগুলি অনুবাদ করে অথবা পৌরাণিক বিষয়ে নাটক রচনা করে ইংরেজি থিয়েটারের আদলে সেগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করা হল। কারণ, ইংরেজি তর্জমা নাটকের সংকীর্ণ পবিসরে বাঙালির রস পিপাসা মিটল না। ইংরেজ কর্তৃপক্ষও এই ধরণের পরীক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ১৮৫৯ সালে রেভারেন্ড জেম্স্ লঙ বাংলার সরকারকে জানাচ্ছেন," A Taste for Dramatic Exhibition has lately revived among the educated Hindus, who find that translations of the Ancient Hindu Dramas are better suited to oriental tastes than translations from the English plays ..."[১৪]

অভিনয় ছাড়া নাট্যশিল্প সার্থক হয় না। অথচ নিখুঁত নাট্য প্রদর্শনীর জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। এই অর্থ যোগাতে পারতেন একমাত্র সম্পদশালী বাবুরা। তাঁরা অভিজাত ভদ্রলোক ও ইংরেজ পদাধিকারীদের মনোরঞ্জনের জন্য নাটক রচনা ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন এবং অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য করতেন না।

পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, তাঁদের বেলগাছিয়া

নাট্যশালায় ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে শ্রীহর্ষদেবের লেখা *রত্নাবলী* নাটকের বঙ্গানুবাদ মঞ্চস্থ করেন। পাইকপাড়ার রাজারা গৌরদাস বসাক মারফৎ মধুসূদনকে স্যার হ্যালিডের মত গণ্যমান্য ইংরেজ অভ্যাগতদের জন্য নাটকটির একটি ইংরেজি তর্জমা করার অনুরোধ করেন। *বেঙ্গল হরকারুর* সম্পাদক এই তর্জমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।[১৫] অনুবাদের জন্য রাজারা মধুকে পাঁচশো টাকা পারিশ্রমিক দেন।[১৬]

তর্জমা করতে গিয়ে *রত্নাবলী* নাটকটি কবির নিতান্ত অকিঞ্চিতকর বোধ হয়। মধু বালা ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট নাটক রচনায় ব্রতী হন। তখনও পর্যন্ত তাঁর বাংলা জ্ঞান নিতান্ত স্বল্প। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার থেকে বাংলা ও সংস্কৃত নাটক আনিয়ে পাঠ করেন। এ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যান বেথুনের কথা স্মরণ রেখেও বলা যায় সমকালীন কোলকাতায় বাংলা ভাষাকে নব নব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার যে আয়োজন চলছিল মধুর অনুপ্রেরণা তারই অঙ্গ।

১৮৫৯ সালে মধুসূদনের লেখা *শর্মিষ্ঠা* নাটকটি রচিত ও প্রকাশিত হয়। কবি এই নাটকটি সিংহ ভাতৃদ্বয়ের হাতে তুলে দেন—"যদি কখনও ভারতবর্ষে আবার নাট্যশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তবে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ আমাদিগের জাতীয় নাট্যশালার প্রথম সুহৃদ এই মহানুভব ব্যক্তিদিগকে বিস্মৃত হইবেন না।" অথচ এই বই প্রকাশের পর রাজাদের কাছ থেকে কোন টাকা তিনি পান নি। বরং মুদ্রণের জন্য যে ঋণ তিনি করেছিলেন তা শোধ করতে তাঁর অনেক সময় লেগেছে। এ সময় লোয়ার চিৎপুর রোডের বাড়িতে হেনরিয়েটা আসাতে তাঁর ঋণ বেড়ে গিয়েছিল। মধুর বন্ধু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রাজাদের দেওয়ান। তাঁর মারফৎ কবির অনটনের কথা জানতে পেরে ছোট রাজা তাঁর অধিকাংশ দেনা শোধ করে দেন। ১৮৫৯ সালে *শর্মিষ্ঠার* ইংরেজি অনুবাদ করানোর জন্যও কবিকে ধার দিয়েছিলেন রাজা।[১৭]

শর্মিষ্ঠা নাটককে স্বাগত জানালেন রাজেন্দ্রলাল, "যে সকল বাংলা নাটক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে *শর্মিষ্ঠাকে* সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিবেন সন্দেহ নাই।"[১৮]

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনায় কবিকে অনুপ্রাণিত করেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ১৮৫৯ সালে *শর্মিষ্ঠা* নাটকের মহড়ার সময় তিনি মধুসূদনকে বলেছিলেন বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা সম্ভব নয়। মধুসূদন *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* রচনা করে প্রমাণ করলেন, সম্ভব। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যতীন্দ্রমোহন *তিলোত্তমার* মুদ্রণ ব্যয় বহন করেন। এই কাব্যটি যতীন্দ্রমোহনকেই উৎসর্গিত।

১৮৬১ সালের ৪ঠা জানুয়ারি *মেঘনাদবধ কাব্য প্রথম* খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যয় বহন করেন রাজা দিগম্বর মিত্র। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁকেই *মেঘনাদবধকাব্য* উৎসর্গ করা হয়। ১২ই ফেব্রুয়ারি, কালীপ্রসন্ন সিংহের নেতৃত্বে বিদ্যোৎসাহিনী সভা

মধুসূদনকে বরণ করেন রূপার পানপাত্র দিয়ে। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, কিশোরী চাঁদ মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি সমকালীন বুদ্ধিজীবীরা।

মধুসূদন এর পরবর্তী ট্র্যাজিক নাটক *কৃষ্ণকুমারী* উৎসর্গ করেন বেলগাছিয়া নাট্যশালার সমকালীন অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে। মধুর ভাষায়, "আমাদের যদি কখনও একটি জাতীয় নাটক গড়ে ওঠে, কোন ভবিষ্যৎ ইতিহাসকার সেই নাটকের উদ্ভব ও বিকাশের স্মৃতিচারণা করতে গেলে আপনার নামের সঙ্গে আমার এই সামান্য নাম যুক্ত করবেন।"[১৯]

কবি ভারতচন্দ্র ছিলেন নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বদান্যতাপুষ্ট। অন্য কোন জীবিকা অর্জনে তাঁর মেধা ও উৎসাহ ক্ষয় পায় নি। মধুসূদনও বর্ধমানের মহারাজা বা কৃষ্ণনগরের মহারাজা সতীশচন্দ্রের পোষকতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন। এই দুই রাজবংশেরই তখন ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। তাঁদের পক্ষে মধুসূদনকে সামগ্রিকভাবে পোষণ করা সম্ভব ছিল না।

।। ৩ ।।

মধুসূদন পোষকতা পেতে আগ্রহী ছিলেন, অথচ পোষকের রুচি সম্পর্কে তাঁর ছিল অপরিসীম অবজ্ঞা। ১৮৬৫ সালে তিনি গৌরদাসকে লিখছেন, "তোমার অর্থ থাকলেই তুমি বড়মানুষ, যদি না থাকে, কেউই তোমায় মূল্য দেয় না। আমরা এখনও পর্যন্ত একটি অধঃপতিত জাতি। আমাদের মধ্যে বড় মানুষ কারা? চোরবাগান আর বড়বাজারের কেউনা'রা।"[২০]

পোষকের রুচির সঙ্গে কবির রুচির বারে বারে সংঘাত বেধেছিল। পাইকপাড়ার রাজারা তাঁকে দিয়ে দুটি প্রহসন লিখিয়ে নিলেও, শেষ পর্যন্ত সামাজিক বাধায় এগুলি মঞ্চস্থ হতে পারেনি। *একেই কি বলে সভ্যতা!* এবং *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* যথাক্রমে নব্যশিক্ষিত ইঙ্গবঙ্গ এবং রক্ষণশীল সমাজকে আহত করেছিল। নব্যবঙ্গীয়দের একজন প্রভাবশালী নেতার আপত্তিতে রাজারা প্রথমে *একেই কি বলে সভ্যতা!*, পরে অন্য প্রহসনটি এবং শেষে বিরক্ত হয়ে বাংলা অভিনয়ই বন্ধ করে দেন। যে ইংরেজি শিক্ষিত প্রশাসনিক মধ্যবিত্তের মুখপাত্র মধুসূদন, তাঁরাই তাঁর বিরুদ্ধে গেলেন। প্রায় চার বছর পর, ১৮৬৫ সালে শোভাবাজার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির উৎসাহে *একেই কি বলে সভ্যতা* মঞ্চস্থ হয়।

মধুসূদনের বিশেষ আগ্রহ ছিল সুলতানা রাজিয়াকে নিয়ে নাটক রচনা করবেন। তিনি মনে করতেন মুসলমান চরিত্র বিশেষ বীরত্বব্যঞ্জক। ইউরেসিয়ান পত্রিকায় ১৮৪৯ সালের ১০ই নভেম্বর থেকে ১২ই জানুয়ারির মধ্যে *'রিজিয়া এম্প্রেস অফ দ্য ইন্দে'* কাব্য নাট্যটির দৃশ্যগুলি প্রকাশিত হয়। কোলকাতায় ফেরার পরেও তিনি রাজিয়াকে

নিয়ে পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার সংকল্প করেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে নিরুৎসাহ করেন। এমনকি ১৮৬৭ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরার পরও তিনি রাজিয়াকে নিয়ে নাটক লেখার কথা ভুলতে পারেন নি। কিন্তু রাজিয়া একে মুসলমান তায় পরাজিত রমণী, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন নি। মধুসূদনের স্বপ্ন অধরাই থেকে গিয়েছিল।

কেশবচন্দ্র মধুসূদনকে টডের রাজস্থানের ইতিহাস ভিত্তি করে একটি দেশাত্মবোধক নাটক লিখতে অনুরোধ করেন। কিন্তু মধু লিখলেন বিয়োগান্তক *কৃষ্ণকুমারী নাটক*। মধুসূদনের আশা ছিল নাটকটি মঞ্চস্থ দেখার। নাটকটির অভিনয়ে বিলম্ব ঘটায় তিনি কেশবচন্দ্রকে লিখলেন, 'প্রহসন দুটির অভিনয়কে কেন্দ্র করে আপনারা আমার ডানা ভেঙে দিয়েছিলেন। এবারে এই নাটক নিয়ে আপনারা আবার যদি সেই চাল দেন, তা হলে আমি বাংলায় লেখা ছেড়ে হিব্রু বা চীনাভাষায় লিখব।'[২১]

যতীন্দ্রমোহন *কৃষ্ণকুমারী* নাটকের মুদ্রণ ব্যয় বহন করলেও অভিনয়ের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। ১৮৬৬ সালে পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটারের সূচনা হলে ১৮৬৯-৭০ সালে অভিনয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর মাতার আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত এই নাটক অভিনীত হয় নি। কারণ প্রাচীন হিন্দু গৃহে দক্ষযজ্ঞের মত বিয়োগান্তক নাট্যদৃশ্যের অভিনয় প্রথা বিরুদ্ধ ছিল। শোভাবাজার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ১৮৬৬ সালে নাটকটি অভিনীত হয়।[২২]

রাজনারায়ণ বসু তাঁকে সিংহল বিজয়ের কাহিনী লিখতে অনুপ্রাণিত করেন[২৩], সমকালীন অবক্ষয়িত বাংলার সঙ্গে গৌরবময় প্রাচীন বাংলার তুলনা করতে বলেন। সেই সিংহলের কথাই তিনি লিখলেন, কিন্তু সে কাহিনী গৌরবময় জয়গাথা নয় পরাজয়ের অশ্রুগাথা। কবির সৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পরাভূত বাঙালির ব্যথা[২৪]।

শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রেই নয়, পেশাগত ক্ষেত্রে মধু জেহাদ জানালেন ইংরেজ শাসকদের। বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে তিনি বিপুল ঋণজালে জড়িয়ে পড়েন। বিদ্যাসাগর বিভিন্ন সময়ে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর কাছে অর্থ ঋণ করে মধুর পৈতৃক জমিদারি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জামিনদার দিগম্বর মিত্র মধুর ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েন। মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের উৎসর্গপত্র থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেন। এতেও শেষরক্ষা হল না। অবশেষে পৈতৃক সম্পত্তি মাত্র কুড়ি হাজার টাকায় বিক্রি করে তিনি সাময়িকভাবে ঋণমুক্ত হন।

কোলকাতায় ফিরে ব্যারিস্টারি করতে গিয়েও মধু বাধা পেলেন ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে। দেশীয় জমিদার, বিদ্যাসাগরের মত শিক্ষাবিদ, ব্যবহারজীবী, বুদ্ধিজীবী ও টিপু সুলতানের বংশধরের সমর্থনে তিনি প্র্যাকটিস করার অধিকার অর্জন করেন।[২৫]

সুলতানের বংশধরের সমর্থনে তিনি প্র্যাকটিস করার অধিকার অর্জন করেন।[১৫]

কিন্তু খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ব্যারিস্টারকে হিন্দুরা খুব বেশি গ্রহণ করেন নি। রামপ্রসাদ যেমন হিসাবের খাতায় কবিতা লিখতেন, মধুর যুক্তিতেও আইনের যুক্তির তুলনায় কাব্যের যুক্তিই প্রধান হয়ে উঠত। ঠিক মত পারিশ্রমিক আদায়েও ছিল তাঁর অপরিসীম অনীহা। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মামলা নেওয়াতে তাঁর জেঠতুত ভাই, যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনের ওপর বিরক্ত হন। ক্রমশ তাঁর ব্যয়সাধ্য অভ্যাসের জন্য তিনি ঋণ জালে জড়িয়ে পড়েন। স্বাস্থ্যহানি হয়। বিদ্রোহী কবির পরিসমাপ্তি ঘটে একাকীত্বে, বিচ্ছিন্নতায়।

মধুসূদন মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন বিজয়ীর ধর্ম, পাশ্চাত্য আধুনিকতা-কিন্তু মেনে নিতে পারেন নি বানিয়া মুৎসুদ্দি সমাজের অর্থগৃধ্নুতাকে আত্মধ্বংসের মধ্যে দিয়েই তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠা। মাইকেল বাংলাকে দিয়ে গেলেন আধুনিক স্বাজাত্যবোধের প্রথম স্বর।

সূত্র-নির্দেশ ঃ-

১. Chatterjee Partha, *The Nation and Its Fragments · Colonial and Post Colonial Histories,* Calcutta, 1994, p6.

২. Anderson Benedict, Imagined Communities . Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, 1983, pp 17-49.

৩. Chatterjee, Op cit, P-7

৪. ড. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা, ১৯৮৯, ঢাকা, পৃ. ২০৮।

৫. তদেব, পৃ. ১৯৬।

৬. সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, সম্পাদনা, অরুণ নাগ, কলকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ.৭৫।

৭. নবো মুনসী (ইংরেজি, আরবিক, ফারসি ভাষায় পারদর্শী রাজা নবকৃষ্ণ দেব, মুল পদবি কুণ্ডু), ছিরে বেনে (পোস্তা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নকু ধর ওরফে লক্ষ্মীকান্ত, ইনি ক্লাইভ ও হেস্টিংসের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।), পুঁটে তেলি (কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী ওরফে কান্তবাবু), তদেব, পৃ ৭৭-৭৯।

৮. সিরাজুল ইসলাম, তদেব, পৃ. ২১।

৯. Banerjee Sumanta, *The Parlour and the Streets Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta, 1998, p50*

১০. Ibid, p. 162.

১১. International Encyclopaedia of Social Sciences, ed, Sills David I. Volix, 1968. p417-419.

১২. Chakrabarty Dipesh, Adda. a History of Sociality.. in *Provincialising Europe. Post Colonial Thought and Historical Difference,* 2001, New Delhi, p 190

১৩. Chatterjee Partha, op cit p7.

১৪. Banerjee, op cit. p 165.

১৫ যোগীন্দ্রনাথ বসু, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৮, পৃ ১৭৪।

১৬. গোলাম মুরশিদ, আশার ছলনে ভুলি, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ ১৬১।
১৭. তদেব, পৃ. ১৭৩
১৮. বিবিধার্থ সংগ্রহ, ৫ম পর্ব, ৫৮ সংখ্যা, শক ১৭৮০ মাঘ, উদ্ধৃত, যোগীন্দ্রনাথ বসু, তদেব, পৃ১৮৯।
১৯. নগেন্দ্রনাথ সোম, *মধুস্মৃতি*, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৯৬, পৃ ৩৭০।
২০. তদেব, পৃ. ৩৯২।
২১. তদেব, পৃ. ৩৭০, গোলাম মুরশিদ, তদেব, পৃ ১৯৭।
২২. যোগীন্দ্রনাথ বসু, তদেব, ৫১।
২৩. তদেব, পৃ. ২৪২।
২৪. শীতাংশু মৈত্র, *যুগন্ধর মধুসূদন : পুনর্বিবেচনা*, কলকাতা, ১৩৮৬, পৃ ১৩৪।
২৫. গোলাম মুরশিদ, তদেব, পৃ ৩০৯-৩১১।

প্রসঙ্গ ঃ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঃ রবীন্দ্রনাথের ভারতী

মধুময় রায়

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি 'ভাইবন্ধুদের' লেখা প্রকাশের জন্য কিছুটা খামখেয়ালির মধ্যে একদা জন্ম হয়েছিল 'ভারতী'র। কিছু উত্তেজনা, কিছু ছেলেমানুষি আর কিছুটা আবেগের বশেই ভারতীয় যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য! ঠাকুর বাড়ির একান্ত নিজস্ব পত্রিকা 'ভারতী' যেন লোকচক্ষুর আড়ালেই হয়ে ওঠে উনিশ শতকে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের চালচিত্র। বিগত শতকের আটের দশক থেকে বর্তমান শতকের তিনের দশকের প্রান্তভাগ পর্যন্ত বাঙালী জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বছরের একটি ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ উত্তাল আবেগকে ভারতী যেমন ধরে রেখেছিল, তেমনি তার প্রতিটি ছত্রে উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল একটি জাতির সামাজিক সাংস্কৃতিক গতিময়তা।

এক যুগসন্ধিক্ষণে ভারতীর আবির্ভাব। ১৫ই শ্রাবণ ১২৮৪ (ইং ১৯শে জুলাই ১৮৭৭ খ্রিঃ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ভারতীর প্রকাশ। ভারতীয় সম্পাদক, লেখক, গ্রাহকদের মধ্যে সিংহভাগ ছিলেন বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জগতের সঙ্গে ওতোপ্রতভাবে জড়িত। ভারতীর সম্পাদনার দায়িত্ব পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তেত্রিশ বছর ছিল মহিলা সম্পাদকের হাতে। স্বর্ণকুমারী দেবী বা সরলা দেবীর অবশ্য স্বতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্তা ছিল, এমনকি ভারতীর পাতায় তার প্রকাশও ঘটেছিল।

১৩০৪ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮৯৭ খ্রিঃ) পর্যন্ত দুই বোন হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী ভারতী সম্পাদনা করেন—একজন অন্তর্মুখী অন্যজন বহির্মুখী। বাংলারও তখন ভিতরে বাইরে উঠেছে ঝড়ের মাতন। নবচেতনার প্রস্তুতি পর্বে ভেতরে তখন আত্মসমীক্ষা আর আত্মশক্তি অর্জনের প্রয়াস, বাইরে জাতির বন্ধনমুক্তির জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা। ১৩০৫ (ইং ১৮৯৮ খ্রিঃ)-এ ভারতীর সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদকীয় চক্রের 'অপরিহার্য একজন'-এ পর্যবসিত হয়েছিলেন। ভারতী যখন প্রথম প্রকাশিত তখন তাঁর বয়স ছিল ষোলো আর যখ ন তিনি ভারতীর সম্পাদক হলেন তখন তাঁর বয়স ৩৭ বছর।[১] কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব এই পারিবারিক পত্রিকাতেই। বোধহয় স্বাদেশিকতার প্রথম পাঠও ঘটেছে এই পত্রিকায়।

ভারতী পত্রিকার যাত্রাপথের পঞ্চাশ বছরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে। উনিশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত সময়কাল নবচেতনার প্রস্তুতি পর্ব হিসাবেও চিহ্নিত করা যায়। প্রথম পর্ব ১৮৭৭ খ্রিঃ থেকে ১৮৮৫ খ্রিঃ অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসের জন্মকাল পর্যন্ত ঃ এই সময়ে চলেছে জাতীয় সংগঠন গড়ার প্রস্তুতি পর্ব, একের পর এক উদ্যোগ জন্ম নিয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়া ও উচ্চমধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীকে নিয়ে সংগঠন গড়ার প্রয়াস। দ্বিতীয় পর্ব ১৮৮৫ খ্রিঃ

থেকে ১৯০৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অর্থাৎ জাতীয় স্তরে সংগঠিত হয়েছে নরমপন্থী কংগ্রেসের কার্যাবলী, আবেদন-নিবেদনের নির্লজ্জ প্রকাশ, চরমপন্থীদের উগ্রবিরোধিতা, সরকারি দমন পীড়নের মধ্যে এসেছে স্বদেশীয়ানা—রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম এনেছে বৈপ্লবিক পটপরিবর্তন—সুরাট বিভাজনের দ্বি-মেরুকরণের মধ্যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এক নতুনমাত্রা সংযোজিত হয়েছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ এক রাজনৈতিক সচলতার প্রাণপুরুষে পরিণত হয়েছেন। ভারতী হয়েছে তার বাহক। তৃতীয় পর্ব ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ খ্রিঃ অর্থাৎ বাংলায় বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে এসেছে স্বদেশী বয়কট, একটি জাতির ভাবাবেগ শুধু সংহতই হয় নি আত্মমর্যাদাবোধ পরিণত হয়েছে আত্মশক্তি অর্জনে; গঠনমূলক স্বদেশী জাতীয় শিল্পায়নের পথে চেয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠা—সরকারি দমন-পীড়নের পাশাপাশি এনেছেন নানা 'প্রলোভনের চুষিকাঠি', উৎকোচ ও প্রাপ্তির রাজনীতির মধ্যে এসেছে বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতপাতের রাজনীতি আর প্রথম মহাযুদ্ধ। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের হিংস্র কদর্য দানবীয় রূপ ছিল এই মহাযুদ্ধ। শেষ পর্ব ছিল ১৯১৪ থেকে ১৯২৭ খ্রিঃ। মহাযুদ্ধের অভিঘাতে ভেঙে পড়েছে ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা। নিশ্চল বন্ধ্যাত্বের মধ্যে ভারতীও হারিয়েছে তার জীবনীশক্তি।

১৩০১ বঙ্গাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকেই হিরন্ময়ী দেবী জোড়াসাঁকোর 'রবিমামা'কে সম্পাদক হওয়ার জন্য ধরে পড়েন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাজি না হলেও ভাগ্নীকে বিমুখ করেননি, বরং হিরণ্ময়ী ও স্বর্ণকুমারীকে শুধু সম্পাদনায় সহায়তা নয়, নিজের রচনা ভাণ্ডারও ভারতীর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।[২] ভারতীর দায়িত্ব গ্রহণে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা দ্বন্দ্বের মূল কারণ ছিল 'হঠাৎ জড়িয়ে পড়া সম্পর্কে ভীতি'। বিগত দশকে বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক স্তরে সাংগঠনিক প্রস্তুতি পর্ব একটি প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব অর্জনের দিকে যেমন অগ্রসর হয়েছিল তেমনি রাজনৈতিক দর্শন ক্রমশ জনমানসে সাকার হয়ে উঠেছিল। সরকারি দমন-পীড়ণ প্রতিশোধ পরায়ণতায় ব্রিটিশ সরকারের প্রতি জনগণের অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ বাড়তেই থাকে। 'দাক্ষিণাত্যে প্লেগ, চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু, লিটনের কালাকানুন, বঙ্গভঙ্গ, জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ স্বার্থের যূপকাষ্ঠে ভারতকে বলি প্রদান—সবই একটি জাতির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সর্বস্ব পণ করার কঠিন সত্যকেই তুলে ধরেছিল। পালাবদলের পালা কি আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনে, কি সামাজিক পটপরিবর্তনে, কি রাজনৈতিক দর্শনের বাস্তবায়নে—সর্বত্রই প্রতিফলিত হয়েছিল। ববীন্দ্রনাথ ভারতীর মধ্যে যে রাজনৈতিক গতিক্রমকে সূচিত করেন সরলাদেবী চৌধুরাণীর দুই পর্বের একক সম্পাদনাকাল (যথাক্রমে ১৮৯৯ থেকে ১৯০৭ খ্রিঃ এবং ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ খ্রিঃ) তারই ছিল পরিপুষ্টি সাধন।

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ভারতী নবকলেবর লাভ করে। এতদিন 'রয়েল আটপেজি

ফর্মা'য়, ভারতী ছাপা হতো, রবীন্দ্রনাথ আনলেন ক্রাউন সাইজ, 'গ্রন্থসমালোচনা', 'প্রসঙ্গকথা', 'সাময়িক সাহিত্য', 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ স্বরলিপি' প্রভৃতি বিভাগ সংযোজিত হল। জনগণের কাছে ভারতীর এই সাজসজ্জা অবশ্যই তার আবেদন বৃদ্ধি করেছিল। 'সাধনা' ১৮৯৫ খ্রিঃ ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ কৃষ্টিশীল মানুষের কাছে ভারতী বোধ হয় একমাত্র গ্রহণযোগ্য ও আদরণীয় সাময়িক পত্রে পরিণত হয়। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের হাতে পত্রিকার ভার অর্পিত হওয়ায় পত্রিকার গুণগত ঔৎকর্ষ্যে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। নতুন বিভাগগুলির মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে সাময়িক প্রসঙ্গগুলি প্রাধান্য পেতে থাকে। প্রবন্ধ থেকে গল্প, ভ্রমণকাহিনী থেকে গান-গীতিআলেখ্য সর্বত্রই রাজনৈতিক মনস্কতা ও সামাজিক রূপান্তরের চেহারাটি কখনো প্রত্যক্ষ কখনো বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হতে থাকলো।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'ভারতী' সম্পাদনা সম্পর্কে লিখেছিলেন 'ভারতী মাসিক পত্রের সম্পাদক রূপে রবীন্দ্রনাথকে দুইটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করিতে হইত, একটি হইতেছে সাময়িক রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ঘটনা লইয়া প্রবন্ধ রচনা এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে পাঠকদের মনোরঞ্জনার্থ গল্প রচনা।'[৩] বলাবাহুল্য ভারতীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্পগুলি নিছক মনোরঞ্জনের সামগ্রী ছিল না। এই গল্পগুলিতেও সামাজিক সমস্যা, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, পারিবারিক সম্পর্কের পটপরিবর্তন, কৌলিন্যপ্রথা, বহুবিবাহ জনিত সমস্যা, মহিলাদের ক্ষমতায়ণ, পুরুষ প্রাধান্য প্রভৃতি যেমন প্রতিফলিত হয়েছিল তেমনি এসেছিল ঔপনিবেশিক শাসন জনিত সঙ্কট, আর্থিক শোষণ, রাজনৈতিক হীনমন্যতা, স্বাবলম্বনের আকাঙ্ক্ষা, ইংরাজদের কূটভেদচাল, সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক, আত্মশক্তি ও মর্যাদা অর্জন ও বন্ধনমুক্তির জন্য সাংগঠনিক উদ্যোগ প্রভৃতি।

আরেকটি কাজ রবীন্দ্রনাথ ভারতীর মাধ্যমে চালিয়েছিলেন, সেটি হল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টি ও বাংলায় বিজ্ঞান চর্চাকে জনপ্রিয় করে তোলা। এ বিষয়ে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকার উপর 'প্রসঙ্গ কথা' বিভাগে স্বয়ং উল্লেখ করেছিলেন।[৪] নিছক সাহিত্য চর্চা ভারতীর প্রাথমিক লক্ষ্য হলেও সম্পাদকের প্রচ্ছন্ন উৎসাহে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায় তৎকালীন রাজনৈতিক দোলাচলাবস্থা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি পর্বের বিষয়টি উচ্চকিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের লেখা রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি ভারতীতেই প্রকাশিত হয়। সক্রিয় রাজনীতি রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই করেন নি। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে সৃজনশীলতা ছিল তাই এনে দিয়েছিল একধরণের স্পর্শকাতরতা। তাই সামাজিক সঙ্কট যখন আর্থিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটে ঘনীভূত তখন রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক প্রশ্নে অনেক বেশি সুস্পষ্ট। সমসাময়িক রাজনৈতিক দোলাচল অবস্থার মধ্যে তাঁর মতামত অবশ্যই আবেদন-নিবেদনের

রাজনীতির বিপক্ষে; গভীর আত্মপ্রত্যয় ও আত্ম সম্মানবোধে কবি চেয়েছেন 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির।' জাতীয় মর্যাদাবোধ থেকেই তিনি আত্মশক্তি অর্জন ও স্বদেশীয়ানায় নিজেকে শুধু দীক্ষিতই করেননি, পরবর্তী স্তরে বঙ্গভঙ্গের সময় লিখতে পেরেছেন 'বাংলার মাটি বাংলার জল'। প্রচলিত ধারণা হলো 'ভারতী'র পাতায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি যেমন 'চেঁচিয়ে বলা' (চৈত্র ১২৮৯ বঙ্গাব্দ), 'জিহ্বা আস্ফালন' (শ্রাবণ ১২৯০ বঙ্গাব্দ), 'হাতে কলমে' (আশ্বিন ১২৯১ বঙ্গাব্দ), প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের অলসচিন্তা প্রসূত গভীর চিন্তার ফসল নয়।[৫] যদি তৎকালীন সময়ের দ্বান্দ্বিক দোলাচলতাকে বিশ্লেষণ করা যায় তবে আত্মজিজ্ঞাসার পাশাপাশি যা চোখে পড়তো তা হলো একটি ঐতিহ্যবান জ্ঞানে গরিমায় একদা অভিষিক্ত জাতির অসহায় হীনমন্যতাবোধ। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় 'যা দিয়ে এই আধমরাদেরই জাগাতে চেয়েছিলেন'—পরিশীলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির গতিময়তাই বোধহয় আপোষহীন ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ।

স্বাদেশিকতার উন্মেষে চরমপন্থী রাজনীতির আদর্শগত ভিত্তি হিসাবে ঐতিহাসিক মহলে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের ভূমিকাকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।[৬] এমনকি উনিশ শতকের ভাব সংঘাতও আদর্শবাদী পট ভূমিকার মূল্যায়নে বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ থেকে কেশবচন্দ্র সেনের অবদানের মূল্যায়ন হয়েছে।[৭] কিন্তু ১২৮৯ থেকে ১৩১২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় পাতায় যে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায়, সে এক অনন্য রবীন্দ্রনাথ—নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে ঐতিহাসিক যোগসূত্র। ১৮৯৬-৯৭ সালে মহারাষ্ট্রে প্লেগ নিবারণের নামে ব্রিটিশ শাসকদের অকথ্য অত্যাচার ও তিলকের কারাদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে দেশজুড়ে যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ধ্বনিত হয়েছিল তার সব থেকে সরব কণ্ঠ ছিল রবীন্দ্রনাথ। তিলকের মোকদ্দমা চালাবার অর্থ তহবিলও রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল। আর্মস এ্যাক্ট, ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট, নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন, সিডিশন বিল, সিক্রেট প্রেস এ্যাক্ট যখন প্রতিবাদী কণ্ঠরোধে বদ্ধপরিকর তখন রবীন্দ্রনাথ টাউন হলের জনসভায় পাঠ করেন 'কণ্ঠরোধ' (ভারতীতে প্রকাশ বৈশাখ, ১৩০৫—সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ) এ সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে ছিল 'ভাষা বিচ্ছেদ' (শ্রাবণ ১৩০৫), 'কোট না চাপকান' (আশ্বিন ১৩০৫), মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে (ভাদ্র ১৩০৫) ও পরে ইম্পীরিয়ালিজম। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে ভারতীয় সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ।

সম্পাদনার কাল মাত্র এক বছর। কিন্তু শুধু বাঙালী জীবনে নয়, ভারতীর জীবনে এ সময়কাল চাঞ্চল্যকর, বৃহত্তর পটভূমিতে ঐতিহাসিকও বটে। প্রকাশের মাধ্যম বাংলা ভাষা হলেও ভারতীর পাতায় প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধে ও প্রসঙ্গকথায় রবীন্দ্রনাথ জাতীয় চরিত্র গঠন, জাতীয় নেতৃত্বের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব, নেতৃত্বের স্বরূপ ও সঙ্কট, গণ আন্দোলনের ভিত্তি, সাম্প্রদায়িক সংহতি ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি পর্বের দিকগুলি

তুলে ধরেছেন। নিচুতলার মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার ইতিহাস ও তৃণমূল ভিত্তিক সংগঠন গড়ার প্রয়োজনীয়তাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। শুধু হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি নয়, লোকহিতের নিরিখে জাতপাতের ছুৎমার্গের বিরুদ্ধেও কবি ছিলেন সোচ্চার। রাজনৈতিক সচেতনতাকে সংঘশক্তিতে রূপান্তরের জন্যই 'ভাষা-বিচ্ছেদ', 'কোট না চাপকান' প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এত সোচ্চার। 'যাহাদের দেশ আমরা তাহাদের সঙ্গে আদৌ মিলিত হইতেছি না, আমাদের বেশভূষা, আমাদের রাজনৈতিক বক্তৃতার ভাষা ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহারা দূরে ভীত বিকম্পিত কলেবরে দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য হইতেছে।'[৭]

রবীন্দ্রনাথের কাছে মতাদর্শের ভেদরেখাকে অখণ্ড চিরন্তন ভারতবর্ষ অতিক্রম করেছে। রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন যে ভারতীয় ঐক্য ও অখণ্ড স্বরূপ এদেশে ব্রিটিশ শাসনের পরোক্ষ ফল কিন্তু শাসক শ্রেণী সচেতন ভাবে এই ঐক্যসাধন করেন নি—এই ঐক্যের অনুভূতি ছিল শাসন শোষণের আপতিক ফল। যখন তারা বুঝেছেন যে আসমুদ্র হিমাচলের একাত্মতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সাম্রাজ্যের পরিপন্থী তখনই তারা এনেছে 'ভাষা বিচ্ছেদ' জাতবৈরীতা ও সাম্প্রদায়িকতা। ভারতীর পাতায় লিখলেন ভাষাবিচ্ছেদ। একইটানে কংগ্রেসের উপস্বত্ত্বভোগী মানসিকতা ও ভূস্বামী তোষণ নিয়ে লিখেছিলেন 'মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে'হিন্দু মুসলমানের মিলনকে কেন্দ্র করে লিখলেন কোট না চাপকান। ভারতীতে প্রকাশিত 'দুরাশা' গল্পেও ছিল একই সুর। 'ইম্পীরিয়ালিজম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বরূপ ও শোষণের ব্যাখ্যায় পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্কটকে তুলে ধরলেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ কোন নিগূঢ় তত্ত্বাদর্শ নয়, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরোধিতার সঙ্গে গুরুত্ব পেয়েছিল মানবিক মূল্যবোধ ও বিশ্বজনীনতা। মানবিক মূল্যবোধে রবীন্দ্রনাথ 'ইম্পীরিয়ালিজম্' প্রবন্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দেখেছিলেন নিষ্ঠুরতা, অন্তঃসারশূন্যতা ও অবক্ষয়ের করুণ পরিণতি। 'নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের পৃথিবীর জনসমাজে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ত্ব নিরূপায় করিয়া তোলা যে কত বড় অধর্ম, কি প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই অধর্মের গ্লানি হইতে আপনার মনকে বাঁচাইতে হইলে একটা বড় বুলির ছায়া লইতে হয়।'[৮]

'মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা'— রবীন্দ্রনাথ ধরা দিয়েছিলেন ভারতীয় পাতায়। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে বিদেশী দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী গ্রহণ ও জাতীয় শিক্ষার আদর্শ গ্রহণের মানসিক ভিত্তি রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বেই বাংলায় প্রথম দানা বেঁধে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন ইংরাজ শাসকের কাছে আবেদন-নিবেদনের মধ্যে জন্ম নেয় হীনমন্যতা, বিনিময়ে জোটে অপমান, অনাদর আর লাঞ্ছনা। ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ একটি সত্যই তুলে ধরেছেন—

জাতিগঠনের প্রাথমিক শর্ত হলো আত্মশক্তি ও মর্যাদাবোধ, স্বদেশের প্রতি মমত্ব ও স্বজাতির প্রতি ভালোবাসা। সাধারণ গ্রামীণ মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আর একাত্মতা জাগাবার জন্যই তিনি লেখেন 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' (আষাঢ় ১৩০৫)।

'তোমার যা দৈন্য মাতঃ তাই ভূষণ মোর
কেন তাহা ভুলি
পরধনে ধিক গর্ব— করি করজোড়
ভরি ভিক্ষা ঝুলি
পুণ্যহস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে।
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।
সেই সিংহাসন যদি অঞ্চলটি পাত
কর স্নেহদান
যে তোমারে তুচ্ছ করে সে আমারে মাতঃ
কি করিবেন দান।'[৯]

এক বছর সম্পাদনা কাল শেষে রবীন্দ্রনাথ ভারতীর দায়িত্বভার থেকে বিদায় নিলেন। চৈত্র ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ভারতী পত্রিকায় কবি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিদায়ের কারণ নির্দেশ করেছেন, যদিও ভাগ্নী সরলাদেবীর রবি মামার উপর অভিমানের অন্ত ছিল না। মামা-ভাগ্নীর টানাপোড়েনটি শেষ পর্যন্ত অম্লমধুর হয়েই থাকে। ভারতীর প্রকাশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ তাঁর নিজেরই কাছে 'দৈবাৎ ঘটনা' [১০] কিন্তু বাঙালী মননে ও সৃজনশীলতারসে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গতিময়তা অর্দ্ধশতক ধরে 'ভারতী' বহন করেছিল, তার সঙ্গে ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ না থাকাটাই বোধ হয় ঐতিহাসিক প্রমাদ বলে বিবেচিত হতো।

রাজনৈতিক টানাপোড়েনের দোলাচল রাজনীতি, নতজানু আর্থিক অবস্থা, বন্ধ্যাহীনমন্যতায় আত্মবিশ্বাসহীন একটি জাতির কাছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক। শত আঘাত বিপর্যয়েও যা অটুট ছিল তা হলো সৃজনশীল সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা—বহিরঙ্গের শত আঘাতেও বাঙালী মধ্যবিত্তের 'ঘুরে দাঁড়ানো'র বিষয়ে কবি নিশ্চিত ছিলেন [১১]। রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চা, বিশ্লেষণ ও তত্ত্বগত কূটতর্কে বহিরঙ্গের গবেষণা অবশ্যই সমৃদ্ধ হয় কিন্তু মননশীলতা ও সৃজনশীলতার ইতিহাস কোথায়? 'ভারতী'র রবীন্দ্রনাথ আসলে বাঙালী মনন ও সৃজনশীলতার উনিশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের তিন দশকের ধারা বিবরণী। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সম্পাদনায় 'ভাবতী' আরেক অনন্য ইতিহাস।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। ভারতী ঃ ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী ঃ সুনীল দাস, পৃঃ ৩০।

২। ভারতী ঃ বৈশাখ ১৩১৩ বঙ্গাব্দ পৃঃ ১৯।

৩। রবীন্দ্র জীবনী প্রথম খণ্ড, ১৩৬৭, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৪২১।

৪। ভারতী ঃ বৈশাখ ১৩০৫ পৃঃ ৩৩

৫। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পৃঃ ৮৮।

৬। (১) The Extremist challenge, Amalesh Tripathi

(২) Hindu Revivalism in Bengal, Rammohan to Ramkrishna, Kamal Ghatak.

৭। উনিশ শতক ভাব সংঘাত ও সমন্বয়, রাখাল চন্দ্র নাথ

৮। 'ইম্পীরিয়ালিজম্' ভারতী, বৈশাখ ১৩১২

৯। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ ঃ ভারতী, বৈশাখ ১৩০৫

১০। তখন ও এখন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতী বৈশাখ ১৩২৩

১১। টৌন-হলের তামাসা, ভারতী পৌষ ১২৯০

॥ রবীন্দ্রনাথের গ্রাম পুনর্গঠন ভাবনা ঃ
স্বাস্থ্যসমবায় ও তার প্রাসঙ্গিকতা ॥

অমিয় ঘোষ ও পার্থশঙ্খ মজুমদার

১.০ ভূমিকা ঃ

ভারতে গ্রামাঞ্চলের হাজার সমস্যার মধ্যে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দ্বারা এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হলেও তার ফলাফল মোটেই উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে 'স্বাস্থ্যপরিসেবা' প্রায় প্রহসনের মতো। স্বাধীনতার পঞ্চাশটা বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর রাজ্যসরকার স্বাস্থ্য পরিসেবা নিয়ে সচেতন হওয়ার চেষ্টা শুরু করেছে। পরিবেশ পাঠ এখন উচ্চশিক্ষার (স্নাতকস্তরে) অঙ্গীভূত। চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে স্বাস্থ্য পরিসেবার নূতন পরিকাঠামো নিয়ে। এরই সূত্র ধরে আলোচনায় এসে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের গ্রামপুনর্গঠন ভাবনা ও তাঁর স্বাস্থ্য সমবায় নিয়ে প্রায়োগিক ফলাফল এবং তার বর্তমানে প্রাসঙ্গিকতা।

প্রাক্ উপনিবেশিক কালে কৃষি ভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ ছিল আত্ম নির্ভরশীল। গ্রামের জমির মালিকানা ছিল গ্রাম সভার হাতে। গোচারণক্ষেত্র, বনভূমি ও সেচ ক্ষেত্রের অধিকার ছিল সবার। কৃষিকাজের বিভিন্ন অংশই সম্পন্ন হতো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে। গ্রামে বসবাসকারীরা যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিল। সেখানের উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল প্রয়োজন ভিত্তিক। শক, হুণ, পাঠান ও মোঘলরা ভারতে ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ লিপ্ত হলেও কখনই গ্রামীণ সমাজে অধিকার প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত হয়নি[১]। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন ঘটে। সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়ের জন্য ইংরেজ শাসককুল ভারতবর্ষে নানা ধরণের ভূমি ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। এক কথায় ইংল্যাণ্ড তার এই উপনিবেশটিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির পৃথিবীব্যাপী যন্ত্রের একটি অংশে পরিণত করে। ফলে হাজার বছরের পুরাতন গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন ঘটে যায়। জমি পরিণত হয় কেনাবেচার পণ্যতে, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে, ঐতিহ্যবাহী গ্রাম সমাজের পরিবর্তন ঘটে যায়।

১৮৮৫ খ্রিঃ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও তৎকালীন রাজনীতি ছিল নিস্তরঙ্গ। বঙ্গভঙ্গ ঘটনা এই নিস্তরঙ্গ রাজনীতির সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলে। ভারতবাসী আন্দোলন ও আত্মশক্তি বিকাশের মধ্যদিয়ে পাল্টা আঘাত হানতে চাইল। তখনই পুরানো রাজনীতির বাঁধন খুলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চাইলেন প্রতিকার।[২] সমস্যার মূল থেকে প্রতিকার; গ্রামের উন্নতির মধ্যেই খুঁজে পেলেন ভারতের উন্নতির চাবিকাঠি। তিনি

চেয়েছিলেন সকলকে এক বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণের মধ্যে বাঁধতে। 'স্বদেশী সমাজ'[৩] ও 'পল্লী প্রকৃতি' গ্রন্থদ্বয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর সে চিন্তাধারা।

২.০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রাম পুনর্গঠন ভাবনা ঃ

১৯০৪ খ্রিঃ (৭ শ্রাবণ, ১৩১১) মিনার্ভা থিয়েটার হলে 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠের সময় রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ ''ইংরেজ আমাদের রাজা কিম্বা আর কেউ আমাদের রাজা এই কথাটা নিয়ে বকাবকি করে সময় নষ্ট না করে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা নিজের দেশকে সভ্যভাবে অধিকার করার চেষ্টা সর্বাগ্রে করতে হবে।''[৪] প্রচলিত রাজনীতি অপেক্ষা তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন 'আত্মশক্তি' বিকাশের উপর। এরই সূত্রধরে তাঁর চিন্তার বাস্তব রূপ পায় শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে। ১৯১২ খ্রিঃ রবীন্দ্রনাথ বীরভূমে সুরুল কুঠিবাড়ি কিনে সেই বাড়ির কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে কাজ শুরু করেন। প্রথমদিকে কর্মীদল গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে নানা কারণে। কিন্তু ১৯২২ খ্রিঃ ইংল্যাণ্ড থেকে লেনার্ড এল্মহার্স্ট[৫] শান্তিনিকেতন পৌঁছে গুরুদেবের নির্দেশে গ্রামের কাজের দায়িত্ব নিলে শ্রীনিকেতনে পূর্ণউদ্যমে দেখা দেয় কর্মের জোয়ার। শ্রীনিকেতনের কর্মসূচির পিছনে মূল চিন্তা ছিল 'গ্রামের লোকেদের মধ্যে আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা, তাদের মধ্যে দৈহিক কর্মক্ষমতা বাড়ানো, আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে সচেতন করা এবং সমাজে তাদের ভূমিকা নির্ধারণ করে দেওয়া।[৬] এই তত্ত্বগত গবেষণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগের ফল ছিল 'গ্রামোন্নয়ন বিভাগ' সৃষ্টি।[৭]

২.১. ভাবনার প্রায়োগিক পদ্ধতি ঃ

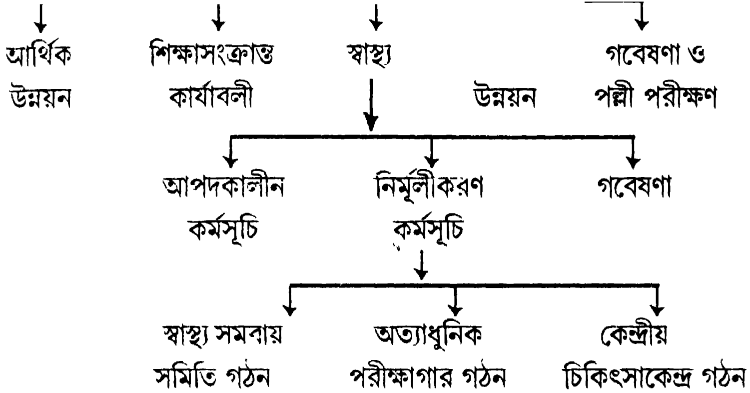
পল্লী পুনর্গঠন বিভাগের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত—এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবিগুরু লেখেন ঃ 'আমাদের লক্ষ্য কয়েকটি গ্রামের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—সকলের জন্য শিক্ষা, আনন্দের বাতাবরণ সৃষ্টি, পুরানো দিনের মতো গানে কবিতায় ভরিয়ে তোলা। তখন আমি বলবো এই কয়েকটি গ্রামই হলো আমার ভারতবর্ষ, প্রকৃত ভারতবর্ষ'।[৮] এই গ্রামোন্নয়ন বিভাগটি প্রথমে শুরু হয় তিনটি গ্রাম নিয়ে এবং পরবর্তীকালে তার কর্মপদ্ধতি বিস্তৃতি লাভ করে ১৬টি উন্নয়ন কেন্দ্রের নেতৃত্বে ২০০ কি.মি. পরিধির মধ্যে ১০০টি গ্রামে।[৯] শ্রীনিকেতনের কর্মপদ্ধতির ছিল তিনটি পর্যায় ঃ

(ক) গ্রামবাসীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলে গ্রামের কাজে তাদের আগ্রহী করে তোলা এবং তাৎক্ষণিক সমস্যায় তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া;

(খ) গ্রামের সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার মাধ্যমে তার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করা;

(গ) এই প্রতিকারের উপায়গুলি বাস্তবায়িত করার জন্য সমবায় ভিত্তিক কর্মসূচি গড়ে তুলে প্রকৃত জীবনধারণের পথে অগ্রসর হওয়া।

নের এই কর্মসূচিকে একটি অনুচিত্র দ্বারা সহজবোধ্য করা যেতে পারে :



অতীতের আত্মনির্ভরশীল গ্রাম যা ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল, তাকে পুনরুদ্ধার করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ নবরূপে। ১৯২৮ খ্রিঃ বর্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মেলনে কবির ভাষণের (২৭ মাঘ, ১৩৩৫) সারমর্ম ছিল ঃ

(১) গ্রামের আত্মনির্ভরশীলতাকে ফিরিয়ে আনতে হবে,

(২) সহযোগিতার মাধ্যমে নূতন গ্রামীণ সমাজ গড়বে গ্রামের মানুষ,

(৩) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিকে সমবায়ের উপর প্রতিষ্ঠা করলে মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ থাকবে,

(৪) সরকার বাহাদুরের মুখাপেক্ষী নয় আত্ম নির্ভরশীলতা হবে জাতি গঠনের সোপান।

রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন পল্লী সমাজ সংবিধান[১১]। প্রতিটি জেলার গ্রাম বা পল্লী সমষ্টি নিয়ে গড়ে উঠবে তাঁর স্বপ্নের পল্লীসমাজ। তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন এই সমাজের উদ্দেশ্য, অর্থসূত্র ও প্রশাসনিক চরিত্র। শ্রীনিকেতনে শুরু হলো গুরুদেবের ভাবনার বাস্তব রূপদান (১৯২২ খ্রিঃ)।

৩.০ বীরভূম জেলার স্বাস্থ্য চিত্র ঃ

ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থানের জন্য বীরভূম একটি স্বাস্থ্যকর জেলা হলেও প্রায়শই বিশেষ ধরণের জ্বর মাঝে মধ্যে মহামারি আকার ধারণ করতো। বর্ধমান জ্বর ও ম্যালেরিয়া দ্বারা জেলা কয়েকবারই আক্রান্ত হয়েছিল ব্যাপকভাবে এবং মৃত্যুর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৩,৫০,০০০।[১২] জেলা দপ্তরের বিভিন্ন তথ্যাদির সূত্রে[১৩] বলা যায়, এখানে ময়লা ও

জল নিষ্কাশন এবং আবর্জনা-দূরীকরণ ব্যবস্থা প্রায় গড়েই উঠেনি। ফলে জেলায় জলবাহিত ও মানুষ বাহিত রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তো। কলেরা ও বসন্তরোগকে সবাই ভয় করতো এবং বলতো 'মায়ের দয়া' (ঠাকুরের দান)। পানীয় জল পরিশ্রুত করার কোন শিক্ষাই এদের মধ্যে ছিল না। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় দেখা যায় সমগ্র জেলার স্বাস্থ্য পরিসেবা ও নগণ্য। সিউড়ীতে দুটি হাসপাতাল মিলে ১৪টি শয্যা এবং রামপুরহাটে ৬টি শয্যার ছোট হাসপাতাল ছিল। অবশ্য বেসরকারিভাবে গড়ে উঠেছিল কয়েকটি প্রাথমিক 'আউটডোর' চিকিৎসা কেন্দ্র।[১৪] সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৩০ খ্রিঃ মধ্যে চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা (প্রাথমিক) বাড়লেও শয্যাসংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল মাত্র ৩৪ টি।[১৫] এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় অনগ্রসর এই জেলাটিকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর উন্নয়ন ভাবনার প্রায়োগিক ক্ষেত্ররূপে।

৪.০ শ্রীনিকেতন পল্লী পুনর্গঠন বিভাগের স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি ঃ

১৯২২ খ্রিঃ, শ্রীনিকেতনের কর্ম পরিচালক এল্মহার্স্ট তাঁর প্রাত্যহিক কর্মের সূত্রে পার্শ্ববর্তী গ্রাম পরিদর্শন করতে গিয়ে মাহিদাপুর গ্রামে এক বৃদ্ধকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পান। কথোপকথনের সূত্রে জানিতে পারেন, বৃদ্ধটি দীর্ঘদিন ধরে পায়ে একটি ক্ষত নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে, নিকটবর্তী কোন চিকিৎসাকেন্দ্র না থাকায় সে চিকিৎসা করানোর কোন সুযোগ পায়নি।[১৬] এল্মহার্স্ট এই ঘটনা থেকে উপলব্ধি করেন প্রত্যন্ত গরিব গ্রামবাসীরা অসুস্থতার সময় অসহায় হয়ে পড়ে। তিনি সত্বর শ্রীনিকেতনে গড়ে তোলেন একটি ছোট চিকিৎসাকেন্দ্র। যেখানে কয়েকটি সাধারণ ঔষধদ্বারা গরিব গ্রামবাসীদের চিকিৎসালয়টি ১৪৪টি গ্রামের ৬৮০০ জন গরিব মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করতে[১৭] সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে শ্রীনিকেতনের কর্মীরা বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে যেসব তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিল এবং শ্রীনিকেতনের চিকিৎসা কেন্দ্রের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান ঃ শুধুমাত্র অবৈতনিক চিকিৎসাকেন্দ্র থেকেই সাহায্য করলেই হবে না, স্থায়ী কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি নির্মূল করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪.১ স্বাস্থ্য সমবায় আন্দোলন ঃ ইতিমধ্যে বিভিন্ন অগ্রসর ইউরোপীয় দেশগুলিতে স্বাস্থ্য সমবায় নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল। স্বাস্থ্য সমবায় নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া যে ধরণের কাজ শুরু করেছিল সেই পদ্ধতিটির কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে গড়ে তোলা হয় স্বাস্থ্যসমবায় সমিতি।[১৮] ডাঃ গোপালচন্দ্র চ্যাটার্জী গোসাবায় হ্যামিলটনের নির্দেশে যে স্বাস্থ্য সমবায় নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন সেই ধারায় ব্যাপকভাবে বীরভূম জেলায় কাজ শুরু করে শ্রীনিকেতনের পল্লীপুনর্গঠন বিভাগ। প্রথম স্বাস্থ্যসমবায় সমিতি গঠিত হয় বোলপুরে বাঁধগোড়া এলাকায়।[১৯] শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সহযোগিতায় কিছু দিনের মধ্যে ১১টি

পল্লী সংগঠন ও স্বাস্থ্য সমিতি গঠিত হয়। সমিতির কাজ পরিচালনার জন্য প্রতিটি সভ্যকে চাঁদা (চার আনা মাসে) বা কায়িক শ্রমদান করতে হতো। সভ্যরা পেতেন স্বল্প মূল্যে ঔষধ ও ডাক্তারের পরামর্শ। ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে সমিতির সদস্যরা ম্যালেরিয়া নিবারণ ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করে ঃ[২২]

(১) গ্রামে নালা তৈরি করে জল ও ময়লাজল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা;

(২) অপ্রয়োজনীয় জলাশয় ভরাট করা;

(৩) পুষ্করিণী পরিষ্কার রাখা;

(৪) ঝোপ জঙ্গল কেটে ফেলা;

(৫) জেলা বোর্ড ও শ্রীনিকেতনের সাহায্য নিয়ে ম্যালেরিয়া ঋতুতে সপ্তাহে দু'দিন করে প্রতিষেধক গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

১৯২৭ খ্রিঃ ডাঃ জিতেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী পল্লী সংগঠন বিভাগের কর্মীরূপে যোগদানের পর স্বাস্থ্য সমবায় আন্দোলন গতিশীল হয়ে ওঠে। শ্রীনিকেতনে স্থাপিত হয় একটি Clinical Laboratory। ইতিমধ্যে (১৯২৯ খ্রিঃ নভেম্বর মাসে) রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য সমিতিগুলির কাজে আকৃষ্ট হয়ে ভারতে আসেন 'The Friend Society of America'-এর প্রতিনিধি হিসাবে ডাঃ হ্যারি টিম্বার। তিনি বিনুরিয়া, বাহাদুরপুর, ইসলামপুর ও লোহাগড় স্বাস্থ্য সমিতির অধীনে গ্রামগুলিতে জনগণের রক্ত ও প্লীহা পরীক্ষা এবং ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহ করে একটি রিপোর্ট পেশ করেন।[২১] সেখানে স্বাস্থ্যসমিতির অধীনে ৯৬১ জন সদস্যের রক্ত ও প্লীহা পরীক্ষা করে কেবলমাত্র ৫.৫২% ব্যক্তিকে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সমিতির আর্থিক অনটনের দূর করে অন্যান্য গ্রামগুলিতেও এই ধরণের সমিতি গঠনের উপর ডা: হ্যারি গুরুত্ব দেন। এই গবেষণার উপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ (ক) গ্রামের অধিবাসীরা যাতে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, (খ) ভবিষ্যতে নিজেদের চেষ্টায় স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারে এই দুই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে স্বাস্থ্য সমিতিগুলি পুনর্গঠনের নির্দেশ দেন। ফলে ১৯৩২ খ্রিঃ বিনুরিয়া, বল্লভপুর, গোয়ালপাড়া ও বাঁধগোড়ায় গড়ে উঠে সমবায়সমিতির আইন দ্বারা নথিভুক্ত স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি। যেগুলি কোন সাহায্য না নিয়েই গ্রামের অধিবাসীদের মূলধনে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠে।[২২]

৪.২ স্বাস্থ্য সমবায় সমিতির বিধান ও পরিকল্পের ব্যয় ঃ

সমবায় আইন দ্বারা নথিভুক্ত সমিতিগুলির কাজ সুষ্ঠভাবে তত্ত্বাবধান এবং কাজের মধ্যে সঙ্গতি যাতে বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য সমবায়গুর্লির জন্য নিম্নলিখিত বিধানগুলি প্রবর্তিত হয় ঃ

(১) ৪/৫ টি গ্রাম নিয়ে ন্যূনতম ২৫০ পরিবারকে সদস্য করে গড়ে উঠবে এক একটি স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি;

(২) প্রতিটি পরিবার মাসিক এক আনা এবং বার্ষিক তিন টাকা চার আনা চাঁদা প্রদান করবে;

(৩) সভ্যরা সমিতি থেকে ন্যূনতম মূল্যের (এক আনা) বিনিময়ে ঔষধ পাবেন, যারা সভ্য নন তাদের বাজার দরে ঔষধ কিনতে হবে;

(৪) সভ্যরা সমিতির নিযুক্ত ডাক্তারকে মাত্র চার আনা ভিজিটে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন;

(৫) চিকিৎসালয়ে আসলে কোন ভিজিট লাগবে না;

(৬) ভিজিটের আয় সমিতির তহবিলে জমা হবে;

(৭) ডাক্তাররা প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস্ করতে পারবে না;

(৮) সমিতির সদস্যরা নিজেরা পরিচালন সমিতি নিয়োগ করবেন;

(৯) সমিতির অধীনস্থ গ্রামগুলির জন্য বার্ষিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

একটি সমিতি গঠন করতে গেলে আনুমানিক ২০০০ টাকা (দুই হাজার) পরিকল্প ব্যয়[২২] ধরা হয়েছিল। ব্যয়ের বিভাজনটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

এককালীন ব্যয় দফা	টাঃ	নিয়মিত ব্যয় (বার্ষিক) দফা	টাঃ
(ক) সমিতির বাড়ি ও ডাক্তারবাবুর বসবাসের গৃহ বাবদ	৬৫০.০০	(ক) ডাক্তারবাবুর বেতন বাবদ (মাসিক ৫০/- হারে)	৬০০.০০
(খ) আসবাবপত্র	৬০.০০	(খ) স্বাস্থ্যকর্মীর বেতন বাবদ (মাসিক ১৫/- হারে)	১৮০.০০
(গ) সাইকেল	৪০.০০	(গ) মেথরের বেতন বাবদ (মাসিক (৫/- হারে)	৬০.০০
(ঘ) আনুসঙ্গিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য	৫০.০০	(ঘ) কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সমিতিকে এককালীন চাঁদা	১৫০.০০
(ঙ) ঔষধপত্র ও ডাক্তারি সরঞ্জাম	২০০.০০	(ঙ) আনুসঙ্গিক ব্যয়	
মোট	১০০০.০০	মোট	১০০০.০০

৪.৩.১ স্বাস্থ্য সমবায় আন্দোলনের মূল্যায়ন ঃ অতীত

সর্বপ্রথম যে স্বাস্থ্য সমবায়টি গড়ে উঠেছিল তার কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই বাঁধগোড়া স্বাস্থ্য সমবায়ের অধীনে সভ্যের পরিবার পিছু বার্ষিক ব্যয় দাঁড়ায় মাত্র ২২ টাকা। সমিতির অধীনে না থাকলে তৎকালীন বাজার দর অনুসারে তাদের চিকিৎসা বাবদ ব্যয় হতো ১২৮ টাকা (বার্ষিক)[২৩]। ১৯৩৬ খ্রিঃ বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগের ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ ডাঃ সূর বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমবায় সমিতির সভ্যদের স্বাস্থ্য

পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেন যে, অন্যান্য ব্যক্তিদের তুলনায় এদের স্বাস্থ্য অনেক সুস্থ।[২৪] অন্যান্য স্বাস্থ্য সমবায়গুলিও ইতিমধ্যে আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছিল। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৫টি স্বাস্থ্য সমিতি বীরভূমে ৪৩,০০০ মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় রত।[২৫] সংশ্লিষ্ট সারণী-১ থেকে বোঝা যাবে সমিতিগুলি কতগুলি গ্রামে কি ধরণের কাজে যুক্ত। এই ধরণের কাজে উৎসাহিত হয়ে জেলা প্রশাসন সরকারি ভাবে এই স্বাস্থ্য সমবায় নিয়ে কাজ শুরু করে। রিলিফ কমিটির সভাপতি বি. কে. গুহের নেতৃত্বে ১৯৩৬-৩৮ খ্রিঃ মধ্যে জেলার পাঁচটি থানায় গড়ে উঠে পাঁচটি স্বাস্থ্য সমবায় (দেখুন, সারণী-২)।

৪.৩.২ বর্তমান ঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দেশব্যাপী যে গণআন্দোলন গান্ধীজির নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল তার আধার ছিল মূলত কংগ্রেস দল। এই সংগঠনটির গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটেছিল। ১৯৪৭ খ্রিঃ কংগ্রেস যখ ন শাসকদলে পরিণত হয় তখন স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠী নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু সুবিধা আদায় করে নেয় পরিকল্পনাহীন ভাবে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি ছিল উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া বোঝার মতো। বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও নানা কারণে সেগুলি ব্যর্থ হয়। আবার গুরুত্ব না দেওয়ায় ছোটছোট গ্রামভিত্তিক গড়ে ওঠা প্রাক্-স্বাধীনোত্তর প্রকল্প গুলি ভেঙে পড়ে। আত্মশক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশ গড়ার পরিকল্পনা রূপান্তরিত হলো 'গড়ে দিতে হবে' আন্দোলনে। একদিকে মহাযুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব, অন্যদিকে দেশবিভাগের ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধাক্কা সামলে উঠতে পারলো না জাতি গড়ার কারিগরের দল। তথাপি রবীন্দ্র আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ প্রমাণ করতে পেরেছিল তার প্রয়োজনীয়তাকে। সেকাজ আজও থেমে নেই, চলেছে 'মডেল' হিসাবে।

বর্তমান স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং অতীতের স্বাস্থ্য সমবায় নিয়ে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কয়েকটি গ্রামে ঘুরে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে সেটি তুলে ধরা হলো ঃ

(১) গ্রামের নাম বল্লভপুর—বৃদ্ধ প্রাণতোষ ঘোষের (নাম পাল্টে) এই বিষয়ে বক্তব্য হলো, "আগে ছিল আমাদের সমিতি, গ্রামে ছিল ডাক্তার। গ্রামের পরিবেশ নিজেরাই রক্ষা করতাম। এখন সবাই চাইছে পঞ্চায়েত করে দিক। এখন সুবিধা কই? শরীর খারাপ হলে পাঁচ মাইল দূরে সিয়ান হাসপাতাল; না হলে সিউরী"।[২৬]

(২) হাসান মিএগ (নাম পাল্টে), বয়স ৬০ বছর, বাড়ি সাত্তোর গ্রামে। প্রশ্ন করতেই বললেন, "আমাদের এখানে সরকার লাখলাখ টাকা খরচা করে হাসপাতাল গড়েছে। ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ছে, ডাক্তার আসে না, ওষুধ নেই। ছুটতে হয় শহরে, সেখানে

ডাক্তারবাবুতো কসাই হয়ে বসে থাকেন। আগে এখানে আসতো সমিতির ডাক্তার, ঘরের মানুষ, কথা বলেই রোগ অর্ধেক সেরে যেত।"[২৭]

(৩) গ্রাম—বিনুরিয়া; এখানে ১৯৩৪ খ্রিঃ থেকে স্বাস্থ্য সমবায়টি চলেছিল ১৯৭৫ খ্রিঃ পর্যন্ত। বর্তমানে এখানে পীচের রাস্তা হয়েছে, বিদ্যুৎ এসেছে, ফোন হয়েছে বাড়ি বাড়ি। তবে চিকিৎসার জন্য যেতে হয় সেই ১০ কি.মি. দূরে বোলপুর শহরে।

৫.০ পরিশেষে ঃ

এই প্রবন্ধের সূচনায় উল্লেখ করা হয়েছে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং তার সমাধানের পথ নিয়ে। একবিংশ শতকের প্রথম দশকে এসেও দেখা যাচ্ছে সে সমস্যা অব্যাহত। এখন সময় এসেছে গ্রামবাংলা তথা ভারতের অনগ্রসর এলাকার স্বাস্থ্য পরিসেবা নিয়ে নূতনভাবে চিন্তাভাবনা করার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাস্থ্যসমবায় ভাবনা আমাদের নূতন পথের সন্ধান দিতে পারে। শ্রীনিকেতনের পল্লীপুনর্গঠন বিভাগ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি ক্ষেত্রে এক সাথে পরিবর্তনের পক্ষে লড়াই করে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, শুধু স্বাস্থ্য নয় তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমবায় প্রথায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষিতে আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায়। সরকার যখন স্বাস্থ্য পরিসেবায় বেসরকারি করণের কথা ভাবছে, তখন গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্যসমবায়ের অধীনে নিয়ে এসে এক একটি এককে পরিণত করা যেতে পারে। এই এককগুলি আত্মনির্ভরশীল হলে সরকারি ভর্তুকির নামে অপচয়ও বন্ধ হবে। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা এখানেই।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। A. R. Desai—Social Background of Indian Nationalism, Bombay, 1976, p. 15-17.

২। Sumit Sarkar—The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908, New Delhi, 1973, p. 58

৩। দেখুন, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—স্বদেশী সমাজ, কলিকাতা, ১৩৬৯

৪। রবীন্দ্র রচনাবলী—৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশনা বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৬৭, পৃ. ৫৭।

৫। লেনার্ড নাইট এল্মহার্স্ট—ইনি ১৮৮৩ খ্রিঃ ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়রে জন্মগ্রহণ করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতক হওয়ার পর কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেন কৃষি বিজ্ঞানের ডিগ্রী। তিনি রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠনের কাজে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে সাহায্যের জন্য এদেশে আসেন।

৬। কিশোর আন্দোলন—(পুস্তিকা), কলিকাতা, ১৯৫২, পৃ. ৬

৭। Santinikean and Sriniketan, (a booklet), Sriniketan, 1983, p. 6 - 7.

৮। Rabindranath Tagore—The History and Ideals of Sriniketan, (Printed booklet), Sriniketan, 1926, p. 14.

৯। Visva- Bharati Bulletin, no. - 11, Dec. 1964, Santiniketan, pp. 2 - 3.

১০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বর্ধমান বিভাগীয় সম্মিলনে প্রধান অতিথির ভাষণ (ছাপা), শান্তিনিকেতন, ১৩৩৫।

১১। স্বদেশী সমাজ, পৃ. ৬৫ - ৬৭।

১২। Bengal Census Report, Calcutta. 1881, p. 60

১৩। W.W. Hunter - A Statistical Account of Bengal, Vol - IV, London, 1877, pp. 150 - 172.

১৪। L. S. S. O'malley—Bengal District Gazetteers, Calcutta (Reprint) 1996, pp. 48-49.

১৫। Bengal District Gazetteers, Vol - B, Birbhum District - 1921-31, Calcutta, 1933, p. 20.

১৬। Report of the Village Welfare Dept., Sriniketan, 1926-29, file no. XXXX, p. 40

১৭। Ibid, pp. 69-70.

১৮। Modern Review, May, 1940, p. 43

১৯। Sriniketan papers, File no. - 4/D.

২০। কালিমোহন ঘোষ—বীরভূমের স্বাস্থ্য ও অন্নসমস্যা, শ্রীনিকেতন, ১৩৪৩, পৃ. ২-৩

২১। Sriniketan paper, Book no. - 86, pp. 72 - 76.

২২। The Calcutta Municipal Gazette, April, 1939, p. 54

২৩। বীরভূমের স্বাস্থ্য ও অন্নসমস্যা, পৃ. ৬-৭

২৪। Rai Bahadur Sukumar Chatterjee—The Co-operative Health Society under the Visva-Bharati, (Source : Modern Review, May, 1940) p. 43

২৫। Sriniketan papers, file no. XXXXI, pp. 71-78

২৬। সাক্ষাৎকার—প্রাণতোষ ঘোষ, সাক্ষাৎকারের স্থান—বল্লভপুর, তারিখ—১৫/১২/২০০১

২৭. সাক্ষাৎকার—হাসান মিএগ, সাক্ষাৎকারের স্থান—সাত্তোর, তারিখ—৩/১১/২০০১

ACTIVITIES OF THE HEALTH CO-OPERATIVES (1925 - 47)
(Tagores' experimental Area)

Sl. No.	Name of The Society	Under Union Bord	No. of Villages to Be Covered	nature of Wrok
1.	Adhirapara	Bhromekol	11	Health, Agri, Edn.
2.	Albandha	Sarpalenana	07	Health, Agri, Edn
3.	Bandagora	Bolpur	03	Health, Agri, Edn.
4.	Benuria	Ruppur	12	Health, Agri, Edn.

5. Bolpur	Bolpur	01	Health, Agri., Edn.
6. Goalpara	Taltore	04	Health, Agri., Edn.
7. Jadabpur	Sattore	01	Health, Agri., Edn.
8. Kasba	Kasba	02	Health, Agri., Edn.
9. Laldaha	Sarpalehana	19	Health, Agri., Edn.
10. Noadanga	Sarpalehana	02	Health, Agri., Edn.
11. Parulanga	Taltore	02	Health, Agri., Edn.
12. Santalpara	Bolpur	04	Health, Agri., Edn.
13. Sitalpur	Sarpalehana	05	Health, Agri., Edn.
14. Sriniketan	Bolpur	26	Health, Agri., Edn.
15. Surul	Bolpur	01	Health, Agri., Edn.
*** 15 Centres	7 Unions	100	*********

(SOURCE : SRINIKETAN PAPERS, DEPT. OF HIST., VISVA-BHARATI, BOOK NO.61)

সারণী - ২
বীরভূম জেলা দুর্ভিক্ষত্রাণ কমিটি দ্বারা পরিচালিত স্বাস্থ্যসমবায়

স্বাস্থ্যসমবায়ের নাম	থানা	প্রতিষ্ঠার সময়	উপকৃত রোগীর সংখ্যা
১) চৌহাট্টা	লভপুর	সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮	১৯৩৭
২) যশপুর	দুবরাজপুর	অক্টোবর, ১৯৩৭	৯৩০৪
৩) পাঁচরা	সিউড়ী	ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬	৩৪০৬
৪) রুপুসপুর	খয়রাসোল	অক্টোবর, ১৯৩৭	৩৯৭২
৫) সেকেড্ডা	মহম্মদবাজার	ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬	২৮৭৯

সূত্র ঃ জেলা মহাফেজখানা, সিউড়ী, বীরভূম

বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় ও দর্শকসমাজ—টানাপোড়েনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় তথা পেশাদারি নাট্যশালা গড়ে উঠতে সময় লেগেছিল কমবেশি সোয়া শো বছর। বাংলার নাট্যচর্চাকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব হল ন্যাশনাল থিয়েটারের সময় থেকে (১৮৭২ খ্রিঃ) পেশাদারি থিয়েটারের কাল ধরা হলে 'ইংরেজি থিয়েটার' (১৭৫৩ খ্রিঃ প্রথম প্লে হাউস 'দ্য ওল্ড প্লে হাউস') থেকে 'লিয়েবেদেফের বাংলা থিয়েটার' (১৭৯৫ খ্রিঃ) হয়ে 'বাবু থিয়েটার' পর্যন্ত। অর্থাৎ ১৭৫৩ খ্রিঃ থেকে ১৮৭২ খ্রিঃ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্ব হল—১৮৭২ খ্রিঃ ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯১২ খ্রিঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু পর্যন্ত। এই সময় গিরিশ ঘোষ ছাড়া অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ধর্মদাস সুর প্রমুখের অবদানও উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় পর্ব হল—১৯২৪ খ্রিঃ বাংলা পেশাদার মঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাব থেকে ১৯৫৪ খ্রিঃ তাঁর অবসর গ্রহণ পর্যন্ত কাল। এই পর্বে আর যারা তাদের ভূমিকা পালন করেছেন তারা হলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, অহীন্দ্র চৌধুরী, সতু সেন প্রমুখ। চতুর্থ পর্ব হল—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে একদিকে গণনাট্য সংঘ ও গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের দ্বারা নাট্যচর্চা, যেখানে শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত প্রমুখের অবদানে সমৃদ্ধ। অন্যদিকে মহেন্দ্র গুপ্ত, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সলিল মিত্র প্রমুখের সাধারণ রঙ্গালয় ভিত্তিক পেশাদার নাট্যচর্চা।

প্রথম পর্বের নাট্যচর্চায় একদিকে ইংরেজি থিয়েটারের সাধারণ ইংরেজ জনগণ, লিয়েবেদেফের বেঙ্গলী থিয়েটারে সাধারণ বাঙালী টিকিট কেটে নাটক দেখার সুযোগ পান। লিয়েবেদেফের নাটকের বিষয়, অভিনেতা-অভিনেত্রীবর্গ সব কিছুর মধ্যেই সমাজজীবনের একটা ছাপ ছিল। কিন্তু এরপর ১৮৭২ খ্রিঃ পর্যন্ত যে থিয়েটার তা ছিল 'বাবু থিয়েটার', যাকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'শখের থিয়েটার'। ১৮৬৮ খ্রিঃ 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের' প্রতিষ্ঠা থেকে যে ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্ম সেখান থেকেই টিকিট কেটে সাধারণ মানুষের যে প্রবেশাধিকার তার থেকেই সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনা।

সাধারণ রঙ্গালয় কথাটির মধ্যে দুটো শব্দ আছে—'সাধারণ' অর্থাৎ সাধারণ জনগণ এবং 'রঙ্গ' অর্থাৎ বিনোদন। এই দুটো বিষয়কে বাদ দিয়ে সাধারণ রঙ্গালয় গড়ে উঠতে পারে না। ভালো নাটক ও সাধারণের জন্য বাণিজ্যিক সাফল্যের আশায় বাণিজ্যিক নাটক—এই টানাপোড়েনের ইতিহাসই হচ্ছে সাধারণ রঙ্গালয়ের উত্থান-পতনের ইতিহাস। নাট্যজগতে স্থায়ীভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনেক আগেই গিরিশচন্দ্র

মঞ্চাধ্যক্ষের পেশাদারিত্ব সম্পর্কে সতর্ক হয়েছিলেন বলে, দি ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা পর্বে টিকিট বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম এখনও এমন উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ টিকিট বিক্রয় করিয়া সাধারণের সম্মুখে বাহির হওয়া যায়। ন্যাশনাল থিয়েটার নাম শুনিয়া অনেকেই মনে করিবেন এই থিয়েটার দেশের সমস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সমবেত চেষ্টার ফল ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ। কিন্তু কতগুলি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সাজসরঞ্জামে ন্যাশনাল থিয়েটার করিতেছে ইহা বড়ই বিসদৃশ হইবে।" অবশেষে টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার করার বিপক্ষে যাঁরা—সুরেশচন্দ্র মিত্র, রাধামাধব কর, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, নন্দলাল ঘোষ, মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গিরিশচন্দ্রকে অনুসরণ করে, ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, ১৮৬৭ খ্রিঃ 'কিছু কিছু বুঝি' অভিনয়ের সময় মাইকেল মধুসূদন, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিকে টিকিট বিক্রি করার অনুরোধ করেছিলেন। টিকিট বিক্রির পক্ষে যাঁরা, তাঁরা মনে করতেন দিনের পর দিন মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চ নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়।

অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না, সাধারণ রঙ্গালয়ে সাধারণ বুদ্ধি দর্শকদের মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রেখেই মালিক পক্ষকে তাঁদের বাণিজ্যিক সাফল্যের প্রত্যাশা পূরণ করতে হয়। তুলসী লাহিড়ী একবার 'নাটক ও দর্শক' শীর্ষক.এক রচনায় লিখেছিলেন, "নাটক একান্তভাবে দর্শকের জন্য। পরিবেশন ও সংগঠনকারীগণ তাঁদের তৃপ্তি দিয়ে যশ অর্থ সব কিছু পাওয়ার আশা করেন। কল্যাণধর্মী ভাল নাটক দর্শক যদি অপছন্দ করে, তবে সেটাকে পরিবেশনকারীগণ পরাজয় বলে মেনে নেয়। আবার যদি অন্তঃসারশূন্য উত্তেজনাবহুল, চাকচিক্যসম্বল নাটক পছন্দ করে, কুভোজ্যের মত বিষ-ক্রিয়ায় সে দর্শকগণের এবং সমাজের যত অকল্যাণই করুক না কেন, পরিবেশকগণ আত্মরক্ষার তাগিদেই তাকে জয় বলে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। তাই নাট্যাভিনয়ের উন্নতি অবনতি প্রভৃতি সব কিছুর জন্য দর্শকের দায়িত্বও প্রচুর।" দর্শকের চাহিদার তারতম্য যুগে যুগে নাট্যালয়ের সংগঠকদের প্রভাবিত করলেও, বিচক্ষণ ও সুবিবেকী মালিকপক্ষ অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও সুনাট্যের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা বজায় রেখে নাট্যপ্রযোজনাকে কেবল বাণিজ্যিক লাভালাভের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন নি কিংবা বক্স-অফিসের সাফল্যের পক্ষেই তাঁদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রাখতে চান নি। বরং কীভাবে উন্নততর নাটকের দিকে দর্শকদের আকর্ষণ করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করতে চেয়েছেন। তুলসী লাহিড়ী তাঁর পূর্বোক্ত নিবন্ধে বলেছিলেন, "সাধারণ রঙ্গালয়ে নানা প্রকার দর্শকের সমাবেশ হয়। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সুরসিক থেকে জড়বুদ্ধি সূক্ষ্মানুভূতি ও রসজ্ঞানহীন সব রকম দর্শকই থাকে। তারা নাটক অভিনয় থেকে যে

যার ধারণা শক্তি অনুসারে আনন্দ আহরণ করে। এই বিভিন্ন রুচি ও বুদ্ধির দর্শকেরা নট-নাট্যকার ও নাট্য-পরিবেশকদের এক চিরন্তন সমস্যা। এদের কাকে খুশি করব। এটা অনেকেই স্থির করতে পারল না।" যাঁরা স্থির করতে পারেন না, তাঁরা কেবলই অলীক কোনও ভাবনায় থিয়েটারকে ক্রমাগত চমক আর আকর্ষণ তৈরি করে দর্শক সমাগম ঘটানোর অভিলাষে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠেন। কীভাবে রসোত্তীর্ণ নাটকে সব ধরণের দর্শকই সন্তুষ্টবোধ করেন সে বিষয়ে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে তুলসী লাহিড়ী জানাচ্ছেন, "সার্থক নাটক বহুদিন চলে। প্রতিদিন বিভিন্ন নাটক দেখতে আসে। তাদের ভারগ্রহীতার তারতম্য প্রতিদিনই থাকে। কিন্তু অভিনয়ে কোনও ত্রুটি না হলে সমবেত প্রতিক্রিয়া একইভাবে নিত্য প্রকাশ পায়। করুণ রসের প্রভাবে প্রতিদিন দর্শক একইভাবে অভিভূত হয় এবং প্রেক্ষাগৃহে একটা থমথমেভাব সৃষ্টি হয়। যেখানে হাসি ওঠার প্রতিদিনই সেখানে হাসি ওঠে। বারোয়ারি আসরে, যেখানে ছোট ছেলেমেয়েরাই মঞ্চের ঠিক সম্মুখে বসে, তারাও অভিভূত হয়ে একটা অদ্ভুত আগ্রহ নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে দেখতে থাকে, যদিও অভিনীত রসের সঙ্গে বয়সের জন্য তাদের পরিচয় থাকে না।"

শচীন সেনগুপ্ত একবার তাঁর একটি গ্রন্থে বাংলা নাট্যপ্রেমী দর্শকদের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর কীভাবে রঙ্গালয় মালিকদের নির্ভর করতে হয় সে প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "বাংলার সখের থিয়েটার 'প্রফেশনাল' থিয়েটারে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে যখন অর্থের বিনিময়ে সাধারণ দর্শক হওয়ার অধিকার লাভ করল, তখন আর বাংলার নাট্যশালা বিদগ্ধ ধনিকদের আনন্দ নিকেতন হয়ে রইল না। বিভিন রুচির ও শ্রেণীর দর্শক প্রেক্ষাগৃহে সমবেত হতে লাগলেন। নাট্যশালার পরিচালকরা খুব শিগগিরই বুঝতে পারলেন যে, 'গ্যালারি'র দর্শকদের মর্মবীথে যে সুর বাজে, তারই সঙ্গে সুর বেঁধে দিতে না পারলে তাঁদের নাটক জনপ্রিয় হবে না এবং নাটক জনপ্রিয় না হলে নাট্যশালা নিজের আয়ের ওপর নির্ভর করে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, অর্থের জন্য ধনিকেব মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলেও পারবে না।" গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন বাংলার সব ধরণের দর্শক—শিক্ষিত, অশিক্ষিত, শহরের, গ্রামের, ধ্যানে-ধারণায়, রুচিতে বিশেষ পার্থক্য আছে। গিরিশচন্দ্র সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই সাধারণ রঙ্গালয়ের সেবা করতে চেয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পরবর্তী পঁচিশ বছর পর্যন্ত। বাংলা পেশাদার রঙ্গালয়ের প্রধানতম এবং একছত্র অধিপতি ছিলেন গিরিশচন্দ্রই।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পঁচিশ বছরের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল ১৮৯৭খ্রিঃ বিডন স্ট্রীটের স্টার মঞ্চে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারের প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে। একটানা পঁচিশ বছর পুরনো থিয়েটারের একঘেঁয়েমির মধ্যে অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারকে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'একটি সর্বজাতীয় আমোদাগারে' পরিণত করলেন।

জাঁকজমক, আড়ম্বর, নাচ-গান-লঘু রঙ্গরসিকতা, বর্ণময় জৌলুষ দিয়ে দর্শকদের সামনে প্রলোভন তৈরি করে মৃতপ্রায় থিয়েটার-ব্যবসার মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। 'আলিবাবা' প্রযোজনা কাল থেকে ১৯১৬ খ্রিঃ অমরেন্দ্রনাথের প্রয়াণ পর্যন্ত, পরবর্তী দু দশকব্যাপী, যদিও বাংলা মঞ্চে নানা নতুনত্ব সঞ্চারিত হয়েছিল, মঞ্চব্যবসায় আধুনিকতা থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মাধ্যমে। তা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে অনেকটা স্তিমিত হতে শুরু করে।

মনোমোহন থিয়েটারে দুরবস্থার সুযোগে শিশির ভাদুড়ী মনোমোহন নাট্যমন্দির স্থাপন করে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' প্রযোজনা করেন ৬ আগস্ট, ১৯২৪ খ্রিঃ, যা বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। শিশির কুমার অধ্যাপনার সম্মান ও আরামের কাজ পরিত্যাগ করে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের একঘেয়ে একটানা স্রোতে একটা পরিবর্তন আনার জন্য পেশাদার অভিনেতার জীবন গ্রহণ করে একটি দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শিশিরকুমারের আকর্ষণেই তাঁর বিদগ্ধ বন্ধুমণ্ডলীর অনেকেই রঙ্গমঞ্চের নিয়মিত দর্শক হন, কেউ কেউ তাঁর প্রযোজিত নাট্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন, যেমন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কিন্তু তিরিশ বছর ব্যাপী তাঁর সে অভিযাত্রা বারবার ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে। সে ব্যর্থতা কখনো এসেছে সমাজজীবন থেকে, কখনো এসেছে নন্দনতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে।

বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের এই সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা থেকে যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং ঘাত-প্রতিঘাতময়। সমাজজীবনের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের টানাপোড়েন তো ছিলই, তাছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল তার-প্রতিবাদী চেতনা। ১৮৭২ খ্রিঃ বাংলায় সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা যে গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্ম দিল তা হল নাট্যকারদের, জমিদার পোষা কলমাচি থেকে স্বাধীন নাট্যকারে পরিণত হওয়া। বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ যাত্রা শুরু করল যে 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে, তাতে প্রথম বাংলার কৃষক সমাজ তার মাটির গন্ধ নিয়ে উঠে এল। 'নীলদর্পণ' প্রথম নাটক যেখানে ভারতীয়দের অত্যাচার ও শোষণের জন্য ইংরেজ সরকারকে সরাসরি দায়ী করা হল। যদিও এ নাটক সামগ্রিক শ্রেণী সংগ্রামের নয়, তবুও প্রতিরোধ ও প্রত্যাঘাতের জ্বলন্ত দলিল 'নীলদর্পণ'।

সেই সময়ের যুগ লক্ষণের বৈশিষ্ট্য কীরূপ ছিল? একদিকে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্র, জাগরণোন্মুখ বণিক শ্রেণী—অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন এবং তারই প্রভাবে বাঙালী মধ্যবিত্তের নবজাগৃতি, সিপাহী বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ—এতগুলি ঘটনার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে এক নতুন নাগরিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটল। একই সঙ্গে যে নাগরিক রক্ষণশীল, অর্থ-লোলুপ, মদ্যপ, অনুদার, ভণ্ড, আত্মকেন্দ্রীক ও স্বার্থপর;

অন্যদিকে এই নাগরিক শ্রেণী নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের চেতনা, পরাধীনতা ও সামাজিক নিপীড়নের মর্মবেদনা, সমাজ সংস্কারের প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং বহুদিনের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বারবার আঘাত হানছিল। একদিকে রিচার্ডসন-ডিরোজিও-ডেভিড হেয়ার-বেথুন; অন্যদিকে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-শ্রীরামকৃষ্ণ। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ইতিহাসবোধ-সাহিত্যবোধ-নবচেতনার বিকাশ হল। একটির পর একটি বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার প্রসার। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন-প্রসার-বিকাশ, সতীদাহ-বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ-বিধবাবিবাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, বাংলা গদ্যের বিকাশ প্রভৃতি ঘটনা সেই সময়কার যুগলক্ষণের প্রকৃত দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে। এই সমাজ মানসিকতার প্রেক্ষাপটেই ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা। উল্লেখ্যনীয় ন্যাশনাল থিয়েটার এমন একটি সময়ে প্রতিষ্ঠিত হল যখন জাতীয় কংগ্রেসের (Indian National Congress) জন্ম হয় নি। বাংলায় জাতীয় চেতনা, জাতীয় আন্দোলন, জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় নি। বাংলা থিয়েটারের এই জাতীয় চৈতন্য সম্বলিত ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ হল—নীলদর্পণ, জমিদার দর্পণ, চা-কর দর্পণ, সুরেন্দ্র বিনোদিনী, শরৎ-সরোজিনী, গজদানন্দ ও যুবরাজ প্রভৃতি নাটক। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, স্বদেশচেতনা এবং প্রবল ব্রিটিশ বিরোধিতায় উত্তাল হয়ে উঠে। এরপর ১৯১২ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু, ১৯১৪-১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন—ইতিহাসের ঘটনাক্রমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ কিন্তু চলতে পারল না। দেখা দিল ভাঁটার টান। কিন্তু সেই অসহযোগ আন্দোলনের বছরেই আবির্ভাব হল শিশিরকুমার ভাদুড়ীর। তিনি বাংলা রঙ্গমঞ্চে জোয়ার আনলেন সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই, সমাজজীবন থেকে রসদ নিয়েই। কিন্তু ক্রমশ বিশেষ করে শিশির কুমার ভাদুড়ীর জীবনের শেষ দিক থেকে নাট্যকর্মী ও দর্শকরা নিস্পৃহ, নিরুৎসাহ হতে লাগলেন।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে ১৮৭২-১৯৪৪ খ্রিঃ অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনা থেকে গণনাট্য সংঘের আবির্ভাব পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় সমাজ-জীবনের সঙ্গে কখনো সম্পৃক্ত থেকে, কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। এই টানাপোড়েনেরই সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা এই রচনা।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, ১৯৪৬ খ্রিঃ, বেঙ্গল পাবলিশার্স।

২। গণেশ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ২০০ বছরের বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটার ১৯৯৭খ্রিঃ, বিশ্ব কোষ পরিষদ।

৩। দেবাশীষ মজুমদার, শেখর সমাদ্দার (সম্পা.), শতাব্দীর নাট্যচিন্তা, ২০০০ খ্রিঃ এ

মুখার্জী এ্যান্ড কোং।

৪। শচীন সেনগুপ্ত, বাংলার নাটক ও নাট্যশালা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যান্ড সন্স।

৫। উৎপল দত্ত, চায়ের ধোঁয়া, ১৯৬৪ খ্রিঃ, রূপা এ্যাণ্ড কোং।

৬। প্রভাত কুমার গোস্বামী, দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ; সাহিত্য প্রকাশ।

৭। বিপিন বিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, বিদ্যাভারতী।

৮। দীপক চন্দ্র, বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা (১৯২৩-১৯৬০), ১৯৮২ খ্রিঃ সাহিত্য সংস্থা।

বর্ণবৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও ক্রীড়া সত্তা
ঔপনিবেশিক কলকাতায় ফুটবল-সংস্কৃতির একটি চালচিত্র

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ফুটবল খেলার ব্যাপক প্রসার ও জনপ্রিয়তা বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। ফুটবল ঔপনিবেশিক বাংলায় বাঙালি জনগণের এক নতুন অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক ক্রীড়া সত্তার প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এই ক্রীড়াসত্তা ঔপনিবেশিক শাসনে আহত জাতীয়তাবাদের আধারে পুষ্ট হওয়ায় ক্রমশ এক ঐক্যমূলক জাতীয়তাবাদী সত্তায় পরিণত হয়েছিল।[১] ইংরেজের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ক্রীড়াক্ষেত্রেও তার নখর বিস্তার করায় কলকাতার ফুটবল সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাঙালিদের প্রথম থেকেই বর্ণবৈষম্য তথা জাতিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। এই লড়াই শুধুমাত্র ইউরোপীয় দলের বিরুদ্ধে ফুটবল যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তার প্রকাশ ঘটেছিল বাঙালি দর্শকদের উগ্রতায়, দেশীয় ক্লাব-সংগঠকদের আন্তরিকতায়, দেশীয় ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকতায় আর ইংরেজের বিরুদ্ধে জয়শ্রুতির গণ আকাঙ্ক্ষায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, পরবর্তীতে বিশেষত ঊনিশ-শো ত্রিশ ও চল্লিশ-এর দশকে বাঙালির জাতীয়তাবাদী ক্রীড়া-সত্তায় সাম্প্রদায়িকতার মতো কদর্য-লক্ষণ এক অবাঞ্ছিত বিভাজন রেখা সৃষ্টি করে, যা অনেক সময়েই তদানীন্তন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে সম্পৃক্ত হয়ে সামাজিক সংঘাত ও হিংসার রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে ফুটবল মাঠ ইংরেজ 'সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব'-র আধার হতে মুক্ত ছিল। ইংরেজরা প্রথম থেকেই কলকাতা ফুটবলে বর্ণবিদ্বেষী নীতি গ্রহণ করে। সমাজ-রাজনীতির অন্যান্য অঙ্গনের মতোই ফুটবলেও বাঙালি দলগুলোকে সংগঠন, অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইংরেজের পদ্ধতিগত বৈষম্যনীতির শিকার হতে হয়েছিল। এ কাহিনীর সূচনা ১৮৯৩ সালে ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা আই এফ এ-র প্রতিষ্ঠা হতে। জন্মলগ্ন হতে ঐ প্রতিষ্ঠান ছিল সম্পূর্ণ 'অভারতীয়'। ঊনিশ শতকের পট পরিবর্তনে একজন ভারতীয়কে যুগ্ম সম্পাদকরূপে গ্রহণ করা হলেও তিনি ইউরোপীয় সাম্মানিক সম্পাদকের 'ব্যক্তিগত কেরানি' (Personal Clerk)-এর বেশি কিছু ছিলেন না। আই এফ এ-র অধীনস্থ বা সংযুক্ত ক্লাবগুলোকেও 'ইউরোপীয়' ও 'ভারতীয়'—দু'ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রথমোক্ত শ্রেণীর দলগুলোই আই এফ এ-র গভর্নিং বডি ও কাউন্সিল এ প্রভূত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করত। ১৮৯৩ হতে প্রায় চার দশক ব্যাপী বাঙালি তথা ভারতীয় দলগুলোকে এই সংগঠনের ইউরোপীয় সদস্যদের হাতে নানান বৈষম্য, হেনস্থা, অবিচার ও অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল।

সংগঠিত স্তরে ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। ট্রেডস্ কাপ ও আই এফ এ শিল্ড ছাড়া প্রায় সব উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতাতেই ভারতীয় দলের খেলার দরজা দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। সিমলার ডুরাণ্ড কাপ ও বোম্বাই-এর রোভার্স কাপ ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ সামরিক দলগুলোর কর্তৃত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি, কলকাতার আই এফ এ পরিচালিত প্রথম বিভাগীয় লিগ (১৮৯৮ হতে) ও দ্বিতীয় বিভাগীয় লিগ (১৯০৪ হতে) প্রথম পর্বে ভারতীয় দলের জন্য প্রবেশহীন ছিল। প্রথম বিভাগীয় লিগ ১৯১৪ সাল পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণত 'শ্বেতাঙ্গ' প্রতিযোগিতাই ছিল; ঐ বছরই প্রথম মোহনবাগান ও পর বছর এরিয়ান—এই দুটি ভারতীয় দলের খেলার সুযোগ দানের মধ্যেই আরও এক দশক ভারতীয়দের অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ রাখা হয়। উপযুক্ত নিয়মানুগ যোগ্যতামান থাকা সত্ত্বেও ঐ একই দশকে কুমারটুলি-কে পর পর দু'বার প্রথম বিভাগে খেলতে দেওয়া হয় নি। ১৯২৫ সালে ইস্টবেঙ্গল দলের প্রথম বিভাগে ওঠাকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কের আগে পর্যন্ত এই বিদ্বেষী ও বৈষম্য নীতি বজায় ছিল।[২]

আই এফ এ শিল্ড যদিও 'মুক্ত' প্রতিযোগিতা (Open tournament) ছিল, এই প্রতিযোগিতাতেও প্রথম দিকে শোভাবাজার ভিন্ন অন্য ভারতীয় দলগুলোর প্রবেশাধিকার খুবই নিয়ন্ত্রিত ছিল। কোচবিহারের মহারাজা রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর প্রথম বছরের শিল্ড খেলায় অন্যান্য ভারতীয় দলের অংশগ্রহণে বিধি নিষেধ থাকায় ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের উদ্যোগে ও খরচে কোচবিহার কাপ নামে একটি পরিবর্ত মুক্ত ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। ইংরেজের ক্রীড়াবৈষম্য নীতির অপর প্রকাশ দেখতে পাই প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পৃথকীকরণের মধ্যে। কলেজ ফুটবলে দেশীয় ও বিদেশী (ইউরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান) ছাত্রদের জন্য পৃথক পৃথক এলিয়ট ও ক্যাডেট শিল্ড প্রবর্তন করা হয়।

ফুটবল সংগঠনে ও অংশগ্রহণে এই বর্ণবিদ্বেষের জবাব বাঙালিরা মাঠেই দিতে শুরু করেন। বাঙালি ক্লাব সংগঠক-খেলোয়াড়-দর্শকদের আহত আত্মমর্যাদা বিশ শতকের প্রথম ভাগে মন্মথ গাঙ্গুলির ন্যাশানাল অ্যাসোসিয়েশন এবং পরবর্তীতে মোহনবাগান দলের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় দৃঢ়চিত্ত সংগ্রাম ও সাফল্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল। বিশ শতকের প্রথম দশকে প্রথমে ন্যাশনাল ও পরে মোহনবাগান উভয়েই উপর্যুপরি তিনবার করে ট্রেডস্ কাপ বিজয়ীব সম্মান অর্জন করে। অন্যান্য মুক্ত প্রতিযোগিতাগুলোতেও[৩] বাঙালি দলগুলো ক্রমেই ইউরোপীয় দলগুলোকে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিল। ১৯১১ সালের ২৯শে জুলাই ইংরেজ সামরিক দল ইস্ট-ইয়র্কস্ কে পরাজিত করে মোহনবাগানের আই এফ এ শিল্ড বিজয় কলকাতা ফুটবলে শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বের উপর এক চরম আঘাত হেনেছিল।

মোহনবাগানের এই ক্রীড়া বিজয় কলকাতার সমাজ জীবনে নেটিভ বাঙালি ও সাদা ইউরোপীয়দের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করেছিল বলা যায়। সমাজ জীবনের প্রতিপদে ইউরোপীয়দের হাতে অপমানিত বাঙালি মোহনবাগানের জয়কে হৃত আত্মমর্যাদার পুনঃপ্রকাশরূপে দেখাতে চেয়েছিল।[৪] ঐ সময়কার ব্রিটিশ পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় মোহনবাগানের জয়ের প্রেক্ষাপটে বাঙালির শারীরিক দক্ষতা ও মানসিক বীর্য্যের প্রশংসা করা হলেও একই সঙ্গে ইংরেজদের শান্ত ঔদার্যের কথাও উল্লেখিত হয়।[৫] ঐ সব পত্রিকায় এ কথাও বার বার বলা হয় যে মোহনবাগানের শিল্ড জয়ে ও তার তাৎক্ষণিক ফলাফলে কোনরকম জাতি-দ্বেষের আভাস মেলে না।[৬] কিন্তু ইউরোপীয়দের এই ঔদার্য সম্পর্কে সংশয় জাগে যখন দেখি যে কলকাতার ইউরোপীয় জনবসতি এলাকা ঐ খেলার পরে একেবারে অন্ধকার ও নির্জন হয়ে পড়েছিল।[৭] শিল্ড চলাকালীন একটি ঘটনার জনশ্রুতি এখানে উল্লেখযোগ্য।[৮] শিল্ডের সেমিফাইন্যাল খেলার দিন একজন ইংরেজ ও একজন নেটিভ খ্রিস্টান যখন একই রেলবগিতে এক সাথে যাচ্ছিলেন, দ্বিতীয়জন অত্যন্ত সরল মনে প্রথম জনের কাছে ঐ দিন খেলার ফল জানতে চাইলে তিনি যে উত্তরলাভ করেন তা হল গালে একটি সপাটে চড়।

মোহনবাগানের এই শ্বেতাঙ্গদের জাতিদর্পে কতটা আঘাত করেছিল তার প্রমাণ পাই এর পরবর্তী প্রায় দু'দশক ধরে মোহনবাগানসহ বাঙালি ক্লাবগুলোর প্রতি খেলার মাঠে ও সাংগঠনিকক্ষেত্রে ব্রিটিশদের চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্যে। ১৯১২ সালের শিল্ড প্রতিযোগিতায় মোহনবাগানকে প্রথম রাউণ্ডে ক্যালকাটার বিরুদ্ধে খেলায় শ্বেতাঙ্গ রেফারির উদ্দেশ্য প্রণোদিত অন্যায় পরিচালনার শিকার হয়ে বিদায় নিতে হয়। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ রেফারিদের নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বের অজস্র উদাহরণ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়।[৯] বিখ্যাত ঐতিহাসিক হীরেন মুখার্জী তাঁর এক স্মৃতি চারণে ১৯২৩ সালের শিল্ড ফাইনাল সম্পর্কে এরকম একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।[১০] ঐ ফাইনালে মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ক্যালকাটা। অসম্ভব বর্ষার মাঠেও রেফারি ক্লেটন খালি পায়ের মোহনবাগানকে খেলতে বাধ্য করেন যখন কিনা সকলেই ঐ দিন খেলা বাতিল করা হবে ভেবেছিল। খেলায় মোহনবাগান সহজেই ০-৩ গোলে পরাজিত হয়। ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি একবার গোষ্ঠপালের নেতৃত্বে মোহনবাগান দল খেলা চলাকালীন রেফারি ক্লেটনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ মাঠের মধ্যে বসে পড়ে খেলা বয়কট করেছিল[১১] ময়দানে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে বৈষম্যের সবচেয়ে স্পষ্ট বর্ণনা পাই অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত-র আত্মজীবনীমূলক লেখনিতে,—" সে সব দিনের রেফারিগিরি করা ইংরেজের একচেটে ছিল, আর সেই এক চোখা রেফারি পদে-পদে মোহনবাগানকে বিড়ম্বিত করেছে। অবধারিত গোল দেবে মোহনবাগান, হুইস্‌ল দিয়েছে অফসাইড বলে। ফাউল করলো ক্যালকাটা; ফাউল

দিলে না, যদি বা দিলে, দিলে মোহনবাগানের বিপক্ষে। কিছুতেই মোহনবাগানকে দাবানো যাচ্ছে না, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত বলা-কওয়া নেই দিয়ে বসল পেনাল্টি!" [১২]

পরাধীন ভারতে দৈনন্দিন সামাজিক জীবনের প্রতি পদে ইংরেজদের হাতে বাঙালি তথা ভারতীয়দের জাতিদ্বেষপূর্ণ লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করতে হত। নীরদ সি. চৌধুরির মত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি সংবেদনশীল ব্যক্তিত্বও স্বীকার করেছেন যে ভারতে ইংরেজগণ এক ধরণের জাতিগত বর্ণবৈষম্য নীতি অনুসরণ করত। ১৯২৮ সালে একবার তিনি নিজেই কলকাতা ইডেন উদ্যানের সংলগ্ন ইউরোপীয়দের জন্যে সংরক্ষিত পাশ দিয়ে হাঁটার জন্যে তিরস্কৃত হন।[১৩] সুভাষচন্দ্র বসুও তাঁর আত্মজীবনীতে ইংরেজদের এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৪] উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই অবশ্য এর বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদ বা পাল্টা জবাব দেবার প্রয়াস শুরু হয়েছিল।[১৫] ফুটবল মাঠ ছিল এই প্রতিবাদের এক মোক্ষম ক্ষেত্র। ইংরেজ রেফারির পক্ষপাতিত্ব আর ইউরোপীয় দলগুলোর শারীরিক শক্তির অপপ্রয়োগের জবাব বাঙালি খেলোয়াড়রা 'পাল্টা মার'-রএর দ্বারা মাঠেই দিতে শুরু করেন। খালি পায়ে বুট পরা ইংরেজ দলগুলোর সঙ্গে শরীর স্পর্শী (body-contact) খেলায় তাল ঠুকে সমানে সমানে লড়া ও পরাজিত করার সাথে সাথে খেলা চলাকালীন কোন শ্বেতাঙ্গ সামরিক খেলোয়াড়ের মুখে কনুই বা ঘুঁষি চালানো কিংবা ট্যাক্‌ল করার ভনিতায় জোড়ারো লাথি মারা ছিল এই 'পাল্টা মার'-এর অঙ্গস্বরূপ। কলকাতা ময়দানে গোষ্ঠপাল, অভিলাস ঘোষ কিংবা বলাই চ্যাটার্জি প্রমুখ খেলোয়াড় তাঁদের ক্রীড়ানৈপুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা মারের সার্থক রূপকার হিসেবেও বাঙালি সমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। অনেক সময় বাঙালি দর্শকরাও এই ধরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে তাদেরকে 'যথেচ্ছ মার' দেবার সুযোগ হাতছাড়া করত না।

বাঙালি সমাজে ফুটবলকে কেন্দ্র করে যে ঐক্যমূলক ক্রীড়াসত্তা আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা ক্রমশ এক ক্রীড়া জাতীয়তাবাদের রূপ পরিগ্রহ করে সত্য[১৬]; কিন্তু একই সাথে বিভিন্ন সামাজিক কারণে ঐ জাতীয়তাবাদী ক্রীড়া সত্তায় ক্রমিক বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছিল। কলকাতার ফুটবল ময়দানে সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ ছিল এই বিভাজিত মানসিকতারই প্রতিফলন মাত্র। বিশেষত ১৯৩০-৪০ এর দশকে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও তজ্জাত সামাজিক টানাপোড়েনের প্রেক্ষাপটে ক্লাব-সংগঠনে ও ফুটবল-সংস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটেছিল।

কলকাতার ফুটবলে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের সূচনা হয় ১৮৮৭ সালে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে কেন্দ্র করে।[১৭] তবে ঐ ক্লাব প্রথম থেকেই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রকাশ করেছিল একথা বলা চলে না। অবশ্য ১৮৯০ এর দশক থেকেই ক্লাবটির কংগ্রেস বিরোধী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় ক্লাবের মুখপত্র (The Calcutta Monthly)-র

মতামতের মধ্যে।[১৮] তা সত্ত্বেও বলা চলে ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত ময়দানে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদের প্রকাশ লক্ষিত হয় না। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল-যুগে' লিখেছেন ঃ ''তখনো খেলার মাঠে সাম্প্রদায়িকতা ঢোকে নি, মোহনবাগান তখন হিন্দু-মুসলমানের সমান মোহনবাগান—তার মধ্যে নেবুবাগান কলাবাগান ছিল না। সেদিন যে 'ক্যালকাটা' মাঠের সবুজ গ্যালারি পুড়েছিল তাতে হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, একজন এনেছিল পেট্রল, আরেকজন এনেছিল দিয়াশলাই। সওয়ার পুলিশের উচ্ছৃংখল ঘোড়ার খুরে এক সঙ্গে জখম হয়েছিল দু'জনে।''[১৯] বিশেষত, ১৯১১ সালে মোহনবাগানের শিল্ড বিজয়ের লগ্নে হিন্দু ভাইদের বিজয়োৎসবে মুসলিমরাও যথেষ্ট উৎসাহিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হয়েছিল।[২০]

ভারতীয় তথা বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লিগের প্রভাব বৃদ্ধি এবং ১৯২০-এর দশকে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্রমাবনতির প্রেক্ষাপটে খেলার মাঠেও তার প্রতিফলন পড়তে শুরু করেছিল। ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি যখন মহামেডান স্পোর্টিং কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলে এক শক্তিশালী দল রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তখন মুসলিম সম্প্রদায় ঐ ক্লাবকেই তাদের সার্থক সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক প্রতিনিধি সংগঠনরূপে গণ্য করতে শুরু করেছিল। ১৯৩৪-৩৮ পরপর পাঁচবার ইংরেজ ও দেশীয় দলগুলোকে পর্যুদস্ত করে মহামেডানের লিগ বিজয় বাংলার ফুটবলে দেশীয় শক্তির চূড়ান্ত ও স্থায়ী উত্থান ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক যে মহামেডানের এই জয়ে হিন্দু সমাজ ততোটা উল্লসিত হয় নি; বরং দু' একটি ক্ষেত্রে অন্য বাঙালি হিন্দু দলের বিরুদ্ধে মহামেডানের জয়কে আদৌ সুনজরে দেখা হত না।[২১] ঐ একই সময়ে বাংলাদেশে কংগ্রেস-বিরোধী মুসলিম লিগ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং লিগ মহামেডান দলকে স্পষ্টতই বাংলাদেশে মুসলিম শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ রূপে তুলে ধরেছিল। এমনকি জাতীয়তাবাদী মুসলিমগণও এক হাতে কংগ্রেস পতাকার সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতে মহামেডানের সাদা-কালো পতাকা ধরতেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩০-এর দশকের দ্বিতীয় ভাগে কলকাতা ফুটবলে ইংরেজ-ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান নিয়েছিল হিন্দু-মুসলিম প্রতিযোগিতা; যার ফলে কিনা ক্রীড়া ক্ষেত্রকেও সাম্প্রদায়িকতা স্পর্শ করেছিল।

১৯৩২ সালে একদল তরুণ উৎসাহী দেশপ্রেমী প্রগতিশীল মুসলিম কলকাতায় 'নব মুসলিম মজলিস' নামক সংগঠন স্থাপন করেন।[২২] এর উদ্যোক্তা ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিনের নিকটাত্মীয় খাজা নূরউদ্দিন, যিনি পরবর্তীতে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ভারতের এক প্রধান ফুটবল শক্তিতে পরিণত করতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মজলিস-এর জন্মলগ্নে এর অন্যতম প্রধান ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সাংগঠনিক ক্ষমতা দখল করে ক্লাবটিকে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাবে পরিণত করা। নব মুসলিম মজলিসের সামাজিক ও রাজনৈতিক সাফল্যের অঙ্গরূপে

ঐ ক্লাবও ক্রমে কলকাতার ফুটবলে চূড়ান্ত সাফল্য পেতে শুরু করে। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-র জীবনীকার এম. এ. এইচ ইস্‌পাহানি লিখেছেন যে ফুটবল মাঠে শক্তিশালী ইউরোপীয় ও হিন্দু দলের বিরুদ্ধে মহামেডানের জয়লাভ বাঙালি মুসলিম জনগণের মধ্যে এক আত্মবিশ্বাসী শক্তির ও শ্লাঘার সঞ্চার করেছিল।[২৩] বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টি ও ফজলুল হকের শাসনকালে মুসলিম লিগের জনপ্রিয়তাবৃদ্ধিতে মহামেডানের ফুটবল সাফল্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।[২৪] এর ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা, পরগণা ও মফস্বলে মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাব গঠনের উদ্যোগ শুরু হয়। লিগের রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠান ঐ ক্লাবকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেচ্ছ বে আইনি সরকারি সাহায্য দিয়েছিল তার প্রমাণও পাওয়া যায়।[২৫] হিন্দুরা স্বভাবতই এই ধরণের সরকারি একদর্শিতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল।

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব যে ক্রীড়াক্ষেত্রে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব যথেচ্ছভাবে করেছিল বিশেষত ত্রিশের দশকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে, তার যথেষ্ট উদাহরণ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে পাওয়া যায়। ১৯৩৮ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় কলকাতায় আগত বর্ম্মা দলের বিরুদ্ধে ক্যালকাটার মাঠে খেলতে মহামেডানের অস্বীকৃত হওয়াকে প্রশংসা করা হয়। কিন্তু ঐ একই প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়;—"মুসলমানরা যাতে বর্ম্মা দলের খেলা দেখতে না যায় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়েছে—হ্যাণ্ডবিল বিলি এবং আদেশ করে ঢোকবার লাইন থেকেও মুসলমানদের ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মতামতের জন্য মহামেডানদের খেলতে রাজি না হওয়া অনুমোদন করা যায়, কিন্তু তাদের সম্প্রদায়কে খেলাতে যোগ দিতে বাধা বা অনুজ্ঞা দেওয়া অনুমোদিত হয় না।"[২৬] ঐ একই বছর চ্যারিটি ম্যাচের অর্থ বিতরণ সম্বন্ধেও মুসলমানগণ আপত্তি ও অসন্তোষ জ্ঞাপন করে বলেন যে মহামেডানের চ্যারিটি হতে প্রচুর অর্থ আসা সত্ত্বেও সমহারে মুসলমান দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সেই অর্থ বিতরিত হয় নি। ১৯৩৬ সালের ৩১শে জুলাই ময়দানে মুসলিমদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলে মুসলমান খেলোয়াড় ও সদস্যদের স্বার্থরক্ষার জন্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৭]

১৯৪৬ সালে কলকাতার দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে কেন্দ্র করে যে 'Self-mobilization'-এর ইঙ্গিত অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস দিয়েছেন[২৮], তা কিন্তু শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ঐ ধরণের প্রচেষ্টা হিন্দু মহাসভার আধারে হিন্দুদের মধ্যেও শুরু হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষভাগ হতে হিন্দুদের মধ্যে যে স্বদেশী শারীর সংস্কৃতি মূলত আখড়া বা ব্যায়াম সমিতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, ১৯৩০-৪০ এর দশকে হিন্দু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে ঐ প্রয়াসেরই চূড়ান্ত রূপ দেখা যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে এইসব সংগঠন ভিত্তিক হিন্দু 'Self-

mobilization' প্রক্রিয়ার ফুটবলের মতো খেলাধূলোর ভূমিকাকে অস্বীকার করা অসঙ্গত হবে।[২৯] তনিকা সরকার মন্তব্য করেছেন, ১৯২০-র দশক থেকে ক্রীড়াভিত্তিক হিন্দু শরীর শিক্ষা বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সক্রিয়তা মুসলমানদের মধ্যে আশঙ্কার সৃষ্টি করে এবং তাদের পাল্টা প্রস্তুতি গ্রহণে উত্তেজিত করে।[৩০] যার ফলে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করেও কলকাতায় হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদ পুষ্ট হতে শুরু করে১৯৩০-এর দশক থেকেই। ১৯১১ সালে মোহনবাগানের বিজয়ে উল্লসিত মুসলমান জনতার স্থান দখল করে একদল উগ্র মুসলমান সমর্থক, যারা ছুরি-ক্ষুর ও সোডা ওয়াটারের বোতল নিয়ে নিয়মিত মাঠে যাওয়া শুরু করে। বিশেষত কলকাতায় ১৯৪৬-এর দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে ফুটবল মাঠে উগ্র হিংসার একটি সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক চরিত্র এ সময়ে প্রকট হয়ে পড়ে। সুরঞ্জন দাস যথার্থই লিখেছেন ঃ '' ... reverses suffered by the Mohammadan Sporting club in football matches enraged Muslim feelings which were expressed in sporadic violence against the Hindus.'' [৩১] ছেচল্লিশের দাঙ্গার প্রেক্ষিতে আই এফ এ শিল্ডের খেলা বাতিল হয়ে যায়।

দুর্ভগ্যজনকভাবে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মূলত রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও ধনী ব্যবসায়িদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট সফল ক্লাব পরিচালনার অঙ্গাঙ্গী কিছু সমস্যা থাকে। কেন না এইসব নেতা বা ব্যবসায়ীদের আসল স্বার্থ পূরণ হলেই তাদের ক্লাব প্রীতি বা পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রেও ভাটা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ক্ষেত্রেও এই ঘটনার ব্যতিক্রম হয় নি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশ ভাগের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণের পর মহামেডানের মুখ্য পৃষ্ঠপোষকরাও হয় পশ্চিম অথবা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। ফলে ক্লাবের ফুটবল তথা ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্য রবিও ক্রমশ অস্তমিত হয়ে পড়ে। গত ৫৫ বছরে মহামেডান স্পোর্টিং মাত্র তিনবার কলকাতা লিগ চাম্পিয়ান হয়েছে।

আলোচনার শেষে এসে বলা যায় যে, জাতি বিদ্বেষী উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্রোধান্বিত বাঙালি সমাজ ফুটবলকে বেছে নিয়েছিল এক অহিংস সাংস্কৃতিক অস্ত্র হিসেবে, যার মাধ্যমে শরীর ও মানসিক—দুয়েতেই সমানে সমানে লড়াই করে 'সাদা' ইউরোপীয়দের ওপর 'নেটিভ' বাঙালিদের শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করা যায়। একই সঙ্গে ফুটবলকে আশ্রয় করে ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী জাতীয়তাবাদী সচেতনতার প্রসার ঘটানোও সহজ হয়েছিল। কিন্তু বাঙালির এই ক্রীড়া-জাতীয়তাবাদী সত্তা ছিল নেতিবাচক,—সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতিতে ইংরেজের পীড়ন নীতির এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে তাদের বর্ণ বিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবর্ত ক্রিয়ামাত্র। যার ফলে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পটপরিবর্তন এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির ঐক্যমূলক

জাতীয়তাবাদী ক্রীড়া সত্তাও ক্রমশ বিশ্লিষ্ট বা বিভাজিত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক রেখায়। হয়ত একটু বেশিই সরলীকরণ করা হবে, তবুও বোধ হয় এরকমটা বলা অসঙ্গত হবে না যে বাংলাদেশে ফজলুল হক ও মুসলিম লিগের প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভ এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অগ্রগতি একই মুদ্রার দুই পিঠ ছিল মাত্র। হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের রাজনৈতিক সন্দেহ-কাতরতা ও সামাজিক অবিশ্বাস প্রবণতা ক্রীড়া ক্ষেত্রকেও স্পর্শ করেছিল। স্বভাবতই কলকাতার ফুটবল ময়দান ১৯৩০ ও ৪০ এর দশকে সাম্প্রদায়িকতার আবর্তে মসীলিপ্ত হয়েছিল। এইভাবে দেখা যায় যে, ঔপনিবেশিক কলকাতার ফুটবল সংস্কৃতিতে কোন ধারাবাহিক ও সুনির্দিষ্ট ঐক্যমূলক ক্রীড়াসত্তা খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্ট ফুটবল পিপাসু জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। বরং ফুটবলকে আশ্রয় করে প্রথম বাঙালির এক জাতীয়তাবাদী শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ বিরোধী ক্রীড়াসত্তা বিকশিত হয় এবং পরে তা ক্রমে সাম্প্রদায়িক রেখায় বাঙালি সমাজেরই বিভাজনের প্রতিফলকরূপে ব্যবহৃত হয়।

সূত্র-নির্দেশ :—

১। ফুটবলকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক বাংলায় যে বিশেষিত সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল, তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ফুটবল ও বাঙালি : ঔপনিবেশিক বাংলায় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রকাশ' (গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইতিহাস অনুসন্ধান-১৬, ফার্মা কে এল এম : ২০০২-এর অন্তর্গত); সৌমেন মিত্র, 'Babu at play : Sporting Nationalism in Bengal : A Study of Football, 1880-1911' (নিশীথ রায় ও রণজিত রায় সম্পাদিত Bengal : Yesterday and today, প্যাপিরাস : ১৯৯১-এর অন্তর্গত)।

২। কলকাতা ফুটবলে ইংরেজের বৈষম্যমূলক নীতির উদাহরণস্বরূপ উল্লেখিত তথ্যসমূহের জন্য দেখুন,—IFA Golden Jubilee Souvenir, পঙ্কজ গুপ্ত (সম্পা.) কলকাতা : ১৯৪৩; IFA Shield Souvenir, কলকাতা : ১৯৪৫।

৩। এই ধরণের প্রতিযোগিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল,—গ্ল্যাডস্টোন কাপ, মিন্টো-ফেট টুর্নামেন্ট, লক্ষ্মীবিশ্বাস কাপ, নবাব আসানুল্লাহ্ চ্যালেঞ্জ শিল্ড প্রভৃতি।

৪। ১৯১১-এর বিজয়ের প্রেক্ষিতে Times of India Illustrated Weekly লিখল : "On Thursday and Friday every Bengalee carried his head high and the one theme of conversation in the tramcars, in offices and in those places where the Babus congregate most, was the rout of the king's soldiers in boots and shoes by barefooted Bengalee lads."

৫। ৩০.৭.১৯১১-এর 'নায়ক' লেখে : "The second lesson is the magnanimous equanimity of the English. Amidst taunts and jeers .... they had the generosity to express their admiration for their conquerors to take them upon their shoulders and dance in glee so that everyone could see why the English are

the rulers of India ... would they show the same equanimity in the work of administration that they have shown in sport ?

৬। বসুমতী (৫.৮.১৯১১)-র প্রতিবেদনে বলা হয় : "They are greatly mistaken who seem to find race antagonism in this national victory. Race antagonism had nothing to do with it. There is nothing of meanness in the tide of patriotism that has rushed into the silted up life stream of the Bengali." দ্য টেলিগ্রাফ (৫.৮.১৯১১) ও একই সুরে লেখে : "The victory of the former (Mohaun Bagan) was well taken by the English population of Calcutta ... this is as it should have been for it was a fair contest, fairly and gallantly fought on both sides in a friendly spirit, without anything like race hatred and rancour finding any place in the hearts of the combatants."

৭। অমৃত বাজার পত্রিকা, ৩০শে জুলাই, ১৯১১।

৮। হিতবাদ, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯১১।

৯। যেমন, ১৯২২ সালের প্রথম বিভাগীয় লিগের মোহনবাগান- ক্যালকাটা খেলা সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা (১৮.৫.১৯২২)-এর প্রতিবেদনে পাই : "মোহনবাগান ও ক্যালকাটা ক্লাবের মধ্যে সে খেলা হয়, ... রেফারি বেনেটের পক্ষপাতিত্বতায় বাঙালি দলকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। বাঙালিরা কাহারও গায়ে লাগিলেই ফাউল। আর গোল দেওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেই 'অফসাইড'। খেলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রেফারি কেন দেওয়া হইতেছে না?"

১০। হীরেন মুখার্জী, "Playing for freedom', দি স্টেটস্‌ম্যান, ৯.৮.১৯৯৭। একই ঘটনার উল্লেখ পাই, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১.৭.১৯২৩।

১১। দি স্টেটস্‌ম্যান, ১১.৫.১৯৩৫।

১২। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, (কলকাতা : ১৩৫৭ সন), পৃ. ৬৬-৬৭।

১৩। নীরদ সি. চৌধুরি, Thy Hand, Great Anarch ! India : 1921 - 1952 (লণ্ডন : ১৯৮৭)।

১৪। সুভাষচন্দ্র বসু, An Indian Pilgrim : An Unfinished Autobiography and collected letters, 1897-1921 (লণ্ডন : ১৯৬৫), পৃ. ২২-২৩ ও ৬৪-৬৬)।

১৫। এ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর মন্তব্য উল্লেখ্য : "In conflicts of an inter-racial character the law was of no avail to Indians. The result was that after some time Indians, failing to secure any other remedy, began to hit back. On the streets, in the tram-cars, in the railway trains, Indians would no longer take things lying down. The effect was instantaneous. Every where the Indian began to be treated with consideration. Then the word went around that the Englishman understands and respects physical force and nothing else." সুভাষচন্দ্র বসু, ঐ, পৃ. ৬৫-৬৬।

১৬। ঔপনিবেশিক কলকাতায় ফুটবলীয় জাতীয়তাবাদের চরিত্র ও রূপপ্রকরণের বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'Sporting culture and cultural nation-

alism : A study of Football in Late colonial Calcutta', Occasional paper, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় : ২০০২, পৃ. ৬-১০।

১৭। ১৮৮৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিমদের ক্রীড়াসংস্থা জুবিলি ক্লাব পর পর দু'বার নাম পরিবর্তন করে, - প্রথমে ক্রিসেন্ট ক্লাব ও পরে হামিদিয়া ক্লাব । শেষ পর্যন্ত ১৮৯১ সালে ঐ ক্লাব পরিণতি পায় মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে।

১৮। ১৮৯৬ সালে বোম্বাই এর মুসলিম কংগ্রেস নেতা রহমতউল্লাহ সায়ানি কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতির বক্তব্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের কংগ্রেস বিরোধিতার তীব্র সমালোচনা করেন। সায়ানির এই সমালোচনার জবাবে Calcutta Monthly তার সম্পাদকীয়তে লেখে, " We wish we could induce Mr. Sayani to live for sometime in Bengal and see with his own eyes how Mohammadans fare at the hands of their Hindu friends in evey matter ..... and when he shall have done that, we have no doubt in our mind that he will pause thrice before committing himself to the espousal of a cause, the success of which will mean the gradual, but inevitabe, extinction of his co-religionists as a political unit in India." The Calcutta Monthly, ডিসেম্বর, ১৮৯৬।

১৯। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, ঐ, পৃ - ৬৭।

২০। এই প্রেক্ষিতে দি মুলসমান পত্রিকা লেখে: "It was a sense of universal joy which pervaded the feelings of the Hindus, the Mohammedans and the Christians alike. the members of the Muslim Sporting Club were almost mad and rolling on the ground with joyous excitement on the victory of their Hindu brethren." দি কমরেড, মাসিক মোহম্মদি প্রভৃতি পত্রিকাতেও অনুরূপ বর্ণনা পাই। রিপোর্টগুলোর জন্যে দেখুন মোহনবাগান ক্লাব প্লাটিনাম জুবিলি সুভেনির কোলকাতা : ১৯৬৪) পৃ.২৫; এবং Report on the Native Newspaper in Bengal, ৫ই আগষ্ট ও ১২ আগষ্ট ১৯১১ সপ্তাহান্ত সংস্করণ ।

২১। 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক মোহম্মদ নাসির উদ্দিনের মন্তব্য, লুৎফর রহমান রিটন, ফুটবল (ঢাকা : ১৯৮৫), গ্রন্থে উল্লেখিত, পৃ. ২১।

২২। এম. এ. এইচ ইস্‌পাহানি, Qaid-E-Azam Zinnah – As I knew Him (করাচি : ১৯৬৬), পৃ.৪; কেনেথ ম্যাক্‌ফারসন্‌, The Muslim Microcosm ; Calcutta, 1918-1935 (উইজব্যাডেন: ১৯৭৪), পৃ. ১২১।

২৩। ইস্‌পাহানি, ঐ, পৃ. ১২ ।

২৪। আবুল কালাম শামসুদ্দিন, অতীত দিনের স্মৃতি (ঢাকা: ১৯৬৪), পৃ. ১৫৪ - ১৫৮; হুমাইরা মোমেন, Muslim Politics in Bengal; A study of Krishak Praja Party and the Elections of 1937 (ঢাকা : ১৯৭২), পৃ.৭২।

২৫। ১৯৩৬ সালে খাজা নাজিমউদ্দিন একক ক্ষমতা বলে প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে ময়দানে মহামেডানকে একক ভাবে মাঠ ভোগ করার অধিকার এবং তার আর্থিক গ্যারিন্টি প্রদান করেন। Government of Bengal, Home Police, File, 7 - M of 1936 ও File 7-M

(1-3) of 1937 হতে প্রাপ্ত।

২৬। ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৪৫ সন (পৃ. ১৫০)।

২৭। ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৪৫ সন ।

২৮। সুরঞ্জন দাস, Communal Riots in Bengal, 1905 - 47 (নিউ দিল্লী : ১৯৯১), পৃ.১৭০।

২৯। জয়া চ্যাটার্জি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, এই সব সেবচ্ছাসেবী সংগঠন, যার অধিকাংশই হিন্দু মহাসভা নিয়ন্ত্রিত, ফুটবলকেও গুরুত্ব দিত; বেহালা যুব সম্প্রদায় যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জয়া চ্যাটার্জি, Bengal Divided. Hindu Communalism and Partition, 1932 - 1947 (কেম্ব্রিজ ঃ ১৯৯৫), পৃ. ২২৩ - ২২৪।

৩০। তনিকা সরকার, 'Communal Riots in Bengal' (মুশিরুল হাসান সম্পাদিত- Communal and Pan - Islamic Trends in colonial India , নিউ দিল্লী : ১৯৮৫ -এর অন্তর্গত, পৃ. ৩০৯)।

৩১। সুরঞ্জন দাস, ঐ, পৃ. ১৭০। ঐ ধরণের হিংসাত্মক ঘটনার উদাহরণের জন্যে দ্রষ্টব্য, অমৃত বাজার পত্রিকা, ৮ই জুলাই, ১৯৪৬।

অরণ্য জীবনের প্রতিভাসে লৌকিক দেবী

বনবিবি

দীপক মণ্ডল

গ্রামময় সুন্দরবনাঞ্চলের শেষ প্রান্তে অবস্থান করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা। এই জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পূজা-অর্চনা হয়। বিশেষ করে সুন্দরবন ও অরণ্য সংশ্লিষ্ট 'আঠারো ভাটি' নিয়ে যে অঞ্চল, সেখানকার সর্বাগ্রগণ্য দেবতাদের মধ্যে অন্যতম বনবিবি। জল-জঙ্গল সমাকীর্ণ বাদাবনের দেশে গ্রাম সমাজের অধিষ্ঠাত্রী মা-বনবিবি। লোকায়ত হিন্দু জনগোষ্ঠী সমূহের কাছে ইনি সর্বজনপ্রিয় মাতৃমূর্তি। এই বনবিবিকে নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে এক ধরণের লোকপুরাণ বা মিথ তৈরি হয়েছে। এই মিথের সঙ্গে রূপকথা-কিংবদন্তী ইত্যাদি মিলেমিশে এক বিচিত্র প্রকরণের কাহিনী গড়ে উঠেছে।

আঠারোভাটি এলাকায় 'বনবিবি জহুরানামা; 'বনবিবির কেরামতি' 'ধনামৌলে ও দুখে সাহার কাহিনী'—নামে ইত্যাদি কাহিনী এলাকার পালাগায়কদের কাছে পাওয়া যায়। এই পাঠের একটি মুদ্রিত রূপ ১৩০৫ সনে চিৎপুরের মদিনা বুক ডিপো থেকে প্রকাশিত হয়—সংকলক মোহাম্মদ মুনশী। এখানে বনবিবি শুধু একজন অভিজাত মুসলমানী নন, মুসলমান সমাজে এঁর পরিচয় হল ইনি একজন বিলাসিনী। বনবিবি যে একজন উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্না মহিয়সী মাতৃমূর্তি এবিশ্বাস কিন্তু মুসলমান সমাজের থেকে লোকায়ত হিন্দু সমাজের মানুষের বেশি। বনাঞ্চল ও বনাঞ্চল সংলগ্ন গ্রাম জনপদে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বাঘের অধিদেবতা রূপে কল্পিত হয়ে রূপান্তরিত হন অভয়দাত্রী মাতৃমূর্তিতে। আদিতে তিনি ছিলেন একজন ইসলামধর্ম প্রচারক; পরিবর্তিত আচারে তিনি হয়ে ওঠেন অভয়দাত্রী মা বনবিবি। কল্যাণময়ীর কোন জাত নেই বলেই হয়ে ওঠেন হিন্দু-মুসলমান সমাজের মধ্যবর্তী একজন সমন্বয়ী মাতৃমূর্তি। যেখানে হিন্দুয়ানী ও মুসলমানী ধর্ম বিভাজন অপ্রাসঙ্গিক। বলা যেতে পারে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার যোগসূত্র।

বনাঞ্চল সংলগ্ন মানুষদের জীবন-জীবিকা বনাঞ্চলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। ফলে হিংস্র জন্তু বাঘের ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে বনবিবির প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিকে আশ্রয় করে নির্ভেজাল একটি রূপকথার আদলে তৈরি হয়েছে 'বনবিবির কাহিনী'। মক্কাবাসী বেরাহিম ফকিরের স্ত্রী ফুলবিবি নিঃসন্তান ছিল বলে ফকির সাহেব দ্বিতয়বার গুলাল বিবি নামে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। কিন্তু সতীনের কৌশলে গুলাল বিবিকে সুন্দরবনে নির্বাসনে যেতে হয়। নির্বাসনের সময় তিনি ছিলেন সন্তান সম্ভবা। বনেই শা

জঙ্গলী ও বনবিবি নামে তাঁর দুই সন্তান ভূমিষ্ট হয়। এরপর বনবিবি, মা ও ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে বনের হরিণেরা তাঁকে লালন-পালন করেন।

কালক্রমে সকলের পুনর্মিলন হলে, বনবিবি এবং সা জঙ্গলী মদিনা নগরী থেকে আঠারো ভাঠি রওনা হলেন। এখানকার অত্যাচারী রাজা দক্ষিণ রায়ের (নারায়ণী ঠাকুরের ছেলে) অত্যাচারে উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল প্রজারা। আল্লার আদেশে এই সমস্ত অসহায় ও দুর্বল মানুষদের রক্ষার জন্য দক্ষিণ রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন দেবী। অল্পদিনের মধ্যেই আশেপাশের বেশ কিছু অঞ্চল বনবিবির দখলে আসে এবং তিনি হয়ে ওঠেন আঠারোভাটি অঞ্চলের মা।

পরবর্তী অংশে দেখা গেছে বরিজ হাটির ধনা সাহা ও মনা সাহা নামে দুই ভাই সপ্ত ডিঙি সাজিয়ে জঙ্গলে মধু কাটতে গেছে। এদের ডিঙিতে নিয়ে গেছে এক দুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র 'দুখে'কে। একরাত্রে দক্ষিণ রায় ধনা কে স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে বললেন যে 'নরবলি পূজা' দিলে মোম মধু সাত ডিঙ্গা দিব তোরে আমি। এই সাত ডিঙ্গা 'মোম-মধুর লোভে ধনা দুখেকে ছলে ভুলিয়ে নাও থেকে নামিয়ে বনের মধ্যে পাঠায় কাঠ সংগ্রহের জন্য। যাতে দক্ষিণ রায় নরবলি রূপে দুখে কে গ্রহণ করে। বনের মধ্যে দক্ষিণ রায় বাঘের রূপ ধরে এসে দুখেকে খেতে উদ্যত হলে, দুখে মনে মনে "বনবিবি মাগো লেহ উদ্ধারিয়া" বলে ডাকতে শুরু করে।

বনবিবি সেই নীরব ডাক শুনতে পেয়ে ভাই শা জঙ্গলীকে নিয়ে ছুটে আসেন অকুস্থলে। শা জঙ্গলীর হাতের রাম থাপ্পড়ে দক্ষিণ রায়ের ঘাড়টা গেল বেঁকে। (সেই থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ঘাড়টা একটু ডাইনে বাঁকা)। পরাজিত দক্ষিণ রায় পরবর্তীকালে বনবিবির পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। কাহিনীর শেষ পর্বে বনবিবির ভয়ে ধনা সাহা দুখের সঙ্গে নিজের মেয়ে চম্পার বিয়ে দেন। দুখেও বনবিবির রহমতে বাদা অঞ্চলের চৌধুরী হয়ে ওঠে।

এই মাহাত্ম্যের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে বনের হিংস্র জন্তু বাঘের হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং জীবনের নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তি পেতে এই অঞ্চলের সাধারণ খেতমজুর, বাউলে, মউলে, শিকারী, নিকারী, বুনো পাটনী প্রভৃতি বিচিত্র জীবিকাধারীরা নিত্য স্মরণে রাখেন মা বনবিবিকে। বনবিবির সেই অভয়বাণী ঃ

আঠার ভাটির মাঝে আমি সবার মা।
মা বলে ডাকিলে তার বিপদ থাকে না।
বিপদে পড়ি যেবা মা বলি ডাকিবে।
কভু তারে হিংসা না করিবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রায় সর্বত্র বনবিবির উপাসনা হয় থান অথবা মন্দিরে। গ্রামে-গঞ্জে, হাট, ঘাট, পল্লীর পথ প্রান্তরে পূজা হয় মূর্তি ও মাটির স্তূপে।

বনবিবিকে নিয়ে যে গল্প মালাই তৈরি হোক না কেন; আদিতে তিনি এক অরণ্যবাসিনী মহাদেবীই ছিলেন, সে কথা শুধু 'বনবিবি' নামেই নয়, তাঁর সাজসজ্জা থেকেই বোঝা যায়। তাঁর পোশাক আশাকের উপর লতাপাতার নক্‌শা আঁকা। তিনি ব্যাঘ্র বাহনা, তারও তাৎপর্য আছে। অরণ্যের ভয়ংকরতম প্রাণীটিকে বাহনরূপে দেখানোর মাধ্যমে এটাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে তিনি সেখানে সর্বপ্রধানা। আবার ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায় যে তাঁর অধীনতা মেনে নিলেন, তারই সূচক রূপে বনবিবির ব্যাঘ্র সওয়ার মূর্তিটি কল্পিত হয়েছে। আবার দুখেকে কোলে নিয়ে বসা মূর্তির মোটিফ তো বিশ্বজননী মাতৃকামূর্তির সূচক। কোন কোন জায়গায় বনবিবির মূর্তির বদলে একটি ঢিবিকেই পূজা করা বা হাজত দেওয়া হয়।

প্রাচীন কালে দক্ষিণ বাংলার বিশিষ্ট জনপদ সভ্যতার ক্ষেত্র ভূমিতে অরণ্য ক্রমে ক্রমে নিজের অধিকার বাড়িয়ে গেছে। পরবর্তীকালে জঙ্গল হাসিল করে জনপদের পত্তন ঘটেছে। এর ফলে এখানকার জনপদ জীবনে সংস্কৃতির মিশ্রিত উত্তর সরণ ঘটেছে। নিজেদের প্রয়োজনেই মানুষ 'বনবিবি'কে নিয়ে হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্বের গণ্ডী পেরিয়ে সম্প্রীতির ঐক্যবদ্ধ স্রোতস্বিনী মিলনের ধারায় মিলিত হয়েছে।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। যোগেন্দ্র কৃষ্ণ বসু—"বাংলার লৌকিক দেবতা" (১৯৬৬) পৃঃ ৮।

২। সুভাষ মৈত্র—"মা বনবিবির উৎসব" ঃ যুগান্তর ঃ ২৯ মার্চ ১৯৭৩।

৩। শ্রী প্রলয় সেন—"কয়েদখানা" (১৩৮০)।

৪। "বাংলার মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস" (১৯৬৪)।

৫। কৃষ্ণরামের "রায় মঙ্গল" রচিত হয় ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে (দ্রঃ ১৪ নং পাদ টীকা গ্রন্থ, পৃঃ ৭৬২ ও ৭৬৫)।

৬। কমল চৌধুরী—২৪ পরগণা উত্তর ও দক্ষিণ ঃ সুন্দরবন।

৭। পশ্চিমবঙ্গের পূজা ও পার্বণ (তৃতীয় খণ্ড)—সম্পাদনা ঃ অশোক মিত্র।

৮। বাদাবনের লৌকিক পালাগান—মানিক সরকার।

৯। বাংলার লৌকিক দেবতা'—১৯৬৬ পৃ. ১৫২।

১০। পশ্চিমবঙ্গ ঃ জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ।

১১। বাঘ ও সংস্কৃতি—সম্পাদনা সনৎ কুমার মিত্র।

১২। কৃষ্ণরাম, হরিদেব এবং রুদ্রদেবের তিনখানি মঙ্গলকাব্য।

সারাংশ

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার ও গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

মোঃ শাহাদাত হোসেন সরকার

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নিস্তরঙ্গ মফস্বলে তথা গ্রামীণ সমাজে যে দু' একজন নিঃস্বার্থ নির্ভীক ব্যক্তি সমাজ সেবার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সাংবাদিকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) তাদের মধ্যে অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য। নিভৃত পল্লীতে বসে সংবাদপত্র প্রকাশনার যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছিলেন তা যথার্থই বিস্ময়কর ও অনেকাংশে তুলনারহিত। বিদ্যা শিক্ষার প্রতি অপরিসীম আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দারিদ্রতার কারণে পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে তিনি জনকল্যাণের লক্ষ্যে ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে (১২৭০ সালের ১লা বৈশাখ) গ্রামবার্তা প্রকাশিকা নামের পত্রিকা সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করেন। জীবনের ঝুকি নিয়ে হরিনাথ শাসক সরকার নীলকর, জমিদার, মহাজন প্রমুখ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে সৎ সাংবাদিকতার আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্য সাধক, সাময়িক পত্র পরিচালক, সমাজ সংস্কারক ও নব্য সাহিত্যিকদের উদার পৃষ্ঠপোষক। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পরিচালনার মাধ্যমে যে সাহসী সামাজিক ভুমিকা পালন করেন সেদিক দিয়ে তার সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আমার এ প্রবন্ধ সংক্ষেপে তার জীবন ও সামাজিক কর্মতৎপরতারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের কাব্যে উপনিবেশবাদের প্রতিক্রিয়া

শ্রাবণী পাল

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন লেখেন ''বাজ রে শিঙ্গা বাজ রে রবে,/শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,/সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে/সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে/ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে''? (ভারতসংগীত, কবিতাবলী) কিংবা নবীনচন্দ্র সেন যখন লেখেন 'সভ্যতার রঙ্গভূমে, কল্পনা উদ্যানে/বিদ্যার বিনোদ-বনে, সর্ব-অগ্রসর/ছিল যেই জাতি শ্রেষ্ঠ, সঙ্গীতে বিজ্ঞানে/অনুপম, অদ্বিতীয় সংগ্রাম ভিতর;/শাস্ত্রে শস্ত্রে শৌর্যে যার ছিল না দোসর,/শিশু গ্রিস, শিশু রোম, যার তুলনায়,/পার্থিব গৌরব এত অকিঞ্চিৎকর,/সে জাতির শেষে এই দুরবস্থা যায়!/.. সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর যতেক যন্ত্রণা,/অভাগার যে অনলে দহিছে হৃদয়,/কেমনে জানিবে তুমি কত বিড়ম্বনা/সহিয়াছি প্রতিদিন, প্রাণে

নাহি সয়/অধীনতা অপমান, প্রাণে নাহি সয়/স্বজাতির হীনাবস্থা, কি বলিব হায়!" (মুমূর্ষু শয্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক ঃ অবকাশরঙ্গিনী ১ম ভাগ) এবং দাবি করেন "আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয়, স্বদেশ-প্রেমের নামগন্ধ বাংলার কাব্যে, কি কবিতায় ছিল না"। (আমার জীবন ঃ নবীনচন্দ্র রচনাবলী ১ম খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃঃ ৩২৫) তখন কবির ভারতবোধে পাঠক উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ সপ্তম এডওয়ার্ডের আগমন উপলক্ষে যে কবিতা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র উভয়েই তাতে যোগ দেন, প্রবল আবেগে লেখেন "আসিছে ভারতে ব্রিটন-কুমার,/শুন হে উঠিছে গভীর বাণী:/গগন ভেদিয়া, জয় ভিক্টোরিয়া/রাজরাজেশ্বরী, ভারতরানী" (ভারতভিক্ষা ঃ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং রাজ্ঞীপুত্র তুমি, যে হও সে হও;/ভাবি রাজ্যেশ্বর ব্রিটিশ-তপন;/লও ভারতের সিংহাসন লও,/বহুদিন পরে যুড়াই নয়ন।.../ তোমার সাহিত্য, তোমার সঙ্গীত,/ তোমারই শিল্প, তোমার আচার,/তব সভ্যতায় ভারত প্লাবিত,/ভারতের আহা! কি রয়েছে আর!/...যুবরাজ। - যবে মাতৃসিংহাসন উজ্জ্বলিবে, যথা ওই শশধর;/স্মৃতিতে বিহুল, শুনিবে তখন, —/"জয় এডোয়ার্ড ভারত-ঈশ্বর" (ভারত উচ্ছ্বাস ঃ নবীনচন্দ্র সেন) এবং নবীনচন্দ্র প্রথম পুরস্কার পান, তখন কবির মনোবিন্যাসের প্রতি আমরা কিছুটা কৌতূহলী হয়ে উঠি, রাজভক্তির বেগবান প্রবাহ এখানে স্পষ্টত দেশানুরাগকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, 'স্বদেশপ্রেম' ব্রিটিশ-আনুগত্যে গ্রস্ত হয়েছে।

বস্তুত, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী চৈতন্যের এই দোলাচলতা সেই ঔপনিবেশিক কালতাড়িত। উপনিবেশ সুরক্ষিত করার জন্য ইংরেজ শাসক সেদিন যেসব ন্যূনতম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিল, তাই ক্রমশ ভারতবর্ষকে মধ্যযুগীয় স্থবিরতা থেকে উত্তীর্ণ করে দিল। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে সংঘটিত পরিবর্তন সৃজনশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে বিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী জটিলতার উৎস হয়ে দাঁড়াল তার মূল নিহিত তৎকালীন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে, —যাঁদের মনস্বিতা উপলব্ধি করেছিল ভারতে ইংরেজশাসনের অমৃতময় যুগপৎ গরলপূর্ণ দুটি ধারা। তাই ফরাসী বিপ্লবের প্রতি আবেগমথিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও ভারতে উপনিবেশবাদকে স্বাগত জানিয়ে ১৮২৩ সালে ইংল্যান্ডের রাজার প্রেরিত আবেদনপত্রে রামমোহন লিখেছিলেন — Your dutiful subjects consequently have not viewed the English as a body of conquerors, but rather as deliverers, and look up to your Majesty not only as a Ruler, but also as a father and protector.'' সিপাহী বিদ্রোহ দমনে সমকালীন বুদ্ধিজীবী বাঙালি শ্রেণীস্বার্থে উপনিবেশবাদী শক্তির পোষকতা করেছিল। বাস্তবজীবনের সঙ্গে বাসনার, করতে চাওয়ার সঙ্গে করতে পারার, সত্যের সঙ্গে আদর্শের ক্রমবর্ধমান সংঘাত

শিক্ষিত মানসে শেষপর্যন্ত একধরণের স্ব-বিরোধের জন্ম দিয়েছে। তাই রাবণের প্রদীপ্ত পৌরুষ নির্বাপিত হয় অবিরল অশ্রুধারায়, সাম্রাজ্যবাদী শাসকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রকেও পিছিয়ে আসতে হয় বলে আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের সঙ্গে তৃতীয় সংস্করণের পার্থক্য রচিত হয়; সরকারি উকিল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'কবিতাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে 'ভারতসঙ্গীত' কবিতাটি বাদ দিতে হয় আর সাতশ টাকা মাইনের চাকরি বজায় রাখতে গিয়ে নবীনচন্দ্র বর্জন করেন 'পলাশীর যুদ্ধের' আপত্তিকর পঙ্‌ক্তি। উপনিবেশের শৃঙ্খলিত জীবনে গ্লানিবোধ সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ ছিল অসম্ভব — এই সময়ের এই সমাজের মননজীবীর এই আত্মসঙ্কটজাত দৈন্যই প্রকাশিত হয়েছিল হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্রের বীরবাহুকাব্য কিংবা পলাশীর যুদ্ধে যবন-বিরোধিতার রূপকে, বাস্তব সমস্যার থেকে মুখ ফিরিয়ে অতীত ভারতবর্ষের পৌরাণিক ও কাল্পনিক ছদ্ম-ঐতিহাসিক কাহিনীতে আশ্রয় নেওয়ার মধ্যে। এভাবেই তাঁরা বিবেক-দংশন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন, বাস্তব ভারতবর্ষের চেয়ে কল্পনা ও ইচ্ছাপূরণের অতীত ভারতবর্ষের প্রতি মোহময় আকর্ষণ তখন প্রবলতর ও একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়াল। হেমচন্দ্রের বীরবাহু কাব্য, বৃত্রসংহার কাব্য; নবীনচন্দ্রের রঙ্গমতী, পলাশীর যুদ্ধ এবং রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস ত্রয়ী কাব্যকে এই দেশ কাল-মননের পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝে নিতে হবে।

মুসলমান সমাজ ও রবীন্দ্রনাথ ঃ সম্পর্কের খতিয়ান

ভুঁইয়া ইকবাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মুসলমান সমাজের মধ্যে সামাজিক ও সাহিত্যিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কারণে যে সম্পর্কে গড়ে ওঠে, তাঁর ইতিহাস পুনর্গঠন সীমিত পরিসরে প্রায় অসম্ভব। কবিজীবনের নানা পর্বে মুসলমান সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে কবির সম্পর্কের সূত্র সন্ধান বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য। এ ব্যাপারে কবির, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভাষণ, চিঠিপত্র এবং মুসলমান লেখকদের স্মৃতিচারণ ও প্রতিক্রিয়া সহায়ক উপাদান।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যবহৃত "মুসলিম উপাদান" খুব সীমিত হলেও ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত এমন কি উচ্চবিত্তের মুসলমান ব্যক্তিদের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগের খতিয়ান তৈরি আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রশান্ত কুমার পাল, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল ফজল, জসীম উদ্দীন, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুহাম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী, গৌরী আইউব, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও আবদুল

মান্নান সৈয়দের গবেষণা ও কাজ উল্লেখ্য।

আমার পূর্বসূরী আলোচকদের তথ্য ও বিশ্লেষণের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুসলমান সম্পর্কের এই জরিপ করেছি।

কলকাতার হিন্দি সাপ্তাহিক পত্রিকা - ''শ্রীসনাতনধর্ম''

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৪ খ্রিঃ কলকাতা থেকে ''শ্রীসনাতনধর্ম'' নামক হিন্দি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত গান্ধীবাদী লেখক, সমাজ সংস্কারক, স্বাধীনতা সংগ্রামী বৈজনাথ কেডিয়া। নাম থেকে পত্রিকাটিকে কঠোর হিন্দুত্ববাদী চরিত্রের মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি হিন্দু-মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা বলত। এটি ছিল অস্পৃশ্যতার বিরোধী সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী একটি ব্রিটিশবিরোধী পত্রিকা। পত্রিকাটি ভারতের স্বাধীনতা চাইত, কিন্তু মনে করত, স্বাধীনতা অর্জনের পথ হবে গান্ধী নির্দেশিত অহিংস পথ। পত্রিকাটি সন্ত্রাসবাদকে ধিক্কার জানিয়েছিল।

এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সনাতনধর্মের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা, যা সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত এক প্রকৃত মানবধর্ম।

''শ্রীসনাতনধর্ম''-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এর সংযত রচনাশৈলী, ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনায় পত্রিকাটি আবেগপূর্ণ ভাষার চাইতে যুক্তিপূর্ণ ভাষাকেই মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছে। যা একে ঐসময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত অন্যান্য উগ্র জাতীয়তাবাদী হিন্দি পত্রপত্রিকা যেমন 'ভারতমিত্র', 'কলকাত্তা সমাচার' বিশেষত 'স্বতন্ত্র' থেকে পৃথক করেছে। তা সত্ত্বেও গান্ধীর প্রশস্তিতে এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নিন্দায় পত্রিকাটি এর স্বভাবসিদ্ধ সংযম থেকে কখনো কখনো বিচ্যুত হয়েছে। তাসত্ত্বেও একথা বলতে হয় যে, কলকাতার হিন্দি সাংবাদিকতার ইতিহাসে পত্রিকাটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

চিত্তরঞ্জন ও বৈপ্লবিক আন্দোলন

মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বিপ্লববাদ ও বিপ্লবীদের সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রথম থেকে সক্রিয় সংযোগ ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অংশ্রগহণের আগেই চরমপন্থী ও বৈপ্লবিক ভাবধারা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব উল্লেখ্য। তাঁর সাহিত্য-পত্রিকা 'নারায়ণ'-এ বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্মের প্রতিফলন লক্ষ্যণীয়।[১] তিনি মানবিক ব্যক্তিসত্তা, জাতি, মানবতা এবং স্বাধীনতা ও স্বরাজ প্রাপ্তি এ সকলই ভগবৎ মহিমার প্রকাশ বলে মনে করতেন।[২] এক্ষেত্রে চরমপন্থী মতাদর্শের সঙ্গে তার সাদৃশ্য ছিল।

চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দ কলকাতা অনুশীলন সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন, যে বিপ্লবী সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯০২ সালে। চরমপন্থী নেতা তিলক ও অরবিন্দ চিত্তরঞ্জনের উপর প্রভাব বিস্তার করেন, বিশেষত অরবিন্দের সান্নিধ্য তাঁর জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর আগে ছাত্রাবস্থায় বিলাতে থাকাকালীন দুজনে দাদাভাই নৌরজীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দুজনেই বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং জাতীয় বিপ্লবকে সংগঠিত করাই ছিল অনুশীলন সমিতির লক্ষ্য। চিত্তরঞ্জন ঐ সমিতিকে আর্থিক সাহায্য দান করতেন।[৩]

দ্বিতীয়ত, লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল দমন নীতি চরমপন্থার প্রসারে সহায়ক হয়েছিল। তখন চিত্তরঞ্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করেন। সেই সময় কংগ্রেসের মধ্যে দুটি ভাগ দেখা দেয়। নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদন নীতির বিরুদ্ধে চরমপন্থীরা সোচ্চার হলেন। এই দুটি দলের সংঘাতে চিত্তরঞ্জন চরমপন্থীদের সমর্থন করেন। তিনি মডারেটদের ভিক্ষামূলক পরমুখাপেক্ষী নীতির নিন্দা করে আত্মনির্ভরতার আদর্শ প্রচার করেন। তিনি ১৯০৬ সালে বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।[৪]

তৃতীয়ত, চিত্তরঞ্জন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই আন্দোলনের গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, যেমন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নেতৃত্বে স্বদেশী শিক্ষার প্রসারের জন্য যাদবপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা যাতে ঐ পরিষদের কর্মকর্তা চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগে অরবিন্দ সুদূর বরোদা থেকে এসে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন এবং কলকাতার সুবোধ মল্লিক ও ময়মনসিংহের সূর্যকান্ত রায়চৌধুরী বিপুল অর্থদান করেন, জাতীয় বিমার জন্য হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানির প্রতিষ্ঠা, স্বদেশী শিল্পের উন্নয়নের জন্য বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক স্থাপনা যার পরিচালক

মণ্ডলীর একজন ছিলেন চিত্তরঞ্জন এবং বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলকে আর্থিক সঙ্কট থেকে উদ্ধার। উক্ত মিলটি যখন অবাঙালি কিনে নিতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন চিত্তরঞ্জন ও উকিল সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের প্রচেষ্টায় ফরিদপুরের সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য ও ময়মনসিংহের ধনী ব্যবসায়ী রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী তিরিশ লক্ষ টাকায় রুগ্ন মিলটি ক্রয় করে বাংলার একটি বিশিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করেছিলেন ও সেই সঙ্গে আরো অনেক শিল্পসংস্থা গঠন করেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের পরামর্শে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পি. মিত্র, অরবিন্দ, বিপিন পাল, সুবোধ মল্লিক ঢাকা ও ময়মনসিংহে গিয়ে জাতীয় শিল্প ও স্বদেশী প্রচার করেন। তা ছাড়া বার্ণ কোম্পানির ধর্মঘটকে ন্যায় সঙ্গত মনে করে তিনি ধর্মঘটকারীদের সাহায্য করেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া রেলের কর্মচারীদের ধর্মঘটের সময় তাদেরও তিনি অর্থসাহায্য করেন এবং সুরেন্দ্রনাথ হালদারকে পাঠিয়ে বিরোধের মীমাংসা করান।[৫]

চতুর্থত, স্বদেশী যুগে দুটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা অরবিন্দ সম্পাদিত 'বন্দে মাতরম' ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা'-য় চিত্তরঞ্জন ও তাঁর বন্ধু রজতনাথ রায় অকাতরে অর্থদান করতেন, যা ছিল ঐ দুটি পত্রিকার জীয়নকাঠি। ঐ প্রসঙ্গে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী লিখেছিলেন, 'সন্ধ্যা ও বন্দে মাতরমে কাটা কাটা বোল বেরুত আর টাকা টাকা করে প্রাণ যেত চিত্ত ও রজতের।'[৬]

পঞ্চমত, আইনজীবী রূপে চিত্তরঞ্জন বহু স্বদেশী মামলা গ্রহণ করে বিপ্লবীদের পক্ষে সওয়াল করেন। বন্দে মাতরম মামলা, সন্ধ্যা মোকদ্দমা, আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা, ঢাকা ও মাদারিপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা, কুতুবদিয়া মামলা প্রভৃতিতে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন অসাধারণ সাহস, আইনজ্ঞান ও যুক্তি-তর্কের কৌশলে বিপ্লবীদের পক্ষে লড়াই করে অরবিন্দ সমেত অনেককে নির্দোষ প্রমাণিত করতে সক্ষম হন[৭] এবং এ সকলই তাঁর বিপ্লববাদকে আন্তরিক স্বীকৃতির পরিচয় বহন করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতে হোমরুল আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছিল যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিলক, অ্যানি বেসান্ত ও চিত্তরঞ্জন। ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বায়ত্তশাসনের পথে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় তিলক ও অ্যানি বেশান্ত হোমরুল লীগ গঠন করে স্বায়ত্ত শাসন দাবি করেন। সরকার অ্যানি বেসান্তকে অন্তরীণে আবদ্ধ করলে চিত্তরঞ্জন প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন। তাঁর মতে এ হল মানবতার দেবতাকে আবার ক্রুশ বিদ্ধ করা। তিনি এক প্রতিবাদ সভায় বলেছিলেন, 'অ্যানি বেসান্তের অপরাধ কি ? তিনিও তো স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেছেন। যে দাবি ভারতবাসীর দাবি - ভারতের প্রতিটি মানুষের দাবি।'[৮] সেই সময় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্তরীণের বিরুদ্ধেও চিত্তরঞ্জন প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। এইভাবে চিত্তরঞ্জন রাজদ্রোহে অভিযুক্ত বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিকদের রক্ষাকল্পে সর্বদাই অগ্রবর্তী ছিলেন।

হোমরুলের পর এল অসহযোগ আন্দোলন, যার পুরোভাগে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন। অসহযোগ প্রথম সর্বভারতীয় গণআন্দোলন। এ আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী বা সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ অভিনব অহিংস আঙ্গিকে এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলনেরও একটি বৈপ্লবিক রূপ ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উচ্ছেদকল্পে জাগ্রত গণচেতনার ভিত্তিতে এই আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটেছিল। অসহযোগের উপস্থাপনায় ও রূপদানে চিত্তরঞ্জনের ঐতিহাসিক ভূমিকা আজ স্বীকৃত। গান্ধীর পরিকল্পনাকে তাঁর নৈতিবাচক ও সীমাবদ্ধ মনে হয়েছিল। নাগপুর কংগ্রেসে (১৯২০) তার পরিসরকে বর্ধিত করে গণআইন অমান্য আন্দোলনকে লক্ষ্যবস্তু করে তিনি অসহযোগের কর্মসূচিকে আরো গণভিত্তিক করে তুললেন।[৯] মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে কৃষক, শ্রমিক, সর্বস্তরের মানুষকে একত্রিত করে দেশবন্ধু ১৯২১ সালে বাংলায় যে ব্যাপক গণআন্দোলন এনেছিলেন তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কেঁপে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর দুই সুযোগ্য সহকর্মী, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুর জেলায় মাহিষ্য কৃষকদের চৌকিদারী খাজনা বন্ধের আন্দোলন ও চাঁদপুরে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে শ্রমিক ধর্মঘট স্মরণীয় হয়ে আছে।[১০]

বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন সংঘটিত করায় বিপ্লবী যুগান্তর দল চিত্তরঞ্জনকে সহায়তা করেছিল।[১১] ১৯১৯ সালে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর যুগান্তর দলের সদস্যেরা গান্ধীর নেতৃত্বে সাংবিধানিক সংগঠন থেকে গণসংগঠনে কংগ্রেসের রূপান্তর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেন। চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের স্বপক্ষে বিপ্লবীদের সক্রিয় সমর্থন লাভের জন্য তাদের ও গান্ধীর মধ্যে এক বৈঠক আহ্বান করেন যেখানে অসহযোগ-বিরোধী অনুশীলনের সদস্যরাও ছিলেন। সেখানে তিনি ও গান্ধী অসহযোগের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিপ্লবীদের আশ্বস্ত করলেন।[১২] ফলে অহিংসাতে বিশ্বাস না থাকলেও তাঁরা গান্ধী প্রদত্ত এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভের প্রতিশ্রুতিতে এক বছর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে সম্মত হন নতুন গণ-আন্দোলনের সমর্থনে। কলকাতা কংগ্রেসে (সেপ্টেম্বর ১৯২০) যুগান্তর দল গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিল। নাগপুর কংগ্রেসে (ডিসেম্বর, ১৯২০) চিত্তরঞ্জনের সংশোধিত অসহযোগ কর্মসূচির পক্ষে যুগান্তরের অনেকেই ছিলেন। বিপ্লবীদের তখনকার অবিন্যস্ত অবস্থা ও বলিষ্ঠ কর্মসূচির অভাব, গণ সংযোগের সুযোগ লাভ এবং সেই সঙ্গে দেশবন্ধুর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তাদের এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানে প্রণোদিত করেছিল। অন্যদিকে দেশবন্ধু বিপ্লবী যুবকদের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের শক্তিকে চিরকাল শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তিনি তাদের হিংসার পথ পরিহার করতে ও তাদের ধ্বংসাত্মক শক্তিকে বিনাশ করে তাকে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করতে প্রয়াসী হন।

চৌরিচৌরার হত্যাকান্ডের ফলে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে জাতীয় আন্দোলনে ভাঁটা পড়ল। তখন যুগান্তরের সদস্যেরা দেশবন্ধুর কাউন্সিল অভিযানের

পরিকল্পনাকে সমর্থন জানান। তাঁরা বুঝেছিলেন সাম্রাজ্যবিরোধী জাতীয় বিক্ষোভকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে ও বিদেশী শাসকের সঙ্গে লড়াইএ এই প্রতিরোধমূলক পদ্ধতি এক অস্ত্র।[১৩] গান্ধীপন্থীগণ নো-চেঞ্জার নামে পরিচিত হলেন, যাঁরা ছিলেন কাউন্সিল প্রবেশের বিপক্ষে এবং দাশপন্থী বা স্বরাজীরা ছিলেন এর পক্ষে। ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে যুগান্তর দল স্বরাজীদের সমর্থন করে। সুভাষচন্দ্র যুগান্তর দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, সেজন্য তিনি চিত্তরঞ্জন কর্তৃক যুগান্তর দলের সমর্থন লাভের জন্য নিযুক্ত হন। তার ফলে যুগান্তর দল দেশবন্ধুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি করায়ত্ত করতে সহায়তা করেছিল। বাংলার বিভিন্ন জেলায় কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষে জনমত গঠনেও তাঁরা দাশকে সহায়তা করেছিলেন। দিল্লী কংগ্রেসে (১৯২৩) স্বরাজীদের জয়ে যুগান্তর দলের সক্রিয় সহায়তা ছিল এবং অনুশীলন দলের একাংশ স্বরাজী কর্মসূচীকে সমর্থন করেছিল। সরকারী রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে যে দাশ বিপ্লবীদের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট প্যাক্ট করেছিলেন যার শর্ত ছিল যে স্বরাজ্য দল ততক্ষণ বিপ্লবীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে যতক্ষণ তারা হিংস্র কাজ থেকে বিরত থাকবে।[১৪] স্বরাজ্য দলের সংগঠনে যুগান্তর দলের সদস্যেরা বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন. যেমন সত্যেন মিত্র ও সুভাষ বোস - দাশের সেক্রেটারি, উপেন ব্যানার্জি ও মনমোহন ভট্টাচার্য স্বরাজ্য দলের পাবলিসিটি বোর্ডে এবং বসন্ত মজুমদার ও নগেন্দ্র গুহ রায় প্রোপাগান্ডা বোর্ডে ছিলেন। এছাড়া কিছু বিপ্লবী জেলা ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতেও ছিলেন। বি-পি-সি-সি তে ছিলেন ভূপতি মজুমদার, সত্যেন মিত্র, বিপিন গাঙ্গুলি, গোপেন রায়, অমরেন্দ্র চ্যাটার্জি, মনোরঞ্জন গুপ্ত।[১৫] ব্রিটিশ সরকারী মহল পর্যন্ত স্বীকার করেছিল, 'বিপ্লবীরা বাংলায় সবচেয়ে নিঃস্বার্থ ও দক্ষ কর্মী এবং মিঃ দাশের নির্বাচনী বিজয়ে তারা একটি বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।'[১৬] দাশ বিপ্লবী যুবকদের মধ্য থেকে বাছাই করা দলীয় কর্মী নিযুক্ত করেন যেমন ইটালিতে করেছিলেন মাৎসিনি। এই বিপ্লবী যুবকেরা বাংলার বিভিন্ন জেলায় দাশের স্বরাজ্য দলকে সংগঠিত করায় সহায়তা করেছিল, যেমন ময়মনসিংহে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ঢাকায় জীবন চ্যাটার্জি, হুগলিতে ভূপতি মজুমদর, যশোর ও খুলনায় ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, নোয়াখালিতে সত্যেন মিত্র, কুমিল্লাতে বসন্ত মজুমদার, বাঁকুড়াতে অনিল বরণ রায়, ২৪ পরগণায় অমরকৃষ্ণ ঘোষ। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র এক্ষেত্রে দাশকে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন।[১৭] গান্ধীপন্থীদের প্রবল বিরোধিতার বিরুদ্ধে নিজের হাত শক্ত করার জন্যও দাশ বিপ্লবীদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন।

১৯২৩ সালে ডিসেম্বরের নির্বাচনে স্বরাজ্য দল বাংলায় অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। বিধানসভায় প্রবেশের পর দাশের প্রথম কাজ হল সকল রাজবন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করা এবং এ বিষয়ে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।[১৮] ১৯২৪ সালে ২৮ জন প্রাক্তন বিপ্লবী স্বরাজ্য দলের প্রভাবাধীন বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটিতে বিভিন্ন

পদ অধিকার করেছিলেন।[১৯] কিছু বিপ্লবী স্বরাজ্য দল অধিকৃত পুরসভায় চাকরি পান এবং এক সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী ৮৮ জন বিপ্লবী পৌর-বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন। সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মেলনে মি: ডের হত্যাকারী গোপীনাথ শাহার দেশাত্মবোধের প্রশংসাসূচক যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল তা পাশ হয়ে যায়, যার পিছনে যুগান্তর দলের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ঐ সম্মেলনে দাশের কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাব পাশ ও বেঙ্গল হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট পুনঃসমর্থিত হওয়ার পিছনেও যুগান্তর দলের সমর্থন ছিল একটি বিশিষ্ট কারণ। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে যুগান্তর দলের কর্মীরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।[২০]

স্বরাজ্য দল ও যুগান্তর দলের মৈত্রী ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্রিটিশ সরকারের ভীতি সঞ্চার করেছিল। শাসককুল দুই দলের যোগসাজসে সরকারের বিরুদ্ধে বাংলায় বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিল।[২১] সরকারি মহলের অভিমত ছিল যে বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমগুলি বৈপ্লবিক কর্মের কেন্দ্রস্থল এবং বিপ্লবীরা স্বরাজ্য দলের তহবিল থেকে অর্থলাভ করত। যুগান্তর দলের নেতৃবৃন্দ এই মত সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। অরুণচন্দ্র গুহ ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত লিখেছেন দেশবন্ধুকে তাঁরা কথা দিয়েছিলেন যে তাঁরা কোন সন্ত্রাসমূলক কাজ করবেন না এবং দেশবন্ধুর জীবিতকালে তাঁরা এই কথা রেখেছিলেন। শাঁখারিতলা, কোনা ও গরপার রোডের হত্যাকান্ড, মীর্জাপুর স্ট্রীটের বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতির সঙ্গে যুগান্তর দলের কোন সংস্রব ছিল না। এগুলি সরকারি দালালদের দ্বারা প্ররোচিত কিছু বিক্ষুব্ধ যুবকের হতাশার বিক্ষিপ্ত ফলশ্রুতি। আশ্রমগুলি কোন গুপ্ত হিংস্র কাজে লিপ্ত হয় নি। স্বরাজ্য দলের থেকে তাঁরা কোন অর্থ লাভ করেননি।[২২] কিন্তু সরকার এই সব যুক্তিতে কর্ণপাত না করে ১৯২৪ সালে অক্টোবর মাসে বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারি করেছিল। সরকারের মৌখিক ঘোষণা ছিল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদকে ধ্বংস করাই তার লক্ষ্য। কিন্তু তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল স্বরাজ্য দলের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যকে বিনষ্ট করা এবং বিপ্লবী দলের সঙ্গে তার মৈত্রীকে খর্ব করা। আইনসভায় স্বরাজ্য দল ব্রিটিশ সরকারকে প্রতিরোধমূলক পদ্ধতিতে যেভাবে বারবার পর্যুদস্ত করেছিল তা ছিল সরকারের আক্রোশের একটি প্রধান কারণ। এই পদ্ধতির বৈপ্লবিক সম্ভাবনা ব্রিটিশদের ভয়ের কারণ ছিল। এক সমকালীন বিপ্লবীর মতে, সরকারের আসল উদ্দেশ্য ছিল যুগান্তর কর্মীদের স্বরাজ্য দলের শক্তিবৃদ্ধি থেকে বিরত রাখা, বিপ্লবী ষড়যন্ত্র দমন একটি অজুহাত মাত্র।[২৩] জাতীয় মহল মনে করেছিল সিমলার শৈলশিখব থেকে এই সহসা বজ্রপাতের কারণ স্বরাজ্য দলের নির্ভরযোগ্য অবলম্বনগুলিকে সরিয়ে দিয়ে দলকে পঙ্গু করে দেওয়া। কার্যত কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের অফিসগুলিতে পুলিশ হানা দিয়ে দলের মূল কর্মীদের কারারুদ্ধ করেছিল, যেমন সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধুর 'ডান হাত' ও পুরসভার প্রধান অফিসার, সত্যেন মিত্র, বঙ্গীয় স্বরাজ্য দলের কর্মসচিব, অনিলবরণ রায়, বিপিসিসির কর্মসচিব ও এম. এল. সি. এবং সেইসঙ্গে ফরোয়ার্ড পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও ম্যানেজার প্রভৃতি।

দেশবন্ধু তৎক্ষণাৎ এই অর্ডিনান্সকে 'Lawless law' বলে ধিক্কৃত করে বললেন, কোন প্রমাণ ছাড়াই অনির্দিষ্ট কালের জন্য জেলে আটকে রাখা ও দেশের আইন অনুযায়ী বিচারের ব্যবস্থা না করা প্রধান মানবাধিকারের অস্বীকৃতি,[২৪] যে জাতীয় আইন ইংল্যান্ডে স্টুয়ার্ট স্বৈরতন্ত্রের সময় জারি হত। বঙ্গীয় আইনসভা ও অন্যান্য মঞ্চ থেকে তিনি বারবার বলেছেন যে হিংসার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন তিনি কখনো বিপ্লবীদের প্ররোচিত করেন নি, বরং তাদের সংযত রেখেছেন। গত কয়েক বছরে তিনি অনেক বিপ্লবী যুবকের সংস্পর্শে এসে তাদের বুঝিয়েছেন যে হিংসার পথ স্বরাজের পথ নয় এবং তাদের অনেকে তাঁর যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তারা আর হিংসামূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করবে না। কিন্তু তিনি ত্রাসের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে কিছু দিনের মধ্যেই পুলিশ তাদের ধরপাকড় করে কারারুদ্ধ করল। দেশবন্ধুর মতে স্বরাজ্য দলের সাংবিধানিক আন্দোলন বৈপ্লবিক হিংসাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং স্বরাজ্য দলের বলিষ্ঠ কর্মসূচি না থাকলে বিপ্লবীরা অনেক আগেই তাদের হিংসাত্মক কাজ শুরু করত।[২৫] সরকারের সন্ত্রাসকে তীব্র নিন্দা করে তিনি আরো বলেছিলেন যে দমননীতির দ্বারা বৈপ্লবিক আন্দোলনকে কখনো ব্যাহত করা যাবে না অথবা স্বাধীনতাকামীদের বাসনাকে খর্ব করা যাবে না।

বেঙ্গল অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিল এটি অসাংবিধানিক ও নাগরিক স্বাধীনতার প্রতি বিপজ্জনক এই অভিযোগে।[২৬] মতিলাল নেহরু প্রকাশ্য বিবৃতিতে বললেন বাংলায় যে ৭২ জনকে বন্দী করা হয়েছে তার মধ্যে ৬০ জন হলেন স্বরাজী। এদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী চক্রান্তের কোন প্রমাণ দাখিল করা হয়নি। গান্ধী কলকাতায় এসে সব দেখেশুনে স্থিরনিশ্চিত হলেন যে 'বড়লাটের বোমা'র লক্ষ্য স্বরাজ্য দল।

১৯২৫ সালে ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি রূপে চিত্তরঞ্জন তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ দেন।[২৭] বাংলার বিপ্লবী দলের উত্থানের জন্য তিনি সরকারের দমননীতিকেই দায়ী করেন। অতীতের পুনরাবৃত্তি করে তিনি বলেন হিংসা ইউরোপের মত ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির অঙ্গ নয় এবং হিংসাত্মক বিদ্রোহের দ্বারা জাতীয় মুক্তিলাভ হতে পারে না। বিপ্লবী যুবকদের প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন তাদের উদ্দেশ্যের সততা ও দেশভক্তির উদ্দীপনার বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চারণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তিনি তাদের হিংসার পথ পরিত্যাগ করতে বলেন। তিনি সরকারকে দমননীতি পরিহার, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান ও স্বরাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার শর্তে সম্মানজনক সহযোগিতার আহ্বান জানান এবং সরকারের তরফ থেকে সাড়া না পেলে গণ-আইনঅমান্য আন্দোলনকে পরাধীন জাতির শেষ অস্ত্ররূপে উল্লেখ করেন। অবশ্য তরুণ বিপ্লবীরা তাঁর ডোমিনিয়ান স্টেটাসকে সমর্থনের বিরোধিতা করেছিল।

বৈপ্লবিক আদর্শে শ্রদ্ধাশীল হলেও বিপ্লবী পদ্ধতিতে চিত্তরঞ্জনের ছিল প্রবল অনীহা। এ বিষয়ে তাঁর কোন দ্বৈত সত্তা ছিল না। বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর স্বচ্ছ মনোভাব তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে খুলে ধরেছিলেন — 'এদের অনেককে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে ভয়ানক মারাত্মক।...খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি শরৎবাবু।' শরৎচন্দ্র লিখেছেন এদের ভালবাসা না দেওয়া ও প্রশ্রয় দেওয়া দুইই 'তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল'। সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপকে তিনি জাতির পক্ষে চরম ক্ষতিকর মনে করতেন। অথচ তিনিও বিপ্লব চেয়েছিলেন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে মৌলিক ও সম্পূর্ণ পরিবর্তনের অভিলাষী ছিলেন। মার্ক্সীয় শ্রেণী-সংগ্রামে নয়, ভারতীয় সমন্বয়ের আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের মতে বিপ্লবীর প্রধান বৈশিষ্ট্য আত্মত্যাগের শক্তি। চিত্তরঞ্জন দেশের মুক্তি ও জাতির কল্যাণের জন্য তাঁর সর্বস্ব, এমন কি 'মৃত্যুহীন প্রাণ'কেও দান করে গেছেন।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। সুনীল দাশ, নারায়ণ ও চিত্তরঞ্জন, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, প্রবাল সেনগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ - একটি বিশ্লেষণ, ইতিহাস অনুসন্ধান - ১০

২। দেশবন্ধুর গয়া ভাষণ ১৯২২।

৩। পুলিন দাশ, আত্মচরিত, কলকাতা ১৯৬৫।

৪। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, দেশবন্ধু-স্মৃতি, কলকাতা ১৯৬৬, পৃ: ১৪৩-৪৬।

৫। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৫; যুগান্তর, ৫ নভেম্বর ১৯৭০।

৬। উদ্ধৃত, মণি বাগচি, দেশবন্ধু, কলকাতা ১৯৬৯, পৃ: ১৫৩।

৭। দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭২-১২১।

৮। মণি বাগচি, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৭।

৯। মঞ্জুগোপাল মুখার্জি, নাগপুর কম্প্রোমাইস (১৯২০), ক্যালকাটা হিসটরিকাল জার্নাল, ১৯৮৫ এবং গান্ধী, দেশবন্ধু ও অসহযোগ, ইতিহাস অনুসন্ধান - ৪।

১০। অমৃতবাজার পত্রিকা, ২১, ২২, অক্টোবর ১৯২১; হোম পলিটিক্যাল, ফোর্টনাইটলি রিপোর্ট, বেঙ্গল, সেপ্টেম্বর, ফাইল ২৫/১৯২৩; রিপোর্ট অফ নেটিভ নিউজপেপার্স, ১৯২১-২২; এ্যানড্রুজ পত্রাবলী, শান্তিনিকেতন।

১১। হোম পলিটিক্যাল, ফাইল ৬১/মার্চ ১৯২৪; সুভাষচন্দ্র বোস, ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল, কলকাতা ১৯৪৮, পৃ: ৯০।

১২। হোম পল., পূর্বোক্ত।

১৩। নিবন্ধকারকে অরুণ গুহের চিঠি, ২২-২-১৯৭৫ ও ভূপেন্দ্র দত্তের চিঠি, ২১-৪-১৯৭৫।

১৪। হোম পল., পূর্বোক্ত।

১৫। পূর্বোক্ত।

১৬। হোম পল., ফাইল ৩৭৯/১৯২৪, পার্ট ২।

১৭। মঞ্জুগোপাল মুখার্জি, অপ্রকাশিত থিসিস, সি. আর. দাশ অ্যান্ড স্বরাজ পার্টি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪।

১৮। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রোসিডিংস, জানুয়ারি ১৯২৪, খণ্ড ১৪।

১৯। হোম পল., কলসালটেসন, ফাইল ৪৫/১/১৯৩৩।

২০। অরুণ চন্দ্র গুহ, অরবিন্দ এ্যান্ড যুগান্তর, ১৯৭৫, পৃ: ৫৬।

২১। বি-এল-সি-পি, খণ্ড ১৪, নং ১, পৃ: ১০০-১০৮; রিডিংকে অলিভিয়ার, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, রিডিং পত্রাবলী, খণ্ড ৭।

২২। অরুণ চন্দ্র গুহ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৩, ৫৪, ৬৭; ভূপেন্দ্র দত্তের চিঠি, পূর্বোক্ত; অরুণ গুহের চিঠি, ৭-৭-১৯৭৬।

২৩। ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, বিপ্লবের পদচিহ্ন, ১৯৫৩, পৃ: ৩৬৪।

২৪। মাইনিউট অফ দ্য প্রোসিডিংস অফ দ্য ক্যালকাটা কর্পোরেশান, ১৯২৪, ১৯২৫।

২৫। ফরোয়ার্ড, ৩ অগাস্ট, ১৯২৪; বি.-এল.-সি.পি., খণ্ড ১৪, নং ১, পৃ: ১১০।

২৬। রিপোর্ট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ বেঙ্গল, ১৯২৩-২৪।

২৭। দাশগুপ্ত, দেশবন্ধুস্মৃতি, পৃ: ৩০১-৩০৯।

২৮। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্মৃতিকথা, মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৩২।

বাংলার রাজনীতি ও শরৎচন্দ্র বসু (১৯৩১-১৯৩৯)

প্রগতি চট্টোপাধ্যায়

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ হিসাবেই সাধারণের মধ্যে শরৎচন্দ্র বসুর খ্যাতি-র বাইরে তার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অবস্থান আমরা প্রায় মনেই আনি না। ইদানীং অবশ্য তাঁকে তাঁর যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কিছু প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর জন্ম শতবর্ষে প্রকাশিত "Sarat Chandra Bose Commemoration Volume" কিংবা তারও আগে "The voice of Sarat Chandra Bose (Selected speeches 1927-1941)" নামে প্রকাশিত তাঁর ভাষণ সংগ্রহ--এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। সাম্প্রতিককালে বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবনী নিয়ে লেখা Leonard A. Gordon-এর "Brothers Against the Raj (A Biography of Sarat and Subhas Chandra Bose)"[১] - গ্রন্থটির নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্র বসুর শেষ জীবনে প্রকাশিত 'নেশন' পত্রিকার অংশবিশেষ গত বছরে প্রকাশিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে শরৎচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক কর্ম-কান্ডের প্রতি আর একবার এই সুযোগে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে - ভেবেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা থেকে ১৯৩৭ সালে কলকাতা পুরসভা (সংশোধনী) বিল আইনে রূপান্তরিত হওয়া পর্যন্ত শরৎ চন্দ্র বসুর রাজনৈতিক ভূমিকা বিশ্লেষণ আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও আলোচনাকে সম্পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা গঠনের পূর্ব মুহূর্তে তিনি গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত কাহিনীকে টানা হয়েছে।

জানকীনাথ বসুর পরে পরিবারে শরৎচন্দ্র বসুর গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সুভাষচন্দ্র বসুকে বিলেত পাঠানোর যে সিদ্ধান্ত জানকীনাথ বসু গ্রহণ করেছিলেন শরৎ চন্দ্র বসু তা কেবলমাত্র সমর্থন করেননি, তা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় ভারেরও কিছুটা বহন করেন। লিওনার্ড গর্ডনের ভাষায়, "Sarat was after all, the main man in his generation of the Bose family especially for Subhas" তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, "Subhas's work and career were to some extent depened on the continued support, financial as well as emotional."

রাজনীতিতে যোগ দেবার ও বাংলার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার অনেক আগে থেকেই শরৎচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুভাষচন্দ্রের মত গঠনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সিভিল সার্ভিস ত্যাগের দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এ বিষয়ে ১৯২১

সালের ৬ই এপ্রিল মাসে তিনি লেখেন যে, পিতামাতার সাথে জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাছেও সমান করে অঙ্গীকারবদ্ধ। ১৯২১ সালের প্রাক্কালে চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে তাঁর পত্রালাপের বিষয়টি জানিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তিন লেখেন, "My decision is final and unchangeable, but my destiny is at present in your hands." ।[২] সিভিল সার্ভিসে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তকে শরৎচন্দ্র পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করেছিলেন।

১৯২৫ সালের প্রথম ভাগে মান্দালয় জেল থেকে লিখিত পত্রালাপ-এর মাধ্যমে বোঝা যায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিসাবে শরৎচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুভাষচন্দ্রের সুস্বাস্থ্য রক্ষণার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিলেন। সুদূর মান্দালয়ের বন্দীজীবন থেকে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি জনিত প্রস্তাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হোত তাই ১৯১৫ সালের ৫-ই ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্রকে তিনি জানান— "I am however sending your suggestions regarding the election campaign to Kiran Sankar and have no doubt they will prove useful."[৩]

১৯২০ এর জুন মাসে লিখিত পত্রালাপের মাধ্যমে কোকোনাদ কংগ্রেস কেবল প্যাক্টের উত্থাপন ও তার ফলাফল এবং সিরাজগঞ্জ কংগ্রেসে বেঙ্গল প্যাক্টের গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাথে সাথে স্বরাজ্য দলের কর্মীদের কর্তব্য (নিজেকেও স্বরাজ্য দলের কর্মী হিসাবে মনে করে) হিসেবে বলেন, "I do maintain that Bengal should not sit down with folded hands and look up to the A.I.C.C. for a solution. Our solution should be an all Indian basis but Bengal must solve her own problems."[৪]

১৯২০ সালে বহু বিতর্কিত বেঙ্গল প্যাক্ট ব্লাংলার সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দু রাজনীতিবিদদের প্যাক্টের বিরোধিতা ও নীতিগতভাবে ঐ প্যাক্টের ভিত্তিতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটা জাতীয় প্যাক্ট গ্রহণের প্রস্তাবে গান্ধীবাদী কংগ্রেসের আপত্তি — এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্র বসুর রাজনীতিতে আগমন ও উত্থাপন হয়েছিল। উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ছিল মুখ্য ভূমিকায় তবে তা তখন ছিল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ন। এই সময়ের ১৯২৫-এর অধ্যাপক গ্যালাঘারের "Congress in Decline" শীর্ষক প্রবন্ধে এই সময়ের একটি রূপরেখা ফুটে উঠেছে। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু বাংলার কংগ্রেসকে যে হতাশাগ্রস্ত দিশেহারা পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছিল সেখানে বাংলার প্রাদেশিক নেতৃত্বের দেউলেপনা প্রকট হয়ে পড়েছিল। চিত্তরঞ্জন দাসের মতো ব্যক্তিত্বপূর্ণ নেতার অনুপস্থিতিতে কংগ্রেসে নানা সমস্যা মাথাচাড়া দেয়। এর মধ্যে অধিকাংশ সমস্যা ব্যক্তিগত ক্ষমতার লাভজনিত ও সুবিধাবাদ প্রসূত। চিত্তরঞ্জন দাশ তথা স্বরাজ্য পার্টির আদর্শ লুপ্ত হয়ে গেল। ২০ এর দশকে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পরে বাংলার কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ হোল এই নেতৃত্বের অভাব। এই সময় 'বিগ্-ফাইভ' গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে যার অন্যতম সক্রিয় সদস্য ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু।

এই সম্মিলিত নেতৃত্ব চিত্তরঞ্জন দাশের অভাব কতকাংশ পূর্ণ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র বসুর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও এই সময়ে বৃদ্ধি পায়। যেমন — প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী দৈনিক 'Forward' চালু হয় ১৯২৩ সালে। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু, বি.এন. শাসমল এবং পি.ভি. হিমতসিং গকা-র সাথে শরৎচন্দ্র বসু ও ডিরেক্টরদের বোর্ড এ ছিলেন। বন্দীজীবন (১৯২৪-২৭) সুভাষ ও শরৎচন্দ্র বসু-র পত্রমাধ্যমে যোগাযোগগুলি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, শরৎচন্দ্র বসু 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা চালানোর ব্যাপারে কত গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। শরৎচন্দ্র বসু দেশবন্ধু ফান্ডের (Desbandhu Village Reconstrcution Fund) উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন, কারণ 'ফরোয়ার্ড পত্রিকা চালানোর জন্য আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পরে দু বছর বাংলার আইন পরিষদে শরৎচন্দ্র বসু স্বরাজ্য দলের ভূমিকাকে শক্তিশালী করার জন্য সচেষ্ট হন। তাঁর মৃত্যুর পরে দু বছর ধরে শরৎচন্দ্র বসু কলকাতা কর্পোরেশনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন কমিটিতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। অর্থ বিভাগের সহ-সভাপতি, ভূমি এবং সাধারণের স্বার্থে গঠিত কমিটিতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের জন্য সিলেক্ট কমিটির সেক্রেটারি পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্র বসু বিশ্বাস করতেন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত উদ্ভুত রাজনৈতিক ধারার সংমিশ্রণ এক— এক প্রকৃত সমন্বয় ভিত্তিক রাজনীতি ও দৃষ্টির বা 'ফেডারেশন অফ কালচার' — এর ওপর আমাদের দেশের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে বলে বিশ্বাস করতেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে (বিশেষত ২০ ও ৩০ এর শেষে) গান্ধীবাদ কোনদিনই বিকল্প রাজনৈতিক ধারার অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছিলেন "Silent Persecution"[৫] 'সুভাষচন্দ্রকে লেখা শরৎচন্দ্র বসুর চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি, বাংলার রাজনীতিতে গান্ধীপন্থী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে একাধারে তিনটি পদে আসীন করে গান্ধীবাদী নেতৃত্ব কায়েম করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

২০ এর দশকের কংগ্রেসের চরিত্র বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক গ্যালাঘার বলেছেন, "The Bengal Congress was Hindu Nationalism"[৬] বাংলার তথা কলকাতার উচ্চবর্ণের হিন্দু কেন্দ্রীক কংগ্রেস কর্তৃক প্রাদেশিক কংগ্রেসগুলি অবহেলিত হয়েছিল। এই প্রবণতা পরবর্তীকালে কর্পোরেশনের কংগ্রেসের রাজনীতিকেও প্রভাবিত করেছিল। ১৯৩০-এর মার্চ মাসে ডান্ডি অভিযানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময়েও কলকাতা কেন্দ্রীক কংগ্রেসীরা কর্পোরেশনের রাজনীতি নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৩০-এর দশকে কংগ্রেসের যাত্রার শুরু থেকেই "devoid of mass support"[৭] ছিল।

আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করেও কংগ্রেস দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পুনা চুক্তি (১৯৩২ এর ২৫শে সেপ্টেম্বর) "Depressed Class" এর জন্য ব্যবস্থা এবং 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' (১৯৩৫) হিন্দু-মুসলমান-উভয় সম্প্রদায়কেই প্রভাবিত করেছিল

(নেতিবাচক দিক থেকে)। বাংলা ও পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ নিয়ম নীতি মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্থ করলেও কংগ্রেসের "Muslimwing" -এর পক্ষে তা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, কারণ কংগ্রেস সর্ব ধর্মের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে অক্ষম ছিল। অধ্যাপক গ্যালঘার যথার্থই বলেছিলেন- "This would also have extinguished the credibility of congress claims to represent Indians of all communities."[৮]

পন্ডিত মদনমোহন মালব্য ও অ্যানে বেসান্ত এই পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার চুক্তি কংগ্রেস ত্যাগ না করলে তারা কংগ্রেসকে ত্যাগ করবেন। ১৯০২ ও ১৯০৫ সালের ঘটনাসমূহ ভারতবর্ষ তথা বাংলার রাজনীতির সাম্প্রদায়িকী করণকে সুদৃঢ় ও সুনির্দিষ্টরূপ প্রদান করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে নেহেরুকে লিখিত ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের চিঠিতে বাংলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি হিসাবে শরৎচন্দ্র বসু সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের নিরপেক্ষ ভূমিকাকে বাংলায় পূর্ববর্তী প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবির কারণ হিসাবে দায়ী করেন। প্রত্যুত্তরে নেহেরু ২৬শে সেপ্টেম্বরের চিঠিতে লেখেন, স্বাধীনতা হোল মুখ্য বিষয়, বাংলার কংগ্রেসে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বদান অনুচিত। শরৎচন্দ্র বসু ১৯৩৬-এর ১৮ই নভেম্বরের চিঠিতে স্পষ্টত:ই জানান, 'Bengal will never subordinate the main issue to the issue raised by the communal decision."[৯]

১৯৩৯-এ জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে বলেন, কংগ্রেসের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত 'পূর্ণ - স্বরাজ' বাকী সবকিছুই "Secondary"[১০]

১৯২৭ এর ১৩ই ডিসেম্বর কাউন্সিলে শরৎ চন্দ্র বসুর সাথে নতুন মন্ত্রীদের বিতর্ক ও উত্তপ্ত আলোচনা হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষা, রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা নিয়ে মন্ত্রীদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন। শরৎচন্দ্র বসু এই সময়ে মন্ত্রীদের আইন - পরিষদের প্রশ্ননীতি (Question - Procedure) সম্বন্ধে মন্ত্রীদের অবগত করেন কারণ জে. এম. সেনগুপ্ত বলেছিলেন শরৎচন্দ্র বসুর এই ধরণের প্রশ্নবাণ পরিকল্পিত ভাবে মন্ত্রীদের অযোগ্য প্রমাণের একটা কৌশলমাত্র।[১১] গ্রেপ্তার সংক্রান্ত বিষয়ে সওয়াল করার সময়ে (১৯৩১) তিনি বলেন, আইনজীবী হিসেবে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরুর সাথে সাথেই তিনি BPCC থেকে পদত্যাগ (১৯৩০) করলেও "....It is only the truth to say that I have not ceased to be a Congress-man nor have I ceased to subscribe to the congress ideal, namely the achievement of Purna Swaraj by all peacefull and legitimate means."[১২]

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শরৎচন্দ্র বসু প্রথমবার গ্রেপ্তার ও নির্বাসিত হন। শরৎচন্দ্র বসুর ওপর প্রশাসনিক নথিপত্রে একটি "information sheet" থেকে যা জানা যায়, তা শরৎচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।

এই নথিপত্র থেকে জানা যায়,........."he has been a direct supporter of the terrorist compaign, which he has assisted with advice and money, both before and after the penetration of outrage. In particular, he was beleived to have investigated and financed."[১৩] শরৎচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক মঞ্চে পদার্পণ ঘটেছিল চিত্তরঞ্জন দাশের ছত্রছায়ায় এবং সুভাষচন্দ্র বসুর পেছনে পেছনে। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতো দেশত্যাগ করে এবং সশস্ত্র রাজনীতির চরম রূপ সামরিক অভিযানের অংশীদার না হয়ে দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আপাত নিয়মতান্ত্রিক এক রাজনীতির আড়ালে এক গণবিপ্লবী রাজনীতির সামিল হয়েছিলেন।

কলকাতা পুরসভায় শরৎ বসুর অবস্থান সম্পর্কে প্রশাসনিক মতামত জানা যায়। "Sarat Bose was also a leading member of the section which turned the Calcutta Corporation....into a source of revenue for the congress and revolutionary party, and it was through his influence that a large number of terrorists on release from imprisonment were given appointments as teachers in Calcutta schools."[১৪] শরৎচন্দ্র বসুকে ব্রিটিশ সরকার জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হিসাবে চিহ্নিত করেছিল যদিও তাঁকে বন্দীত্বের কারণ জানানো হয়নি। তাঁর বন্দীজীবন সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগদানকে কয়েক বছর পিছিয়ে দিয়েছিল। ১৯৩০-এর Press-Ordinance - এর দমনমূলক নীতির ফলস্বরূপ বন্দী জীবনে (১৯৩১-০৫) দেশের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সংবাদ থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। প্রশাসনকে লিখিত চিঠিতে শরৎচন্দ্র বসু তাঁর বৈপ্লবিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন।[১৫] ১৯৩০ এর দশকের বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কের নির্ধারণকারী হিসাবে 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' (১৭ই আগস্ট, ১৯৩২)-কে চিহ্নিত করা যায়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সাথে মতভেদের পরিপ্রেক্ষিতেই কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট পার্টির সৃষ্টি হোল। এই সময়ে শরৎচন্দ্র বসু কলকাতা থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভাতে কংগ্রেস ও ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস উভয়ের সমর্থনেই "unopposed" ভাবে নির্বাচিত হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন -এর ফলশ্রুতি প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন অনুসারে বাংলার নির্বাচনের পরে মন্ত্রীসভা গঠনে কংগ্রেসের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা অসম্মতি এবং বাংলার প্রাদেশিকতা কংগ্রেস নেতৃত্বের চিন্তাধারাকে উপেক্ষা করে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র বসুর আপত্তি প্রকাশ তাঁর দূরদৃষ্টি ও বাস্তবতার পরিচায়ক। ১৯৩৭-এর ২রা আগষ্ট আন্দামানে বন্দী মুক্তির স্বপক্ষে টাউন হলে এক বিরাট সমাবেশে দৃঢ়তার সাথে বলেন, পৃথিবীর কোন সভ্য দেশেই বিনা বিচারে বন্দী করা যায় না। তিনি এই জেল ফেরৎ বন্দীদের জন্য কর্পোরেশনে চাকুরির ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৭-৩৯ পর্যন্ত সময়ে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৯ সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সুভাষচন্দ্র বসুকে

পুনর্নির্বাচিত করার আদেশ দিলে প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নেতারা সুভাষচন্দ্র বসুকে মেনে নিতে অস্বীকার করে, ফলস্বরূপ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কার্যকলাপের সমালোচনা করে শরৎচন্দ্র বসু বলেন, "Central Executive was acting, Undemocratically and unconditionally." । ১৯৩৯-এ BPCC "Official Congress" ও "Ad hoc Congress"[১৬]- এ বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। শরৎচন্দ্র বাংলার "Official Congress" -এব নেতৃত্ব করেছিলেন। ১৯৪০ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভায় তিনি কংগ্রেসে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। ১৯৪০-এর শিক্ষাসংক্রান্ত বিল ছিল তাঁর মতে "Vague"[১৭]।

১৯৩৯ সালে কলিকাতা পুরসভা (সংশোধনী) আইনকে শরৎচন্দ্র বসু জাতীয়তাবাদ বিরোধী ও গণতন্ত্র - বিরোধী আখ্যা দেন। বিলের প্রস্তাবিত প্রকাশ করেন। বিল বিষয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে জাতীয় স্তরে যে বিরোধ তার পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র বসু মন্তব্য করেন... "There is much doubt that the legislative chapter of the Calcutta Municipal (Amendment) Bill will close with a verdict in favour of the Muslim leaguers. But the legislative is neither the people nor the country."

তবু তিনি আশা করতেন, "In this movement there will be Muslims as well as Hindus"[১৮] ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি বলেন, "I have tried my best to discover a basis in justice and reasoning for the provisions of the C.M.C. Bill and particularly for the appointment ot seats bid down in it, but I have failed to find any - It is a measure of the most barefaced communalism."[১৯] কলকাতা পুরসভা সংশোধনীবিলকে শরৎচন্দ্র বসু কলকাতার পুরসভার প্রশাসনিক কাঠামো সাম্প্রদায়িক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রণয়ন করার একটা চক্রান্ত বলে অভিযোগ করেছিলেন।

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত "Bengal Provincial Political Conference"-এ সভাপতির ভাষণে - ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইনে কথিত যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অবাস্তবতা সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। এই আইনে কৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাগগুলিকে তিনি কৃত্রিম বলে দাবি করেন। তাঁর মতে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ আংশিকভাবে গণতান্ত্রিক হলেও ভারতীয় রাজ্যগুলি ছিল সম্পূর্ণতই "Autocratic" । তাই সঙ্গত কারণেই তার মতামত হোল, "There can be no real federation of units apposed in political principles."[২০] তাঁর মতে, ভাষাগত, ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন — কোন ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তি ছিল না। তিনি আরও কঠোরভাবে বলেন "It is the old dyarchical system under a newguise."

শরৎচন্দ্র বসু হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক ঐক্যে গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। ২০-এর দশকে তিনি নাটোরে নও গাঁও এর দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করেন। সাম্প্রদায়িক বিষ

ছড়ানোর জন্য তিনি ব্রিটিশ প্রশাসনকে অভিযুক্ত করেন। ১৯৩৯ এর ফেব্রুয়ারি মাসে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত বাংলা প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "My greatest charge against this ministery is that they are encouraging communalism. They are trying to drive as under Bengali Hindus and Bengali Muslims, who may have inherited a common culture and are the children of a common soil."[২২]

অন্যত্র একই ভাষণে তিনি বলেন— "The ministry is introducing the communal principle where it is still non-operative."[২৩]

...এইভাবে তিনি ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার (মুসলিম লীগের সাথে গঠিত) সাম্প্রদায়িক মনোভাবের তিনি কড়া সমালোচনা করেন।

মুসলিম লীগের সাথে গঠিত কোয়ালিশনে মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে গেল ১৯৪১ সালে। সেই সময়ে শরৎচন্দ্রও কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। বাংলার আইনসভায় নতুন প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠিত হয় যার নেতা হিসাবে ফজলুল হক ৩রা ডিসেম্বর আইনসভার ঘোষণা করেন, "The coalition party of 1937 has obviously ceased to exist."[২৪] — শরৎচন্দ্র বসুর হিন্দু ও মুসলমানের নেতা হিসাবে নতুন মন্ত্রীসভায় গৃহমন্ত্রী হিসাবে অংশগ্রহণ করার আশা দেখা দেয়। ১৯৪১ সালে জাপান কর্তৃক গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকা আক্রমণের পটভূমিতে কলকাতা জাপানি "Consul"-এর সাথে আলোচনা ("Secret meetings") করেন।

এই কারণে তিনি ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে "a very definite and real danger"[২৫] হিসাবে বিবেচিত হন ও ১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু বন্দী অবস্থায় প্রথম সপ্তাহে (দ্বিতীয়বার) শরৎচন্দ্র বসুর সাথে হক এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক পরামর্শ অব্যাহত রাখেন। তাই ভীত ব্রিটিশ প্রশাসন শরৎচন্দ্র বসুকে কলকাতার বাইরে (দূরে) কোন স্থানে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪১ সালে বাংলার রাজনীতির এক সন্ধিক্ষণে শরৎচন্দ্র বসুর এই গ্রেপ্তারের কারণে প্রত্যক্ষ রাজনীতির থেকে দূরে সরে যাওয়ায় হিন্দু মুসলমান ঐক্য প্রচেষ্টা পুনরায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যদিও হিন্দু প্রশাসনিক নেতা হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর অংশগ্রহণ (মন্ত্রীসভায়) এই স্থান পূরণে অনেকাংশে সমর্থ হয়েছিল।

সূত্রনির্দেশ :—

১। Leonard A. Gordon, *Brothers Against the Raj (A Biography of Sarat and Subhas Chandra Bose)*, Viking, Penguin Books Ltd., 1990.

২। Netaji Collected Works, Edited by Sisir Kr. Bose. Vol. I, p. 222.

৩। Ibid., Vol. III,, p. 160

৪। Ibid, p. 314.

৫। 'দেশ', ১৮ ভাদ্র ১৯৩৫, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, ৫ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা।

৬। John Gallagher, "Congress in Decline', *Locality, Province and Nation : Essays on Indian Politics (1870-1940),* by Bordon Johnson, John Gallagher, Anil Seal, Viking, Penguine, 1990, 276.

৭। ibid.

৮। Ibid.

৯। Letters from AIOC Papers, File No. G 24(i), 1936.

১০। Presidential Address, Bengal Provincial Political Conference, 36th Session of the Conference at Jalpaiguri, 4 February, 1939, From, Sarat Chandra Bose Commemoration Volume'.

১১। Leonard A. Gordon, *Brothers Against the Raj (A Biography of Sarat and Subhas Chandra Bose)* Viking, Penguin Ltd., 1990, p, 157.

১২। Ibid., p. 259.

১৩। Ibid., p. 259

১৪। Sarat Bose, Letter to Asok Bose, Feb. 1932

১৫। Government of India. Home department, Political, File No. 31/101/32.

১৬। Leonard A, Gordon, *Brothers Against the Raj* (A Biography of Sarat and Subhas Chandra Bose), Viking, Penguin Books Ltd , 1990, p. 401.

১৭। Ibid., p. 414.

১৮। ১৯৩৯ ১ জুলাই প্রকাশিত কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত শরৎ বসুর প্রবন্ধ "Prepare for the utmost sufferings and sacrifices."

১৯। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাস গেজেট, ২০ মে, ১৯৩৯, (শরৎ বসুর চিঠির তারিখ - ১২ মে, ১৯৩৯)।

২০। Presidential Address, Bengal Provincial Political Conference, 36th session of the Conference at Jalpaiguri, February 1939, From "Sarat Chandra Bose Commemoration Volume', p. 357.

২১। Ibid. p. 357.

২২। Ibid. p. 361.

২৩। Ibid.

২৪। Mitra, IAR, II, 1941, p. 147-48 থেকে উদ্ধৃত হকের উক্তি।

২৫। Government of India, Home Department, Political, File No. 94/26/41.

লবণ সত্যাগ্রহে চব্বিশ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার

পুষ্পরঞ্জন সরকার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শহরের মধ্যবিত্তদের পাশাপাশি গ্রামের মানুষদেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ বা কোন দলীয় রাজনীতি নয়, গ্রামবাসীদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামী চেতনার পর্যালোচনা করাই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কলকাতার দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবারে লবণ সত্যাগ্রহ স্থানীয় কৃষকদের এরকমই একটি সংগ্রাম।

ডায়মণ্ড ক্রীক (Diamond Creek) থেকে ডায়মণ্ডহারবার নামকরণ। হুগলী নদীর সঙ্গে সংযোজিত কয়েকটি খাল রয়েছে এখানে। স্থানীয় ভাষায় ডায়মণ্ডহারবারের নাম ছিল হাজীপুর। ইউরোপীয় বণিকেরা মুড়িগঙ্গাকে বলত রোগস্ রিভার। তখন এখানে ছিল জলদস্যুদের ঘাঁটি। হ্যামিল্টন ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গেজেটিয়ারে লেখেন, "At Diamond Harbour the Company's ship usually unload their outword and receive the greater part of homeword bound cargoes."[১] রূপনারায়ণ-হুগলী point-এ (ডায়মণ্ডহারবারের পশ্চিমে) আট মাইল দীর্ঘ নদীখাত ধনুকের মতো বেঁকে গেছে। হুগলী নদীগর্ভে এসে সঞ্চারকারী The James Mari Sand (বালির চর) সাগরের মুখ পর্যন্ত দেখা যায়। নদীর তীরে ইংরেজরা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে কলকাতাকে রক্ষার জন্য দুর্গ নির্মাণ (old tower) করেন। এখানকার পুরানো কবরস্থান এখানে ইংরেজ বসতির সাক্ষ্য বহন করে। এখানকার খালগুলি আসলে গঙ্গার চলমান ধারার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত ছিল। বর্তমানে সেইগুলি খালে পরিণত হয়েছে। এরকমই একটি খাল Diamond Creek ছিল পর্তুগীজ দস্যুদের আস্তানা। হুগলী নদীর সঙ্গে সংযোগকারী বিশেষ খালগুলি হলো : (১) কাঁটাখাল (ফলতা থেকে ৩ মাইল দূরত্বে, (২) বলরামপুর (ফলতার আরো নিকটে), (৩) নীলাখাল, (৪) কুলপি ও ট্যাংরা খাল (কুলপি থানা)[২] ইত্যাদি। একসময় ডায়মণ্ডহারবার থেকে হুগলী নদীপথে অনেক চালবোঝাই ডোঙ্গা আসত কলকাতার চেতলায়।

মেদিনীপুরের সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবারের যোগাযোগ সুবিদিত। ডায়মণ্ডহারবার থেকে স্টীমার যোগে সহজেই গেঁওখালি, তমলুক যাওয়া যায়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে লবণ উৎপাদন ও লবণ ব্যবসায় কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্যে পরিণত করে। মেদিনীপুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে অনেক লবণ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে সমুদ্র উপকূলের লোনা জল

থেকে লবণ তৈরি হতো। কোম্পানি দেশীয় শ্রমিকদের দিয়ে লবণ উৎপাদন করাতো। অন্ধ্র থেকে লবণ তৈরিতে বিশেষ দক্ষ শ্রমিক 'মলুঙ্গী'দের মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণায় নিয়ে আসা হয়। তাছাড়া সাঁওতাল পরগণা থেকে পরিশ্রমী কষ্টসহিষ্ণু সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডাদেরও লবণ তৈরির কাজে লাগানো হয়। স্থানীয় অঞ্চলে এদের 'বুনো' বলা হতো।[৩] শেষে লবণশ্রমিক মাত্রেই মলুঙ্গী নামে পরিচিত হয়। স্বল্প বেতন, অসম্ভব খাটুনি, 'নিমক দারোগা'দের অত্যাচারে স্বভাবতই কোম্পানির সল্ট এজেন্সির বিরুদ্ধে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল।

একসময়ে এদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লবণ উৎপাদন বন্ধ হলেও লবণ শ্রমিকদের এক বড় অংশ এখানে থেকে যায়। ডায়মণ্ডহারবারে ও হুগলী নদীর উপকূল ধরে লবণ শ্রমিকরা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এঁরা কৃষি ও ধীবর বৃত্তি গ্রহণ করে। কোম্পানির কর্মচারী তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এদের স্বাভাবিক ক্ষোভ পরবর্তী বংশধরদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।

গান্ধীজির লবণ আন্দোলনের আহ্বান মেদিনীপুর জেলার ন্যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলকেও প্রভাবিত করেছিল। মহিষবাথান, কালিকাপুর, নীলা, ক্যানিং, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়।

ডায়মণ্ডহারবারের লবণ সত্যাগ্রহের পটভূমিকায় বলা যায়ঃ

(১) ডায়মণ্ডহারবার ও তার পার্শ্ববর্তী জয়নগর, মজিলপুর, নীলা, কুলপি, বারুইপুর, ফলতা প্রভৃতি অঞ্চলের যুব-সম্প্রদায় স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবী কার্যকলাপ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কলকাতা বা অন্যত্র ব্রিটিশ পুলিসের গ্রেপ্তার এড়াতে অনেক বিপ্লবী এতদ্অঞ্চলে আশ্রয় নিতেন। তাঁরা এই অঞ্চলগুলিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করেন।

(২) বারুইপুর-সোনারপুর অঞ্চলে নীলচাষ হতো। স্থানীয় কৃষকদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার ছিল সুবিদিত। কৃষকরা তাই বংশপরম্পরায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ছিল।

(৩) মলুঙ্গী সম্প্রদায়ের স্থানীয় উত্তরাধিকারী কৃষক ধীবর সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাভাবিক ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল।

(৪) এই অঞ্চলে খাল-বিলের নোনাজল থেকে লবণ তৈরিব প্রাকৃতিক পরিবেশ বিদ্যমান।

(৫) গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহের আহ্বানে এ অঞ্চলের মানুষেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন।

আন্দোলন ঃ

ডায়মণ্ডহারবার ও তার উত্তরে নীলা ছিল বিপ্লবী কেন্দ্র। এই অঞ্চলের বিজয় দত্তের নেতৃত্বে[৫] সত্যাগ্রহ শুরু হয়। স্থানীয় যুবকরা, স্ত্রী-পুরুষরা যথেষ্ট উদ্দীপনার সঙ্গে আন্দোলন শুরু করেন (৭ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রিঃ)। বিজয় দত্ত গ্রেপ্তার হন। নীলা গ্রামে পুলিশের গুলিতে বালক আশুতোষ দলুই নিহত হয়। লবণ সত্যাগ্রহে আশুতোষ দলুই হলো বাঙলার প্রথম শহীদ।

লবণ আন্দোলনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিশেষ ভূমিকা ছিল।[৫] লবণ আন্দোলনে ডায়মণ্ডহারবার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে এক ব্যাপক গণআন্দোলন সৃষ্টি হয়। প্রভাসচন্দ্র পুরকায়স্থ, ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, গঙ্গাধর হালদার, ললিত দেবশর্মা, সতীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি ছিলেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। নীলাব শিবতলা ছিল লবণ তৈরির মুখ্যস্থান। শত শত গ্রামবাসী, মহিলা ও ছাত্ররা নীলায় লবণ আইন ভঙ্গে যোগ দেন।[৬] সুভাষচন্দ্র বসু নীলায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিশেষ প্রশংসা করেন। শহীদ আশুতোষ দলুইয়ের স্মৃতিসভায় তিনি পূর্বনির্ধারিত কাজের জন্যে উপস্থিত থাকতে না পারলেও লিখিত ভাষণ পাঠান। নীলার লবণ সত্যাগ্রহের অন্যতম নেতা ছিলেন জয়নগর-মজিলপুরের ভূতনাথ ভট্টাচার্য। ইনি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সাথেও যুক্ত ছিলেন।[৭]

ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী চাঁদপালা গ্রামে লবণ সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। ফলতা খাল (তেঁতুলতলা খাল) বরাবর চাঁদপালা, কলসা, অনন্তরামপুর, মালা, পানারহাট, বরবাদী প্রভৃতি গ্রামের স্থানীয় গরিব মহিলা-পুরুষের জীবিকা ছিল লবণ তৈরি করে বিক্রয় করা। সরকারের লবণ আইনে তাদের উপার্জন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্যদের সঙ্গে তারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন।[৮]

সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে তিরিশের দশকেও ইংরেজ কোম্পানিগুলি ব্যাপকভাবে লবণ তৈরি করত। সরকারি নিয়মে লবণ তৈরির প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল সাগরদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ ও লোথানিয়ান দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে। সরকারের সল্ট রেঞ্জ ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার মি. পিট ১৯৩২ সালে এই অঞ্চলগুলি পরিদর্শনে আসেন।[৯]

গান্ধীজি লবণ আন্দোলন শুরু করলে ইংরেজ ও সরকারের লবণ তৈরির কেন্দ্রগুলিতে এক ব্যাপক নৈরাজ্য দেখা যায়।[১০] পক্ষান্তরে শ্রমিকরা নিজেদের কর্মচ্যুতির আশঙ্কা সত্ত্বেও গান্ধীজির লবণ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে উপকূলবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের লবণ তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামবাসীরা, তথাকথিত বর্বর বুনোদের পরবর্তী প্রজন্মের এক বড় অংশও যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হয় তার প্রামাণিক উপকরণের এক উদাহরণ দেওয়াই হলো এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। নিজেদের শত

দৈন্যদশা সত্ত্বেও শহরের মধ্যবিত্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তাঁরা নৈতিক ও সংগ্রামী সমর্থন জানিয়েছিল, এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। মনোরঞ্জন রায়, পরায়ত্ত পরগণা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮।

২। L.S.S. O'Mally, Bengal District Gazetteers-24 Parganas, Calcutta, 1914, P-296

৩। কৃষ্ণকালী মণ্ডল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ, কলিঃ নবচলন্তিকা ১৯৯৭, পৃঃ ১৩২।

৪। সুকুমার সিং, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, মাল্টিবুক, ১৯৯৬, পৃঃ ১২।

৫। কৃষ্ণকালী মণ্ডল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ, পৃঃ ১৫৪।

৬। ঐ, পৃঃ ১৫৪-১৫৫।

৭। ঐ, পৃঃ ১৫৬।

৮। চাঁদপালা গ্রামের অধিবাসী প্রত্যক্ষদর্শী শ্রী নিতাইলাল ঘোষ দ্বারা বিবৃত। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন বিবৃতকারের মেজ ঠাকুরদা (লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার)।

৯। S. C. Agarwal, The Salt Industry in India, Ministry of Production, New Delhi, 1956, P. 25.

১০। Ibid., P. 525।

এছাড়া সার্বিকভাবে -

১১। Balai Barui, The Salt Industry of Bengal, Calcutta, 1985, P. 9

১২। A. N. Serajuddin, The Condition of the Salt Manufacturers of Bengal under the Rule of "East India Company' (Journal of the Asiatic Society of Bangladesh), Vol. XVIII No. 1; Dacca, April 1973, P. 6

১৩। The Library, April 9-11, 1930, P. 6-10

১৪। ভূপেশচন্দ্র প্রামাণিক, লবণহ্রদের উপকথা।

অস্পৃশ্যতা ও মন্দির প্রবেশ আন্দোলন

শিবাজী কয়াল

ভারতবর্ষ কি প্রকৃত অর্থে সভ্য দেশ ? এ দেশের সকল মানুষ কি সম-অর্থে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে ? আদিবাসী সমাজে কি আর্থসামাজিক প্রভেদ সেরূপ অর্থে দেখা যায় যে রূপ অর্থে অআদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় ? আদিবাসীরা নিঃসন্দেহে দরিদ্র নারী ও পুরুষ এবং সকলেই বিভিন্ন ধরণের কাজ করে। নারী ও পুরুষদের মধ্যে অন্যান্য সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। সে ইতিহাসে আমরা প্রবেশ করছি না।

কিন্তু হিন্দু সমাজ হচ্ছে ভিন্ন প্রকৃতির। এই সমাজ নানা রকম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন যেমন সতীদাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। হিন্দু ধর্ম ও সমাজের আরো একটা ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অস্পৃশ্যতা এবং মন্দিরে বর্ণ ও ধর্ম বির্নিশেষে সকলের প্রবেশ নিষেধ। বিংশ শতাব্দীতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে একটা বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। অবশ্য এটা দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত আমরা অস্পৃশ্যতাকে হিন্দু সমাজ থেকে নির্মূল করতে পারিনি। আমাদের ঔপনিবেশিক বন্ধন, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা, ভ্রান্ত প্রচার এবং অর্থনৈতিক সমস্যা এই আন্দোলনের অগ্রগতি রোধ করেছে। কিন্তু গান্ধীর নেতৃত্বে হরিজন সেবকরা সকল বাধার সম্মুখীন হয়েও বীর বিক্রমে আন্দোলনকে শক্তি যোগাচ্ছে।

প্রাচীন যুগ

মনু বলেছেন যে পঞ্চমবর্ণ বলে কিছু ছিল না। প্রাচীন-যুগে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন ছিল। বশিষ্ঠ একজন চন্ডাল নারীকে বিবাহ করেছিলেন।

মন্দিরে সকল বর্ণের মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল। পীঠস্থানে এবং অর্চ্চনালয়ে অস্পৃশ্যতা বলে কিছু ছিল না।

কোন জলাশয় বা হ্রদ অপবিত্র হোত না। সকল বর্ণের মানুষ এই জল খেতে পারতো এবং স্নান করতে পারতো। মিতাক্ষরা আইনের স্রষ্টা তাঁর অন্যান্য আইন মেনে নিলেও তাঁর উপরিউক্ত মত সকল ক্ষেত্রে মেনে চলতো না।

সকল বর্ণের মানুষ সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারতো। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত মহাভারতের ভাষ্যকার গোবিন্দ রাজা লিখেছেন যে, "একজন শূদ্র ভক্ত একজন ব্রাহ্মণের সমগোত্রীয়।"

মধ্যযুগ

আমরা আরো জানতে পারি যে, শ্রীরামানুজ কেবল একজন ধর্মীয় সংস্কারক ছিলেন না, সমাজ সংস্কারকও বটে। নিম্ন সম্প্রদায়েব পেরিয়ানাম্বিকে গুরু রূপে মেনে

নিয়েছিলেন। তিনি মহিশূরের মেলকোট মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন রথ উৎসবের দিন।

কল্‌হনের রাজতরঙ্গিনী থেকে জানতে পারা যায় যে, বর্ণ প্রথা কোন ব্যক্তিকে কোন সামরিক বা অসামরিক পদ দখলে বাধাস্বরূপ ছিল না। এছাড়া কাশ্মীরের রাজা (৯২৩-৯৩৩ খ্রি) চক্রভর্মন হামসী নামক একজন ডোম নারীকে বিবাহ্ করে তাঁকে প্রধানা রানী রূপে ঘোষণা করেছিলেন।

শঙ্করাচার্য অস্পৃশ্যকে গুরু রূপে স্বীকার

একদা শঙ্করাচার্য বেনারসে গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছিলেন। তখন এক জন নারী তাঁকে বলেন সরে যেতে। ঋষি তাঁকে বললেন সকলের মধ্যেই শাশ্বত অনন্ত আত্মা বর্তমান। কেন তুমি এরূপ বলছো। নারী বললেন আপনি প্রচার করেন সকলেই আমরা দৈব (শিবহুম)। শঙ্করাচার্য তখন তাকে বললেন তোমার মতো উন্নত চরিত্রের ব্যক্তি আমার গুরু। তুমি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করো। কাজেই যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে হচ্ছে অস্পৃশ্য।

তামিলনাডে এবং অন্যত্র শৈব এবং বৈষ্ণবদের অস্পৃশ্য রূপে গণ্য

তামিলনাডে এবং অন্যত্র শৈব এবং বৈষ্ণব সাধু ব্যক্তিদের অস্পৃশ্য রূপে গণ্য করা হয়েছে। তিরুভাল্লুভার, যিনি তিরুক্কুরল গ্রন্থের রচয়িতা। যিনি ঈশ্বর ভক্তি ও প্রেমের জন্য বিখ্যাত তাহেরকেও অস্পৃশ্যদের দলভুক্ত করা হয়েছে। বিখ্যাত যমুনাচার্যের শিষ্য মরানেইড়নাম্বী যদিও জন্মগতভাবে পঞ্চমবর্ণ ছিলেন তাঁকে ব্রাহ্মণের সম্মান প্রদর্শন করে দাহ্ করা হয়েছিল।

মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ সাধু অস্পৃশ্যদের মনে করতেন না যে তারা অস্পৃশ্য। একদা নদী তীরে গরম বালুরাশির ওপর একজন হরিজন বালককে দেখতে পেয়ে নিজ গৃহে তাকে নিয়ে যায় এবং খেতে দেয়।

আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগ সম্বন্ধে বলতে হলে রাজা রামমোহন রায়, Ramkrishna Paramahamsa, Vivekananda, Dayananda Saraswati, Ranade,, Gokhale, V.R. Shinde এবং আরো বহুজন যে যার নিজ নিজ পথে এই অস্পৃশ্যতা সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন।

একদিন স্বামীজি খুবই ক্ষুধার্ত অবস্থায় — একজন জুতোমেরামতকারি তাঁকে চাপাটি দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন। জুতোমেরামতকারি ভয় পেয়েছে দেখে স্বামীজির চোখে জল এল মানুষটির ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা দেখে তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন যে এইরূপ কত হাজার উদার-হৃদয় মানুষ হীন অবস্থায় বাস করে এবং আমরা তাদের ঘৃণা করি" (Venkataraman, S.R. Harijans Through the Ages, P11, Calcutta, 1946)।

গান্ধীর অবদান

কিন্তু মহাত্মাগান্ধী ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর কেউ হরিজন প্রশ্নকে সেরূপ গুরুত্ব আরোপ করেনি। তিনি শিক্ষিত দেশপ্রেমিক যুবকদের দৃষ্টি এই সমস্যার প্রতি আকর্ষণ করেন। Ramsay Macdonald এর Communal Award তাঁর ক্রোধ বাড়াতে সাহায্য করেছিল। এই Award হরিজনদের হিন্দু সমাজ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিল। গান্ধীর ঐতিহাসিক অনশনের ফল হল "Poona Pact". পর গান্ধী হরিজন সেবক সঙ্ঘ নামক একটি সংস্থা শুরু করলেন। হরিজনের অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সে যে বর্ণেরই হোক না কেন। গান্ধী মতে "untouchability is a blot (ত্রুটি) on Hinduism and must be removed at any cost."। তিনি আরও মনে করতেন যে "untoucability is a poison and if we do not get rid of it in time it will destroy Hinduism"[২] (Venkataraman, S. R., P. 12, Harijans Through the Ages)". এই আন্দোলন তাহলে হচ্ছে ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক এবং মানবিক। হরিজন সেবক সঙ্ঘের কাজ হচ্ছে প্রচার, অনুরোধ, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি অস্পৃশ্যতাকে দূরীভূত করার জন্য।

মন্দির প্রবেশ আইন

প্রতিটি ধর্মে মন্দির, মসজিদ, চার্চ, গুরুদ্বারা, শিনাগগ্ আছে যেখানে ঈশ্বরের উপাসনা হয় এবং এই সব উপাসনালয়ে সকল মানুষের প্রবেশাধিকার আছে বর্ণ বিভেদ নির্বিশেষে। কেবলমাত্র অস্পৃশ্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই নিয়ম মানবতাবাদের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং ধর্মের মূল সত্যকে অস্বীকার করা।

অস্পৃশ্যতার একাধিক চিহ্ন বা প্রতীক আছে কিন্তু মন্দির প্রবেশ নিষেধ হচ্ছে সব থেকে বড়ো কলঙ্ক (black spot) হিন্দু ধর্মে। হরিজনদের মন্দিরের দ্বার খুলে দেওয়া হচ্ছে তাদের সামাজিক এবং ধর্মীয় মুক্তিদান। প্রায় ২৫ বছর ধরে প্রগতিশীল হিন্দু এবং হরিজনরা এই কুসংস্কার নিয়ে আন্দোলন করেছে।

Travancore এ প্রথম মন্দির প্রবেশ

মন্দির প্রবেশ আন্দোলন প্রথম শুরু হয় Travancore রাজ্যে (১৯১৯ খ্রি)। কিন্তু অনেকেই বাধা দেয়। "শেষ পর্যন্ত ১২ই নভেম্বর ১৯৩৫ খ্রি: Travancore এর মহারাজা তার রাজ্যের সকল মন্দিরের দ্বার হরিজনদের উন্মুক্ত করেছেন।" (Venkataraman, S.R., Temple Entry Legislation, P2, Bharat Devi Publications, Madras)[৩]। মন্দির ঘিরে অনেকদিন আন্দোলন চলেছিল আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

ব্রিটিশ সরকারের নীতি

ব্রিটিশ সরকার হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ ছিল। সেই কারণে Indian Penal

Code-এ একটা Section আছে যাতে বলা হয়েছে যে হরিজনরা মন্দির দূষিত করলে আইন ভঙ্গ করা হবে।

সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য

১৯৩২ এ Bombay-তে Congress conference এ এই প্রস্তাব গৃহীত হলো যে "No one shall be regarded as an untouchable by reason of his birth and that those who have been so regarded hitherto will have the same rights as other Hindus in regard to the use of public wells, public schools, public roads, and all other public institutions (Venkkataraman), S.R., P6, Temle Entry Legislation)[8] Swaraj Parliament এর প্রথম আইন হবে এই অধিকার। এই সিদ্ধান্তের ফলে হরিজনদের মন্দির প্রবেশ আন্দোলন আরো শক্তিশালী হলো।

Temple Entry Legislation সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলা যায় কিন্তু সে আলোচনায় প্রবেশ করা হচ্ছে না।

মন্দির প্রবেশ আন্দোলনের বিরোধী মত

অস্পৃশ্যতা ও মন্দির প্রবেশ বিরোধী মত

পরিসংখ্যান (Statistics) থেকে জানা যায় কমপক্ষে ভারতবর্ষের জনসাধারণ বর্ণপ্রথা অনুসরণ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাদের সম্পর্কে সরকার চিন্তা করেনি। আর্যদের বেদ এবং অন্যান্য ধর্ম পুস্তকের ওপর ভিত্তি করে যে হিন্দু ধর্ম গড়ে উঠেছে প্রচলিত ধর্ম-বিরোধী (heretics) তার কালো চিত্র এঁকেছে। (Sharma, Dhannulal, Untouchability, P1, Temple Entry and Sanatan Dharma)[৫]

Dhannulal এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতে মল এবং প্রস্রাব স্পর্শ করলে অস্পৃশ্য হয় যে কোন মানুষ যতক্ষণ না সে স্নান করছে। Dhannulal বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী এবং তিনি অস্থায়ী অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাসী কিন্তু অস্পৃশ্যতা চিরস্থায়ী এই ধারণায় আমি বিশ্বাসী নয়। (Sharma, Dhannulal, Untouchability, Temple Entry and Sanatan Dharma, P4)[৬]

সনাতনপন্থীদের লড়াই বিশেষ করে গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে। সনাতন ধর্মসভার সম্পাদক ধন্নুলাল শর্মা গান্ধীকে লিখেছেন "যে যদি Temple Entry Bill Legislative Assemblyতে উপস্থাপিত করা হয় তাহলে Assembly-র Christian সদস্য এবং বিরোধী সনাতন পন্থী দল সকল মন্দির ভাঙনের আইন বিধিবদ্ধ করতে পারে কারণ মূর্তি পুজো খ্রিস্টান, মুসলমান এবং আরো কিছু ধর্মগোষ্ঠী অপচ্ছন্দ করে। (Sharma, Dhannulal, Untouchability, Temple Entry and Sanatan Dharma, P16)[৭]

এই বলে সনাতন ধর্ম পন্থীদের নেতা Dhannulal Temle Entry Bill Legislative Assembly-তে উপস্থিত না করবার অনুরোধ করলেন।

উপসংহারে বলা যায় যে, হিন্দু ধর্ম হচ্ছে চিরপরিবর্তনশীল এবং নমনীয় (ever-changing and elastic)। অন্যান্য আন্দোলনের মত অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও মন্দিরে সকলের প্রবেশ আধুনিকযুগের একটা উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কার আন্দোলন।

সূত্রনির্দেশ ঃ—

১। Venkataraman, S.R., Harizans Through the Ages, P II, Calcutta, 1946.

২। Ibid, P12.

৩। Venkataraman, S.R. Temle Entry Legislation, Bharat Devi Publications, Madras.

৪। Ibid., P6.

৫। Sharma, Dhannulal, Untouchability.

ঔপনিবেশিক বাঙলায় কয়লাখনি শ্রমিক আন্দোলনের প্রারম্ভ : (আসানসোল-রাণীগঞ্জ : একটি রূপরেখা)

নবনীতা দত্ত

অজয়-দামোদর ও বরাকর নদী বেষ্টিত আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলটি কয়লা সম্পদপূর্ণ হওয়ায় 'কালো হীরের দেশ' নামে পরিচিত। এই শহর দুটির শিল্পনগরী রূপেই জন্ম। ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জে প্রথম কয়লাখনির সূচনা হয়েছিল ১৭৭৪ সালে। এই বিষয় এইচ.ডি.জি. হামফ্রেজ জানিয়েছেন যে রাণীগঞ্জ কয়লাখনি থেকে প্রথম কয়লা উত্তোলিত হয় ১৭৭৪ সালের ১১ই আগষ্ট।[১] এই সময় কোম্পানির দুজন কর্মচারী সামনার ও হিটলী প্রথম কয়লা উত্তোলনের উদ্যোগ নেন, যদিও তাঁরা বাণিজ্যিক সাফল্য পাননি।[২] ব্যবসায়িক সাফল্য আসে অনেক পরে ১৮১৩ সাল নাগাদ। এযুগে কয়লাখনির মালিকানা ছিল ব্রিটিশদের। সুনীল বসুরায় বলেছেন "১৮৪৩ সালে আধুনিক যৌথ সংস্থা হিসেবে সংগঠিত বেঙ্গল কোল কোম্পানির গঠন থেকে কয়লাশিল্পের ওপর পুঁজির প্রাধান্য কায়েম হয়। বেঙ্গল কোল কোম্পানি ছিল ইংগ-বঙ্গীয় পুঁজির এক মিলিত ও সমন্বিত রূপ।"[৩] এই কোম্পানির দেশীয় উদ্যোক্তা ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

ভারতে রেললাইনের পত্তন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন চাহিদা কয়লাশিল্পের স্থায়ী সাফল্য এনে দেয়। সরকারি পরিকল্পনা ব্যতীত যেখানে-সেখানে খনি গড়ে তোলা হয়। মুনাফা অর্জন চরম লক্ষ্য হওয়ায় খনি শ্রমিকদের নিরাপত্তা, বাসস্থানের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষা, কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা, বেতন কাঠামো কোনকিছুই মালিকদের প্রশাসনিক কার্যাবলীর অন্তর্গত ছিলনা।

প্রাথমিক পর্বে কয়লাশিল্পে শ্রমিকরা এসেছিল পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে। এদের মধ্যে প্রধানত সাঁওতালরা ছাড়াও মাঝি, বাউরী ও কুরমী, নুনিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নরনারীরা যোগ দিয়েছিল। এঁরা সকলে খনি সংলগ্ন অঞ্চলে ধাঁওড়ায় জীব-জন্তুর সঙ্গে এক অমানবিক জীবনযাপন করত। এই উপজাতি ও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষরা ছিলেন স্ব-স্ব সমাজ ত্যাগী ছিন্নমূল। সুনীল বসুরায়ের মতে "...খনির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমিকেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। শ্রমিকরা অধিকাংশই বহিরাগত।"[৫] নারী শ্রমিকরা কয়লা বোঝাই-এর কাজে তাঁদের স্বামীদের সাহায্য করত। প্রতি পুরুষ পিছু নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫-৬ জন। এই সময় কোম্পানি ভূগর্ভে নারী শ্রমিক নিয়োগ হ্রাস করতে বললেও, ১৯৩৮ সাল নাগাদ নিয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[৬]

ঔপনিবেশিক যুগে খনি সংলগ্ন গ্রামগুলির অবস্থাপন্ন সামন্ত-মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা যারা জীবিকাসূত্রে কয়লাখনির সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাঁরা মালিক বা মালিকের লোক। এঁরা সামাজিক অবস্থান বজায় রেখে অবস্থান করত। অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিরা গ্রাম ছেড়ে রাণীগঞ্জ ও আসানসোলে বাসস্থান গড়ে তোলেন। ফলে গ্রামীণ সমাজের ধন-বৈষম্য স্থিতাবস্থা বিনষ্ট করে। গ্রামীন সমাজের পুরান কেন্দ্রাতিগ শক্তি দুর্বল হয়, বিপরীতে কেন্দ্রাতিগ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

এই যুগে ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত সামাজিক অসাম্য, বিশেষত নারী-পুরুষ এবং শিক্ষাগত অসাম্য, ধনবৈষম্য খনি শ্রমিকদের জীবন ও জীবনচর্চাকে প্রভাবিত করেছিল। মধ্যবিত্ত কর্মচারী শ্রেণীর চাহিদার হিসেব-নিকেশে খাদান শ্রমিকরা স্থান পায়নি। একই শিল্পে শ্রমিক ও সাদাপোষাক কর্মচারীর মধ্যে এত ব্যবধান অন্য শিল্পে ঘটেনি। এই যুগে যে তীব্র শোষণ ও বঞ্চনার মধ্যে খনিশ্রমিকরা জীবন অতিবাহিত করত তা আর্থ-সামাজিক চিত্রে যন্ত্রণার প্রতিফলন।

ঔপনিবেশিকযুগে বিভিন্ন শিল্প শ্রমিকরা মূলত দু-ভাবে শোষিত হত। যথাঃ ১) শ্রমিকশ্রেণীসহ সমগ্র জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ; ২) ভারতীয় ও ব্রিটিশ মালিকানা নির্বিশেষে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর ওপর পুঁজিবাদী শোষণ। এই সময় থেকেই শ্রমিকশ্রেণী পুঁজির শোষণেব বিরুদ্ধে প্রাথমিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে প্রয়াসী হয়। যে রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীচেতনা বিকশিত হতে শুরু করে তা দীর্ঘ, কঠিন ও তিক্ত সংগ্রামের মধ্যদিয়েই বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

ঔপনিবেশিক যুগে কয়লাখনি শ্রমিকদের অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে মোহন কুমার মঙ্গলম বলেছেন "শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা ঠকিয়ে নেওয়া হত। কষাইখানার মতো খনন ও সংরক্ষণের ধারণা বর্জিত অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সেই খনি পরিচালনা করা কয়লা শিল্পের বিস্তৃত এলাকার একমাত্র বৈশিষ্ট্য।.......অবাধ দুর্নীতি, বাধ্যতামূলক শ্রম, জাল ও দুনম্বরী নথি, উৎপাদনের পরিমাণ কম দেখান, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন না দেওয়া....নিরাপত্তা ও শ্রমিক কল্যাণের কোনো ব্যবস্থা না করা....এই ছিল খনি মালিকদের কার্যকরী নীতি।"[৭]

কয়লাখনির সমস্ত শ্রমিকরাই সর্বাধিক বঞ্চনার ও পীড়নের স্বীকার। ১৯২০ সালে সারাভারত ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ব ট্রেডইউনিয়ন সংস্থার অধিবেশনে A.I.T.U.C কোলিয়ারি শ্রমিক সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেশ করেছিল তার শিরোনাম ছিল 'ভারতের মরণখনি'।[৮] ১৯২০ সালেই ধানবাদে আই.বি. সেন বার এ্যাট ল এর সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল ইন্ডিয়ান কোলিয়ারি এমপ্লইজ এ্যাসোসিয়েশন।[৯] এই সংগঠনই ছিল কোলিয়ারি শ্রমিকদের প্রথম ট্রেডইউনিয়ন।

স্বামী বিশ্বানন্দের প্রচেষ্টায়, যোশেফ বাপতিস্তার সভাপতিত্বে ঝরিয়ায় ১৯২১ সালে দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে AITUC-র সঙ্গে ইন্ডিয়ান কোলিয়ারি এমপ্লইজ এ্যাসোসিয়েশন সদস্যরা সংযুক্ত হয়। এভাবে তাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ১৯২৪ সালে পি.সি.বসু ইন্ডিয়ান কোলিয়ারি এমপ্লইজ সংস্থার পূর্ণ সময়ের সম্পাদক নিযুক্ত হয়। এইসব সম্মেলন, সভা ও সংগঠন খনি শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে আন্দোলন গড়ে তোলার পশ্চাতে প্রেরণা যুগিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে টাটা কোলিয়ারি লেবার এ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। তিরিশের দশকের অন্যতম সংগঠন East Indian Coal Company Workers Union যথেষ্ঠ শক্তিশালী।

কয়লাখনি শ্রমিকের কতগুলি উদ্দেশ্যপূরণের লক্ষ্যেই সংগঠনেব মাধ্যমে আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিল। তাঁদের লক্ষ্য ছিলঃ ১. শ্রমিক কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অভাব-অভিযোগ দূরীকরণ। ২. ক্ষতিপূরণ ও বকেয়া মজুরি আদায়ের জন্য মামলা-মকদ্দমা। ৩. প্রয়োজনে ধর্মঘট পালন। ৪. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয় শিক্ষাদান। ৫. উচ্চতম মজুরি আদায়।

১৯২০-৩৩ সাল পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দাজনিত কারণে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন মন্থর হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক ভারতে ১৯২৬ সালে প্রথম ট্রেডইউনিয়ন অ্যাক্ট পাশ।[১১] এরপরেই আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হতে থাকে। এই কারণে কংগ্রেস কয়লাখনি শ্রমিকদের মধ্যে কাজের জন্য ১৯৩৮ সালে আব্দুল বারিকে পাঠায়। এই সময় বিভিন্ন কোলিয়ারিগুলির ধর্মঘট পালন থেকে সহজেই বোঝা যায় যে শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে আন্দোলনে অংশ নিচ্ছিল। ১৯৩৯ সলে কুস্তোড় কোলিয়ারিতে ২২দিন, ১৯৪১ সালে ১০০ দিন ধর্মঘট পালিত হয়েছিল। ১৯৪২-৪৫ নাগাদ বিহারের কয়লাখনি শ্রমিকদের মধ্যে এম.এন. রায়পন্থীরা সক্রিয় ছিলেন। ইতিপূর্বে ১৯৩৯ সাল থেকে বাঙলার রাণীগঞ্জ অঞ্চলে বঙ্কিম মুখার্জি বিধানসভায় নির্বাচিত হবার পর থেকে কয়লাখনি শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টপন্থীরা সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন।[১২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে AITUC-প্রতিষ্ঠার পূর্বে কয়লাখনি শ্রমিকদের মধ্যে কোন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার মানসিকতা ছিল না। কোন ট্রেডইউনিয়ন সংগঠনও খনিশ্রমিকদের মধ্যে ১৯২০ সালের পূর্বে সক্রিয় ছিল না। ১৯২০-২১ সালে খনিশ্রমিকদের সংগঠনের সূচনাকালেই রাণীগঞ্জ কয়লাখনিগুলিতে ৬টি ধর্মঘট পালিত হয়েছিল।[১৩] যারমধ্যে ১টি ব্যর্থ, ১টি মীমাংসা হয় ও অন্য ৪টি আংশিক সাফল্য পেয়েছিল। এইসব ধর্মঘট পালনের উদ্দেশ্যই ছিল উচ্চতম মজুরি আদায় করা।

১৯৩৬ সালে কয়লাখনি শ্রমিকদের মধ্যে তিনটি ট্রেডইউনিয়নের অস্তিত্ব ছিল - যারা প্রাথমিকভাবে শ্রমিকদের সংগঠিত করতে তৎপর হয়েছিল। এই সংগঠনগুলি হল:-[১৪]

১) The Indian Colliery Labour Union - ১৯২৬ সালে ট্রেডইউনিয়ন আইন দ্বারা

রেজিস্ট্রীকৃত। সদর দপ্তর ঝরিয়া। সদস্য সংখ্যা ছিল ৮.৩১৫। সভ্যরা ছিলেন দক্ষ-অদক্ষ, কেরানি প্রভৃতি শ্রমিকরা। চাঁদার হার ছিল ১ পয়সা থেকে ৪ আনা। এই সংস্থা ক্ষতিপূরণ, বেতন, মদ্যপান বিরোধিতা, স্বাস্থ্য-পরিচ্ছন্নতা বিষয় যুক্ত ছিল।

২) The Tata's Collieries Association - ১৯২৬ সালের আইন দ্বারা পঞ্জীকৃত। সদস্য সংখ্যা ছিল ৩,৩১৭। মাসিক চাঁদা ১ আনা। এটি ছিল প্রধানত মজদুর শ্রমিকদের সংগঠন।

৩) The Indian Miner's Association - ১৯২৬ সালের আইন অনুসারে রেজিস্ট্রীকৃত। সদর দপ্তর ছিল ঝরিয়া। সভ্য সংখ্যা ৩,৫০০। চাঁদার হার ১-৪ আনা। এটি কল্যাণমূলক কাজ ছাড়াও মজুরি, ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি নিয়ে কাজ করত। এই সংঘের সঙ্গে ন্যাশনাল ট্রেডইউনিয়ন ফেডারেশনের (বম্বে) সম্পর্ক ছিল।

চল্লিশের দশকে দুর্বার স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বৃহত্তর স্বার্থে খনিশ্রমিকদের আন্দোলন কিছুটা প্রাধান্য হারায়। যদিও ১৯০১ সালে Mines Act, ১৯০৪ সলে Mines Regulation বলবৎ করা হয়েছিল। শ্রমিকদের দীর্ঘকালীন আন্দোলনের পরে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৬ সালে প্রথম বেতন আইন পাশ করতে বাধ্য হয়। বস্তুত যখন দেশে ট্রেডইউনিয়ন সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত তখন সরকার কয়লাশিল্পে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন রচনায় তৎপর হয়েছিল।

এতদ্‌সত্ত্বেও কয়েকটি সমস্যা ও বাধার জন্য সংগঠিত আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[১৫] এই সমস্যাগুলি হল ঃ

১. কয়লাখনি শ্রমিকদের মধ্যে "Sons of the Soil" সেন্টিমেন্টের প্রাবল্য।

২. অশিক্ষা ও দুর্নীতি জড়িত রাজনীতি।

৩. অধিকাংশ ভিন্ন ভাষাভাষী শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনার অভাব।

৪. মূল্যবোধগত অবক্ষয় ও আন্দোলন বিমুখতা।

৫. যোগ্য, দক্ষ নেতা ও কর্মীর অভাব।

৬. শ্রমিকদের পানাভ্যাস, নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য এবং অধিকার বিষয় সচেতনতার অভাব।

লোকালয় থেকে দূরে, ভৌগলিক বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশে, বহিরাগত আদিবাসী হরিজন শ্রমিকদের পক্ষে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সময় লেগেছিল অনেক। কিন্তু কোন সময় থেকে শ্রমিকরা সচেতনভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল সে বিষয় গবেষকদের মধ্যেও মতানৈক্য বিদ্যমান।

প্রসঙ্গত বলা যায়, যে সচেতন শ্রমিক সংঘ আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণী রাজনীতিতে সংগঠিত করতে সাহায্য করে সে ধরণের সংগঠিত পরিকল্পিত ও শক্তিশালী আন্দোলন

প্রথমদিকে বিকশিত হয়নি। এর পশ্চাতে বিভিন্ন কারণগুলির অন্যতম ছিল সামাজিক অসাম্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা, গ্রাম ও শহরের অসাম্য, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের অত্যাচার উৎপীড়ন প্রভৃতি বিষয়গুলি কয়লাশিল্প, শিল্পের শ্রমিক ও শ্রমিক সংঘ আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যেই কয়লাখনি শ্রমিকদের মধ্যে সংঘ দানা বাঁধছিল এবং একটা নির্দিষ্ট রূপ লাভ করছিল।

এই সময়কালে বিশেষ লক্ষণীয় দিক হল যে অন্যান্য শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে বিশেষত পাট, বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং ও পরিবহণ (ডক, ট্রাম, ট্রেন) শিল্পে শ্রমিকরা যেভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হয়েছিল এবং তাদের পেশাগত অধিকার অর্জনের সংগ্রাম শুরু করেছিল, কয়লাখনি শ্রমিকদের সেভাবে সংগঠিত আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেনি। তাই দেখা যায় যে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিম লগ্নে কয়লাখনি শ্রমিকরা সচেতনভাবে সংঘের মাধ্যমে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ :—

১. Mohan Kumar Mangalam, Coal Industry in India.

২. নন্দদুলাল আচার্য (সাং), আসানসোলের ইতিবৃত্ত।

৩. সুনীল বসুরায়, রাণীগঞ্জে কয়লাখনি শ্রমিক।

৪. Report of the Deshpande Committee.

৫. পূর্বোল্লিখিত।

৬. পূর্বোল্লিখিত।

৭. পূর্বোক্ত।

৮. পূর্বোক্ত।

৯. সুনীল বসুরায়, কয়লাখনি শ্রমিক, জীবন ও সংগ্রাম।

১০. পূর্বোক্ত।

১১. সুকোমল সেন, ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস।

১২. পূর্বোক্ত।

১৩. The Report of the Committee in Industrial Unrest in Bengal (1921).

১৪. Annual Report of Collieries (1936).

১৫. Anjan Ghosh, Environmental Impact of Coal Mining in Eastern India (Article).

১৯৩০-৪০ দশকে বাংলাদেশে কেরানিবাবুদের সংগঠন ও আন্দোলনের একটি চিত্র

অনুরাধা কয়াল

১৯৩০ এর মধ্যবর্তী সময় থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষ জুড়ে কেরানিবাবুদের আন্দোলন বৃহৎ আকার ধারণ করেছিল। সেই সময় বাংলার কেরানিবাবুরা রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ট্রেডইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী শেষ কয়েক বছর জুড়ে সমগ্র ভারতবর্ষে নতুন ধরণের ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল। ১৯৩৭ সালে জনপ্রিয় মন্ত্রীসভা গঠন, ১৯৩৫ সালের আইন (এ্যাক্ট অফ ১৯৩৫) মার্কসীয় মতবাদের বিস্তার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, ভারতছাড়ো আন্দোলন (কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ইন ১৯৪২) ১৯৪৬-৪৭ সলের রায়ট এবং ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা, প্রত্যেকটি ঘটনাই ছিল অত্যধিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে সেই সময় নানা ধরণের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যথা রেজিস্ট্রেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন বুক সেলারস্ এ্যান্ড পাবলিসার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, জমিনদারী এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, ইনসুরেন্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ইত্যাদি। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু ইউনিয়ন যথা - মার্কেনটাইল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, প্রেস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ইত্যাদির অস্তিত্ব পূর্বে ছিল কিন্তু নানা কারণে এই সব ইউনিয়নের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। এবং ১৯৩০ এবং ৪০ এর দশকে এই ইউনিয়নগুলি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯২৮ সাল নাগাদ বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। এবং ১৯৩০ সাল নাগাদ এই ইউনিয়নের প্রথম আঞ্চলিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মৃণাল কান্তি বসু এই ইউনিয়নের সাথে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিল। এই সংগঠনটি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তার কার্যভার পরিচালনা করেছিল। এবং কিছু অজ্ঞাত কারণবশত এই সংগঠনটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৫ সাল নাগাদ এই ইউনিয়নটি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সময় মৃণাল কান্তি বসুকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।[১] ১৯৩৯ সাল নাগাদ প্রেস এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন-এর বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন কলিকাতার মেয়র মি: এ.কে. ঝাকারিয়াকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। মেয়র সেই সময়ে প্রেস কর্মীদের স্বল্প বেতন সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই সম্মেলনে প্রেস কর্মীদের সুবিধার্থে বেশ কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। যথা - প্রেস কর্মীদের স্থায়ী নিয়োগ, প্রেস কর্মীদের উপযুক্ত বেতন। তাদের উপযুক্ত ছুটি ইত্যাদি।[২] ১৯৩৯ সাল নাগাদ প্রেস এমপ্লয়িজ একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে। আবদুল হালিম গজনাবিকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। মৃণাল

কান্তি বসু, সেই সময়ে প্রেস কর্মীদের সঙ্গীন অবস্থার সম্পর্কে গজনবিকে নানা তথ্য দেন। তিনি গজনবিকে বলেন প্রেস কর্মীরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের অধিকার দাবি করতে পারে।[৩] ১৯৩৯ সাল নাগাদ মৃণাল কান্তি বসুকে বুক সেলারস এ্যান্ড পাবলিসার্স অ্যাসোসিয়েশান-এর প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।[৪] এই সংগঠনের কর্মচারীরা মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছিল এবং তারা মালিক পক্ষের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন-এ অবতীর্ণ হন। মৃণাল কান্তি বসু এই সময়ে মনে করেন যে শুধু মাত্র ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেই এই ধরণের সমস্যার সমাধান করা কোনোভাবেই সম্ভবপর নয় এবং তিনি মনে করেন যে সুষ্ঠভাবে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে কেরানিবাবুদের আন্দোলন-এ অবতীর্ণ হওয়া উচিত। বুক সেলারস্ এ্যান্ড পাবলিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের কেরানিবাবুরা কর্মক্ষেত্রে অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। এবং এদের অবস্থার উন্নতি করার উদ্দেশ্যে বেঙ্গল এ্যাসেমব্লিতে প্রফেসর কবীর বেদী একটি বিল পেশ করেন। ১৯৩৯ সাল সেপ্টেম্বর নাগাদ বিভিন্ন মার্কেনটাইল অফিস-এর কেরানিবাবুরা একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এবং তারা ইউরোপীয়ান এবং মাড়োয়ারী মালিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।[৫] ১৯৪০-এর মে মাস নাগাদ জমিনদারী এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন তাদের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে এবং এম. কে. বসুকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। এই সম্মেলনে জেড. ই. এ. কেরানিবাবুরা তাদের স্বল্প বেতন, চাকরি ক্ষেত্রে নানা ধরণের অসুবিধা যথা, পদোন্নোতির অসুবিধা, চাকরির ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।[৬] এম. কে. বসু এই ক্ষেত্রে বলেন স্বল্প বেতনের দরুণ জেড. ই. এ কেরানিবাবুরা নিজেদের জীবন যাত্রার মান উন্নতির উদ্দেশ্যে অসত্য উপায়ে রোজগারের পথ অবলম্বন করে।

১৯৪১ সেপ্টেম্বরে বিমা কোম্পানির এজেন্টরা একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। এই মিটিং-এ বিমা এজেন্টরা ১৯৩৮ সালের বিমা আইনের ত্রুটি গুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন।[৭]

১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পোস্টাল এবং আর.এম.এস. এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাদের বাৎসরিক সম্মেলনে যোগদান করেন এম. কে. বসু এবং এই সম্মেলনেও পোস্টাল এবং আর. এম. এস. এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের কেরানিবাবুদের কর্মক্ষেত্রে নানা ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করেন।[৮] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের সাথে সাথে নানা ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। এবং সমগ্র (ওয়ার্কিং ক্লাস) কর্মচারী শ্রেণীর মধ্যে এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

১৯৪৫ সাল নাগাদ ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়।[৯] এবং এই সংগঠনে কেরানিবাবুদের দরখাস্তের আন্দোলনের সূচনা ঘটে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ফায়ার সার্ভিস এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন-এর কেরানিবাবুরা

একটি সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে সেই মাসের ৩১ তারিখের পর তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।[১০] এই সময় মনে করা দরকার যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফায়ার সার্ভিস এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের কেরানিবাবুরা সরকার এবং সাধারণ মানুষকে সর্বস্তরে সাহায্য করেছিল এবং যুদ্ধের পর চাকরি থেকে বরখাস্ত - এর অর্থই হল অনাহার এবং মৃত্যু।[১১] এই ধরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দরুণ এপ্রিল ১৯৪৬ সাল নাগাদ সমগ্র এফ.এস.ই. অ্যাসোসিয়েশনের কেরানিবাবুরা আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন ধরণের দাবি দাওয়া নিয়ে কিন্তু সরকার সেই সময়ে কোনোরকম মীমাংসার পথে যেতে রাজি ছিল না এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাওড়া এবং কোলকাতার প্রায় ১৬টি ফায়ার স্টেশন বন্ধ হয়ে যায়।[১২] ১১ দিন আন্দোলনের পর এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। এবং একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে উভয় পক্ষই একটি মীমাংসায় আসেন। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালে প্রেস এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের কেরানিবাবুরা নানা ধরণের অসুবিধার স্বীকার হয়েছিল এবং কর্মক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার উদ্দেশ্যে বার বার সরকারের কাছে আবেদন করেন কিন্তু সরকার সেইসব আবেদনে কোনোভাবেই কর্ণপাত করেননি। কোলকাতা, দিল্লী, আলিগড় এবং সিমলার প্রেস কর্মীরা সরকারকে একটি নোটিশের মাধ্যমে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। কংগ্রেসী নেতা শরৎচন্দ্র বসু আন্দোলনকারীদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন।[১৩] এই আন্দোলনে প্রায় ২০০০ কেরানিবাবু অংশ গ্রহণ করেছিল। কোলকাতায় ২রা এপ্রিল, ১৯৪৬ সালে আন্দোলনের সূচনা ঘটে কিন্তু আলিগড় এবং সিমলায় আন্দোলন পূর্বেই আরম্ভ হয়। জুন, ১৯৪৬ সালে এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। কোলকাতার প্রেস এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন হয়ে এম. কে. বসু মীমাংসা পত্রে স্বাক্ষর করেন।[১৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানকালে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির ফলে কেরানিবাবুদের জীবন যাত্রার মানের ক্রমাগত অবনতি ঘটেছিল। এবং তাদের জীবন দুরুহ হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৫ সালের ডাক বিভাগের কেরানি বাবুরা একত্রিত হয়ে পোস্টাল এবং টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন গঠন করেছেন শ্রী চমন হলের - এর নেতৃত্বে।[১৫] এই সংগঠনের কেরানিবাবুরা নিজেদের বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিল কিন্তু সরকার সেই দাবি নাকচ করে দিয়ে মে, ১৯৪৬ বেতন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন গঠন করেছিল। সরকারের এই আচরণে কেরানিবাবুরা অসন্তুষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং জুলাই, ১৯৪৬ থেকে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়।[১৬] এই স্ট্রাইক ক্রমাগতভাবে ঐতিহাসিক স্ট্রাইকে পরিণত হয়। জুলাই, ১৯৪৬ সারা বাংলা জুড়ে হরতাল পালিত হয়। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় এই আন্দোলনে যোগদান করে। কারখানা, মিল, সরকারি অফিস, ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য নানা ক্ষেত্রের কেরানিবাবুরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। পরিবহন এবং বন্দরের কেরানিবাবুরাও এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল। এই আন্দোলনের ফলে বেঙ্গল কাউন্সিল এবং হাইকোর্ট-এর কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়। সেই দিন কোলকাতা একটি বিশাল মিছিলের সাক্ষী হয়েছিল। হাজার হাজার

পুরুষ ও মহিলা এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল। (এবং তাদেব মূল স্লোগান ছিল "ডাক বিভাগের কেরানিবাবুদের দাবি ছিল আমাদের দাবি'? মিলিটারি অ্যাকাউন্টস বিভাগের কেরানিবাবুরা তাদের সহকর্মীদেব বরখাস্ত-এর বিরুদ্ধে সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানায়[১৭] এবং আগস্ট, ১৯৪৭ নাগাদ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। সরকার চার আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করেন। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে মৃণাল কান্তি বসু সরকারি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চাব হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর বাংলাদেশের কেরানিবাবুদের সংগঠন এবং রাজনৈতিক সচেতনতা নতুন মাত্রা অর্জন করেছিল।[১৮]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কেরানিবাবুদের আন্দোলনের চরিত্র এবং ক্ষমতা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[১৯]

১৯৪৪-৪৫ সালে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সাথে সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে কেরানিবাবুদের আন্দোলনের কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং এই সভাগুলি মূলত কোলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হত। যে সব সরকারি কর্মচারীরা কমিউনিস্ট পার্টি অনুগামী ছিল তারা নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছিল অথবা পুরানো সংগঠনের মধ্যেই কাজকর্ম করছিল। প্রদ্যুৎ ঘোষের নেতৃত্বে বাণিজ্যিক অফিসের কেরানিবাবুরা সঠিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে প্রদ্যুৎ ঘোষ কমিউনিস্ট পার্টির থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৪৯ নাগাদ মহিলারা ১৪৪ ধারা ভেঙে বন্দুকধারী পুলিসের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়! এই ঘটনায় প্রদ্যুৎ ঘোষ ভীষণভাবে ভেঙে পড়েন এবং সি. পি. সদস্যপদ পুনরায় গ্রহণ করেন নি। কিন্তু জীবনের শেষদিক পর্যন্ত কেরানিবাবুদের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে কাজ করে যান। কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আবদুল মৈনান মার্কেনটাইল অফিসের সংগঠনের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। বাংলাদেশের আঞ্চলিক সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনের প্রতি কমিউনিস্ট নেতা কৃষ্ণ গোপাল বসু সহানুভূতি প্রজ্ঞাপন করেন। সরকারি অফিসের কেরানিবাবুদের সংগঠন এবং আন্দোলনগুলি ক্রমাগতভাবে ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠে এবং ১৯৪৬ সালের তার ও ডাক বিভাগের কর্মীদের আন্দোলনটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে জুলাই, ২৯, হরতালটি ছিল সঠিক অর্থে ঐতিহাসিক।[২০]

সূত্রনির্দেশ ঃ—

১। Mrinal Kanti Bose - Smriti Katha, Calcutta, Bangabda 1355, p. 214.
২। Ibid., p. 241।
৩। Ibid., p. 228।
৪। Ibid., p. 242।
৫। Ibid., p. 231-232।

৬। Ibid., p. 242 ।

৭। Ibid., p. 243 ।

৮। Ibid., p. 256 ।

৯। Ibid., p. 268 ।

১০। Ibid., p. 268 ।

১১। Ibid., p. 257 ।

১২। Ibid., p. 278 ।

১৩। Ibid., p. 288 ।

১৪। Ibid., p. 320 ।

১৫। Sukomal Sen, *Working Class of India, History of Emergency and Movement 1830-1970*, Cal. 1977. p. 425 ।

১৬। Ibid., p. 425 ।

১৭। Saroj Mukherjee, Bharater Communist Party O Amra, 1986, Vol. II, p.326-27 ।

শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন এবং বাংলা সাহিত্য ঃ ১৮৭০-১৯৫০

শুভেন্দু শিকদার

সামাজিক-রাজনৈতিক বিন্যাস, আন্দোলন, অগ্রগতি সাহিত্যিকের রচনায় যে অনিবার্য প্রভাব ফেলে—সোজাসুজিই হোক কি বাঁকাভাবে—সাহিত্য সমালোচনায় এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা এনেছে মার্কসীয় চিন্তাধারা। মার্কসবাদ পরিবর্তমান ইতিহাসকে শুধু ব্যাখ্যাই করে না, ইতিহাস নির্দেশিত পথে সমাজকে বদলাতে চায়। সে কারণে মনে করে সাহিত্যে আর্থ-সামাজিক পটভূমির প্রতিফলন বিশ্লেষণ যেমন জরুরি, তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্য যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার বিচার। ইংরাজী সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেখানকার শিল্প বিপ্লব ও তজ্জাত শিল্প মালিক শ্রেণীর প্রতাপ, দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীর দুরবস্থা প্রভৃতির নিদর্শন ডিকেন্স, রাস্কিন, গলসওয়ার্দি প্রমুখের লেখায় ফুটে উঠেছে। যদিও ভারতবর্ষের শ্রমিক ইতিহাস আধুনিককালের ঘটনা মাত্র, কিন্তু পাশ্চাত্য মনীষীদের সাম্যবাদী মতাদর্শ ও পাশ্চাত্যের শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তাস্রোতে আলোড়ন তুলেছিল এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। তবে 'সাম্য', কমলাকান্তের বিড়াল নিবন্ধের মতো প্রবন্ধ রচনা করলেও মার্কসবাদ ও পুঁজিবাদকে ভারতের পূর্বপ্রান্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় প্রত্যক্ষ না করায় বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য মনীষীদের মতো হয়নি।[১] আর বেদান্তের চরম সাম্যে বিশ্বাসী বিবেকানন্দ মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রবাদকে সর্বাংশে সমর্থন করতে পারেননি।[২]

উনিশ শতকের এই দুই সমাজবাদী চিন্তানায়কের কথা বাদ দিলে দেখা যায় সেকালের শিক্ষিত বাঙালী সমাজের অনেকেই যেমন অক্ষয়কুমার দত্ত (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা), কেশবচন্দ্র সেন (সুলভ সমাচার), পাদ্রী লং (হিন্দু পেট্রিয়েট), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (সোমপ্রকাশ), ভোলানাথ চন্দ্র (শম্ভুচন্দ্র মুখার্জির মুখার্জিস ম্যাগাজিন) প্রমুখ ধনতান্ত্রিক শোষণের নিন্দা ও শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি বিধানের নানা কথা বলেছেন। চা বাগিচার শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের রিপোর্ট সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দি বেঙ্গলী', কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী', (রামকুমার বিদ্যারত্ন ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী রিপোর্টার) পত্রিকায় প্রকাশিত হত।

যাইহোক বরানগরের চটকল শ্রমিকের সেবায় আত্ম-নিয়োগকারী শশীপদ ব্যানার্জী 'ভারত শ্রমজীবী' নামক সর্বপ্রথম শ্রমিক শ্রেণীর জন্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর প্রথম সংখ্যায় শিবনাথ শাস্ত্রী বাংলায় শ্রমজীবী জাগরণ সম্পর্কিত প্রথম কবিতাটি

লিখেছিলেন, চা বাগিচার শ্রমিকদের উপর অমানুষিক নির্যাতনকে কেন্দ্র করে দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'চা-কর দর্পণ' নাটক এবং রামকুমার বিদ্যারত্ন সঞ্জীবনীতে লিখলেন 'কুলি-কাহিনী' উপন্যাস। যদিও ইংরাজীতে লেখা তবুও প্রাসঙ্গিক রেভারেন্ড লালবিহারী দে'র 'গোবিন্দ সামন্ত' উপন্যাসে দেখি গ্রামের কৃষকের শহরে এসে মজুর (কুলি) হওয়ার কথা। কিন্তু ইংরেজ শাসন ও ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে পশ্চিমী সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুষ্ট এবং বহুলাংশে বাংলার অকৃত্রিম প্রাণরস থেকে বঞ্চিত কলকাতা কেন্দ্রিক আধুনিক বঙ্গসমাজের সাহিত্য সেবীরা মুষ্টিমেয়র মনোরঞ্জনের সামগ্রী সৃষ্টির ব্রত নেওয়ায় এ যুগের শহুরে শিল্পবাণিজ্য ভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতাব দাপটে পল্লীর অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ার, সমাজ বিপর্যস্ত হওয়ার ছবি কেউই সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। যদিও দেখা যায় বিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রমিক শ্রেণী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই মাঝে মাঝে ধর্মঘট করেছে এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলনেও কয়েকটি ক্ষেত্রে সাড়া দিয়েছে।[৩]

এমতাবস্থায় হোম শিখা (১৯০৭) কাব্য গ্রন্থের মধ্যে সংকলিত 'সাম্যসাম' কবিতাটির মধ্যে শ্রমিক আর কৃষক শ্রেণীর জন্য মানুষের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জাগালেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যে বাঙালী মধ্যবিত্ত কাব্যপাঠক যে কল্পিত স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখেছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের অভিঘাতে সে যুগের অবসান হল। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'দেশোদ্ধার' কবিতায় শখের কৃষক দরদী শ্রমিক দরদীদের এক হাত নিলেন। মরীচিকা কাব্যগ্রন্থের (১৯১০-২২) অন্তর্গত 'ডাক হরকরা' কবিতাটি বাংলাদেশের পল্লীপ্রকৃতির জীবনাশ্রিত একজন ডাকহরকরার বাস্তব জীবন পরিচয়।

বাংলা কাব্যে এই অ-রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ ও সুরের ক্রমভিব্যক্তিতে যাঁর দান আছে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সেই নজরুল ইসলাম মুজফ্ফর আহ্মেদকে সঙ্গে নিয়ে যে 'নবযুগ' (১৯২০) সান্ধ্য দৈনিক বের করলেন তাতে ১৯২০ সালে দেশময় এখানে ওখানে ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে লিখলেন 'ধর্মঘট', লিখলেন 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' এমন সব প্রবন্ধ সোচ্চারে ঘোষণা করতে লাগলেন কৃষক মজুরদের ন্যায্য দাবি। লাঙ্গল পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় (ডিসেম্বর, ১৯২৫) প্রকাশিত 'সাম্যবাদী 'শ্রমিকের গান'; এরপর ১৯২৭ সালে কলকাতায় প্রথম মে দিবস উপলক্ষে 'লাল পতাকার গান', 'ওড়াও ওড়াও লাল নিশান', সারা পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীর 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত' (অনুবাদ); সর্বহারা কাব্যের (১৯২৬) কুলিমজুর, ফরিয়াদ; 'সন্ধ্যা' কাব্যের (১৯২৯) 'আমি গাহি তার গান', ও জীবন বন্দনা ইত্যাদি কবিতা; 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধ, 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে শ্রমজীবী সমাজের কত কথাই না আছে। অবশ্য নজরুলের বিদ্রোহ মার্কসবাদী প্রেরণা সঞ্জাত ছিল না বলে তিরিশ সালের পরের কবিতা ভিন্নধর্মী হয়ে পড়ে।[৪]

অপরপক্ষে ১৯২০-২১ নাগাদ রবীন্দ্রমানসে ধনতান্ত্রিক দানব কীভাবে থাবা দিয়ে এদেশের কৃষিলক্ষ্মীকে হরণ করেছে তার প্রতি উদ্বেল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে তার রূপকাশ্রিত

নাটকগুলিতে যেমন সমালোচনা[৫] সত্ত্বেও বলা যায় পুঁজিবাদী সমাজের দানবীয় লোভের চাপে পড়ে কীভাবে গ্রামের নিরন্ন চাষীরা 'টিটাগড়ের চটকলে মরতে' আসছে কবি 'রক্ত করবী'র (১৯২৪) ভূমিকায় তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, একই ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'মুক্তধারা' (১৯২২) নাটকে। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৭ এ ধর্মঘটী চটকল শ্রমিকদের অকাতরে সাহায্য করার জন্য দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানান। এই সময় রচিত 'ছড়ার ছবি' কবিতাগুলির অন্তর্গত 'মাধো' কবিতাটিতে সংগ্রামী চটকল শ্রমিক চরিত্র পাওয়া যায়। সম্ভবত কালের যাত্রার অন্তর্গত 'রথের রশি' (১৯৩২) নাটকে ও 'বড়ো খবর' (১৯৪১) গল্পে শোষিত জনগণের আর শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের দিন সমাগত ইঙ্গিত দিয়েছেন। অবশ্য সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'রথের রশি' নাটকের 'রথযাত্রা' নামক পরিশিষ্টের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন 'শূদ্রের একাধিপত্য তিনি চান না, তিনি চান রাজায় শূদ্রে সামঞ্জস্য।' অবশ্য কারখানার শ্রমিকের রবীন্দ্রনাথের অপরিচিত ছিল পাছে সেই সত্যে কল্পনার খাদ থেকে যায়, এই আশঙ্কায় গল্পে তারা একদম নেই। যদিও 'রবিবার' গল্পে শ্রমিকদের প্রতি তাঁর সম্মান না লক্ষ্য করা যায়।[৬]

যাইহোক সাধারণ মানুষের ভেতরের অঙ্গনে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন সেই শরৎচন্দ্র চট্টোপধ্যায় শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন অতুলানন্দ রায়কে লেখা এক চিঠিতে।[৭] তার 'মহেশ' (১৯২৬) গল্পে গ্রাম্য চাষীর চটকল শ্রমিকে রূপান্তরিত হতে দেখি। কিন্তু অত্যাচারিত কৃষকের সুনিশ্চিত অনাহারী জীবনের চেয়ে শ্রমিকের অচেনা জীবন অন্তত তুলনায় শ্রেয় হতে পারে সেটা শরৎচন্দ্র দেখাতে চান নি।[৮] আবার শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও শ্রমিক আন্দোলন সংক্রান্ত তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের সীমাবদ্ধতা[৯] দেখতে পাই তাঁর 'পথের দাবী' (১৯২৬), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫) উপন্যাসে।

শরৎ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার তাগিদেই একদল গল্প-উপন্যাস লেখক কৃষক-শ্রমিকের জীবনের শরিক হওয়ার নেশায় মেতে উঠলেন ভারতীর লেখক গোষ্ঠী ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের রচনার মধ্যে দিয়ে বস্তুত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে এই নূতন ধারা প্রবর্তিত হয়।[১০] প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাসে দিনমজুরের দাবি ইত্যাদি প্রসঙ্গ আছে আর কুলি মজুরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আত্মপরিচয় দিয়েছেন 'প্রথমা' (১৯৩২) কবিতাটিতে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাকুঠি, নারীমেধ, অতসী, দিনমজুর গল্পসংকলনে দেখালেন যে কয়লাখাদের কুলি-কামিনদের নিয়ে মর্মস্পর্শী কাহিনী রচনা করা যায়।

এছাড়া নারায়ণ ভট্টাচার্য (দিনমজুর), সরলকুমার অধিকারী (চৈতী হাওয়া), রাণী সুরচিবালা চৌধুরাণী (কুলির প্রাণ), সুধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ (জংলা), তারানাথ রায় (মেশিনের পাশে), মণীন্দ্রলাল বসু (কিরণের কথা), অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত (সারেঙ ১৯৪৭),

প্রবোধ কুমার সান্যাল (অঙ্গার- ১৯৪৩, 'সেই পুরাতন') প্রমুখের কথা উল্লেখ করা যায়।

তবে বৈষম্য ও পীড়নের সমস্যাকে বৃহত্তর সমাজের বিন্যাসব্যবস্থার সঙ্গে যিনি যুক্ত করতে পেরেছেন সেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯৩১), গণদেবতা (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৫১) উপন্যাসে, 'তারিণী মাঝি' গল্পে দেখালেন আর্থনীতিক পরিবর্তনের তরঙ্গাঘাতে গ্রামের চাষী চাষ ছেড়ে শহরস্থ কলকারখানার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, 'ডাক-হরকরা' গল্পটিতে একজন ডাক-হরকরার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

যাইহোক শ্রমজীবী মানুষের নানাবিধ সমস্যাকে বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে দেখি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সহরতলী' (১ম - ১৯৪০, ২য়-১৯৪১), প্রতিবিম্ব (১৯৪৩), 'সহরবাসের ইতিকথা' (১৯৪৬), চিন্তামণি (১৯৪৬), দর্পণ (১৯৪৫), চিহ্ন (১৯৪৭), স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১), শান্তিলতা উপন্যাসে এবং খতিয়ান গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত 'ছাঁটাই' রহস্য (১৯৪৭) 'বাগদীপাড়া দিয়ে' (১৯৪৮), ফেরিওলা গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত সংঘাত (১৯৫৩), কংক্রীট (১৯৪৬), ধনজন যৌবন (১৯৪৪), খতিয়ান (১৯৪৭), ছোট বকুল পুরের যাত্রী' (১৯৪৯) গল্পে। 'চা' কবিতায় তিনি চা কুলিদের প্রতি মর্মবেদনা অনুভব করেছেন। এই চা বাগানের জীবন যাত্রার উল্লেখ পাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি প্রদীপ (১৯৩৫) উপন্যাসে। আর 'খুঁটি দেবতা' গল্পে গ্রামবাসীর রেল কারখানায় কাজ খুঁজতে দেখি।

এছাড়া আত্মশক্তিতে প্রকাশিত ভরতকুমার বসুর 'মজুর' গল্প,[১১] শিবরাম চক্রবর্তীর 'তাহাদের সবার সমান' কবিতা, পরিচয় পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), আবর্ত (১৯৩৫) ও মোহনা (১৯৪২) এই উপন্যাস ত্রয়ী, গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন' মিলিয়ে যে ত্রিদিবা উপন্যাস যাতে ১৯৩০ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যবর্তী অস্থির সময়ের অগ্নিযুগ থেকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে শ্রমজীবী বিপ্লবের প্রস্তুতির যুগে উত্তরণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বাস্তবতা বিধৃত, অগ্রণী পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্ববিশ্বাসের শ্রমিক ধর্মঘট নিয়ে 'মজদুর' উপন্যাসে, এবং সুবোধ ঘোষের 'ফসিল', গোত্রান্তর (১৯৪৪), ভাট তিলক রায়, উচলে চড়িনু, কর্ণফুলির ডাকে প্রভৃতি গল্পে শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলনের কথা দেখতে পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে প্রকাশিত অরণি পত্রিকায় যাদের কবি প্রতিভা প্রকাশিত হয়েছিল[১২] তাঁদের মধ্যে অরুণ মিত্রের 'লাল ইস্তাহার' (প্রান্তরেখা - ১৯৩৯); বিষ্ণু দে'র 'বৈকালী' (পূর্বলেখ - ১৯৪১), '২২শে জুন ১৯৪১' (সাত ভাই চম্পা - ১৯৪১), '১৪ই আগস্টে', 'বর্ষার নদী', গান (১৯৪২), '১৫ই আগষ্ট', মৌ ভোগ ১৯৪৭; দিনেশ দাসের চা

বাগানের কুলিদের নিয়ে কবিতা ও 'কাস্তে', জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান', 'চৌমাথা', গোলাম কুদ্দুসের '২৯শে জুলাই'; সমর সেনের 'নানা কথা' কাব্যগ্রন্থের (১৯৪২) অন্তর্গত 'রোমন্থন, 'নববর্ষের প্রস্তাব', 'ক্রান্তি', খোলাচিঠি কাব্যগ্রন্থের (১৯৪২-৪৩) অন্তর্গত 'খোলাচিঠি', 'পোড়ামাটি', 'পঞ্চমবাহিনী'; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মে দিনের গান', 'কানামাছির গান', 'আজকের গান', 'পদাতিক', 'জবাব চাই', 'রক্তের ধার শুধবো', 'ময়দান চলো' প্রভৃতি কবিতায় কৃষক-শ্রমিক জীবন ও আন্দোলনকে কাব্যে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

এব্যাপারে যে অপূর্ণতা ছিল তা পূর্ণ করলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য (তাঁর অধিকাংশ ভালো কবিতাই লেখা ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ এর ভেতর) তাঁর 'পৃথিবীর দিকে তাকাও', 'চারাগাছ', 'একটি মোরগের কাহিনী', 'কলম', 'ছুরি', 'মজুরের ঝড় (অনুবাদ), 'শত্রু এক', 'রোম - ১৯৪৩', 'জবাব', 'মণিপুর', ঐতিহাসিক, 'বিবৃতি', 'বোধন', 'কবে', 'একুশে নভেম্বর ১৯৪৬', 'আজব লড়াই', 'ডাক', 'রানার', 'অনুভব', 'বিদ্রোহের গান', 'আমরা এসেছি', 'লেনিন', 'উপস্থিতি, '১লা মে'র কবিতা' ৪৬, 'চরমপত্র', 'ভবিষ্যতে', 'সূচনা' প্রভৃতি কবিতায় এবং 'জাপানকে রুখতে হবে' গণনাট্য, 'ক্ষুধা', 'কিশোরের স্বপ্ন', 'ভদ্রলোক' প্রভৃতি গল্পে। কিন্তু নিজ কবিতার বিদ্যুৎ শক্তিকে যখন কলকারখানায়, ক্ষেত খামারে, ঘরে ঘরে সবে পৌঁছে দিতে শুরু করেছেন ঠিক তখনই মৃত্যু তাঁকে কেড়ে নিয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের পরেও যে নতুন কথা নতুন ভাবে বলা যায়, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যিনি দেখিয়েছিলেন সেই জীবনানন্দ দাশের 'এই সব দিনরাত্রি' কবিতা, 'প্রেতিনীর রূপকথা', 'সুতীর্থ' (১৯৪৮), 'জলপাই হাটি' (১৯৪৮), মাল্যবাণ (১৯৪৮) উপন্যাসে দেখা যায় চল্লিশের দশকের সামাজিক পরিস্থিতিতে তিনি কতটা শ্রমিক সচেতন ছিলেন।

মোটকথা চল্লিশের ঘটনা পীড়িত সমকাল সাহিত্যের অন্যান্য শাখাকে যেমন স্পর্শ করেছিল উপন্যাসও তার বাইরে ছিল না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মন্দমুখর', 'বীতংস' (গল্প - ১৯৬২), 'মহানন্দা' (শ্রাবণ, ১৩৫৩); বনফুলের 'সে ও আমি' (১৯৪৩), 'অগ্নি'; নবেন্দু ঘোষের 'ডাক দিয়ে যাই' (১৯৪৪), 'কান্না' (গল্প); রমেশচন্দ্র সেনের 'শতাব্দী' (১৯৪৫); জ্যোতির্ময় রায়ের 'উদয়ের পথে' (১৯৪৪); সতীনাথ ভাদুড়ীর 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', আবুল মনসুর আহমেদের 'জীবন ক্ষুধা' (১৯৫৫); কৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'সীমান্ত পেরিয়ে' উপন্যাসে শ্রমিক শ্রেণীর কথা আছে। এ প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর 'কলিযুগের গল্প' বইটির অন্তর্গত '১৯৪৩' গল্পটি এবং ২১শে নভেম্বর, ১৯৪৬-এর কলকাতার শ্রমিক ছাত্র মিছিল উপলক্ষে মাসিক বসুমতী (আষাঢ়, ১৩৫৪) পত্রিকায় আবুল কালাম শামসুদ্দীনের 'ডাক' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

চল্লিশের দশকে সদ্য আবির্ভূত লেখক সমরেশ বসু শ্রমিক শ্রেণীর মানুষদের

সমবেতভাবে ধরার চেষ্টা করেন তাঁর 'শ্রীমতি কাফে' (১৯৫৩) ও আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'যুগ যুগ জীয়ে' (১৯৮১)-তে, যাতে ১৯৩৬ এর পরবর্তী দশবছরের বৃহত্তর কলকাতার যে সব আলোড়নকারী ঘটনা ঘটেছে (যেমন উত্তাল শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র আন্দোলন) তার ছাপ পড়েছে। অমিয়ভূষণ মজুমদারের গড় শ্রীখন্ড (১৯৫৭) উপন্যাসে আছে পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে দেশ বিভাগের মধ্যবর্তীকালে রেল কর্মীদের ইউনিয়ন গড়ে তোলার কাহিনী।

গণসংগীতগুলোতেও মূলত শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী জনগণের জীবনের কথা, সংগ্রামী চেতনা, শোষণ মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানে মজুর কিষাণের কথা এসে গেছে। ধর্মতলায় গুলি চালনা, কদম রসুলের মৃত্যু, সবকিছু মিলে একটা প্রচন্ড আবেগ ফেটে বেড়িয়েছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সুরমা উপত্যকায় (শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায়) চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে গান লিখেছেন সুধাংশু ঘোষ। কৃষক নেতা সত্যেন সেন সুতাকল মজুরদের নিয়ে, সাধন দাশগুপ্ত, রমেশ শীল কৃষক-শ্রমিকদের নিয়ে অনেক গান লেখেন। গুরুদাস পাল শ্রমিক মালিকের লড়াইতে যরা মালিক পক্ষের দালালি করে তাদের ব্যঙ্গ করে গান লিখেছিলেন।[১৩] ১৯৪৬ এর রসীদ আলি দিবস উপলক্ষে ছাত্র-মজুরদের কথা ভেবে গণনাট্য সঙ্ঘের বিনয় রায়ের গান অথবা তেভাগা আন্দোলনে কৃষক-মজুর ঐক্যের কথা ভেবে স্বাধীনতা পত্রিকায় যশোরের চাষী পঞ্চানন দাসের এক দীর্ঘ গান 'হওরে সবে আগুয়ান' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ২১শে নভেম্বর, ১৯৪৫ এ উত্তাল শ্রমিকছাত্র মিছিল, ১৯৪৬ এর রসীদ আলি দিবসের শহীদ শ্রমিক কদম রসুল এবং ঐ বছরের ২৯শে জুলাইয়ে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সলিল চৌধুরীর গানগুলি যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে।

বোধ হয় চারের দশকে গণনাট্য সংঘের আন্দোলনকারীরা এগিয়ে এলেন নাটকের মাধ্যমে, আরও ঘনিষ্ঠ গণসংযোগের সংকল্প নিয়ে। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, সলিল সেন প্রমুখ নাট্যকারবৃন্দ। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর 'আগুন' নাটকে দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অন্যান্য অংশের মানুষের মতই শ্রমিকরাও একইভাবে অসহায় দেখিয়েছেন। অবরোধ (১৯৪৭) নাটকে শ্রমিক জীবন যাত্রা ধরার চেষ্টা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে তুলসী লাহিড়ী কোলিয়ারি শ্রমিকদের নিয়ে পথিক নাটক লেখেন। শ্রমিকদের ধর্মঘট নিয়ে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'মোকাবিলা'। (১৯৪৯) নাটক লেখেন।

যাইহোক শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে লেখালেখি এক প্রকার শুরু হয়েছিল বহু আগেই। এরপর ধীরে ধীরে সাহিত্য রচিত হয়। এখন প্রশ্ন হল দেশ বিভাগ শ্রমিক শ্রেণীকে উপজীব্য করে লেখা বাংলা সাহিত্যকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল। দেশবিভাগের ফলে জীবনের প্রধান দাবি অর্থাৎ জীবিকার দাবি দারুণভাবে আহত হল। জীবনযাত্রার সুস্থ মানোন্নয়ণের জন্য যে শ্রমজীবী সমাজের দাবি তা মধ্যবিত্তের আবেগময় সমর্থন থেকে

বঞ্চিত হল। এর কারণ দুটি-এক, দেশ বিভাগের ফলে কলকাতার মধ্যবিত্তের বহুলাংশের পূর্ববাংলার গ্রামীণ শিকড় ছিঁড়ে যাওয়ায়, তারা হারিয়ে ফেলল অর্থনৈতিক স্থিরতা। দুই, অর্থনৈতিক সংকটের প্রথম ঝাপটায় বাঙালী ব্যাঙ্কগুলিই প্রথম শিকার হওয়ার দরুণ মধ্যবিত্ত মানসে দেখা দিল দারুণ প্রতিক্রিয়া। তৎকালীন বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন ও বড়বড় শ্রমিক আন্দোলনগুলি এই কারণের জন্য পাঠক সমাজের বৃহৎ কল্পনাকে স্পর্শ করতে পারে নি।[১৪]

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। ডঃ জীবেন্দু রায়, 'বঙ্কিমচন্দ্রের ভারত চিন্তা ঃ সূত্র ও প্রকৃতি', ১৯৮৪, পৃ: ৬৫-৬৬।

২। মলয় বসু; 'অক্টোবর বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য', ১৯৮৯, পৃ: ১৩৭।

৩। নীলরতন সেন; 'প্রসঙ্গ ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্য', ১৯৮৭, পৃ: ১৯৮।

৪। সরোজ মোহন মিত্র; 'সুকান্তের জীবন ও কাব্য', ২য় সং ১৯৮০, পৃ: ১৫৭-১৫৮।

৫। শান্তিময় গুহ, 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটক ও শ্রমিক শ্রেণী'—মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্য—১ম খণ্ড, ১৯৮৯, পৃ: ১০১।

৬। ক্ষেত্র গুপ্ত; 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব', ২য় সং ১৯৯৩, পৃ: ৫৮।

৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত, 'শরৎচন্দ্রের পুস্তককারে অপ্রকাশিত রচনাবলী', পরিবর্ধিত ৩য় সং-১৯৫৫, পৃ: ২৮৯।

৮। নাজমা জেসমিন চৌধুরী, 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি', ৩য় সং ১৯৯১, পৃ: ১০১-১০২।

৯। মুজফ্ফর আহ্মদ; 'কাজী নজরুল স্মৃতিকথা', ১৯৬৫, পৃ: ৩৯৯।

১০। নেপাল মজুমদার; 'রবীন্দ্রনাথঃ কয়েকটি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, ১৯৮৭, পৃ: ২৫৮।

১১। আত্মশক্তি, ২য় বর্ষ ১৬শ সংখ্যা।

১২। সুস্নাত দাশ, 'ঔপনিবেশিক যুগের বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রভাব ঃ দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩০-৪৭)' — ইতিহাস অনুসন্ধান- ১৪, পৃ: ৬০০।

১৩। সুধীর চক্রবর্তী, 'বাংলা গণসংগীতের ধারা' — ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত - 'বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা, ১৯৯২, পৃ: ৫৪৮।

১৪। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়; 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', পরিবর্ধিত সংস্করণ - ১৯৮০, পৃ: ৩০৮।

একটি জাতীয় আন্দোলনে আঞ্চলিক নেতৃত্বের অবদান

তাপস সিনহা রায়

ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতীয় নেতৃত্বের অবিসংবাদী ভূমিকার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রবণতা এবং জাতীয় আন্দোলনে জাতীয় নেতৃত্ব নির্ভরশীলতার বক্তব্য সাম্প্রতিককালে নানান প্রশ্নের সম্মুখীন। বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের উপর অত্যাধিক আলোকপাতের ফলে দেখা যাচ্ছে সেখানে স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। বিশেষত ৪২-এর আন্দোলনের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য এবং আন্দোলনের স্থানীয় নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি অধুনা বিশেষভাবে আলোচিত। ৪২-এর আন্দোলনের এই সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ঐ আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র মেদিনীপুরের স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা সাপেক্ষ হয়ে ওঠে।

মেদিনীপুরের ভারত ছাড় আন্দোলনের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে এখানের আন্দোলন ছিল সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত এবং তার উপরে স্থানীয় নেতৃত্বের অবিসংবাদী ভূমিকা ছিল। আন্দোলনের প্রতিটি পর্ব অর্থাৎ একেবারে প্রাথমিক পর্বে শোভাযাত্রা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে জনমত সংগঠন, পরে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রস্তুতি ও তার রূপায়ণ, বিকল্প সরকার পরিচালনা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে পূর্ব পরিচিত স্থানীয় নেতৃত্ব আন্দোলনকে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করেন। নেতৃত্বের উপর অন্যান্য অঞ্চলের ঘটনাবলীর বা বিভিন্ন বুলেটিন ও লিফলেটের একটা প্রভাব কাজ করেছিল মাত্র।[১] এই বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই উইকেনডেন রিপোর্টে যে বলা হয়েছে পরিস্থিতিমত নেতৃত্ব নিচুতলার কর্মী, ছাত্র ও সাধারণ জনতার হাতে চলে যায়[২] অথবা হ্যাচিনস-র - বক্তব্য মত কংগ্রেসি নেতৃত্বের গ্রেপ্তারে দ্রুত স্থান করে নেয় নূতন গুপ্ত সংগঠন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তৃপক্ষ হয়ে যান[৩] তার সম্পূর্ণ বিরোধী। বা কংগ্রেসের শতবার্ষিকী ইতিহাসে যে বলা হয়েছে নেতৃত্ব ছাড়াই তৃণমূল স্তরে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, সাধারণ কংগ্রেসিরা জনতার সমর্থনপুষ্ট হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করে[৪] তাকেও সমর্থন করে না। কানুনগো বলেছেন গুপ্ত কংগ্রেসি কর্মী এবং কংগ্রেসের প্রতি সহানভূতি সম্পন্ন যুবকের সাধারণভাবে আন্দোলনকে বৈপ্লবিক করে তোলে[৫] এই বক্তব্যও মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমার অন্বেষণে পান্ডে সম্পাদিত গ্রন্থে যাঁরা কোনদিন গান্ধীবাদী ছিলেন না তাঁদের দ্বারা বা সাধারণ জনতার দ্বারা আন্দোলন পরিচালিত হওয়ার কথা এবং এটিকে কংগ্রেসি আন্দোলন বলে স্বীকার না করার উপর গুরুত্ব আরোপও[৬] অসমর্থিত।

বস্তুত অন্যান্য স্থানের মত বিচ্ছিন্ন অভ্যুত্থানে শক্তির অপচয় না করে মেদিনীপুরের

আত্মগোপনকারী নেতৃত্ব ধৈর্যধরে, নিখুঁত পরিকল্পনামাফিক আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তোলেন এমনকি ব্রিটিশ সরকারের প্রকাশিত "Some Facts About the Disturbances in India, 1942-43" গ্রন্থে মেদিনীপুরে স্থানীয় নেতৃত্বের সাংগঠনিক দক্ষতার স্বীকৃতি পাওয়া যায়।[৭] ১৯৪৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে অনুরূপ মন্তব্যই করেন।[৮] আন্দোলনের আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কংগ্রেসি নেতৃত্ব গ্রাম থেকে শহরে সুসংগঠিতভাবে গণ-আন্দোলনের প্রস্তুতি চালান। ভবিষ্যত সংগ্রামের জন্য সমরপরিষদের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ, গোপন শিবির স্থাপন, চৌকিদার ও দফাদারদের পদত্যাগে বাধ্য করা ইত্যাদি সমস্ত কাজকর্মই নির্দিষ্ট সাংগঠনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় নেতৃত্বের কঠোর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়—যা বহুকথিত স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের তত্ত্ব বা সাব-অলটার্নদের অটনমির সম্পূর্ণ বিরোধী। আন্দোলনের উপর স্থানীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি কাঁথি মহকুমার অন্যতম সংগঠক বলাইলাল দাসমহাপাত্র, কাঁথির ছাত্রনেতা সুবোধ গুছাইত, মহিষাদলের ছাত্রনেতা গোপীনন্দন গোস্বামী প্রমুখদের বক্তব্য থেকে প্রাঞ্জল হয়ে উঠে।[৯]

দীর্ঘ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং গান্ধীর গঠনমূলক কাজকর্মের কেন্দ্র হিসাবে আন্দোলনের প্রধান দুটি কেন্দ্র তমলুক ও কাঁথি মহকুমার নেতৃত্ব অবিসংবাদী ক্ষমতার তথা আধিপত্যের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। অর্থাৎ মহকুমা নেতৃত্বের সুযোগ্য পরিচালনাতে একটা সংগঠিত প্রতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে স্থানীয় নেতৃত্বের একাত্মকরণ হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যায় ঐ নেতৃত্বের সঙ্গে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ও সমর্থক জনতার মধ্যে সুসংগঠিত সম্পর্ক কাজ করে — যা অনায়াসে আন্দোলনকে ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করে। নন্দীগ্রাম থানা জাতীয় সরকারের কর্মকর্তা বঙ্গভূষণ ভক্ত বলেন, থানা থেকে শুরু করে মহকুমাভিত্তিক শক্তি সংগঠিত ছিল শুধু তাই নয় থানা নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামের নেতাদের সঙ্গে মহকুমা নেতৃত্বের গভীর যোগাযোগ ছিল।[১০]

৪২-এর আন্দোলনে যে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের কথা হয় তা মেদিনীপুরে আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র তমলুক ও কাঁথি মহকুমার মধ্যে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় উভয় মহকুমার আন্দোলন স্থানীয় নেতৃত্বের পরিচালনায় স্থানীয় বৈচিত্র্য নিয়ে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ তথা পরিচালনার প্রশ্নেও উভয় মহকুমার নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্য ছিল। আন্দোলনের ধারা অনুসরণ করলে প্রতীয়মান হয় যে তমলুক মহকুমাতে মহকুমা নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ প্রথমাবধি একইভাবে বর্তমান থাকলেও কাঁথি মহকুমাতে তা হয়নি। কাঁথি মহকুমাতে একেবারে প্রাথমিক স্তরে মহকুমা নেতৃত্বের আধিপত্য থাকলেও প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের গ্রেপ্তারের পরবর্তীকালে মহকুমা নেতৃত্বের দুর্বলতার ফলে থানাগুলির নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা ভোগ করে।

ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের স্তরে বা তৎপরবর্তী ক্ষেত্রে এগরা, ভগবানপুর ও পটাশপুর থানা তিনটিতে স্বল্পকালীন বিকল্প শাসনব্যবস্থার সংগঠনে বা ঐ জাতীয় কাজকর্মে থানা ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়ভাবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তমলুক মহকুমা নেতৃত্বের প্রেরিত নির্দেশ অধীনস্থ থানাগুলি সাধারণও সম্পূর্ণ রূপে মান্য করত। থানা নেতৃত্বের স্বাধীনভবে চলার অবকাশ ছিল না।[১১] এখানে থানা জাতীয় সরকারের কর্মকর্তারা এক বাক্যেই স্বীকার করেন যে তাঁদের থানা এলাকাতে সমস্ত কাজকর্ম মহকুমা নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হত।

আন্দোলন পরিচালনায় স্থানীয় নেতৃত্বের এই অবিসংবাদিত ভূমিকা সত্ত্বেও আন্দোলনের উপর গান্ধীজীর পরোক্ষ উপস্থিতি বা তাঁর প্রভাবের উপর আলোকপাত করেছি। কারণ মেদিনীপুরে যাঁরা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তাঁরা মুখ্যত গান্ধীবাদী যাঁদের উপর গান্ধীজী তথা গান্ধীবাদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। অর্থাৎ আন্দোলনের সামগ্রিক ধারা থেকে দেখা যায় আন্দোলনে গান্ধীজীর দৈহিক উপস্থিতি না থাকলেও তাঁর বিভিন্ন ধরণের প্রভাব তথা পরোক্ষ উপস্থিতি মেদিনীপুরে প্রথমাবধি কাজ করেছিল। গান্ধীজীর গঠনমূলক কাজকর্ম ও তার প্রভাব তথা গান্ধীবাদী সাংগঠনিক ভিত্তির উপরেই আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং পরিচালিত হয়। স্থানীয় নেতৃত্বের উপর গান্ধীজীর প্রভাব ছিল গভীর। একেবারে প্রাথমিক পর্বের কাজকর্মে এবং পরবর্তীক্ষেত্রের ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কাজেও আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে অহিংস ছিল। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার বিশেষ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে যে কিছুটা হিংসার পথে গিয়েছিল তা পরবর্তীকালে সরজমিনে তদন্ত করে (১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে) গান্ধীজী সমর্থন করেন এবং সরকারের পক্ষে রায়দান করেন। ইংরেজ সরকার যে সর্বশক্তি দিয়েও জাতীয় সরকারকে উচ্ছেদ করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত সেই সরকার গান্ধীজীর নির্দেশ মেনেই আত্মসমর্পণ করে। সুতরাং এই সমস্ত বিচারে সাব - অলটার্ন স্টাডিজে গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ অস্বীকার তত্ত্ব মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে সমর্থন করা যায় না। ডি.এন. পাণিগ্রাহী ও কংগ্রেসের শতবার্ষিকী ইতিহাসে এম.এন.দাশ আন্দোলনের পটভূমিতে কংগ্রেসের যে সাংগঠনিক ভিত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং গ্রামীণ এলাকাতে গান্ধীজীর প্রভাবের কথা বলেছেন[১২] তা মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মেদিনীপুরে মহকুমা নেতৃত্ব ও থানা নেতৃত্বের সামাজিক ভিত্তি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করলে নেতৃত্বের শ্রেণী চরিত্রগত পার্থক্য উদ্ঘাটিত হয়। তমলুক মহকুমার তৎকালীন ৯ জন নেতার (সতীশ চন্দ্র সামন্ত, অজয় কুমার মুখার্জী, সতীশ চন্দ্র সাহু, সুশীল কুমার ধাড়া প্রমুখেরা) মধ্যে সকলেই ছিলেন গভীর আদর্শবাদী, নিষ্ঠাবান গান্ধী অনুরাগী, জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও গঠনমূলক কাজকর্মের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই মহকুমা নেতৃত্বের মধ্যে সুশীল ধাড়া (৩১ বছর) ছাড়া অন্যান্য সকলেই ছিলেন ৪৫ বছর বয়স্ক বা তার উর্ধ্বে। সংক্ষিপ্ত বিচারে বলা যায় জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে সম্পাদিত গ্রন্থে[১৩] যে

এলিট নেতৃত্বের গুরুত্ব অস্বীকৃত তমলুক মহকুমাতে সেই এলিট নেতৃত্বের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে তমলুক মহকুমার থানা গুলির নেতৃত্বে নতুন নেতৃত্বের প্রাধান্য বেরিয়ে এসেছে যা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পর্কিত ধ্যানধারণার সমগোত্রীয়। এখানে থানাগুলির নেতৃত্বের মধ্যে ২৮ জনের সামাজিক পটভূমির অন্বেষণে দরিদ্র, অনেকখানি অপরিচিত, অপেক্ষাকৃত নবীন, স্বল্পশিক্ষিত, নেতৃত্বের প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়। কাঁথি মহকুমা ও থানা নেতৃত্বের মধ্যে ১৪ জনের সামাজিক ভিত্তির অন্বেষণে দেখা যায় অর্থনৈতিক অবস্থান, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদির বিচারে এঁরা এলিট শ্রেণী ভুক্ত ছিলেন।

মেদিনীপুরে আগষ্ট আন্দোলনের গুরুত্ব পরবর্তী ক্ষেত্রে যে বিভিন্নভাবে অব্যাহত থেকেছে তা নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাস যথার্থই হয়ে উঠেছে 'অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবিশেষ।' ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন অবরুদ্ধ হয়ে পড়েনি তাঁদের আন্দোলনও শেষ হয়ে যায়নি, বরঞ্চ তাঁদের দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের প্রভাবে সমৃদ্ধ হয় স্বাধীনোত্তর সমাজ। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাঁদের জীবনসৃঞ্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে দেশগঠনের মহান কর্মে আত্মনিয়োগ করেন যার গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল গঠনমূলক কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগ। স্বাধীনোত্তর কালে তাঁরা গ্রামের জনগণের কাছে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন নিরলস সেবাব্রতে ব্যাপৃত থাকেন। সুতাহাটার স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরাজমোহন দাস লিখেছেন, দেশ স্বাধীন হলে দেশবাসীর জন্য গ্রাম সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করাকে আমরা পরমধর্ম মনে করেছিলাম।[১৪] তমলুকের (কৃষ্ণগঞ্জ) গুণধর ভৌমিক বলেন, আন্দোলনের প্রভাব যে পরবর্তী ক্ষেত্রেও রয়েছে তার বড় প্রমাণ হল স্বাধীনোত্তর কালে নানান ধরণের গঠনমূলক কর্মসূচির মধ্যে আমাদের যুক্ত হওয়া যার নিদর্শন আজকে এলাকার চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে।[১৫]

আবার স্বাধীনোত্তর যুগে মেদিনীপুরের রাজনীতিতে ৪২-এর আন্দোলনের প্রভাব যে থেকে গিয়েছিল তা আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেসের নির্বাচনে সাফল্য এবং সেইসঙ্গে নির্বাচনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দীর্ঘ ও অনেক ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়। অন্যার্থে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে ৪২-এর নেতৃত্বের সাফল্য প্রমাণ করে জনগণ তাঁদের সেই বীরোচিত কর্মপ্রয়াস বিস্মৃত হয়নি। নেতৃত্বের সাফল্যের কতিপয় উদাহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। যেমন, তমলুক মহকুমার অন্যতম নেতা, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক সতীশ চন্দ্র সামন্ত ছিলেন গণপরিষদের সদস্য, একটানা ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত লোকসভার সদস্য। ঐ সরকারের ২য় সর্বাধিনায়ক অজয় কুমার মুখার্জী স্বাধীনতার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ও মন্ত্রী থেকে ১৯৬৭ সালে প্রথম অ-কংগ্রেসি মন্ত্রী সভার মুখ্যমন্ত্রী হন। এরপরেও তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে তিনি জয়ী হন। সরকারের তৃতীয়

সর্বাধিনায়ক, মহকুমার বিশিষ্ট নেতা সুশীল কুমার ধাড়া একটানা চারবার বিধানসভাতে নির্বাচিত হন, ২ বার মন্ত্রী হন। ১৯৭৭ সালে লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে লোকদলের চিফহুইপ হন।

. এই আলোচনান্তে স্পষ্ট হয় যে মেদিনীপুরের আগষ্ট আন্দোলন সম্পূর্ণ রূপে স্থানীয় নেতৃত্বের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণে ছিল। নির্ধারিত হয়েছে স্থানীয় নেতৃত্বের আধিপত্যের পটভূমিটি। আন্দোলন পরিচালনায় তমলুক ও কাঁথি মহকুমা নেতৃত্বের ভিন্ন ভূমিকা ধরা পড়েছে। মেদিনীপুরে নেতৃত্ব ও আন্দোলনের উপর গান্ধীজীর পরোক্ষ প্রভাব আলোচনা করেছি। নেতৃত্বের সামাজিক ভিত্তির আলোচনা থেকে এলিট নেতৃত্বের আধিপত্য লক্ষ্য করা গেছে। দেখিয়েছি গঠনমূলক কাজকর্ম এবং নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্যে কি ভাবে স্থানীয় নেতৃত্বের প্রভাব থেকে গিয়েছিল।

সূত্রনির্দেশ ঃ—

১। এই প্রবন্ধটি ২০০০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লব্ধ পি.এইচ.ডি ডিগ্রীর গবেষণাপত্র - 'কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ইন মিদনাপুর : এ মাইক্রো লেভেল স্টাডি'-র অংশবিশেষ।

২। পি.এন.চোপরা (সম্পা) -কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট : ব্রিটিশ সিক্রেট রিপোর্ট (ফরিদাবাদ ১৯৭৬)।

৩। জি. ফ্রান্সিস, হ্যাচিনস - স্পনটেনিয়াস রেভলিউশান : দি কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট (দিল্লী - ১৯৭১)।

৪। বি.এন.পান্ডে - (সাধারণ সম্পাদক) - এ সেন্টেনারী হিস্ট্রি অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ভলিউম - ৩, ১৯৪৫-'৪৭ (বোম্বে-১৯৮৫)।

৫। ভূপেন কানুনগো - 'দি কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, ১৯৪২'-বি.এন.পান্ডে (সাধা. সম্পা) - পূর্বোক্ত।

৬। পান্ডে - পূর্বোক্ত।

৭। ফাইল নং - ২৬৯/৪৩ - প.ব. রাজ্য অভিলেখ্যাগার - পৃ-১২।

৮। গোপীনন্দন গোস্বামী - তমলুক মহকুমায় স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাপঞ্জী (মেদিনীপুর - ১৯৮৩) পৃ - ৫৬।

৯। সাক্ষাৎকারের তারিখ - যথাক্রমে - ১১.৬.৯০, ২৫.১২.৮৯, ৫.১০.৯০।

১০। সাক্ষাৎকার - ২.১১.৮৯।

১১। সাক্ষাৎকার - সুশীল কুমার ধাড়া ১.১২.৯০, গোস্বামী ও ভক্ত - পূর্বোক্ত।

১২। ডি. এন. পাণিগ্রাহী - কুইট ইন্ডিয়া এন্ড দি স্ট্র্যাগল ফর ফ্রিডম (দিল্লী - ১৯৮৪) এম. এন. দাস - 'ইনট্রোডাকশন' - পান্ডে পূর্বোক্ত।

১৩। জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে - (সম্পা) - দি ইন্ডিয়ান নেশন ইন ১৯৪২ (কলিকাতা - ১৯৮৮)

১৪। বিরাজমোহন দাস স্বদেশীয়ানার অর্ধ — শতবর্ষ (১৯৩৯-১৯৮৯) (মেদিনীপুর - ১৩৯৬) পৃ- ১১৩।

১৫। সাক্ষাৎকার - ৬.১০.৯০।

রশীদ আলি দিবস, ১৯৪৬; প্রতিবাদী মিছিল বনাম 'সংরক্ষিত অঞ্চল' ডালহৌসী স্কোয়ারের তথাকথিত 'অলঙ্ঘনীয়তা' - একটি পর্যালোচনা।

ব্রততী হোড়

১৯৪৫-৪৭ কালপর্বে ভারতবর্ষে গণ-অভ্যুত্থানের এক নতুন তরঙ্গ দেখা গেল। ১৯৪৬-র ফেব্রুয়ারি মাসে INA-র ক্যাপ্টেন রশীদ আলির সাত বছর দণ্ডাদেশকে কেন্দ্র করে দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার গণজোয়ার দেখা গেল। প্রকৃতপক্ষে এই গণবিক্ষোভ ছিল '৪৫-র নভেম্বরে। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবির আন্দোলনের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতি। মুসলিম ছাত্ররা ছিলেন বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ, যেহেতু অভিযুক্ত ছিলেন একজন মুসলিম। তাঁরা মনে করেছিলেন যে এই দন্ড ছিল মুসলিম লীগের প্রতি সরকারের একটি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং সেই হিসেবে এটি ছিল মুসলিম লীগের ক্ষেত্রে একটি প্রত্যক্ষ আঘাত। মুসলিম লীগ দেখাতে চেয়েছিল যে তারাও বিক্ষোভ আন্দোলনে কংগ্রেসের মতই পারদর্শী — বিশেষত, ১৯৪৫-এ INA-র তিন বন্দীকে নিয়মরক্ষার জন্য শাস্তি দিলেও পরে তা মকুব করে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কংগ্রেস পরিচালিত বিক্ষোভ আন্দোলনের জন্যই।

এ ব্যতীত আসন্ন নির্বাচনের এ একটি পরোক্ষ ভূমিকা ছিল।[১] লীগ সন্দেহ করেছিল যে ভাইসরয় হয়তো মুসলিম লীগকে এড়িয়ে কংগ্রেসকে কেন্দ্রে সরকার গঠনে আহ্বান করবেন এবং সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের দাবি ও উপেক্ষিত হবে।[২]

এই দন্ডাদেশকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বম্বে। কলকাতায় ১১ই ফেব্রুয়ারি রশীদ আলির মুক্তির দাবি জানিয়ে মুসলিম ছাত্র লীগ ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান জানালো। তাঁদের আবেদন সমর্থন করলো স্টুডেন্টস্ কংগ্রেস, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন (ভবানী দত্ত লেন) এবং ঐ (মির্জাপুর স্ট্রীট) গত নভেম্বরের মতই কলকাতার রাস্তায় অতিদ্রুত গড়ে উঠলো ছাত্র-শ্রমিক-হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এক উল্লেখযোগ্য ঐক্য।

ঘটনার সূত্রপাত

১১ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার প্রায় সমস্ত স্কুল এবং কলেজে ধর্মঘট হয়। দুটো নাগাদ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রায় ৫০০০ ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকে। ধ্বনি উঠতে থাকে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড়', 'ক্যাপ্টেন রশীদ আলির এবং

অন্যান্যদের মুক্তি চাই', 'হিন্দু-মুসলিম এক হও'।

অতঃপর ছাত্রমিছিল ডালহৌসী স্কোয়ারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, যা ছিল প্রকৃতপক্ষে সরকার কর্তৃক ঘোষিত একটি নিষিদ্ধ অঞ্চল।[৩] ধর্মতলা স্ট্রীট পুলিস দ্বারা বেস্টিত থাকায়, মিছিল চলতে শুরু করে কলুটোলা স্ট্রীট এবং জ্যাকারিয়া স্ট্রীট বরাবর কিন্তু অচিরেই তা বাধাপ্রাপ্ত হয় ফেয়ারলি প্লেসের কাছে যখন ডেপুটি কমিশনার শামসুজ্জোহার নেতৃত্বে পুলিস বাহিনী মিছিল এগোতে বাধা দেয়। BPSF-এর সাধারণ সম্পাদক অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য দৃপ্তকণ্ঠে জানান যে তাঁদের যেতে দিতেই হবে এবং তাঁরা যাবেন শান্তিপূর্ণভাবেই। ইতিমধ্যে প্রায় দুশো সশস্ত্র পুলিস বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে মিছিলকারীদের উপরে কেননা ডালহৌসী স্কোয়ার ছিল 'সংরক্ষিত অঞ্চল'। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে বসে পড়ে। প্রথমে লাঠিচালনা ও পরে গুলি চালনার ঘটনা ঘটে পুলিসের তরফ থেকে। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, উত্তাল হয় গোটা শহর। স্তব্ধ হয় পরিবহণ ব্যবস্থা। সাধারণ ধর্মঘট হয় বজবজ থেকে কাঁকিনাড়া পর্যন্ত সমস্ত কলকারখানায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে গড়ে ওঠে ব্যারিকেড, সেখানে উড়তে থাকে একত্রে মুসলীম লীগ, কংগ্রেস এবং কমিউনিষ্ট পর্টির পতাকা সংগ্রামী ঐক্যের প্রতীক হিসাবে। তাই একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার শিরোনাম হয় সমস্ত দলগুলির পতাকার মিলন[৪]। ১২ তারিখে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জনসভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দ যেমন মুসলীম লীগের সোহরাওয়ার্দী, গান্ধীবাদী নেতা সতীশ দাসগুপ্ত, কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ ছাত্র-যুবদের প্রশংসা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।[৫] সেখান থেকে লাখো জনতার মিছিল দৃপ্তপদে পৌঁছে যায় 'নিষিদ্ধ অঞ্চল' ডালহৌসী স্কোয়ারে।

গত নভেম্বরে (২১শে নভেম্বর ১৯৪৫) তুলনায় ফেব্রুয়ারির দিনগুলি ছিল আরো উত্তেজক এবং আরো ভয়ানক। ছাত্র-যুব জনতার ঢল নেমেছিল রাস্তায়। ট্রামডিপো, পোস্ট অফিস, রেলওয়ে বুকিং অফিসে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। দোকানপাট, রেস্তোরা, সিনেমা হল এবং ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষতিসাধন হয়। থবোর্ন মেথোডিস্ট চার্চ, এবং Y.M.C.A লুঠতরাজ হয়। ভারতীয় যাঁরা সাহেবী পোষাকে সজ্জিত ছিলেন এবং সাহেবরা আক্রান্ত হন।[৬] একধরণের জঙ্গীপনা এই আন্দোলনে লক্ষ্য করা গেছিল।

ডালহৌসী স্কোয়ারের অলঙ্ঘনীয়তা এবং আমলাতন্ত্র :

১১ই ফেব্রুয়ারির রাজনৈতিক মিছিলকেই গোলমালের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে গভর্নর কেসী মন্তব্য করেছিলেন যে রাজনৈতিক মিছিল যত সদুদ্দেশেই সংগঠিত করা হোক না কেন, তা শেষপর্যন্ত কিছুই হাসিল করতে পারে না। এবং এর অনিবার্য পরিণতি হয় অশান্তি এবং দুর্ঘটনা যা দ্বিতীয়বারের মতই শিক্ষা দিল।[৭] স্পষ্টতই তার ইঙ্গিত ছিল নভেম্বর গণবিক্ষোভের।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মিছিল ছিল শান্তিপূর্ণ এবং প্রতিবাদও ছিল আইনসংগত।[৮] গত

নভেম্বরের মতই এবারেও পুলিসের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ এবং পরবর্তীতে গুলি চালনাই ছিল গোলযোগের প্রকৃত কারণ। আসলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রতি মনোভাব সম্বন্ধে ভারতীয়দের মূল্যায়নে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভুল করেছিল।

ফেব্রুয়ারির গণবিক্ষোভে নভেম্বরের মতই সেই একই 'সংরক্ষিত স্থান' ডালহৌসী স্কোয়ার ছিল জরাজীর্ণ এবং কলঙ্কময় প্রশাসনের নিরাপত্তার দুর্গ বিশেষ। ফলও হয়েছিল পূর্বেকার মতই। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে আড়াই মাসের ব্যবধানে ঘটনা দুটিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে 'স্যায়ামীস্ টুইন' হিসাবে। অমৃতবাজারের সম্পাদকীয়তে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে নভেম্বরের ঘটনাবলীর পরও কেন ডালহৌসী স্কোয়ার-এ নিষেধাজ্ঞা জারি রাখা হয়েছিল ? যখন কর্তৃপক্ষের জানাই ছিল যে এটা সম্পূর্ণ নিরর্থক। ডালহৌসী স্কোয়ারের 'তথাকথিত পবিত্রতা' তো পূর্বেই (অর্থাৎ নভেম্বরেই) লঙ্ঘিত হয়েছিল।[১]

আন্দোলনের পটভূমিকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব :

আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ১৯৪৫ এর ২১শে নভেম্বর এবং ১৯৪৬-র ১১ই ফেব্রুয়ারির বিক্ষোভ আন্দোলন দুটোই প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের পতাকার নীচেই সংগঠিত হয়েছিল যদিও এই বিক্ষোভ আন্দোলনই ছিল প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বহীন। জাতীয় কংগ্রেস কোনভাবেই নিজেকে এর সঙ্গে সরকারিভাবে জড়াতে চায়নি। যদিও বিক্ষোভ আন্দোলনে BPSC-র যোগদান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আজাদ আন্দোলন চলাকালীন গুণ্ডামির নিন্দা করেছিলেন।[১১] এমন কি কংগ্রেসের তথাকথিত বামপন্থী ঘরানার নেতৃত্বও (শরৎ বসু) আন্দোলনের 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতার' নিন্দা করেছিলেন।[১২] অবশ্যই কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে সতীশ দাশগুপ্ত, কে.পি. চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম, যাঁরা ১২ই ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক মিছিলে পথ হেঁটেছিলেন ১১ই ফেব্রুয়ারির ব্রিটিশ নৃশংসতার প্রতিবাদে ! কলকাতায় শহীদদের প্রতি অভিবাদন জানিয়েছিলেন অরুণা আসফ আলীও।[১৩]

মুসলিমলীগ নেতৃত্বকে প্রয়োজনের তাগিদেই এই বিক্ষোভ আন্দোলকে সমর্থন করতে হয়েছিল। বস্তুত মুসলিম লীগের অবস্থা ছিল রাজনৈতিকভাবে সমস্যাপূর্ণ। কারণ সাধারণ নির্বাচন ছিল সামনেই ; এই অবস্থায় এই বিক্ষোভ আন্দোলনকে সমর্থন না করার অর্থই ছিল সাধারণ জন সমর্থন হারানো - যা সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত হঠকারী হত। রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষে থাকায়, সোহরাওয়ার্দী জানতেন যে ১২ই ফেব্রুয়ারির মিছিলকে 'সংরক্ষিত অঞ্চল' ডালহৌসী স্কোয়ার-এ ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে — যা একই সঙ্গে লীগ-কংগ্রেস ঐক্য এবং হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রধান চরিত্র হিসাবে তাঁর ভূমিকাকেও সমুজ্জ্বল করবে।

কমিউনিস্ট পার্টি এই বিক্ষোভ আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, যদিও নেতৃত্ব একেবারে গোড়াতেই বিপ্লবী জনগণের মেজাজ বুঝতে সময় নিয়েছিল।

তাঁদের মতে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তিতেই একমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্য সম্ভব। পার্টির তার প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি; যদিও পার্টি ক্যাডারদের জনগণের সঙ্গে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এইখানে একটু ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে; তাই প্রথমেই পরিষ্কার করে দিতে চাই যে এই পর্বে পার্টির অপরিসীম নিষ্ঠা এবং বীরত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস-লীগ যৌথ নেতৃত্বের অধীনে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপরেই গুরুত্ব দিয়েছিল পার্টি এবং যেখানে পার্টি পালন করবে সহায়ক ভূমিকা। ১৫ই ফেব্রুয়ারির স্বাধীনতার সম্পাদকীয়তে সর্তকতা উচ্চারিত হয়েছিল পাছে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে বিপ্লব ভাবা হয়। যদিও পরে পার্টি নেতৃত্ব পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুধাবন করেছিলেন। যার ফলশ্রুতি ছিল স্বাধীনতায় সোমনাথ লাহিড়ীর অবিস্মরণীয় রচনা 'প্রস্তুত হও' যেখানে বলা হয়েছিল যে কলকাতায় যা হল তা সাম্রাজ্যবাদী শাসকের সঙ্গে চূড়ান্ত পরীক্ষার সূত্রপাত। জনতা ঐক্যবদ্ধ এবং তারা সমস্তরকম বাধা অতিক্রম করেছে। আমাদের কাজ হ'ল তাদের সংগঠিত করে শেষ সংগ্রামের জন্য নেতৃত্ব দেওয়া।[১৪] বস্তুত পুলিস কমিশনারের গোপন প্রতিবেদনেও এই তথ্যই প্রতিফলিত হয়েছিল।[১৫] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে গত ২১শে নভেম্বরের (১৯৪৫) গণ আন্দোলনে পার্টি মিছিলের শেষ সারিতে ছিল মঞ্চে তাঁদের বক্তব্য রাখতেও দেওয়া হয়নি। কিন্তু ১১ই ফেব্রুয়ারির (১৯৪৬) গণ আন্দোলনের দিনগুলিতে পার্টি ছিল মিছিলের পুরোভাগে, মঞ্চেও তাঁদের উপস্থিতি ছিল তাঁদের রাখা বক্তব্যর মতই সাবলীল এবং জোরালো। এইভাবে পার্টির রাজনৈতিক উত্তরণ এই পর্বে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ডালহৌসী স্কোয়ারের ছাত্র মিছিলের প্রয়োজন এবং গুরুত্ব :

গত নভেম্বরের (১৯৪৫)-র মতই ফেব্রুয়ারির (১৯৪৬) গণ অভ্যুত্থানের দিনগুলোতে ও বাংলার ছাত্র সমাজ বিপ্লবের নিশান ঠিক রেখে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন। ১১ ও ১২ই ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিল করে ডালহৌসী স্কোয়ারে যাওয়া কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছিল না — বরং এটা ছিল বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনেরই একটি অংশ বিশেষ। কোন এক বিশেষ রাস্তা দিয়ে মিছিল যাওয়ার ব্যাপারটা এখানে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যাঁরা এই মিছিলগুলি পরিচালনা করেছিলেন অথবা এতে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা স্থির সংকল্প নিয়েই এক বিদেশী সরকারের আজাদ হিন্দ ফৌজকে দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত এবং বিচার করার অধিকারের কর্তৃত্বকেই-চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। সেই অর্থে এই মিছিল ছিল নিজেদের অধিকারকে জাহির করার/প্রতিষ্ঠিত করার একটা প্রতীকী প্রতিবাদ-যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল।

১১ই ফেব্রুয়ারির মিছিলে অন্তত কোন হিংসার আশ্রয় নেওয়া হয়নি যদিও এই পর্বে শহর জুড়ে হিংসাত্মক বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। এক অর্থে এই মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন নেতৃত্বহীন — কেননা তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে কোন নির্দেশ

নেয় নি। তাঁরা নিজেরাই ছিলেন নিজেদের নেতা। তাঁরা মনে করেছিলেন যে একটা প্রতিবাদ জরুরি — জোরালো এবং আপোষহীন প্রতিবাদ, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের বিরুদ্ধে যা একই সঙ্গে বিদেশী শাসনের ভিত্তিরও বিরুদ্ধে — স্বাভাবিক এবং অনিবার্য ঘটনাবলীর অংশ বিশেষ, যা বস্তুত দক্ষিণ এশিয়ায় দেখা গেছিল। এটা কেবলমাত্র একটা প্রতিবাদই ছিল না — ছিল একটা জাতির বৈধ অধিকারের চেষ্টাকে জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা; যাদের কাছে বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল ক্রমেই নিদারুণভাবে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

অভিযোগ উঠেছিল, মিছিল থেকে বিশৃংখলার এবং অন্তর্ঘাতের। তা ছিল অসত্য। বরং অভিযোগ আনা যেতে পারতো কেসীর সরকারের বিরুদ্ধে — অদূরদর্শীতার এবং বেপরোয়া মনোভাবের। কিছু পুলিস অফিসার হঠাৎ মাথা গরম করে বেপরোয়া গুলি বর্ষণের মাধ্যমে এক ধরণের সংগঠিত অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল। এই যথেচ্ছ গুলিচালনা শহরকে করেছিল অগ্নিগর্ভ। একটা সময় মনে হয়েছিল যেন সাধারণ মানুষের বুলেটের ভীতি বুঝি আর নেই। ব্রিটিশ রাজের 'মর্যাদা' বিপন্ন হয়েছিল এবং সেই তথাকথিত মর্যাদার সীমারেখা ছিল মিছিলকারী এবং সংরক্ষিত অঞ্চল ডালহৌসী স্কোয়ারের মাঝে। যখন জনতা ডালহৌসী স্কোয়ারে পরের দিন অর্থাৎ ১২ তারিখে ঢুকে পড়েছিল — মনে হয়েছিল যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বাধা বুঝি সংগ্রামী মিছিলের পদতলে অপসারিত হ'ল। অন্তহীন মানুষের মিছিলই অবশেষে জয়যুক্ত হয়েছিল।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে ছাত্রদের এই সংগ্রামী মিছিল পরিচালন করে ডালহৌসী স্কোয়ারে ঢোকার মাধ্যমে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তি অথবা দেশের মুক্তি ঘটেনি। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে এটাই একমাত্র বিষয় ছিল না। আলোচ্য বিষয় হল — যা আগেই বলেছি — জনতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল বিদেশী শাসনের অবসান দেখতে। তাঁদের নিজেদের মত ক'রে ছাত্ররা আন্তরিকভাবে মনে করেছিলেন যে তাঁরাও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বর্তমান ধারার বাইরে নন। সুতরাং তাঁরা মনে করেছিলেন যে তাঁদেরও কিছু করণীয় আছে দেশের মুক্তি আন্দোলনে — যেটা মানব মুক্তির বৃহত্তর আন্দোলনেরই অংশ বিশেষ।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। Home Poll. 1 5/22/46 ।

২। Ibid ।

৩। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ ।

৪। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ ।

৫। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ ।
হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬।

৬। হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬, ডেইলী এক্সপ্রেস ১৩/২/৪৬।
৭। অমৃতবাজার পত্রিকা ১৪/২/৪৬।
৮। অমৃতবাজার পত্রিকা ১৩/২/৪৬।
৯। অমৃতবাজার পত্রিকা ১৪/২/৪৬।
১০। Home Poll. I 18/2/46 NAI।
১১। অমৃতবাজার পত্রিকা ১৩/২/৪৬।
১২। অমৃতবাজার পত্রিকা ১৩/২/৪৬।
১৩। অমৃতবাজার পত্রিকা ১৬/২/৪৬।
১৪। স্বাধীনতা ১৬/২/৪৬।
১৫। Home. Poll. I 5/22/46. NAI।

ঔপনিবেশিক বাঙলায় তেভাগা কৃষক সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

সুস্নাত দাশ

॥ ১ ॥

তেভাগা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির অংশ গ্রহণ, নেতৃত্বের ভূমিকা, তার সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে নানা আলোচনা ও সমালোচনা নানা সময়ে গবেষক ও বিজ্ঞান মহলে উত্থাপিত হয়েছে। আলোচনা হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোর নানা স্তরে — যেখানে তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক পি.সি. যোশী, প্রাদেশিক সম্পাদক ভবানী সেন থেকে শুরু করে সুধী প্রধান বা গোলাম কুদ্দুসের মতো বুদ্ধিজীবী নেতারাও প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক কী ছিল ? কোন্ রণকৌশল তারা অবলম্বন করেছিলেন ও তা যথাযথ ছিল কিনা ? এই আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতার পশ্চাতে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের দায় দায়িত্ব কতখানি ? এই নিবন্ধে এসবের উত্তর অনুসন্ধানের একটা প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টি যে গণ সংগঠনটির মধ্য দিয়ে অধিক সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের কাছে পৌঁছেছিল বা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল তা ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা। কৃষক সভার নেতৃত্বে বিশেষ করে সভার মধ্যে কর্মরত কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের উৎসাহ ও উদ্যোগে এই কৃষক আন্দোলনগুলি বাঙলার কৃষক সমাজের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যেমন উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের 'হাট-তোলা' বা 'লেখাই-খরচ' বিরোধী আধিয়ার আন্দোলন ভাগচাষীদের মধ্যে কৃষকসভা এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে জনপ্রিয় হতে সাহায্য করেছিল।[১] এটা সত্য যে ১৯৩৯-৪০ সালে উত্তরবঙ্গে আধিয়ার আন্দোলনের পূর্বে বর্গাদার বা ভাগচাষীদের সমস্যাবলীর সমাধান সম্পর্কে কৃষকসভার উল্লেখযোগ্য কোন পরিকল্পনা বা কর্মসূচি ছিল না। ১৯৩৭ সালে বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের প্রথম অধিবেশনে কৃষকসভা জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ; ঋণ মুকুব; এবং খাজনার পরিবর্তে আয়কর প্রদান এই তিনটি প্রধান দাবি উত্থাপন করলেও বর্গাদার বা ভাগচাষী বা আধিয়ারদের সমস্যা সম্পর্কে প্রায় নীরবতাই গ্রহণ করেছিল।

তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, ময়মনসিংহ, হাওড়া, মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলাগুলিতে আধিয়ার বা ভাগচাষীদের নানা ধরণের বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

॥ ২ ॥

তেভাগার দাবিতে ভাগচাষীদের আন্দোলনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার ভূমিকা সম্পর্কে দু'ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিকদের গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে। জ্ঞানব্রত ভট্টাচার্য, সুগত বসু, আন্দ্রে বেতেই প্রমুখ গবেষক মনে করেছেন যে কৃষকসভা সম্পূর্ণ প্রস্তুতিহীন অবস্থায় ভাগচাষীদের উপর এই আন্দোলন চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তৎকালীন বাংলায় এই ধরণের সংগ্রাম পরিচালনার কোন বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ছিল না। আবার পিটার কাস্টার্সের মতন কোন কোন গবেষক বলতে চেয়েছেন যে তেভাগা আন্দোলন ছিল মূলত ভাগচাষীদের একটি স্বয়ংক্রিয় বা অটোনমাস আন্দোলন, যাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অনুপস্থিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের প্রাক্তন সচিব দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় তাঁর অতি সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে (EPW)[২] দেখাতে চেয়েছেন যে ১৯৩৯ সালে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে ল্যান্ড রেভেন্যু কমিশনের কাছে যে স্মারকলিপি BPKS-এর পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছিল তাতে বাংলার ভাগচাষী বা বর্গাদারদের উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুই ভাগ প্রদান করার দাবি জানানো হয়নি। অর্থাৎ তেভাগার কৃতিত্ব কৃষকসভার নয়, ফ্লাউডের। এই অভিযোগটি নিয়ে ইতিপূর্বে অভিজিৎ ব্যানার্জী এবং মৈত্রীশ ঘটক অন্যত্রও আলোচনা করেছেন।[৩]

এছাড়া অ্যাড্রিয়েন ক্যাপার তাঁর গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ভাগচাষী বা বর্গাদারদের শ্রেণীভিত্তি যাই হোক না কেন তারা মূলত পরিচালিত হয়েছিল 'সাম্প্রদায়িক' মনোভাবের দ্বারা।[৪]

প্রথম অভিযোগটির জবাবে বলা যায় যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা (যা পরবর্তীকালে প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত গণ-সংগঠন রূপে বিকশিত হয়) ভাগচাষীদের ২/৩ ভাগ সহ অধিক ফসলের উপর তাদের দাবির সমর্থনে কখনোই যে কুণ্ঠিত ছিল না তার প্রমাণ নানাভাবে স্বীকৃত। যশোহরের নড়াইলে ১৯২৩-২৪ সালেই উদারপন্থী-জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা মৌলবী সৈয়দ নওশের আলি ও তাঁর সহকর্মী ওয়ালিয়ার রহমানের নেতৃত্বে কৃষকরা নমঃশূদ্র ও মুসলমান অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রামে তেভাগার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে খুলনার মৌভোগে BPKS-এর উদ্যোগে যে প্রথম জেলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বঙ্কিম মুখার্জী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলন থেকেই 'জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই'; 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই রণধ্বনি উত্থাপিত হয়। ১৯৩৭-এর মে মাসে যশোর জেলা সম্মেলনে এই দাবি সমূহের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সুতরাং শুধু উৎপন্ন ফসলের ২/৩ ভাগ মাত্র নয়, সম্পূর্ণ অংশই যাতে ভাগচাষী-বর্গাদাররা লাভ করতে পারে তার জন্য BPKS জমির মালিকানা-স্বত্ব ভূমিহীন কৃষকদের জন্য দাবি করেছিল সেই সঙ্গে এবং জমিদারি প্রথার অবসানের সংকল্প ঘোষণা করে।

এই অভিমত বহুদিন ধরেই অনেকে করে আসছেন যে তেভাগা সংগ্রাম শুরু ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ও কৃষক নেতৃত্বের মধ্যে দ্বিধা ও দোলাচলচিত্ততা ছিল।[৫] মধ্যবিত্ত ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে আগত কৃষক নেতৃত্বের একাংশ (যদিও উল্লেখযোগ্য অংশের নেতা ও কর্মীরা প্রভূত কষ্ট স্বীকার করেও চাষীদের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছিলেন, শ্রেণীহীনও হতে পেরেছিলেন) শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির উর্দ্ধে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু দেবব্রত ব্যানার্জীর এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয় যে ভাগচাষী বা বর্গাদারদের জমির অধিকার (Tenancy Right) প্রদানের প্রশ্নে কৃষকসভা সক্রিয় ছিলেন না বা কোন দাবি উত্থাপন করেনি। ফ্লাউড কমিশন গঠিত হবার পূর্বেই 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই দাবি বা শ্লোগান তবে তোলা হয়েছিল কার স্বার্থে ? একথা সত্য যে ফ্লাউড কমিশনের কাছে পেশ করা স্মারক লিপিতে (Memorandum) বর্গাদার বা ভাগচাষীদের উৎপন্ন ফসলের ২/৩ অংশ প্রদানের কোন তাৎক্ষণিক দাবি বা চাহিদার কথা বলা হয়নি। বস্তুতপক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি বা কৃষকসভার নেতৃত্বে সঠিকভাবে বিষয়টিকে নীতিগত অবস্থান থেকে বিচার করেছিলেন। 'বর্গাদারী ব্যবস্থা বা ভাগচাষী' চূড়ান্ত লক্ষ্য রূপে মার্কসবাদীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তারা জমির ওপরে চাষীদের সম্পূর্ণ দখলীস্বত্বই (Occupancy Right) দাবি করেছিলেন।[৫] কিন্তু তৎকালীন কৃষকসভা ও কমিউনিস্ট পার্টির নীতিগত অবস্থান তলিয়ে না দেখেই তাদের বিরুদ্ধে যে মনগড়া অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে তাকে ইতিহাস-সম্মত বলা চলে না।

॥ ৩ ॥

সাধারণত কমিউনিস্ট পার্টির উপর যে অভিযোগটি চাপিয়ে দেওয়া হয় তা হল কোনরূপ প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা ছাড়াই তেভাগা আন্দোলন কৃষকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। এই অভিযোগের মান্যতা আরো বৃদ্ধি পায় যখন স্বয়ং আবদুল্লাহ্ রসুল তাঁর রচিত কৃষকসভার ইতিহাসে মন্তব্য করেন যে, "তেভাগা সংগ্রামের সিদ্ধান্তটি কৃষকসভা কতকটা যেন আকস্মিকভাবেই গ্রহণ করে।"[৭] এটা সত্য যে ১৯৪৬ সালে খুলনার মৌভোগে BPKS-এর নবম সম্মেলনে চিন্তা করা যায় নি যে পরবর্তী দু'মাসের মধ্যে বাঙলার বহু জেলায় ব্যাপক ও প্রবল ভাবে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু তেভাগা সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ একেবারে আকস্মিক ছিল — এমন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যায় না।[৮] রসুল সাহেবও 'কতকটা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে একথা ঠিক যে, মাঝে ১৯৪২ থেকে 'ফ্যাসি-বিরোধী জন যুদ্ধের' নীতি কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করায় এই কয় বৎসর কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রামে জঙ্গীত্ব অনেক কমে যায়। তাই ১৯৪০-এ পাঁজিয়া সম্মেলনে তেভাগার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও ১৯৪৬-এর আগে তা ঘোষিত হয়নি। রসুল সাহেব অপ্রস্তুতির এই দিকটিও ইঙ্গিত করেছেন কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও তেভাগা সংগ্রামের সিদ্ধান্তকে একেবারে আকস্মিক বলা চলে না। পুরোপুরি একটি অপ্রস্তুত সংগ্রামও এটা ছিল না।

এটা ঠিকই যে, কিছু কিছু স্থানে উপযোগী পদক্ষেপ কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে নেওয়া হয়নি এবং তা সংগ্রামের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন কারণে তাড়াহুড়ার দিকটিও ছিল সমস্যার।

১৯৪৬ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার কাউন্সিল অধিবেশনে তেভাগা আন্দোলন আনুষ্ঠানিক শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। কেন ঠিক ঐ সময়েই কমিউনিস্ট পার্টি এবং কৃষক নেতৃত্ব এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন সে বিষয়ে বিভিন্ন গবেষক নানাবিধ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অভিমত প্রকাশ করেছেন। বলা হয় ১৯৪৬-এর আগস্ট মাস জুড়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তার ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যকে রক্ষা করার প্রশ্নটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। বস্তুত সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করাই এই অর্থনৈতিক সংগ্রামের মূল অন্যতম লক্ষ্য ছিল একথা অমল সেন, অবনী লাহিড়ী প্রমুখ কৃষক নেতারা মনে করেন।[৯] পূর্ব প্রেক্ষাপট বিচার করলে এই সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না যে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রতিহত করতেই শ্রেণী-সংগ্রামকে কৌশলগত কারণে ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে এটা সত্য যে 'তেভাগা আন্দোলনের এলাকায়' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিহত হয়েছিল। যদিও মনে রাখা প্রয়োজন কৃষক সমাজের মধ্যে থেকে এই দাবি যদি উঠে না আসত এবং তেভাগা আদায় করার জন্য কৃষকরা দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় না দিতেন অর্থাৎ নিচের তলা থেকে একটি চাপ সৃষ্টি না হলে, শুধুমাত্র কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতার আহ্বানে বাংলার অধিকাংশ জেলাতে লক্ষ লক্ষ ভাগচাষী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন না।

॥ ৪ ॥

তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকাটি ঐতিহাসিক বা গবেষকদের কাছে নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ এই আন্দোলনকে কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বলে মনে করেছেন; কেউ কেউ মনে করেন প্রাদেশিক কৃষকসভা জোর করে এই আন্দোলন বাংলার কৃষকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে এমন অভিযোগও তুলেছেন। 'নস্যাৎকারী' ও 'অতিশয়োক্তিকারী' উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গি ড. বিনয়ভূষণ চৌধুরী অন্যত্র খন্ডন করেছেন।[১০] প্রকৃত ঘটনা হল তেভাগা আন্দোলন ছিল সংগঠিত কৃষক সংগ্রাম (Organised peasant struggle)। নানাস্তরের নেতৃত্ব এই আন্দোলনকে পরিচালনা করেছেন। সন্দেহ নেই এই বিভিন্ন স্তরের নেতাদের শ্রেণীগত উৎস ছিল বিভিন্ন প্রকার; বিশেষ করে প্রাদেশিক ও জেলা স্তরের নেতৃত্বের একটি বড় অংশই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত। কিন্তু শুধু এই কারণেই যদি এঁদের প্রতি 'পেটি-বুর্জোয়া' মানসিকতার বা 'সর্বহারা শ্রেণী'র প্রতি অবিশ্বস্ততার মনগড়া অভিযোগ ওঠে তবে তা গ্রহণযোগ্য কিনা তা বিশ্লেষণ করা উচিত। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে জেলা প্রশাসন ও মহকুমা শাসকদের কাছ থেকে যে রিপোর্ট সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল[১১] তাতে দেখা যায় যে বহিরাগত কমিউনিস্ট নেতা ও

কর্মীরা বিভিন্ন জেলায় ও মহকুমায় ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা যেভাবে কৃষকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাকে মাও সে তুং কথিত 'জল মাছের সম্পর্ক' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সুতরাং আন্দ্রে বেতেই-এর এই সমালোচনা টেঁকে না যে কৃষকসভা বা তার নেতৃত্বে কৃষকদের যথার্থ প্রতিনিধি নয়। তেভাগা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সংগঠক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলাও অসঙ্গত যে তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত বলেই এই আন্দোলন যথেষ্ট মাত্রায় জঙ্গী হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল বা শ্রেণীগত দুর্বল চিত্তের কারণে তাঁরা এই আন্দোলনের রাশ টেনে ধরেন। সীমাবদ্ধতা যদি কিছু থাকে তা সর্বোচ্চ স্তরের (কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক) নীতি নির্দ্ধারক নেতৃত্বের ছিল — যাঁদের মধ্যে সংস্কার পন্থা ছিল অংশত ক্রিয়াশীল। অবশ্য পাশাপাশি সমকালীন জাতীয় রাজনীতির জটিল আবর্তের দিকটিও বিবেচনায় রাখা দরকার।

কিন্তু উপরে প্রদত্ত কমিউনিস্ট ও কৃষক-নেতৃত্ব সম্পর্কিত আলোচনা কোনোমতেই দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিমতকে সমর্থন করে না যে, It is the middle class fetishism of the communist party, led by the urban middle class elite. With all their pretensions of being "desclassed' they remain true to their salt and to their class interest"[১২] তবুও এই প্রশ্ন ওঠা অসংগত নয় যে কেন বর্ধমানের মত কৃষিপ্রধান একটি জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত কবার ক্ষেত্রে তেমন সক্রিয় ছিল না ? এই প্রশ্নের জবাব উক্ত জেলায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে কতটা বিদ্যমান ছিল। কৃষকনেতা বিনয় চৌধুরীর বা সৈয়দ শাহেদুল্লাহের রচনায় এর ব্যাখ্যা মিলবে।[১৩]

তেভাগা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভা ভাগচাষীদের ন্যায্য বিক্ষোভকেই সংগঠিত নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন সন্দেহ নেই। তবে কৃষক নেতাদের মধ্যে আন্দোলন শুরু করার ক্ষেত্রে এমনকি ১৯৪৭-এর জানুয়ারি থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলন যখন সশস্ত্র সংঘর্ষের পর্যায়ে উন্নীত তখন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-দোলাচলচিত্ততাও (ambivalence) যথেষ্ট পরিমানে ছিল। ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরে কৃষক কাউন্সিলে যখন আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছিল তখনও দু-একজন কৃষক নেতা এই আন্দোলন করার বাস্তব পরিস্থিতি আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

জিতেন ঘোষ জানিয়েছেন যে কোনো কোনো কমিউনিস্ট নেতা এই প্রশ্ন তুলেছিলেন যে কৃষকরা একটি 'অবিপ্লবী' শ্রেণী, শ্রমিক হল আসল 'বিপ্লবী'। কৃষক আন্দোলনের পরিবর্তে পার্টির উচিত শ্রমিক আন্দোলনেই সর্বশক্তি নিয়োগ করা।[১৪] বদরুদ্দিন উমর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে 'সুবিধাবাদী' বলে চিহ্নিত করেছেন এই অভিযোগে প্রখ্যাত কৃষকনেতা মণি সিং বদরুদ্দিন উমরকে 'কমিউনিস্ট বিরোধী' রূপে ঘোষণা করে দেখাতে চেয়েছেন যে

উমর কর্তৃক তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতাদের একাংশের চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করা উদ্দেশ্য প্রণোদিত।[১৫] কিন্তু বদরুদ্দিন উমরের উদ্দেশ্য আসলে বোধহয় তা ছিল না। উমর মূলত কৃষক নেতা জিতেন ঘোষকেই উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্যে[১৬] তৎকালীন নেতৃত্বের একাংশের একটি বুর্জোয়া সুলভ মানসিকতার সমালোচনা করেছিলেন - যে সমালোচনা পরবর্তীকালে ভবানী সেন, অবনী লাহিড়ী থেকে শুরু করে সুধী প্রধান ও গোলাম কুদ্দুস[১৭] করেছেন এবং যা একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না।

অবশ্য বদরুদ্দিন উমরের এই অভিমত[১৮] অর্থাৎ "তেভাগা আন্দোলনকে সত্যিকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-আন্দোলনের পথে চালনা করা সম্ভব হয়নি" — এর জন্য কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে সম্পূর্ণ দায়ী করা চলে কি ? দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যখন ১. জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে দেশের অধিকাংশ মানুষের উপরেই দলীয় প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে; ২. সাম্প্রদায়িকতার আবিলতা যখন জনগণের সর্বস্তরে কম-বেশি পরিব্যাপ্ত; ৩. আসন্ন স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশায় দেশের মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সমাজ যখন উৎসুক; ৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার অভিযোগে কমিউনিস্ট পার্টি যখন 'দেশদ্রোহী' রূপে অভিযুক্ত ও প্রশ্নবোধক চিহ্নের সম্মুখীন এবং ৫. সামগ্রিক বিচারে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক শক্তি ও সমর্থন (স্মর্তব্য যে ১৯৪৬-এর মধ্যে আইনসভা নির্বাচনে বাঙলায় মাত্র তিনটি আসন কমিউনিস্টরা পেয়েছিল) যখন তুল্য-মূল্য বিচারে অকিঞ্চিৎকর — সেই পরিস্থিতিতে নানাদিক থেকে সীমাবদ্ধতা ও আক্রান্ত একটি ভাগচাষী আন্দোলনকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-আন্দোলনের চবিত্রে উন্নীত করার স্বপ্ন দেখা কি অলীক নয় ?[১৯] তবে এই সমালোচনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে ১৯৪৬-৪৭ সালে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমিউনিস্টদের এই জাতীয় প্রয়াসে নেতৃত্বদানে অক্ষমতার পরিচয় বহন করে। অনেক সমালোচকই বলেছেন যে তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে নগরাঞ্চলে শ্রমিকদের আন্দোলনকে যদি যুক্ত করা যেত এবং পাশাপাশি ছাত্র-মহিলা-বুদ্ধিজীবী ফ্রন্টও যদি সক্রিয় ও উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতো তবে অবিভক্ত বাঙলায় শেষ কৃষক সংগ্রামকে অতটা কোণঠাসা হতে হতো না।[২০] যদিও ডুয়ার্সের রেল শ্রমিকরা ও চা-বাগিচা শ্রমিকরা এই আন্দোলনকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিল - কিন্তু সমগ্র বাঙলার চিত্র তা ছিল না।

১৯৪৭-এর জানুয়ারি মাস থেকেই আন্দোলনকারীদের উপর পুলিস; জোতদারদের গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটতে থাকে এবং সংবাদ পত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী এপ্রিল মাস পর্যন্ত মাত্র ৩-৩½ মাসের মধ্যে ৮৬ জন আন্দোলনকারী নিহত হন। এর মধ্যে ৭৭ জন গুলিতে, ৫ জন পুলিসের অত্যাচারে এবং ৪ জন জেলে বন্দী অবস্থায় মারা যান। নিহতের সংখ্যা আরো কিছু বেশি ছিল — সঠিক তথ্য এখনো উদ্ধার করা যায় নি। আহতের

সংখ্যা ছিল অন্তত দশ হাজার। এই সময়কালে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভার অসংখ্য নেতা ও কর্মীর উপরে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল।[২১]

কমিউনিস্ট পার্টি তখনও পর্যন্ত দমন পীড়নের প্রেক্ষাপটে কৃষকসভার মাধ্যমে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্তে অবিচল ছিল। এই পর্যায়ের তেভাগা আন্দোলন শুধুমাত্র আর অর্থনৈতিক স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চেই (মেদিনীপুর সম্মেলন) 'লাঙ্গল যার জমি তার', 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি বাজেয়াপ্তকরণ', 'ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করা' প্রভৃতি আমূল ভূমি সংস্কারের বৈপ্লবিক নীতি সমূহ কার্যকর করার দাবিতে আন্দোলন তীব্রতর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।[২২]

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই সময়কালে কয়েকটি জেলায় গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। বিশেষত ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, ২৪ পরগণা ও যশোরের নড়াইল প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে। একদা জাতীয় বিপ্লববাদী ও তৎকালীন যুগের কমিউনিস্ট কর্মী গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও (পরে মেজর জয়পাল সিং) প্রমুখ এই উদ্যোগে প্রাথমিকভাবে জড়িত ছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল সশস্ত্র নারী বাহিনী।[২৩] যদিও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষাদানের কর্মসূচী থেকে কমিউনিস্ট পার্টি পরবর্তীকালে (ঔপনিবেশিক যুগে) সরে আসে।[২৪]

বিস্ময়কর বিষয় ছিল যে লীগ সরকারের নানাবিধ কার্যের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সদস্যারা সোচ্চার থাকলেও আন্দোলনকারী কৃষকদের উপর পুলিসী নির্যাতন বা হত্যাকান্ড সম্পর্কে তারা কিন্তু মৌনব্রতই গ্রহণ করেছিলেন। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র ছিলেন একদা বিপ্লববাদী কংগ্রেস নেত্রী বীণা দাস। তিনি ময়মনসিংহে নারীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সোচ্চার হন (কিন্তু তেভাগা বিষয়ে নয়)। আইনসভায় কমিউনিস্ট সদস্যরূপে অবশ্য জ্যোতি বসু কিন্তু ১২ই মার্চ, ১৫ই মার্চ, ২১শে মার্চ, ২৫শে মার্চ, ২২শে এপ্রিল ও ২৪শে এপ্রিল তারিখগুলিতে তাঁর ভাষণে আইনসভায় তীব্রভাবে সোহ্‌রাওয়ার্দী সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান।[২৫]

॥ ৫ ॥

কোনো কোনো লেখক, গবেষক তাঁদের তেভাগা আন্দোলন বিষয়ক গবেষণায়, পুস্তকে জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে তির্যক সমালোচনার বাণ নিক্ষেপ করেছেন 'এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি বিল'-এর উপর আইনসভার আলোচনাতে তাঁর ২৪শে এপ্রিলের ভাষণকে লক্ষ্য করে।[২৬] আমরা জানি - 'বর্গাদার বিল - ১৯৪৭'কে ধামাচাপা দিয়ে মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষ থেকে ফজলুর রহমান ২১শে এপ্রিল (১৯৪৭) "জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব বিল" নামে একটি বিল পেশ করেন।

কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষিতনীতি ও কর্মসূচীর সঙ্গেও এই বিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। কিন্তু ড. কুণাল চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে একটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এই অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি কি করল ? তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ বিধানসভায় এই প্রসঙ্গে জ্যোতি বসুর বক্তৃতা। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে ঐ বিলের মূল নীতিগুলিকে তিনি অভিনন্দন জানাচ্ছেন। যে বিলের লক্ষ্য ছিল কৃষক বিদ্রোহ স্তব্ধ করার, উপর থেকে আঁতাতের ভিত্তিতে কৃষিক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটানো এবং জোতদারদের অধিকার অটুট রাখা, অর্থাৎ যে বিল বহু ত্রুটিপূর্ণ 'বর্গাদার বিলেরও' সমস্ত প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়েছিল সেই বিলকে অভিনন্দন জানালেন সি.পি.আই. এর এই নেতা।"[২৭]

সমালোচনামূলক মন্তব্য কার্যত পরিপ্রেক্ষিত বিচার শূন্য। কারণ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার জন্মলগ্ন থেকেই জমিদারি প্রথা অবসানের দাবি রেখে আসছে; প্রাদেশিক কৃষকসভার মাধ্যমে যাঁরা পাঁচখুপি কৃষক সম্মেলনে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৪৭) 'লাঙ্গল যার জমি তার' ধ্বনি তুলে তেভাগার পাশাপাশি জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে এবং যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি রূপে জ্যোতি বসু দিনের পর দিন তাঁর বক্তৃতায় তেভাগা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন, তিনি কি এতই অজ্ঞ ছিলেন যে লীগ সরকার আনীত 'জমিদারি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিল'-র মর্মার্থ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবেন ! ২৪শে এপ্রিল জ্যোতি বসু আইন সভায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে ঐ 'বিলের সাধারণ নীতিগুলিকে' স্বাগত জানানোর অর্থ ছিল জমিদারি প্রথা অবসানের বিষয়টিকেই শুধুমাত্র গ্রহণ করা। বিলের সম্পূর্ণ প্রস্তাবাবলী বা অপরাপর ধারাগুলিকে সমর্থন জানানো নয়। বরঞ্চ জমিদারদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ধারাটির তীব্র সমালোচনা করে জমিদারি ব্যবস্থারই বিলোপ ঘটানো।[২৮]

স্মরণ করা ভালো যে সেসময় স্বাধীনতা পত্রিকায় কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবেই বলা হয়েছিল : "বাঙলার কৃষকদের মূল দাবি — জমিদারি প্রথা ধ্বংস হোক্; লাঙল যার জমি তার, বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই এবং সকলের বাড়তি জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী ও গরিব চাষীদের মধ্যে বিলি করো।" (স্বাধীনতা ২রা এপ্রিল, ১৯৪৭)।[২৯] ২রা থেকে ৯ই এপ্রিল এসব দাবিতেই 'কৃষক সপ্তাহ' পালন করা হয়েছিল এমনকি বিল পেশ হবার দিনেই পার্টির পক্ষ থেকে বিলের কৃষক বিরোধী ধারাগুলিকে সংশোধন দাবি করা হয়েছিল। এটাই ছিল কমিউনিস্টদের প্রকৃত অবস্থান।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসের পর থেকেই যুক্ত বাঙলার শেষ কৃষক সংগ্রাম 'তেভাগা' আন্দোলনের ক্রমসমাপ্তি ঘটে। এই বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষত তার উচ্চস্তরের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতৃত্বের ভূমিকা কতখানি তা নিয়ে অজস্র সমালোচনা ও বিতর্ক বিভিন্ন গবেষক, পন্ডিত ও আন্দোলনের সংগঠকদের মধ্য থেকে উত্থাপিত হয়েছে।

অবিভক্ত বাঙলায় স্বাধীনতা লাভের প্রাক্ পর্বে তেভাগা কৃষক আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের পক্ষে উচিত হয়েছিল কিনা ? এবং এই পদক্ষেপ গ্রহণ ষাট লক্ষাধিক কৃষকের এই আন্দোলন ব্যর্থ করে দিয়েছিল কিনা উপযুক্ত প্রেক্ষিত বিচারে তা আলোচনা না করলে উত্তর অনুসন্ধানে ভ্রান্তি আসতে পারে। দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রেক্ষাপটে যদি এই প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা হয় তবে বলা যায় যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া তৎকালীন কমিউনিস্ট কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অন্য কোনো পন্থা ছিল না। ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ তারিখে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যখন ঘোষিত হয় যে আগামী ষোল মাসের মধ্যে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন প্রত্যাহৃত হবে, তখন থেকে তেভাগা আন্দোলনের সমাপ্তির অন্তিম গণনার (Count Down) প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। একদিকে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ, অপরদিকে অন্ধ মুসলিম জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ ও স্বার্থের সংঘাতে পিষ্ট হয় অবিভক্ত বাঙলার শেষ কৃষক সংগ্রাম। অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় : "Thus the single biggest mass force that could have re-built communal unity in Bengal and possible averted the tragedy of partition, namely the toiling peasantry, was betrayed and struggle brutally supressed."[৩০] এই ভাবেই অবিভক্ত বাঙলায় ঐতিহাসিক তেভাগা কৃষক সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ের বিরতি ঘটে - অবসান নয়।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১. বিনয়ভূষণ চৌধুরী, 'অর্গানাইজড পলিটিকস্' অ্যান্ড পেজেন্ট ইনসারজেন্সিঃ দি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কৃষক সভা অ্যান্ড দি শেয়ারক্রপার্স স্ট্রাগল ইন বেঙ্গল, ১৯৪৬-৪৭; দ্রষ্টব্য দি ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল জার্নাল, ভল্যুম-১৩; জুলাই, ১৯৮৮ - জুন ১৯৮৯, এবং অশোক মজুমদার, পেজেন্ট প্রোটেস্ট ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, দিল্লী, ১৯৯৩।

২. ডি. বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তেভাগা ম্যুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ঃ আ রেট্রস্পেক্ট'; ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি; ১৩ অক্টোবর, ২০০১; পৃঃ ৩৯০১-০৭।

৩. অভিজিৎ ব্যানার্জী ও মৈত্রীশ ঘটক; এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড দি ইকনমিকস্ অব টেন্যান্সি রিফমর্স্; ম্যাসাচুস্টেস্ ইন্স্টিটিউট অব টেক্নোলজি; ১৯৯৬।

৪. অ্যাড্রিয়েন ক্যুপার, শেয়ারক্রপিং অ্যান্ড শেয়ারক্রপার্স স্ট্রাগলস্ ইন বেঙ্গল (১৯৩০-৫০); কে. পি. বাগচী, কলকাতা, ১৯৮৮।

৫. ড. সুনীল সেন, অ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাগল ইন বেঙ্গল (১৯৪৬-৪৭); দিল্লী, ১৯৭২; অবনী লাহিড়ী, তিরিশ চল্লিশের বাংলা; কলকাতা, ১৯৯৯; সুধী প্রধান; পশ্চিমবঙ্গ, তেভাগা সংখ্যা; কলকাতা, ১৯৯৬ এবং ভবানী সেন, রচনা সংগ্রহ (১ম); ১৯৮৪।

৬. ফ্লাউড কমিশনের কাছে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার প্রদত্ত স্মারকলিপি। দ্র. রিপোর্ট অব দি ল্যান্ড রেভেন্যু কমিশন; ভল্যু-VI; আলিপুর, ১৯৪০।

৭. আব্দুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস; কলকাতা; পৃঃ ১১৬-১৭।

৮. অমল সেন, বিবিধ প্রসঙ্গ; নবব্যারাকপুর; ১৯৯৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ; তেভাগা সংখ্যা; পৃঃ ৮৯।

৯. অমল সেন, তদেব পৃ. ৮৮ এবং অবনী লাহিড়ী; তদেব; পৃ. ৭৮

১০. বিনয়ভূষণ চৌধুরীর পূর্বোক্ত নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১১. ল্যান্ড এ্যান্ড ল্যান্ড রেভেন্যু বিভাগের ফাইল নং 6M-38/47B, DEC. ৪৮/১৫-১০৭ দ্রষ্টব্য। এই রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হয়েছে; সুস্নাত দাশ; অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম; কলকাতা, ২০০২ এবং জয়ন্ত ভট্টাচার্য; বাংলার তেভাগা — তেভাগা সংগ্রাম; কলকাতা, ১৯৮৬ গ্রন্থ দুটিতে।

১২. ডি. বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত নিবন্ধ; ই. পি. ডব্লু; ১৩ অক্টোবর, ২০০১।

১৩. বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির প্রথম ২৫ বৎসর, বর্ধমান, ১৯৫৯ এবং সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, বর্ধমান, ১৯৯১।

১৪. জিতেন ঘোষ, গরাদের আড়াল থেকে, ঢাকা, ১৯৭০; পৃঃ ১৩৩।

১৫. মণি সিং, তেভাগা সংগ্রামের স্মৃতিকথা; রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ; কলকাতা; ১৯৭৩।

১৬. বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক; পূর্বোক্ত; পৃঃ ১১৫।

১৭. অবনী লাহিড়ী ও সুধী প্রধানের বক্তব্যের জন্য পূর্বোক্ত সূত্র দ্রষ্টব্য। গোলাম কুদ্দুসের নিবন্ধের জন্য দ্রষ্টব্য পশ্চিমবঙ্গ, তেভাগা সংখ্যা; কলকাতা; ১৯৯৬; পৃঃ ৬৪।

১৮. বদরুদ্দীন উমর; পূর্বোক্ত।

১৯. ডি. এন. ধনাগারে লিখেছেন, "যেমন দাবি করা হয়, তেভাগা আন্দোলন তেমন বড় সড় ব্যাপার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, যদিও এই আন্দোলন একটি বড় কৃষক আন্দোলনে পরিণত হওয়ার উপাদানে সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু তা হয়ে ওঠে নি। এর কারণ মনে হয় এই যে শুধুমাত্র বর্গাদারদের ফসলের দুই তৃতীয়াংশ অর্জনের দাবিতেই তা গড়ে উঠেছিল। এর বাইরে বেরুনোর উপায় এই আন্দোলনের ছিল না।" দ্র. ধনাগারে, পেজেন্ট ম্যুভমেন্টস্ ইন ইন্ডিয়া; অক্সফোর্ড, ১৯৮৬; পৃঃ ১৭২।

২০. বিভূতি গুহ, তেভাগার লড়াই; ধনঞ্জয় রায় (সম্পাঃ) পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃঃ ২৮।

২১. দৈনিক স্বাধীনতা; ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ থেকে ১৫ এপ্রিল, ১৯৪৭ দ্রষ্টব্য।

২২. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার জানুয়ারি ১৯৪৭-এ অনুষ্ঠিত বৈঠকে 'ফসল ও জমির লড়াই' শীর্ষক দলিল ছাড়াও দ্রষ্টব্য কৃষক সভার পাঁচথুপি সম্মেলনের (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৪৭, মেদিনীপুর) রিপোর্ট; মনসুর হবিবুল্লাহ-র 'জমিদারি ব্যবস্থা ধ্বংস হোক' (এন. বি. এ., ১৯৪৭) পুস্তিকা এবং পিপলস্ এজ, ১৮ মে, ১৯৪৭ তারিখের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য। এছাড়া লেখকের সঙ্গে কৃষক নেতা বিনয় চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, ১৯৯৬।

১৩. রাণী দাশগুপ্ত, তেভাগা কৃষক সংগ্রামে কৃষক মহিলাদের অবদান; তেভাগা রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ কলকাতা, ১৯৭৩ দ্রষ্টব্য।

২৪. সুনীল সেন, পূর্বোক্ত ও অশোক মজুমদার, পেজেন্ট প্রোটেস্ট ইন ইন্ডিয়ান পলিটিকস্; দিল্লী, ১৯৯৩। এছাড়া লেখকের সঙ্গে গণেশ ঘোষের সাক্ষাৎকার।

২৫. বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্বলি প্রসিডিঙস্‌; জ্যোতি বসুর ভাষণ; ভল্যু-৭২; নং-৩।

২৬. কুণাল চট্টোপাধ্যায়, তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস; প্রোগ্রেসিভ; কলকাতা, ১৯৮৭; পৃঃ ৯৭।

২৭. পূর্বোক্ত।

২৮. এই প্রসঙ্গে জ্যোতি বসুর ২৪ এপ্রিল '৪৭ প্রদত্ত আইনসভায় বক্তৃতার পূর্ণ পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য বি. এল. এ. পি.; পূর্বোক্ত এবং সুস্নাত দাসের অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম ঃ তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার; নক্ষত্র (এন.বি.এ); ২০০২ এবং অঞ্জন বেরা ও অন্যান্য সম্পাদিত জ্যোতি বসু রচনা সংগ্রহ; প্রথম খন্ড; এন.বি.এ; ২০০২ দ্রষ্টব্য।

২৯. দৈনিক স্বাধীনতা; ২ এপ্রিল; ১৯৪৭, কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' সর্বদাই এ সময়ে বিনাক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা বাতিলের দাবি করে গিয়েছিল যেমন তা একদশক জুড়ে কৃষক সভারও দাবি ছিল।

৩০. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল ইলেকটোরাল পলিটিকস্‌ অ্যান্ড ফ্রিডম স্ট্রাগল ঃ ১৮৬২-১৯৪৭; আই.সি.এইচ.আর; দিল্লী; ১৯৮৩; পৃঃ ২১৩।

দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ ঃ কেন ও কিভাবে ?

অঞ্জন সাহা

১৯০৫ সালের প্রথম বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, যার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঘটেছিল ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী গণ আন্দোলন—স্বদেশী আন্দোলন। তৎকালীন বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোক। তখন যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে হিন্দুত্বের সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল—যদিও তা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছিল। প্রধানত দুটি কারণে ঐ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে : প্রথমত, ১৯২০-র দশক থেকে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন গণ আন্দোলনের ফলে জাতীয় কংগ্রেসের কাঠামোগত পরিবর্তন; দ্বিতীযত, বাংলার মুসলিম রাজনীতি একটি কৃষিজ ভিত্তির সন্ধান পায় যাব ফলে কৃষি সম্পর্কিত শ্রেণী সংঘাতকে অবহেলা কবে পুরনো হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃত্বের শ্লোগান আর কার্যকরী হচ্ছিল না।[১]

বাংলার মুসলিম কৃষক সম্প্রদায সর্বপ্রথম যে বাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন, তা হল অসহযোগ আন্দোলন। ঐ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মুসলমানদের সাথে একটি বোঝাপড়ায় আসতে চান, কেননা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলায় তাদেব সহায়তা ছাড়া স্বরাজ্য দলের সাংবিধানিক সঙ্কট সৃষ্টির পরিকল্পনার সাফল্য অসম্ভব ছিল।[২] তাঁর ঐ প্রচেষ্টার ফল ছিল "Bengal Pact", যার ফলে অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী মুসলমান স্বরাজ্য দলকে সমর্থন করেন। ১৯২৫-এ দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটে, যার জন্য প্রধানত দায়ী ছিল উত্তর ভারত থেকে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ।[৩] যদিও গ্রামাঞ্চলে সাম্প্রদাযিক সংঘাত ছিল বিরল। বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতিব জন্য দায়ী নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি : প্রথমত, ১৯২৬ সালে প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনে "Bengal Pack" নাকচ করা[৪] দ্বিতীয়ত, "বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব সংশোধনী আইন (১৯২৮)" প্রসঙ্গে স্বরাজ্য দলের কৃষক স্বার্থবিরোধী আচরণ[৫] তৃতীয়ত, কংগ্রেস কর্তৃক "নেহেরু রিপোর্ট" গ্রহণ।[৬]

অবিভক্ত বাংলায় জনসংখ্যার অংশ হিসেবে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ক্রমহ্রাসমান। ইতিমধ্যে বাংলার কৃষি-অর্থনীতির ক্রমশ বাণিজ্যীকিকরণ ঘটছিল, আবার তার সাথে কৃষকদের ঋণের বোঝাও ক্রমশ বাড়ছিল। পূর্ববঙ্গে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা, বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য, বাণিজ্যিক শস্য হিসেবে পাট চাষের ফলে ক্ষুদ্র কৃষকদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ছিল, আর্থ-সামাজিক স্তর বিভাজন যথেষ্ট অগ্রসর হয়নি।[৭] মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গে জমিদার-মহাজনদের মধ্যে ব্যাপক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের। কিন্তু মুসলিম

জোতদার শ্রেণী সামাজিক ও সংস্কৃতিগত ভাবে কৃষক সম্প্রদায়েরই অঙ্গীভূত ছিলেন, উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদার-মহাজনদের মত পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতেন না। ১৯৩০-এর বিশ্বব্যাপী মন্দার আঘাতে গ্রামীণ ঋণ সরবরাহ ব্যবস্থা পূর্ববঙ্গে বিপর্যস্ত হয় এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় একতা ব্যবহৃত হয়েছিল রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে।[৮] সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় সমান্তরাল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ত্রিশের দশক থেকে এটি গড়ে উঠতে থাকে — শিক্ষিত, সম্পদশালী জমিদার ও অন্য পেশাজীবী উচ্চবর্ণের সাথে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আঁতাতরূপে; যদিও তা পরবর্তীকালে বিভিন্ন নিম্নবর্গের প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির সামাজিক মর্যাদালাভের ইচ্ছাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল।[৯] এর প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য স্বীকার করতে তীব্র অনিচ্ছা।

প্রজা আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহের কামারিয়ারচর প্রজা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে, কিন্তু ১৯৩৪ পর্যন্ত এর নেতৃত্ব কলকাতাবাসী অভিজাত মুসলিমদের কুক্ষিগত ছিল। ১৯৩৫ সালে সভাপতিরূপে ফজলুল হকের নির্বাচনের সময় থেকে কৃষক প্রজা পার্টি বা KPP প্রায় সম্পূর্ণভাবে একটি পূর্ববঙ্গভিত্তিক দলে পরিণত হয়।[১০] ফজলুল হকের উত্থান বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান সক্রিয় অংশগ্রহণের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকগুলিতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে তীব্র মতভেদ হওয়ায় ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" ঘোষণা করেন। কংগ্রেস ঐ সম্পর্কে নিরপেক্ষ অবস্থান নিলেও বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় চড়া সুরে প্রতিবাদ করে এবং তাঁদের প্রচারের মর্মবস্তু ছিল হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের আনুপাতিক হারে বেশি আসন লাভ।[১১] এর ফলে মুসলিম জনমত বাঁটোয়ারার স্বপক্ষে চলে যায়। সর্বোপরি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভা প্রচার চালায় যে, এর ফলে হিন্দুরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁদের আধিপত্যমূলক অবস্থান হারাবেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কাছে।[১২] বাংলায় ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে কংগ্রেস কোন মুসলিম আসনে প্রার্থী দেয়নি, বরং KPP-র সাথে একটি অলিখিত বোঝাপড়ায় এসেছিল। কিন্তু কংগ্রেস-KPP যৌথ মন্ত্রীসভা গঠন নিম্নলিখিত কারণগুলিতে সম্ভবপর হয়নি ঃ প্রথমত, মন্ত্রীসভার কাজের অগ্রাধিকার প্রসঙ্গে মতবিরোধ; দ্বিতীয়ত, মন্ত্রীসভায় নলিনীরঞ্জন সরকারের যোগদানের বিষয়ে মতানৈক্য; তৃতীয়ত, মারোয়াড়ী অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিনিধি ঘনশ্যামদাস বিড়লার ষড়যন্ত্র। এর ফলে গঠিত হয় KPP-মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা — যা বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে।[১৩] লীগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ফজলুল হকের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে আপন গণভিত্তি সুদৃঢ় করা। ঐ মন্ত্রীসভার স্থায়িত্বকাল (১৯৩৭-৪১) বাঙালী মুসলিম মানসে KPP-র

গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় — প্রথমত, হক স্বয়ং লীগে যোগদান করেন এবং লীগকে মুসলিমদের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন রূপে স্বীকৃতি দেন।[১৪] দ্বিতীয়ত, KPP-র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলির র‍্যাডিকাল চরিত্র বজায় রাখা সম্ভব না হলেও মুসলিম জনসমষ্টি মন্ত্রীসভার কাজের ফলে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল।[১৫] স্বাভাবিকভাবে মুসলিম জনমানসে সাধারণভাবে ধারণা হয় যে এটা তাদের সরকার, যারা এর বিরোধী তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের শত্রু। মুসলমাদের মন্ত্রীসভা ও হিন্দুদের কংগ্রেস দুটি পরস্পর বিরোধী শিবির; এই সাম্প্রদায়িক চেতনা সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানের মনে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৪১ সালে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদে যোগদানের প্রশ্নে জিন্নার সাথে মতবিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে হক লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলার মেহনতী মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল অংশের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজনীয়।[১৬] তাছাড়া লীগে অতি প্রভাবশালী কলকাতার উর্দুভাষী মুসলমান বণিকদের সম্পর্কেও তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন।[১৭] ইতিমধ্যে বসু ভ্রাতৃদ্বয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হওয়ায় বাংলায় কংগ্রেস তখন কার্যত দ্বিধাবিভক্ত। অবশেষে শরৎ বসু, শ্যামাপ্রসাদ এবং হকের উদ্যোগে গঠিত হয় Progressive Coalition Party; কিন্তু ঐ মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণের দিন শরৎবাবু গ্রেপ্তার হন। তাঁর অবর্তমানে মন্ত্রীসভার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হিন্দু সদস্য ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, এর ফলে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে লীগের প্রচার জোরালো হবার সুযোগ পায়। দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভা প্রধানত তিনটি বিষয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় : ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, চরম খাদ্যসঙ্কট এবং কিশোরগঞ্জের একটি মসজিদের ভিতর পুলিসের গুলিচালনা।[১৮] আইনসভায় মুসলিম লীগের দ্বারা মন্ত্রীসভাকে সরানোর চেষ্টা বিফল হলে গভর্নর কার্যত প্রতারণার দ্বারা ফজলুল হকের কাছ থেকে তাঁর পদত্যাগপত্র আদায় করেন।[১৯] কিন্তু তবুও একথা অনস্বীকার্য যে দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভার শাসনকালে (December 1941 — March 1943) বাংলায় লীগের প্রতিপত্তি ক্রমশ বাড়ছিল।[২০] এরপর ক্ষমতাসীন হয় লীগের অন্যতম শীর্ষনেতা খাজা নাজিমুদ্দিনের Bengal Coalition; ঐ মন্ত্রীসভা দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির মোকাবিলায় শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হলেও ক্ষমতায় থাকার সুবাদে এবং উল্লেখযোগ্য কংগ্রেস নেতারা কারাবন্দী থাকায় মুসলিম লীগ বাংলায় একটি গণসংগঠনে পরিণত হয়।[২১] মন্ত্রীসভার পতন ঘটে বাজেট অধিবেশনে বিরোধীপক্ষের আনা একটি ছাঁটাই প্রস্তাব গৃহীত হলে (March, 1945)।

১৯৩৭-এর প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেস ও লীগের নির্বাচনী ইস্তাহারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নে মূলত কোন পার্থক্য ছিল না।[২২] মোট ৪৮৫টি মুসলিম সংরক্ষিত আসনের মধ্যে কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল মাত্র ২৬টিতে, অন্যদিকে লীগ পেয়েছিল ১০৯টি আসন। কিন্তু কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় যুক্তপ্রদেশ,

মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রদেশে লীগ সদস্যদের মন্ত্রীসভায় নেওয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় লীগ নেতৃত্বের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়া শুরু হল যে স্থায়ীভাবে সংখ্যালঘু হওয়ায় ভারতবর্ষে ক্ষমতার শরিক কখনই তারা হতে পারবেন না।[২৩] তাছাড়া মোট আটটি প্রদেশে কংগ্রেসী শাসন মুসলিমদের অসন্তোষের উদ্রেক ঘটিয়েছিল; যদিও অনেকক্ষেত্রেই তা ছিল ভিত্তিহীন[২৪] কিন্তু তবু তা লীগের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হয়। কংগ্রেস আপন ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে মুসলমান জনতাকে অবহিত করতে ১৯৩৭ সালে মূলত জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে 'মুসলিম গণসংযোগ কর্মসূচী' নেয়। কিন্তু তা কোন আর্থসামাজিক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট না থেকে কেবলমাত্র বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ থাকায় ব্যর্থ হয়।[২৫] এই পরিপ্রেক্ষিতে জিন্না লীগের সাংগঠনিক শক্তি ও গণভিত্তি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন — যাতে লীগ মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনের স্বীকৃতি পায়।[২৬] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইংরেজ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করায় প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলি ১৯৩৯-এর শেষ দিকে পদত্যাগ করে। লীগ এই সুযোগে তার সংগঠন ও জনপ্রিয়তার যথেষ্ট প্রসার ঘটায়।

মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে (১৯৪০) দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের দাবি উঠলো, যদিও জিন্না ব্যক্তিগতভাবে ঐ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না।[২৭] জিন্নার পাকিস্তানদাবির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় স্তরে মুসলমানদের জন্য ক্ষমতার তুল্যমূল্য অংশ আদায় করা। ১৯৪২-এর ক্রিপস প্রস্তাব জিন্নার অবস্থানের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতাকে স্পষ্ট করেছিল সম্প্রদায়ের বদলে প্রদেশগুলিকে কেন্দ্রের বাইরে থাকার অধিকার দেবার প্রস্তাব করে। ১৯৪৪ সালে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী প্রস্তাব দেন, যুদ্ধাবসানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিতে যাবতীয় অধিবাসীদের গণভোটের দ্বারা পৃথকীকরণের প্রশ্নটির মীমাংসা হবে। কিন্তু জিন্নার মতে এর ফলে সৃষ্টি হবে "বিকলাঙ্গ ও কীটদষ্ট" পাকিস্তানের, তাছাড়া প্রস্তাবানুসারে অ-মুসলমানরা মুসলমানদের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার সুযোগ পাবে। ১৯৪৫-এর সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হয়, কেননা বড়লাট ও কংগ্রেস নেতারা মেনে নিতে পারেননি যে পুনর্গঠিত শাসন পরিষদের সকল মুসলমান সদস্য বাধ্যতামূলক ভাবে লীগের প্রতিনিধি হবেন। ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনে লীগের বিপুল জয়লাভ লীগকে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৪৬-এর মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা ছিল অবিভাজ্যরূপে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সর্বশেষ প্রয়াস। কিন্তু কংগ্রেস কার্যনির্বাহী সমিতি প্রস্তাবটি গ্রহণ করার পর সভাপতি জওহরলাল মন্তব্য করেন কংগ্রেস কেবলমাত্র গণপরিষদে যোগ দিতে সম্মত হয়েছে।[২৮] তাঁর ঐ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে লীগ মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনায় তার সম্মতি প্রত্যাহার করে নেয় এবং পাকিস্তান প্রাপ্তির জন্য 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' আহ্বান জানায়।

১৯৪৬-এর প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে লীগ বাংলায় ১১৩টি আসন লাভ করে।

মন্ত্রীসভা গঠন করে সুরাবর্দীর নেতৃত্বে। ১৬ই আগস্ট তারিখে তথাকথিক 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবসে যে পাশবিক সাম্প্রদায়িক হানাহানির সূচনা হয়, তাতে ক্ষমতাসীন সরকারের একটি বড় ভূমিকা ছিল।[২৯] রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক উভয় দিক থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম — স্পষ্ট হয়ে উঠল উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের অভাব।[৩০] ইতিমধ্যে ১৯৪৭-এর ২০শে ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ঘোষণা করেন পরবর্তী বছরের ৩০শে জুনের মধ্যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করবে। বড়লাট হিসেবে মাউন্টব্যাটেনের আবির্ভাব ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া দ্রুততর করে তোলে। নেহরু ও প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস তখন ক্ষমতা গ্রহণ করতে উদগ্রীব, এমনকি দেশভাগের মূল্যেও।[৩১] কংগ্রেস অবশ্য দেশবিভাগে সম্মত হয়েছিল এই শর্তে যে লীগ ও জিন্না একে চূড়ান্ত বোঝাপড়া বলে মেনে নেবেন। ১৯৪৭-এর ৮ই মার্চ কংগ্রেস হাইকমান্ড ভারত বিভাগের প্রস্তাব নেন। শেষমুহূর্তে শরৎ বসু এবং প্রাদেশিক লীগের সম্পাদক আবুল হাশিম প্রচেষ্টা চালান অবিভক্ত স্বাধীন সার্বভৌম স্বতন্ত্র বাংলা সাধারণতন্ত্র গঠন করার—কিন্তু ঐ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা ও পরস্পরবিরোধিতার জন্য এটি ব্যর্থ হয়।[৩২] অবশেষে ১৯৪৭-এর ৩রা জুন তারিখে ঘোষিত বড়লাটের Indian Policy Statement অনুসারে ২০শে জুন বাংলার অ-মুসলিম অঞ্চলের বিধায়করা মিলিত হয়ে দেশবিভাগের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেন। এরপর সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয় সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে। এইভাবে ১৯০৫-এর পর ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হয়।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১. Partha Chatterjee, The Present History of West Bengal : Essays in Political Criticism (O.U.P. 1997) pp-29, 30

২. Goutam Chatterjee, Bengal Electoral Politics & Freedom Struggle : 1862-1947 (ICHR, New Delhi, 1984) p-74

৩. Rajat Kanta Ray, Social Conflict & Political Unrest in Bengal : 1875-1927 (New Delhi, 1984)

৪. Goutam Chatterjee, পূর্বোক্ত, pp-90, 95, 96

৫. Partha Chatterjee, Bengal : 1920-1947 The Land Question (Calcutta, 1984) pp-87-95

৬. Suniti Kumar Ghosh, India and the Raj (I), pp. 276-85

৭. Partha Chatterjee, "Bengal Politics and the Muslim Masses 1920-47" in Mushirul Hasan (ed), Indias Partition : Process, Strategy & Mobilization, pp. 263, 264, 267, 268

৮. Sugata Basu, Agrarian Bengal : Economy, Social Structure & Politics 1919-1947 (Cambridge, Cambridge University Press, 1986) pp. 181-232

৯. Joya Chatterjee, Bengal Divided . Hindu-Communalism and Partition 1932-1947 (Cambridge, Cambridge University Press, 1995) p. 228

১০. Jatindra Nath Dey, "History of the KPP of Bengal : 1929-1947", Unpublished Ph.D. thesis, Delhi University, 1977

১১. সুনীতি কুমার ঘোষ, বাংলা বিভাজনের রাজনীতি-অর্থনীতি, ১৫১

১২. Leonard Gordon, "Problems of Nationalism and Identity in the 1947 Partition" in Mushirul Hasan (ed), Indias Partition p. 287

১৩. Ram Gopal, Indian Muslims : A Political History 1858-1947 (Asia Publishing House, Bombay, 1959) p. 246

১৪. Shila Sen, Muslim Politics in Bengal : 1937-1947 (Impex India, New Delhi, 1976) p. 65

১৫. Joya Chatterjee, পূর্বোক্ত, pp. 104-108

১৬. অমলেন্দু দে, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক (কলকাতা, ১৯৭২), p. ৩৪

১৭. আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (ঢাকা, ১৯৭০) p. 231

১৮. Shila Sen, প্রাগুক্ত, p. 137

১৯. Goutam Chatterjee, প্রাগুক্ত, pp. 190, 191

২০. Shila Sen, প্রাগুক্ত, pp. 164-171

২১. Shila Sen, তদেব, pp. 181-186

২১. Mushirul Hasan (ed), প্রাগুক্ত, Introduction, p. 9

২৩. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জিন্না/পাকিস্তান: নতুন ভাবনা (মিত্র-ঘোষ, কলকাতা, ১৪০৬) p. 311

২৪. Humayun Kabir, Muslim Politics : 1906-42, p. 14

২৫. Mushirul Hasan, "The Muslim Mass Contacts Campaign" in Mushirul Hasan (ed), প্রাগুক্ত

২৬. Z. H. Zaidi, "Aspects of the Development of the Muslim League Policy : 1937-47" in C. H. Philips & M. D. Wainwright (ed), The Partition of India : Policies and perspectives (London, 1970) pp. 258, 259, 267-271

২৭. Zinnah's speech in the first session of the Constituent Assembly of Pakistan on 11.8.1947 in Hector Bolitho, Jinnah : Creator of Pakistan (London 1954) p. 197

২৮. Maulana Abul Kalam Azad, India wins Freedom (1959)

২৯. Kamala Sarkar, Bengal Politics : 1937-1947 (A. Mukherjee, Calcutta, 1990) p. 95

৩০. তদেব, pp. 94-99

৩১. Sugata Basu & Ayesha Jalal, Modern South Asia : History, Culture & Political Economy (O.U.P., 1997) pp. 184-187, 193, 194

৩২. Abul Hashim, In Retrospection, pp. 153, 154
Leonard Gordon, প্রাগুক্ত, pp. 312, 313

বঞ্চিত মানুষ, অলীক স্বাধীনতা ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিঃ ১৯৪৮-১৯৫০ : অসফল বিপ্লব প্রয়াস

অমিতাভ চন্দ্র

১৫ অগস্ট ১৯৪৭। মর্মান্তিক দেশবিভাগকে সঙ্গী করে এল জাতীয় স্বাধীনতা। এই জাতীয় স্বাধীনতা এসেছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপ ধরে, দেশবিভাগের বিনিময়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গের কাছ থেকে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল ভারতের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর হাতে, যে শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল কংগ্রেস। একশো নব্বই বছর ব্যাপী প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অবসান ঘটালেও ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপ ধরে আসা এই জাতীয় স্বাধীনতা সাধারণ মানুষের জন্য প্রকৃত মুক্তির বার্তা বহন করে আনে নি। শোষণের নিগড় থেকে সার্বিক মুক্তি ঘটে নি সাধারণ মানুষের, অবসান ঘটে নি তাদের বঞ্চনার। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপ ধরে এলেও আর শোষণ-নিপীড়ন-বঞ্চনার অবসান না ঘটালেও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের সেই মুহূর্তে কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে এই স্বাধীনতার প্রকৃত চরিত্র নিয়ে কোনও প্রশ্ন জাগে নি। আর তাই সেই স্বাধীনতার আগমন কালে সাধারণ মানুষ সানন্দে, সোৎসাহে স্বাগত জানিয়েছিল সেই স্বাধীনতাকে।

মর্মান্তিক দেশবিভাগকে সঙ্গী করে, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপ ধরে আসা জাতীয় স্বাধীনতার চরিত্র নিয়ে কোনও প্রশ্ন সেই মুহূর্তে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও তোলে নি। পরিবর্তে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সেই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি স্বাগতই জানিয়েছিল সেই স্বাধীনতাকে। কার স্বাধীনতা ? কিসের স্বাধীনতা ? এরকম কোনও প্রশ্ন সেদিন কমিউনিস্ট পার্টি তোলে নি। দেশ তখন দাঙ্গা-বিধ্বস্ত। আর তাই ভয়-সন্দেহ-অবিশ্বাস কলুষিত শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া থেকে মুক্তিই তখন প্রতিভাত হয়েছিল স্বাধীনতা হিসাবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও সেই মুহূর্তে এই অর্থেই স্বাধীনতাকে গ্রহণ করেছিল।

১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট যেদিন কংগ্রেস সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল, সেই স্বাধীনতা দিবস (Independence Day)-কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই) উদ্‌যাপন করেছিল 'জাতীয় আনন্দের দিন' ('the day of national rejoicing')[১] হিসাবে। নিজস্ব কেন্দ্রীয় মুখপত্র *People's Age* পত্রিকায় কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ঘোষণাই করেছিলেন, স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ উৎসবে কমিউনিস্টরাও সামিল হবেন।[২] শুধু তাই নয়, জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারকে সমর্থনও যুগিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি, কারণ এই দলের চোখে এই

সরকার ছিল 'জাতীয় অগ্রগতি' ('national advance')[৩]-র সরকার, এবং দ্ব্যর্থহীন ভাবেই ঘোষণা করেছিল যে, স্বাধীন ভারতে সি পি আই 'অনুগত বিরোধী পক্ষ' ('loyal opposition')-এর ভূমিকাই পালন করবে।

সুতরাং 'জাতীয় অগ্রগতির সরকার নেহ্রু সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন' জানিয়ে স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি তার যাত্রা শুরু করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি জানিয়েছিল যে, দেশজোড়া সাম্প্রদায়িক হানাহানির পরিপ্রেক্ষিতেই জওহরলাল নেহ্রুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারকে এই 'অকুণ্ঠ সমর্থন'। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বেশ গুরুত্ব সহকারেই ছাপা হয়েছিল — 'নেহ্রু গভর্নমেন্টকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থনের জন্য পি. সি. যোশীর আবেদন। এই সমর্থনের প্রধান কারণ সমূহ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী দ্ব্যর্থহীন ভাবেই ঘোষণা করেছিলেন :

> ...আমাদের জাতীয় গভর্নমেন্টের নেতা পন্ডিত নেহ্রুর পিছনে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি আজ সমগ্র দেশবাসীকে অকুণ্ঠ আহ্বান জানাইতেছে। জাতির শত্রুরা আজ পন্ডিত নেহ্রু তথা তাঁহার গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে দেশের সমস্ত মিলিত শক্তির দ্বারা তাহাকে রুখিতেই হইবে।[৪]

স্বাধীনতা প্রাপ্তি তথা ক্ষমতা হস্তান্তর-এর চার মাসের মধ্যেই অবশ্য সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছিল সি পি আই-এর অবস্থান। 'অকুণ্ঠ সমর্থন'-এর পরিবর্তে সি পি আই শুরু করেছিল ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের সার্বিক বিরোধিতা। স্বাধীনতা ক্রমশই অলীক হিসাবে প্রতিভাত ও প্রতিপন্ন হয়েছিল সি পি আই-এর চোখে, ক্রমশই তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল এই স্বাধীনতার অসারত্ব। সি পি আই উপলব্ধি করেছিল, এই স্বাধীনতা প্রাপ্তি মানুষের বঞ্চনার অবসান ঘটাবে না। অলীক স্বাধীনতা এবং বঞ্চিত মানুষের সীমাহীন বেদনা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে গিয়েছিল বিপ্লব প্রয়াসের পথে, যদিও সেই বিপ্লব প্রয়াসের শেষ পর্যন্ত পরিসমাপ্তি ঘটেছিল অসাফল্যের মধ্য দিয়ে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপ ধরে আসা জাতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির একেবারে উষাকাল থেকেই অব্যাহত ছিল ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের নানাবিধ জনবিরোধী কাজকর্ম — পশ্চিম বাংলায় এবং অন্যত্র, সারা দেশ জুড়ে। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম দিনেই শ্রীদুর্গা কটন মিলের চার জন নেতৃস্থানীয় ইউনিয়ন কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়। তার প্রতিবাদে চলতে থাকে তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা মনোরঞ্জন হাজরার নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই। অবশেষে ত্যাগ-বীরত্ব-মৃত্যুর সড়ক ধরেই জয়যুক্ত হয়েছিল শ্রীদুর্গা কটন মিলের শ্রমিক সংগ্রাম। কেন্দ্রের এবং বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার সমূহের তরফে লাগাতার চলছিল শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের জীবন, জীবিকা ও অধিকারের ওপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ। আর তার সঙ্গেই যোগ হয়েছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার হরণের যাবতীয় অপপ্রয়াস। ধারাবাহিক ভাবে উন্মোচিত হতে থাকে

সদ্য 'স্বাধীন' ভারতের কেন্দ্রের ও রাজ্য সমূহের 'স্বাধীন' সরকারগুলির জনবিরোধী নিপীড়ক চেহারা।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পুনর্গঠিত পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ২১ নভেম্বর। সেই দিন ছিল ১৯৪৫ সালের ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ব্যাপক গণ আন্দোলনের দ্বিতীয় বার্ষিকী। সেই দিন 'রামেশ্বর দিবস' উপলক্ষে শহিদ্ রামেশ্বরের একটি মূর্তি নির্মাণের প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করার উদ্দেশ্যে একটি ছাত্র মিছিল আসছিল বিধান সভার অভিমুখে। একই সঙ্গে তে-ভাগার দাবিতে প্রায় পনেরো হাজার কৃষকের একটি বিরাট মিছিলও আসছিল বিধান সভার অভিমুখে। উল্লিখিত ছাত্র মিছিল ও কৃষক মিছিল উভয়ই আসছিল স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিধান সভাকে স্বাগত জানাতে। কিন্তু সেই সুযোগ মিছিলকারী ছাত্র ও কৃষকেরা আর পেলেন না। কলকাতার এসপ্ল্যানেড ইস্টে নতুন বিধান সভাকে অভিনন্দন জানাতে আসা মিছিলকারী সমবেত কুড়ি-পঁচিশ হাজার কৃষক ও ছাত্রের ওপর মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের পুলিস লাঠি চালাল ও কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করল। এই ভবেই শুরু হল পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের রাজত্ব — ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মুখ্যমন্ত্রিত্ব।

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মুখ্যমন্ত্রিত্বে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার প্রথম যে কালা কানুন চালু করেছিল, তার নাম ছিল 'পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা আইন'। পরে এই আইনের নামকরণ হয়েছিল 'পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন'। সুরাবর্দির শাসনকালে যে 'বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স্, ১৯৪৬' জারি করা হয়েছিল, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মুখ্যমন্ত্রিত্বে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সরকার তাকে ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর তারিখে বিল আকারে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় উত্থাপন করেছিল এবং এই বিল বিবেচনার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়েছিল। বিল আকারে উত্থাপিত এই 'পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা আইন'-এর মর্মবস্তু ছিল বিনা বিচারে জেল, সংবাদপত্রের সেন্সর অর্থাৎ কন্ঠরোধ, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে ন্যায্য ধর্মঘটও নিষিদ্ধ, রাজনৈতিক ধর্মঘটে পাঁচ বছর সাজা, সরকারি কর্মচারীদের অভিযোগ চাপা দেওয়া, এবং সর্বোপরি প্রমাণবিহীন আটক ও বিচারবিহীন নিরঙ্কুশ দমননীতি। আলোচ্য দানবীয় বিলটিতে আমলাতন্ত্র ও পুলিসকে গণ আন্দোলন দমনের ঢালাও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী সুরাবর্দি মন্ত্রিসভাও আগে একই উদ্দেশ্যে 'বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স্'-টিকে ব্যবহার করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গেও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মন্ত্রিসভা এই অর্ডিন্যান্স্ প্রয়োগ করা শুরু করে দিয়েছিল। এই অর্ডিন্যান্স্ বলে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দেওয়া আটক আদেশ অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ২১ নভেম্বর আর সি পি আই নেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও পঁচিশ জন আর সি পি আই নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হলেন এবং তাঁদের বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হল। শেষ

পর্যন্ত তাঁরা মুক্তি পেয়েছিলেন ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করছেন, যা রাজ্যের তথা সারা দেশের নিরাপত্তা ব্যাহত করতে চলেছে। এই অর্ডিন্যান্স্ বলে যে-কোনও নাগরিককেই এই রকম নিরাপত্তা ব্যাহত করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে বন্দী করে রাখা যেতে পারত।

এই কুখ্যাত অর্ডিন্যান্স্টিকেই প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিসভা বিল আকারে উপস্থাপিত করেছিল এবং কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু সহ বিধান সভার কয়েকজন সদস্যের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে ২৭ নভেম্বর ১৯৪৭ বিলটিকে বিবেচনার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ১৫ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় ৪৭-১২ ভোটে গৃহীত হয়ে এই দানবীয় বিলটি পাকাপাকি ভাবে আইনে পরিণত হয়েছিল।

এই দানবীয় বিলটির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা ভবনের গেটের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১০ ডিসেম্বর। দাবি ছিল এই নিরাপত্তা বিলটিকে প্রত্যাহার করতে হবে। বিনিময়ে তাঁরা পেলেন লাঠি, কাঁদানে গ্যাস এবং শেষ পর্যন্ত গুলি। বহু মানুষ আহত হলেন, নিহত হলেন আর ডব্লিউ এ সি-র ক্যাডেট শিশির মন্ডল। স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের শাসনে এই প্রথম গুলিবর্ষণ এবং সেই গুলিবর্ষণে প্রথম শহিদ্ শিশির মন্ডল।

তীব্র বিক্ষোভ সঞ্চারিত হল জনমানসে। আলোচ্য দানবীয় বিলটির তীব্র বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন কমিউনিস্টরা। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য গঠিত হল সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা কমিটি। কমিউনিস্টদের ও অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে এই কমিটিতে যোগ দিয়ে নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সোচ্চার হলেন শরৎচন্দ্র বসু, মৃণালকান্তি বসু, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ। বিধান সভায় সরব হয়েছিলেন জ্যোতি বসু।

এই কুখ্যাত বিলের বিরুদ্ধে আবার বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ৫ জানুয়ারি। সেই দিন কালা কানুন ও দমন নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিল। এই সাধারণ ধর্মঘট সফল করার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। সমর্থন জানিয়েছিল শরৎচন্দ্র বসুর সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি এবং অন্যান্য কয়েকটি বামপন্থী দল। পুরোদস্তুর বিরোধিতা করেছিল কংগ্রেস এবং সোস্যালিস্ট পার্টি। বিরানব্বই হাজার শ্রমিকের প্রতিবাদ ধর্মঘট পালিত হয়েছিল কলকাতা, হাওড়া ও ২৪ পরগণা জেলায়। বিক্ষোভকারীরা আক্রান্ত হয়েছিলেন পুলিসের সমর্থনপুষ্ট এবং কংগ্রেসের দ্বারা নিয়োজিত ও মদতপ্রাপ্ত গুন্ডাদের হাতে।

১৯৪৮ সালের ৫ জানুয়ারির সাধারণ ধর্মঘট পুরোপুরি সফল হয় নি এবং ঐ দিনটিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক চরম তিক্ততায় বিষিয়ে উঠেছিল।

তীব্র আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন কমিউনিস্টরা এবং তা কংগ্রেসই পরিচালনা করেছিল। ৫ জানুয়ারি ১৯৪৮ কমিউনিস্টদের চোখে নতুন করে ধরা পড়েছিল কংগ্রেসের স্থূল শ্রেণী চরিত্র। সেই দিন থেকেই শুরু হয়েছিল কমিউনিস্টদের স্বপ্ন ভঙ্গের পালা। কংগ্রেস-কমিউনিস্ট মৈত্রী যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, অনেক রূঢ় অভিজ্ঞতার বিনিময়ে আক্রান্ত ও রক্তাক্ত কমিউনিস্টরা সেদিন এই সার সত্যটুকু উপলব্ধি করেছিলেন।

'পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা বিল' পাস হয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন'-এর রূপ নেওয়ার পরই বিধান সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তার পরই অপসারিত হল ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা এবং তার পরিবর্তে গঠিত হল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বাধীন নতুন মন্ত্রিসভা। পশ্চিমবঙ্গের নতুন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন কিরণশঙ্কর রায়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও কিরণশঙ্কর রায়ের যৌথ প্রয়াসে শুরু হল কমিউনিস্ট দমন-দলনের নতুন অধ্যায়।

১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও লাইন দুটোই পাল্টাল এই কংগ্রেসে। লাইন পরিবর্তনের ব্যাপারটি আদৌ আকস্মিক ছিল না। ১৯৪৬ সালের অগস্ট মাস থেকে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস অবধি প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন দলিলে লাইন পরিবর্তনের ইঙ্গিত ছিল। অবশ্য এগুলি সবই ছিল কেবলমাত্র ইঙ্গিতই। রাজনৈতিক 'চরমপন্থা'র পালে বেশ কিছুটা বাতাস লাগলেও দুই লাইনের টানাপোড়েনে ও দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছিল রাজনৈতিক 'নরমপন্থা'রই, এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতেই স্বাধীনতার সময়ে এবং ঠিক তার অব্যবহিত পরবর্তী কালে সি পি আই নেহরু সরকারকেই অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ৭ থেকে ১৬ ডিসেম্বর বোম্বাইতে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ বৈঠকে কেন্দ্রীয় কমিটি *For the Struggle for Full Independence and People's Democracy* এবং *On the Present Policy and Tasks of the Communist Party of India*[৬] নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। এই দুই দলিলেই রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তনের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এরপরই আসছে দ্বিতীয় কংগ্রেসে পরিবর্তিত রাজনৈতিক লাইন। কিন্তু এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক লাইনের অর্থাৎ রাজনৈতিক 'চরমপন্থা'র বা 'সংগ্রামী' রাজনৈতিক লাইনের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের এই দুটি রাজনৈতিক প্রস্তাবেই।

রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তনের সঙ্গে নেতৃত্ব পরিবর্তনের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবেই জড়িত ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বও পরিবর্তিত হল এই দ্বিতীয় কংগ্রেসেই। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের

সময় কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশীর আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব বজায় থাকলেও রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগ তখনই যোশীর হাতছাড়া হয়ে গেছে। পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত হলেন এক দশকেরও অধিক সময় এই পদে অবস্থানকারী, সেই সময় 'সংস্কারপন্থী' হিসাবে চিহ্নিত ও সমালোচিত পি সি যোশী। তাঁর জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হলেন 'সংগ্রামী' বি টি রণদিভে। রণদিভের নেতৃত্বে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত হল নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি। নেতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক লাইনও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হল দ্বিতীয় কংগ্রেসেই। 'জাতীয় অগ্রগতির সরকার নেহ্‌রু সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন' জ্ঞাপনের 'সংস্কারবাদী' অবস্থান সম্পূর্ণ বর্জিত হল কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে। পরিবর্তে দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত *Political Thesis*[৭]-এ 'জাতীয় আত্মসমর্পণের সরকার, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও তার সঙ্গে আপসকামীদের সরকার নেহ্‌রু সরকার'-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতের আহ্বান জানানো হল। ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ অনুষ্ঠিত এই ঐতিহাসিক দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করেছিল :

> We characterize here the National Government as the Government of national surrender, of collaborators, a Government of national compromise. Thus in place of our former characterization about the Government as one of an advance, with whom we should have a joint front, we have now the characterization that it is a Government of national surrender and collaboration; the conclusion that follows, therefore, is that it is the basic policy of the working class and its Party to oppose this Government, and this is what we have sharply underlined.[৮]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের এই 'সংগ্রামী' ও 'চরমপন্থী' রাজনৈতিক লাইন এই দলকে নিয়ে গেল জওহরলাল নেহ্‌রুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে 'বৈপ্লবিক সশস্ত্র অভ্যুত্থান' ('revolutionary armed insurrection')-এর ডাক দেওয়ার পথে। দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত সবকটি রিপোর্টে ও প্রস্তাবেই প্রত্যক্ষ সংঘাতের এই মেজাজটি অক্ষুণ্ণ রাখা হল। পার্টি কংগ্রেসের শেষে কলকাতা ময়দানের প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করা হল — 'তেলেঙ্গানার পথ আমাদের পথ'। প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে 'ভুয়া' বা 'মিথ্যা' হিসাবে চিহ্নিত করে কমিউনিস্ট পার্টি দৃপ্ত কন্ঠে ঘোষণা করল :

> 'দেশ আভিতক ভুখা হ্যায়,
> ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়।'

এই 'ভুয়া' বা 'ঝুটা' আজাদীকে নস্যাৎ করে কমিউনিস্ট পার্টি ডাক দিল প্রকৃত আজাদীর জন্য সংগ্রামের, যে আজাদীর মর্মবস্তু হল সমস্ত রকমের শোষণ-নিপীড়ন-বঞ্চনার নিগড়

থেকে মুক্তি।

দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হওয়ার ঠিক কুড়ি দিনের মাথায় ২৬ মার্চ ১৯৪৮ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এই রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করল। পরাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘ আট বছর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এবার কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হল স্বাধীন ভারতের একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে। সেদিনই ভোর থেকে শুরু হয়ে গেল ব্যাপক ধরপাকড়, পশ্চিম বাংলার সর্বত্র সীল হয়ে গেল কমিউনিস্ট পার্টির অফিস, সীল হয়ে গেল কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা'-র অফিস। পশ্চিম বাংলার সর্বত্র গ্রেপ্তার হলেন ও হতে থাকলেন বহু কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী।

স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম নিষিদ্ধ ও বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। পরবর্তী কালে ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের গোড়াতেই মহীশূর, ইন্দোর, ভূপাল ও চন্দননগরে (তখনও পর্যন্ত ফরাসি শাসিত) কমিউনিস্ট পার্টি অবৈধ ঘোষিত হয়েছিল। সারা ভারত জুড়েই পার্টি অফিসগুলিতে পুলিসী হানা চলেছিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা, এলাহাবাদ, নাগপুর প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলির পার্টি অফিসে এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও গণ সংগঠনগুলির দপ্তরে দপ্তরে ব্যাপক হারে খানাতল্লাসি চলেছিল। দেশের সর্বত্রই চলেছিল ব্যাপক হারে কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের ধরপাকড়। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও অন্ধ্র কমিটির যাবতীয় মুখপত্র নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে জওহরলাল নেহ্রুর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের পূর্ণ সম্মতিক্রমেই মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিক ভাবে অবৈধ ঘোষিত হয়েছিল। সারা দেশ জুড়েই কংগ্রেস সরকারগুলির তরফে চলেছিল লাগাতার কমিউনিস্ট-বিরোধী জেহাদ।

দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির লাইন হল দেশজোড়া বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের লাইন, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের লাইন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চলল অকুতোভয় জঙ্গী কৃষক সংগ্রাম — তেভাগা-তেলেঙ্গানা-কাকদ্বীপ-বড়া কমলাপুর-ডুবিরভেড়ি-অগ্রদ্বীপ, পাশে এসে দাঁড়াল চন্দনপিঁড়ি-ভাঙড়-নন্দীগ্রাম-বিষ্ণুপুর-হাঁটাল-মাসিলা। কৃষক সংগ্রাম পেল এক নতুন মাত্রা, খুলে গেল কৃষক আন্দোলনের এক নতুন দিগন্ত, কমিউনিস্ট আন্দোলনে সৃষ্টি হল এক সংগ্রামী মেজাজ।

অপরদিকে সরকারের তরফ থেকে নেমে এল চরম দমন-নিপীড়ন। বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক সংগ্রামের ওপর বারে বারে চলল পুলিসের গুলি, শহিদ্ হলেন বহু কৃষক। কৃষক রমণীরাও পুলিসের গুলির হাত থেকে রেহাই পেলেন না। অহল্যা-অশ্বিনী-সরোজিনী-উত্তমী-বাতাসীদের রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠেছিল কাকদ্বীপের মাটি। রক্ত রাঙ্গা কাকদ্বীপের সেই ভেজা মাটি জন্ম দিয়েছিল এক নতুন কাহিনীর — জন্ম নিয়েছিল বাংলার শিশু তেলেঙ্গানা। লয়ালগঞ্জ হয়ে উঠেছিল লালগঞ্জ, সেই লালগঞ্জে চলেছিল সোভিয়েত

গড়ার পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা। হাওড়া জেলার হাঁটাল গ্রামে পুলিসের গুলিতে শহিদ্ হয়েছিলেন কৃষক পরিবারের ছয় মহিলা : সুধা সাঁতরা, বৃদ্ধা মাখনময়ী পণ্ডিত, পারুলবালা সাঁতরা, সিন্ধুবালা দলুই, কালিকা পাত্র ও ৯ বছরের মেয়ে যশোদা সাঁতরা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চন্দনপিঁড়ির শহিদ্ অহল্যার মতোই হাঁটালের শহিদ্ যশোদা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রতীক।

কলকাতার রাজপথে চলল গুলি — ২৭ এপ্রিল ১৯৪৯। শহিদ্ হলেন লতিকা-প্রতিভা-অমিয়া-গীতা। ১৯৪৯ সালের ৮ জুন প্রেসিডেন্সি জেলে চলল গুলি। ১ জন নিরাপত্তা বন্দী নিহত ও ১ জন আহত হলেন। ৯ জুন আলিপুর জেলে চলল লাঠি। আহত হলেন ১২ জন। ১০ জুন ১৯৪৯ দমদম জেলে চলল গুলি। নিহত হলেন ৩ জন নিরাপত্তা বন্দী ও আহত হলেন ৮ জন। নিহত হলেন প্রভাত-সুমন্ত-মুকুল — তিন কমিউনিস্ট রাজবন্দী। ১১ জুন থেকে শুরু হয়েছিল জেলে অনশন ধর্মঘট। জেলখানাও পরিণত হয়েছিল সংগ্রামের অন্যতম ফ্রন্টে।

কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে পরবর্তী দুই বছরের ইতিহাস একদিকে নেহরু-বিধান রায়ের কংগ্রেস সরকারের কমিউনিস্ট দলন-দমনের ইতিহাস, আর অপরদিকে পার্টি নেতৃত্বের চরম 'আমলাতান্ত্রিকতা'র ও পার্টি লাইনের 'বাম-সংকীর্ণতা'র ইতিহাস। যোশী নেতৃত্বের চরম সংস্কারবাদ উল্টো ধাক্কায় পরিণত হল রণদিভে নেতৃত্বের গোঁড়া 'সংকীর্ণতাবাদ'-এ। কংগ্রেস নেতৃত্বের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার ও নেহরু স্তুতির উল্টো রথের যাত্রায় এল প্রস্তুতিবিহীন দেশজোড়া বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের আহ্বান। এই লড়াই-এ জেলখানাও অন্যতম ফ্রন্ট, যেখানে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রায় নিরস্ত্র ও অবরুদ্ধ অবস্থায় অসম লড়াই-এ গুলি খেয়ে মরা অনিবার্য ঘটনা। কমিউনিস্ট পার্টির সেই 'বামপন্থী' যুগে অর্থাৎ ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ কালপর্বে নির্বিচারে যাঁর-তাঁর সম্পর্কে 'সংস্কারপন্থী' আখ্যা প্রয়োগ করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। 'বাম-হঠকারিতা'র এ ছিল একেবারে আদর্শ নিদর্শন। ফলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ও আন্দোলনের এই দুই বছর (১৯৪৮-১৯৫০) একদিকে যেমন অকুতোভয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের যুগ, অপরদিকে তেমনই 'বামপন্থা'র যুগ — 'বাম-সংকীর্ণতা' ও 'বাম-হঠকারিতা'র যুগ।

এর মধ্যেই শুরু হয়েছিল পার্টি পলিটব্যুরোর সঙ্গে অন্ধ্র পার্টি নেতৃত্বের ভারতের বিপ্লবের বর্তমান স্তর ও তার আনুষঙ্গিক রণনীতি-রণকৌশল সংক্রান্ত মতবিরোধ। সেটা চল্লিশের দশকের শেষ বছর।

১৯৫০ সালের ২৭ জানুয়ারি *Cominform* ('কমিনফর্ম')-এর মুখপত্র *For a Lasting Peace, For a People's Democracy* !-তে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ পুরো চিত্রটাই আবার বদলে দিল। মাও সে-তুং (মাও জে-দং)-এর নেতৃত্বাধীন সফল

চীন বিপ্লবও এই পট পরিবর্তনে সাহায্য করেছিল। এই দুই-এর প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয়েছিল তীব্র আন্তঃ-পার্টি সংগ্রাম। নেতৃত্বের বিরূপ সমালোচনার পাশাপাশি এল আত্মসমালোচনা। আর এই তীব্র আন্তঃ-পার্টি সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পঞ্চাশের দশকের সূত্রপাত। পঞ্চাশের দশকের প্রথম বছরের মাঝামাঝি পার্টি নেতৃত্বে ও লাইনে আবার পরিবর্তন ঘটল। বি টি রণদিভের জায়গায় সি রাজেশ্বর রাও পার্টির সাধারণ সম্পাদক হলেন। অন্ধ্র লাইন জয়যুক্ত হল। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বলা হল — চীনের পথ ধরেই ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এগিয়ে যাবে।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহার দিয়ে ১৯৫১ সালের শুরু। ১৯৫১ সালের ৫ জানুয়ারি নিষেধাজ্ঞামুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য আবির্ভাব ঘটল জনজীবনে — সম্পূর্ণ অবসান ঘটল কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনী যুগের। এর পেছনে ছিল হাইকোর্টের এক গুরুত্বপূর্ণ রায়।

নেহ্‌রু সরকার ঘোষিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৫১ সালের মে মাসে আবার পার্টি নেতৃত্বে ও লাইনে পরিবর্তন ঘটল। সি রাজেশ্বর রাও-এর জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে এলেন অজয়কুমার ঘোষ। সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি আবার সাংবিধানিক পথে ফিরে এল। আবার শুরু হল 'সাংবিধানিক কমিউনিজম'-এর।[১০]

সদ্য স্বাধীন ভারতে বেশ কিছুটা আকস্মিক ভাবেই কমিউনিস্ট পার্টি ডাক দিয়েছিল দেশজোড়া 'বৈপ্লবিক সশস্ত্র অভ্যুত্থান'-এর, গ্রহণ করেছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের লাইন। কিন্তু তার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিরও নিজস্ব প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছিল না, আর সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের জনসাধারণও আশু বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অর্থাৎ ভারতের তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি তখন এই লাইন বাস্তবায়নের পক্ষে অনুকূল ছিল না। ফলে অনিবার্য পরিণতি হিসাবে উত্তাল চল্লিশের বিপ্লব প্রয়াস অসমাপ্তই থেকে গেল, বিপ্লব আর সমাপ্ত হল না।

অসাফল্যের মধ্য দিয়েই ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ কালপর্বের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লব প্রয়াসের পরিসমাপ্তি ঘটলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীন ভারতে প্রতিবাদী রাজনীতির সূত্রপাত ঘটেছিল তৎকালে কমিউনিস্ট পার্টির হাত ধরেই। কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন রাজনীতিই বেঁধে দিয়েছিল স্বাধীন ভারতে প্রতিবাদী রাজনীতির সুর। পরবর্তীকালে প্রতিবাদী রাজনীতির এবং জনগণের দাবিদাওয়া নিয়ে ব্যাপক গণ আন্দোলনের পথও নিঃসন্দেহে প্রস্তুত করে দিয়েছিল সদ্য স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামী রাজনীতি। অসফল বিপ্লব প্রয়াসের পাশাপাশি এই বিষয়টির প্রতিও দৃষ্টিপাত করা দরকার।

সূত্রনির্দেশ :—

১. *People's Age*, August 3, 1947, p. 1.

২. Ibid,. p. 1. এছাড়াও দেখুন : অমলেন্দু সেনগুপ্ত, 'উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব', পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৮৯, পৃপৃ ২৩৮-৩৯।

৩. *Mountbatten Award and After*, Political Resolution of the Central Committee (CC) of the Communist Party of India (CPI), June, 1947, People's Publishing House Ltd., Bombay, p. 6; *Mountbatten Award and After*, also in TG Jacob (ed.), *National Question in India : CPI Documents : 1942-47*, Odyssey Press, New Delhi, May, 1988, p. 215.

৪. 'যুগান্তর', ৮ অক্টোবর ১৯৪৭। উদ্ধৃত : অমলেন্দু সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৪৫।

৫. *Communist Statement of Policy : For the Struggle for Full Independence and People's Democracy*, Resolution on the present political situation passed by the Central Committee of the Communist Party of India at its meeting held in Bombay from 7th to 16th December, 1947, People's Publishing House Ltd., Bombay, December, 1947, pp. 1-14.

৬. *On the Present Policy and Tasks of the Communist Party of India*, Adopted by the Central Committee of the CPI at its meeting held in Bombay from December 7 to 16, 1947.

৭. *Political Thesis of the Communist Party of India*, Adopted at the Second Congress, February 28 - March 6, 1948, Calcutta, Published by the Communist Party of India, Bombay, July, 1948, pp. i-v + 1-118; 'Political Thesis of the Communist Party of India', Adopted at the Second Congress, February 28 to March 6, 1948, Calcutta, in M B Rao (ed.), *Documents of the History of the Communist Party of India*, (hereafter *Documents*), Volume VII (1948-1950), People's Publishing House, New Delhi, January, 1976, pp. 1-118.

৮. *Opening Report by Comrade B.T. Ranadive on the Draft Political Thesis,* 29 February 1948. Second Congress of the CPI, published as a pamphlet along with *Comrade Bhowani Sen's Speech on the Report on Pakistan*, 1 March 1948, CPI, Bombay, p. 13. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : ibid., pp. 1-25.

৯. 'Mighty Advance of the National Liberation Movement in the Colonial and Dependent Countries', (Editorial), *For a Lasting Peace, For a People's Democracy !*, Bucharest Organ of the Information Bureau of the Communist and Workers' Parties (Cominform), No. 4 (64), 27th Januray, 1950, p.1.

১০. Gene D Overstreet and Marshall Windmiller, *Communism in India*, The Perennial Press, Bombay, 1960, p. 309. Overstreet and Windmiller এই পর্যায়কে আখ্যা দিয়েছেন — 'The Return to Constitutional Communism'.

বেরুবাড়ী আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তার তাৎপর্য

মাধুরী পাল

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত সদর ব্লকের অধীন বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী একটি বৃহৎ মৌজা বেরুবাড়ী।[১] এই অঞ্চলকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা — বেরুবাড়ী উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং মধ্য। তবে রাজস্ব তথ্যাদি অনুযায়ী বৃহৎ বেরুবাড়ী মৌজা খারিজা বেরুবাড়ী, দক্ষিণ বেরুবাড়ী, বেরুবাড়ী এবং আরজি বেরুবাড়ী ভাগে বিভক্ত। আরজি নামের অর্থ, নদী তার গতি পথ পরিবর্তন করলে যে নতুন জায়গা ভূমি উৎপন্ন হয় এরূপ ক্ষেত্র অর্থাৎ কোন কোন জায়গা নিষ্কর জমির ক্ষেত্রেও এই আরজি শব্দটি ব্যবহার হয়। মনে হয় আরজি বেরুবাড়ীর ক্ষেত্রে এরূপ হয়েছিল। কথা হল বেরুবাড়ী নাম কেন হল ? ষোড়শ শতাব্দীতে বীরেন্দ্র নারায়ণ রায় নামীয় এক অর্থবান লোক বাস করতেন। তাঁর প্রতাপ ছিল দুর্দ্দাম। সেই বীরেন্দ্র থেকে বিরু নারায়ণ তার অপভ্রংশ হয় বেরুবাড়ী।[২] এই হল বেরুবাড়ী নামকরণের প্রচলিত মত।

১৯৪৭ সালের র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার দ্বারা বেরুবাড়ীর ন্যায় বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কচ্ছ কিংবা পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় ২৬ মাইল ভূমি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় কোন প্রকার আন্দোলন ব্যতিরেকে।[৩] ইদানীংকালের মেঘালয়ের শিলং অঞ্চলে সীমান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীদের গুলিতে নিহত হন ভারতীয় জওয়ান। কিন্তু এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেও শিলং-এ কোন প্রতিবাদ আন্দোলন দেখা গেল না। অথচ ১৯৫৮ সালে দক্ষিণ বেরুবাড়ী হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে এক গণ আন্দোলন হয়েছিল। যে বিষয়টি পার্লামেন্টে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে মামলা হয় এবং সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সুতরাং প্রশ্ন জাগে কি এমন কারণ নিহিত ছিল যার জন্য সামান্য একটি অখ্যাত গ্রাম সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণ অসন্তোষ, গণ আন্দোলনের সামিল হয়েছিল ? এই প্রশ্নের সদুত্তর পাবার জন্য আমার বর্তমান গবেষণা পত্রের মুখ্য বিষয় — 'বেরুবাড়ী আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তার তাৎপর্য।'

বর্তমানে বেরুবাড়ী সন্নিহিত নার্ততারী দেবোত্তর, নবাবগঞ্জ, কাজলদিঘী পরাণী গ্রাম, বড়শশী গ্রাম - এই চারটি গ্রামকে বাংলাদেশ তাদের বলে দাবি করছে। অথচ গ্রামগুলি ভারতের মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেও সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।[৪] আমার গবেষণার দ্বিতীয় বিষয় — 'দক্ষিণ বেরুবাড়ী সংলগ্ন চারটি গ্রামকে

কেন্দ্র করে উদ্ভূত সমস্যা।[৩] ক্রমান্বয়ে বিষয় দুটির বিশ্লেষণে প্রয়াসী হলাম।

প্রায় চারিদিকে বাংলাদেশ সীমান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত দক্ষিণ বেরুবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়তন ৮.৭৫ বর্গমাইল। ভারতীয় ১৩০টি ছিট্‌মহলের মধ্যে চারটি ছিট্‌মহল এই দক্ষিণ বেরুবাড়ীতে অবস্থিত। এগুলি হল - (১) সাকাতি (২) বিন্নাগুড়ি (৩) বিন্নাগুড়ি (ক) এবং (৪) দৈখাতা ওকড়াবাড়ী। দক্ষিণ বেরুবাড়ীর লোকসংখ্যা ২৫ হাজারের বেশি। অধিবাসীদের ৯৮% হিন্দু এবং ২% মুসলমান। হিন্দুদের মধ্যে সিংহভাগই তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত।[৫]

১৯৪৭ সালের ৮ই জুলাই ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ৩ এবং (৩) ধারা মতে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের সভাপতিত্বে বাউন্ডারি কমিশন ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত চিহ্নিতকরণ করে।[৬] র‍্যাডক্লিফ দাগ টানার সময় থানাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[৭] তিনি দাগ টানার সময় তেঁতুলিয়া, পচাগড়, দেবীগঞ্জ এবং পাটগ্রামকে খেয়ালে রাখলেও বোদা থানাটিকে উপেক্ষা করে গেছেন।[৮] উল্লেখিত পাঁচটি থানা এলাকাগুলি পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়ন নং ১২ জলপাইগুড়ির। ফলে দাগ ও বিবরণীর মধ্যে অমিল থাকায় সীমান্ত সমস্যার উৎপত্তি হয়।[৯]

ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত সমস্যা বা র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা থেকে শুরু বেগ এ্যাওয়ার্ড-ও তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেনি।[১০] এই সমস্যা সমাধানের জন্যে ১৯৫৮-এর ১০ই সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নুনের মধ্যে ঐতিহাসিক — "নেহেরু-নুন চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয়।[১১] এই চুক্তিতে বলা হয় যে —

"(10) Exchange of old Cooch-Behar enclaves in Pakistan and Pakistani enclaves in India without claim to compensation for extra area going to Pakistan in agreed to."[১২]

অর্থাৎ নেহেরু-নুন চুক্তি অনুযায়ী ভারতের ভূখন্ড, কোচবিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিট্‌মহল যা বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অর্ধাংশ পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তরের পরিকল্পনা হয়। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ভীষণ গণ-আন্দোলন শুরু হয়।[১৩]

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ সালে "বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটি" গঠিত হয়। শ্রী রমাপ্রসন্ন রায়, অমর রায় প্রধান, সত্যজ্যোতি সেন, মনোরঞ্জন গুহ, নিরঞ্জন দত্ত প্রমুখেরা ছিলেন এই প্রতিরক্ষা কমিটির প্রতিনিধি যাঁরা শ্রী প্রফুল্ল ত্রিপাঠীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে দক্ষিণ বেরুবাড়ী-র সমস্যা নিয়ে দেখা করেন।[১৪]

৩রা অক্টোবর ১৯৫৮ সালে অ্যাডভোকেট অমর চক্রবর্তী সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুসারে শ্রী নির্মল বসুর নামে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন নেহেরু-নুন চুক্তির বিরুদ্ধে।[১৫] কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী ডি. এন. সিংহ এই মামলা খারিজ

করে রায় দান প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাবেই বলেন যে "It must be understood that the petitioners application failed not necessarily on merits but becauses of an insufficiency of materials without which the wheels of the law can not be made to move."[১৬] এরপর অধ্যাপক শ্রী নির্মল বসু সুপ্রীম কোর্টে মামলা করেন।

বেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রসঙ্গে হিন্দু মহাসভার বিশিষ্ট জননেতা এবং ব্যবহারজীবী শ্রী নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে বলেন যে, নেহেরু-নুন চুক্তি দ্বারা জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ী ইউনিয়নের অর্ধাংশ পাকিস্তানকে দেওয়ার যে মতলব হইয়াছে, তাহার ফলে সমগ্র জাতীয় চেতনায় একটা অনুরণন দেখা দিয়েছে।[১৭]

পরিশেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছে আবেদন জানান যে তিনি যেন ভূয়া আত্মমর্যাদা বোধ বিসর্জ্জন দেন এবং বেরুবাড়ী হস্তান্তরিত করার পরিকল্পনা প্রত্যাহার করেন।[১৮]

সংবিধানের ১৪৩ নং ধারা অনুসারে ইহা সংবিধান সম্মত কিনা তাহা বিচারের জন্য এই ব্যাপারটি যাহাতে সুপ্রীম কোর্টে যায় সেই জন্য শ্রী নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট অনুরোধ জানান।[১৯]

জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ী হস্তান্তরের যে সর্বনাশা প্রস্তাব নেহেরু করেছেন তার বিরুদ্ধে জনমত ও বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তোলবার জন্য ৫ই মার্চ '৫৯ জলপাইগুড়ি শহরের বিশিষ্ট নাগরিক ও গণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এক সভা শ্রী কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন গৃহে অনুষ্ঠিত হয়।[২০]

নেহেরু-নুন চুক্তির ফলে বেরুবাড়ীর উক্ত অঞ্চলের হাজার হাজার অধিবাসী পুনরায় চরম লাঞ্ছনা ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবেন। সুতরাং এই সভা অবিলম্বে নেহেরু-নুন চুক্তির প্রত্যাহার দাবি জানাচ্ছে এবং এই অন্যায় ও অযৌক্তিক হস্তান্তরের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতায় সর্ব্বাত্মক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।[২১]

প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য একটি অস্থায়ী সংগঠন গঠিত হয়। যে সংগঠনে ছিলেন শ্রী কুমুদিনী কান্ত চক্রবর্তী, শ্রী প্রীতিনিধান রায়, শ্রী সরোজ চক্রবর্তী, শ্রী নিখিল ঘটক, শ্রী নরেশ চক্রবর্তী, ডাঃ শৈলেশ ভৌমিক এবং যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন শ্রী দেবব্রত মজুমদার, শ্রী মানস সান্যাল, শ্রী পরেশ মিত্র, শ্রী সত্যজ্যোতি সেন প্রমুখ।[২২]

জনসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রী দীনদয়াল উপাধ্যায় ২১শে মার্চ ১৯৫৯ লক্ষ্ণৌতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, বেরুবাড়ী হস্তান্তরের প্রতিবাদে দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।[২৩]

১৯৫৯ - ২২শে মার্চ পাক সীমান্তে মাণিকগঞ্জের হাটে আট-দশ হাজার লোকের এক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রী নির্মল চন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে বেরুবাড়ী হস্তান্তর সম্পর্কে নেহেরু-নুন চুক্তির তীব্র নিন্দা করেন। এই চুক্তি কুখ্যাত "মিউনিক প্যাক্টের" সমতুল্য বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন যে বেরুবাড়ীর সমস্যা সাম্প্রদায়িক অথবা আঞ্চলিক সমস্যা নয়। এটা জাতীয় সমস্যা।[২৪]

২৩শে মার্চ '৫৯ স্থানীয় আর্য-নাট্য সমাজ প্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোকের এক জনসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বেরুবাড়ী পাকিস্তানে হস্তান্তরের প্রস্তাব পরিত্যক্ত না হলে দেশব্যাপী সক্রিয় আন্দোলন শুরু করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রী প্রীতিনিধান রায়।[২৫]

গণ সম্মেলন, গণ আন্দোলনের চাপে ১লা এপ্রিল, ১৯৫৯ রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১৪৩ (১) ধারা অনুসারে বেরুবাড়ী হস্তান্তরের সংবিধানগত প্রশ্ন বিবেচনার জন্য সুপ্রীম কোর্টের কাছে বিষয়টি পাঠান।[২৬] রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন :

১. বেরুবাড়ী ইউনিয়ন সম্পর্কে চুক্তি কার্যকরী করতে হলে কোন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে কি ?[২৭]

২. যদি থাকে, তবে সংবিধানের ৩ ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্টের একটি আইন প্রণয়নই কি যথেষ্ট ? অথবা, সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন ? একটির পরিবর্তে অপর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে চলবে, না আইন প্রণয়ন ও সংশোধন দুই-এরই প্রয়োজন হবে ?[২৮]

৩. সংবিধানের ৩ ধারা অনুযায়ী ছিট্‌মহল বিনিময় সম্পর্কে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন যথেষ্ট, না ৩৬৮ ধারা অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন ? যে কোন একটি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই চলবে, না উভয় বিষয়েই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ?[২৯]

সুপ্রীম কোর্ট যাঁদের এই বিষয়ে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের মামলার আবেদনকারী রূপে শ্রী নির্মল বসু ছিলেন। তা ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বেরুবাড়ী ইউনিয়ন বোর্ড, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক (বাংলা কমিটি), বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (জলপাইগুড়ি কমিটি) এবং ভারতীয় জনসংঘের বিভিন্ন শাখা ছিলেন। এঁদের পক্ষ থেকে বিবৃতি পেশ করা হয়।[৩০]

১৯৫৯ সালের ৮ই থেকে ১১ই ডিসেম্বর, এই চার দিন সুপ্রীম কোর্টে শুনানি হয়। ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রী ভুবনেশ্বর প্রসাদ সিংহ ছাড়াও এই উপলক্ষে গঠিত 'ফুল বেঞ্চে' বিচারপতি শ্রী এস. কে. দাস, শ্রী গজেন্দ্র গদকার, শ্রী এ. কে. সরকার, শ্রী সুব্বা রাও, শ্রী হিদায়েতুল্লা, শ্রী কে. সি. দাশগুপ্ত ও শ্রী জে. সি. শাহ ছিলেন।[৩১]

সুপ্রীম কোর্টের সম্মুখে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এটর্নী জেনারেল শ্রী এম. সি. শীতলবাদ

বলেন, বেরুবাড়ী হস্তান্তর নিতান্তই মামুলী সীমানা রদবদলের ব্যাপার। সুতরাং শাসন বিভাগীয় সিদ্ধান্তের দ্বারাই এ কাজ করা যায়। আর যদি, এর দ্বারা ভারতীয় অঞ্চল হস্তান্তর সূচীত হয়, তবে সংবিধানের ৩ ধারা অনুসারে পার্লামেন্টে আইন পাশ করলেই চলবে।[৩২] পশ্চিমবঙ্গের এডভোকেট জেনারেল শ্রী এস. এম. বসু বলেন, ৩ ধারার দ্বারা ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রাজ্যে আয়তন পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু কোন অংশ বিদেশী রাষ্ট্রকে দিতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।[৩৩] শ্রী চ্যাটার্জী বলেন, সংবিধান সংশোধন করেও এই হস্তান্তর করা যায় না। ভারতের সংবিধান অনুসারে সংশোধন করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রস্তাবনায় ভারতের যে অখন্ডত্ব স্বীকার করা হয়েছে তা অপরিবর্তনীয়।[৩৪]

শুনানী শেষ হবার তিন মাস দু'দিন পরে ১৪ই মার্চ, ১৯৬০ সুপ্রীম কোর্ট এ বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন।

সুপ্রীম কোর্ট বলেছেন, বেরুবাড়ী নিঃসন্দেহে ভারতীয় অঞ্চল এবং এই হস্তান্তরের অর্থ ভারতীয় ভূমি বিদেশী রাষ্ট্রকে অর্পণ করা। ৩ ধারা অনুসারে পার্লামেন্টের আইনের দ্বারা এ হস্তান্তর করা যায় না। সুতরাং চুক্তিকে কার্যকরী করতে হলে ৩৬৮ ধারা অথবা ৩ ধারাকে সংশোধন করতে হবে। অর্থাৎ, এক কথায় বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী এই হস্তান্তর সম্ভব নয়।[৩৫]

সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ের গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। এর দ্বারা কেবল জনমতের দাবিই শক্তিশালী হল না, ভারতে শাসন বিভাগের ক্ষমতা, পার্লামেন্টের ক্ষমতা এবং সংবিধানের কয়েকটি ধারা সম্পর্কে সর্বোচ্চ আদালতের অভিমত স্পষ্ট ভাবে জানা গেল।[৩৬]

কিন্তু সকল কিছুকে অগ্রাহ্য করেই ১৯৬০ সালের মধ্যেই সংবিধানের নবম সংস্করণ হয়ে যায়। এই সংশোধন অনুযায়ী বেরুবাড়ী পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়টি আইনত সিদ্ধ হয়। এই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী ছিলেন শ্রী অশোক কুমার সেন।[৩৭]

বেরুবাড়ী রক্ষার জন্য, আন্দোলন তীব্র আকার নেয়। আন্দোলনকারীদের একটি দাবি ছিল — "জান দেব, প্রাণ দেব, বেরুবাড়ী দেব না। রক্ত দেব বেরুবাড়ী রুখবো।" ধীরে ধীরে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।[৩৮]

তবে ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ভারতের রাজনৈতিক ও স্বাভাবিক জনজীবনেও এই স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব এসে পড়ায় আন্দোলনের গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে আসে। তবুও আন্দোলন চলতে থাকে।[৩৯]

১৯৭৪-এর ১৬ই মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যা ইতিহাসে 'ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তির মূল বক্তব্য ছিল — দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অর্ধাংশের ১২নং

ইউনিয়ন প্রায় ২.৬৪ বর্গমাইল জমি ভারতে রয়ে গেল এবং তার পরিবর্তে দহগ্রাম ও আঙ্গারপোতা ছিট্‌মহল গুলি বাংলাদেশের রয়ে গেল।[৪০]

বেরুবাড়ী সংলগ্ন চারটি গ্রামকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সমস্যায় প্রবেশ ঃ

১৯৭৪ সালে 'ইন্দিরা-মুজিব' চুক্তির বলে দক্ষিণ বেরুবাড়ীর পূর্বতন সমস্যার সমাধান হয় ঠিকই তবে ১৯৮৯ সালে আরও এক নতুন সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। কারণ দক্ষিণ বেরুবাড়ী এলাকায় যৌথ জরিপের দল আসেন। দক্ষিণ বেরুবাড়ীর উত্তর সীমানা বরাবর সীমান্ত চিহ্নিতকরণ শেষে ৭৬৯ নং মেইন পিলার করার পর সমস্যার উদ্ভব হয়। এখানে দেখা যায় ৭৬৯ নং পিলারের পর এক বিশাল এলাকা (অর্থাৎ কাজলদিঘী ও নাউতারী মৌজা যেটি ভারতের দখলীয়, সেই এলাকাটি বাদ দিয়ে জমি জরিপের কাজ চলছে। স্থানীয় মানুষদের সন্দেহ হওয়ায় দক্ষিণ বেরুবাড়ীর সমস্ত রাজনৈতিক দলের মানুষ জরিপের কাজে বাধা দেন। ফলে জরিপের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।)[৪১] অর্থাৎ ৭৭০ নং এবং ৭৭১ নং পিলার দুটির মধ্যবর্তী নাউতারী দেবোত্তর, নবাবগঞ্জ, কাজলদিঘী পরাণী গ্রাম এবং বড়শশী গ্রাম বাংলাদেশ তাদের বলে দাবি করলে, ভারতের মানচিত্রভুক্ত উক্ত চারটি বেরুবাড়ী সন্নিহিত গ্রামকে কেন্দ্র করে নতুন এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।[৪২]

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১. দক্ষিণ বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটির পুস্তিকা, জলপাইগুড়ি (পৃঃ-১)।

২. মানসী ঃ শারদীয়া সংখ্যা — ১৪০২, সম্পাদক ঃ শ্রী সন্তোষ কুমার চক্রবর্তী, (পৃঃ ২৪)।

৩. আনন্দবাজার পত্রিকায় অধ্যাপক নির্মল বসুর লেখা — "বেরুবাড়ী মামলার ইতিবৃত্ত", কলিকাতা, (১৫.৩.৬০)।

৪. উত্তরবঙ্গ সংবাদ ঃ শিলিগুড়ি সংস্করণ। (২.১১.২০০১)।

৫. দক্ষিণ বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটির পুস্তিকা ঃ পূর্বোক্ত, (পৃঃ ১ ও ৩)।

৬. তদেব, (পৃঃ ২)।

৭. সাক্ষাৎকার ঃ অমর রায় প্রধান (৩১.১২.২০০০)।

৮. উত্তরবঙ্গ সংবাদ ঃ ফজলুল হকের লেখা "তিনবিঘা করিডরের বদলে আড়াই বিঘা দাবি", শিলিগুড়ি, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৯৮।

৯. সাক্ষাৎকার ঃ অমর রায় প্রধান (৩১.১২.২০০০)।

১০. তদেব।

১১. আনন্দবাজার পত্রিকায় অধ্যাপক নির্মল বসুর লেখা ঃ পূর্বোক্ত।

১২. রুল অব্ জঙ্গল ঃ অমর রায়প্রধান, (পৃঃ ১১ থেকে ১২)।

১৩. সাক্ষাৎকার ঃ অমর রায়প্রধান (৩১.১২.২০০০)।

১৪. তদেব।

১৫. আনন্দবাজার পত্রিকায় অধ্যাপক নির্মল বসুর লেখা : পূর্বোক্ত।

১৬. দৈনিক বসুমতী : হাইকোর্টের রায় : অতীতের পাতা থেকে (১০.৪.৫৯), কলিকাতা।

১৭. দৈনিক বসুমতীর অতীতের পাতা থেকে : বেরুবাড়ী হস্তান্তর সম্পর্কে শ্রী এন. সি. চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতি (২১শে মার্চ, ৫৯), কলিকাতা।

১৮. ত্রিস্রোতা : স্থানীয় সংবাদ — বেরুবাড়ীতে জাতীয় সম্মেলন এবং বেরুবাড়ী প্রসঙ্গ, সম্পাদক : সুরেশ চন্দ্র পাল, ২৯.৩.৫৯, জলপাইগুড়ি।

১৯. দৈনিক বসুমতী : পূর্বোক্ত।

২০. ত্রিস্রোতা : বেরুবাড়ী হস্তান্তরের প্রতিবাদে জনসভা, ৮.৩.৫৯, পূর্বোক্ত।

২১. তদেব।

২২. তদেব।

২৩. দৈনিক বসুমতী : পূর্বোক্ত।

২৪. ত্রিস্রোতা : স্থানীয় সংবাদ — বেরুবাড়ীতে জাতীয় সম্মেলন, ২৯.৩.৫৯, পূর্বোক্ত।

২৫. তদেব।

২৬. আনন্দবাজার পত্রিকায় নির্মল বসুর লেখা : পূর্বোক্ত।

২৭. দি অল ইন্ডিয়া রিপোর্টার, ১৯৬০, (৪৭ খন্ড) সুপ্রিম কোর্ট।

২৮. তদেব।

২৯. তদেব।

৩০. আনন্দবাজার পত্রিকায় নির্মল বসুর লেখা : পূর্বোক্ত।

৩১. আনন্দবাজার পত্রিকা : তদেব।

৩২. আনন্দবাজার পত্রিকা : তদেব।

৩৩. আনন্দবাজার পত্রিকা : তদেব।

৩৪. আনন্দবাজার পত্রিকা : তদেব।

৩৫. দি অল ইন্ডিয়া রিপোর্টার : পূর্বোক্ত।

৩৬. আনন্দবাজার পত্রিকা : পূর্বোক্ত।

৩৭. মধুপর্ণী : বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬তে পবিত্র কুমার গুপ্তের লেখা প্রবন্ধ "কোচবিহারের ছিট্‌মহল" সম্পাদক — অজিতেশ ভট্টাচার্য, (পৃঃ ৪২৮)

৩৮. জনমত : আবার বেরুবাড়ী, সম্পাদক — ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, জলপাইগুড়ি, ৬ই জুন ১৯৬৬।

৩৯. সাক্ষাৎকার : সুধাংশু মজুমদার (৩০.১২.২০০০)।

৪০. রুল অব্ জঙ্গল : অমর রায় প্রধান (পৃঃ ১২)।

৪১. দক্ষিণ বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটির পুস্তিকা (পৃঃ ৫-৬)।

৪২. উত্তরবঙ্গ সংবাদ, (২.১১.২০০১) পূর্বোক্ত।

এই প্রবন্ধের কাঠামো নির্মাণ, তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ। তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন আমার পিতৃদেব শ্রী অনিল কুমার পাল, শ্রী অমর রায় প্রধান - সাংসদ, শ্রী সত্যজিৎ বসু, শ্রী সুনীল রায়, শ্রী অরবিন্দ কর।

সাক্ষাৎকার ব্যক্তিদ্বয়ের পরিচয় —

১) শ্রী সুধাংশু মজুমদার, সেক্রেটারী, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক, জলপাইগুড়ি জেলা শাখা। এখন বয়স : ৮৫।

২) শ্রী অমর রায় প্রধান, সাংসদ, কোচবিহার ও ফরওয়ার্ড ব্লকের শীর্ষস্থানীয় জননেতা।

সারাংশ

প্রসঙ্গ ঃ অবিভক্ত তমলুক মহকুমায় বামপন্থী আন্দোলন

জয়দীপ পন্ডা

বর্তমান নিবন্ধে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অবিভক্ত তমলুক মহকুমায় বামপন্থী আন্দোলনের একটি রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি কিভাবে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব হয় তা আলোচনায় স্থান পাবে। আলোচ্য মহকুমায় বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কমিউনিস্ট বা বামপন্থী আন্দোলন ভাগচাষীদের দাবি দাওয়া আদায় তথা তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে।

এই মহকুমায় জাতীয় আন্দোলনের সাথে কৃষক শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্য থেকে বামপন্থীরা ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠনগুলির আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে কার্যকলাপ চালাতে থাকেন। ১৯৩৬ সালে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন জাতীয় নেতারা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর সভাপতিত্বে গড়ে তুললেন 'নিখিল ভারত কৃষক সভা' যার উদ্দেশ্য ছিল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, ভূমি রাজস্বের পুনর্বিন্যাস, সুদের হার কমানো ইত্যাদি।

১৯৩৭-৩৮ সালে তমলুকের বিশ্বনাথ মুখার্জী, অনন্ত মাঝি, মহিষাদলের পতিত জানা, নন্দীগ্রামের ভূপাল পান্ডা, সরোজ রায় প্রমুখের নেতৃত্বে এখানে গোপন মার্কসবাদী চক্র গড়ে ওঠে। ঠিক হয় এঁরা জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তুলবেন। জেলার জোতদার জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় কৃষকেরা সংগঠিত হতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে জেলার বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন।

এইভাবে আজ পর্যন্ত বামপন্থী আন্দোলন অবিভক্ত তমলুক মহকুমার (বর্তমানে তমলুক ও হলদিয়া) কিভাবে প্রভাব ফেলে চলেছে তা আলোচনায় স্থান পাবে।

বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রয়াস বিরোধী আন্দোলন (১৯৫৬): কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

দেবনারায়ণ মোদক

সমগ্র ভারতের এক বিপুল অংশের মানুষ যখন ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবিতে সংগ্রামমুখর; কেন্দ্রীয় সরকার যখন সেই আন্দোলনের চাপে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নিয়োগে বাধ্য এবং সেই কমিশন যখন সে বিষয়ে তাদের প্রতিবেদন পেশ করেছেন এবং সরকার যখন কিছু সংশোধনীসহ তা গ্রহণ করেছেন; সেই সময়েই (১৯৫৬) আকস্মিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় কর্তৃক বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব ঘোষণা জনচিত্তকে আহত করেছে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে তীব্র গণ আন্দোলন। বর্তমান নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা মূল্যায়নের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

এই আন্দোলনকে যথাযথ প্রেক্ষিতে অনুধাবণের তাগিদে সর্বভারতীয় পটভূমির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ এই প্রস্তাবের উৎসভূমি চিহ্নিত হয়েছে। নিবন্ধে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রসঙ্গে সরকারি প্রস্তাব ও তাৎপর্য নির্ণয়ের পাশাপাশি আন্দোলনের সূচনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপ্তি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। ইতিপূর্বে গড়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির ভূমিকা এ প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নির্ণয় করতে গিয়ে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন সম্পর্কে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কিত বিবাদ-নিরসনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রদত্ত সমাধানসূত্র এবং সর্বোপরি জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সম্পর্কে কমিউনিস্ট ধারণা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। এই আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা মূল্যায়নের পাশাপাশি বৃহত্তর রাজনৈতিক পটভূমিকে তার গুরুত্ব অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

কলকাতা মহানগরী ও সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে আগষ্ট আন্দোলনকালীন গণমাধ্যম ঃ লিফলেট, বুলেটিন, হ্যান্ডবিল ও পোস্টারের ভূমিকা।

কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন শুরু হবার সময় থেকেই বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী এমনকি উর্দু ও ওড়িয়া ভাষার লিফলেট, বুলেটিন, হ্যান্ডবিল ও পোস্টার কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের রাজপথ ও গলি ছেয়ে ফেলে , যা জনসাধারণকে সংগ্রামের পথে নামবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। প্রথম থেকেই কলকাতার আন্দোলনে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ছিল স্বত:স্ফূর্ত। তাদের মধ্যে এই সংগ্রামী মেজাজ সৃষ্টিতে লিফলেট, বুলেটিন, পোস্টার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আন্দোলনের প্রথমদিকের অনিয়মিত লিফলেটগুলোর প্রধান লক্ষ্য ছিল, আন্দোলনের স্বপক্ষে' জনমত তৈরি করা। প্রকারণে সেগুলোতে মূলত কংগ্রেসের আগস্ট প্রস্তাব ও গান্ধীর বাণী বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হতো।

পরবর্তী পর্যায়ের অর্ধ-সাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক বুলেটিনগুলোর মধ্যে দিয়ে নিয়মিতভাবে বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশের আন্দোলনের অগ্রগতির সংবাদ এবং সরকারের দমননীতির বিস্তৃত বিবরণ পেশ করা হতো।

বলাযেতে পারে প্রাথমিক প্রস্তুতির শেষে একটি অনুকূল গণভিত্তির ওপর আন্দোলনকে দাঁড় করাবার পর তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে 'Free India', 'Do or Die', 'স্বাধীন ভারত', 'কংগ্রেস প্রচাবপত্র', 'হয় জয় নয় মৃত্যু', 'রক্ত রবিবার' ইত্যাদি বুলেটিনগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকাপালন করে।

ভারতীয় পুলিস ও সৈন্যদের আন্দোলনে যোগদেবার আহ্বান জানিয়ে বিভিন্ন লিফলেট প্রচার করা হয়।

হাওড়ার একটি হ্যান্ডবিলে লেখা ছিল 'চাই ইংরেজের রক্ত-রক্ত-লালমুখো বাঁদর দ্যাখো আর ধরে ধরে মারো।' হাওড়ার একটি পোস্টারে পাশাপাশি ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রিস্ট এবং জেল গারদের পেছনে গান্ধীর ছবি ছিল, যার নীচে লেখা, '2000 years ago — will history repeats itself.' আগস্ট আন্দোলনকালের এই প্রচারগুলো বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষ উল্লেখ এই রচনাগুলোতে পাওয়া যায়। আধুনিক পৃথিবীর দুটি শ্রেষ্ঠ গণবিপ্লব ফরাসি বিপ্লব এবং রুশবিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করে সেই মহান ঐতিহ্যকে আগস্ট বিপ্লবের সময়কালেও অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়। পরাধীন দেশের মানুষের কাছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেয়ে স্বাধীনতা অর্জনের

লড়াই চালানোই যে অধিক গৌরবের — চীনা কমিউনিস্ট নেতা মাও-সে-তুং-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে তার যৌক্তিকতা প্রমাণেরও চেষ্টা করা হয়।

অন্যদিকে দেশের মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা চিত্রায়িত করার পাশাপাশি বুভুক্ষু জনতাকে খাদ্য লুণ্ঠন করার আহ্বান জানানো হয়।

এইভাবে ১৯৪২ সালের সংগ্রামী জনগণের কাছে অনাহত আশা ও বিশ্বাসের দর্পণের কাজ করেছিল সেই সময় প্রকাশিত বিভিন্ন লিফলেট, বুলেটিন, হ্যান্ডবিল ও পোস্টার।

বরেন্দ্র অঞ্চলের মুসলিম শিল্পকলা (রাজশাহী জেলা) ঃ একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভৌগলিক সমীক্ষা

মোঃ আতাউর রহমান

পটভূমি ঃ ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, "Understanding of man's past in an important aid to understanding people today." অর্থাৎ মানুষের বর্তমানকে বুঝতে হলে তার অতীতকে খুঁজতে হবে। আর অতীতকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের হতে হবে ঐতিহ্য সচেতন এবং ইতিহাসের উপাদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যার জন্য প্রয়োজন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন যুগের মুসলিম শিল্পকলা তথা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রতি যত্নশীল হওয়া। "কোন একটি মহান শিল্পকর্মকে উপলব্ধি করতে হলে তার প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতটা জানা থাকা দরকার। দেশ-কালের কোন অবস্থার বিচার্যে শিল্পবস্তুটি নির্মিত হয়েছিলো, কি তার পশ্চাৎপট এবং কি তার পরিবেশ তা জানা না থাকলে শিল্পকর্মটির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়না।"[১]

"শিল্প হলো কল্পনা। রেখার রঙে রসানুভূতির প্রকাশ। রঙের উদ্রেক করাতেই তার সার্থকতা। প্রকাশের জন্য করণ-কৌশলের প্রয়োজন আছে, সে হল উপায় উদ্দেশ্য নয়।"[২] শিল্প কথাটি এসেছে সংস্কৃত থেকে। প্রতিশব্দ আর্ট কথাটি লাতিন হলেও এর উৎপত্তি ফরাসী শব্দ হতে। ফরাসী অভিধানে আর্ট বলতে বুঝানো হয় কোন কিছুকে বিশেষ নিয়মানুসারে তৈরি করার কৌশল।[৩]

এরপর আসে কলা, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এখনও সুনির্দিষ্ট হয়নি। তবে সংস্কৃতিতে কলা বলতে নৃত্য, গীত, অভিনয় এজাতীয় চৌষট্টি রকম বিদ্যাকে বুঝায়। শব্দগত দিক দিয়ে 'শিল্প' ও 'কলা' একই অর্থবোধক। কিন্তু বাংলায় শিল্পকলা বলতে শিল্পবিদ্যা বুঝায়, যার লক্ষ্য এমনকিছু সৃষ্টি করা যা - মানুষের শিল্পবোধ (Aesthetic Sense) -কে জাগ্রত করে।[৪]

আর মুসলিম শিল্পকলা হল খ্রিস্টিয় সপ্তম-সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত অঞ্চলের জনসমষ্টির মধ্যে গড়ে উঠা শিল্পকলা। মুসলিম শব্দটা আরবী, ইসলাম শব্দের বিশেষণ। মুসলিম বলতে বুঝায় ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের।[৫] সুতরাং উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলাম ধর্মের নিয়মানুসারে শিল্পকলার যে বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে মুসলিম শিল্পকলা বলা যেতে পারে।

মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলায় আরবরা খুবই উন্নতি করেছিলো যা পরবর্তী যুগের স্থাপত্য শিল্পকে প্রভাবিত করে। মূর্তি (Sculpture) তৈবি ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়ায় ভাস্কর্যশিল্পে আরবদের অবদান ছিলোনা। আরব চিত্রকর ও স্থপতিরা জ্যামিতিক রেখার বিন্যাসে যে বর্ণচিত্র, নক্‌শা, লতা-পাতা-ফুল আঁকতেন তা আরবীয় চিত্রকলার জগতে অ্যারাবেস্‌ক (Arabesque) নামে প্রসিদ্ধ।[৬] শিল্পকলার ইতিহাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একটি শিল্পকর্মের নির্মাণকাল জানা এবং অপরটি শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা। Art-Historian-রা শিল্পকর্মকে তাঁদের নির্মাণকাল, রীতি-বৈশিষ্ট্য অনুসারে বর্ণনা করেন এবং এর ধারাকে মানব ইতিহাসের নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে বৃহত্তর পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করে অতীতের নিকষে বর্তমানকে বিচার করেন।[৭]

এরপর প্রত্নতত্ত্ব, সাধারণ অর্থে যা মানুষের অতীত দিনের ব্যবহৃত নিদর্শন নিয়ে আলোচিত হয়। এর প্রতিশব্দ পুরাতত্ত্ব, যাকে ইংরেজীতে Archaeology বলে। Philip Rahty তার Invitation of archaeology গ্রন্থে লিখেছেন, "Today garbage is tomorrows archaeology" অর্থাৎ মানব সভ্যতার বিবর্তনে ব্যবহৃত পুরানো, ঐতিহাসিক প্রাগ ঐতিহাসিক সকল দ্রব্য য. মানুষের স্ব-নির্মিত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, অথবা মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে এমন সবই প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়।

বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে বিচিত্র উপাদান সমূহ, যেমন - প্রাচীনভবন, ধ্বংসস্তুপ, মসজিদ, মাদ্রাসা, মাজার, মৃৎপাত্র, মুদ্রা, পোষাক-পরিচ্ছদ, পাণ্ডুলিপি, ড্রইং, পেইন্টিং, স্কেচ, লিথোগ্রাফ্‌স, ক্যালিওগ্রাফ্‌স, শিলালিপি, ধাতবলিপি, কাষ্ঠকর্ম ইত্যাদি মানুষের ব্যবহৃত যাবতীয় জৈব, অজৈব জীবনোপকরণ। আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র হচ্ছে মধ্যযুগীয় গৌড়বঙ্গ রাজ্যের প্রসিদ্ধ জনপদ, 'বরেন্দ্রভূমি' নিয়ে। সেজন্য ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর ভাষ্য থেকে বরেন্দ্র অঞ্চলের মুসলিম শিল্পকলা সম্বন্ধে নানান উপাচার ও তথ্যসংগ্রহ কবা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বরেন্দ্র অঞ্চলের ভৌগলিক বিবরণ

বরেন্দ্র অঞ্চল ২৩'-৪৮-৩০" উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬-৩৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮-০২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৯-৫৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তীতে অবস্থিত। কর্কট-ক্রান্তিরেখা সামান্য দক্ষিণ দিয়ে চলে গেছে। ৮৮°২' ও ৮৯°৫৭' দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী পূর্ব গোলার্ধের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বিশাল এই অঞ্চলের জলবায়ু প্রধানত উষ্ণ ও মোটামুটি আর্দ্র। বরেন্দ্র অঞ্চলের বেশ কিছু স্থান বাংলাদেশের সবচেয়ে চরমভাবাপন্ন এলাকাগুলির ভেতর পড়ে। এখানকার বার্ষিক গড় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫°, সর্বনিম্ন ২৫° সেলসিয়াস। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬৬"।[৮] পশ্চিমে মহানন্দা, পূর্বে

করতোয়া,দক্ষিণে পদ্মা, উত্তরে কুচবিহার ও তরাইয়ের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ হচ্ছে বরেন্দ্র ভূমি।[৯] বরেন্দ্র অঞ্চলের মোট আয়তন প্রায় ১৫,৬০০ বর্গমাইল। বর্তমানে জেলার সংখ্যা ১৬টি। লোকসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি।[১০]

ভৌগলিক দিক থেকে এই অঞ্চল তুলনামূলক উঁচু, পুরাভূমির অন্তর্ভুক্ত। মাটিতে লোহা ও চুনের ভাগ বেশি হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট আমন ধান উৎপন্ন হয়।[১১] এছাড়াও ধান, পাট, ইক্ষু, গম সরিষা এ অঞ্চলের অর্থকরী ফসল। উল্লেখ্য, বর্তমানে বরেন্দ্র অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রচুর 'হল্যান্ড আলু' উৎপাদিত হচ্ছে যা সারাদেশের চাহিদা পুরণ করতে সক্ষম। এছাড়া ''বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ'' গভীর নলকূপের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। ফলে এক ফসলের জমিতে তিনটি ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

বরেন্দ্র পরিচিতি

বরেন্দ্র অঞ্চল বা উত্তরাজনপদ বহু প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি।[১২] প্রাচীনকালে অনেক জনপদ নিয়ে বাংলা ভাষাভাষী জনগণের এই দেশ গঠিত। জনপদগুলির মধ্যে উত্তরাংশে ছিল গৌড়, পুন্ড্র, বরেন্দ্র, যেখানে বিপুল পরিমাণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পরিপূর্ণ। এরমধ্যে বরেন্দ্র হচ্ছে গৌড়দেশান্তর্গত প্রসিদ্ধ জনপদ।

দশম শতকের বরেন্দ্র কবি সন্ধাকর নন্দীর ''রামচরিত'' কাব্যের কবি-প্রশস্তিতে, গয়ারতুঙ্গদেবের তালচের পট্টোলিতে বরেন্দ্রকে পালরাজাদের পিতৃভূমি বলে ইঙ্গিত করেছেন।[১৩] গঙ্গার ধারে লক্ষণাবতী রাজ্যের দুটি পক্ষ, তন্মধ্যে পশ্চিমাংশে 'রাল' (রাঢ়), পূর্বাংশ 'বরিন্দ' (বরেন্দ্র) নামে অভিহিত।[১৪]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকের প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের বর্ণনায়, রামচরিত, দিগ্বিজয় প্রকাশ, ভবিষ্য-বহ্মাখন্ড হতে জানা যায় বর্তমান মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা এই কয়েকটি জেলার অধিকাংশ এবং রংপুর ময়মনসিংহের কিয়দংশ বরেন্দ্র নামে পরিচিত ছিলো।[১৫] "The capital cities of lackhnuati, Dewkot, Gour, Pandua and Ikdalah during the turko-Afgan rule were with in the territorial limits of the Barind."[১৬]

বরেন্দ্র অঞ্চলের মুসলিম শিল্পকলার নিদর্শনসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বরেন্দ্র অঞ্চলের মুসলিম শিল্পকলা এতদ্দৃষ্ট বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক ১২০৪ খ্রিঃ বাংলা বিজয়ের সূচনা থেকে পরবর্তী ব্রিটিশদের আগমণ পর্যন্ত মুসলিম শাসনের এই ছয়শ বছর ধরে প্রশাসক সুলতান এবং রাজপ্রতিনিধিদের দ্বারা এই বরেন্দ্র অঞ্চলে যে অসংখ্য ইমারত নির্মিত হয়েছিল তা শিলালিপির সাক্ষ্যপ্রমাণ হতে জানা যায়। এছাড়া বিজিত অঞ্চলে বিজয়ী মুসলমানগণ কর্তৃক মসজিদ নির্মাণ একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন

করে।[১৭] এবং মসজিদ হচ্ছে ইসলামের বলীয়ান স্থাপত্যরূপ।[১৮] আলোচ্য প্রবন্ধে বরেন্দ্র অঞ্চলের বিদ্যমান উদাহরণ সমূহের অধিকাংশই হচ্ছে মসজিদ, তার কারণ সুস্পষ্ট।

পবিত্র হাদিসে বর্ণিত, "The Prophet has said, "Who builds a mosque in this world, Allah the most high will build in the nest world, Seventy palaces, accomplished with gold, ruby and coral."[১৯] এসকল ধর্মীয় বাণী মসজিদকে সুদৃঢ়রূপে নির্মাণ করতে নির্মাতাদেরকে যে উদ্বুদ্ধ করেছিলো তা বলাই বাহুল্য। বলতে গেলে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, দুর্গ, সেতু নির্মাণ শুরু হয়েছিলো বখতিয়ার খিলজী এবং পরবর্তী শাসকগণ কর্তৃক।[২০]

রাজশাহী উত্তরবঙ্গস্থিত বরেন্দ্রভূমির অন্তর্ভুক্ত অতি প্রাচীন স্থান।[২১] সুতরাং, এস্থানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনার এই সংক্ষিপ্ত প্রয়াস।

মুসলিম সভ্যতার আমলে যে স্থাপত্যকর্ম নির্মিত হয়েছিলো তন্মধ্যে মসজিদ এবং সৌধই প্রধান।[২২] প্রত্যেক জামে মসজিদের পার্শ্ববর্তীস্থানে দিঘি অথবা পুকুর, সন্নিকটে মসজিদের প্রবেশদ্বার নির্মিত হতো বং। বিদ্যমান উদাহরণ ও লিপি থেকে জানা যায়। লিপিমালা সাধারণত কষ্ঠিপাথরে খোদাই করে মসজিদের সম্মুখের মধ্যবর্তী দরজার উপরিভাগে স্থাপন করা হতো এবং এর বিষয়বস্তুতে কোবানের সুরার পংক্তি, হাদিস, সুলতানদের গুণকীর্তন সম্বলিত বাক্য, নির্মাতা হিসাবে প্রতিনিধিদের উপাধি, তারিখ ইত্যাদি সন্নিবেশিত হতো। বলাবাহুল্য সমকালীন বই-পুস্তক উৎসের অনুপস্থিতিতে এই লিপিসমূহ বরেন্দ্র অঞ্চলের তথা বাংলার ইতিহাস নির্মাণের সর্বোৎকৃষ্ট প্রামাণ্য দলিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিপিমালা সমূহ স্থানচ্যুত হওয়ায় এদের নির্মাণ তারিখ শৈল্পিকরীতি, ভৌগলিক অবস্থা, লিপির তথ্য ইত্যাদি থেকে অনুমান করা হয়।[২৩] নিম্নে বরেন্দ্র অঞ্চলের কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

বাঘা মসজিদ

এই বর্তমানে রাজশাহী জেলার ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। রাজশাহী শহর থেকে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত ঐতিহাসিক বাঘা বা অতীতের মখ্দুমনগর।[২৪] প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত বিরাট উন্মুক্ত পরিসরে, প্রকান্ড দিঘির পাড়ে কালের সাক্ষী হয়ে অবস্থান করছে অনিন্দ্যসুন্দর বাঘার বিখ্যাত মসজিদটি। এর প্রধান প্রবেশ পথের উপরি-অংশে স্থাপিত উৎকীর্ণ শিলালিপি হতে জানা যায়, সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহ্ কর্তৃক ১৫২৩-২৪ খ্রিঃ এটি নির্মিত হয়েছিলো।[২৫]

সম্পূর্ণ পোড়ামাটির লাল ইটের তৈরি আয়তকার মসজিদটির পরিমাপ উত্তর-

দক্ষিণে ৭৫'৮", পূর্ব-পশ্চিমে ৪২'-২"। উত্তর ও দক্ষিণের দুটি তোরণদ্বার দিয়ে এই পরিসরে প্রবেশ করা যায়। ১৮৯৭ খ্রিঃ গম্বুজগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে[২৬] প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এর সংস্কার সাধন করে, বর্তমানে এর পাঁচটি অলংকৃত মেহরাব ও দশটি অর্ধগোলাকৃতির গম্বুজ রয়েছে।

অচিনঘাট মসজিদ

রাজশাহী শহরের উত্তর-পূর্বে ২০ মাইল দূরে বাঘমারা থানার ঐতিহাসিক অচিনঘাট মসজিদ অবস্থিত। এটি ধ্বংস হয়ে গেলেও সামান্য কিছু চিহ্ন লক্ষণীয়। কিবলা প্রাচীরের তিনটা মেহরাব, দুই সারিতে বিদ্যমান সাতটি (একসারিতে ৪টি, অপর সারিতে ৩টি) পাথরস্তম্ভ থেকে এই মসজিদের একটি প্রস্তাবিত ভূমি পরিকল্পনা ও নির্মাণ পরিকল্পনা পেশ করা যায়। নামাজ কক্ষটির দৈর্ঘ উত্তর-দক্ষিণে ৫৩'-৬", প্রস্থ্য পূর্ব-পশ্চিমে ৩১'-৬"। কোন শিলালিপির সন্ধান না পাওয়ায় সঠিক নির্মাণকাল জানা যায়নি। তবে ভূমিনক্শা, নির্মাণশৈলী বিবেচনা করে মসজিদটিকে পঞ্চদশ-ষষ্টদশ শতাব্দীর ইলিয়াসশাহী অথবা হুসেনশাহী আমলের স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।[২৭]

ঐতিহাসিক বাগধানী মসজিদ

রাজশাহীর পবা উপজেরার নওহাটা ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বাগধানী গ্রামের বারইন নদীর পশ্চিমপাড়ে মসজিদটি অবস্থিত। এটি সমাকৃতির তিনগম্বুজ বিশিষ্ট। এর শিলালিপি থেকে জানা যায় ১৭৯১ খ্রিঃ দেওয়ান মুন্সি এনায়েতুল্লাহ কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়েছে।[২৮] মসজিদটির দৈর্ঘ ৬১'-৬" উত্তর-দক্ষিণে, প্রস্থ ২৪'-৬" পূর্ব-পশ্চিমে। সম্মুখে পাকা চত্ত্বর যার দৈর্ঘ উত্তর-দক্ষিণে ১০২' পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থে ৫৫'। মসজিদের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখে অনুমিত হয় এস্থান অত্যন্ত জাঁকজমক ছিলো।

শাহ্ মখদুম দরগা জামে মসজিদ

হযরত শাহ্ মখদুম রূপোস (রঃ) এর দরগা সংলগ্ন প্রাচীন তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি রাজশাহী কলেজের দক্ষিণ-পশ্চিমে পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ উত্তর-দক্ষিণে ৪০ ফুট, প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমে ১৬ ফুট। কিবলা প্রাচীরে তিনটি মেহরাব রয়েছে। মসজিদটির নির্মাণকাল বাংলার নবাবী আমলের বলে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন।

মেহেদীপুর মসজিদ

রাজশাহী শহরের লক্ষ্মীপুর এলাকায় একটি প্রাচীন মহল্লায় তিন গম্বুজবিশিষ্ট মেহেদীপুর জামে মসজিদটি অবস্থিত। এর কিবলা প্রাচীরে তিনটি মেহ্রাব রয়েছে। দৈর্ঘ উত্তর-দক্ষিণে ৩৭ ফুট, প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমে ১৫ ফুট। এর প্রধান প্রবেশ পথে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে হযরত আলী (রাঃ) বাণী লিপিবদ্ধ থাকলেও নির্মাণের তারিখ

উল্লেখ নেই। তবে এর নির্মাণশৈলী থেকে ধারণা করা যায় মসজিদটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত।

মুন্ডুমালা মসজিদ

রাজশাহী শহরের অদূরে তানোর পার হয়ে মুন্ডুমালা বাজার। সেখান থেকে ২০০ গজ উত্তরে তিনগম্বুজ বিশিষ্ট মুন্ডুমালা মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদের শিলালিপিটি বর্তমানে না থাকায় স্থানীয় লোকভাষ্যে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী. এটি স্থানীয় কোন দেওয়ান নির্মাণ করেন এবং তা নবাবী আমলে নির্মিত তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ এর দক্ষিণপাশেই রয়েছে একই সময়ে নির্মিত একটি (মহরমের) তাজিয়া যার উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় নবাব মুর্শিদকুলির শাসনামলে।

মোহাম্মদপুর মসজিদ

রাজশাহীর তানোর উপজেরার পাঁচন্দর ইউনিয়নের মোহনপুর গ্রামের পাশে মোহাম্মদপুর মৌজায় এই মসজিদটি অবস্থিত। এর চারকোণে অষ্টকোণাকৃতির চারটি টাওয়ার এবং তিনটি প্রাচীন গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের কোন শিলালিপি পাওয়া না যাওয়ায় এর নির্মাণশৈলী দেখে অনুমান করা হয় মসজিদটি মোগল আমলের শেযদিকে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত হয়েছিলো।

সিধাইর মসজিদ

রাজশাহী হতে তানোর যাওয়ার পথে কাসিমবাজারের সোজা পশ্চিম দিকে ৩-৫ কি.মি. দূরে মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটির চার কোণে চারটি অষ্টকোণাকৃতির টাওয়ার ও তিনটি প্রাচীন গম্বুজ রয়েছে। মসজিদে উৎকীর্ণ ফার্সীলিপিতে জানা যায় ১৮০৫ খ্রিঃ এটি নির্মিত হয়েছিলো।

বাঘার মাদ্রাসা

বাংলার সুলতান নাসির-উদ্দিন নুসরত শাহ্ কর্তৃক যখন বাঘার মসজিদটি স্থাপিত হয় তখন হামিদ দানেশমন্দ এর পিতা শাহ্ মুয়াজ্জেম দানেশমন্দ (যিনি শাহ্ দওলা নামে সমাধিক পরিচিত) এই বাঘায় এসে সুফী প্রশিক্ষণের জন্য একটি খানকা ও একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। বাঘার এই মাদ্রাসায় কোরান, হাদিস, আরবী-ফারসী, ফেকাহ ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হতো। এখানে ইসলামিক গ্রন্থাদির একটি গ্রন্থাগার ছিলো।[২৯]

রাজশাহী আলীয়া মাদ্রাসা

১৮৭৪ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত যেটা বর্তমানে রাজশাহী কলেজের পশ্চিমে "সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা" নামে পরিচিত। হাজী মহসিনের অর্থানুকূল্যে এটি দ্রুত প্রসার লাভ করে।[৩০]

উল্লেখ্য যে, এই মাদ্রাসার পূর্বে রাজশাহীতে উল্লেখযোগ্য দুটি আরবী শিক্ষাকেন্দ্র ছিলো, একটি হলো শাহ্ মখদুমের মাযারের বারান্দা, অপরটি হেতেম-খাঁ মসজিদ।[৩১]

হযরত শাহ্ মখদুম রূপোস (রঃ)- এর মাযার

প্রাচীনকালে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে তথা বরেন্দ্রভূমিতে ইসলাম প্রচারের নির্মিত্ত যে সকল ওলী আউলিয়াগণ আগমণ করেন তন্মধ্যে হযরত শাহ্ মখ্দুম রূপোস (রঃ) - এর নাম সর্বাগ্রে। তিনি দীর্ঘদিন বাঘায় অবস্থান করার পর সহচরদের নিয়ে একসময় রামপুর-বুয়ালিয়ায় আসেন। তাঁর মাযারটি রাজশাহীর দরগাপাড়ায় অবস্থিত। উল্লেখ্য হযরত শাহ্ মখ্দুমের সমসাময়িক কিংবা তাঁর অনুসারীগণ যারা রাঁজশাহী সংলগ্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য স্মরণীয় তাঁরা হচ্ছেন-

হযরত তুরফান শাহ্ (রঃ) ঃ ইনি শাহ্ মখ্দুম (রঃ) সাহেবের আগমণের বেশ কিছু কাল পূর্বে মহাকাল রাজ্যে, বর্তমান রাজশাহী এসেছিলেন। রাজশাহী কলেজের পাশে তাঁর মাযার অবস্থিত। **শাহ্ আব্বাস (রঃ) ঃ** যার মাযারটি বাঘায় অবস্থিত। তিনি শাহ্ মখ্দুমের স্নেহভাজন ও বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। **শাহ্ সুলতান (রঃ) ঃ** তিনি শাহ্ মখ্দুমের সাথে বাগদাদ থেকে আগমণ করেন। তার মাযারটি গোদাগাড়ী থানার সুলতানগঞ্জ গ্রামে অবিস্থিত। **হযরত কমর আলী (রঃ) ঃ** সৌধটি ১৬৭৭ খ্রিঃ নির্মিত। রাজশাহী-নাটোর রাস্তার পাশে বিড়ালদহ নামক স্থানে তার মাযারটি অবস্থিত। **হযরত শাহ্ দিলাল শাহ্ বুখারী (রঃ) ঃ** তাঁর মাযারটি রাজশাহীর চারঘাট থানার আলাইপুর গ্রামে অবস্থিত। **হযরত শাহ্ মোকাররম শাহ (রঃ) ঃ** ইনি একজন বিখ্যাত ওলী ছিলেন। রাজশাহী শহর থেকে ১২ কিঃ মিঃ পশ্চিমে কুমারপুর গ্রামে তার মাযারটি অবস্থিত। তাঁর মাযার গাত্রে কৃষ্ণপাথরে পবিত্র কুরান শরীফের আয়াত "সুরা আর রহমান" উৎকীর্ণ আছে। **হযরত শাহ্ জংলী (রঃ) ঃ** গোদাগাড়ীর দামকুরা হাটের নিকট খাড়ী নদীর পার্শ্বে এই পীরের মাযার অবস্থিত। **বাঘার মাযার শরীফ ঃ** বাঘা সম্পর্কে পূর্বেই আমরা জেনেছি এস্থানটি লস্করপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আইন-ই-আকবরীর বর্ণনা অনুযায়ী সরকার বারবাকাবাদের প্রশাসনভুক্ত। এ স্থানে অসংখ্য পীর, আউলিয়ার আগমণ ঘটে এবং তাঁদের সমাধি সৌধ রয়েছে। বাঘার মাযারে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ সমাহিত হয়ে আছেন তাঁরা হলেন-হযরত মওলানা শাহ্ দাওলা, হযরত শাহ্ নূর, হযরত শাহ্ মহিউদ্দিন, হযরত লোহা শাহ্, হযরত মাস্তান শাহ্ প্রমূখ।[৩২]

উল্লেখ্য যে, অপূর্ব এসকল দর্শনীয় মাযারগুলির অধিকাংশই বরেন্দ্র তথা বাংলার প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের এক একটি চমৎকার নিদর্শন। শিলালিপি ইতিহাসের উপকরণ অথবা ইতিহাসের কোন সূত্রের পুনর্গঠনের জন্য প্রাথমিক উৎস হিসাবে বিবেচিত

হয়।[৩৩] এ পর্বে বরেন্দ্র অঞ্চলের রাজশাহী জেলায় প্রাপ্ত কয়েকটি শিলালিপি যেগুলি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর-এ সংরক্ষিত সেগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

উজির বেলডাঙ্গা শিলালিপি

এটি আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ। এর ভাষ্য মোতাবেক ১৩২২ খ্রিঃ পিতার জীবদ্দশায় গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে পরিচিত করেছে।[৩৪]

সুলতানগঞ্জ শিলালিপি

গোদাগাড়ী থানার মহানন্দা ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে সুলতানগঞ্জ। জাহানাবাদও বলা হয়ে থাকে।[৩৫] আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিটির ভাষ্যে সুলতান জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ্'র আমলে ১৪৩২ খ্রিঃ আমীরদাদ কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে জানা যায়।[৩৬] এস্থানে প্রাপ্ত আরেকটি শিলালিপির ভাষ্যে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান বারবাকশাহ্'র পুত্র শামসুদ্দিন ইউসুফশাহ্'র আমলে (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিঃ) খানমোজাফ্ফর খান উলুঘ কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে জানা যায়।[৩৭]

রাজশাহী শিলালিপি

গৌড় থেকে সংগৃহীত আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপির ভাষ্যে সুলতান আবুল ফতেহশাহ্'র শাসনামলে মখদুম মওলানা আতাওয়াহিউদ্দিন কর্তৃক ১৪৮২ খ্রিঃ একটি মসজিদ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে।[৩৮] এস্থানে সংগৃহীত আরও একটি আরবী-ফারসী ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপির ভাষ্যে সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহশাহ্'র আমলে Malik Takir কর্তৃক ১৪৮৬ খ্রিঃ একটি মসজিদ নির্মিত হয়।[৩৯]

দরগাপাড়া শিলালিপি

রাজশাহীর শাহ্ মখ্দুমের সমাধি ভবনের প্রবেশপথে ফার্সী ভাষায় লিখিত এই তথ্য বহুল শিলালিপিটি স্থাপিত, যার ভাষ্য, "According to the Inscription, a tomb was erected for Shah Darwish by one Ali Quli Baig in the year 1045 A.H. (1634 A.C.) which falls in the reign of the Mughal Emperor Shahjahan."[৪০]

কুমারপুর শিলালিপি

আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ এই শিলালিপির ভাষ্যে জানা যায়, ১৫৫৮ খ্রিঃ গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ্'র শাসনামলে সুলাইমান নামক একব্যক্তি কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মিত হয়।[৪১]

উপসংহার

উল্লেখিত আলোচনায় বরেন্দ্র অঞ্চলের রাজশাহী জেলায় প্রাপ্ত মুসলিম শিল্পকলার উপাদান তথা প্রত্নতাত্ত্বিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। কিন্তু

এসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যাপকভাবে, এছাড়াও আরো অনেক উপাদান রয়েছে সেগুলোকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে অনুসন্ধান করে গবেষণা করলে, বরেন্দ্র অঞ্চলের মধ্যযুগীয় আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ইতিহাস, ঐতিহ্য লোকাচার প্রভৃতি সম্পর্কে আরো সৃষ্টিধর্মী জ্ঞানলাভ করা যেতে পারে, যা বরেন্দ্র অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ধারা পুনর্গঠনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এতে অনুসন্ধিৎসু মন গবেষকদের আরো নতুন তথ্য উৎঘাটন করবে বলে বিশ্বাস করা যায়।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১. নারায়ণ সান্যাল ঃ অপরূপা অজন্তা, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ১০৮।

২. নন্দলাল বসু ঃ শিল্পকলা, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৫১, পৃ. ৩৬।

৩. এবনে গোলাম সামাদ ঃ ইসলামী শিল্পকলা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ১১৩।

৪. পূর্বোক্ত ঃ পৃ. ১১৪।

৫. পূর্বোক্ত ঃ পৃ. ২।

৬. এবনে গোলাম সামাদ ঃ ঐ, পৃ. ১০-১১।

৭. পূর্বোক্ত ঃ পৃ. ভূমিকা - ছয়।

৮. বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস ঃ রাজশাহী বিভাগ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, রাজশাহী, ১৯৯৮, পৃ. ৩-৭।

৯. A. Cunningham : Archaeological Survey of India, Calcutta, 1882, pp. 40, 116.

১০. বরেন্দ্রী ঃ কাকনহাট উন্মুক্ত পাঠাগার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০০১, পৃ. ৪৩।

১১. রাজশাহী পরিচিতি ঃ বরেন্দ্র একাডেমী, রাজশাহী, ১৯৮০, পৃ ৭।

১২. মোঃ আতাউর রহমান ঃ "বাংলাদেশের প্রথম গবেষণা যাদুঘর", ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫, পৃ. ৯৫৭।

১৩. নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ১১৬।

১৪. Minhaj-I-Siraj : Tabaqat-I-Nasiri, Vol. 1, Persian Text (Kabul : Historical Society of Afganistan, 1963), pp. 437-439.

১৫. নগেন্দ্রনাথ বসু ঃ বিশ্বকোষ, কলিকাতা, ১৩২০, অষ্টাদশভাগ, পৃ. ৩৯৬।

১৬. A. K. M. Yaqub Ali : Aspect of Society and Cultural of the Varendra, Rajshahi, 1998, p. 363.

১৭. ডঃ মুহম্মদ মোখলেসুর রহমান ঃ সুলতানী আমলের মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ১৫।

১৮. নির্মল ঘোষ ঃ ভারত শিল্প, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৬১।
১৯. Shamsuddin Ahmed : Inscription of Bengal, Vol. IV, VRM, Rajshahi, 1960, p. 245.
২০. Minhaj-I-Siraj : p. 427.
২১. অধ্যাপক আলমগীর জলিল সম্পাদিত, "রাজশাহীর ছড়া" বাংলা একাডেমী, ১৩৭০, পৃ. ১৭-১৮।
২২. খন্দকার মাহ্মুদুল হাসান ঃ মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১১১।
২৩. এ.বি.এম. হোসেন ঃ "বরেন্দ্র অঞ্চলের মসজিদ স্থাপত্য", বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, রাজশাহী, ১৯৯৮, পৃ. ৪৩০।
২৪. মুহম্মদ আবদুস সামাদ ঃ সুবর্ণদিনের বিবর্ণ স্মৃতি, রাজশাহী, ১৯৮৭, পৃ. ৫৫।
২৫. S. Ahmed : I. B. Vol. IV, pp. 212-214.
২৬. সৈয়দ মাহ্মুদুল হাসান ঃ বাংলাদেশের মসজিদ, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৫৮।
২৭. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী ঃ মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ. ১৯৭-১৯৮।
২৮. এ. বি. এম হোসেন ঃ ঐ, পৃ. ৪৪৮।
২৯ রাজশাহী পরিচিতি ঃ বরেন্দ্র একাডেমী, রাজশাহী, ১৯৮০, পৃ. ২০৮-২০৯।
৩০ সুবর্ণদিনের বিবর্ণ স্মৃতি, পৃ. ৯২।
৩১. রাজশাহী পরিচিতি, পৃ. ২৪৩।
৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১-২১১।
৩৩. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী ঃ মুদ্রা ও হস্তলিপি লিখন শিল্প, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ৩৪৫।
৩৪. Abdl Karim : "The first & only Discovered Inscription of Ghiyathal-Din Bahadur Shah", JVRM, Vol. 6, 1980-81, pp. 5-6.
৩৫. A. H. Dani : Bibliography of Muslim Inscription of Bengal, 1957, p. 14.
৩৬. S. Ahmed : I.B. Vol. IV, p. 46.
৩৭. A.K.M. Yaqub Ali : Select Arabic and persian Epigraphs, IFB, 1988, pp. 53-56.
৩৮. S. Ahmed : I. B. Vol. IV, p. 116.
৩৯. A.K.M. Yaqub Ali, p. 62.
৪০. S. Ahmed : I. B. Vol. IV, pp. 272-274.
৪১. Ibid, pp. 244-245.

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র ও নাট্যকার কল্যাণ মিত্রের অবদান

অঞ্জলি দাস

১৯৫২ সনে পূর্ববাংলার বাঙলাভাষায় জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম মাতৃভাষার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় রফিক, জব্বার, বরকত, সালেম-এর প্রাণ বিসর্জন - তাঁদের আত্মোৎসর্গের প্রতীক — ২১শে ফেব্রুয়ারি আজ বিশ্ব আসনে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রসংঘ ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'বিশ্ব-মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষণা করে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ২১শে ফেব্রুয়ারির দীপ্ত স্মৃতি আমাদের পথবর্তিকা। এটি শুধু বাংলাদেশের বাঙালীদের পরম কাঙ্ক্ষিত দিন নয় সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বাঙালীর গর্বের দিন। মানব ইতিহাসে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠা, স্বীকৃতির জন্য যাঁরাই সংগ্রাম আন্দোলন করছেন তাঁদের উদ্যোমে প্রেরণা জাগাবার দিন।

আজকের প্রজন্মের কাছে এ এক নব প্রেরণা। মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন কিভাবে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দিল তার ইতিহাস বিশেষভাবে উন্মোচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যেখানেই শাসকবর্গ অন্যভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে সেখানেই মূর্ত প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে সংগ্রাম আন্দোলনকে পথ দেখাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বিভিন্ন বেতারকেন্দ্রগুলি। কিন্তু শাসকশ্রেণীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে অতি সতর্কতার সঙ্গে কেন্দ্রগুলিকে পরিচালনা করতে হত। সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক খবর পৌঁছাবার এবং বিশ্বজনমত গঠনে ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল বেতারকেন্দ্রগুলির।

১৪ই ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান, শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করলেন। কিন্তু তারপর সব যেন কেমন হয়ে গেল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও নানা টালবাহানা করে আওয়ামী লীগকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে দেওয়া হল না। উপরন্তু ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণায় রাজনৈতিক মহল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ৩রা মার্চ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে কুষ্ঠিয়া শহর প্রদক্ষিণ করে। ইসলামিয়া কলেজ মাঠে সভায় উপস্থিত আব্দুল জব্বার "জয় বাংলার জয়" সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। এদিকে প্রতিবাদের ঢেউ উত্তাল হতে থাকে। বিভিন্ন স্থান থেকে

সংঘর্ষের খবর আসতে থাকে। সেনাবাহিনীর হাতে বীরের মত প্রাণ দিচ্ছেন বাঙালী সন্তানেরা। এই হত্যার প্রতিবাদে আওয়ামী প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, রেসকোর্সের ময়দানে ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

"আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।...ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রঙপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।...এদেশের ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খাঁ মার্শাল'ল জারী করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৯ সালে আন্দোলনে আইয়ুব খাঁ-র পতনের পর এলেন ইয়াহিয়া। ইয়াহিয়া খান বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন—আমরা মেনে নিলাম।... নির্বাচন হলো। ...আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম—১৫ই ফেব্রুয়ার তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সভা হবে।

..হঠাৎ মার্চের ১লা তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেয়া হলো। ...দোষ দেয়া হলো বাংলার মানুষের, দোষ দেয়া হলো আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলো। ...আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।...আমি বললাম—আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আর সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব দুঃখী মানুষদের বিরুদ্ধে—তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি।

...আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট দেখে যান, কিভাবে আমার গরীবের উপর—আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হচ্ছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন, আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিলে কনফারেন্স ডাকবো। আমি বলেছি কিসের এসেমব্লি বসবে? কার সঙ্গে কথা বলবো? আপনারা যারা মানুষের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলব?...আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই...এরপর যদি একটি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।...সৈন্যরা, তোমরা আমাদের ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো...আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা কোরনা। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি—তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।

...এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে...আমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শা আল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। "জয় বাংলা"।

৭১ সালের বাঙালীর জাতীয় জাগরণের চরম অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে ৭ই মার্চ, ৭১'এ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণের রেকর্ড টেপ করে ৮ই মার্চ ঢাকা বেতারের অকুতভয় বেশকিছু কর্মী ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করলেন। ইথারের বুকে ছড়িয়ে পড়লো শেখ মুজিবের উদাত্ত আহ্বান। ফ্যাসিস্ট সামরিক সরকারের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বেতার অংশ নিল। এরপর পাক মিলিটারী ফৌজ ঢাকা বেতার নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। কিন্তু দেশের মানুষ যার যা হাতিয়ার আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে ২৫শে মে ৭১ মধ্যরাত্রিতে মেসিনগান সুসজ্জিত ট্যাঙ্ক, মর্টার কামান নিয়ে ঢাকার শান্তিকামী মানুষদের আক্রমণ করলো। ২৬শে মার্চ সকালে শহরে আইন জারী করে দেওয়া হলো। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হলো। শুরু হলো ব্যাপক ধরপাকড়।

চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংঘটিত বিপ্লবী স্বাধীনবাংলার বেতার কেন্দ্রের প্রথম অনুষ্ঠান শুনতে পেয়েছিলেন ২৬শে মার্চ ৭১ সন্ধ্যা ৭টা ৪০মি. সময়ে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদটি করেন জনাব আবুল কাশের। পরদিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ সান্ধ্য অধিবেশনে সদ্য গঠিত বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পুনরায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাটি প্রচার করেন মেজর জিয়াউর রহমান, যিনি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন। ৩০শে মার্চ দুপুরে অনুষ্ঠান চলাকালীন পাক বিমান বাহিনী চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র ধ্বংস করে।

ইতিমধ্যে মুজিব নগরে অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল '৭১ মেহেরপুরের অদূরে বৈদ্যনাথতলার এই অস্থায়ী সরকার মুক্তিযুদ্ধের প্রচার জোরদার করার জন্য বেতারকেন্দ্র গঠনের জন্য সচেষ্ট হলেন। দায়িত্ব অর্পিত হল শ্রী মান্নানের উপর। শ্রী মান্নান পরবর্তীকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন। কলিকাতাতে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বিশাল বাড়িতে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্ম হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি করতে সৃষ্টি হল এই বেতার কেন্দ্রটি। এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠান বাংলার দামাল ছেলেদের উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল।

শহর থেকে দূরের মানুষের একমাত্র ভরসা ছিল বেতারকেন্দ্রটির প্রচার অনুষ্ঠান। পরম আগ্রহ সহকারে নিয়মিত শুনতেন তারা। স্বাধীন বাংলাকেন্দ্রের অনুষ্ঠানের

চরমপত্রের চরম কণ্ঠের প্রতি মানুষের ছিল প্রবল আকর্ষণ। "চরমপত্র"-এর বক্তব্যগুলি টক-ঝাল-মিষ্টির মতই উপভোগ্য ছিল। ভাষার চাতুর্যে তীব্র কটাক্ষের সাথে মুক্তিবাহিনীর বীরত্বের কথা ছিল অপূর্ব।

ইতিমধ্যে স্বাধীন বেতার কেন্দ্রে বাংলাদেশ বেতারের, সিনেমার, মঞ্চের বহু বিশিষ্ট শিল্পী, অভিনেতা কলাকুশলী, স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবীগণ এই বেতার কেন্দ্রে মিলিত হলেন। প্রথমে একটি বড় ঘরে সব জানালা বন্ধ করে ঘর্মাক্ত কলেবরে অনুষ্ঠান রেকর্ডিং করা হতো। ২৫শে মে বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মদিনে স্বাধীন বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে দৃপ্ত পদযাত্রা শুরু হলো। বেতারের সামগ্রিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের সহ আঞ্চলিক পরিচালক সামসুল হুদা চৌধুরীর ওপর। মে-ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলা বেতারেব বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রতিদিন বেলা দেড়টায় ও সন্ধ্যা ছয়টায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হতো। কিন্তু ভারত সরকারের গোপনীয়তা ও বেতার শিল্পীদের নিরাপত্তার জন্য অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত স্থলে ঢোকা নিষেধ ছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার বাংলার শিল্পীদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বহু স্বনামধন্য শিল্পী, বুদ্ধিজীবীগণ অংশগ্রহণ করতেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণদাস বাউল, শ্যামল মিত্র, দিগেন্দ্র চৌধুরী, অংশুমান রায়, গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং সংবাদ বিচিত্রার প্রযোজক উপেন তরফদার প্রমুখ।

নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক এবং নাট্য শিল্পীগণের মধ্যে ছিলেন আব্দুল জব্বার খান, নারায়ণ ঘোষ, কল্যাণ মিত্র, মামুনুর রসিদ, নাট্যপ্রযোজক রণেন কুশারী, নাট্যপ্রযোজক অভিনেতা — হাসান ইমাম, মরহুম রাজু আহমদ (জল্লাদের দরবার নাটিকার প্রধান চরিত্র কেল্লা ফতেহ আলী খান), নারায়ণ ঘোষ (জল্লাদের দরবারের অন্যতম প্রধান চরিত্র—দুর্মুখ), তোফাজ্জল হোসেন এবং আরো অনেকে।

যাঁরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের পবিত্র কোরআন তেলায়াতে ও অনুবাদে মৌলানা নুরুল ইসলাম জেহাদী, মৌলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী ও মৌলানা ওবাযদুল্লাহ বিন্ সাঈদ জালালাবাদী। পবিত্র কোরআনের আলোকে জনাম হাবিবুর রহমানের কয়েকটি আলোচনাও প্রচারিত হয়েছিল 'ইসলামের দৃষ্টিতে' এই সিরিজে। পবিত্র গীতাপাঠে অংশ নিয়েছেন—বিনয় কুমার মণ্ডল ও জ্ঞানেন্দ্র বিশ্বাস। পবিত্র ত্রিপিটক পাঠে—রণবীর বড়ুয়া এবং পবিত্র বাইবেল পাঠে ছিলেন ডেভিড প্রণব দাস।

প্রশাসনিক কাজে ছিলেন—ফজলুল হক্ ভুঁইয়া (পরবর্তীকালে ইনি প্রেস, তথ্য, বেতার ও ফিল্ম-এর অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন)। অনিল মিত্র (হিসাবরক্ষক), মরহুম আশরফউদ্দিন (স্টেনোগ্রাফার), কালিদাশ রায় (স্টেনো

টাইপিস্ট), মহিউদ্দিন আহমদ (অফিস এ্যাসিস্টান্ট), আনোয়ারুল আবেদিন (অফিস এ্যাসিস্ট্যান্ট, ইনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য মাঝেমধ্যে পাণ্ডুলিপিও লিখেছেন), এস. এস. সাজ্জাদ হোসেন (স্টুডিও একজিকিউটিভ-কাম-রিসেপশানিস্ট), বিমল কুমার নিয়োগী (পিয়ন), সত্যনারায়ণ ঘোষ (পিয়ন), সামশুল হক (পিয়ন) শাখাওয়াত হোসেন (পিয়ন) ও দুলাল (পিয়ন)। নকলনবীশের কাজে ছিলেন নওয়াব জামান চৌধুরী, দুলাল রায়, আবুল বরকত ও একরামুল হক চৌধুরী।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ছিল অত্যন্ত গতিশীল ও আকর্ষণীয়। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় যাঁরা কণ্ঠ দিয়েছেন প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে লিখে দিতেন ঘোষণা বা উপস্থাপনার কথা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আশাফাকুর রহমান খান, টি.এইচ.শিকদার, মোস্তাফা আনোয়ার, আশরাফুল আলম, শহীদুল ইসলাম, বাবুল আখতার (মনজুর কাদের), আবু ইউনুস, মোতাহার হোসেন, মোহসীন রেজা ও আরো অনেকে।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় কর্মীগণ তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। অনুষ্ঠান কর্মীগণের মধ্যে অনুষ্ঠান সংগঠক পর্যায়ে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা ছিলেন সর্বজনাব আশফাকুর রহমান খান (সঙ্গীত এবং উপস্থাপনা), মেসবাহ্উদ্দীন আহমদ (নাটক এবং সাহিত্যানুষ্ঠান), বেলাল মোহাম্মদ (অভ্যন্তরীণ পণ্ডলিপি সংগ্রহ এবং অধিবেশন পত্র তৈরি), এবং জনাব আলমগীর কবীর (ইংরেজি অনুষ্ঠান), অনুষ্ঠান প্রযোজক পর্যায়ে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা ছিলেন সর্বজনাব টি.এইচ. শিকদার (অগ্নিশিখা ঃ মুক্তিবাহিনীর জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান), তাহের সুলতান (সঙ্গীত), মোস্তাফা আনোয়ার (কথিকা ও জীবন্তিকা), আবদুল্লাহ আল ফারুক (সাক্ষাৎকার এবং প্রামাণ্য অনুষ্ঠান সহ সংবাদ বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন), মোহাম্মদ ফারুক (পরবর্তীকালে ইনি সাক্ষাৎকার এবং প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেছেন), আলী জাকের (ইংরাজি অনুষ্ঠান), আশরাফুল আলম (দর্পণ, ও.বি, সাক্ষাৎকার) এবং জনাব জাহিদ সিদ্দিকী (উর্দু অনুষ্ঠান)। এছাড়া সোনার বাংলা এবং প্রতিধ্বনি এ দুটি অনুষ্ঠানের বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন জনাব শহীদুল ইসলাম। উপস্থাপনা তত্ত্বাবধানে ছিলেন জনাব এ. কে. সামসুদ্দিন। অনুষ্ঠান ঘোষণা এবং অগ্রিম অনুষ্ঠান পত্রলিখনের দায়িত্বে ছিলেন আবুল ইউনুস।

নাট্যকার কল্যাণ মিত্র তখন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ কর্মী। নাটক ও কথা সাহিত্যে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব পাকিস্থানের হাজার হাজার মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা তাঁকে আপ্লুত করেছিল। গণযুদ্ধের সূচনা থেকেই তিনি এবং তাঁর সহকর্মীগণ রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ফলে সমস্ত

দেশজুড়ে বেতার ও টেলিভিশনের কর্মীদের উপর নির্যাতন শুরু হলো। অনেককে হত্যা করা হলো, অনেক জেলে গেলেন। বহু বেতার টেলিভিশন কর্মী ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। সর্বস্ব খুইয়ে কল্যাণ মিত্র মহাশয়, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ভারতের বুকে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা তাঁকে দমিয়ে দিতে পারেনি। বন্ধু প্রসেনজিৎ বোস ও রাজু আহমেদ ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। স্বাধীন বাংলা বেতারের পরিচালক শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম সামসুল হুদা চৌধুরীর প্রেরণায় ও সহযোগিতায় সৃষ্টি করলেন—'জল্লাদের দরবার'। যা এখনও মানুষের মনে অমলিন হয়ে আছে। ঘাতক ইয়াহিয়া খানের পরিচালনার ঘাতকদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ধারাবাহিক 'জল্লাদের দরবার' নাটকটি। শব্দ সৈনিক হিসাবে অংশ নিয়েছিলেন রাজু আহমেদ (প্রধান চরিত্র) তিনি ইয়াহিয়া খানের রূপক চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করে বাঙালীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ইয়াহিয়া খানের — বিবেক 'দুর্মুখ'-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নারায়ণ ঘোষ। এছাড়া ছিলেন প্রসেনজিৎ বোস, অমিতাভ বোস, বুলবুল মহলানবীশ, সুস্মিতা ও আরও অনেকে। সর্বোপরি নাট্যকার কল্যাণ মিত্রের অপূর্ব কাহিনীসৃষ্টি ও সার্থক চরিত্র চিত্রায়ণই ছিল নাটকটির সকল উপস্থাপনের প্রধান সহায়ক। নাটকটি সংগ্রামী মানুষের ঘরে ঘরে প্রেরণা জোগালো। ইথারের বুকে কম্পন জাগিয়ে হানাদার কাহিনীকে আঘাত করলো। দুই বাংলার মানুষের কাছেই নাটকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। ব্যঙ্গাত্মক এই নাটকটি উভয়বাংলার অগণিত শ্রোতার মনে আলোড়ন তুলে ছয়মাস ধরে সপ্তাহে চারদিন অভিনীত হয়েছিল। এছাড়া বিশ্বজনমতের উপর বিভিন্ন ফিচার লিখতেন কল্যাণ মিত্র মহাশয়। স্বাধীন বেতারকেন্দ্র চলাকালীন অবশেষে এসে গেল সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। সেদিন ১৯৭১-এর ৩রা ডিসেম্বর সারা বেতারকেন্দ্র জুড়ে ভীষণ ব্যস্ততা। নির্দেশ এসেছে "জোরসে স্লোগান দো, জোরসে মার্শাল সং লাগাও"। পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। শুধু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রই নয়—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বক্তব্য প্রচার করছেন। বিশ্ব জনমত তখন বাঙালী নেতা শেখ মুজিবের মুক্তি ও রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। এমনই চরম মুহূর্তে ৬ই ডিসেম্বর ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি নতুন মাত্রা এনে দিল। স্বাধীন বাংলা বেতারে তখন চরম পত্রের উচ্ছ্বাস চরমে। একটি চরমপত্রের নমুনা নিম্নরূপ :-

"...ঢাকায় তখন মেজিক কারবার চল্‌তাছে। চাইরো-মুড়ার থনে গাবুর বাড়ি আর কেচ্‌কা মাইর খাইয়া ভোমা ভোমা মসুয়া সোলজারগুলা তেজগাঁ-কুর্মিটোলায় আইস্যা অ অ অ দম্ ফেলাইতেছে। আর সমানে হিসাব পত্র তৈরি হইতাছে। তোমরা কেডা?

ও অ অ ভৈরব থাইক্যা আইছো বুঝি? কতজন ফেরত আইছো? ...ব্যাস্ আর কইতে হইবো না—বুইজ্যা ফালাইছি। বাকীগুলার বুঝি হেই কারবার হইয়া গেছে। ...আরে এইগুলি কারা? যশুরা কই মাছের মত চেহারা হইছে কীর লাইগ্যা? ও-অ অ তোমরা বুঝি যশোর থাইকা ১৫৬ মাইল দৌড়াইয়া ভাগোয়াট হওনের গতিকে এই রকম লেড় লেড়া হইয়া গেছ। আঃ তুমি একা খাড়াইয়া আছো কীর লাইগা? কি কইল্যা? ও অ অ বাকী হগ্‌গল গুলারে বুঝি বিচ্চুরা গাং এর পারে পাইয়া আরাম্‌সে পানির মইদ্দে চুবানি মারছে।

কেইসডা কি? আমাগো বক্‌সী বাজারের ছক্কু মিয়া কান্দে কীর লাইগ্যা? ছক্কু-উ, ও ছক্কু! কান্দিসনা ছক্কু কান্দিসনা। কইছিলাম না, 'বাঙ্গাল মুলুকে কেদো আর প্যাকের মাইদ্দে মউত তেরা পুকারতা হ্যায়'। নাঃ তখন কি চোট-পাট হ্যান্ করগো, ত্যান করেগা আর অখন? ...আতকা আমাগো ছক্কু কইলো, ভাইসাব, আমার বুকটা ফাইট্যা খালি কান্দোন আইতাছে। ডাইন মুড়া চাইয়া দেহেন ওইগুলা কি খাড়াইয়া রইছে। কি লজ্জা, কি লজ্জা! মাথা এ্যাঙ্গেল কইরা তেরছী নজর মারতে দেহি কী? শও কয়েক মছুয়া অক্করে চাউলার বাপ্ মানে কিনা দিগম্বর সাধু হইয়া খাড়াইয়া রইছে। বিগ্রডিয়ার বশীর তাগো জিগাইল তুম লোগকো কাপ্‌ড়া কিধার গিয়া? জবাব আইলো যশোরে সার্ট, মাগুরায় গেঞ্জি, গোয়ালন্দে ফুলপ্যান্ট আর আরিচায় আন্ডার উইয়ার থুইয়া বাকী রাস্তা খালি চিল্লাইতে চিল্লাইতে আইছি—'হায় ইয়াহিয়া ইয়ে তুম্‌নে কেয়া কিয়া—হাম্ লোগ তো আভি নাঙ্গা মছুয়া বন গিয়া।"

এরপর প্রতিদিনই কোনো না কোনো অঞ্চল শত্রুমুক্ত হতে থাকে। অবশেষে এল ১৬ই ডিসেম্বর। বাংলার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল বিজয়ের আনন্দ। ভারতের মিত্রবাহিনী ও মুক্তি বাহিনীর মিলিত আক্রমণে মাত্র বারো দিনেই পতন হলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর। পাকিস্তান ইস্টার্ণ কমান্ডের সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল নিয়াজী ভারত ও বাংলাদেশের মিলিত কমান্ড জেনারেল আরোরার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। সেদিন ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে নিজের স্থান করে নিল।

নাট্যকার কল্যাণ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৯৩৯ সালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর রেল কোয়ার্টার্সে তাঁর জন্ম হয়। পিতা শ্রী হৃষিকেশ মিত্র ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপ্রেমী। বংশগত কারণেই কল্যাণ মিত্রের রক্তে প্রবেশ করেছিল সংস্কৃতির ধারা। শৈশবে কিছুকাল চট্টগ্রামে কাটিয়ে স্থায়ী বাসস্থান কুষ্টিয়ায় চলে আসেন। নবম শ্রেণীতেই তার নাটক লেখার হাতেখড়ি হয়। স্কুলের

বাৎসরিক পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তার লেখা নাটক "কথা কও" মঞ্চস্থ হয়। গুণীজনের প্রশংসায় শুরু হয় নবীন নাট্যকারের পথচলা।

মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর কয়েকজন বন্ধু মিলে কুষ্ঠিয়া সাংস্কৃতিক সংসদ নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। নাটক, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রভৃতি অনুষ্ঠান নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত। কল্যাণ মিত্রের চলার পথে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন কুষ্ঠিয়া মহাবিদ্যালয়ের সহঃ অধ্যক্ষ শ্রী অম্বিকা চক্রবর্তী, কুষ্ঠিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী হৃষিকেশ মৈত্র, অঙ্কের শিক্ষক শ্রী অমল মৈত্র মহাশয়।

কলেজ জীবনের প্রারম্ভে তিনি শুধু নাটক রচনা নিয়েই মেতে থাকেননি। এম. এম. ওয়াহিদ এবং নট ও নাট্যকার নিজামতুল্লাহকে নাট্যশিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করে তালিম নিতে শুরু করেন নাটক, মঞ্চসজ্জা এবং রূপসজ্জা প্রভৃতি বিভিন্ন আঙ্গিক ও প্রকরণ বৈশিষ্ট নিয়ে। এছাড়াও তালিম নেন তৎকালীন দৃশ্যসজ্জাকর অনিল মিত্র ও প্রখ্যাত রূপসজ্জাকর আবদুস সোবহান সাহেবের কাছে। স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে যখন একচেটিয়া ভারতীয় বাংলা নাটক আধিপত্য বিস্তার নাটক সেই সময় অসম সাহসে বুক বেঁধে তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশীয় নাট্য রচনায়। তার রচিত "দায়ী কে?" নাটকটি আর্থিক অভাবের জন্য মঞ্চস্থ করা যায়নি। তখন তার বন্ধুস্থানীয় শিল্পপতি শ্রী দেবকীনন্দন কেজরীওয়ালা আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ফলে একের পর এক নাটক মঞ্চায়ন শুরু হয়।

তার রচিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল — "জল্লাদের দরবারে", "প্রদীপশিখা", "শুভবিবাহ", "টাকা-আনা-পাই", "সংঘাত", "পাথরবাড়ী", "কুয়াশার কান্না", "সাগর সেঁচা মাণিক", "সোনা-রূপা-খাদ", "সূর্যমহল", "অতএব", "অনন্যা" ইত্যাদি। এর মধ্যে "পাথরবাড়ী" ও "জল্লাদের দরবার" বেতারে প্রচারিত হয়।

"জল্লাদের দরবার" চলচ্চিত্রায়ণের কাজ শুরু হয়, কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

তার রচিত উল্লেখযোগ্য ফিচারগুলি হল — "মীরজাফর সাবধান", "একটি জাতি - একটি ইতিহাস", "আততায়ী", "বেইমান", "অভিশাপ" ইত্যাদি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের সঙ্গে গণবিপ্লবে অংশগ্রহণের জন্য সামরিক শাসক তাকে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের মত ফাঁসির হুকুম দেয়। ফলে তিনি স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন। ভারতেও তিনি মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৭২ সালে তার সাগ্রিক নাট্যসৃষ্টির জন্য তিনি বাংলা আকাদেমী সাহিত্য পুরস্কার পান। এছাড়া স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রপতি তাকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করেন। আর সর্বোচ্চ পুরষ্কার হিসাবে পেয়েছেন দুই বাংলার অগণিত স্বাধীনতাকামী মানুষের ভালবাসা।

স্বাধীন বাংলার বেতারে প্রচারিত "জল্লাদের দরবারে" নাটকটি প্রচারের সাথে সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন নাট্যকার কল্যাণ মিত্র।

তথ্য সংগ্রহ ঃ-

১। নাট্যকার কল্যাণ মিত্রের সাক্ষাৎকার।

২। "৭১-এর রণাঙ্গন"—সামসুল হুদা চৌধুরী।

৩। "৭১-এর আমি" — বেগম নূরজাহান।

৪। মাশিউর রহমান পারভেজ কর্তৃক "মাকু" পাবলিশার্স, জাপান থেকে প্রকাশিত।

সংযুক্তি ঃ-

১। কয়েকটি প্রামাণ্য দলিল ও প্রাসঙ্গিক কথা।

২। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত বিখ্যাত স্লোগান।

৩। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত কয়েকটি অনুষ্ঠান।

পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনে (১৯৪৮-১৯৫২) "সাপ্তাহিক সৈনিক" - এর ভূমিকা

মুহাম্মদ জমালুল আকবর চৌধুরী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষা আন্দোলনের যুগান্তকারী চেতনা পরবর্তীকালে বাঙালীর জীবনের প্রতিটি সঙ্কটে প্রেরণা শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। ১৯৪৭ খ্রিঃ দেশ বিভাগকালে নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনগণের মনে অজস্র আশা আকাঙ্খা পুঞ্জীভূত ছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের অব্যবহিত পর ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের মনে পাকিস্তান সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটে। পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর মনে এধারণা বদ্ধমূল হলো যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শাসন অবসানের সুযোগে আর একটি নয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। ১৯৪৮ খ্রিঃ থেকে ১৯৫২ খ্রিঃ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক ঘটনা প্রবাহ এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

ভাষা আন্দোলনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের সচেতন বুদ্ধিজীবী, লেখক ও গবেষক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ঘটনা প্রবাহ ও তাৎপর্য সম্পর্কে প্রচুর গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল গ্রন্থে *"ভাষা আন্দোলনে সংবাদপত্র সমুহের ভূমিকা"* সম্পর্কীয় বিষয়টি আলাদাভাবে তেমন স্থান পায়নি-যা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। কারণ বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জনমত গঠনে পূর্ব বাংলার সাময়িক পত্রগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে *"সাপ্তাহিক সৈনিক"* আন্দোলনের আলোকবর্তিকা তথা পথ-প্রদর্শক হিসাবে কাজ করে। আলোচ্য প্রবন্ধে *"সাপ্তাহিক সৈনিক"* এর উদ্ভব ও বিকাশ এবং ভাষা আন্দোলনে এর যথাযথ ভূমিকা গুরুত্ব সহকারে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হবে।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম (জন্ম ১৯২০) এর উদ্যোগে একই বছরের ১লা সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় "পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস"। মজলিসের উদ্যোগে নিয়মিতভাবে সাংস্কৃতিক সম্মেলন, বিতর্ক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তমদ্দুন মজলিশ কর্তৃক ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা - বাংলা না উর্দু' নামে প্রথম একটি বই প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক আবুল কাসেম এই গ্রন্থে প্রদত্ত এক বক্তব্যে

বলেন "লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের স্ব-স্ব প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নির্ধারণ করার স্বাধীনতা দিতে হবে।"[১] তাছাড়া আবুল কাসেমের ভাষা সংক্রান্ত কয়েকটি প্রস্তাবও[২] বইয়ের মুখবন্ধে সন্নিবেশিত হয়। তিনি এসব প্রস্তাবের পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেককে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

আবুল কাসেম ও তাঁর সহকর্মীরা বাংলা ভাষার পক্ষে ব্যাপক প্রচারণার প্রয়াস স্বরূপ ১৯৪৮ সালের ১৪ই নভেম্বর (২৮শে কার্তিক, ১৩৫৫) *"সাপ্তাহিক সৈনিক"* নামে একটি মুখপত্রে প্রকাশনা শুরু করে। পত্রিকার প্রকাশনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আবুল কাসেম বলেন - "রেল কর্মচারী লীগের কয়েকজন নিষ্ঠাবান বিশিষ্ট কর্মীর সহায়তায় আমি এই বিপ্লবী পত্রিকাটি তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে প্রকাশ করি। ...তমদ্দুন মজলিসের মুখপত্ররূপে 'সৈনিক' আত্মপ্রকাশ করে। ভাষা আন্দোলনে ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য 'সৈনিক' জনগণের প্রিয় হয়ে উঠে।"[৩] ১৯৪৮ সালে 'সৈনিক' আত্মপ্রকাশের সময় সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন শাহেদ আলী ও এনামুল হক। পরে শাহেদ আলী সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি হন। পরবর্তীকালে আব্দুল গফুর সৈনিকের' ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন। ১৯৫০-১৯৫১ সালের দিকে তিনি সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ১৯নং আজিমপুর-এর তমদ্দুন মজলিসের অফিসই ছিল 'সৈনিক'-এর অফিসে। ১৯৪৯ সাল থেকে 'সৈনিক' ৪৮নং কাপ্তান বাজার হতে প্রকাশিত হতে থাকে। পৃষ্ঠার সংখ্যা ছিল ৮। দাম ছিল ১০ পয়সা। আত্মপ্রকাশের সময় থেকে 'সৈনিক' পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলার) সকল প্রকার অধিকার ও বাংলাভাষা বিরোধী সকল ধরণের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সজাগ ছিল। 'সৈনিক' সংবাদ, নিবন্ধ, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, কবিতা, গান কার্টুন, ইত্যাদিব মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে আপোষহীন ভূমিকা পালন করে। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় ঃ

> ...অনেক বাধা-বিঘ্ন পার হইয়া সৈনিক আজ লড়াই-এর ময়দানে আসিয়া হাজির হইল। পুরানো দুনিয়ার ইমারত হইতে ইট খসিয়া পড়িতেছে। যে নীতিবোধ ও ধ্যান ধারণার উপর এতো দিনকার জগৎ প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাতেও আজ ফাটল ধরিয়াছে। ...মানুষে, মানুষে, জাতিতে জাতিতে হানাহানি থামানো দূরের কথা, আজ তাহা হাজার গুণে বাড়িয়া গিয়াছে।...দুস্‌রা মহাসমরের পর দুনিয়া জোড়া মানুষের মনে নূতন করিয়া যে অশান্তির ঝড় উঠিয়াছে পাক জনগণও তাহা হইতে বাদ যায় নাই। বরং পাকিস্তানে এই হতাশা আর বিশৃঙ্খলা যেন সকল

সীমা-সরহাদ্দ ছাড়াইয়া যাইতে বসিয়াছে। সাধারণ মানুষের সামনে পাকিস্তান সম্বন্ধে একদিন এক রঙীন স্বপ্ন তুলিয়া ধরা হইয়াছিল-কিন্তু কোনো মজবুত আদর্শের বুনিয়াদ তাদের মধ্যে খাড়া করা হয় নাই।...ক্ষমতা হাতে পাইয়া নেতারা নিজ নিজ স্বার্থ আদায় করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন আর দরিদ্র জনসাধারণ -ছাত্র, শিক্ষক, কিষাণ, শ্রমিক যাদের ঐতিহাসিক কোরবানীর ফলে পাকিস্তান হাসিল হইয়াছে নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আজ তারা শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত। ...তাদের ভাত-কাপড়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দাবি এতটুকু মিটে নাই। নিজেদের দাবি দাওয়া ও আশা আকাঙ্খার জন্য লড়িবার মনোবৃত্তিও আজ তাদের উবিয়া যাইতেছে। যাকে সামনে রাখিয়া তারা লড়িবে...তেমন কোনো মজবুত আদর্শ তাদের সামনে না থাকায় তাদের নৈরাশ্য আজ চরমে পৌছিয়াছে এবং তারি ছিদ্রপথে পাকিস্তানের দুশমনেরা আমাদের মাঝে ঢুকিয়া পড়িতেছে। ...আমরা কায়দে আজমের বিপ্লবী আদর্শের উত্তরাধিকার বহন করিতেছি। এদেশের পুঁজিপতি ও জমিদারদিগকে কায়দে আজম কী বলিয়াছিলেন, বড়ো বড়ো শিল্প জাতীয়করণ সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা ছিল, সর্বোপরি কোন ন্যায়-নীতির উপর পাকিস্তানের বুনিয়াদ তিনি খাড়া করিতে চাহিয়াছিলেন সৈনিক তাহা ভুলিতে পারে না।...''[৪]

বলা যায় চল্লিশের দশকের কলকাতার 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'' ও ঢাকার 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এর আদর্শ অনুযায়ী তমদ্দুন মজলিস ও সৈনিক পত্রিকা পরিচালিত হয়েছিল।

১৯৪৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে অধ্যাপক নূরুল হক (প্রথম সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ও তখনকার তমদ্দুন মজলিস কর্মী), অধ্যাপক আবুল কাসেম, অধ্যাপক রেআত খাঁ, অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম, আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী (তখনকার সাপ্তাহিক 'ইনসাফের' সম্পাদক) সহ আরো অনেকে একটি বিবৃতি দেন যা পরবর্তীতে 'সাপ্তাহিক সৈনিকে' প্রকাশিত হয়। বিবৃতিটি নিম্নরূপ ঃ

''আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য আগাইয়া আসেন। আমাদের মাতৃভাষাকে কোণঠাসা করিবার একটি সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র চলিতেছে - তাহার বিরুদ্ধে আমাদের এখন হইতে তৎপর হওয়া অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এখানের সংবাদপত্র ও শিক্ষিত

সমাজ এখনো এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত বলিয়া মনে হয় না। আমরা এইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের মনে রাখা উচিত প্রদেশব্যাপী এই আন্দোলন গড়িয়া তোলা ছাড়া বাংলা ভাষা যথাযোগ্য স্থান পাইবে না।

আরো একটি বিষয়ে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের হিতাকাঙ্খীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সমস্ত প্রদেশব্যাপী আন্দোলন করিতে আমাদের অনেক অর্থের দরকার। বাংলা ভাষার প্রচার করিতে ইতিপূর্বে তমদ্দুন মজলিসের অনেক আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। ইহা বিবেচনা করিয়া তমদ্দুন মজলিসের কেন্দ্রীয় পরিষদ একটি 'বাংলা ভাষা প্রচার তহবিল' খুলিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই ফান্ডে মুক্ত হস্তে দান করিবার জন্য আমরা সকলের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। বিভিন্ন পত্রিকায় চাঁদাপ্রাপ্তির হিসাব ও চাঁদাদাতার নাম প্রকাশ করা হইবে। অর্থাদি পাঠাইবার ঠিকানা ঃ অধ্যাপক আবুল কাসেম, ট্রেজারার, 'বাংলা ভাষা প্রচার তহবিল, ১৯নং আজিমপুর রোডে, ঢাকা।"[৫]

১৯৪৮ এবং ১৯৫২ পর্বের ভাষা আন্দোলনের মধ্যবর্তী সময়ে রাষ্ট্রভাষা চিন্তার মূল বিষয় ছিল ভাষা সংস্কার। নতুন লিপি, সহজ বাংলা, পাক-বাংলা, ইত্যাদি নামে ভাষা সংস্কারের নানামুখী প্রয়াস এ সময়ে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া অনেকে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং আরবিকে রাষ্ট্রভাষা করারও প্রস্তাব দেন। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুর রহমান (১৯০৫-১৯৬৬) ছিলেন বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনে সরকারী পরিকল্পনার মূল প্রবক্তা। বাঙালী আমলাদের মধ্যে মিজানুর রহমান মুসলমানী বাংলা ও সহজ উর্দু দিয়ে 'পাকিস্তানী ভাষা' গঠনের সুপারিশ করেন এবং বাংলাকে আরবি লিপিতে অনুলিখিত করে দেখান। ১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ মাসে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁনকে (১৮৬৮-১৯৬৮) সভাপতি করে গঠিত হয় "পূর্ববাঙলা ভাষা কমিটি"। ভাষা কমিটি কর্তৃক গঠিত 'ভাষা সংস্কার সাব কমিটি' "সহজ বাংলা" নামক একটি অদ্ভুত লিপির সুপারিশ করে। কমিটি সংবাদপত্রের সম্পাদক, লেখক পত্রিকার মুদ্রকসহ সকলকে 'সহজ বাংলা' অনুসরণের আহ্বান জানান। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড বাংলাসহ সকল প্রাদেশিক ভাষা আরবি হরফে লেখার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করে। ভাষা সংস্কারের ব্যাপারটি 'সৈনিক' বেশ গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ১১ই মার্চ 'সৈনিক' ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত 'সোজা বাংলা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ভাষা কমিটির পক্ষে নঈমুদ্দিন আহমেদও এক বিবৃতিতে

সরকারের এরূপ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।[৬] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিবেচনার বিশেষজ্ঞ কমিটির নিকট পেশকৃত স্মারকলিপিতে বলা হয় - 'আমরা মনে করিতেছি যে, আরবি হরফ প্রণয়ন প্রচেষ্টার দ্বারা পৃথিবীর ৬ষ্ঠ স্থানাধিকারী বিপুল ঐশ্বর্যময়ী ও আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরবের ঐতিহ্যবাহী বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর হামলা করা হইতেছে।...বাংলা হরফকে পরিবর্তন করা চলিবে না। পাক বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর কসায়ের মত ছুরি চালনা করা চলিবে না।[৭] শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আরবি হরফে বাংলা লিখনের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্য বার্ষিক বেশ কিছু টাকা মঞ্জুর করেন। এ প্রসঙ্গে "সাপ্তাহিক সৈনিক" এর 'ইহা কি সত্য" - শিরোনামে এক সংবাদে বলা হয় - 'ইহা কি সত্য যে, ভাষা কমিটির রায় প্রকাশের পূর্বেই উর্দু হরফ চালু করিবার উদ্দেশ্যে ৩৫,০০০ টাকা ব্যয়ে প্রদেশের বিভিন্নস্থানে কতগুলো ট্রেনিং সেন্টার খুলিবার আয়োজন হইতেছে? অর্থাভাবের অজুহাত দেখাইয়া যেখানে প্রতিদিন অসংখ্য শিক্ষালয় তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে, সেখানে এইসব অকারণ অর্থ অপব্যয় কি জঘন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়?"[৮] বাংলা ভাষায় আরবি হরফ লেখার বিরুদ্ধে সারাদেশে প্রবল গণরোষের সঞ্চার হলে পূর্ববাংলা সরকার কর্তৃক ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪৯ তারিখে জারিকৃত এক প্রেসনোটে উক্ত খবরকে ভিত্তিহীন গুজব বলে উড়িয়ে দেয়া হয়। ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪৯ তারিখে "সাপ্তাহিক সৈনিক" এ এই প্রেসনোট প্রকাশিত হয়। তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক ও সৈনিকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আব্দুল গফুর "সাপ্তাহিক সৈনিকে" বাংলা হরফের উপর কোন শয়তানী হামলা বরদাশত্ করা হইবে না" - শীর্ষক এক সংবাদ নিবন্ধে বলেন।

> "পূর্ব পাকিস্তানের তমদ্দুনের গলা টিপিয়া মারিবার জন্য এক শয়তানী চক্রান্ত শুরু হইয়াছে। বাজারে জোর গুজব, ঢাকাতে আগামী ১৪ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের যে সভা বসিবে তার একটি প্রস্তাবে বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। গুজবটি সত্য হইলে কর্তৃপক্ষকে আমরা হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। বাংলা ভাষার জন্য আরবি হরফ গ্রহণ যে কতটা অবৈজ্ঞানিক ও জাতীয় জীবনের প্রগতির পক্ষে কতটা মারাত্মক হইবে, তাহা লইয়া দেশের হিতকামী শিক্ষাবিদ ও ভাষাবিদগণ সৈনিকে ও অন্যান্য পত্রিকায় ঢের আলোচনা করিয়াছে।"[৯]

আরবি হরফে বাংলা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে 'সৈনিকের' ভূমিকা এবং তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশের ছাত্রসমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি

করে। হরফ-ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯৪৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর "সাপ্তাহিক সৈনিকে" তাদের আন্দোলনের বিবরণ ছাপা হয়। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে "কেন্দ্রীয় বর্ণমালা সংগ্রাম পরিষদ" নামে একটি পরিষদ গঠন করা হয় যা প্রয়োজনবোধে সারা প্রদেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়।[১০] সৈনিকের দ্বিতীয় বার্ষিকী সংখ্যায় 'হুঁশিয়ারী' শীর্ষক এক প্রবন্ধে হাসান ইকবাল (পরবর্তীতে সৈনিকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন) বলেন,

> "পূর্ব বাংলাকে কোণঠাসা করার এই ষড়যন্ত্র নতুন কিছু নয়। পাকিস্তান কায়েম হবার পর থেকেই করাচীর প্রতিক্রিয়াশীল মহল থেকে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা মারফত এই ষড়যন্ত্রের শুরু করা হয়েছে। এই সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে পূর্ববঙ্গের মেরুদন্ড ভেঙে দিতে প্রয়াস পেয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের বীভৎসরূপ আমরা দেখেছি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বাজেট, মূলনীতি প্রস্তাবে, বাংলা হরফকে তাড়ানোর চেষ্টায়, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করার বেলায়। পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল দিকেই এই ষড়যন্ত্রের সুতীক্ষ্ম ছুরি চালানো হয়েছে এবং হচ্ছে।"[১১]

১৯৫০ সালের ১৩ই জানুয়ারি সৈনিকে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে, করাচিতে পাকিস্তান গণ-পরিষদে পূর্ব বাংলার সদস্যরা করাচির স্কুলগুলোতে বাংলাকে দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষা হিসাবে প্রচলনের দাবি জানান। ১৯৫১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, পরিষদ সদস্য, অধ্যাপক, সাংবাদিক, লেখক, শিল্পী এবং ছাত্ররা প্রধানমন্ত্রীকে ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সরকারি কাজ-কর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এদিকে পূর্ব বাংলায় পুলিস বিদ্রোহ, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারি আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ এবং সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প পূর্ব বাংলার গণমানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের ভাষা সংক্রান্ত এক মন্তব্যে পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সালে ২৭শে জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানের এক জনসভায় দেড়ঘন্টাব্যাপী বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে তিনি প্রাদেশিকতা ও রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বলেন - "প্রদেশের ভাষা কি হবে তা প্রাদেশবাসীই স্থির করবেন, কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। একাধিক রাষ্ট্র থাকলে কোন রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে পারে না।"[১২] পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের উক্ত বক্তব্য পূর্ব বাংলায় ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কিত 'সৈনিকের' প্রতিবেদন ছিল - "গত ২৭শে জানুয়ারি তারিখে ঢাকা পল্টন ময়দানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা

নাজিমুদ্দিন - 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে একমাত্র উর্দু - এবং উর্দু হরফে বাংলা লিখনের প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হইতেছে' বলিয়া যে উক্তি করেন, তার বিরুদ্ধে ঢাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য স্থানে বিক্ষোভ শুরু হইয়াছে।[১৩] এই বিক্ষোভ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে আরো বলা হয় - "২৯ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের এক প্রতিবাদ সভা হয়। ৩০ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন এবং বিভিন্ন শিক্ষায়তনের ছাত্রদের সহযোগে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।"[১৪]

নাজিমউদ্দিনের বক্তৃতার পর ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরীতে "সর্বদলীয় রাষ্টভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারির "সাপ্তাহিক সৈনিক" এর তথ্য অনুযায়ী '৪০ জন প্রতিনিধি সমবায়ে' সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরের সকল স্কুল কলেজে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা এবং আরবি হরফে বাংলা ভাষা প্রচলনের বিরুদ্ধে ধর্মঘট আহ্বান করে। এই ধর্মঘট সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। এই গণ-আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে "সাপ্তাহিক সৈনিকের" সম্পাদকীয়তে বলা হয় - "জাগ্রত জনতা এই বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত জবাব দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে নতুন করে দিকে দিকে আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে। আমরা এই গণ-আন্দোলনকে মোবারকবাদ জানাই।"[১৫]

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১১ই ফেব্রুয়ারি 'পতাকা দিবস' এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। এই কর্মসূচি সফল করতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়। সরকার রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি প্রসূত দূর্বার গণ আন্দোলনকে মোকাবিলা করতে ২০শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকা শহরে মিছিল ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে পূর্ববঙ্গের আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন আহ্বান করে। অতঃপর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ছাত্ররা আমতলার বিক্ষুব্ধ সভায় বহু বাক-বিতন্ডার পর ১৪৪ ধারা ভঙ্গের এবং গ্রেফতার বরণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে শুরু করলে দলে দলে গ্রেফতার হতে থাকলে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দুপুরের পর পুলিস মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে ঢুকে লাটিচার্জ করতে শুরু করলে ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিসের প্রতি ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পুলিস উত্তেজিত হয়ে গুলিবর্ষণ করলে শহীদ হয় বরকত, সালাম, জব্বার এবং

সালাউদ্দিন প্রমুখ। এদিকে বিধান পরিষদের অধিবেশন চলাকালে পুলিসের গুলিবর্ষণের ঘটনা অবগত হয়ে সদস্যরা পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন।

ঢাকায় ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ ও ছাত্র হত্যার ঘটনাটি পূর্ববাংলাসহ সমগ্র ভারত উপমহাদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা সম্বলিত রিপোর্টি নিয়ে ১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি সকালে "সাপ্তাহিক সৈনিক" - এর বিশেষ শহীদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই দিন মাত্র দুই ঘন্টার মধ্যে হাজার হাজার কপি পত্রিকা বিক্রি হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে একই সংখ্যার উপর্যুপরি তিনটি সংস্করণ বের করেন। 'সৈনিকের' রক্তাক্ত ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রতিক্রিয়ায় 'শহরময় গণদাবানল' শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয় -

"২১শে ফেব্রুয়ারিতে নিরীহ ছাত্রদের উপর গুলি চালিয়ে যারা ভেবেছিল এতে করে ছাত্রদের আওয়াজকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়া যাবে, তাদের সে দুরাশা মিটিয়ে দিতে জনসাধারণই এবার ছাত্রদের পাশে এগিয়ে এসেছেন। ঢাকার শিক্ষিত-অশিক্ষিত, যুবা-বৃদ্ধ, মেয়ে-পুরুষ, এক কথায় সমগ্র জনসাধারণ পুলিসের এই নৃশংস অত্যাচারের খবরে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠেন। শহরের সমস্ত দোকানপাট আপনাআপনিই বন্ধ হয়ে যায়। জনসাধারণ পথেঘাটে পুলিশের এসব দুষ্কার্যের তীব্র নিন্দা করতে থাকেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি ভোর হতেই সকালে সংবাদপত্রের অপেক্ষায় থাকেন। কিন্তু মর্নিং নিউজ, সংবাদ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁরা যখন বিকৃত সংবাদ প্রকাশিত দেখতে পান, তখন তাঁদের ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে যায়। জনসাধারণ এসব ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে পুড়িয়ে ধংস করে দেন। ভোর হতে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা মর্নিং নিউজের গাড়ির জন্য আজাদ অফিসের সামনে অপেক্ষা করতে থাকেন। মর্নিং নিউজের গাড়ি আজাদ অফিসেব সামনে উপস্থিত হওয়া মাত্রই উত্তেজিত জনতা গাড়ির উপর লাফিয়ে পড়ে সমস্ত কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন। জনতা গাড়ির আক্রমণ উদ্যত হলে গাড়ি আজাদ অফিসের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করে।"[১৬]

২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনায় আহতদের জন্য বেনামে জনসাধারণের প্রতি রক্তদানের আবেদন জানানো হয়। যেমন - 'সৈনিক' - এ 'আপনারা রক্ত দিন' - শিরোনামে লেখা হয় - "আজকের হত্যাকাণ্ডে আহত বন্ধুরা রক্তের অভাবে মেডিক্যাল হাসপাতালে মরতে বসেছে। আপনি দয়া করে ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত দান করে তাদের বাঁচান।"[১৭] ধারণা করা হয় এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেকে পরে স্বআগ্রহে রক্ত দেন বলে নিহতের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়নি।

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের তথা বাঙালী জাতির সবচাইতে গৌববোজ্জল অধ্যায়। আর এই আন্দোলনকে উজ্জীবিত করতে তৎকালে যে সকল পত্র-পত্রিকা এগিয়ে আসে

তন্মধ্যে অন্যতম ছিল "সাপ্তাহিক সৈনিক"। নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে স্পষ্টভাষী ও আপোষহীন 'সৈনিক' পত্রিকা সকল আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াকু ভূমিকা অব্যাহত রাখে। 'সৈনিক' - রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণকারী কেন্দ্রীয় ও মুসলিম লীগ সরকারের বাঙালী স্বার্থ বিরোধী স্বরূপ উন্মোচনে অন্যতম ভূমিকা রাখে। "সাপ্তাহিক সৈনিক" - এর জোরালো ভূমিকা এবং পূর্ব বাংলার ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দগণ গণমানুষের তীব্র বিরোধিতা ও অসহযোগিতার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বাংলা ভাষা বিরোধী বিভিন্ন ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতঃপর ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদে গৃহীত পাকিস্তান ইসলামি রিপাবলিকের প্রথম সংবিধানে (২১৪নং অনুচ্ছেদের ১নং ধারা) পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি লাভ করে।

সূত্র নির্দেশ ঃ-

১. আবুল কাসেম (সম্পাদিত) *"পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু"*, বলিয়াদি প্রেস, তমুদ্দুন মজলিস, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭।

২. প্রস্তাবগুলো ছিল - (১) বাংলা ভাষাই হবে ঃ (ক) পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন, (খ) পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা, (গ) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা। (২) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হবে দু'টি - বাংলা ও উর্দু। (৩) (ক) বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা একশজনই এ ভাষা শিক্ষা করতেন। (খ) পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্ত প্রাদেশিক ভাষা। (গ) ইংরাজী হবে পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। (৪) শাসনকাজ ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাতত কয়েক বছরের জন্য ইংরাজী ও বাংলা - দুই ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকাজ চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাংলাভাষার সংস্কার করতে হবে।

৩. আবুল কাসেম প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, উদ্বৃত; মোসতাফা কামাল, *"ভাষা আন্দোলন সাতচল্লিশ থেকে বাহান্ন"*, চট্টগ্রাম; প্রথম প্রকাশ; ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, পৃঃ ৩৭।

৪. বশীর আল হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৮৫, পৃঃ ১১৩।

৫. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, ভাষা আন্দোলনে সৈনিক (১৯৪৮-'৫২), বিচিত্রা, একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ২৫শে ফেব্রুয়ারি' ৮৩, পৃঃ ৩৫-৩৬।

৬. "সাপ্তাহিক সৈনিক", ৮ই এপ্রিল, ১৯৪৯ ইং।

৭. *তদেব*, ২২শে এপ্রিল, ১৯৪৯ ইং।

৮. *তদেব*, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ইং।

৯. *তদেব।*

১০. তদেব, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ইং।

১১. *তদেব*, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৫০ ইং।

১২. বশীর আল হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৭।

১৩. "*সাপ্তাহিক সৈনিক*", ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ ইং।

১৪. *তদেব*।

১৫. তদেব, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ ইং।

১৬. *তদেব*, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ ইং।

১৭. তদেব।

পূর্ব - পাকিস্তানের সামরিক শাসন ও সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া : ১৯৫৮-৬৩

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি সাংবিধানিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক আইনের বলে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। এই সময়ে সামরিক আইনের ফরমান বলে জনগণের মৌলিক অধিকার সমুহ কেড়ে নেয়া হয়। এরপর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খান একের পর এক সামরিক আইন রেগুলেশন ঘোষণা করতে থাকেন। সাধারণ আইন শৃঙ্খলা, বিচার বিভাগ ও প্রশাসন বিষয়ক রেগুলেশনগুলি ঘোষণা করার পর সামরিক আইন রেগুলেশন নং ৪ ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার মধ্যে দিয়ে সকল ধরণের প্রচার মাধ্যমগুলির ওপর প্রি সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়। এ হুকুমেব কোন রকম বরখেলাপ করা হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে বলে ঘোষণা করা হয় এবং সে শাস্তি ৭বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড হতে পারে। এই বিবরণ থেকে দেখা যায়, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসনের মাধ্যমে মানুষের ন্যূনতম মৌলিক অধিকারকেও হরণ করে নেওয়া হয়। বিভিন্ন ঘোষণা ও হুকুম প্রদানের মাধ্যমে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, জনগণ প্রতিবাদ করার সুযোগ পেত না। এমন কি সাধারণ মানুষ পথে ঘাটেও মুক্তভাবে চলাফেরা করার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। দেশের জনসাধারণ যেন এক অভিভাবকহীন অনাথ লোকালয় পরিণত হয়েছিল। এ সময় সমস্ত ধরণের মত প্রকাশের অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়, সামরিক শাসনের ব্যাপারে যে কোন ধরণের সমালোচনাকে কঠোর ধরণের শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে হরণ করা হয়, সামরিক কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে গঠিত বিভিন্ন ধরণের সামরিক আদালতের হাতে শাস্তি প্রদানের চূড়ান্ত অধিকার অর্পণ করা হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রাখা হয়নি। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ওপর এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয় যে কেউ ইঙ্গিতেও যদি সামরিক শাসনকে কিংবা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সমালোচনা বা বিদ্রুপ করছে বলে তারা মনে করে তাহলেও

শুধুমাত্র তার সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে ন্যূনতম শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে ৭ বছর কারাদণ্ড। ফলে সমগ্র পাকিস্তানের জনগণ, এমন কি মিলিটারিদের প্রতি সোজাভাবে তাকাতে পর্যন্ত সাহস পেত না, এমন কি তা অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হত।[১] রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বে-সামরিক প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের দমন করার জন্য আরো স্থুল ধরণের হুকুমনামা জারি করতে হয়। এ ধরণের একটি হুকুমনামা ছিল ১৯৫৯ সালের ৬ আগষ্ট ঘোষিত THE ELECTIVE BODIES (DISQUALIFICATION) ORDER, 1959 (EBDO)। এবডোর অধীনে প্রয়োজনীয় বই পুস্তক বা হিসাব নিকাশ সংক্রান্ত যে কোন ধরণের দলিল কিংবা বিভিন্ন অভিযোগ সংক্রান্ত যে কোন ধরণের কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশও ছিল। ১০নং ধারার (২) উপধারাতে এই বিষয়টি সংযোজিত ছিল।

সামরিক সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে এবং এর সঙ্গে জড়িত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে জেল-জুলুম নির্যাতন নেমে আসে। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকারের কথা পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের কথা যে সকল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেত- যেমন *ইত্তেফাক, সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজারভার* সেগুলোকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয। এছাড়াও সরকারি ও আধাসরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করে সামরিক শাসন বিরোধী সাংবাদিকদের বিদেশ গমনের বাধা দেয়া হয়।[২]

সামরিক শাসন প্রথমেই আঘাত হেনেছে সংবাদপত্রের উপর। বাঙালিরা দেখলো, দেখে মর্মাহত হলো যে, সাংবাদিকরা সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা বলতে গিয়ে কিভাবে বন্দী হচ্ছেন, দমিত হচ্ছেন। প্রয়োজনে রীট জারি করে সাংবাদিকদের রক্ষার জন্য বিচার বিভাগও এগিয়ে আসেনি।[৩] অথচ সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সাহসী। সুব্রত শংকর ধর পাকিস্তানের সামরিক শাসনে সংবাদপত্রের করণীয় ভূমিকার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

> প্রথম সামরিক শাসনের কড়া বিধিনিষেধের চাপে পড়ে এখানকার সংবাদপত্রগুলো যে একটু দমেই গেলো। সামরিক শাসন জারির পরবর্তী কয়েকটি দিন আজাদ, ইত্তেফাক, সংবাদ প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামেও যে বক্তব্য এসেছে তা হলো দেশের রাজনীতির চরম নৈরাজ্যিক পরিস্থিতিতে নিত্যন্ত অনিচ্ছায় সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করেছে এবং এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটানো তাদের পক্ষেই সম্ভব, অতএব তাদের এই ক্ষমতা গ্রহণ অভিনন্দনযোগ্য।[৪]

সামরিক শাসন জারির পর থেকেই পাকিস্তানের উভয় অংশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের

ওপর নিপীড়ন নেমে আসে। যেমন কিছুকালের মধ্যেই মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান সহ প্রায় দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা কারারুদ্ধ হন। সামরিক শাসন আসার পর যে অসংখ্য নেতা কর্মীকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম ১৯৫৮ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখের *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ছিল বিধায় জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যাবলী তুলে ধরার মাধ্যম ছিল সংবাদপত্র। কিন্তু সামরিক শাসনকর্তাদের অসন্তুষ্টির ভয়ে কোন পত্রিকা অবাধে সংবাধ ও মতামত প্রকাশ করত না। এমনি নাজুক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে *দৈনিক ইত্তেফাক* দুঃসাহসের উপর ভর করে সামরিক শাসনকে লেখার মারপ্যাচে সমালোচনা করতে শুরু করে। অন্যান্য দৈনিক সংবাদপত্রগুলি সযত্নে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনা এড়িয়ে চলত। *দৈনিক সংবাদের* ম্যানেজিং ডিরেক্টর আহমাদুল কবির স্বীয় স্বভাবসুলভ পথেই সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের বশংবদ পাত্রে পরিণত হন এবং গভর্নর জাকির হোসেন কর্তৃক গঠিত শিল্প-উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ইত্তেফাকের সমালোচনার আঁচর সহ্য করতে না পেরে সামরিক শাসনকর্তা সেই অন্ধকার যুগে আশার আলোকবর্তিকা ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মাণিক মিয়াকে ১৯৫৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করেন এবং সামরিক আদালত সংক্ষিপ্ত বিচারে তাঁকে দন্ডাদেশ দেন। ভবিষ্যতে লেখনীতে সতর্কতা অবলম্বন করবেন এ মর্মে লিখিত আশ্বাস দেবার পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নির্দেশে সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মাণিক মিয়া মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু ইহা সর্বজন বিদিত যে, কারামুক্তির পরও তাঁর লেখনীতে বিশেষ কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। এজন্য আলি আহাদ যথার্থই মন্তব্য করেছেন -

> ...ছদ্মনাম মোসাফির লিখিত পোস্ট এডিটরিয়েল রাজনৈতিক মঞ্চ জেলে রাজবন্দীদের জন্য সঞ্জীবনী সুধাবৎ ছিল। ইহা স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কত্ববাদের বিরুদ্ধে মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার সংগ্রামের অন্যতম দৃষ্টান্ত ছিল। উক্ত প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য প্রেরণায় উৎস হইয়া থাকিবে।[৫]

এ ধরণের নির্যাতন শুধু পূর্ব পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সমগ্র পাকিস্তানেই এরূপ নিপীড়ন চালানো হয় পশ্চিম পাকিস্তানের বামপন্থী কবি-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরাও এ নিপীড়ন থেকে রেহাই পায়নি। পাকিস্তানের প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা ও সংবাদ প্রকাশক মিয়া ইফতেখার উদ্দীনের ওপর এক চরম নির্যাতন নেমে আসে। তাঁর Progressive Papers Limited থেকে প্রকাশিত *টাইমস এবং ইমরোজ* ছিল সে সময়ের

পাকিস্তানের বামপন্থী নেতা-কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের মুখপত্র। ১৯৫৯ সালের ১৬ই এপ্রিল এক অধ্যাদেশ জারি করে সামরিক সরকার এ প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এর কারণ হিসাবে সরকারের এক প্রেসনোটে প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তানের বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করে চলেছে বলা হয়।

এ ধরণের একটি প্রেস নোট প্রদান করে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে এভাবে জোর করে শুধু দখলই করা হয়নি, এ প্রশ্নে মিয়া ইফতেখার উদ্দীন আদালতের স্মরণাপন্ন হতে চাইলে সে অধিকার থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়। আইয়ুব খানের ৪৪ মাস ব্যাপী সামরিক শাসন আমলের সবচেয়ে বহুল ছিল শেষের ১২টি মাস। এ সময় আইয়ুব শাসকগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল একটি এবং তা হচ্ছে ক্ষমতাসীন অবস্থায় গদীনশীন থেকে কিভাবে গণতন্ত্রে উত্তীর্ণ হওয়া যায়? ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক আইন জারি করার সময় দেশের সংবিধান বাতিল করায় ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহারের সময় একটি নতুন সংবিধানের আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় আইয়ুব সরকার গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রাক্কালে বেশ কটি সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যার মধ্যে সবচেয়ে প্রথমেই হচ্ছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার। ১৯৬২ সালের ৩১শে জনুয়ারি তারিখে করাচীতে হোসেন শহীন সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের দানা বাঁধতে থাকে। এই প্রথমবারের মত পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠলো। বলা বাহুল্য, এই আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৬২ সালের ৬ই ফ্রেরুয়ারি তারিখে পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিনান্সে আটক করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। সামরিক আইন চলাকালীন সময়েই ছাত্ররা আইয়ুব খান প্রণীত সংবিধান বিরোধী আন্দোলন করে। সামরিক আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র পূর্ব বাংলার জনগণ স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। ১৯৬২ সালের ১৫ই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ ওই শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে ধর্মঘট আহ্বান করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তারা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত একটি সভায় শাসনতন্ত্রের দুটি কপি ভস্মীভূত করে।[৮] এরপর ১৯৬২ সালের মার্চের পর প্রদেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন চলে তিনটি দাবির ভিত্তিতে। দাবিগুলো ছিল ঃ

১। নতুন শাসনতন্ত্র বাতিল।

২। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

৩। সোহরাওয়ার্দী-মুজিব সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি।

১৯৬২ সালের ১৭ই জুন তারিখে প্রাদেশিক পরিষদে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবি সম্বলিত একটি বিল পাশ হয় এবং ১৮ই জুন তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দান করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনায় এসময়ে উল্লেখযোগ্য ছিল নয় নেতার বিবৃতি। যার মধ্যে দিয়ে রাজনীতিবিদরাও প্রকাশ্যে আন্দোলনে আসার চেষ্টা করেন। ১৯৬২ সালের ২৫শে জন তারিখে নয় জন রাজনীতিবিদ আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্রের সমালোচনা করে এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিই ছিল তৎকালে পাকিস্তানী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি। ১৯৬২ সালের ২৫ জুন তারিখে বিবৃতিটি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করেছিল ঃ

সত্যিকার গণ-প্রতিনিধি ছাড়া কোন ব্যক্তি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার অধিকারী নয়। করিলে তাহা স্থায়ী, সহজ ও কার্যকরী হইতে পারে না। জনগণ সার্বভৌম - এই হচ্ছে গণতন্ত্রের সারকথা। জনগণই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে। এই ইচ্ছার স্বতঃস্ফূর্ত বাধা-বিঘ্নমুক্ত ও অবাধ বিকাশের একান্ত প্রয়োজন।[৭]

দৈনিক ইত্তেফাকের ঐ সংখ্যায় আরো মন্তব্য করা হয়েছিল ঃ

শাসনতন্ত্রকে স্থায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও গুণসম্পন্ন হইতে হইলে সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও বিচার বুদ্ধির প্রতিফলন অবশ্যই থাকিতে হইবে। এই পদ্ধতিতে প্রণীত বিধানগুলোই বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভাবী বংশধরদের মনে অকৃত্রিম আনুগত্য ও আবেগই শাসনতন্ত্রে প্রধান অবলম্বন ও দুর্ভেদ্য বর্ম বিশেষ। জনমতের উপর নির্ভর না করিয়া বাহিরে থেকে চাপানো শাসনতন্ত্র বিপর্যয়ের মুখে জনসমর্থন লাভ করিতে পারে না। বর্তমান শাসনতন্ত্রে এই গুণাবলী না থাকায় এটা অন্তঃসারশূন্য। যতই প্রচার করা হউক না কেন, জনমতের প্রতি উপেক্ষা ও অনাস্থাই হইতেছে এই নয়া শাসনতন্ত্রের ভিত্তি ভূমি।[৮]

কিন্তু সরকারী দলের মুখপাত্র ডন, মর্ণিং নিউজ পত্রিকা এর বিরুদ্ধে বিষেদগার শুরু করে। এ সকল পত্রিকার মাধ্যমে আইয়ুব খানের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণ নয় নেতার বিবৃতিকে ব্যাবিলনের নয় জন জ্ঞানীর বিবৃতি বলে ব্যঙ্গোক্তি করতে লাগলেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান স্বয়ং রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যে নিমকহারা মীর অভিযোগে চিহ্নিত করলেন। সরকারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও বিবৃতির সমর্থনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভা করলে সর্বস্তরের জনগণ তাতে সমর্থন জানান। এরপর ওই বিবৃতির সমর্থনে নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রাম, বরিশাল, টাঙ্গাইল, সিলেট প্রভৃতি স্থানে একের পর এক জনসভা করে দেশবাসীকে তাঁরা আন্দোলনের আহ্বান জানান। ১৯৬২ সালের ৮ই জুলাই তারিখে পল্টন ময়দানে এক বিক্ষোভ সমাবেশের

আয়োজন করেন। নুরুল আমীনের সভাপতিত্বে ওই সভায় শেখ মুজিবুর রহমান এবডো সহ সকল কালাকানুন বাতিল করে সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী সহ প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দাবি করেন। ওই জনসভা সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্ধৃতি দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা মন্তব্য করেছিল যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যাহারা ইংরেজ প্রভুদের গোলামী করেছিল, তাহারাই আজ দেশের ভাগ্য বিধাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।[৯] জনসভা সম্পর্কে দৈনিক আজাদ মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিল ঃ

প্রায় চার বছর পর অতীতের বিভিন্নমুখী দলীয় শক্তি-পরীক্ষায় কেন্দ্রস্থল পল্টন ময়দান আবার বিপরীত নীতি ও মতবাদের সমর্থক বিভিন্ন সাবেক রাজনৈতিক যৌথ সমাবেশে বক্তৃতার শব্দ সম্ভারে মুখরিত হইয়া উঠে।[১০]

ইতোমধ্যে সামরিক শাসন অবসানের পর যখন রাজনৈতিক দল, শ্রমিক, কর্মচারী, পেশাজীবীও সমাজের বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষ তাদের স্ব স্ব দাবি নিয়ে মাঠে নামতে শুরু করে, তখনই আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে। এই শিক্ষা নীতি কার্যকরী হওয়ার পর পরই ছাত্র সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং সারা দেশব্যাপী শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। আইয়ুব সরকার আন্দোলনের তীব্রতা দমন করার পূর্ব প্রস্তুতিতে ৯ই সেপ্টেম্বর ১৪৪ ধারা জারি করে শোভাযাত্রা, পিকেটিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অপরপক্ষে ছাত্র সমাজ ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল না করলে এ দিন প্রদেশব্যাপী হরতাল ডাক দেয়া হয়। কিন্তু ১৭ই সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ মিছিল গুলি বর্ষণে ছাত্র নিহত হলে পরদিন সংবাদপত্রে বিশেষ করে পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকাতে লীড স্টোরি সহ বেশ কয়টি সংবাদ ও ছবি ছাপা হয় এই ঘটনার উপর। মর্ণিং নিউজ পত্রিকাতেও এই ঘটনা নিয়ে লীড স্টোরি করে। এর সাথে সরকারী প্রেসনোট ও অন্যান্য খবরও গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, সেদিন বা পরে কখনও এই ঘটনা নিয়ে মর্ণিং নিউজ পত্রিকাটি কোন ধরণের সম্পাদকীয় লেখেনি। পর পর কয়েকদিন এই গুলি বর্ষণ ও তার পরবর্তী ঘটনা সমূহ ব্যাপক কভারেজ পায় দৈনিক ইত্তেফাক ও আজাদ পত্রিকায়। ১৯শে সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক এক সম্পাদকীয়তে লিখেছিল ঃ

দেশ সুষ্ঠ বলিষ্ঠ এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল আজ গঠন করিতে হইবে। দেশে রাজনীতি চলিবে, কিন্তু রাজনৈতিক দল থাকিবে না, এই অবস্থা চলিতে পারে না। কিছুদিন আগেও আমরা বলিয়াছিলাম যে, দলহীন রাজনীতি আর নোঙরহীন নৌকার অবস্থা সমান। এ অবস্থা আগুন লইয়া খেলারই সামিল। এরূপ পরিবেশ রাজনীতি করিতে যাওয়া আর নৈরাজ্য এবং উচ্ছৃঙ্খলা ডাকিয়া আনা একই কথা। গত

সোমবারের ঘটনাবলী এ কথাই নির্ভুলভাবে প্রমাণিত করিয়া দিয়াছে।[১১]

কিন্তু ইতোমধ্যে সরকারী তথ্য বিভাগের সাথে পূর্ব বাংলার তিনটি বহুল প্রচারিত দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ এবং পাকিস্তান অবজারভার এর বিরোধ দেখা দেয় কিছু কিছু সংবাদ পরিবেশনকে কেন্দ্র করে। সরকারী ভাষ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত আচরণ না করার অজুহাতে পত্রিকাগুলোকে ব্ল্যাকলিস্ট করা হলো সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর ১৯৬২ ও শেষের দিকে। অর্থাৎ সরকারী, আধা সরকারী বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির সমস্ত সুযোগ প্রত্যাহার করে নেয়া হলো এই পত্রিকাগুলোর কাছ থেকে। সঙ্গত করণেই এই সরকারী, আধা সরকারী বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির সমস্ত সুযোগ প্রত্যাহার করে নেয়া হলো এই পত্রিকাগুলোর কাছ থেকে। সঙ্গত কারণেই এই সরকারী সিদ্ধান্ত ছিলো পত্রিকাগুলোর অস্তিত্বের প্রতি একটি মারাত্মক আঘাত। সংবাদপত্র সম্পর্কেও এই ক্রমাবনতির প্রেক্ষাপটেই ১৯৬৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর আইয়ুব সরকার জারি করে প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস্ (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬৩। এই অধ্যাদেশে পাকিস্তানের সংবাদপত্র ও পত্রিকার ওপর কতকগুলো বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। যেমন - এই অধ্যাদেশ বলে সরকারী প্রেস নোট এবং তথ্য বিবরণী অনুপুঙ্খ মুদ্রণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। অধ্যাদেশটি ঘোষণা করার সাথে সাথে সংবাদপত্র এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের উভয় অংশের সাংবাদিকরা অর্ডিন্যান্স এর প্রতিবাদ ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৯ তারিখে এক হরতাল পালন করে। এ সময় দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রতিদিন কালো বর্ডার দিয়ে বক্স করে ছাপানো হতো দুটি শ্লোগান প্রেস অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার কর / সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা চলবে না। এছাড়াও কখনো কখনো তালা আঁটা মুখের স্কেচ ছাপানো হতো প্রথম পৃষ্ঠার উপরের দিকে। প্রেস অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তবে সাংবাদিকদের প্রবল আন্দোলনের মুখে ১৯৬৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে সরকার এক মাসের জন্য নতুন প্রেস অর্ডিন্যান্স এর কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করেন।[১২]

পরিশেষে বলা যায়, পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্র গুলি ছিল খুবই সোচ্চার। মাত্র দুই একটি পত্র পত্রিকাকে বাদ দিলে সবগুলো পত্রিকার একটি ধনাত্মক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সংগ্রাম শুধু সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার জীবন-মরণের সংগ্রাম নয়, সেই সংগ্রামের সঙ্গে একটি স্বাধীন জাতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইও বিজড়িত। এ প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকে মোসাফিরের লেখনীও রাজনৈতিক মঞ্চের মাধ্যমে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। মোসাফির লিখেছিল : সংবাদপত্রের উপর হামলা শুধু কয়েকজন সাংবাদিক, সম্পাদক কিংবা সংবাদপত্র মালিকের উপর হামলা নয়, ইহা গোটা জাতির ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশে স্বাধীনতার উপরই

চরম আঘাত। সংবাদপত্র শুধু নিজেদের মতামতই প্রকাশ করেনা, জনমত প্রতিবিম্বিত করিয়া তোলাই উহার কাজ। প্রধানত তাহারা জননেতাদের বিবৃতি, বক্তৃতা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের. প্রবন্ধাদি এবং মানুষের অভাব অভিযোগ সম্বলিত খবরাদি প্রদান করিয়া থাকে। সংবাদপত্র শিল্প আর দশটা সাধারণ শিল্পের মত নয়..।[১৩]

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১. Aleem-Al-Razzee, *Constitutional Glimpses of Martial Law in India,* Pakistan and Bangladesh, Dhaka : University Press Limited, 1988, p. 32.

২. ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* - ১৯৪৭-৭১, ঢাকা ঃ সময়। প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ: ২১।

৩. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ সংগ্রাম,* ঢাকা ঃ অবসর প্রকাশনা সংস্থা, পৃ: ২১।

৪. সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ৭২।

৫. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি* : ১৯৪৫ ৭৫, ঢাকা বাংলাদেশ কো-আপারেটিভ বুক সোসাইটি লি: দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৬০।

৬. মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪ পৃ. ২০৯।

৭. *দৈনিক ইত্তেফাক,* ২৫ জুন ১৯৬২।

৮. ঐ।

৯. *দৈনিক ইত্তেফাক,* ৯ জুলাই ১৯৬২।

১০. *দৈনিক আজাদ,* ৯ জুলাই ১৯৬২।

১১. *দৈনিক ইত্তেফাক,* ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২।

১২. *দৈনিক ইত্তেফাক,* ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২।

১৩. ঐ।

আরাকানী শরণার্থী সমস্যা ও ইংরেজ কর্তৃক আরাকান অধিকার

মোহাম্মদ আলী চৌধুরী

আরাকান দেশটি বর্তমান মায়ানমারের (বার্মা) অন্তর্গত একটি প্রদেশ। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত নাফ নদীর তীরে এ প্রতিবেশী দেশটির অবস্থান। আরাকান নামটি ইংরেজ প্রদত্ত। দেশটির প্রাচীন নাম রাখাইন-পি। রাখাইন শব্দের অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস। এখানকার অধিবাসীদের প্রধান ধর্ম ছিল জড় উপাসনা। ১৪৬ খ্রিঃ চন্দ্রসূর্য নামক মগধের এক সামন্ত আরাকানে রাজত্ব স্থাপন করে সেখানকার জড় উপাসক আদিম জনগোষ্ঠীকে সর্বপ্রথম ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে দীক্ষিত করেন। রাজা চন্দ্রসূর্যের রাজধানী ছিল ধান্যবতী। তিনিই সর্বপ্রথম আরাকানে মহামুনি বৌদ্ধমূর্তি তৈরি করেন এবং তা স্থাপনের জন্য রাজধানী ধান্যব্যতীতে মহামুনি প্যাগোডা নির্মাণ করেন।[১] পরবর্তীতে আরাকানের বিভিন্ন রাজবংশ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে[২] রাজধানী স্থাপন করে প্রায় ১৬৩৯ বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করেন। ১৭৮৫ খ্রিঃ বার্মা কর্তৃক আরাকান দখল পর্যন্ত দেশটির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রায়ই অক্ষুণ্ণ ছিল।

আরাকানের সর্বশেষ স্বাধীন রাজবংশ ম্রাউক বংশের রাজত্বকালে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও সভ্যতা সংস্কৃতির অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম রাজা নরমিখলা ওরফে মিনসুয়ামম বাংলার সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় আরাকানের সিংহাসনে পুনঃঅধিষ্ঠিত হন[৩] এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট ইসলামী ধাঁচে গড়ে তোলেন।[৪] এ বংশের রাজত্বকালে বিভিন্ন বিদেশী পর্যটক ও বণিকগোষ্ঠীর পদচারণায় রাজধানী ম্রোহঙ নগরী মুখরিত ছিল। ম্রাউক বংশের রাজত্বের শেষদিকে রাজ্যের সর্বত্র গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিদ্রোহ, হত্যা ও সিংহাসন দখলের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। বস্তুত আরাকান এ সময়ে ষড়যন্ত্রের রাজনীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। দেশের এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় আরাকানের জনৈক সভাসদ হারি (Hari) আরাকান রাজ থামাদাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য বর্মীরাজকে আমন্ত্রণ জানান।[৫] অবশেষে অনেক রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে বর্মীরাজ বোধপায়া (১৭৮২-১৮১৯) ১৭৮৪ খ্রিঃ আরাকান দখল করেন। থামাদাকে পরাজিত করে আরাকানকে বার্মার একটি প্রদেশে পরিণত করা হয় এবং

প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপর এর শাসনভার ন্যস্ত করা হয়।[৬] অতপর ১৭৮৫ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি মাসে বিজয়ী বর্মী বাহিনী রাজা থামাদা ও তাঁর পরিবার পরিজন এবং বিশ হাজার বন্দীসহ্ আরকান ত্যাগ করেন।[৭] তৎসঙ্গে মহামুনি বৌদ্ধমূর্তিটিও আভায় নিয়ে যাওয়া হয়।

বার্মা কর্তৃক আরাকান দখল ছিল রাজা বোধপায়ার সাম্রাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার অজুহাতে বর্মী প্রশাসন আরাকানে অত্যাচার ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। বর্মী বাহিনীর নির্যাতনে সেখানকার জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের আক্রমণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রাণদণ্ড প্রদানসহ্ বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুশাসনের অনেক নিয়মনীতি পরিবর্তন করে সন্ন্যাসীদের জমিজমা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়। জোরপূর্বক আরাকানীদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা, শ্রমের কাজে বাধ্য করা, নির্ধারিত রাজস্বের বাইরে মাথাপিছু অতিরিক্ত কর ধার্য করা প্রভৃতি ঘটনা আরাকানের জনজীবনে অভিশাপরূপে আবির্ভূত হয়। ফলে বর্মী বাহিনীর অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য হাজার হাজার আরাকানী সীমান্ত অতিক্রম করে ব্রিটিশ শাসিত চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৮] বর্মী বাহিনীর অত্যাচার ও নির্যাতন সম্পর্কে জনৈক আরাকানী বিদ্রোহী ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করেন যে, "Nearly two lakhs of men. women and children had been killed, the same number had been carried off to Burma as slaves, and those who had taken shelter in hills and jungles were either captured by Burma troops or killed by tigers."[৯]

এইরূপ বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় ভীতসন্ত্রস্ত আরাকানীরা বর্মী শাসনের অধীনে জীবন ধারণের চেয়ে চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এলাকায় শরণার্থী হিসাবে বেঁচে থাকা শ্রেয় মনে করে। মানবিক কারণে কোম্পানী প্রশাসন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাংশে এ সকল আরাকানী শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয় এবং অনেককে পতিত জমি চাষাবাদের অনুমতি প্রদান করে।[১০] তাছাড়া, জঙ্গলাকীর্ণ ও জনবিরল এলাকায় জনসংখ্যাবৃদ্ধি কোম্পানীর অভিপ্রেত ছিল।[১১] কোম্পানীর রাজ্যে বসবাস নিরাপদ ভেবে আরও অধিকহারে আরাকানী অধিবাসীগণ পূর্বেকার শরণার্থী দলগুলোর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকে। ফলে দেশত্যাগ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আরাকান প্রায় জনশূন্য হয়ে যাওয়াটা সুদূর পরাহত নয় বলে অনুমিত হয়।[১২] আরাকানের বর্মী প্রশাসন কোম্পানীর এ ধরণের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। পলাতক উদ্বাস্তুদের পশ্চাদ্ধাবন করে অনেক সময় বর্মী বাহিনী নাফ নদী অতিক্রম করে কোম্পানীর সীমানার অনেক অভ্যন্তরে প্রবেশ করতো। ১৭৮৬ ও ১৭৮৭ খ্রিঃ বর্মীবাহিনী দু'বার সীমান্ত অতিক্রম করে। তাদের প্রতিরোধ কল্পে কোম্পানী

প্রশাসন মেজর এলারকার এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করে, কিন্তু বর্মী বাহিনী আরাকানে ফিরে যাওয়ায় কোন সংঘর্ষ হয়নি।[১৩] এভাবে প্রায় সময় কোম্পানীর অনুমতি ব্যতিরেকে বর্মীবাহিনী সীমান্ত লংঘন করতো।

১৭৯৪ খ্রিঃ লাহোমোরাং নামক জনৈক মগ সর্দারকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে বর্মী বাহিনী পুনরায় কোম্পানীর রাজ্যে উপস্থিত হয় এবং চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট কোলব্রুকের নিকট অভিযোগ করে যে, লাহোমোরাং নামক জনৈক বিদ্রোহী ৩,৫০০ অনুসারীসহ চট্টগ্রামে পালিয়ে এসেছে। ফলে আরাকানী প্রশাসন বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ সকল বিদ্রোহীদেরকে আরাকানে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করাই তাদের অভিযানের উদ্দেশ্য।[১৪] কোলব্রুক বড়লাঠ জন শোরকে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি কর্নেল ইরস্কিনকে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। শান্তিপূর্ণ ভাবে ব্রিটিশ সীমান্ত ত্যাগ না করলে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বর্মী বাহিনীকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দেয়া হয়। কর্নেল ইরস্কিন রামুতে পৌঁছাবার কয়েকদিন পর বর্মী বাহিনী ব্রিটিশ সীমান্ত ত্যাগ করে। এ সময়ে কর্নেল ইরস্কিন আরাকানী শরণার্থীদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্য ও বাস্তব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কলিকাতায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি রিপোর্ট প্রদান করেন। এতে উল্লেখ করা হয় ঃ "That the Barmahs have been guilty of schocking cruelty and oppression to the conquered. I have not... the smallest doubt... thousands of men, women and children have been slaughtered in cold blood."[১৫]

এমতাবস্থায় আরাকানীদের দেশ ছেড়ে পালানো ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিলনা। পথিমধ্যে তার দুর্বিষহ অবস্থার শিকার হতো। এক বিবরণ থেকে এই দুর্দশাগ্রস্থ আরাকানী শরণার্থীদের করুণ চিত্র পাওয়া যায়। এতে উল্লেখ করা হয় ঃ "কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই স্বাপদ সঙ্কুল বিরান অঞ্চল অতিক্রম করে তারা পলায়ন করে এবং তাদের অধিকাংশ অভাব অনটন, রোগ ও ক্লান্তিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নাফ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সড়ক বৃদ্ধ, জরাগ্রস্থ এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ অনেক মায়ের মৃতদেহ আকীর্ণ ছিল।"[১৬]. শরণার্থীদের সঙ্গে বিদ্রোহী সর্দার বা নেতারাও কোম্পানীর নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রবেশ করতো। চট্টগ্রামে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ এবং চট্টগ্রাম ভিত্তিক বর্মীদখল বিরোধী একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য।[১৭] উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আরাকানী বিদ্রোহী সর্দারদের চট্টগ্রামে আশ্রয়দান বর্মীদের সন্দেহের অন্যতম কারণ। চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে তাদের আদি বাসভূমি আরাকানের বিরুদ্ধে ঘনঘন চোরাগুপ্তা হামলায় আরাকানের বর্মীগভর্নর ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে বর্মীকর্তৃপক্ষ কর্নেল ইরস্কিন এর নিকট পলাতক বিদ্রোহীদের প্রত্যার্পণ দাবি করে।[১৮] কিন্তু কোম্পানী কর্তৃপক্ষ অভিবাসীদের আরাকানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ নিয়ে ব্যর্থ

হন। এরকম এক ঘটনার প্রত্যুত্তরে শরণার্থীদের জনৈক দলপতি বলেন ঃ "আমরা কখনো আরাকানে ফিরে যাবনা। আপনারা যদি আমাদের এখানেই জবাই করতে চান তাহলে আমরা মরতে প্রস্তুত। যদি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাড়াতে চান তাহলে আমরা পর্বতারণ্যে আশ্রয় নেব। অরণ্য বন্য পশুদেরও আশ্রয় দেয়।"[১৯]

আরাকানী শরণার্থী সমস্যা সংক্রান্ত সীমান্ত উত্তেজনা কিছুটা প্রশমনের পর ভারতের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সংঘর্ষ এড়ানোর লক্ষ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা শুরু করে। Sir Jhon Shore, Lord Wellesly এবং Lord Minto কয়েকবার ব্রহ্ম রাজ দরবারে দূত প্রেরণ করেন। এদেব মধ্যে ক্যাপ্টেন জর্জ সোরেল (১৭৯৪), ক্যাপ্টেন মাইকেল সাইমস (১৭৯৫, ১৮০২), ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স (১৭৯৬), ক্যাপ্টেন টমাস ছিল (১৭৯৯) এবং ক্যাপ্টেন ক্যানিং (১৮০৯, ১৮১১) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখ্য। ব্রহ্ম রাজ দরবারে এ সকল ইংরেজ দূত প্রেরণের একাধিক উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, বাণিজ্য বিস্তার, দ্বিতীয়ত, ইংরেজদের বিরুদ্ধে বর্মীদের ষড়যন্ত্র নিবারণ এবং আরাকান থেকে পলাতক উদ্ধাস্তুদের সম্পর্কে ব্রহ্মরাজের সঙ্গে একটি স্থায়ী চুক্তি সম্পাদন।

সর্বশেষ উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইংরেজদের বক্তব্য ছিল খুবই সুস্পষ্ট। তাঁদের মতে, কোন বিদ্রোহী আরাকানীর অপরাধ সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পেলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাকে আরাকানী শাসনকর্তার হাতে সমর্পণ করতে প্রস্তুত; কিন্তু কোন জনগোষ্ঠী অত্যাচারের ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য কোন দেশের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তা প্রত্যাখান করা মানবতা বিরোধী।[২০] বর্মী কর্তৃপক্ষ তা মানতে নারাজ। তারা সকল উদ্বাস্তুদের লুঠতরাজের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং সকল নতুন ও পুরাতন উদ্বাস্তুদের ফেরৎ পাঠানোর জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি জানায়।[২১] ফলে কোম্পানীর প্রতিটি মিশনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উপরন্তু বর্মী প্রশাসন ইংরেজ অধ্যুষিত চট্টগ্রাম, ঢাকা মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি অঞ্চল দখলের জন্য সামরিক অভিযানের হুমকি প্রদান করে। ইতিমধ্যে আরাকানে গুরুতর বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮১১ খ্রিঃ মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ সিন পিয়ান (ইংরেজ প্রদত্ত নাম কিং বেরিং) নামক জনৈক মগ সর্দার মুংডু দখল করে নেয়। আরাকানীরা দলে দলে তার পতাকাতলে সমবেত হয়। চট্টগ্রামে বসবাসরত অনেক শরণার্থী তার দলে যোগদানের নিমিত্তে আরাকান যাওয়ার পথে চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পিছেলকে জানান "যদি আমরা না যাই, তাহলে রাজা আমাদেরকে হত্যা করবে।" তারা আরো জানান, তার শুনেছে "তিনি (কিং বেরিং) আরাকানের দুই কি তিনটি থানা দখল করে নিয়েছেন, পরবর্তী মঙ্গলবার (অর্থাৎ২১শে মে) তিনি রাজধানী দখল করে নেবেন। চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলের মগদের নিয়ে ১০,০০০ কি ১২,০০০ সদস্য বিশিষ্ট একটা সেনাবাহিনী গঠন করেছেন। তিনি যুদ্ধ

করতে উদগ্রীব, তিনি যদি আরাকান দখলে সফল হন তাহলে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে এরজন্য রাজস্ব প্রদান করবেন।"[২২] সত্যিই কিং বেরিং ইংরেজদের সহায়তা লাভের নিমিত্তে চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চিঠি লিখে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন যে, যদি তাঁকে গোলা বারুদ সরবরাহ করা হয়, তাহলে তিনি কোম্পানীকে রাজস্ব প্রদান করবেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কিং বেরিং এর প্রস্তাব প্রত্যাখান করা সত্ত্বেও তিনি করদ রাজা হওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।[২৩] ফলে কিং বেরিং বর্মী বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হয়ে অসংখ্য অনুচরসহ চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। আরাকানের বর্মী গভর্নর চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেটকে এব্যাপারে অবহিত করে এবং কিং বেরিংকে অনতিবিলম্বে তাদের হাতে সমর্পণ অন্যথায় সৈন্য প্রেরণের হুমকি দেয়।[২৪]

বড়লাটের নির্দেশানুযায়ী কিং বেরিং কে গ্রেফতার করে নজরবন্ধী বাখা হয়। কিন্তু ইংরেজ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে কিং বেরিং পুনরায় আরাকান আক্রমণ করেন। এবারও ব্যর্থ হয়ে তিনি চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে ফিরে আসেন। তাঁকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে বর্মীবাহিনী কোম্পানীর রাজ্যে প্রবেশ করেও সফল হননি। অবশেষে লর্ড মিন্টো বিরক্ত হয়ে নির্দেশ দেন যে, কিং বেরিংকে পুনরায় আটক করে আরাকানে ফেরত পাঠানো হউক। কিন্তু ১৮১৫ খ্রিঃ ২৫শে জানুয়ারি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। এরপর রিং জিং নামে অপর এক নেতার নেতৃত্বে আরাকানে পুনরায় সংগ্রাম শুরু হয়। বর্মী বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়ে রিং জিং তার প্রধান অনুচরসহ চট্টগ্রাম আশ্রয় নেয়। কিন্তু দুবৎসরের মধ্যে তারা কোম্পানীর পুলিসের হাতে ধরা পড়ে কারারুদ্ধ হন।[২৫]

১৮১৭ খ্রিঃ ব্রম্মারাজের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা চট্টগ্রামে উপস্থিত হন এবং মগ বিদ্রোহীদের অবিলম্বে আরাকানে ফেরৎ পাঠানোর দাবি জানান। উত্তরে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ জানান "মগেরা বহুকাল যাবৎ কোম্পানীর রাজ্যে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে জোর করে আরাকানে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করা সঙ্গত নহে। তবে যারা আরাকানে স্বেচ্ছায় ফিরে যাবে তাদেরকে বাধা দেয়া হবেনা।[২৬] এতে বর্মীরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ১৮১৮ খ্রিঃ রামবীর শাসনকর্তা বড়লাটকে পত্র মারফত জানান যে, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার অবিলম্বে ব্রম্মরাজকে প্রত্যার্পণ না করলে বর্মীবাহিনী সামরিক হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবে।[২৭] ইতিমধ্যে আসাম, মণিপুর ও কাছাড় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে বর্মীরা আসাম ও মণিপুর দখল করে নেয় এবং কাছাড় আক্রমণের উদ্দ্যোগ নেয়।[২৮] তাছাড়া ১৮২১-২২ খ্রিঃ বর্মীরা কোম্পানীর নিয়োজিত কয়েকজন শিকারীকে বন্দী করে মংডু নিয়ে যায় এবং ইংরেজ অধিকৃত শাহাপুরী নামক একটি ক্ষুদ্র দীপ বলপূর্বক দখল করে নেয়।[২৯] এমন কি, ১৮২৪ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে বর্মীরা

ব্রিটিশ নৌ-বিভাগের দুজন কর্মকর্তাকে কৌশলে বন্দী করেন। বর্মীদের এ সকল হিংসাত্মক কর্মকান্ডে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অবশেষে শান্তি রক্ষার কোন উপায় না দেখে লর্ড আর্মহার্ষ্ট ১৮২৪ খ্রিঃ ৫ই মার্চ বার্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন - যা প্রথম ইন্দ-বর্মী যুদ্ধ নামে খ্যাত।

আরাকান থেকে বর্মী বাহিনীর বহিস্কার করাই ছিল যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। যুদ্ধে বর্মীবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন সেনাপতি মহা বান্দুলা। ১৮২৪ খ্রিঃ মে মাসের প্রথম দিকে ৮,০০০ সৈন্যসহ্ আরাকানেব চারজন (আরাকান, রামরী, সেন্ডুয়ে ও ছেদুবা) গভর্নরের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী নাফ নদী অতিক্রম করে রামুর ১৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত রত্নাপালং এর দিকে অগ্রসর হন। মহাবান্দুলা নিজেই আরাকানে অবস্থিত তাঁর সদর দফতর থেকে এ অভিযান পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন।[৩০] বর্মী বাহিনীর আগমণের সংবাদে তাদের গতিবিধি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য ইংরেজ অধিনায়ক Captain Notan দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু বর্মী বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে Notan তাঁর দলবল সহ পিছু হটতে বাধ্য হন। ১৩ই মে বর্মীবাহিনী রত্নাপালং ত্যাগ করে সম্মুখদিকে অগ্রসর হয়ে রামুর পূর্বদিকের পাহাড়ে অবস্থান নেয়। কয়দিন অবস্থানের পর ১৭ই মে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে Captain Notan ও Captain Trueman বর্মীবাহিনী কর্তৃক ধৃত ও নিহত হন এবং প্রায় ২৫০ জন ইংরেজ সৈন্য আহত ও বন্দী হন। বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ কয়েকজনকে রাজধানী আভায় প্রেরণ করা হয়।[৩১] রামুর যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর পরাজয়ে সমগ্র পূর্ববঙ্গে ভীত ও ত্রাসের সঞ্চার হয়। ইতোমধ্যে ইংরেজ বাহিনী কর্তৃক রেঙ্গুন, বেসিন ও ছেদুবা দখলের সংবাদ প্রচারিত হলে বর্মী কর্তৃপক্ষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। রাজধানী আভাকে ব্রিটিশ আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য সকল সৈন্য সামন্তসহ্ সেনাপতি মহাবান্দুলাকে আরাকান থেকে রেঙ্গুন অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেয়া হয়।[৩২]

মহাবান্দুলার প্রস্থানের পর বর্মীবাহিনী ম্রোহং শহরে ইংরেজদের আক্রমণের অপেক্ষায় থাকে। ১৮২৫ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে জেনারেল মরিসন আরাকান অধিকার কল্পে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে। ১লা ফেব্রুয়ারি তারা টেকনাফ পৌঁছে এবং পরবর্তীদিন ২রা ফেব্রুয়ারি বিনা যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী মংডু অধিকার করেন। অতঃপর তারা আরাকানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং ১লা এপ্রিল আরাকান দখল করে নেয়।[৩৩] বর্মীবাহিনী কোন রকমে বার্মায় প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইংরেজ বাহিনী রামরি ও সেণ্ডোয়ে দখল করে নেয়।[৩৪] দুই বৎসর যুদ্ধের পর ১৮২৬ খ্রিঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারি ইয়ান্দাবুর সন্ধির মাধ্যমে প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের অবসান ঘটে।[৩৫] সন্ধির শর্তানুযায়ী ব্রহ্মরাজ প্রথমত আসাম এর অধীনস্ত এলাকা এবং মণিপুরের উপর থেকে নিজেদের সমস্ত দাবি প্রত্যাহার করতে সম্মত হয়,

দ্বিতীয়ত ব্রহ্মরাজ আরাকান ও টেনাসিরাম প্রদেশ ইংরেজদের নিকট ছেড়ে দিতে রাজি হন, তৃতীয়ত যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ বর্মী কর্তৃপক্ষ ইংরেজদের এক মিলিয়ন পাউন্ড ষ্টার্লিং দিতে বাধ্য হয়।[৩৮] অতঃপর রবার্টসনকে বড়লাটের কর্তৃত্বাধীন আরাকানের প্রথম বেসামারিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

বর্মীবাহিনীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এবং আরাকানী জনগণের সমর্থন আদায়ে ব্যর্থতা এই যুদ্ধে বার্মার পরাজয়ের অন্যতম কারণ। প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধে বার্মার পরাজয়ের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। এই যুদ্ধে বিরাট এলাকা বার্মার হাতছাড়া হয়ে যায়। শুধু তাই নয় পরবর্তীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের মাধ্যমে পুরো দেশটি ইংরেজদের পদানত হয়।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১. R. B. Smart, *British Burma Gazzetter - Akyab*, 1917, pp. 44-45.

২. প্রাচীন রাজধানী সমূহ, যেমন ঃ ধান্যবতী (Diannabati), বৈশালী (Vaisali), পিনসা (Pyinsa), পেরিন (Parin), কিরিত (Kirit), লঙ্গিয়েত(Launggyet) ও ম্রোহং (Mrohaung) প্রভৃতি।

৩. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ. ১৫২।

৪ G. E. Harvey, *History of Burma*, London, 1925, p. 140.

৫. G. E. Harvey, *op. cit.*, p. 267

৬. Aung Mung Htin, *A History of Burma*, New York, Colombia University Press, 1967, p. 195.

৭. Fytche : *Burma-Past And Present*, Vol. i, pp. 76-77.

৮. M. Siddiq Khan, *Captain George Sorrels Mission*, p. 141.

৯. Anil Chandra Banerjee, *The Eastern Frontier of British India*, Calcutta, 1934, p. 99

১০. *Ibid*, p. 100.
Harvey, G. E.; op. cit. pp. 277-82.

১১. *Bengal political consultations*, 4th Feb., 1795.

১২. Captain W. White; *A Political Survey of the Extra-Ordinary Events which led to the Burmese War*, 1827, p. 5.

১৩. Anil chandra Banerjee, *op. cit.* p. 100.

১৪. *Ibid*, p. 102.

১৫. *Ibid*, p. 99.

১৬. Malcolm, John, *The Political History of India*, Calcutta, 1826. pp. 500-51.

১৭. Harvey, *op. cit*; pp. 280-81.

১৮. *Ibid.* p. 282.

১৯. Malcolm, John. op. cit., 1826. p. 550.

২০. M. Siddiq Khan, Paper on Anglo Burmese History, Political Proceedings (1797-1825) vol. 4, p. 887.

২১. Cady, John; A History and Modern Burma, Cornell University Press. New York, 1958. p 72.

২২. Journal of the Burma Research Society. XX 111, 11, 1933. p 450.

২৩. Ibid

৩৪. *Ibid,* pp. 456-57

২৫. Anil Chandra Banerjee, *op cit*, pp. 196-97

২৬. *Ibid,* pp. 197-98

২৭. *Ibid,* p. 199.

২৮. Hall, D. G. F., *Europe and Burma A study of European Relations with Burma to the Annexation of Thibaw's Kingdom 1886,* London, 1945, p. 111.

২৯. *Ibid,* p. 112.

৩০. Anil Chandra Banerjee, *op. cit* pp 262-263.

৩১. *Ibid,* pp. 262-267.

৩২. *Ibid,* p. 268. ১৮২৫ খ্রিঃ ১লা এপ্রিল দানিউবের যুদ্ধে মহাবান্দুলা নিহত হন।

৩৩. *Ibid,* pp. 272-74.

৩৪. *Ibid,* p 275.

৩৫. Singhal, D. P. The Annexation of Upper Burma. Singapore. 1960, pp 91-94.

৩৬. Ibid

চট্টগ্রামের ছোট পত্রিকা

কমলেশ দাশগুপ্ত

চট্টগ্রামের ছোট পত্রিকার প্রকাশনার কাল সময়ের হিসেবে খুব একটা ছোট নয়। প্রথম ছোট পত্রিকার প্রকাশনার উৎসটি উপমহাদেশের একটি সংস্কারবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে (১৮৮০-৮৮) চট্টগ্রাম ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র মাসিক 'সংশোধনী' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কাশীশ্বর গুপ্ত। নর্মাল স্কুলের পণ্ডিত কাশীশ্বর গুপ্ত দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটির পরিচিতি থাকলেও সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চায় প্রাথমিক ভিত নির্মাণে তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল লক্ষণীয়। 'সংশোধনী'র পরে কবিগুণাকর নবীন চন্দ্র দাশ ও রমলাকান্ত সেনের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত পাক্ষিক 'পূর্ব প্রতিধ্বনি'। মৌলভী আহসানউল্লাহ প্রায় একই সময় প্রকাশ করেন পাক্ষিক 'পূর্বদর্পণ'। চট্টগ্রামে সাময়িকী পত্রিকার সম্পাদনার জগতে তিনিই প্রথম মুসলমান সম্পাদক। অবিভক্ত বঙ্গে বৌদ্ধ সমাজের প্রথম পত্রিকা 'বৌদ্ধবন্ধু' কালীকিঙ্কর মুৎসুদ্দির সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রকাশিত হয় 'ছোলতান' (১৯১০)। পত্রিকাটির উদ্যোক্তা ছিলেন মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। প্রকাশিত হয় বেগম সফিয়া খাতুন সম্পাদিত 'আন্নেসা'। এটি চট্টগ্রামের প্রথম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা।

১৯১২ খিস্টাব্দে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চট্টগ্রাম শাখার প্রতিষ্ঠা এবং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ২২, ২৩ মার্চ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ও সম্মেলনে কৃতবিদ্য পুরুষ কবি নবীন চন্দ্র সেন, বিজ্ঞানী প্রিয়দা রঞ্জন রায়, দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক ক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী, গুণালঙ্কার মহাস্থবির প্রমুখের উপস্থিতি ও সাহচর্য চট্টগ্রামের সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চায় ও ছোট পত্রিকার প্রকাশনায় এক স্মরণীয় কার্যক্রমের সূচনা করে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চট্টগ্রাম শাখার প্রথম পত্রিকা 'প্রভাত' কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার মতোই গবেষণাধর্মী সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে সমমানের মর্যাদা লাভ করে। এই ঐতিহ্যের ধারায় ত্রিশের দশকে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল। হাবিবুলাহ বাহার সম্পাদিত 'প্রাতিকা', সুকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অঞ্জলি, আবদুল সালাম সম্পাদিত 'মুকুলিকা', সুবোধ রঞ্জন রায় সম্পাদিত 'পার্বণী'। এই পত্রিকাগুলোর লেখকসূচীতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, প্রভাবতী দেবীসরস্বতী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কবি সুফিয়া কামাল, কাজী আবদুল ওদুদ, জনার্দন চক্রবর্তী প্রমুখ।

এসব মুদ্রিত পত্রিকার পাশাপাশি চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্ররা হাতে লেখা পত্রিকার সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। সংকলনগুলো ছিল 'কালবৈশাখী', 'নবীর স্বপ্ন', 'মশাল' ও 'তরুণ'। হাতে লেখা পত্রিকার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক আবদুল সালাম ও কবি দীননাথ সেন।

১৯০১ খিস্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খিস্টাব্দ অবধি চট্টগ্রামে পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার দিক থেকে যে দুটি অবস্থান নেপথ্যে সাহিত্য সংস্কৃতিকর্মীদের উদ্দীপিত করেছিল তার একটি হলো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অন্যটি চট্টগ্রাম কলেজ কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা। দেশপ্রিয়, সাধনা, পূরবী, যুগের আলো এই স্রোতেরই ফসল। চল্লিশের দশক অবধি চট্টগ্রামের ছোট পত্রিকা নিখাদ সাহিত্য সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশের স্মরণীয় ঘটনা চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ এবং পরবর্তীতে চট্টগ্রামের কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন, সংগ্রাম কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত যুব সম্প্রদায়ের নতুন চিন্তা ও চেতনা সাহিত্য পত্রিকার পুরনো স্রোতের ধারাবাহিকতার একটি পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। চট্টগ্রামের সর্বস্তরের সচেতন জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে যায় সাম্রাজবাদ, ধনতন্ত্র, ফ্যাসিজম প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হিসেবে জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অধিকার'। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ননী সেনগুপ্ত। এর পরপরই আরো একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সংগ্রাম' প্রকাশিত হয়। এটির সম্পাদক ছিলেন সুধাংশু দত্ত। এই দুটি পত্রিকা একটি রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হয়েও মানুষের, সমাজের দুঃসময়ের কথা বলেছে। অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বার সাহস যুগিয়েছে। সে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুদিকেই এর প্রভাব ও উপস্থিতি ছিল। পঞ্চাশের দশকে যুগপৎভাবে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটেছিল গোটা পূর্ব পাকিস্তান জুড়েই। বাঙালির ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য ঢাকার রাজপথ হয়েছিল রক্তাক্ত। বাহান্নের মহান ভাষা আন্দোলন বাঙালির সাহিত্য, সংস্কৃতির চর্চায় অনুপ্রাণিত করে ও একইভাবে বাঙালিকে সচেতন করে তোলে তার পরিচয়, স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ববোধ।

স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে স্বাভাবিকভাবেই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, সংগ্রাম চট্টগ্রামের ছোট পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্যতম অনুপ্রেরক হিসেবে কাজ করেছে। তবে 'অন্বেষা' শিরোনামে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত চট্টগ্রাম কলেজ বার্ষিকীতে সাময়িকী, সংকলন, মুখপত্র ও স্মরণিকা নিয়ে শ্রদ্ধেয় প্রফেসার, মনিরুজ্জামান সাহেব একটি গবেষণাধর্মী রচনায় যে বিবিধ উৎসমুখগুলো চিহ্নিত করেছিলেন, আমি সেইসব উৎসমুখ

অনুপ্রেখে তীব্রভাবে আগ্রহী কারণ যে উৎসস্থলগুলোর বহিরঙ্গের আকার, বাঙালি চিত্ত ও মানচিত্রের হলেও তার নেপথ্যে ছিল পাকিস্তানী শাসন ও শোষণকে প্রলম্বিত করার প্রয়াস। কাজেই পাকিস্তান কাউন্সিল বা তৎগত প্রতিষ্ঠানগুলোর ছোট পত্রিকা, সাময়িকী সংকলন প্রকাশনা বাহান্ন থেকে একাত্তরের গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার ও ইতিহাসের ধারায় অবাঞ্চিত ও অযৌক্তিক বলেই মনে করি। উনিশ শ সাতচল্লিশ-এর পরবর্তী সময়ে ভৌগলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্ত বাতাবরণের পরিবর্তে যে অবরুদ্ধতা ও ছকে বাঁধা সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়েছিল তা থেকে প্রাথমিকভাবে মুক্ত থাকার, বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা চট্টগ্রামেও পরিলক্ষিত হয়েছে। মাহবুবুল আলম চৌধুরী ও সুচরিত চৌধুরী সম্পাদিত 'সীমান্ত' 'প্রাচী' ছোট পত্রিকাগুলো তার স্বাক্ষর বহন করছে। বাহান্নের মহান ভাষা আন্দোলন বাঙালির চিন্তায় ও জীবনবেদে ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটি সুদূর প্রসারী দিক নির্দেশক বার্তার আভাষ দিয়েছিল। যার গতি পথের বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটেছে রাজনৈতিক ঘটনা দুর্ঘটনার পথ ধরেই। এরই নিরিখে চট্টগ্রমের ছোট পত্রিকার পর্যায় পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ করা বোধহয় সমীচীন।

- বাহান্নের ভাষা আন্দোলন (পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর)
- ১৯৬৯ এর ছাত্র আন্দোলন
- ১৯৭০ এর ছাত্র, জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, সত্তরের নির্বাচনে বাঙালির বিজয়।
- ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা
- ১৯৭৫ এর পরবর্তী স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী চক্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বাঙালির অস্তিত্ব, ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিকৃতি, সচেতন জনমনে বিভ্রান্তি ও পলায়নী বৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মূলধারায় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মীদের সুস্পষ্ট অংশগ্রহণ। চট্টগ্রামের ছোট পত্রিকার প্রকাশনায় একুশ ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসকে উপলক্ষ করে পত্রিকার কাল ও সময় সচেতন প্রতিবাদী চরিত্রের উপস্থিতিও লক্ষণীয়।

বাংলাদেশে ছোট পত্রিকার যে নির্ভীক বক্তব্য ও দ্রোহ প্রকাশ পেয়েছিল উন্মেষপর্বে (১৯৫০) তা সত্তর দশকের মাঝামাঝি অবধি বিস্তৃতভাবে এসেছে। চট্টগ্রামও তার ব্যতিক্রম নয়। অনেকটা এই ধারার প্রতি দৃষ্টি রেখেই চট্টগ্রামের ছোট পত্রিকার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যাবো এবং আশা করি পাঠকরা এ থেকেই চট্টগ্রামের ছোট পত্রিকার বৈশিষ্ট্যের ও চরিত্রের পরিচিত কিছুটা হলেও মিলবে।

ষাটের দশকে দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, ছাত্র আন্দোলন, পাকিস্তানী শোষণ ও নির্যাতনের চরমতম অবস্থা সর্বোপরি সাধারণ মানুষের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উত্তরণ ও পাকিস্তান সরকার বিরোধী আন্দোলনে স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এসবই ছিল প্রধান বিষয়। এই দশকের আন্দোলন বাঙালি জাতিকে দিয়েছিল স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বদেশচেতনা।

একটি প্রকৃত চিত্র নিয়ে, বক্তব্যে স্পষ্টতা ও সঠিক বিষয়ে নির্বাচন করে যে ছোট পত্রিকাগুলো সময়ের কাজটুকু সম্পন্ন করেছিল তারই কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

ছোট পত্রিকা	সম্পাদনা	প্রকাশকাল	প্রচ্ছদ
আমি বাংলার বাংলা আমার	কাজী শহীদুল্লাহ	১৯৬৭ ইং	অমিত চন্দ
গ্রহণের কাল	আবু শহীদ	,,	নয়ালোক
দু-পাতা	আবুল মোমেন	,,	—
কলরোল	মাহবুবুল হক	,,	সবিহ্-উল-আলম
সূর্যদিন	মোঃ আবদুল মনিব খান	২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ ইং	—
ক্রান্তি	ছাত্র ইউনিয়ন	,,	সবিহ্-উল-আলম
ঐতিহ্য	চৌধুরী জহুরুল হক	১৯৭০ ইং	সবিহ্-উল-আলম

রবীন্দ্র বিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভারত (পশ্চিমবঙ্গ) ও বাংলাদেশের অগ্রজ কবিদের কবিতা সংকলন। এই সংকলনটি তৎকালীন সময়ে তার সাহসী ভূমিকার জন্য প্রশংসিত হয়েছিল। আকাশবাণী কলিকাতার জনপ্রিয় অনুষ্ঠান সংবাদ পরিক্রমা-র দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় রাজনৈতিক ঘটনার প্রাসঙ্গিক আলোচনার্থে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন এই ক্ষুদে পত্রিকাটির।

ছোট পত্রিকা	সম্পাদনা	প্রকাশকাল	প্রচ্ছদ
রবিকরে কবিকণ্ঠ	মাহবুবুল হক	১৯৬৮ ইং	সবিহ্-উল-আলম

১৯৬৯ এর গণ জাগরণ, সত্তরের বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় পুষ্ট ছোট পত্রিকাগুলো ছাত্র জনতার বিক্ষোভ ও বিদ্রোহকে বিষয় করে একটি মাত্র বক্তব্যই রেখেছিল। সেটি হলো বাঙালি জাতির পরিচয় ও অস্তিত্ব রক্ষার আহ্বান। এটাই কমিটমেন্ট হিসেবে এসেছে প্রবন্ধে, কবিতায় এবং বিবিধ রচনার আঙ্গিকে।

ছোট পত্রিকা	সম্পাদনা	প্রকাশকাল	প্রচ্ছদ
কিংশুক	হেনা ইসলাম	১৯৬৯ ইং	সবিহ্-উল-আলম
বাহান্নের বহ্নি শিখার বাংলা	আবদুল আলীম	,,	সবিহ্-উল-আলম
লাল পলাশ	মির্জা শামসুদ্দিন তারেক	,,	এনামুল হক দানু

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশ ও জাতিসত্তার মানচিত্র, মহান মুক্তিযুদ্ধের দীপ্তি নিয়ে প্রকাশিত ছোট পত্রিকাগুলো নিঃসন্দেহে একটি দায়-দায়িত্ব সম্পন্ন করেছিল। এতে প্রধান উপজীব্য হয়েছে স্বদেশ, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতীয় চেতনা! সময় ও কালের সাহিত্য সংরক্ষণে এর গুরুত্ব আছে বৈকি। পরবর্তী সময়ে ও স্বাধীনতার পক্ষ শক্তির রাজনৈতিক মতদ্বৈততা, দেশব্যাপী একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের স্বাভাবিক সঙ্কটকে পুঁজি করে বিরোধী চক্রের প্রচারণা সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্য লালিত ধারাকে দ্বিধা,

দ্বন্দ্ব ও অনৈক্যের ভাবাবেশে আবদ্ধ করতে পারে নি। তার প্রতিফলন ১৯৭৪ অবধি প্রকাশিত পত্রিকাগুলোয় সহজেই দৃষ্ট।

আবার সম্প্রদায়ভিত্তিক। প্রথম থেকে শুরু করে একই পদবীতে সূচীর শেষ। কারো আশঙ্কা "তাদের মানচিত্রে শৃগালের উপদ্রব।" কারো বক্তব্যে এসেছে "সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে ধনবাদের হাওয়া তখন সাধারণভাবে সাহিত্যপত্রে জীবনবোধের চর্চা ছাড়া কিইবা থাকে।" কারো মতে "কাপড়ে চোপড়ে কবি, সাইনবোর্ড ও ডীলারশীপ্ কবিদের চিহ্নিত করার প্রয়োজন আছে, কেউ আবার গ্রামীণ জীবনের উন্নয়নে প্রত্যয়ী হলেন। এসব ব্যক্তিগত, দলগত, গোষ্ঠীগত তর্ক, বিতর্ক সাহিত্য, সংস্কৃতির জমিতে বীজ রোপনের, ফলনের পূর্বাভাষ মাত্র ছিল কিন্তু ফসল ফললো না। শুধু মাত্র ছোট পত্রিকার আঙ্গিক নিয়ে একুশের দিনে ও স্বাধীনতা দিবসের আনুষ্ঠানিকতার মতো কিছু কবিতা পত্র আমাদের দায়বদ্ধতার বিপরীতে প্রকাশিত হলো। এই চতুর্দিক অবক্ষয়, হীন দীন সময়ে চট্টগ্রামের ছোট পত্রিকার সহজাতভাবেই হয়ে ওঠার একটা সুযোগ ছিল যা ষাটের দশকে আমরা কোন না কোন অবস্থান থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারি বা পেরেছি।

১৯৭৫ থেকে ৯৭ এই দীর্ঘ সময়ের বিশুদ্ধ সাহিত্য ও কবিতাপত্রের খতিয়ান একটু পরেই দিচ্ছি তার আগে এই বিশুদ্ধ চর্চার হিড়িকে গা না ভাসিয়ে যাঁরা কিছুটা হলেও সময় কাল নিরিখে চট্টগ্রামের সাহিত্য ও শিল্প উৎসাহী পাঠকদের কাছে তাদের চিন্তাভাবনাকে যুক্তিসঙ্গত করে বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরলেন, একটা গোষ্ঠীগত প্রতিবাদী অবস্থান ও গড়ে তুললেন একই সঙ্গে। তার একটি হলো এস্টাবলিশমেন্ট বিরোধী সাহিত্য চর্চা ও প্রকাশনা। 'স্পার্ক জেনারেশন' সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে "সভ্যতা সংস্কৃতির-ঐতিহ্যের মূল্যায়ন যেখানে প্রবঞ্চনায় ভরা, ইতিহাস যেখানে বিকৃত সেখানে নিত্যানন্দ যীশু হয়ে গঠন সম্ভব নয়" "আমরা সকলেই বুঝতে পারলাম লিটল ম্যাগাজিন ছাড়া কোন পথ নেই, ... বাঁধাধরা পথ লিট্ল ম্যাগাজিনের জন্য নয়, লিট্ল ম্যাগাজিনের হাতে শৃঙ্খল মানায় না তাই এবারের আয়োজন তরুণ সমাজের হয়ে প্রতিষ্ঠানিক শক্তির বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষেত্র নির্মাণ করা" বাংলাদেশ পরিষদ, বাংলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি সম্পর্কে তাদের মন্তব্য ছিল এ প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু ধরাবাঁধা দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্র, "সংবাদপত্র সম্পর্কে বক্তব্য ছিল কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও কাগজের ফয়দা লোটা ছাড়া আর কোন কর্তব্য নেই।" সন্দেহ নেই সময়ের সত্য ভাষণ এটি এবং তারুণ্যের প্রতিবাদী চেতনার স্ফুরণও তাতে ছিল ও লিট্ল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সূচনার সহায়ক ছিলো এই 'স্পার্ক জেনারেশন' পত্রিকাটি।

কিন্তু এই জেনারেশনের ক্রমানুসারিক অর্জন, অগ্রগতি তাদের বক্তব্য ও প্রতিবাদের রাস্তা ধরে হলো না; হলো ব্যক্তিগত জীবনে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে। কাজেই

পরে আর কোন শিশু জেনারেশন স্পার্ক করলো না। একটা গোষ্ঠীগত বা দলবদ্ধভাবে কোরাস গীতি হলো মাত্র।

চট্টগ্রামের লিট্‌ল ম্যাগাজিন ধর্মীতার স্বাক্ষর পূর্বে ও পরে কিছু কিছু ছোট পত্রিকায় মিলেছে যেমন 'এপিটাফ, 'বাঙলা', 'মূল্যায়ন', তিমির হননের গান' ও 'পদাতিক'। শেষোক্ত দু'টির মতাদর্শগত অবস্থান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হলেও তার বক্তব্য ছিল দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি রক্ষার সর্বজনীনবোধ সৃষ্টি ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার। সমসাময়িক কালেও সঙ্কটগ্রস্থ বাঙালি জাতীয়তাবাদ, জনগণের হতাশা, বিভ্রান্তি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় পত্রিকাগুলোর বিষয় ভাবনার মুখ্য উপাদান ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে চট্টগ্রামে তরুণ লেখক ও পাঠক তৈরির কাজটিও করছে 'পদাতিক'। অতীতে ও বর্তমানে চট্টগ্রামের অনেক লেখক, কবি, সাহিত্যিক তাঁদের সাবলীল ও মুক্ত সাহিত্য চর্চার সুযোগ লাভ করেছেন 'পদাতিক' এর সূত্রে। এই অঙ্গীকার 'পদাতিক' রক্ষা করেছে পূর্ণ মাত্রায়। পরবর্তীতে চট্টগ্রামে ছোট পত্রিকার স্বকীয়তা ও বিষয় ভাবনায় 'পদাতিক বড়ো সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। চট্টগ্রামের সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চায় এটিকে মুক্ত চিন্তা ও মনস্কতার সূচক বললেও বেশি কিছু বলা হবে না।

ছোট পত্রিকা	সম্পাদনা	প্রকাশকাল	প্রচ্ছদ
পদাতিক	মাহবুবুল হক	১৯৬৭ ইং	আশীষ চৌধুরী
,,	শাহিদ আনোয়ার	১৯৮২ ইং	উত্তম সেন
,,	শাহিদ আনোয়ার	১৯৮৪ ইং	পীযুষ দস্তিদার

উপরিউল্লেখিত বক্তব্য ও চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ হয়ে কিছুটা স্বকীয় পথে অবিকল প্রতিফলন দেখতে পাই পর সময়ে প্রকাশিত ছোট পত্রিকা। "... স্বাধীন প্রকাশনা মানেই মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা। শাসকের রক্ত চক্ষু এবং শোষণের প্রক্রিয়াটাকে সনাক্তকরণে এসবের ভূমিকা দ্বিধাহীন। শোক এবং শোষণের যন্ত্রটাকে নির্মম আঘাত করতেও স্বাধীন পত্রিকা কুণ্ঠিত নয়।" 'এটিটাফ' সম্পাদকীয় "রূঢ়ভাবে সত্য ভাষণে ব্রতী হওয়ার এক সংকল্পে আমরা কতিপয় নবাগত তরুণ সম্ভাবনার মুক্তি চাই। আমাদের দেশ ও সংস্কৃতি, আমাদের ভাব ও ভাষার দুশ্চরিত্র তাকে ঐতিহ্য, অস্তি, অনির্বেদ ও স্বস্তি সহযোগে সমৃদ্ধ করার চিন্তা আমাদের মূলধন।...জীবনের শাশত ন্যায়কে প্রতিষ্ঠার ও জনতার সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ না করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। 'বাঙলা সম্পাদকীয়'

"দেশের আজ গ্রহণের কাল চলছে। প্রতিক্রিয়া অবস্থান নিয়েছে রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে। জাতিকে বিভক্ত করা হচ্ছে ধর্মের সীমারেখা টেনে। ধর্ম উন্মাদনার দাপট গ্রাস করতে চাইছে মুক্ত বুদ্ধিতে।...চাই জাতীয় জাগরণ।" সম্পাদকীয় 'তিমিন হননের গান'

পূর্বেই আলোচনা করার চেষ্টা করেছি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময় অর্থাৎ বঙ্গ

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা ও সামরিকশক্তি এর ঘাতক বাহিনীর উত্থান পর্ব। এ নিয়ে পুর্নবার আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে এই আলোচনাতেই নির্দিষ্ট করেছি চট্টগ্রামে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে দুটি ধারা। একটি হলো কাল, সময়কে উপেক্ষা করে, বাস্তবতাকে এড়িয়ে নিরেট সাহিত্য চর্চা অপরটি তার বিপরীত ও বিবিধ অনুষঙ্গের মাধ্যমে প্রতিবাদী ও গণ সংযোগমুখী।

'অচিরা' ১৯৭৪ - এর সম্পাদকীয় ও ১৯৭৫ এর সম্পাদকীয়ই এই দুটি ধারা বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রথমোক্তে বলা হচ্ছে "মানুষের অস্তিত্ব ভয়াবহ প্রশ্নের চাপে কম্পমান, কেউ জানি না আগামী দিন, অবসর নেই তাকে গড়বার এভাবে যে মানুষ ন্যূনতম মানুষে পরিণত।

ছোট পত্রিকা	সম্পাদনা	প্রকাশকাল	প্রচ্ছদ
শপথ	দীপকজ্যোতি আইচ	একুশে সংকলন ১৯৭১	
আগুন	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সমিতি	"	
আহুতি	অশোক কুমার খাস্তগীর	"	সামসুল আলম
বার্লাক	অনীশ বড়ুয়া	"	দেবদাস চক্রবর্তী
চেতনার অন্য নাম	আহসান হাবিব কোহিনূর	"	আহসান হাবিব কোহিনূর
যুগান্তর	শাহ আলম পিন্টু	"	সবিহ্ উল আলম
চিত্ত যেথা ভয় শূন্য	জাফর হানাফী	"	অশোক কুমার
প্রতিভাস	নাসিরুদ্দিন চৌধুরী	১৯৭৩ ইং	সবিহ উল আলম
উত্তরণ	মোহাম্মদ আলী	"	কমলেশ দাশগুপ্ত
পদাতিক	মোরশেদ শফিউল হাসান	"	চন্দ্র শেখর দে
বান্ধবী	বেগম মুশতারী শফি	"	মেরাজ তাহসিন শফি
তৈলাক্ত পিপীলিকা	খালিদ আহসান	১৯৭৪ ইং	সুমন হাসান

স্বাধীনতোত্তর পর্বে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে গণমুখী প্রসারের আদর্শিক চিন্তা ভাবনা গণসংযোগের দুটি অত্যন্ত সবল মাধ্যম চলচ্চিত্র ও নাটকের ক্ষেত্রে নবতর দিকের সূচনা করে। চট্টগ্রামে অতি ক্ষীয়মানভাবে হলেও সুস্থ চলচ্চিত্রবোধ ও চলচ্চিত্র বিষয়ক ধ্যান-ধারণা, সংবাদ, আলো ছবির দর্শক ও এ সম্পর্কে পাঠক তৈরির ভূমিকা নিয়েছিল। 'রেইন বো' 'চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র সংবাদ ও চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্র এ লক্ষ্যে প্রকাশনার কাজটি করেছে ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়েছে।

ছোট পত্রিকা	সম্পাদনা	প্রকাশকাল	প্রচ্ছদ
লুক-থ্রু	আনোয়ার হোসেন পিন্টু	২০ জুন, ১৯৮২ ইং	সাইফুল কবীর রনজু
নিউ ওয়েভ	শৈবাল চৌধুরী	জুন, ১৯৯৬ ইং	ঢালী আল মামুন

গ্রুপ থিয়েটার প্রকাশনার খুব আকাল চলছে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত প্রকাশনার দিক থেকে এর কার্যক্রম তেমন একটা হয় নি তবে গ্রুপ থিয়েটার সংগঠন চট্টগ্রামের

কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে। স্বাধীনতোত্তর কাল থেকে নাট্যবিষয়ক পত্রিকার প্রকাশনা বর্তমান সময় পর্যন্ত নাট্য সাহিত্যকে কিছুটা হলেও সমৃদ্ধ করেছে নাট্য বিষয়ক ছোট পত্রিকা 'তির্যক', 'মঞ্চ', 'গণায়ন', 'প্রসেনিয়াম', 'থিয়েটার ফ্রন্ট', 'ফ্রন্ট লাইন থিয়েটার' 'নাটক কথা' ও মঞ্চ সন্ত ও শহীদনগর থিয়েটার।

চট্টগ্রাম থেকে শিল্পকলা বিষয়ক দুটি পত্রিকা একটা সর্বজনীন অঙ্গীকারকে সামনে রেখে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনেও তাই। "......একটি সত্যিকারের তথ্য সমৃদ্ধ উপকারী প্রকাশনা বা শিল্পের বিভিন্ন শাখায় উৎসাহী সকলের কাছে আসবে তেমনভাবে 'নান্দনিক' কে হাজির করা আমাদের উদ্দেশ্যে।"

পরবর্তীতে প্রকাশিত চারুকৃৎ। স্বাধীনতার চেতনা ও সংগ্রামী প্রত্যয় নিয়ে এই পত্রিকার যাত্রা শুরু। সম্পাদক লিখেছিলেন '...চারুকৃৎ চারুকলার সংগ্রামী প্রগতিশীল ভূমিকাগুলোকে বাংলাদেশের জনমানসে তুলে ধরার চেষ্টা করবে।

১৯৭৫ এর পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামের ছোট পত্রিকার ভূমিকা, বিষয়বস্তু প্রতিবাদী পথে খুব একটা এগোল না। প্রাসঙ্গিকভাবেই এই পশ্চাৎগামীতাকে বিস্তৃতভাবে দেখার প্রয়োজন আছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। সামরিক উর্দির ভয় ভীতি, আকস্মিক রাজনৈতিক শূন্যতা ও গণতান্ত্রিক বিপর্যয় ও বিভ্রান্তি, ইতিহাস বিকৃতি, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধ চক্রের দাপট সব মিলে যে বিপ্রতীপ পরিবেশের সৃষ্টি করবো তার বিপরীত পক্ষ শক্তি কোন স্মরণযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারলো না এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা বা রচনার প্রয়োজন অন্যত্র। তবু এই পরিপ্রেক্ষিতে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে তা তুলে ধরলাম।

রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর উচ্চাশা থেকে সৃষ্ট দুর্বল কার্যক্রম ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির প্রতি আবেগপ্রসূত অচেতন পক্ষপাত এর একটি প্রধান কারণ হলেও অন্তরালে ছিল দ্বন্দ্ব ও অন্তর্কলহ। যেটি সাহিত্য সংস্কৃতির অবস্থানকেও সংক্রমিত করে বিভেদ বিভক্তির সূত্রপাত ঘটিয়েছে। মত ও পথের দোদূল্যমানতায় ভুগতে ভুগতে অনেক সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মীকে আমরা দেখলাম ৫২ থেকে ৭১-এর যে ঐতিহাসিক ধারা ও অর্জন তাকে বর্জন করে সরে যেতে। এই বিষবৃক্ষের বীজ আরো দীর্ঘায়ু নিয়ে প্রোথিত হলো বহু গভীরে। সত্তরের দশকেই উঠতি তরুণদের বিরাট এক অংশ বিকৃত ইতিহাস ও সংস্কৃতির পাঠ নিলেন পূর্বসূরীদের কাছ থেকে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেবল বিভাজন হয়ে তার শেষ নয়; নৈতিক পদস্খলন ও ক্ষয়ের সূচনা হলো এই সময়ে। একদল শুধু সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ব্যক্তিগত তাগিদে, জনারণ্যে সাহিত্যিক, কবি, লেখক হিসেবে টিকে থাকবার জন্য সময় ও কালকে অবজ্ঞা করে কিংবা এড়িয়ে অতি বিশুদ্ধ সাহিত্য, শিল্প চর্চার পথে পা পাড়ালেন। পার্থিব লাভালাভের পথও সুগম হয়ে গেল এই ছদ্মবেশে। কাজেই দেশ, সমাজ মানুষকে কিছু জানাবার দায় নয়, নয় উদ্যোগ, এলো বিশুদ্ধ সাহিত্য শিল্প চর্চার নামে কিছু ঠুনকো দলগত বক্তব্য ও তর্ক।

কেউ বললেন, "ভাষাকে উপযুক্ত মর্যাদায় আসীন করতে সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতিভাবানদের ভূমিকা বেশি", কেউ চাপালেন ঋদ্ধ উত্তরাধিকার উত্তোলনের ভার অথচ কাঠামোয় তার বিপরীত চিত্র। কেউ সাংস্কৃতিক অগ্রসরতা নির্দিষ্ট করছেন সেই দেশের গদ্য মেপে। কেউ কেউ হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। ভোগের অভীপ্সাই টিকে থাকছে অবশেষে, গতায়ু হচ্ছে সৃষ্টির প্রাণবীজ। শুধু মানুষের বসতি বাড়ছে, আহারজীবী লিপ্সু প্রকৃতির।" "১৯৭৫ এ সঙ্কট, সমস্যাজর্জরিত ও হতাশাগ্রস্থ সময়ে 'অচিরা'র সম্পাদকীয়তে দেখি 'কবি ও প্রেমিক' প্রায় অভিন্ন। আর কবিতার সঙ্গে প্রেমের সংযোগ ও তদ্রুপ। পৃথিবীতে এ যাবৎ যত কবিতা রচিত হয়েছে তার খুব ক্ষীণ একটি অংশই হয়তো প্রেমিক বিহীন।" অনেকটা এই পরিবর্তিত সময়ে প্রকাশিত ছোট পত্রিকার সম্পাদকীয়তে যেটা মূল বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে তারই কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। "স্বাধীনতা রাখতে হবে, প্রতিক্রিয়ার বেড়াজাল ভাঙতে হবে, বাঁচার মত বাঁচতে হব।" 'স্বাধীকার' মহিলা পরিষদ, ১৯৭৮।

'পদাতিক'-এর সম্পাদকীয়তে লেখা হলো "স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুরা এখন উচ্চকণ্ঠে ধুয়া তুলছে জাতীয় পতাকা ও সঙ্গীত পরিবর্তনের।...ভাষা ও সংস্কৃতির স্বীকৃত মানদন্ড নিয়ে বিতর্ক চলছে ধর্ম নেশার মূঢ়তা নিয়ে।"

"অস্ত্রের জোরে তুমি সারা পৃথিবী জয় করতে পার, কিন্তু মানুষের মন বশীভূত করতে পারবে না। সভ্যতার ওপর আঘাত হেনে বাঙালির সর্বনাশ করার জন্যে মেতে উঠেছিল মীরজাফরেরা, কিন্তু ইতিহাস তাদের ক্ষমা করেছি।....রক্তাক্ত সিঁড়ি বেড়ে আমরা এখনো চলেছি!

'চেতনার অন্য নাম' সম্পাদক, বশীর উদ্দিন মাহমুদ,

"মানুষের সমস্ত ব্যথা যন্ত্রণাকে গল্প টিপে হত্যা করেছে বুদ্ধিজীবী নামের কূপমন্ডুকেরা প্রগতিশীলতার আড়ালে অত্যন্ত সুকৌশলে।...একটা ফাঁদ পেতে শৃঙ্খলিত করতে চায় জ্ঞান পাপীরা"

'সংকেত (১৯৭৯), সম্পাদক ওমর কায়সার

"আমাদের লক্ষ্য নয়া গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক, সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ আর সামন্তবাদী মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের শাসন, শোষণ নির্মম নির্যাতনের ফলে 'বাংলাদেশ'-এর মৌল কাঠামো পরিবর্তনে একটি অপরিহার্য ও নির্ধারক সিদ্ধান্ত।"

'আন্দোলন' (১৯৮০), সম্পাদক ঃ রঞ্জিত দস্তিদার রানা

"আমরা দেখেছি বর্তমান জেনারেশনের লেখক নামাবলীধারী ব্যক্তি আসলে মুর্খ, ভন্ড, প্রতারক। এদের কোন দেশ নেই, সমাজ নেই, সংস্কৃতি নেই। ওরা নীতিহীন ল্যাংবোট মাত্র। এমনকি আত্মপ্রচারণায়ও এরা নির্বিকার মোহন্ত।"

'দৈনিক কবিতা' ১৯৮১, সম্পাদক শিশির দত্ত

বর্তমানে ছোট পত্রিকাগুলোর দুষ্প্রাপ্যতার কারণে অনেক ভালো পত্রিকারও অনুল্লেখ ঘটবে তবু যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি তাতেই এই দ্বিবিধ অনুসারীর সত্যাসত্যের প্রমাণ মিলবে।

	ছোট পত্রিকা	সম্পাদনা	প্রকাশকাল	প্রচ্ছদ
(ক)	অচিরা	আবুল মোমেন	১৯৭৫ ইং	অমিত চন্দ্র
	নির্মাণ	রেজাউল করিম	১৯৯৪ ইং	এ্যাড কমিউনিকেশন
	কালধারা	নিতাই সেন	১৯৯৪ ইং	
	ঋতপত্র	অরুণ সেন	১৯৯৬ ইং	খলিদ আহসান
	পংক্তিমালা	আকতার হোসাইন	১৯৯৭ ইং	পীযুষ দস্তিদার
(খ)	লড়াই	মহিউদ্দিন শাহ আলম নিপু	১৯৭৬ ইং	মনসুর-উল-করিম ঠাণ্ডু
	অপেক্ষা	শেখ শামসুল আবেদীন	১৯৭৭ ইং	এনায়েত হোসেন
	কবে শেষ হবে এই গ্রহণের কাল	কাজী এনামুল হক পুলক	”	—
	বুমেরাং	ফরিদুর রহমান বাবুল	১৯৭৮ ইং	জহরুল আলম মনি
	এপিটাফ	মিনার মনসুর দিলওয়ারা চৌধুরী	১৯৮০ ইং	খালেদ আহসান
	তোলপাড়	ইউসুফ মুহম্মদ	”	সাফায়াত খান
	সাহসী ঠিকানা	মাহবুবুল হক	”	—
	স্বাধীকার	চিত্রা বিশ্বাস	”	
	দৌপদী	বিশ্বজিৎ চৌধুরী	১৯৮১ ইং	উত্তম সেন
	তিমির হননের গান	সম্পাদক মন্ডলী উচীচী শিল্পী গোষ্ঠী	১৯৮২ ইং	সৌমেন দাশ
	বৈরী সময়ের শ্লোগান	মহীবুল আজিজ	”	—
	রাইমার্স এ্যালবাম-৮২	অজয় দাশগুপ্ত/ সঞ্জীব বড়ুয়া ইকবাল বাবুল	”	খালিদ আহসান
	রক্তে বেজেছে উৎসব	দেবাংশু হোড়	১৯৮৩	উত্তম সেন
	স্পর্শ	আবু মুসা চৌধুরী	আশ্বিন ১৯৮৬ বাংলা	খালিদ আহসান
	ঋতবাক	অরুণ দাশ	১৯৮৩ ইং	নন্দ দুলাল বসুর অঙ্কিত স্কেচ
	একুশ মানে মাথা নত না করা	আবুল মোমেন	”	—
	বহ্নি	বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী	”	সাফায়াত খান
	কবিতা সমকালীন	মুনির আহমেদ	”	উত্তম সেন

যুগান্তর	বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন	১৯৮৮ ইং	—
লিমেরিক	উৎপল কান্তি বড়ুয়া	,,	—
তিমির হননের গান	মাহবুবুল হক	,,	সৌমেন দাশ
প্রেরণা	রাশেদ রউফ	১৯৮৯ ইং	উত্তম সেন
স্বনন	হোসাইন কবির	,,	হাসান জাহাঙ্গীর চৌধুরী
মূল্যায়ন	অমিত চৌধুরী	ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ ইং	উত্তম সেন
রাজাকারের বিরুদ্ধে ছড়া	রাশেদ রউফ	১৯৯০	উত্তম সেন
বলাকা	শরীফা বুলবুল লাকী	জানু-ফেব্রু ১৯৯৭ ইং	শামীম

চট্টগ্রামের ছোট পত্রিকা প্রকাশের সূচনাকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বেশির ভাগ ছোট পত্রিকার বিষয়বস্তু প্রাধান্য পেয়েছে সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কট সমস্যাগুলো। তৎকালীন পূর্ববাংলা, পূর্ব পাকিস্তানের সময়কালের সঠিক একটি চিত্র আমরা পেতে পারি এই ছোট পত্রিকাগুলোর দিকে যদি একটু নজর দিই। এতে করে মনে হয়, প্রমাণিত হয় যে, বেশ কিছু চোট পত্রিকাই তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে স্বদেশ, সমাজ ও মানুষের কথা মনে রেখে। কিন্তু স্বাধীনতোত্তর ছোট পত্রিকাগুলোতে এই কমিটমেন্ট একটা ভিন্নরূপে এসেছে। বিশেষ করে ১৯৭৫ এর পরবর্তী সময়ে কিংবা আরো কিছু আগে থেকেই ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার ইতিহাস সমৃদ্ধ বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক চেতনার অঙ্গীকারকে অনেকটা পেছু হটতে দেখেছি বিভিন্ন বেশবাসে। ছোট পত্রিকার সম্পাদক, কর্মীরা প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপোষকামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, বাংলাদেশ ও বাঙালির সর্বোত্তম অর্জন জাতীয়তাবাদী চেতনা, ঐতিহ্য ও একুশের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ এই বিরাট অর্জনের ইতিহাসটি; ছোটপত্রিকার প্রকাশনা, আন্দোলনের পর্বটিও দুইভাগে বিভক্ত। সে জাতীয় চিন্তা-চেতনার স্তর থেকে ব্যক্তিগত পর্যায় অবধি। একটি বাঙালি জাতীয়তাবাদপুষ্ট সাহিত্য, সংস্কৃতি অপরটি ইসলামী ভাবধারায় প্রভাবিত। চট্টগ্রামও এর ব্যতিক্রম নয়।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

চট্টলা - অম্বিকা চৌধুরী

চট্টগ্রামের মানস সম্পদ ঃ সামসুল আলম সাইদ ১৯৯৪

হাজার বছরের চট্টগ্রাম ঃ দৈনিক আজাদী প্রকাশনা ১৯৯৫

'চট্টগ্রামের ছোট পত্রিকা' ঃ কমলেশ দাশগুপ্ত 'অন্তরীণ' ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত

বাংলাদেশের বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাস

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশের বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করার আগে প্রথমেই এই আলোচনার সীমানা নির্দেশ করা আবশ্যক। 'বাংলাদেশ' নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। এই ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের জলমগ্ন থেকে। তবে শুধু তাই নয়, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের আগে যে ভূখণ্ডে আজকের বাংলাদেশ অবস্থিত সেখানকার বিজ্ঞান আন্দোলনের পরিচয়, এই নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল কোন্ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিজ্ঞান আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করা। কাজেই এই নিবন্ধের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গ থেকে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে আজকের বাংলাদেশ পর্যন্ত। বিজ্ঞান আন্দোলন সম্পর্কিত এই পর্যালোচনা তিনটি ধারাকে নির্দেশ করবে-বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব প্রচার বা বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, জনগণের বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনকল্যাণের কাজে ব্যবহার করা। এই তিনটি ক্ষেত্র অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর সম্পর্কিত। এই তিনটি ধারায় সমৃদ্ধ বিজ্ঞান আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মাধ্যম হিসেবে ব্যক্তি, সংগঠন, পত্র-পত্রিকা-পুস্তিকার ভূমিকা এবং বিজ্ঞান সম্মেলনের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণার প্রধান তথ্যসূত্র বাংলাদেশের বিজ্ঞান পত্রিকা, বিজ্ঞান সংগঠনের সাংগঠনিক কাগজপত্র, বিজ্ঞান সম্মেলনের কার্যবিবরণী এবং এই সম্পর্কিত বইপত্র।

বাংলাদেশের বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা প্রথমে নজর দেব ১৯২০-র দশকে। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি লেখা থেকে জানা যায়, ১৯২৪ সাল নাগাদ, তৎকালীন পূর্ববঙ্গে 'বারোজনা' নামে একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, ঢাকা কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক পূর্ণেন্দু মজুমদার, কাজী মোতাহার হোসেন, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ। 'বারোজনা'র আড্ডায় বিজ্ঞান সহ নানান বিষয়ে আলোচনা করা হত। শেষ অবধি 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে একটি বাংলা মাসিকপত্র বের হয়. দেশভাগের (১৯৪৭) পরও কিছুদিন সে কাগজ চলেছিল।[১]

তবে 'বারোজনা'র আগেও বিজ্ঞান নিয়ে ভাবনা-চিন্তা বাংলাদেশে হয়েছিল। এর

হোতা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে (১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে) কাশিমবাজারে প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর পরের বছর রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে, রামেন্দ্রসুন্দর, ত্রিবেদীর পরামর্শে এবং শশধর রায়ের উদ্যোগে সম্মিলনের একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান শাখার আয়োজন করা হয় যার সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের সেই সভাপতির অভিভাষণে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন 'বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান' সম্পর্কে। দু'বছর পরে ময়মনসিংহ অধিবেশনে জগদীশচন্দ্র বসুর সভাপতির অভিভাষণের বিষয় ছিল 'বিজ্ঞান সাহিত্য'। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে চট্টগ্রাম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ফের প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। ১৩২০ বঙ্গাব্দের (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের) কলকাতা অধিবেশন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে সভাপতির অভিভাষন দেন তা 'বিজ্ঞানপন্থী জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞানপন্থার একটি বিশিষ্ট ঘোষণা' রূপে চিহ্নিত।[২]

পূর্ব পাকিস্তানের আমলে ১৯৬০ এর দশক ছিল বাংলাদেশের বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরে বের হয় 'বিজ্ঞান বিষয়ে ঝরঝরে সুন্দর রচনা' সমৃদ্ধ পত্রিকা 'বিজ্ঞান সাময়িকী'। এর প্রথম সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ 'নি:সন্দেহে যে যুগে আমরা বাস করছি তা বিজ্ঞানের যুগ, উঠতে বসতে বিজ্ঞান ছাড়া আমাদের একদন্ড চলারও উপায় নেই। কিন্তু যে বিজ্ঞান আমাদের চলমান জীবনের নিত্যসঙ্গী তাকে আমরা আপন করে নিতে পেরেছি কই? বিজ্ঞানের যুগে বাস করেও বিজ্ঞান সম্বন্ধে যতটুকু সাধারণ জ্ঞান না থাকলেই নয় সেটুকুও আমাদের নেই। আমরা বিজ্ঞানকে মনে করছি ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় বিজ্ঞানীদের গড়া জিনিস যাতে আমাদের মাথা ঘামাবার কোনো দরকারই নেই। একথা বুঝতে চাই না যে, শুধু বিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রি পেয়েই আমরা বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের আগ্রহ দেখাতে পারি না। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়ে ছোটবেলা থেকেই আমাদেরকে বিজ্ঞানের ভাবাপন্ন হতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে পড়া বিজ্ঞানের সাথে-সাথে আমাদের বিজ্ঞানের দৈনন্দিন অগ্রগতির সাথে ওয়াকিবহাল হতে পারে।.....

আমরা, বিজ্ঞান-জগতে যাদের প্রথম প্রবেশ ঘটেছে, তারা যাতে পাঠ্য-পুস্তকের আওতার বাইরেও বিজ্ঞানের সংস্পর্শে থাকতে পারি তারই জন্য 'বিজ্ঞান সাময়িকী'র আত্মপ্রকাশ।[৩]

এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মুহাম্মদ ইব্রাহিম, যিনি চট্টগ্রাম কলেজে 'বিজ্ঞান সাময়িকী'র আত্মপ্রকাশের পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে —'... নানা কিছু করার, নানা আসর জমানোর ধুম পড়ে যেত স্বাধীন ছাত্রত্বের প্রথম স্বাদ পেতে না পেতেই। মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর আত্মপ্রকাশও এমনি আবহের মধ্যে।' কিন্তু শুধু স্বাধীন ছাত্র জীবনই নয়, এর পটভূমির ব্যাপ্তি ছিল আরো বিস্তৃত, সেটি ছিল স্পুটনিকের সময়,

গ্যাগারিন আর গ্লেনের মহাশূন্যে উৎক্ষেপ'-এর কাল। ঐ সময়ই ১৯৬০ সালে বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রকাশ এবং তারপর তার পরিচালনায় 'ক্ষুদে বিজ্ঞানীর আসর' জমে উঠেছিল। ১৯৬১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় 'পাকিস্তান বিজ্ঞান সম্মেলন'। ঐ সম্মেলনে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজ্ঞানের ভূমিকার কথা বলেন।[৪] সম্মেলনে বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পরে প্রতি বছর 'বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানজীবী সমিতি (PASSP) কার্জন হলে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করতে শুরু করে। ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এইসব বিজ্ঞান মেলায় যোগাযোগ ঘটত বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের।[৫]

১৯৬২ সাল নাগাদ ঢাকার ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুলে একজন শিক্ষক এবং কয়েকজন ছাত্রের উদ্যোগে তৈরি হয় 'অগ্রণী বিজ্ঞান সংঘ'। এদের উদ্যোগে বের হত কিশোরদের বিজ্ঞান পত্রিকা : 'টরে-টক্কা'। এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যেত ঐ স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক আর অভিভাবকদের কাছ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক মরহুম বেলায়েত হোসেন চৌধুরী ছিলেন এই ধরণের বিভিন্ন ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর বাড়ির ঠিকানা ছিল এরকম বেশ কয়েকটা গোষ্ঠীর ঠিকানা, তাঁর টেলিফোন ছিল এদের টেলিফোন। অর্থ আর যন্ত্রের সাহায্যও তিনি দিতেন। এই ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের জন্য তিনি নিজের টাকায় বের করতেন 'বিজ্ঞান সমাচার' নামে পত্রিকা।[৬] আসলে স্কুলে বিজ্ঞানচর্চার আসল কাজটুকু হত। বিশেষ কোনো শিক্ষকের বা বিশেষ কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে একান্তে, এমনকি স্কুল-কলেজের বাইরে'। মুহাম্মদ ইব্রাহিমের ভাষা ধার করে বলা যায়, 'দৃষ্টির আড়ালে এরকম ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বরাবর কাজ করেছে এবং করছে, যে কোন মহৎ আন্দোলনের তারা প্রাণ-শক্তি।[৭]

স্কুলের আনুষ্ঠানিক কাজের পরিপূরক হিসেবে বিজ্ঞান ক্লাব যে একটা নিয়মিত এবং গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হতে পারে সেটাও কেউ কেউ ভাবছিলেন। তার প্রমাণ মেলে, ১৯৬৪ তে প্রকাশিত 'Science Clubs in Schools' শীর্ষক একটি লেখায়। এ. এম. শরফুদ্দিনের এই লেখাটি বেরিয়েছিল ইস্ট পাকিস্তান এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টারের বুলেটিনে, ১৯৬৪ জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যায়।

ঐ বছরেই (১৯৬৪) 'বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানজীবী সমিতি'র জাতীয় প্রদর্শনীর আহ্বায়ক এ. এইচ চোটানী পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর জনপ্রিয়তা বেশি বলে মন্তব্য করেন। তিনি লেখেন, দু'বছর আগে থেকে ঢাকায় যেসব বিজ্ঞান প্রদর্শনী হচ্ছে সেগুলো এতই জনপ্রিয় হয়েছে যে নগরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে তা ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়ে গেছে। তাঁর মতে, করাচী, লাহোর বা পেশোয়ারে সে উৎসুক্যের তুলনা মেলে নি।[৮]

১৯৭১-এ স্বাধীনতার পর বিজ্ঞান আন্দোলনের ব্যাপ্তি বাড়ে। এখন আর শুধু স্কুলকেন্দ্রিক নয়, বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন পাড়ায়, দেশের নানান ক্ষেত্রে। এদেশে বিজ্ঞান ক্লাবকেন্দ্রিক বিজ্ঞান আন্দোলনের সূচনা অবশ্য ঢের আগে। ১৯৫৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়ে এ দেশের প্রথম আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিষ্ঠান 'নটরডেম বিজ্ঞান ক্লাব'। সত্তর দশকে, স্বাধীনতার দু'-এক বছরের মধ্যে বেশ নাম করল 'দ্য ইয়াং সীকার্স অ্যাসোসিয়েশন'। পাশাপাশি গড়ে উঠল ঢাকায় স্পুটনিক, অনুসন্ধিৎসু চক্র' জুভেনাইল সায়েন্স পায়োনিয়ার্স, সন্ধানী, চট্টগ্রামে রাউজানের গ্রমে কলকণ্ঠ, খুলনার গ্রামে বেতাগা বিজ্ঞান সমিতি প্রভৃতি বিজ্ঞান ক্লাব। আবার 'ইত্তেফাক' পত্রিকার কচি কাঁচার আসর' - এর মতো বিশেষ বিভাগকেন্দ্রিক সংগঠন গড়ে উঠল।[৯] একইরকমভাবে গড়ে ওঠা 'খেলাঘর' সংগঠন ছোটদের জন্য বিজ্ঞান ক্লাবধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করল।

বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মসূচির মধ্যে চিরাচরিত মডেল তৈরি, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, নানান প্রকল্প ইত্যাদি তো ছিলই। পাশাপাশি জোর দেওয়া হত স্থানীয় ভিত্তিতে প্রকৃতি - পরিবেশকে জানার কাজকে। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে তরুণ মনে প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা জন্মাত। আশেপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি হত। আর এর ফলে দেশের নানান সম্পদের একটা প্রাথমিক সমীক্ষার কাজও হয়ে যেত। সামগ্রিকভাবে, সমীক্ষা-নির্ভর বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে, বৈজ্ঞানিক মেজাজের বিকাশ ঘটত।

১৯৭৫ এ বিজ্ঞান সাময়িকীর উদ্যোগে 'বিজ্ঞান ক্লাব' বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।[১০] এর ফলশ্রুতিতে পত্রিকা তার বিজ্ঞান ক্লাব সমন্বয়ের কার্যক্রম ঘোষণা করে আন্দোলনের একটি রূপরেখা দিয়ে। পত্রিকার আরও প্রত্যক্ষ অবদান ঘটে যখন বিজ্ঞান সাময়িকীর সংযুক্ত বিজ্ঞান ক্লাব হিসেবে 'অনুসন্ধানী' দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত বিকাশ লাভ করে। ইতিমধ্যে 'বিজ্ঞান সাময়িকী'-র চরিত্রগত একটা বদল ঘটে। আগে, প্রথম দিকে, বিজ্ঞান সাময়িকীর মাথার উপর লেখা থাকত 'ক্ষুদে বিজ্ঞানী সমষ্টির উদ্যোগে প্রকাশিত বিজ্ঞান বার্তাবহ। পরে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ যখন 'নিজেদেরকে রীতিমত একটা আন্দোলনের অংশ, হিসেবে ভাবতে শুরু করেন, তখন বিজ্ঞান সাময়িকীর মাথার উপর লেখা শুরু হয় 'বিজ্ঞান আন্দোলনের পথিকৃৎ'।[১১] সত্যিই, বিজ্ঞান সাময়িকী বিজ্ঞান আন্দোলনের পুরোধা হয়ে ওঠে।

১৯৭৬ এর ২০ ডিসেম্বর কার্জন হলে বিজ্ঞান সাময়িকীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম বিজ্ঞান ক্লাব সমাবেশ। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ ইব্রাহিম পরবর্তীকালে মন্তব্য করেছিলেন : 'আজ বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনের অধিকতর বিস্তৃতিতে এই পত্রিকা খানিকটা গর্ব করতে পারে বৈকি।'[১২]

সত্তরের দশকে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের পাশাপাশি হাতে কলমে বিজ্ঞানচর্চার এই জোয়ারের সময় চেষ্টা হয় এই ধরণের কাজকর্মের সমস্যাগুলো বুঝে নেওয়ার। তপন চক্রবর্তী লেখেন, 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও পরিভাষা সমস্যা'। ১৯৭৬-এ বের হয় তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন 'মানুষের জন্য বিজ্ঞান'। নাম থেকেই বোঝা যায় যে ঐ সময় বিজ্ঞানর সামাজিক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব প্রদানের চেষ্টা শুরু হয়েছিল। সংকলিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে অবশ্য বিজ্ঞানের তথ্য জানানোর প্রবণতাই বেশি লক্ষণীয়। তবে তা যে কিছুটা 'জনপ্রিয়' হয়েছিল তার প্রমাণ বারো বছরে তিনটি সংস্করণের প্রকাশ।

১৯৭৮ সালে বিজ্ঞান ক্লাবের সংখ্যায় একটা বিরাট পরিবর্তন আসে। এর কারণ ঐ বছরে পরপর দু'বার জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ পালিত হয়। এই বিশেষ সপ্তাহ পালনের ফলে বিজ্ঞান ক্লাবগুলো চলে আসে আলোকবৃত্তের মাঝখানে।[১৩] এই সময় এই খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হল। নতুন বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠল। বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন সমৃদ্ধ হল।

এই সমৃদ্ধির ব্যাপ্তি মাপতে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কিছু মানুষ প্রয়াসী হলেন। তাদের এই প্রয়াসের ফলে ১৯৭৯তে প্রকাশিত হল ২৪৮ পাতার বোর্ড বাঁধাই সুবৃহৎ বই 'বিজ্ঞান ক্লাব'। দুটি বাংলা মিলিয়ে, বিজ্ঞান ক্লাব' সম্বন্ধে এরকম তথ্য ও বিশ্লেষণ সম্বলিত বই এর আগে বা পরে কখনোই বের হয়নি। এই বইটি প্রকাশ করেছিল 'বাংলাদেশ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানজীবী সমিতি। এর পরিকল্পনা এবং রূপায়ণে সহযোগিতা করেছিল 'বিজ্ঞান গণ-শিক্ষা কেন্দ্র'। বইটির সম্পাদক ছিলেন মুহাম্মদ ইব্রাহিম। সম্পাদনা পরিষদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন, আলী আসগর, তমাল কান্তি দত্ত। এই বইতে আলোচনার বিষয়ের মধ্যে ছিল বিজ্ঞান সন্ধানীর ভূমিকা, বাংলাদেশে বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাবের বিভিন্ন ধরণের কাজকর্ম, বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশনা, বিদেশের দৃষ্টান্ত, প্রাসঙ্গিক বইপত্রের তালিকা ইত্যাদি। আর ছিল বাংলাদেশের বিজ্ঞান ক্লাবের একটি বিস্তৃত ডাইরেক্টরী।[১৪] কুড়ি পাতা ব্যাপী 'বিজ্ঞান ক্লাব নির্দেশিকা' তে জলো ধরে ধরে বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবের নাম-ঠিকানা তুলে ধরা হয়েছিল। সম্প্রতি (২০০০), 'চেতনা' পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় দুই বাংলার 'এন জি ও' সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে 'বিদেশী দালাল না স্বদেশী সেবক - এন জি ও আসলে কী?' এই বইতে বাংলাদেশের ৩৫৫টি এন জি ও-র বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে, নাম ঠিকানা ছাড়াও কাজের ক্ষেত্র, অর্থাগমের উপায় প্রভৃতিও তাতে উল্লিখিত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকগুলিই বিজ্ঞান সংগঠন। এদের কাজের ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি।

'বিজ্ঞান আন্দোলন' নিয়ে ভাবনা-চিন্তা যে সংহত হচ্ছিল তার প্রমাণ মেলে আশির দশকে প্রকাশিত বইপত্রে। ১৯৮১-তে প্রকাশিত আবদুল্লাহ আল-মুতীর 'এ যুগের

বিজ্ঞান' বইটির একটি অংশের নাম ঃ বিজ্ঞান আন্দোলন।[১৫] এর মধ্যে রয়েছে 'বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞান আন্দোলন'। 'বিজ্ঞান সন্ধানীর ভূমিকা', 'বুনিয়াদী বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানী সমাজ' এবং 'বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক চারটি নিবন্ধ। এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়, '....বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত তথ্যাবলী বিজ্ঞানের একটা অংশ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, বিজ্ঞান হল বিজ্ঞানীদের তথ্য-সন্ধানের, গবেষণার এক বিশেষ পদ্ধতি। ...এই পদ্ধতির অঙ্গীভূত হল এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। তাকে বলতে পারি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।'[১৬] আল-মুতীর মতে, বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাজে পৌঁছানোর উপায় হল ঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, পত্র-পত্রিকা, বই পাঠাগার, রেডিও, টেলিভিশন এবং বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান সমিতি ইত্যাদি।[১৭] তিনি লিখেছেন, বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার একটা উপায় হল দেশময় বিজ্ঞান ক্লাব সংগঠন। যার উদ্দেশ্যের মধ্যে আসতে পারে ঃ দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা গবেষণামূলক কাজের অভিজ্ঞতা, যুক্তিবাদী চিন্তা পদ্ধতি অভ্যাস করা, বিজ্ঞানভিত্তিক শৌখিন কার্যকলাপ এবং প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের প্রতিভার বিকাশ সহায়তা করা।

এই লক্ষ্য সাধন করার জন্য কাজ করতে গেলে সচেতন হতে হবে দেশের বিজ্ঞানচর্চার বস্তুগত প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে, আর সেই লক্ষ্যেই ১৯৮৩-তে বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে বার হয় 'বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চা' বিষয়ক একটি সংকলন। এতে আলোচিত হয় বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা, ফলিত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োগ পরিধি, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডল ও বিজ্ঞানচর্চা, বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও কাজের ভাষা রূপে বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়। বইটিতে বিজ্ঞান আন্দোলনের সুর প্রত্যক্ষ করা যায় যখন পড়ি ঃ 'বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজন আমাদের অস্তিত্বের জন্য, উন্নয়নের জন্য এবং জীবনের জন্য। বিজ্ঞানচর্চার বৃহত্তর প্রেক্ষিতটিও তাই বিবেচনা করতে হবে সামগ্রিক জীবনমুখী দৃষ্টিকোণ থেকেই। অন্যথায় তথাকথিত বিজ্ঞানচর্চা নেহাৎ প্রতিষ্ঠানিক কার্যকলাপ কিংবা ব্যক্তিক উচ্চভিলাষের সামগ্রী হয়েই থাকবে - উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও প্রায়োগিক পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে নয়।'[১৮]

১৯৮৪ সালে ২৯ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলা একাডেমি বক্তৃতামালা প্রদান করা হয়। এ. এম. হারুন. অর. রশীদ প্রদত্ত এই বক্তৃতার শিরোনাম ছিল বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান। যা ঐ বছরই বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে বই হয়ে বের হয়।[১৯] এর মধ্যে বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় ছিল ঃ বিজ্ঞানের সামাজিক পটভূমি ও উৎস, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের দার্শনিক পটভূমি এবং বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চা।

১৯৮৫ সালের ২৭ থেকে ২৯ এপ্রিল বাংলাদেশের ঢাকায় প্রথম বিজ্ঞান লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর যৌথ উদ্যোক্তা ছিল 'বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদ' এবং 'বাংলা একাডেমী, ঢাকা'। এই সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল ঃ জনপ্রিয় বিজ্ঞান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিজ্ঞানের বই, গণমাধ্যমে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সাময়িকী, উচ্চশিক্ষান্তরে বিজ্ঞানের বই, বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশনা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য এবং স্বাধীনতা ও বিজ্ঞান চর্চা, আর ছিল মুক্ত অধিবেশন। ১৯৮৬ সালে বাংলা একাডেমী থেকে এই সম্মেলনের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হয় যার ভূমিকায় বলা হয় ঃ এই সব বিবরণ স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা হলো, শুধু বর্তমানের সকল অংশগ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্ট বা এ বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিদের সুবিধার জন্যে নয়, ভবিষ্যৎকালেও, আমাদের দেশের মানসিক জগতে কীভাবে এবং কোন দিকে বিবর্তন ঘটেছিল, সে বিষয়ে কৌতূহলী ব্যক্তিও এ সংকলন থেকে জানাতে পারবেন।'[২০] এর আগে ১৯৮২, ৯মে কলকাতায় একটি 'বাংলা বিজ্ঞান লেখক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব ছিল।[২১]

১৯৮৮ তে বের হয় আবদুল্লাহ আল মুতী সম্পাদিত 'বাংলাদেশে বিজ্ঞানচিন্তা'। এই বইয়ের পাঁচটি ভাগ হল ঃ বিশ্বলোক (জ্যোতিষ বনাম জ্যোতির্বিদ্যা উল্লেখ্য), বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ (রয়েছে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ক প্রবন্ধগুচ্ছ; বিশেষ উল্লেখ্য ঃ 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও কুদরত-এ-খুদা' শীর্ষক প্রবন্ধ), জীবন ও বিজ্ঞান (জনস্বাস্থ) বিষয়ক লেখা), বিজ্ঞানের পটভূমি (বিজ্ঞানের পদ্ধতি, বিজ্ঞানের ইতিহাস সংক্রান্ত লেখা) এবং প্রয়োগ প্রসঙ্গ (উল্লেখ্য 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জনঘনিষ্ঠতা'র মত জনবিজ্ঞান ভাবনাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ)।

১৯৯১ তে প্রকাশিত হয় আলী আসগরের লেখা বই 'বিজ্ঞান আন্দোলন' যা আন্দোলনের তত্ত্ব এবং প্রয়োগ বোঝার ক্ষেত্রে খুবই কাজের। বিজ্ঞানমনস্কতা, বিজ্ঞান প্রচারের নানান মাধ্যম সবই উঠে এসেছে এই বইতে। লেখকের মতে, 'আমরা যদি আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চাই, বিজ্ঞানের যথার্থ চর্চা ও প্রয়োগের ভেতর দিয়ে, তা হলে মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীর চেষ্টা নয় মাত্র, সমগ্র জাতিকে সচেতনভাবে অনুধাবন করতে হবে বিজ্ঞানের গুরুত্ব। সেই সামগ্রিক চেতনা সৃষ্টিতে বিজ্ঞান পত্রিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।'[২২]

সেই অবদান রেখেওছে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকা। এদের মধ্যে উল্লেখ্য ঃ 'বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা', বেতাগা বিজ্ঞান সমিতির মুখপত্র 'বিজ্ঞান পরিক্রমা', কলকণ্ঠ গ্রামীণ বিজ্ঞান ক্লাবের মুখপত্র 'বিজ্ঞান বার্তা', বিজ্ঞান চেতনা পরিষদের 'বিজ্ঞান চেতনা', অনুসন্ধিৎসু চক্র বিজ্ঞান ক্লাবের 'অনু', মোহম্মদ গাজীউর রহমান প্রকাশিত 'বিজ্ঞান চর্চা', ফজলুর রহমানের কাগজ 'বিজ্ঞান সমাজ পত্রিকা', কেন্দ্রীয় খেলাঘর

আসরের বিজ্ঞান মুখপত্র 'বিজ্ঞান খেলাঘর',[২৩] চট্টগ্রাম বিজ্ঞান পরিষদের 'সন্ধান', মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান', গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র-র 'গণস্বাস্থ্য', এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত 'পুরোগামী বিজ্ঞান' ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা' প্রভৃতি। তবে নিয়মিত বের হওয়ার নিরিখে এক নম্বর হ'ল বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র প্রকাশিত 'মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী'। বিগত চল্লিশ বছর ধরে বের হয়ে চলেছে এই পত্রিকা। ২০০০ সালের ২৫ নভেম্বর নভেরা মিলনায়তন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিজ্ঞান সাময়িকীর চল্লিশ বছর পূর্তি উৎসব।[২৪] এই উপলক্ষে বেরিয়েছে মুহাম্মদ ইব্রাহিম সম্পাদিত সুবৃহৎ সুদৃশ্য' মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর নির্বাচিত রচনার সংকলন'।[২৫]

বাংলাদেশের বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ পর্যালোচনা করার পর স্বভাবতই এর মূল্যায়নের প্রশ্ন উঠবে। সমকালীন বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চার, বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারাটা কেমন তা নিয়ে ওদেশের মানুষরা ভেবেছেন। এই উদ্দেশে মাসিক শিক্ষাবার্তার উদ্যোগে ২৬-২৭ অক্টোবর, ১৯৯৫ তে আয়োজিত হয়েছে 'বিজ্ঞানচর্চা : সমকালীন বাংলাদেশ' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার। সেখানে প্রারম্ভিক পর্বে আলোচিত হয়েছে শিক্ষানীতি, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা। বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যা, দারিদ্রের বহুমুখী বাস্তবতা পরিপ্রেক্ষিত প্রভৃতি। আর পঞ্চম অধিবেশনে আলোচনা করা হয় বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞানমনস্কতা সম্পর্কে। বলা হয় ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিজ্ঞান শিক্ষার কথা, বিজ্ঞান শিক্ষায় বিজ্ঞান ক্লাবের ভূমিকার কথাও। ১৯৯৭ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় এই সেমিনার - কার্যবিবরণীর সংকলন গ্রন্থ।[২৬]

বাংলাদেশে বিজ্ঞান আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহ্য থাকলেও সেখানে জীবনের সকল ক্ষেত্রে চিন্তার এবং আচরণে বিজ্ঞান চেতনা এবং যুক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। বরং ফ. ব. আল. সিদ্দিক লিখেছেন ঃ 'আমাদের দেশের সেরা বাগ্মী ও প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ তাদের তাদের দশ আঙ্গুলের মধ্যে আট আঙ্গুলে আটটি তথাকথিত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন রত্ন বা পাথর পরিধান করেন'। তাঁর ভাষায়—

'...যে সকল ছাত্রছাত্রীরা যুক্তিবাদিতার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে, তারা হয়তো শ্রেণীকক্ষ বা পাঠ্যপুস্তক থেকে পাওয়া জ্ঞানের সাহায্যেই আমাদের সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলি থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু যাদের মনে চিরাচরিত ধারণার প্রতি পারিবারিক বা সামাজিক প্রভাবে অন্ধ অনুগত্য, ধর্মভয়, জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি অহঙ্কার, পরকালের প্রলোভন ইত্যাদি ভীষণভাবে ক্রিয়াশীল, তারা হয়তো তাদের বিচারবুদ্ধির উপর অতটা আস্থা রাখতে পারে না, কিংবা যুক্তির কথা মেনে নিতে ভয় পায়। এর

ফলে তারা বিজ্ঞান-শিক্ষা থেকে অর্জিত জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে তাদের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারে না।'[২৭] আর তাই শফি আহমেদ লেখেন : 'তুখোড় পদার্থ বিজ্ঞানীকে দেখতে পাই জীবনের সাফল্যের সন্ধানে প্রতি বছরই হাতের আঙ্গুলে বাড়তি একটি করে রত্নধারণ করছেন।...'[২৮]

কিন্তু কুসংস্কার তো আর শেষ কথা বলে না। তাই উঠে আসে বরিশালের আরজ আলি মাতুব্বরের নাম যিনি জন্মসূত্রে মুসলিম হয়েও ইসলাম সহ যাবতীয় ধর্মের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক অজস্র লেখা লিখেছেন। প্রথাগত শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত না হয়েও ১৩৯২ বঙ্গাব্দে ৮৬ বছর বয়সে, মারা যাবার আগে তিনি দেহদানের অঙ্গীকার করেন।[২৯] উল্লেখ করা যায় বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাদুশিল্পী জুয়েল আইচের কথা যিনি কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনীতে সামিল। বাংলাদেশের লেখক শিবিরও একাজে যুক্ত। বিভিন্ন পত্রিকাতে অলৌকিকতা বিরোধী লেখা বের হয়, ১৯৯৩ তে কলকাতা থেকে বের হয়েছিল 'দুই বাংলার কুসংস্কার বিরোধী বিজ্ঞানচিন্তা'[৩০] তাতে সংকলিত ৪৭ টি প্রবন্ধের মধ্যে ১৯টি বাংলাদেশের, মুক্তির পথে যাত্রায় সামিল নানান ছোটখাটো সংগঠনও। ঢাকার কিছু মুক্তমনা তরুণ গড়ে তুলেছেন 'যুক্তি' নামক একটি 'কুসংস্কার বিরোধী প্রগতিশীল সংগঠন' যারা ১৯৯২-এ প্রচারিত একটি প্রচারপত্রে ধর্মীয় কুসংস্কারসহ মন্ত্র, জ্যোতিষবিদ্যা, অপচিকিৎসা, আত্মা ও পুনর্জন্ম ইত্যাদির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন। আরো কয়েকজন তরুণ কোরানের পরস্পর বিরোধিতার উদাহরণ সংকলিত করেছিলেন।[৩১]

কাজেই বলা যায় অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঐতিহ্য আজও ম্লান হয়ে যায় নি। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় যে মৌলবাদী প্রবণতা আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গেলে চাই বিজ্ঞানচেতনা বিকাশের আরও জোরালো আন্দোলন। বাংলাদেশের বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়; এই প্রতিরোধী ঐতিহ্যই তো আমাদের এগিয়ে চলার পাথেয়।

সূত্র নির্দেশ :—

১. সত্যেন বোসের চিঠি, যে চিঠি আমরা বিলম্বে পেলাম, 'বিজ্ঞান সাময়িকী', ঢাকা এপ্রিল, ১৯৭৪।

২. শান্তনু চক্রবর্তী, 'রামেন্দ্রসুন্দরের অভিভাষণ - বিজ্ঞানপন্থী জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞানপন্থার একটি বিশিষ্ট ঘোষণা, অপরাজিত বসু সম্পাদিত 'ভারত ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি', কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ২২৭-২৩৬।

৩. প্রথম সম্পাদকীয় : ক্ষুদে বিজ্ঞানীর দফতর', বিজ্ঞান সাময়িকী, সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

৪. মুহাম্মদ ইব্রাহিম, বাংলাদেশে বিজ্ঞান ক্লাব', মুহাম্মদ ইব্রাহিম সম্পাদিত 'বিজ্ঞান ক্লাব', ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. ১২।

৫. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২।
৬. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩।
৭. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩।
৮. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২।
৯. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪।
১০. বিজ্ঞান ক্লাব ঃ সমন্বয়, বিজ্ঞান ক্লাব সমাবেশ '৭৬, বিজ্ঞান সাময়িকী, ফেব্রু-মার্চ ১৯৭৭।
১১. মুহম্মদ ইব্রাহিম, বিজ্ঞান সাময়িকী ও আমাদের লেখালেখি, জহুরুল হক এবং অন্যান্য সম্পাদিত বিজ্ঞান লেখক সম্মেলন ১৩৯২, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৪২-১৪৩।
১২. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪৯।
১৩. আলী আসগর, বিজ্ঞান আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৪১-৪৫।
১৪. মুহম্মদ ইব্রাহিম সম্পাদিত, 'বিজ্ঞান ক্লাব', ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. ২১৯-২৩৯।
১৫. আবদুল্লাহ আল মুতী, এ যুগের বিজ্ঞান, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ১৩৯-১৬৮।
১৬. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৯।
১৭. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৬৩।
১৮. সুব্রত বড়ুয়া, 'বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চা', বাংলা একাডেমী ঢাকা প্রকাশিত 'বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চা', ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৯৬।
১৯. এ. এম. হারুন সর রশীদ, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, ঢাকা ১৯৮৪।
২০. সম্পাদকমন্ডলীর নিবেদন, জহুরুল হক এবং অন্যান্য সম্পাদিত 'বিজ্ঞান-লেখক সম্মেলন, ১৩৯২', ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ৭-৮।
২১. বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য সম্মেলন, স্মারক সংকলন, গোবরডাঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৮২।
২২. আলী আসগর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
২৩. দীপক দাঁ, প্রসঙ্গ বাংলাদেশের বিজ্ঞান পত্রিকা, বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য সম্মেলন, স্মারক সংকলন, গোবরডাঙ্গা, ১৯৮২, পৃ. ৯১।
২৪. মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর চল্লিশ বছর (স্মরণিকা), ঢাকা ২০০০ এবং বিজ্ঞান সাময়িকী, ৪০ বর্ষ পূর্তি সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০১।
২৫. মুহাম্মদ ইব্রাহিম সম্পাদিত, মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর ৪০ বছর নির্বাচিত রচনার সংকলন, ঢাকা, নভেম্বর ২০০০।
২৬. এ. এন. রাশেদা এবং অন্যান্য সম্পাদিত 'বিজ্ঞান চর্চা ঃ সমকালীন বাংলাদেশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭।
২৭. ফ. ব. আল সিদ্দিক 'ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণে বিজ্ঞানশিক্ষা', এ. এন. রাশেদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯-১৭৪।
২৮. শফি আমেদ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিজ্ঞান শিক্ষা', এ. এন. রাশেদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।
২৯. ভবানী প্রসাদ সাহু 'প্রসঙ্গ - বাংলাদেশে বিজ্ঞান আন্দোলন', উৎস মানুষ, জুলাই আগষ্ট, ২০০০, পৃ. ১৪১ এবং 'বাংলাদেশে গণবিজ্ঞান চর্চা ঃ একটি প্রাথমিক ধারণা', উৎস মানুষ, জুন, ১৯৮৯।
৩০. তপন চক্রবর্তী ও ভবানীপ্রসাদ সাহু, 'দুই বাংলার কুসংস্কারবিরোধী বিজ্ঞানচিন্তা,' কলকাতা, ১৯৯৩।
৩১. ভবানীপ্রসাদ সাহু 'দুই বাংলা' হায় ধর্ম, কলকাতা, ১৯৯৩।

বাংলাদেশের বর্তমান ছাত্র রাজনীতি ঃ একটি বিশ্লেষণ

মোঃ রেজাউল করিম

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছাত্ররা এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার দাবিদার। উপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল মুক্তির সংগ্রামে এদেশের ছাত্র সমাজ তথা ছাত্র সংগঠনসমূহ সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এ কথা ব্রিটিশ শাসন অবসানের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি পাকিস্তান কাঠামোতে স্বাধিকার ও স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তথা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সমভাবে সত্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এ দেশের ছাত্র সমাজ যে অবদান রেখেছে তা তাদেরকে ইতিহাসে স্থায়ী আসন দান করেছে। বিশ্ব ইতিহাসে একমাত্র বাংলাদেশের ছাত্ররাই একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে।[১] স্বাধীন বাংলাদেশেও বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে এদেশের ছাত্রদের অংশগ্রহন ছিল সফল ও সার্থক। এক কথায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৯০ সালের এরশাদ বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত এ দেশের ছাত্র সমাজের গৌরবোজ্জল ভূমিকা স্পষ্টত দৃশ্যমান। অথচ বর্তমানে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতিতে দেখা দিয়েছে মন্দা ভাব। যা এ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে আমাদের জানা দরকার, ছাত্র রাজনীতি কি? - ছাত্ররা মূলত কোন স্বকীয় সত্ত্বা সম্পন্ন রাজনৈতিক শক্তি নয়। কারণ ছাত্রদের পেশাগত অবস্থান স্থায়ী নয়। বৃহত্তর জীবনের প্রস্তুতি পর্বের এক পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট সমাজের সভ্য হিসেবে নিজেদের স্বভাবজাত সচেতনতা থেকে ছাত্ররা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে নিজেদের কর্মসূচী, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদিকে সাংগঠনিক রূপ প্রদান করলে আদর্শগত স্বতন্ত্র অবস্থানের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। ফলে ছাত্ররা নিজ-নিজ সংগঠন গড়ে তোলে।

বাংলাদেশ নামের এই ভূখন্ডে ছাত্রদের প্রথম সংঘবদ্ধ সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় সরকার ঘোষিত এক সার্কুলারের প্রতিবাদে 'Anti Circular Society' গঠনের মধ্য দিয়ে।[২] অতঃপর বিচিত্র মত ও পথ পরিক্রমায় এদেশের ছাত্র সমাজ বিশ্ব রাজনীতিতে এক ব্যতিক্রমী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলাদেশের ছাত্রদের অতীত কীর্তি ইতিহাসে সমুজ্জ্বল। তাদের সোনালী ভূমিকা অর্জন সারাবিশ্ব বিদিত। পাকিস্তান আন্দোলনে এখানকার ছাত্র সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান কাঠামোতে ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষার দাবিতে প্রথম স্বোচ্চার হয় এদেশের ছাত্ররা। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হল ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের সংগ্রামী ভূমিকা ও মহান আত্মত্যাগ তাদেরকে নেতৃত্বের আসন দান করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো সম্মেলনে ছাত্রদের এ অর্জন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে আরও মহিমান্বিত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন কালে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের দাবি উত্থাপিত হয় ছাত্র সমাজের মধ্য থেকে।[৩] ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন খ্যাত সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের অনুঘটক ছিল এ দেশের ছাত্র সম্প্রদায়।[৪] তারা সামরিক সরকার কর্তৃক সৃষ্ট পরিকল্পিত রাজনৈতিক শূন্যতা ভেঙে গোটা পরিবেশকে চাঙ্গা করে তোলে। ১৯৬৬ সালের ৬-দফা কেন্দ্রিক আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। ১৯৫৮ ৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব দান[৫] সেই গৌরবোজ্জ্বল মহিমার সাক্ষ্য। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রধান অংশীদারিত্ব এদেশের ছাত্র সমাজের। ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মূল প্রেরণা ও চালিকা শক্তি ছিল এই ছাত্র সম্প্রদায়।[৬] অর্থাৎ যুগে-যুগে বাংলাদেশের ছাত্ররা সকল অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছিল স্বোচ্চার। এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক।

বিভিন্ন গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের ধারক ও বাহক সেই ছাত্র সংগঠনগুলো বর্তমানেও ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়। তথাপি ছাত্র রাজনীতিতে দেখা দিয়েছে স্থবিরতা। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ছাত্র রাজনীতি থেকে। কিন্তু কেন?

ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ছাত্র সংগঠনগুলোর গঠন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যায়, শুরুতে রাজনৈতিক দলের সাথে ছাত্র সংগঠনগুলোর কোন সম্পর্ক থাকে না।[৭] পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে বক্তব্য উপস্থাপন ও মতামত প্রদান কালে ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দল আদর্শগত একক অবস্থানে উপনীত হয়। শুরু হয় পরস্পরের পরিপূরক রাজনীতি। এভাবেই ছাত্র রাজনীতির উপর জাতীয় রাজনীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। বাস্তব কারণে আদর্শ অনুসরণকারী ছাত্র সংগঠনটি সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে। শুরু হয় লেজুড় ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির পথচলা।

দলীয় লেজুড়বৃত্তির ফলে ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্র স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা থেকে সরে এসে পিতৃ সংগঠনগুলোর কর্মসূচীর প্রতি গভীর সমর্থন জানিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল, সমাবেশ ও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনীতিবিদদের মাসলম্যান হিসেবে কাজ করছে

ছাত্রনেতারা। অর্থাৎ ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মূল রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র ক্যাডারে পরিণত হচ্ছে। দলীয় ও হীন ব্যক্তি স্বার্থে যথেচ্ছা ব্যবহার হচ্ছে ছাত্রনেতারা। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী দৈনিক পত্রিকায় প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে খোলামেলা মন্তব্যে বলেন,

"ছাত্ররা নিজেরা সন্ত্রাসী নয়। তাদের সন্ত্রাসী বানায় রাজনীতিকরা"।[৮]

অন্যদিকে ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল মন্তব্য করেন,

"বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো 'ছাত্র' কথাটির প্রকৃত অর্থ জানে না। তাদের ধারণা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের দলের হয়ে কাজকর্ম করার জন্য যে সব তরুণকে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ছাত্র।"[৯]

দলীয় লেজুড়বৃত্তি করে ছাত্ররাও লাভবান হচ্ছে। পিতৃ সংগঠন ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সমর্থক ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও অন্যত্র ক্ষমতাসীন হয়ে যায়। সেই সাথে চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী সহ সকল অর্থনৈতিক লেনদেনের সাথেও সম্পৃক্ত হয়ে যায়। ছাত্র রাজনীতিকে পুঁজি করে ছাত্রনেতারা টেন্ডারবাজী, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, দলীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে তদ্দির করে ব্যবসা করা, কিংবা কাউকে পাইয়ে দিয়ে কমিশন আদায় করা, প্রজেক্টে ব্যাংক ঋণ পাইয়ে দিয়ে কমিশন আদায় করার মাধ্যমে ছাত্রনেতারা আজ বিত্তবান হয়ে উঠেছে। ছাত্র রাজনীতিকে পুঁজি করে অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তোলার বর্তমান এই ঘৃণ্য ধারাটি লক্ষ্য করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান ছাত্র রাজনীতিকে বর্তমান একটি লাভ জনক পেশা হিসেবে অভিহিত করে।[১০] ছাত্রসংগঠনের এভাবে হল দখল ও ক্ষমতায় আসার জন্য বদরুদ্দীন উমর সরাসরি সরকারি দলের সরাসরি অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতাকে দায়ী করেছেন।[১১] এভাবে বিশেষ ছাত্র সংগঠন কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যত্র ক্ষমতায় আসার ব্যাপারটি বাংলাদেশ আমলের বিশেষত্ব বলেও তিনি মন্তব্য করেন।[১২]

ছাত্র রাজনীতিকে বলা হয় জাতীয় রাজনীতির নেতা-কর্মী তৈরির প্ল্যাটফর্ম। বর্তমানে সময়ের জাতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকেই একদা ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। জাতীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা থাকলেও স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে ছাত্র অবস্থাতেই অর্থনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতির কোন স্থান ছিল না।

বর্তমান ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্রনেতারা সম্পূর্ণ অন্য রকম। ছাত্রত্ব টিকিয়ে রাখার এক অভিনব প্রতিযোগিতায় মত্ত আছেন ছাত্রনেতারা। ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব দেবে ছাত্ররা, এটাই স্বাভাবিক এবং সত্য। এক জরিপে দেখা গেছে- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী

ছাত্রদল,[১৩] বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র মৈত্রী, জাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন সহ অধিকাংশ ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ পদে অবস্থানকারী ছাত্র নেতৃবৃন্দের ছাত্রত্ব নেই।[১৪] সম্প্রতি কাউন্সিলের মাধ্যমে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে স্থান প্রাপ্ত প্রায় ২০০ জন ছাত্র নেতার মধ্যে স্বয়ং সাধারণ সম্পাদক সহ ১৫০ জনেরই ছাত্রত্ব নেই। সিনিয়র সহ-সভাপতি, এক নম্বর সাংগঠনিক সম্পাদক সহ দুই ডজন ছাত্রনেতা ব্যবসা, ঠিকাদারীর সঙ্গে জড়িত। বিবাহিত আছেন ৬ জন।[১৫] অন্যান্য ছাত্র সংসগঠনেও এ অবস্থা কম-বেশি বিরাজমান। ফলে মেধা ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি আজ মেধা শূন্য, সন্ত্রাস নির্ভর ও অছাত্রদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমান ছাত্রনেতাদের বিলাসী জীবন সুশীল সমাজের চিন্তার খোরাক। অন্য এক জরিপে দেখা গেছে-অধিকাংশ ছাত্রনেতারা আবাসিক হলের পরিবর্তে থাকেন ভাড়া বাসায়, পাবলিক বাস কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসের পরিবর্তে চলাফেরা করেন নিজস্ব কিংবা অনুগতদের গাড়িতে। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন মোবাইল ফোন।[১৬]

একদিকে ছাত্র রাজনীতিতে অর্থের যোগ, অন্যদিকে স্বার্থপর রাজনীতিকদের হীন স্বার্থে ছাত্রদের নগ্ন ব্যবহার। উভয়ের ফলে ছাত্র রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করছে সন্ত্রাস। ছাত্ররা হাতে নিচ্ছে অস্ত্র। ছাত্র রাজনীতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সহ অবস্থান ও সহনশীলতার নীতি। অভ্যন্তরীণ কোন্দল, হল দখল, পাল্টা দখল, প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যকার সংঘাত ও সংঘর্ষ, খুন, ছিনতাই, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী, দখল ইত্যাদি ছাত্র রাজনীতির বৈশিষ্ট্যে রূপ নিচ্ছে। খুন হচ্ছে একের পর এক ছাত্র। বন্ধ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নষ্ট হচ্ছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। ছাত্রজীবনে নেমে আসছে পাহাড় সম সেশনজট। 'ছাত্র সন্ত্রাস' আজ সমাজের জন্য উদ্বেগের কারণ। ছাত্র রাজনীতিতে মাস্তানদের ভূমিকা ও প্রধান সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের চরম অপরাধ প্রবণতা এবং দুর্নীতি বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়।[১৭] অপর এক জরিপে দেখা গেছে-বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদীল দল) সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সারাদেশে বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠন সমূহ ২৫০টির অধিক সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়েছে। তম্মধ্যে বিএনপি'র ছাত্র সংগঠিন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঘটিয়েছে ৯২টি ছোট-বড় সন্ত্রাসী ঘটনা।[১৮] সর্বশেষ ৮ জুন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র দলের দু'গ্রুপে টেন্ডার দখল নিয়ে সংগঠিত বন্দুক যুদ্ধে ক্রসফায়ারে নিহত হয় সাধারণ ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি।[১৯] কম-বেশি সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে জড়িত। তবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের মধ্যে এ প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। কারণ স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে সিংহভাগ সময় এ দু'টি চাত্র সংগঠনের পিতৃ সংগঠন পালাক্রমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছে। ছাত্র রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান ছাত্র সন্ত্রাসের সমাধান খুঁজতে গিয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১তম সমাবর্তনে রাজনৈতিক দলগুলির সাথে ছাত্র সংগঠন গুলোর সম্পর্ক ছিন্ন করা হলে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের ভিত্তি থাকবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[২০]

সার্বিক বি[illegible] ছাত্র রাজনীতি এখন আর কোন আদর্শ বা স্বপ্নের ব্যাপার নয়। এটা সম্পূর্ণ লাভ-লোকসানের ব্যাপার। তাই এ বিষয়ে ছাত্রনেতাদের প্রকাশ্যে লেজুড়বৃত্তি করতে কোন লজ্জা নেই। এহেন অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক ড. বোরহান উদ্দিন খান ছাত্র রাজনীতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার ও ক্যাম্পাসে সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্ররোচনার বিরুদ্ধে আদালতে রিট আবেদন করেন।[২১] তিনি আবেদনে দন্ড বিধির ১৫৩ (খ)[২২] ধারাটি প্রয়োগের দাবি জানান।

ছাত্র রাজনীতি বর্তমানে ন্যায়নীতি ও আদর্শ বিহীন অবস্থায় ধ্বংসাত্বক ও নিষ্ঠুর রূপ লাভ করেছে। ফলে ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে সারা দেশ প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিক এমন কি সাধারণ মানুষও ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে নানা প্রাকার বিতর্কে লিপ্ত। সুশীল সমাজের একাংশ বিভিন্ন সেমিনারে, বক্তৃতা, বিবৃতিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার দাবি তুলছেন।[২৩] স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় সংসদে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনে সংসদে আলোচনা করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[২৪] একথা সত্য যে, দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের স্বার্থন্বেষী রাজনীতিবিদ সহ বিভিন্ন ব্যক্তির প্ররোচনায় ছাত্র রাজনীতির চরিত্র আজ নিম্নগামী। ছাত্র রাজনীতির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আজ ভীতি ও ঘৃণায় রূপ নিয়েছে। এমতাবস্থায় ছাত্র সন্ত্রাস ও মাস্তানী বন্ধ করার জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার দাবি অগণতান্ত্রিক।[২৫]

একটি স্বাধীন দেশের রাজনীতিতে ছাত্র সমাজের সক্রিয় অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন বিদিত।[২৬] স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে এদেশের ছাত্র সমাজ আন্দোলন করেছে উপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। জাতীয় রাজনীতিবিদরা যেখানে ব্যর্থ, সেখানে ছাত্রনেতারা ছিল পুরোপুরি সফল। তাদের ভূমিকা ছিল পথ প্রদর্শকের ন্যায়। দেশ আজ স্বাধীন। দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ছাত্রদের আন্দোলনের লক্ষ্যও সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাপি ছাত্র রাজনীতির ক্ষয়িষ্ণু অভ্যান্তর

সুস্পষ্ট। কারণ স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির বিশেষত্ব হল জাতীয় রাজনীতিতে রাজনীতিকরা ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে হাতিয়ার হিসেবে ছাত্রদের ব্যবহার করছে। যা সুস্থ ছাত্র রাজনীতির প্রধান অন্তরায়।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১. ড. মোহাম্মদ হাননান, "একুশ শতকের ছাত্র আন্দোলন", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১ জানুয়ারি ২০০১ পৃ. ১৮।

২. Md. Abul Kashem, *History of the student Movement of East Pakistan* (Now Bangladesh) 1947-69 : *An Analytical Study,* Unpublished Ph. D. thesis, Jadavpur University, India - 1992. 7.24
নোট ঃ সরকারি সার্কুলারে বলা হয়, যদি কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তার ছাত্র-ছাত্রীকে স্বদেশী আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করতে না পারে তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে দেয়া সরকারি মঞ্জুরী বন্ধ করা হবে এগং তার এ্যাফিলিয়েশন বাতিল করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেয়া হবে।

৩. নোট ঃ ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (DUCSU), নির্বাচনের প্রাক্কালে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র সমন্বয়ে গঠিত 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট' বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতিতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

৪. আবুল কাশেম, "বাবট্টির শিক্ষা আন্দোলন ঃ প্রকৃতি ও পরিধি" *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৩-২৪, ১৪০২-০৪, পৃ. ১২।

৫. ড. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, রংপুর, টাউন স্টোর্স, ১৯৯৮, পৃ. ৫৮।

৬. মোঃ রেজাউল করিম, "বাংলাদেশে' ৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ভূমিকা" *ইতিহাস অনুসন্ধান ১৫*, কলিকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১, পৃ. ৯২৬-৯৩৩।

৭. নোট ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অবশ্য প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে স্বীকৃত। দেখুন; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের খসড়া গঠনতন্ত্র, অনুচ্ছেদ-২৩।

৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ এপ্রিল, ২০০২।

৯. ড. মুহাম্মাদ জাফর ইকবাল, "রাজনীতি ও ছাত্র রাজনীতি", *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০১।

১০. *সাপ্তাহিক চলতিপত্র*, ঈদ সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ. ১১।

১১. বদরুদ্দীন উমর, "ছাত্র রাজনীতির মাস্তানেরা", *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ জুন, ২০০২।

১২. ঐ

১৩. নোট ঃ ১৭ নভেম্বর, ২০০১ তারিখ থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সকল কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক,* ১৮ নভেম্বর, ২০০১।

১৪. *বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস,* বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৫, নভেম্বর, ২০০২ (২), পৃ. ৪২।

১৫. *দৈনিক যুগান্তর,* ৮ এপ্রিল, ২০০২।

১৬. *সাপ্তাহিক চলতি পত্র,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

১৭. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত।

১৮. মতিউর রহমান, "এ কোন রাজনীতি, কিসের ছাত্র রাজনীতি?" *দৈনিক প্রথম আলো,* ১০ জুন, ২০০২।

১৯. The *Daily Star,* 9 June, 2002.

২০. *বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস,* বর্ষ-১৮, সংখ্যা-১০, ফেব্রুয়ারি, ২০০১ (২), পৃ. ৫।

২১. *সংবাদ,* ১১ মে, ২০০০।

২২. নোট ঃ দন্ড বিধির ১৫৩ খ) ধারায় বলা হয়, যে ব্যক্তি কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে বা সংকেত সমূহের বা দৃশ্যমান প্রতীক সমূহের সাহায্যে বা প্রকারান্তে যে কোন ছাত্র বা ছাত্রী শ্রেণী বা ছাত্রদের ব্যাপারে আগ্রহশীল বা তাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানকে এমন কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের জন্য প্ররোচিত করে বা প্ররোচিত করার উদ্যোগ করে যা গণ শৃঙ্খলা নষ্ট বা খর্ব করে অথবা যার গণ শৃঙ্খলা নষ্ট বা খর্ব করার সম্ভাবনা, রয়েছে সে ব্যক্তি কারাদন্ডে যার মেয়াদ ২ বছর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা বা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হবেন। দেখুন; অধ্যাপক এ. এ. খান, দন্ডবিধি, ঢাকা; আলম বুক হাউস, মে-১৯৯৫, পৃ. ১১৫।

২৩. *দৈনিক প্রথম আলো,* ২৩ আগষ্ট, ২০০১, দৈনিক মাতৃভূমি, ৫ ডিসেম্বর, ২০০১।

২৪. *দৈনিক মাতৃভূমি,* ৫ ডিসেম্বর, ২০০১।

২৫. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত।

২৬. ড. আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

সারাংশ

চট্টগ্রাম ও বৌদ্ধ সমাজ (১৮৬৪-২০০০ খ্রিঃ)

শুভাশিস বড়ুয়া

বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামের অবস্থান দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তসীমায় ২০°-৩৫" থেকে ২২°-৫৯" উত্তর দ্রাঘিমাংশ এবং ৯১°-১৭" থেকে ৯২°-২২" পূর্ব অক্ষাংশ। আয়তন প্রায় ২৭৮৭ বর্গ মাইল। দৈর্ঘ প্রস্থ পরিমাপে চট্টগ্রাম জিলা উত্তর-দক্ষিণ দৈর্ঘ টেকনাফ থেকে রামগড়ের সন্নিকটবর্তী ফেনীনদীর মধ্যসীমা পর্যন্ত ১৬৬ মাইল। প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিম উত্তর পাশে ৩০ মাইল। দক্ষিণ পাশে ৪ মাইল। সীমানার পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর এবং ফেনীনদী। পূর্বে চট্টগ্রামের বিস্তৃত পর্বত ও ব্রহ্মদেশের আরাকান। উত্তরে ফেনীনদী, দক্ষিণে নাফ নদী। আজ হত ৯৭ বছর আগে এদেশের পন্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, সু-প্রাচীন কালে চট্টগ্রাম নামে ভূ-খন্ডের অস্তিত্ব ছিল না। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভাষার দুর্বোধ্যতা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের এই অঞ্চল সম্পর্কে এক অবজ্ঞামিশ্রিত কৌতূহল জাগিয়ে রেখেছে।

বৈচিত্র্যময় চট্টগ্রামের নাম বৈচিত্র্যেভরা। চট্টগ্রাম, চাটিগাঁও, চাটগাঁও নামে পরিচিত। বৌদ্ধদের ধারণা চট্টগ্রাম নামটা চৈত্য কেয়াং বা চৈত্যগ্রাম শব্দের অপভ্রংশ, চৈত্য গ্রাম অর্থ বৌদ্ধ কীর্তিস্তম্ভের আবাসস্থল। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা 'স্যার উইলিয়ম জোন্‌স'র অভিমত - এই অঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দর ক্ষুদে পাখি 'চট্‌গা' থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি।

১৯৯১ সালে জনগণনানুসারে চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের সংখ্যা ১,০৬,৫৯৫ জন। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায় ''বড়ুয়া'' উপাধিধারী। তাদের মধ্যে চৌধুরী, তালুকদার, সিকদার, মুৎসুদ্দী ইত্যাদি উপাধিও দেখা যায় এবং কুমিল্লা অঞ্চলে সিংহ উপাধিধারী বৌদ্ধও আছে। 'বড়ুয়া' শব্দটি বৃজি + আ, বজ্জি + আ অর্থাৎ বড় + আর্য > আরিয়া থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায় সাধারণত 'মগ' নামে খ্যাত। 'মগ্‌গদ' কথাটিরই অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার অর্থ মগধ হইতে আগত। আরাকানের প্রাচীন রাজাদের রাজোয়াং ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী বলা যায় ১৪৬ খ্রিঃ মগধের চন্দ্র সূর্য নামক এক সামন্ত রাজা চট্টগ্রামের আরাকানে রাজ্য স্থাপন করেন। মগধাগত বৌদ্ধ ও চট্টগ্রামের আরকানী বৌদ্ধদের রক্ত সংমিশ্রণে প্রথম চট্টগ্রামে বৌদ্ধ সমাজও জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম কোন সময়ে প্রচারিত হয়েছিল

তা নির্ণয় করা সহজ নয়। ঐতিহাসিক পূর্ণচন্দ্র চৌধুরীর মতে, খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে মগধ দেশ হতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকগণ পূর্ব দেশে এসে ধর্ম প্রচার করেন। চৈনিক পরিব্রাজক 'হিউয়েনসাং' (৬২৯-৬৪০ খ্রিঃ) নিজের ভ্রমণ বৃত্তান্তে শ্রীচট্টল সমতটের পূর্ব দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বহু সংখ্যক চৈত্যবিশিষ্ট পার্বত্যস্থান বলে বর্ণনা করেছেন। তিব্বতীয় পন্ডিত লামাতারনাথের "বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস সূত্রে জানা যায় খ্রিস্টিয় নবম শতকে চট্টগ্রামে পন্ডিতবিহার বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্থাপিত হয়েছিল।"

তারপর কয়েক শতাব্দী চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম প্রায় ম্রিয়মান ছিল। ১৮৬৪ সালে আরাকান থেকে সারমেধ মহস্থবির এসে পুনরায় বিশুদ্ধ থেরবাদী ধর্মমত প্রচার করেন। বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বৌদ্ধগৃহী ও ভিক্ষুদের একই দৃষ্টিতে বিচার করেন। সংসার ত্যাগী বৌদ্ধভিক্ষু সমাজের জন্য যা প্রযোজ্য গৃহস্থ সমাজের পক্ষে তা প্রযোজ্য হতে পারে না। হিন্দুদের ন্যায় চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সমাজের মধ্যে সাধভক্ষণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন বা দীক্ষা পূজা পার্বন, বিবাহপদ্ধতি ইত্যাদি ক্রিয়াকান্ডের প্রায় অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়।

সমাজের গৃহী বৌদ্ধদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। সবাই থেরবাদ ধর্মমতই মেনে চলেন। মাছ ও মাংস খাওয়া বৌদ্ধ সমাজে নিষিদ্ধ নেই, কারণ বৌদ্ধধর্মের আভিযান হচ্ছে হত্যার বিরুদ্ধে, আমিষাহারের বিরুদ্ধে নয়। উৎসব ও পূজা পার্বন যে কোন ধর্মের অঙ্গ, চট্টগ্রামের বাঙালী বৌদ্ধ সমাজ ও সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও পূজাপার্বনাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বুদ্ধপূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা বা ছাদাং, নববর্ষ, চৈত্রসংক্রান্তি বা বিষু বুহচক্রমেলা, কল্পতরু উৎসব ইত্যাদি তবে কঠিনচীবর দানোৎসবই বৌদ্ধ সম্প্রদায় জাঁকজমক ভাবে পালন করে থাকেন। বৌদ্ধ সমাজে নামন্ত এবং চলন্ত দুই প্রকার বিয়েই প্রচলিত আছে। নামন্তবিয়েকে শৌঙ্কবিয়ে এবং চলন্ত বিয়েকে ব্রাহ্মবিয়ে বলে। তবে ভিক্ষুদের ওয়া বা বর্ষাযাসের মধ্যে অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে (কোজাগরী) আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিনমাসের মধ্যে বিয়ে হয় না। বিয়ের দিন ঘর দেবতার পূজো করা উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ। আবার চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সমাজে বিধবাবিবাহ, বিবাহ ছিন্ন, সধবার পুনর্বিবাহ এবং স্থল বিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে নূতন করে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর শুধু ধর্ম বিষয়ে নয়, পরিমার্জিত শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির সূত্রে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সমাজ অনেক উন্নতি লাভ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি প্রমাণ্য দলিল ঃ সাপ্তাহিক 'মুক্তিযুদ্ধ'

মাহবুবুল হক

অতীত ও সমকালের ধারাবাহিকতায় সেতুবন্ধন রচনা করে ইতিহাস। কিন্তু অনেক সময় তাতে ফাঁক থেকে যায় - কখনো বস্তুনিষ্ঠ উপাদানের অভাবে, কখনো বা উদ্দেশ্যমূলক বিকৃতির কারণে। তখন ইতিহাস হয়ে পড়ে আচ্ছন্ন, খণ্ডিত বা অতিশয়িত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার ঘটছে। সেদিক থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার বেলায় প্রামাণ্য উপাদানের গুরুত্ব অপরিমেয়। এ ধরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'মুক্তিযুদ্ধ'। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭১-এর একুশে জুলাই। সম্ভবত ২১তম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

এই পত্রিকার কপি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। প্রাপ্ত ১৮টি সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ, সম্পাদকীয়, নিবন্ধ, ভাষ্য ইত্যাদিতে মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিযুদ্ধে অংশরত রাজনৈতিক শক্তিসমূহের কর্মতৎপরতা, ভারত ও বহির্বিশ্বের ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।

এ সব বিষয়ে আলোকপাত করা হবে উপস্থাপিতব্য প্রবন্ধে।

নারী আন্দোলন ও কবি হোসনে আরা

সামিনা সুলতানা নিশাত

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নারী আন্দোলনের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় রাজশাহীর রানী ভবানী ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই, চট্টগ্রামের প্রীতিলতা ওয়াদ্দোদার প্রমুখ বীর নারীগণের গৌরবময় সংগ্রামে।

উনিশ শতকে অবিভক্ত বাংলার অবহেলিত নিপীড়িত নারী সমাজের মুক্তির জন্য ও নারীকে শিক্ষিত করে তোলায় যাদের অবদান অবিস্মরণীয় তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর অন্যতম। তাঁদের প্রচেষ্টায় সতীদাহ ও বাল্য বিবাহ আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়।

কিন্তু মুসলিম সমাজের পারিবারিক সম্পর্ক, তালাক, সন্তানের অভিভাবকত্ব মুসলিম ধর্মীয় আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হত। ফলে ব্রিটিশ আইন দ্বারা যখন হিন্দু নারী নাবালক

সন্তানের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার পেল, তখন মুসলিম নারী সেরকম অধিকার থেকে বঞ্চিত রইলো।

শিক্ষার ব্যাপারেও মুসলিম নারীরা পিছিয়ে থাকল। বাংলার ব্যাপক নারী শিক্ষার সুযোগ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায়। এসময় মেয়েদের জন্য বহু স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০০ সালের মধ্যে ৩৭ জন নারী বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে একজনও মুসলিম নারী ছিলেন না।

অবশ্য ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কতিপয় মুসলিম নারী প্রবল প্রতিরোধের মধ্যেও শিক্ষা অর্জনে প্রয়াসী হয়েছেন। স্বদেশী ও অসহযোগী আন্দোলনের বিপ্লবী আবহাওয়ার মধ্যে বেগম রোকেয়া অবরোধবাসিনীর মুক্তির জন্য সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন।

এ পর্যায়ে প্রবন্ধে এমন একজন মহিয়সী নারীর বক্তব্য রাখা হবে যার অবস্থান হওয়া উচিত মুসলিম নারী জাগরণে ও আন্দোলনে বেগম রোকেয়ার মত যস্বষী নারীদের পার্শ্বে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু লেখা হয়নি। তাঁর জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা তাঁকে মুসলিম নারী আন্দোলনের অগ্রপথিক করেছে, তা প্রবন্ধে বিদ্ধৃত করা হয়েছে।

হোসেন আরা দীর্ঘকাল রাজনীতি ও সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সক্রিয়ই ছিলেন না, ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। দেশ বিভাগের পূর্বে ঊনিশ শতকের ত্রিশের দশকে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের আন্দোলন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। একদা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেও সম্পৃক্ত ছিলেন। এক পর্যায়ে ব্রিটিশ শাসনামলে কারাগারে অন্তরীণ হন। বিভাগত্তোর পাকিস্তান আমলে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তিনি অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন।

কলকাতায় মুসলিম মহিলাদের পত্রিকা 'বেগম' প্রকাশিত হলে হোসনে আরা নিয়মিত ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতেন। তাঁর লেখনী মুসলিম নারী সমাজে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ সালে কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন হোসনে আরা। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে স্বামীর প্রকাশিত পত্রিকার ব্যবস্থাপনার সফল দায়িত্ব প্রতিপালন করতেন তিনি। '৫৪ সালে ঢাকায় প্রথম মহিলা ক্লাব 'বেগম ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হলে ৭/৮ জন বিদগ্ধ নারীদের সাথে হোসনে আরা ক্লাবের সক্রিয় সদস্য হলেন। ক্লাবটি পূর্ব পাকিস্তানের নারী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে হোসনে আরা রেডক্রসের কাপড় সেলাইয়ের প্রকল্পে সেলাই করে যে অর্থ উপার্জন করতেন, তা মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, পেট্রোল ইত্যাদির

জন্য ব্যয় করতেন। জাতি ধর্মের উর্দ্ধে ছিল তাঁর অবস্থান। তাঁর গৃহে আশ্রয় পেয়েছে অসংখ্য অনাথ হিন্দু কন্যা। তাদের লালন পালন ও বিবাহ দেবার মত কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ১৯৬১ সালে তিনি 'বাংলা একাডেমী' এবং '৯২ সালে 'শিশু একাডেমী' পুরস্কারে ভূষিত হন। '৯৯ সালের মার্চে এই মহিয়সী নারী দীর্ঘ রোগভোগের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জাতি হিসেবে আমরা অকৃতজ্ঞ। তাই কালোত্তীর্ণ বহু মহামানব, বহু মহিয়সী নারীকে আমরা তাঁদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা জানাতে কার্পণ্য করি। মরণোত্তর হলেও হোসনে আরাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান জানানো প্রয়োজন। আগামী প্রজন্মের নিকট দেশের ও সমাজের ক্রান্তিলগ্নে এই বিদগ্ধ, স্বাধীনচেতা, জনদরদী হোসনে আরার গৌরবগাথা পৌঁছে দিতে হবে। এটাই তাঁর স্মৃতির প্রতি দেশ ও জাতির কর্তব্য। ১৯৩২ সালে মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত হয়েওষোল বছরের হোসনে আরা পর্দা প্রথার ভ্রুকুটি উপেক্ষা করেছেন। দৃপ্ত পদক্ষেপে রাজপথে নেমে ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে কারাবরণ করেছেন। বাঙালী মুসলমান নারীদের মধ্যে তিনি একক, অনন্য।

আওয়ামী মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি

মোঃ আবদুল্লাহ আল-মাসুম

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশ তৎকালীন পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় আওয়ামী মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ দলটি ছিল ব্রিটিশ শাসনোত্তর পূর্ব বাংলার প্রথম নতুন এবং সরকারী বিরোধী রাজনৈতিক দল। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটলে মুসলিম লিগ পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতায় বসে মুসলিম লিগ সরকার পূর্ব বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করলে লিগের মধ্যকার মতভেদ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। যার ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র ২২ মাসের মধ্যে মুসলিম লিগ বিরোধী পূর্ব বাংলার একদল সুযোগ্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অধীনে আওয়ামী মুসলিম লিগের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ দলের 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লিগ নামে পরিবর্তন করে এটিকে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ দলে পরিণত করেন। এ দলটিই পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাসহ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে অদ্যাবধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

লু-কাউ-চিয়াও ঘটনা ও এশিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধঃ একটি পর্যালোচনা

বকুল চন্দ্র চাকমা

পঁয়ষট্টি বছর আগে ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই এর রাত্রে ইয়াংটিং নদীর উপর লু-কাউ-চিয়াও বা মার্কোপোলো সেতুর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ছোট শহর ওয়ানপিং-এ জাপানের আক্রমণ শুধু জাপানীদের বিরুদ্ধে চীনের প্রতিরোধ যুদ্ধ নয় (পাশ্চাত্যে দ্বিতীয় চীন-জাপানের যুদ্ধ হিসাবে পরিচিত) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও সূচনা করে।[১] উত্তর চীনে পেইপিং-এর কাছাকাছি ওয়ানপিং একটি কৌশলগত রেল সড়কের সংযোগস্থল; ইহা পেইপিং থেকে দক্ষিণ দিকে ইয়াংসি নদীর উপর হ্যানকাউ-এ দক্ষিণ মধ্য চীনের সড়কের সংযোগস্থল পর্যন্ত প্রধান রেললাইন পেইপিং-হ্যানকাউ লাইনের সাথে সমুদ্র ও ঐতিহ্যগত উত্তরাঞ্চলীয় রাজধানীর পেইপিং-তিয়েনসিন লাইন যুক্ত করে।[২]

পাশ্চাত্যে সাধারণত ১৯৩৭ সালে নয়, ১৯৩৯ সালেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। অনেক আমেরিকান এই যুদ্ধ ১৯৪১ সালে যুদ্ধ হয়েছে বলে মনে করে। দ্বিতীয় চীন-জাপানের যুদ্ধকে (১৮৯৪-৯৫ সালের চীন জাপানের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধকে উপেক্ষা করে এই যুদ্ধকে প্রায়ই সাদামাটাভাবে চীন-জাপানের যুদ্ধ হিসাবে উল্লেখ করা হয়) মূলত স্থানীয় যুদ্ধ হিসাবে অনেকখানি বিবেচনা করা হয়। অবশেষে এই যুদ্ধ দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিসমূহের যুদ্ধের সাথে অঙ্গীভূত হয়ে যায়।[৩]

এমন কি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের প্রস্তাবনায় ও প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের সম্মতিতে ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সর্বাধিনায়ক চিয়াং কাই-শেক চীনের যুদ্ধক্ষেত্রে মিত্র শক্তির সকল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হওয়ার পরেও চীনের যুদ্ধকে প্রধান গুরুত্ব দেয়া হয়নি।[৪] সম্মিলিত সামরিক প্রধান কর্তৃক সমন্বিত ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্ব ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকায় জার্মানি ও ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধকে প্রথম অগ্রাধিকার দেয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কৌশলগত পরিকল্পনায় এবং লোকবল আর সাজ সরঞ্জাম সরবরাহে পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে জাপানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ তা তৃতীয় অগ্রাধিকার পায়। ইঙ্গ মার্কিন নেতৃত্বের যুদ্ধকালীন সিদ্ধান্তে ফ্যাসিস্ট ইতালি ও বিশেষত হিটলারের Third Reich এর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পেছনে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ ইতিহাসে ইউরোপের যুদ্ধ সম্পর্কে ততোধিক গুরুত্ব পাওয়াও অনেকখানি দায়ী। যুক্তরাষ্ট্রে জার্মান বা অন্য ইউরোপীয় ভাষা

শেখার তুলনায় খুব কম আমেরিকান চীনা কিংবা জাপানী ভাষা শেখার ফলে এই গুরুত্ব জোরদার হয়। কিছুটা গুরুতর ভাষাগত তফাতের কারণে পাশ্চাত্যে ইউরোপের যুদ্ধের তুলনায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধ সম্পর্কে মূল গবেষণা কম হয়।

১৯৩৯ সালে কিংবা ১৯৪১-ও নয়, ১৯৩৭ সালে শুরু হওয়া যুদ্ধের বৈশ্বিক ব্যাপ্তিকে উপলব্ধি করতে মৌলিক ব্যর্থতার সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে দ্বিতীয় চীন-জাপানের যুদ্ধের অপেক্ষাকৃত উপেক্ষার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

১৯৩১ সালের মুকডেন ঘটনার ১০ বছরেরও কম সময়ে ১৯৩৯ সালে হিটলার কর্তৃক শুরু করা ইউরোপীয় যুদ্ধ ১৯৪১ সালের শেষ দিকে জার্মানির সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ ও জাপানের পার্ল হারবার, হংকং এবং মালয় আক্রমণের মাধ্যমে বৈশ্বিক আকার ধারণ করে।১৯১৫ সালের জাপানের একুশ দফা দাবি থেকে শুরু করে আগ্রাসন ও উসকানীমূলক কর্মকান্ডের দীর্ঘ ঘটনার পর সেই মুকডেন ঘটনা। মুকডেন ঘটনার পর চীনের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশের উপর জাপানের নিয়ন্ত্রণ দ্রুত সুদৃঢ়ীকরণ সম্পন্ন হয় এবং মানচুকো তাঁবেদার রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুকডেন ঘটনা মাঞ্চুরিয়া ঘটনা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

মাঞ্চুরিয়া ঘটনা পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখন্ডে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বেপরোয়া প্রতিযোগিতায় সঙ্কটময় পর্যায়ের সূচনা করে। এই প্রতিযোগিতায় মূল অংশগ্রহণকারীরা ছিল জাপানী, রাশিয়ান, তাদের চীনা কমিউনিস্ট মিত্র এবং চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বে চীনা জাতীয়তাবাদীরা। চীনের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নয়, জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জাতীয়তাবাদীদের মিত্র হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪০ দশকের প্রথম দিকে কিছুটা অনিচ্ছাকৃতভাবে এই প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে যুক্তরাষ্ট্র চীনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৫]

১৯৪৫ সালে চীন ও সম্মিলিত জাতিসমূহের জাপানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায়। তবে ইহা চীনের মূল ভূখন্ডের জন্য প্রতিযোগিতার পরিণতি নিষ্পত্তি করে নাই। ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র এই প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাহারের শেষ পর্যায় ঘটে যখন যুক্তরাষ্ট্র বার্লিন অবরোধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বার্লিন আকাশাবতরণ ঘটিয়ে ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়। সে একই বছরে যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত সামরিক প্রধান প্রতিরক্ষা সচিব জেমস ভি. ফরেস্টলের সম্মতিতে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবাহিনীর অধিনায়ককে নির্দেশ দেয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের নৌঘাঁটি সিংটাউ যদি চীনের কমিউনিস্টদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে সেই ঘাঁটি রক্ষার জন্য তিনি যেন চীন প্রজাতন্ত্রের সামরিক বাহিনীর সাথে যোগ দেন। যুক্তরাষ্ট্র একই সাথে ইউরোপ ও চীনের মূল ভূখন্ডে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় পররাষ্ট্র সচিব জর্জ সি. মার্শাল সিংটাউ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী প্রত্যাহারের

আদেশ দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রুম্যানকে রাজি করান।[৮] পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতি কোরিয়া ও ইন্দোচীনের যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে।

সাধারণ ভাষায় এই হলো এশিয়ার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উপলব্ধি করার ইতিহাস প্রসঙ্গ। সুতরাং এশিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে চারটি প্রধান ইস্যু বা সমস্যার জটিলতার উপর আলোকপাত করার প্রয়োজন রয়েছে। এইগুলিই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়, তবে প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায় বলে এইগুলির উপর জোর দেয়া প্রয়োজন।

চারটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি শুরুতেই আলোচিত হয়েছে: ১৯৩৭ সালে শুরু ও ১৯৪৫ সালে শেষ হওয়া দ্বিতীয় চীন-জাপানের যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নয়, ইহা পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার একটি চূড়ান্ত পর্যায়ও বটে। এই প্রতিযোগিতা ১৯৩৭ সালের আগে শুরু হয় এবং ১৯৪৫ সালের পরেও চলতে থাকে।

এশিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্বিতীয় চীন-জাপানের যুদ্ধ বা জাপানের বিরুদ্ধে চীনের প্রতিরোধ যুদ্ধ) উপলব্ধি করতে হলে চীনের সমাজের ও বিপ্লব পরবর্তী (১৯১১) রাষ্ট্র কাঠামো সম্বলিত- ঐতিহাসিক বর্ণনার গুরুত্ব রয়েছে। চীনের কোন নেতা কখনও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কিংবা সামরিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার অবস্থায় ছিল না। ইহা বললে অত্যুক্তি হবে না যে যুদ্ধকালীন নেতা হিসাবে সর্বাধিনায়ক চিয়াং কাই-শেকের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বা যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী চার্চিলের অবস্থানের সাথে তুলনাই হয় না। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে তাঁরা নিজ নিজ বলয়ে অপ্রতিদ্বন্দী কর্তৃপক্ষ ছিলেন। চিয়াং কাইশেকের অবস্থা তুলনা করা যেতে পারে পরের মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ের পবিত্র রোমান সম্রাটের অবস্থার সাথে।

বিপ্লবের পরে চীন প্রজাতন্ত্রের দুর্বলতা চীনের নেতৃত্বের মধ্যে নিহিত ছিল না, ছিল চীনের রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে। আধুনিক পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে বিচার করলে ঐতিহ্যগত চীনের রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল দুর্বল। সুতরাং ঐ দুর্বলতা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা সান-ইয়াৎ-সেন কিংবা তাঁর উত্তরসূরী ও নির্বাহক চিয়াং কাই-শেকের উপর বিপ্রতীপভাবে প্রতিফলিত হয়নি; অন্যদিকে যে পরিস্থিতিতে তাঁরা শ্রম দিয়ে রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে যা অর্জন করেছিলেন তা ছিল বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদানগুলির অন্যতম।

তবে এটা সত্য যে, ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর এবং বিশেষত ১৯২০ দশকের শেষের দিকে চীনের আনুষ্ঠানিক একত্রীকরণের পর থেকে নাটকীয় উন্নতি সত্ত্বেও চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব বাস্তবিকপক্ষে আঞ্চলিক কর্তৃত্বের দ্বারা তীব্রভাবে সঙ্কুচিত ছিল। কতকগুলি কার্যত স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশের নেতাদের নানকিং-এ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের প্রতি অনুগত থাকার প্রবনতা ছিল না।

চীনের নেতার ক্ষমতার তীব্র সীমাবদ্ধতা প্রামাণিক দলিলের অন্তর্ভুক্ত-যদিও এই দলিলকে প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়। অনেক বর্ণনায় ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত "নানকিং দশক" কে শান্তিপূর্ণ সুদৃঢ়ীকরণের যুগ হিসাবে উল্লেখ আছে। এই সময়ে উত্তরাঞ্চলীয় অভিযানের মাধ্যমে চিয়াং কাই-শেক পরিচালিত কুওমিনটাং-এর নেতৃত্বে চীন প্রজাতন্ত্রের সরকারের সুদৃঢ়ীকরণ সম্পন্ন হয় এবং চিয়াং কাই-শেক জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সক্ষম হন। এই দশকে চীনকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তব হলো এই যে, সেই তথাকথিত "স্বর্ণযুগ" ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে নিরবচ্ছিন্ন গৃহযুদ্ধ। এই সময়ে চিয়াং কাই-শেককে বেশ কয়েকটি অভিযানে ব্যস্ত থাকতে হয়: ১৯২৯ সালের মার্চ-এপ্রিলে কোয়াংশি জেনারেলদের বিরুদ্ধে; ১৯২৯ সালের মে-অক্টোবরে ফেং ইউ-সিং-এর বিরুদ্ধে; ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩০ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত সময়ে চেং ফা-কুই ও তেং শেং-চি-এর বিরুদ্ধে; ১৯৩০ সালের এপ্রিল-সেপ্টেম্বরে ওয়াং চিং-উই, ফেং ইউ-সিং, ইয়েন সি-শ্যানদের জোটের বিরুদ্ধে; এবং ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযানের মধ্যে পঞ্চম অভিযানে সরকার দশ লক্ষ লোক নিয়োগ করেছিল।[৭]

১৯৩৬ সালের শেষের দিকে চিয়াং কাই-শেক তাঁর ষষ্ঠ এবং শেষ অভিযান পরিচালনা করেন চীনের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। চীনের একদিক থেকে অন্যদিকে তাদের বিতাড়িত হওয়ার ঘটনাই ইতিহাসে "লং মার্চ" হিসাবে পরিচিত। কিন্তু তাদেরকে তাইপিংদের মতো ভাগ্য বরণ করতে হয়নি শুধুমাত্র তাদের যুদ্ধ পরিচালনা ও পরিকল্পনার দক্ষতার কারণে।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসের দুইজন উচ্চ পদস্থ সামরিক জেনারেল কর্তৃক চিয়াং কাই-শেক বন্দী হন। পরিভাষাগতভাবে তারা ছিল অধঃস্তন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল তাদের নিজ নিজ ক্ষমতার ভিত্তি নিয়ে শক্তিশালী সেনাধ্যক্ষ। এই "সিয়ান বিদ্রোহ" চিয়াং কাই-শেকের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারত। কিন্তু তিনি শুধু মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হননি, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ভক্তিও উৎসাহ সঞ্চারের ক্ষমতা প্রদর্শন করে একজন অভ্যুত্থানকারীকে আত্মসমর্পণ করাতে সক্ষম হন। কিন্তু ইতিহাসের গতি পরিবর্তন হলো। চিয়াং কাই-শেক জাপানের সাথে যুদ্ধের আগে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তাঁর পরিকল্পিত অভিযান "সিয়ান বিদ্রোহ" দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয়। ঐ সময় হয়তো তিনি সাফল্য লাভ করতে পারতেন।

এশিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চিয়াং কাই-শেকের যুদ্ধ কৌশল ঐ যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রথম ছয় মাস তিনি এমনভাবে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন যে, জাপানের দ্রুত, চূড়ান্ত বিজয়ের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর যুদ্ধ কৌশল চীনকে মিত্র বাহিনী এসে চীনের অস্তিত্ব রক্ষা ও জাপানের বিরুদ্ধে বিজয় সুনিশ্চিত না করা পর্যন্ত টিকিয়ে

রেখেছিল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জাপান ওয়ানপিং-এ প্রধান রেলসড়ক সংযোগস্থল আক্রমণের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু করেছিল। এই ওয়ানপিং-এ তিয়েনসিনের সমুদ্র বন্দর থেকে পেইপিং এবং দক্ষিণ-কেন্দ্রীয় চীন থেকে রেল লাইন মিলিত হয়েছে। জাপানীদের পরিকল্পনা ছিল তাদের মূল সৈন্য সমাবেশ পেইপিং-হ্যানকাউ-ক্যান্টন রেলসড়ক বরাবর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর করানো। হ্যানকাউ হস্তগত করার মাধ্যমে জাপানীরা ইয়াংসি নদী বরাবর দক্ষিণ-কেন্দ্রীয় চীনের প্রধান পূর্ব-পশ্চিম যোগাযোগের লাইন বিচ্ছিন্ন করবে এবং চীনাদেরকে পশ্চিমদিকে অভ্যন্তরে স্থানান্তরে বাধাগ্রস্থ করবে। তাছাড়া জাপানীদের দক্ষিণদিকে অগ্রসরকে বাধা প্রদানরত চীনের সেনা বাহিনীকে উত্তরমুখী করে পূর্ব-পশ্চিম যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করতে হবে। জাপানীরা তাদের আক্রমণকারী ইউনিটগুলিকে ডানপার্শ্বের পশ্চিমে সমাবেশ করে চীনের বামপার্শ্বের সেনা বাহিনীকে পেছনে তাড়িয়ে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হবে। এর ফলে চীনের সৈন্য বাহিনীকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে সমুদ্রের দিকে যেতে বাধ্য করবে।

যদি আক্রমণকারীদেরকে দক্ষিণদিকে উত্তর-দক্ষিণ রেলপথ বরাবর অগ্রসর, হ্যানকাউতে চীনকে বিভক্তিকরণ এবং চীনের বামপার্শ্বের সেনাবাহিনীকে ফরমোজা প্রণালীর দিকে ফিরিয়ে দেয়াকে প্রতিহত করা না যায় তাহলে জাপানীরা যা চেয়েছিল সেইভাবে পশ্চাদপসারণরত চীনের সেনাবাহিনী চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হবে। এটা সম্ভব হলে চীন-জাপানের যুদ্ধ হয়তো এক বছরের চেয়ে বেশি দীর্ঘায়িত হতো না। কিন্তু সর্বাধিনায়ক চিয়াং কাই-শেকের দূরদর্শী যুদ্ধ কৌশলের কারণে চীন এই দূর্যোগ থেকে রক্ষা পায়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাপানীদের অগ্রসরের লাইন বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে চীনের সেনা বাহিনী নিয়োগ করে সরাসরি বাধা প্রদানের মাধ্যমে জাপানীদের দক্ষিণদিকে অগ্রসরকে গতিরোধ করতে যে সম্পদের প্রয়োজন তা চীনের নেই। সেইভাবে তাদের মোকাবিলা করতে গেলে তাদের ফাঁদে পড়তে হতো। তার পরিবর্তে চিয়াং কাইশেক জাপানীদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করাতে চেষ্টা করেন। ব্যাপক আকারে ভিন্নমুখীকরণের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে তাদের অগ্রসরের লাইন নব্বই ডিগ্রী ঘুরিয়ে দিতে সফল হয়েছিলেন। ফলে তারা উত্তরদিক থেকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর না হয়ে বরং পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। তিনি পেইপিং-হ্যানকাউ-ক্যান্টন রেলসড়ক বরাবর চীনকে দুইভাগে ভাগ করতে জাপানকে প্রতিহত করতে সক্ষম হন। তাছাড়া জাপানীদের প্রস্থানের দিক এবং আক্রমণের গতিপথ পরিবর্তনের দ্বারা অমূল্য মানব ও পার্থিব সম্পদ চীনের অভ্যন্তরে অপসারণ করা সম্ভব করে তোলে।

১৯৩৭ সালের ১৩ই আগস্ট কুওমিনটাং-এর মহাপরিচালক হিসাবে চিয়াং কাই-শেকের সভাপতিত্বে চীন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার পর

সর্বাধিনায়ক চীনের বিমান বাহিনীর সকল প্রাপ্তিসাধ্য বিমানগুলিকে সাংহাই অঞ্চলে সমাবেশ করার আদেশ দেন। পরের দিন ১৪ই আগস্ট চীনের বৈমানিকেরা দশ দিনের বিমান আক্রমণ শুরু করে ঐ অঞ্চলে অনেক জাপানী বিমানের ক্ষতিসাধন করে; বিশেষ করে দুইটি অভিজাত নৌবাহিনীর বিমান চালনা ইউনিট ধ্বংস সাধন করে। এই বিমান আক্রমণ জাপানীদেরকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দেয় এবং একই সঙ্গে সাংহাই অঞ্চলে জাপানী অবস্থানের উপর স্থল আক্রমণ চালানো হয়। এই অঞ্চলে জাপানীদের বিপুল সংখ্যক সেনা ও নৌবাহিনী ছিল।

এইভাবে উত্তর চীনে জাপানের আক্রমণের পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে চিয়াং কাই-শেক পূর্ব চীনে দ্বিতীয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষতিকর আক্রমণের দ্বারা জাপানীদের বিস্ময় সৃষ্টি করেন। সম্মুখ সমরে তাঁর বাহিনী জাপানীদের এত প্রচন্ড ক্ষতি সাধন করে যে জাপানের উচ্চ মহল যুদ্ধের পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। জাপানীরা উত্তর চীন থেকে বিপুল সংখ্যক সৈন্য এনে পূর্ব চীনে মোতায়েন করে। মাতৃভূমি থেকে আরও সৈন্য আমদানি করে অতিরিক্ত শক্তি বৃদ্ধি করা হয় এবং পূর্ব চীনে তাদের প্রধান শক্তি প্রয়োগ কেন্দ্রীভূত করে। ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে তারা সাংহাই করতলগত করতে সফল হয়। ডিসেম্বর মাসে ইয়াংসি নদীর দুইশত মাইল উজানে অবস্থিত নানকিংও হস্তগত করে। কিন্তু চীন প্রজাতন্ত্রের রাজধানী নানকিং পতনের দ্বারা জাপানীরা যেরূপ বিজয় চেয়েছিল সেরূপ বিজয় আনতে পারেনি। চীন প্রজাতন্ত্রের সরকারকে নানকিং থেকে চাংকিং-এ স্থানান্তর করা হয়। সর্বাধিনায়ক চিয়াং কাই-শেক দুর্গম এই চীনের নতুন রাজধানী থেকে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মিত্র বাহিনী চীনের সাথে যোগদান করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারে।

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; কারণ পূর্ব এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের দীর্ঘদিনের প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ছিল অন্যতম প্রতিযোগী। ১৯৩৭ সালের ২১শে আগস্ট সাংহাই-এর নিকটে বিরাট পরিসরের যুদ্ধ শুরুর এক সপ্তাহ পরে নানকিং-এ একটি চীন-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা জাপানের অঘোষিত যুদ্ধে রাশিয়া চীনের সাথে এক কাতারে শামিল হয়। শীঘ্রই রাশিয়ার পর্যবেক্ষক ও উপদেষ্টা চীনে পাঠানো হয় এবং "স্বেচ্ছাপ্রণোদিত" সোভিয়েত বৈমানিক জাপানীদের বিরুদ্ধে কতিপয় আকাশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।[৮]

১৯৩৭ সালের অনাক্রমণ চুক্তির অধীনে জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে যে সাহায্য দেয়, যদিও যুদ্ধের গতি প্রকৃতির তুলনায় কম, তার চেয়েও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের মঙ্গোলিয়া সীমান্তে জাপানের উপর চরম বিনষ্টসাধনমূলক আঘাত। এই ঘটনাটি ঘটে একই সময়ে যখন ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

শুরু হয়।

১৯৩৯ সালের মে মাসে চীনের উপর বৃহদাকার আক্রমণের দুই বছরেরও কম সময়ে জাপানীরা মঙ্গোলিয়ায় অগ্রসর হয়। চার মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে তাদেরকে ত্রিশ মাইল ব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা অবলম্বন করতে বাধ্য করা হয়। তাদের হতাহতের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের উপর; এই সংখ্যা লেঃ জেনারেল জর্জি কে. জুকব-এর নেতৃত্বে সোভিয়েত-মঙ্গোলিয়ার সেনাবাহিনীর উপর জাপানীরা যে হতাহত করে তার পাঁচগুণ। "১৯৩৯ সালের নোমনহ্যান ঘটনা" নামে পরিচিত এই সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটে যখন ১৯৩৯ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের পোল্যান্ড আক্রমণের প্রাক্কালে রাশিয়ার সাথে জাপানের সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়।[৯]

১৯৪৫ সালে আবার বৈরিতা শুরু হয়; শুধু জাপান নয়, চীনের স্বার্থের ক্ষতি করে ইয়াল্টায় উপযুক্ত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পেয়ে রাশিয়ানরা মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে।[১০] এইভাবে পূর্ব এশিয়ায় জাপানীদের বিরুদ্ধে সাফল্যজনক অভিযানের মাধ্যমে তারা যেভাবে যুদ্ধ শুরু করেছিল সেভাবে তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায়। তাছাড়া ১৯৩৭ সালের অনাক্রমণ চুক্তির আট বছর পর ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে চীনের সাথে একটি বন্ধুত্ব ও মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এই যুদ্ধ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন প্রজাতন্ত্রের মিত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।[১১]

সুতরাং এশিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আলোচনায় চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন : (১) পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখন্ডের আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম; (২) চীনের বিকেন্দ্রীকৃত কাঠামো; (৩) চিয়াং কাই-শেকের যুদ্ধ কৌশল ও (৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এশিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল লু কাউ-চিয়াও ঘটনা থেকে ১৯৩৭ সালে।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। F.F. Liu, A Military History of Modern China, 1924-1949, Princeton: Princeton University Press, 1956, p. 197.

২। F.F. Liu, op.cit., p. 197.

৩। Akira Iriya, Across the Pacific : An Iner History o American-East Asian Relations, New York and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1967, pp. 171-199.

৪। Herbert Feis, The China Trangle : The American Effort in China from Pearl Harbour to the Marshall Mission, Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1953, p. 12.

৫। Ronald H. Spector, Eagle Against the Sun : The American War with Japan, New York : Free Press, 1984, pp. 461-63.

৬। Earnest R. May, The Truman Administration and China, 1945-49, Philadelphia, Pa. : J.B.Lippincott, 1975, p. 175.

৭। Y.C.Wang, Chinese Intellectuals and the West, 1872-1942, University of North Carolina, 1961, p. 422.

৮। Arthur N. Young, China and the Helping Hand, 1937-1945, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1963, pp. 20-22.

৯। D.S. detwiler & C.B. Burdick, eds., War in Asia and the Pacific, 1937-1949, vol. 11, New York and London : Garland, 1980.

১০। The China White Paper, August 1949, vol. I, Stanford : Stanfort University Press, 1967, pp. 113-114.

১১। Fies, op. cit., pp. 333-351.

চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব : প্রেক্ষাপট ও পটভূমি

মর্তুজা খালেদ

চৈনিক ভাষায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বলা হয়, উ চান চিয়ে চি ওয়েন হুয়া তা কোমিং অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিপ্লব। মাও সে তুং ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে এক বক্তৃতায় বলেন, "সাংস্কৃতিক বিপ্লব হলো বুর্জোয়া ও অন্যান্য শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে সর্বহারার মহান রাজনৈতিক বিপ্লব। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী জনগণের সাথে কুয়োমিনটাংসহ প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই ধারাবাহিকতা এবং সর্বহারা ও বুর্জোয়াদের মধ্যে অব্যাহত শ্রেণীসংগ্রাম।[১] চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সে তুং তার ক্ষমতার শেষ দশকে চৈনিক বিপ্লবের চেতনা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যে আন্দোলনের ডাক দেন তা সাংস্কৃতিক বিপ্লব নামে পরিচিত। এ বিপ্লব পরিচালিত হয় পুরাতন সংস্কার, পুরাতন অভ্যাস, পুরাতন সংস্কৃতি এবং চিন্তাধারার পুরাতন পন্থার বিরুদ্ধে।[২] সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আশু লক্ষ্য ছিল চারটি, প্রথমত পুরাতন ধ্যান-ধারণার বাহক পদস্থ কর্মকর্তাদের অপসারণ করা ও মাওবাদের তার অনুসারীদের স্থলাভিষিক্ত করা। দ্বিতীয়ত চীনা কমিউনিস্ট পার্টিতে শুদ্ধিকরণ অভিযান চালান। তৃতীয়ত চীনা তরুণদের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা প্রদান করা এবং চতুর্থত সরকারের নীতিগত কিছু সিদ্ধান্তের পরিবর্তন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে অধিকতর জনমুখী করা।[৩] পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে মাও উপলব্ধি করেন যে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রুশ্চেভ নির্দেশিত ভুল পথ ধরে চলেছে তাই সংশোধনবাদের পথ থেকে চীনকে যথার্থ পথে পরিচালনার জন্য মাও সে তুং এর জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের।[৪]

সাংস্কৃতিক বিপ্লব অর্থ শুধু মাও বিরোধীদের উচ্ছেদ নয় বরং এ বিপ্লব দলের নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বে পরিবর্তনও এনেছিল। অবশ্য এ বিপ্লব শুরু হয়েছিল ভিন্নভাবে....মাও সে তুং তার পিপল্‌স লিবারেশন আর্মিকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠিত নেতাদের বিরোধিতা করার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। এ সময় নেতৃত্বের শীর্ষে ছিলেন স্বয়ং মাও।[৫] সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে মাও মন্তব্য করেন যে, "The bourgeoisie has been overthrown, it is still trying to use the old ideas, culture, customs, and habits of the exploiting classes to corrupt masses, capture their minds, and endeavor to stage a comeback"[৬] আলোচ্য প্রবন্ধে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে পটভূমি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল নিয়ে ইয়াও ওয়েন ইয়ান (Yao Wen-Yuan) কর্তৃক প্রকাশিত "নতুন রচিত ঐতিহাসিক নাটক 'হাইজুই এর পদচ্যুতি' প্রসঙ্গে মন্তব্য" নামক রচনা থেকে যা সাংহাই থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ওয়েন হাই পাও-এ (Wen hui Pao) প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালের ১০ নভেম্বর। মাও সে তুং এর প্রত্যক্ষ নির্দেশে কমিউনিস্ট পার্টির সাংহাই পৌর শাখার উদ্যোগে লেখাটি প্রকাশিত হয়। হাইজুই নাটকের পটভূমি ছিল সুদূর মিং রাজবংশের (১৩৬৮-১৬৪৪) সময়কাল। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় পিকিং-এ ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। স্বভাবত এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ নাটকের সাথে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? নাটকটি মঞ্চস্থ হবার পাঁচ বছরের অধিককাল পরে এ নাটককে কেন্দ্র করে কেন বিতর্ক শুরু হলো ?

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পটভূমি যথার্থভাবে অনুধাবনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন ঃ....

১. স্ট্যালিন বিরোধিতা এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও মাও সে তুং এ উপর তার প্রভাব;

২. শত পুষ্পের বিকাশ তত্ত্ব ও দক্ষিণপন্থী বিরোধী আন্দোলন;

৩. কমিউন প্রথার প্রচলন এবং মাও সে তুং এর রাষ্ট্রীয় চেয়ারম্যান পদত্যাগ;

৪. পঞ্চম সংশোধনী ও মাও সে তুং এর সাংহাই অভিযান;

৫. প্রত্যক্ষ ক্ষমতার জন্য দ্বন্দ্ব;

৬. ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ব্যাপ্তি।

নিম্নে এ সব বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

স্ট্যালিন বিরোধিতা এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি

১৯৩৫ সালের পর থেকে মাও সে তুং ছিলেন অবিসংবাদিতভাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, তার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার কথা কেউ কখনও ভাবতো না। মাও সে তুং এর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা হয় চীনের অভ্যন্তর নয় বাইরে থেকে।।১৯৫৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে সোভিয়েত নেতা যোসেফ স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ক. ব্যক্তিপূজা; খ. ক্ষমতার অপব্যবহার; গ. রাজনৈতিক অরাজকতা সৃষ্টি।[১] এ সম্মেলনের প্রভাব মাও সে তুং ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির উপর ছিল সুদূরপ্রসারী। কারণ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির এ সকল সমালোচনা মাও সে তুং-এর তাত্ত্বিক ভিত্তিকে ভয়ানকভাবে আঘাত করেছিল। মাও চীনে স্ট্যালিনবাদের অনুকরণে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নে স্ট্যালিনবাদের অবক্ষয় অনুরূপভাবে চীনে মাওবাদের অপমৃত্যুর ইঙ্গিত বহন করে যা মেনে নেওয়া মাও

সে তুং এর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এবছরেই সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেস। এ সম্মেলন দলের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে মাও সে তুং চিন্তাধারাকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির গাইড লাইন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সালে দলীয় সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয়। নতুন সংবিধানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। এখানে মাও সে তুং এর একক নেতৃত্ব থেকে কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হয়। ইতিপূর্বে ১৯৪৫ সালের সংবিধান অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান একই সাথে কেন্দ্রীয় পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েটের প্রধান ছিলেন। এতে ভাইস চেয়ারম্যানের কোন পদ ছিল না। দলীয় চেয়ারম্যান ছিলেন দল তথা রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। ১৯৫৬ সালে অষ্টম কংগ্রেসে দলীয় এ পদে পরিবর্তন আনা হয় ও আনুষ্ঠানিকভাবে চার জন ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়।[৮] পলিটব্যুরোর একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয়। এতে স্থির হয় যে, কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান পলিটব্যুরোর চেয়ারম্যান হলেও তিনি কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েটের প্রধান থাকবেন না। এর পরিবর্তে কংগ্রেসে নতুন এক সাধারণ সম্পাদকের পদ সৃষ্টি করা হয় যাতে দেং শিয়াও পিং কে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েটের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করার জন্য মনোনীত করা হয়। এই নতুন ছয় জন চেয়ারম্যান, চার জন ভাইস চেয়ারম্যান এবং একজন সাধারণ সম্পাদক মিলে গঠিত হয় নতুন পলিটব্যুরোর স্ট্যান্ডিং কমিটি, যাতে সত্যিকার অর্থে চেয়াম্যানের কোন ক্ষমতা ছিল না। এছাড়া লিউ শাও-চি প্রথম ভাইস চেয়ারম্যানের হিসাবে চেয়ারম্যানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন। এ সব কিছু থেকে ধারণা করা যায় যে, পরিবর্তিত অবস্থায় মাও সে তুং এরা করার কিছুই ছিল না। এ বিষয়ে দশ বৎসর পর মাও সে তুং মন্তব্য করেন যে, "এটি ছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হবার প্রথম অধ্যায়।"[৯] অবশ্য এ সকল পবিবর্তন সত্ত্বেও মাও সে তুং ছিলেন, ঐতিহাসিক Brian R. Train এর ভাষায়, "Mao was stilll the undisputed leader of China to the great majority of the Chinese people."[১০]

শত পুষ্পের বিকাশ তত্ত্ব

সোভিয়েত ইউনিয়নে স্ট্যালিন বিরোধিতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে মাও এর জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে চীনে ভিন্নতর কিছু করার যা স্ট্যালিনবাদে ছিল না, এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভব ঘটে শত পুষ্পের বিকাশ তত্ত্ব।[১০] শত পুষ্পের বিকাশ কালীন সময়ে (১৯৫৭ সালের মার্চ থেকে মে মাস) মাওবাদীগণ লিন পিয়াও এর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করে তা হলো, ১. সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করা; ২. রাজনীতিকে ব্যবহার করে বস্তুগত সুবিধা গ্রহণ; ৩. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নমনীয় নীতি গ্রহণ; ৪. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের স্থলে সীমিত আকারে হলেও মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তন; ৫. গ্রামের কৃষকদের

চাইতে শহরের শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন; এবং ৬. সংবিধানে প্রদত্ত কৃষকদের সমবায় কৃষি পদ্ধতি, শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করার অধিকারে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধা প্রদান করা। মাওপন্থীদের মতে এসকল কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য ছিল, "পশ্চিমা ধাঁচে দলকে সজ্জিত করার ব্যবস্থা করা এবং পুঁজিবাদী পথে দেশকে এগিয়ে নেবার চেষ্টা।"[১২]

শত পুষ্পের বিকাশ তত্ত্বের সুযোগ গ্রহণ করে চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তারা তাদের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে থাকে। এই পর্যায়ে সরকারের স্ট্যালিনবিরোধী নীতি গ্রহণ করার ফলে চীনে অসন্তোষ আরও তীব্র হয়ে উঠে। এ তত্ত্বের ফলে দলের সমালোচনা সহ্যের সীমা এক পর্যায়ে ছাড়িয়ে যায় এবং এ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে দক্ষিণপন্থী দমন অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে।

শত পুষ্পের বিকাশকালীন সময়ে দলের শীর্ষস্থানীয় ও মাও বিরোধী নেতাদের বিশেষ করে লিউ শাও চি ও দেং শিয়াও পিং কে দক্ষিণপন্থী হিসাবে চিহ্নিত করা হয় নাই। যদিও রেড গার্ড তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল এবং স্পষ্ট করেছিল যে মাও সে তুং এর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাথে এদের দুজনার মত পার্থক্য রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে লিউ চেয়েছিলেন এক স্থিতিশীল পরিবেশ এবং তিনি ১৯৫৪ সালের সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিক অধিকার জনগণকে প্রদান করার পক্ষপাতী ছিলেন ও অর্থনৈতিকভাবে তিনি শিল্পের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। লিউ এর ভাষায়, "Without the development of industry and the achievement of industrialization, there is no possibility of realizing agriculturall collectivization at all." অপর দিকে মাও চেয়েছিলেন সমবায় পদ্ধতিতে কৃষির বিকাশের মাধ্যমে দেশের উন্নতি সাধন করতে। মাও এ সম্পর্কে বলেন যে, "In the area of agriculture, under the conditions of our country we must achieve cooperativization first before we can use large machines."[১৩] সমবায় পদ্ধতি যে, মাও সে তুং এর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা প্রমাণিত হয় তার কমিউন প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে।

কমিউন প্রথা ও মাও সে তুং এর রাষ্ট্রীয় চেয়ারম্যান পদ বাতিল

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ৮ম জাতীয় কংগ্রেসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৭ সালের গৃহীত সকল কঠোর পদক্ষেপের বিরোধিতা করাই ছিল এ কংগ্রেসের মৌল নীতি। এ সম্মেলনে কমিউন প্রথা প্রবর্তনের নীতি গৃহীত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে হুনানে প্রথম কমিউন ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। এ ব্যবস্থা স্থায়ী হবার চার মাস পর পলিটব্যুরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কৃষি সমবায় পদ্ধতির পরিবর্তে কমিউন ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে প্রবর্তন করা হবে। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ প্লেনামে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, কমিউন প্রথা গ্রহণযোগ্য

নয়। দ্বিতীয়ত মাও সে তুং এর আর চেয়ারম্যান না থাকার প্রস্তাব গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, এ প্রস্তাব গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয় নাই। এখানে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তা ছিল:

In the opinion of this Central Plenum, it is entirely a positive proposal. Because Comrade Mao Tse-Tung not to assume the duty of State Chairman but to be Chairman of the Party Center only, it will better enable him to concentrate his energy to handle the problems of Party and state programmes, policies, and lines; it will also make it possible for him to spare more of his time to do the theoritical work of Marxism-Leninism without impeding him from continuously displaying the role of his leadership in state work.....[১৪]

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মাও সে তুং এর রাষ্ট্রীয় চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ ও কমিউন প্রথা বাতিল সংক্রান্ত প্রস্তাব পরস্পর সম্পর্কীত ছিল এবং চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দলের অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে ছিল। ১৯৬৬ সালে অক্টোবর মাসে মাও সে তুং এ বিষয়ে মন্তব্য করেন, "I was extremely discontented with that decision, but I could do nothing about it"[১৫] বস্তুত উপরোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এ সময় মাও ছিলেন ক্ষমতাহীন।

পঞ্চম সংশোধনী ও মাও সে তুং এর সাংহাই যাত্রা

১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম প্লেনামে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পেং তে-হুয়াই (P'eng Tehuai) দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অনুসৃত সিদ্ধান্ত সমূহের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করে বলেন যে, এ সকল পদক্ষেপ পিপলস লিবারেশন আর্মিকে দুর্বল করে ফেলছে। কিন্তু মাও সে তুং এ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকেন এবং এর ফলে পেং কে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী আখ্যায়িত করে পদচ্যুত করা হয়। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংশোধন ক্যাম্পে পাঠানো হয়। পেং এর স্থলাভিষিক্ত হন লিন পিয়াও। লিন পিয়াও দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পেং এর চাইতে আরও অধিকহারে মাওবাদ প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তিনি "মাও সে তুং চিন্তাধারার সৃজনশীল অনুশীলন" নামে নতুন এক ধারার প্রবর্তনের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন এক মাত্রা সংযোজন করেন।

চীনা বুদ্ধিজীবীদের একাংশ লিন পিয়াও এর বিরোধিতা করা শুরু করে। অনেক বিখ্যাত লেখকও মাও সে তুং এর শাসনের সমালোচনা করেন। এদের পথিকৃৎ ছিলেন ওয়াহান (Wathan), তেং তেং তু (Teng Teng to), লিয়াও মোশা (Liao Mosha)। তারা সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির পিকিং পৌর কর্পোরেশনের সদস্য। পিকিং এর চারটি প্রধান সংবাদ পত্র ও পত্রিকা ব্যবহার করে তারা ধারাবাহিক লেখনীর মাধ্যমে মাওবাদের প্রসারের সমালোচনা করে বলেন চীনের অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা, বিচার

বিভাগের অব্যবস্থাপনার জন্য মাও সে তুং দায়ী। তারা কৃষকদের ভূমি রাষ্ট্রীয়করণের বিরোধিতা করে তা পূর্বের প্রাক্তন মালিকদের নিকট ফেরৎ দেবার প্রস্তাব করেন। তারা আরও প্রস্তাব করেন যে, যেসব প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তাকে বিপ্লবের সময় পদচ্যুত করা হয়েছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

এই অবস্থায় ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দশম প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে দলের মধ্যকার ১ম ও ২য় সারি[১৬] বিলোপ করা হয় এবং মাও সে তুং কে পুনরায় দলের দৈনন্দিন কাজে ফিরিয়ে আনা হয়।[১৭] সম্মেলনে ক্রমবর্ধমান বুর্জোয়া প্রভাব বৃদ্ধির রোধে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র করে তোলার আহ্বান জানান হয়।[১৮] মাও সে তুং এ সময় সক্রিয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং যুগপৎভাবে দু'টি আন্দোলন পরিচালনা করেন। প্রথমত পঞ্চম সংশোধনী (যার সূচনা হিসাবে মনে করা হয় ১৯৪৯ সালকে) যা পরিচালিত হবে শিল্প ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বুর্জোয়া প্রভাবের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়ত গ্রাম সমাজে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা।[১৯]

এ সকল নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে মাও পূর্বের মতোই 'দক্ষিণপন্থী' বাধার সম্মুখীন হন।[২০] বিশেষ করে, ১৯৬২ সালের পর তেং আবার শক্তিশালী হয়ে উঠেন এবং দলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইন আবার আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠে। ১৯৬৩ সালে আবার নতুন করে লিয়াও এবং তেং নতুন করে কমিউনিস্ট পার্টির দৈনন্দিন কাজকর্মে অংশগ্রহণ করা শুরু করেন। যদিও এ সময় মাও সেতুং ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে। দলের মধ্যে মাও সমর্থকদের সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও মাও অবসরে থাকার সুযোগ গ্রহণ করে লিয়াও ও তেং। তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৪ সালেই লিয়াও এবং তেং মাও অনুসৃত কৃষি নীতির বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা শুরু করেন। ফলে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে মাও পলিটব্যুরোর জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন, উদ্দেশ্য তার প্রণীত কৃষিনীতি অনুসরণ করা। এই সময় তিনি ২৩ দফা প্রণয়ন করেন সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও গ্রামের রাজনৈতিক সংগঠন ও তাদের অনুসৃত অর্থনীতিক নীতির জন্য।[২১] মাও এ সময় আবিষ্কার করেন যে, পিকিং পে চেং দের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে এবং তার নিজের জন্য মাও সে তুং এর ভাষায়, "There was not even room for him to put in a needle"[২২] মাও সে তুং তার জীবননাশের ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে ধারণা করেন। তিনি অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, পিকিং তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন।[২৩] ফলে ১৯৬৫ সালের গ্রীষ্মকালে মাও সাংহাই এর উদ্দেশ্যে পিকিং ত্যাগ করেন। সাংহাই ছিল পূর্ব থেকে শ্রমিক প্রধান শিল্প নগরী, এখানে কট্টোরপন্থী কমিউনিস্টদের প্রভাব ছিল সব সময় খুব বেশি এছাড়া সাংহাই এ ছিলেন মাও অনুগত চৌ এন লাই। সাংহাই-এ জুলাই মাসে ইয়াং সি নদীতে দীর্ঘ সাঁতার দেন উহান-এ যেস্থান থেকে ১৯১১ সালের প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয়েছিল। সত্তরউর্দ্ধো মাও এর এভাবে

সাঁতার দেওয়া সংবাদপত্র সমূহে গুরুত্বের সাথে প্রচার করা হয়, এবং চীনের জনগণের কাছে এটা তুলে ধরা হয় যে, মাও এখনও সুস্থ ও সবল রয়েছেন।

ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত

উ হান এর নাটকের সমালোচনার মধ্যদিয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূত্রপাতের কারণগুলো এমন স্পষ্ট হয়েছে। উ হান ছিলেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও মিং যুগ বিশেষজ্ঞ। বিপ্লব পূর্ববর্তীকালে তিনি তার রচনায় হাইজুস নামের এক প্রতিবাদী চরিত্র সৃষ্টি করে সমসাময়িক শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করতেন। হাইজুস মিং রাজসভার এক সভাসদ। অন্যায় দেখলেই সে ভয় ভীতি উপেক্ষা করে তার তীব্র সমালোচনা করতো ও জনগণের অধিকার রক্ষায় সচেতন থাকতো রক্ষণশীল সভাসদদের সবরকম বাধার মুখে। মাও সে তুং তার গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ড সময় কালে তার আন্দোলনের সপক্ষে উ হান কে দিয়ে হাইজুস চরিত্রকে দিয়ে বেশ কিছু আখ্যান রচনা করান।[২৪] ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উ হান মাও শাসনের সমালোচনা করে নতুন ভাবে হাইজুস চরিত্রকে নিয়ে একটি নাটিকা রচনা করে সংবাদ পত্র People's Daily -তে প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে উ হান হাইজুস চরিত্র নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন যা ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারিতে পিকিং-এ মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকে হাইজুস রূপক ভাবে হলেও নিম্নোক্তভাবে সমসাময়িক কালের চিত্র তুলে ধরেন।

> You pay lip service to the principle
> that the people are the roots of the state.
> But officials still oppress the masses
> While pretending to be virtuous men.
> They act wildly as tigers
> and deceive the emperor.
> If you conscience bothers you
> you know no peace by day or night.[২৫]

উ হান এর নাটকের সমালোচনা করা যথার্থ ও যৌক্তিক ছিল। উ হান ছিলেন পিকিং পৌরসভার নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী এবং তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তেং তু (Teng To), লিয়াও মো-সা (Liao Mo-sha) তথাকথিত ত্রয়ীদের একজন।[২৬] উ হানের বিরুদ্ধে আক্রমণ পক্ষান্তরে ছিল তার সহচর ও উর্দ্ধতন পিকিং কর্তৃপক্ষের পিকিং পৌরসভার মেয়র ও কমিউনিস্ট পার্টির পিকিং পৌরশাখার প্রথম সেক্রেটারি পেং চাও (Peng Chen) এর বিরুদ্ধে আক্রমণ। দ্বিতীয়ত পেং চেন ছিলেন চীনে প্রতিবিপ্লবী ও সংশোধনবাদীদের অন্যতম একজন নেতা লিউ শাও চির (Liu Shaochi) ভাব শিষ্য। তৃতীয়ত উ হান সেভাবে মাও এর সমালোচনা করতো তা ছিল অনেকটাই ক্রুশ্চেভ কর্তৃক স্ট্যালিনের

সমালোচনার অনুরূপ। ক্রুশেভ স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিপূজা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপন করেন। একই ভাবে চীনের কমিউনিস্টগণ মাও এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং মাও স্ট্যালিনকে সমর্থন ও ক্রুশ্চেভের বিরোধিতা করে, চীনের জনগণের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলেন যে, চীনে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুরূপ সংশোধনবাদীরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

অচিরেই উ হান এর লেখার সমালোচনা করে প্রচুর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে এবং চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। অবশ্য এ লেখাগুলি শুধু উ হানের সমালোচনার মধ্যেই সীমিত থাকে তাতে তেং তু, লিউ মা-সার কোন উল্লেখ থাকে না। ১৯৬৬ সালের ১০ মার্চ সাং শি (Sung Shih) যিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন এক সভা আহ্বান করেন যাতে একহাজার রাজনৈতিক নির্দেশক ও পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনারগণ উপস্থিত ছিল, এ সভায় তিনি ত্রয়ী চক্রের পক্ষে মতামত তুলে ধরেন।

এর ১৬ দিন পরে অর্থাৎ ২৬ মার্চ দুটি ঘটনা ঘটে। রাষ্ট্রীয় প্রধান লিউ শা চি নিজের উপর যথেষ্ট আস্থা রেখে তাঁর স্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী চীয়েন ই (Chen Yi) সহ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে এক রাষ্ট্রীয় সফরে যান। এই দিন চীয়েন ই জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কিনজি মিয়ামতো (Kinji Miyamoto) আগমন উপলক্ষে এক সভায় খুবই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করে (Jen-min Jin pao) দ্রুত সভাস্থল ত্যাগ করেন। লিয়াও এর অনুপস্থিতি মাও অনুসারীদের সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করে আত্মসমালোচনা নিজের ত্রুটি স্বীকার করার। ত্রয়ী চক্রের পক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির পিকিং পৌর শাখা অপরাধ স্বীকার করে পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করে।

এর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বারের মতো পিপল্স লিবারেশন আর্মি প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সাথে যুক্ত হয়। তারা স্লোগান তোলে, দল বিরোধী কোন মতাদর্শ থাকতে পারবেনা। পিপল্স লিবারেশন আর্মির মুখপাত্র Chiehfang-chun pao তার ১৯৬৬ সালের ১৮ এপ্রিল সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সরাসরি ত্রয়ী চক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, শত্রুরা পিপল্স লিবারেশন আর্মি কে ধ্বংস করার জন্য শিল্প ও সাহিত্যকে ব্যবহার করছে। মাও বিরোধীদের ব্ল্যাক লাইন বলে অভিহিত করে এখানে বলা হয়, মাও বিরোধীরা ১৯৩৬ সালের চো ইয়াং এর 'ন্যাশনাল ডিফেন্স লিটারেচার'র উত্তরসূরী যাদের লক্ষ্য হলো সমাজতন্ত্র বিরোধী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। পিপল্স আর্মি মাও সে তুং কে সর্বহার পক্ষের শক্তি ও মাও বিরুদ্ধবাদীদের দক্ষিণপন্থী বলে অভিহিত করে।

১৯ এপ্রিল পিপল্স লিবারেশন আর্মি সাংস্কৃতিক জগতের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে। লিউ শাও চি দেশে ফেরেন কিন্তু তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিমান বন্দরে কেউ

থাকেনা। ২৮ এপ্রিল লিউ এর চার হাজার শব্দের বক্তৃতায় মাও সে তুং এর নাম, মাও চিন্তাধারা বা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংক্রান্ত কোন কথার উল্লেখ থাকে না। অপর দিকে চৌ এন লাই ৩০শে এপ্রিল পাঁচ হাজার শব্দের বক্তৃতায় ১১ বার মাও সে তুং এর নাম ও তার চিন্তাধারার উল্লেখ করেন। মাও বিরুদ্ধবাদী অপর নেতা পেং চেন ২৬ মার্চ এর বক্তৃতার পর তাকে আর জনসমক্ষে দেখা যায় না। তিনি ১৯৬৬ সালের ৩ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হন।

ক্ষমতার দ্বন্দ্বের বিস্তৃতি

১৯৬৬ সালের মে ও জুন মাস চীনের ইতিহাসে এক সংশয় ও সন্দেহের অধ্যায়। একজন যুগোশ্লাভ প্রত্যক্ষদর্শী পিকিং থেকে বিভিন্ন জাপানী ও তাইওয়ানের বিভিন্ন সংবাদ পত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান যে, এ সময় লিয়াও মাও সে তুং কে ইমপিচ করার চেষ্টা করেন।[২৭]

জুন মাসে মাও লিন পিয়াও এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠায় পিকিং-এ এখানকার সব সংবাদ মাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও কমিউনিস্ট পার্টির পিকিং পৌর কমিটিকে পুনর্গঠন করার জন্য। অপরদিকে লিয়াও অনুগত অংশ মাও কে ইমপিচ করার জন্য দলের প্লেনাম সভা ডাকে। ১৭ জুলাই লিন পিয়াও বাহিনী তিয়েনসিয়েন ও পিকিং এর মধ্যকার রেলপথের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। একই দিনে তারা পিকিং এ লিন পিয়াও এর সঙ্গী ও তার অনুগত সৈন্যদের গ্রেপ্তার করে। লিন এর সঙ্গীদের মধ্যে দেং শাও পিয়াও (Teng Hsiao-ping) পক্ষ পরিবর্তন করে মাও এর পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি মাও এর পরামর্শ অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টির প্লেনাম সভা, যা ২১ জুলাই অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল তা স্থগিত করেন।

মে মাসে মাও এর সচিব ইয়াও ওয়েন-ইযান সাংহাই-এ অভিযোগ করেন যে, লিউ গ্রুপ চৌ এন লাই এর পরিবর্তে পেন চেং কে প্রধানমন্ত্রী পদে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পেন তু হুয়াকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সংশোধনবাদী লাইন প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেছে। ৪ জুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করে যে দলের পিকিং পৌর শাখা পুনর্বিন্যাস করা হবে এবং এর দুই দিন পরে পিপলস্ লিবারেশন আর্মির মুখপাত্র পত্রিকায় ভীতি প্রদর্শন করে ঘোষণা করা হয় যে, মাও এর লাইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করা হবে। এই সকল ঘটনার মধ্যে মাও সে তুং পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিয়ে ইউয়ান-তা (Nieh Yuan-tza) কে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেসিডেন্ট লিউ পেং ও অন্যান্যদের সমালোচনা করে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশের নির্দেশ দেন।[২৮] যা ২৫ মে প্রকাশিত হয়। নি ওয়ান জুর এই দেয়াল পত্রিকা লিউ অংশের বিরাট বাধার সম্মুখীন হয়। লিউ অংশ নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যসংঘ গঠন করে এবং তারা মাও বিরোধী প্রচার শুরু করে। এক সপ্তাহ পরে মাও এই কার্যসংঘ কে বেআইনী ঘোষণা করেন এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংঘের সভা আহ্বান করেন যা আয়োজন করে দলের একাদশ প্লেনামের।

এভাবে অবস্থা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনার পর মাও ১৯৬৬ সালের ২৮ জুলাই পিকিং-এ প্রত্যাবর্তন করেন এবং তার চার দিন পর কমিউনিস্ট পার্টির একাদশতম প্লেনাম সভা আহ্বান করা হয়। একাদশ প্লেনামে ৮ আগস্ট ১৬ দফা গৃহীত হয় বিপ্লবকে বাস্তব ও তাত্ত্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। প্রশাসনের সর্বস্তর থেকে লোক নিয়ে স্থায়ীভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটনের জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়। লিয়াও এর উপর চাপ ছিল যেন তিনি আত্মসমালোচনা করেন। তিনি তা স্বীকার করে বিবৃতি প্রদান করেন যে, ১৯৫১, ১৯৫৫, ১৯৬২ এবং ১৯৬৬ সালে কৃষি সমবায় পদ্ধতি তার দক্ষিণপন্থী নীতির প্রতিফলন ছিল এবং তিনি মাও এর গণধারার বিরোধিতা করে ভুল করেছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গভীরতা এবং চেয়ারম্যান মাও এর চিন্তাধারা যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারেন নাই।[২৯] সেনাবাহিনীর ক্ষমতার দ্বারা বলিয়ান হয়ে মাও সে তুং দলে লিয়াও এর অবস্থান দ্বিতীয় থেকে অষ্টম-এ নামিয়ে আনেন এবং চীনের উপর নতুন করে তার অপ্রতিহত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন---এভাবেই সম্পন্ন হয় চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের।

উপসংহার

সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরুর দশ বৎসর পূর্বে অবস্থাচক্রে মাও সে তুং যখন দৈনন্দিন কার্য সমাধা করার জন্য দলের মধ্যে দ্বিতীয় সারি তৈরি করেন পরে ১৯৫৮ সালে তিনি যখন রাষ্ট্রীয় চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন তখন তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রাষ্ট্রে তার অবস্থান এবং দল তার প্রণীত তত্ত্বীয় রূপরেখা অনুযায়ী পরিচালিত হবে। তা ভাবার মতো যথেষ্ট কারণও ছিল, প্রথমত তিনি ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান এবং দলের প্রধান তাত্ত্বিক; দ্বিতীয়ত দলের প্রথম সারির সব ক'জন নেতা রাষ্ট্র প্রধান লিউ সাও চি, প্রথম সেক্রেটারি দেন শিয়াও পিং, পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন ই, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পেং দে হুয়াই, পিকিং শহরের মেয়র পেং চেন, ছিল কয়েক দশকব্যাপী মাও সে তুং এর একান্ত সহচর।[৩০] তৃতীয়ত নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী এই চারজন নেতা মাও এর বিরুদ্ধে বা তার তত্ত্বীয় আদর্শের বিরুদ্ধে এক জোট হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না বরং তারা একে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তাদের পরস্পরের কাজের সমন্বয় করবেন স্বয়ং মাও সে তুং এমন ভাবেই ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছিল। চতুর্থত মাও সে তুং এবং লিয়াও এর মধ্যে সম্পর্ক ছিল দীর্ঘ দিনের তারা সব ধরণের সরকারি ও বেসরকারি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কাজেই মাও এর বিকল্প যখন খোঁজা হচ্ছিল তখন স্বাভাবিক ভাবেই লিউ এর নাম আসে মাও এর সাথে তার সম্পর্ক ও দলে তার অবস্থান বিবেচনা করে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্ববর্তী দশ বৎসরের অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে লিয়াও, তেং এবং বেন পরস্পরের কাছাকাছি আসেন, তাদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ সালে মাও প্রভাবাধীন সময়েও তারা সীমিত আকারে

হলেও মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করেন এবং কৃষকদের মধ্যেও ব্যক্তিমালিকানায় স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার প্রদান করেন যা চীনা ভাষায় সান-জু পাও নামে পরিচিত। এ সকল নীতির ফলে ১৯৬২ সাল থেকে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসা শুরু করে। যদিও এ সকল কার্যক্রম মাও এর তত্ত্বীয় নীতি ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী। ১৯৬২ সালের পর মাও তার প্রথম লাইন ভেঙ্গে দেন এবং শ্রেণী সংগ্রাম ব্যবস্থা তীব্র করে তোলার আহ্বান জানান। তা সত্ত্বেও ১৯৬২ সালের পর থেকে মাও বিশ্রামে ছিলেন এবং লিয়াও ও তেং দৈনন্দিন কাজগুলো করতেন বলে তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। ১৯৬৪ সালের পর যখন মাও তার ২৩ দফা প্রণয়নের নির্দেশ প্রদান করেন তখন মাও উপলব্ধি করেন যে, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তার নির্দেশিত পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং তারা সকলে হয়ে পড়েছেন সংশোধনবাদী। ফলে সংশোধনবাদীদের প্রতিরোধ করা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠে এবং অপরিহার্য হয়ে পড়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটনের।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। Wheelwright, E.L. & Bruce Macfartane, *The Chinese Road to Socialism*, New York: Scribner, 1976. p. 117.

২। Encyclopedia of Microsoft Encarta 1998, *Cultural Revolution.*

৩। Hongyong, Lee,. *The Politics of the chinese Cultural Revolution*, Berkeley. University of California Press, 1978. p. 2.

৪। সমীরণ মজুমদার, তথ্য ও বিশ্লেষণে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৮-২৩।

৫। MacFarquhar, Roderick, *The Origins of the Cultural Revolution : Contradictions Amongs the People* 1956-1957, New York : Columbia University Press, 1974. p. 12.

৬। Mao tu-se "Sixteen Article" -*Internet.* (http:/www.marx2mao.org/Mao/Index.html#Other).

৭। Inkeles, Alex and Kent Geiger, *Soviet Society*, Boston, 1961. pp. 263-295.

৮। চার জন ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন যথাক্রমে লিউ শাও চি, চৌ এন লাই, চু-তে এবং চিয়েন উয়ান।

৯। ১৯৬৬ সালের অক্টোবরে কেন্দ্রীয় সম্মেলনে প্রদত্ত মাও সে তুং এর বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত।

১০। Domes, Jurgen, *The Internal Politics of China* 1949-72. New York:Praeger, 1973. p. 14.

১১। MacFarquhar, Roderick, পূর্বোক্ত পৃ. ২৬।

১২। Wong, Norman, *Cultural Revolution*: Stories. New York: Persea Books, 1994. p. 74.

১৩। Mao Tse-tung, "On the Question of Agricultural Cooperation", 1955,-*Internet*. (http:www.marx2mao.org/Mao/Index.html#Other).

১৪। উদ্ধৃত হয়েছে, Hsiao, Genet. T., "The great Proletarian Cultural Revolution" in Immanuel, C.Y. Hsu (ed.), *Readings in Modern Chinese History*, New York, 1971 pp. 636-37.

১৫। *Central Daisly News*, quoted ibid.

১৬। ১৯৫৬ সালে মাও সে তুং এর উত্তরাধিকারী নির্ধারণের জন্য দলের মধ্যে এই প্রথম ও দ্বিতীয় সারি তৈরি করা হয়।

১৭। Mao's October 1966 Address.-*Internet*. (http://www/marx2mao.org//Mao/Index.html#Other)

১৮। "Communique of the Tenth Plenum of the Eight CC/CCP", *Jen-min Jlh-pao*, September 29, 1962, p. 1. উদ্ধৃত হয়েছে, Hsiao, Genet. T. পূর্বোক্ত।

১৯। Liu, Guokai. A Brief Analysis of the Cultural Revolution. Armonk, NY:M.E. Sharpe, 1987, p. 28.

২০। MacFarquhar, Roderick. *The Origins of the Cultural Revolution I: Contradictions Among the People*. New York: Columbia University Press, 1974. p. 106.

২১। Silber, Irwin, *The Cultural Revolution*; A Markxist Analysis. New York : Times Change Press, 1970 p. 65

২২। In Mao's October 1966 Address.-(*internet*. (http://www.marx2mao.org//Mao/Index.html#Other).

২৩। Tang, Tsou. *The Cultural Revolution and post-Mao Reforms*: a Historical Perspective. Chicago: University of Chicago Press, 1986. p. 163.

২৪। Jonathan D.Spence, *The Search for Modern China*, (New York: W.W. Norton & Company, 1991), p. 599.

২৫। Ansley, Clive, *The Heresy of Wu Han : His Play "Hai Jui's Dismissal" and Its Role in China's Cultural Revolution*, (Toronto: University of Toronto Press, 1971), p. 76,

২৬। Wang, James C. F. *The Cultural Revolution in China: An Annotated Bibliography*..New York: Garland, 1976. p. 52.

২৭। Robinson, Joan, *The Cultural Revolution in china.* Middlesex: Penguin Books, 1970. p. 15.

২৮। See Mao's October 1966 address available in - *internet* (http://www/marx2mao.org//Mao/Index.html#Other)

২৯। Joseph, William et al., eds. *New Perspectives on the Cultural Revolution. Cambridge.*:Harvard University Press, 1991. p. 19.

৩০। Brian R. Train, "The Great Proletarian Cultural Revolution", *Internet.* (http://www.islandnet.com/citizenx/cultrev2.html)

পশ্চিম এশিয়ার নাগরিক সমাজ : তথাকথিত স্থবিরতা

কিংশুক চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম এশিয়ার চারিত্রিক বিশেষত্বের দরুন সেখানে "civil society" বা নাগরিক সমাজ আছে কিনা সে বিষয়ে বিদগ্ধমহলে মতভেদ আছে। বার্নার্ড লিইউঈস, আর্নস্ট গেলনার, এলি কেদুরি[১] প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, কোন অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রকৃত অর্থে নাগরিক সমাজ গড়ে উঠতে পারে না কারণ মৌলিক কিছু সামাজিক তথা রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাগরিক সমাজের পূর্বশর্ত। অন্যদিকে, এলিস গোল্ডবার্গ, অসাস্টাস নর্টন[২] প্রভৃতিরা মনে করেন, যে নাগরিক সমাজ গণতান্ত্রিক কাঠামোর বাইরেও উপস্থিত থাকতে পারে যদি যথেষ্ট সংখ্যায় বেসরকারি সংগঠন এবং স্বার্থগোষ্ঠীর উপস্থিতি দৃষ্টিগোচর হয়। সেই নিরীখে বিচার করলে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সমগ্র পশ্চিম এশিয়া জুড়ে জনজীবনে নাগরিক সমাজের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বেড়েছে।

১৯৬০-এর দশকে OPEC-এর গঠন এবং রপ্তানি প্রক্রিয়ায় পশ্চিম এশিয়ার তেল রপ্তানিকারি দেশগুলি নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। তেল রপ্তানিকারি দেশগুলিতে তৈলজাত রাজস্বের দরুণ রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তিবিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, সৌদি আরব, ওমান, সংযুক্তআরব আমীরশাহীর মতো উপজাতীয় সংহতি তথা সামরিক শক্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র, অথবা মতাদর্শ তথা সামরিক শক্তিব ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র [যেমন, ইরাক, শাহের শাসনাধীন ইরান] সর্বত্রই নাগরিক সমাজের ওপর রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্ভরশীলতা কমতে থাকে, এবং স্বৈরাচারের ভিত মজবুত হয়।[৩] অন্যদিকে যে সব দেশে রপ্তানিযোগ্য তেল নেই [যেমন, জর্ডন, সিরিয়া, মিশর, লেবানন]। সে সব দেশ তেল রপ্তানিকারি দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক তথা পরিসেবার মাধ্যমে [যেমন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষকর্মচারী রপ্তানি করা] তৈলজাত রাজস্বের দ্বারা পরোক্ষে লাভবান হয়।[৪] এক্ষেত্রে তুলানামূলকভবে কম হলেও, নাগরিক সমাজের ওপর নির্ভরশীলতা কমার দরুন রাষ্ট্রযন্ত্র মজবুত হয়। নাগরিক সমাজের ওপর রাজস্ব সংক্রান্ত নির্ভরশীলতা না থাকায় পশ্চিম এশিয়ার প্রায় সর্বত্রই রাষ্ট্র আরও স্বৈরাচারী, আরও দুর্বিনীত হয়ে ওঠে, এবং মৌলিক তথা সামাজিক অধিকার অনেক ক্ষেত্রে হয় কেড়ে নেয়া হয় [বাথ শাসনাধীন ইরাক, শাহের ইরান], নয়তো অধিকার দিতে অস্বীকার করা হয় [যেমন, সৌদি আরব, জর্ডন, কুয়েত, সিরিয়া]।

৬০-এর দশকেও সামগ্রিকভাবে ইজরায়েল ছিল একমাত্র ব্যতিক্রমী পশ্চিম এশীয়

রাষ্ট্র। শিল্প অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই দেশে নাগরিক সমাজের ওপর রাষ্ট্রের নির্ভরশীলতার সুবাদে শুরু থেকেই এক বলিষ্ঠ নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছিল। ৭০-এর দশকে পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতেও যে অল্পবিস্তর শিল্পায়ন তথা নগরায়নের জোয়ার দেখা দিয়েছিল, তাতে ৮০-র দশকে পশ্চিম এশিয়ার সামাজিক চরিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। তেল-সমৃদ্ধ দেশগুলিতে তেলের খনি কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শহরের জনসংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে- যেমন, সৌদি আরব, কুয়েত, আমীরশাহী, ইত্যাদি এবং, ইরাক বা ইরানের মতো মুষ্টিমেয় কিছু দেশ বাদ দিলে অধিকাংশ দেশেই দক্ষ বা অদক্ষ কর্মীর অভাব থাকাতে পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে, [যেমন মিশর, সিরিয়া, জর্ডন] এদের নিয়ে আসা হত স্বল্প মেয়াদী চুক্তির ভিত্তিতে। এই সব পরিযায়ী শ্রমিক [migrant labourer] -রা কোন দেশেই চিরস্থায়ীভাবে থাকতে না পারায় বারংবার স্বদেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। শহরে পরিযায়ী শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগের সম্ভাবনা বেশি হওয়াতে, এবং নগরজীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার দরুন এরা সাধারণত দেশে ফিরেও শহরেই থেকে যায় — এবং অধিকাংশক্ষেত্রে এরা ছোটখাটো শিল্প বা পরিসেবার সঙ্গে যুক্তহয়ে যায়। ফলে, উভয়ক্ষেত্রেই নগরভিত্তিক অর্থনীতি পুষ্ট হতে থাকে, এবং ৮০-র দশকে জনজীবনে নগরের গুরুত্ব বেড়ে যায়।[৫] ১৯৯০ সালে পশ্চিম এশিয়ায় ৫৭% লোক নগরবাসী [১৯৫০ সালে ২৪%], এবং ইয়েমেন বাদে প্রায় সব দেশেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীই শহরে বসবাস করেন। অনুরূপভাবে, ওমানের মতো মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশ বাদ দিলে অধিকাংশ দেশেই কৃষিজীবিদের সংখ্যা আজ ৩০%-এরও কম।[৬] বর্তমান পশ্চিম এশিয়ার নগরায়নের গতি এবং প্রক্রিয়া ঐ অঞ্চলের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে পশ্চিম এশীয় জনজীবনে বেসরকারি আর্থ-সামাজিক সংগঠনের গুরুত্ব ৮০-র দশক থেকে ক্রমশ বেড়েছে -- যেমন, পেশাজীবীদের সংগঠন, স্বাস্থ্যসংগঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এবং সর্বোপরি সংবাদমাধ্যম। এ অঞ্চলের জনজীবনে এই বেসরকারি সংস্থাগুলির প্রভাব তুলনামূলকভাবে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের অনুপাতে অনেক বেশি, কারণ পশ্চিম এশিয়াব অধিকাংশ দেশেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অনুপস্থিত। ফলে, পরিবার এবং কর্মস্থলের বাইরে নাগরিকদের মধ্যে মতবিনিময়ের তৃতীয় একটি ক্ষেত্রের গুরুত্ব এ অঞ্চলে খুব বেশি। সাধারণত প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রে জনগণের দাবিদাওয়া, চাহিদা সরকারের দৃষ্টিগোচর করার যে কাজ রাজনৈতিক দলগুলি করে থাকে, পশ্চিম এশিয়ায় তা এই রকম বেসরকারি সংস্থাগুলির ওপর বর্তায়। পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসীরা বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও জাতি-এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ ছিল। উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে আরব বা রাষ্ট্র-নির্ভর জাতীয়তাবাদ এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কতকটা নিয়ন্ত্রণে আনলেও রাষ্ট্র নিজ স্বার্থেই জাতি-বা গোষ্ঠী-ভেদ দূর করেনি, কারণ তাতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন ঐক্যবদ্ধ প্রতিপক্ষের উত্থান সহজ হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে, আর্থ-সামাজিক কারণে পশ্চিম এশিয়ার একটা বড় অংশে উপজাতীয় বিভাজনের ঊর্দ্ধে ওঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা

যায়-মূলত পেশাগত বা অর্থনীতিগত প্রয়োজন কেন্দ্র করে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন বণিকসভা, ছাত্রসংগঠন কারিগরসভা, প্রযুক্তিবিদদের সংগঠন, সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পেশাজীবীদের সংগঠন —সকলেই সরকারের কাছে নিজস্ব চাহিদা জানাতে সরব হয়েছে। যেমন সৌদি আরবে ছাত্র সংগঠনগুলি তাদের যোগ্যতা অনুসারে জীবিকার দাবি জানাচ্ছে, এবং প্রয়োজনে বহিরাগত পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা কমানোর দাবি জানাচ্ছে। অন্যদিকে, সৌদি বণিকসভা চায় যে পরিযায়ী শ্রমিক আনার রীতি অব্যাহত থাকুক কারণ একই কাজের জন্য সৌদি নাগরিককে অনেক বেশি অর্থ দিতে হয়। লেবাননের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার চাপে লেবাননের যুযুধান সম্প্রদায়গুলি ইজরায়েলি সেনা অপসারণের পর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা ভাবছে, যা লেবাননের ইতিহাসে দেখা যায়নি। তাই ইরাকের মতো কিছু দেশ বাদ দিলে, যেখানে রাষ্ট্র সচেতনভাবে বেসরকারি সংস্থার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় বেসরকারি সংস্থাগুলি জনজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল যে এই বেসরকারি সংস্থাগুলির সুবাদে আজ পশ্চিম এশিয়ায় নাগরিক সচেতনতা ব্যাপক হারে বেড়েছে। ফলে, বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও যেসব অসুবিধাগুলি নাগরিক জীবনের প্রাত্যহিক অঙ্গ বলে স্বীকৃত ছিল, আজ সেগুলি দূর করার প্রচেষ্টাই বরং স্বাভাবিক বলে মানা হয়।

নাগরিক সচেতনতা বাড়ার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৭৮ সালেও ওমানের উত্তরে অবস্থিত আল-হামরা শহরে বহির্দুনিয়ার খবর শহরবাসীরা পেতেন গোষ্ঠীপতি শেখ আব্দুলার কাছে আসা অতিথিদের কাছ থেকে। বর্তমানে, আল-হামরার প্রতি বাড়িতে টিভি-র দৌলতে সারা বিশ্বের চিত্র পৃথিবীর যে কোন জায়গার মতোই সমান সুলভ।[৭] ফলে, পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসীরা পাশ্চাত্য দুনিয়ার নগরজীবন এবং তাদের নিজস্ব নগরজীবনের তুলনা করতে পারছে এবং সেই অনুসারে তাদের চাহিদার পরিমার্জন ঘটাচ্ছে। মিশর এবং ইরানের বর্তমান উদারপন্থী এবং সংস্কারবাদী আন্দোলনের উৎসই ছিল যথাক্রমে ৮০-ও দশকের শেষভাগে এবং ৯০-এর গোড়ার সংবাদমাধ্যমের উদারীকরণের ভিত্তিতে। ইরানের বর্তমান রাষ্ট্রপতি মহম্মদ খাতমির জনপ্রিয়তার মূল কারণ তিনি সম্প্রচারমন্ত্রী হিসেবে ১৯৯১-৯২ সালে সংবাদমাধ্যমের ওপর বিধিনিষেধ কমান এবং উপগ্রহ চ্যানেল সম্প্রচারের অনুমতি দেন। খাতমির অন্যতম সহযোগী তাঁর ভাই রজা খাতমি একাধিক সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। সংবাদমাধ্যমের এই বিপুল বিস্তারের অন্যতম কারণ অবশ্যই জনসমাজে স্বাক্ষরতার ব্যাপক বিস্তার।[৮] স্বাক্ষরতার প্রসারের দরুণ পশ্চিম এশীয়রা স্বীয় সংস্কৃতির বিষয়ে তাদের আগের প্রজন্মের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন। তাই, বিশুদ্ধবাদীরাও "সত্ত্বাবিপন্ন" (identity in crisis) গোছের কোন যুক্তির অবতারণা করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে পারছে না। ফলে, শতাব্দীর গোড়াতেও যেখানে নাগরিক চিন্তা শহরের চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, আজ উপগ্রহ চ্যানেলের দৌলতে সেখানে ম্যাকডোনাল্‌স, এবং কোকা কোলার পাশাপাশি

নাগরিক অধিকার এবং নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বের বিষয়ে সচেতনতা উত্তরোত্তর বাড়ছে। এবং বিকল্প শাসনের পরবর্তী যুগে যে কড়া রাষ্ট্রীয় অনুশাসন এই অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মনে করা হত, আজ তা শিথিল করার দাবিই কম বেশি পশ্চিম এশিয়ায় সর্বত্র শোনা যাচ্ছে।

এই ক্রমপরিবর্তনশীল অবস্থায় অনুঘটকের কাজ করছে বর্তমান পশ্চিম এশীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। ৭০-এর দশকের শেষ থেকে বিশ্ববাজারে তেলের যে হারে মূল্য হ্রাস হতে থাকে তাতে ৮০-র দশকের শেষ দিকে সমস্ত রাষ্ট্রই কমবেশি বিপন্ন বোধ করে। ১৯৯০ থেকে ইরানে ধীরলয়ে হলেও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদারীকরণ শুরু হয় এই কারণেই। ইরাক-ইরান যুদ্ধ শেষ হবার পর পুনর্নির্মাণের কাজে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল রাষ্ট্র তা যোগাড় করতে ব্যর্থ হয়ে বাজারের দারস্থ হয়, বিনিময়ে উঠে যায় বহু বিধিনিষেধ। ১৯৮৮ সালে সৌদি সরকার ১৯৬০-এর পর প্রথম বাজেট ঘাটতির সম্মুখীন হয়। উপসাগরীয় যুদ্ধের পরে আর্থিক দুর্গতি এড়াতে সৌদি সরকার প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ের দোহাই পেড়ে কিছু নাগরিক সুযোগ-সুবিধা কমাতে বাধ্য হয়। এর বিনিময়ে নাগরিক সমাজ থেকে সংবিধান তথা আইনের শাসনের দাবি উঠলে ১৯৯২ সালে মৌলিক আইনাবলীর প্রণয়ন করা হয় এবং পরামর্শদানের জন্য মজলিস আল-সুরা গঠিত হয়। নাগরিক সমাজের কাছে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কুয়েত আরও একধাপ এগিয়ে যায়। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ে ইরাকের কবলে থাকার দরুন যে বিশাল আর্থিক বোঝা কুয়েতের ওপের চাপে তা দূর করতে ১৯৯২ সালে কুয়েতে প্রথমবার আয়কর চাওয়া হয়; বিনিময়ে কুয়েতের জনজীবনে নির্বাচিত আইনসভায় ফিরিয়ে আনা হয়। একইভাবে তৈলভান্ডার প্রায় ফুরিয়ে আসার কারণে যে বেকার সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার ফলে বাহরিন-এ ২০০১ সালে নাগরিক সমাজের চাপে নির্বাচিত আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৯]

মানতেই হবে উল্লেখিত পরিবর্তনগুলি এখনো সংখ্যায় খুবই নগণ্য। রাষ্ট্রযন্ত্রের দুর্বলতা এখনো খুব কম ক্ষেত্রেই আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। পশ্চিম এশিয়ায় আজও অধিকাংশ দেশেই রাজনৈতিক দল হয় নিষিদ্ধ না হয় হাজার বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভাবে জঙ্গী, ইসলামী মৌলবাদ আজও পশ্চিম এশিয়ার বেশ কিছু সমাজে এক গ্রহণযোগ্য বিকল্প। তা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমপরিবর্তনশীল নাগরিক সমাজের বলিষ্ঠতা সমগ্র অঞ্চলেই রাজনৈতিক স্থিরতা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণের ক্ষেত্রে এক আশাব্যাঞ্জক বিকল্পের সন্ধান দিচ্ছে। রক্ষণশীল ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং কড়া রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের কারণে পশ্চিম এশিয়ার নাগরিক সমাজের যে স্থবিরতার চিত্র আমরা পাই তার উল্টোপিঠটার কথাও মনে রাখা প্রয়োজন।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। Ellie Kedourie, *Democracy and Arab Political Culture*, (Washington D.C., WINEP, 1992); Bernard Lewis, *Shaping of the Modern Middle East* (New York, OUP, 1994); Ernest Gellner, *Conditions of Liberty: Civil Society and its Rivals* (New York, Penguin, 1994)

২। Ferhad Kazemi & A.R. Norton, Civil Society and Prospects for Reform in the Middle East, (Leiden, E.J.Brill, 1995)

৩। F. Gregory Gause III, *Oil Monarchies: Domestic and Security Challenges in the Arab Gulf States*, (New York, CFRP, 1994); H. Katouzian, Political *Economy of modern Iran: Despotism and Pseudo-modernism* 1921-79, (London, Macmillan, 1981)

৪। Alasdair Drysdale, Gerald Blake, *Middle East and North Africa*, (NY, OUP, 1985) p., 237-51

৫। Elias H. Tuma, "Economies of the Middle East," in D. Gerner ed.,*Understanding the Contemporary Middle East*, (Boulder Colorado, Lynne Rienner Publishers inc., 2002), p. ^19-30

৬। V.M. Moghadam, "Population Growth, Urbanisation, Challenges of Unemployment" in D. Gerner.

Ed. ibid., p. 240-42.

৭। Dale Eickelman, "Inside the Islam.c Reformation" in *Washington Quarterly*, Winter 1998, p.82.

৮। এই অঞ্চলে শিক্ষা এবং স্বাক্ষরতার প্রসার ঘটেছে অভাবনীয় হারে। সবথেকে অনগ্রসর দুটি দেশ দেখলেই এটা বোঝা যাবে। ১৯৬০ সালে সৌদি আরবের মোট অপ্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীদের ৭% স্কুলে যেত: ১৯৮৮ সালে সেই হার হয়েছে ৬৩%। ১৯৬৯-৭০-এ মোট ৮০৮ জন সৌদি স্নাতক হয়, সবাই ছিল বহির্দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র: ১৯৮৫-৮৬ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৫,৩০১, যার ৯০% দেশেই পড়েছে। ওমানে স্কুল পড়ুয়ার সংখ্যা ৩% (১৯৭০)) থেকে ৭৫% (১৯৮৮) হয়েছে।

৯। F.G. Gause III, "The gulf conundrum : Economic Change, Population Growth and Political Stability inGCC States" in Washinton Quarterly, Winer 1997 p. 146-52.

ভারত-আফগানিস্তান ঃ সাংস্কৃতিক অনন্বয়ের প্রেক্ষিতে অন্বয়ী ঐতিহ্যের পুনঃউত্তরাধিকার

মলয় কুমার দাস

সংস্কৃতি জাতি সত্তার মৌল চিহ্নায়ক। সংস্কৃতি হল জীবন প্রবাহের অভিব্যক্তি। কিন্তু জাতি অর্থে সমস্ত ভেদবুদ্ধির উর্দ্ধে মানবশ্রেণীকেই বোঝায়। যদিও রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক দৃষ্টিকোণে এই মানব জাতি সত্তার বহুধা বিভক্ত রূপকেই বারবার চিহ্নিত করবার চেষ্টা হয়েছে ইতিহাসে, সভ্যতায়, ব্যাপকতর ও গভীরতর সর্বময় দৃষ্টির প্রেক্ষিতে তাই সংস্কৃতিকে ঐ সব শ্রেণী চিহ্নিত অভিধার বাইরে মানব সংস্কৃতি রূপে দেখাই হবে যুক্তিযুক্ত। মানুষে মানুষে এক সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজের, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সংস্কৃতিগত মেলবন্ধনই বিশ্ব-সংস্কৃতি গড়ে তোলে। প্রত্যেকটি সমাজ ও দেশের সংস্কৃতি আলাদা, আলাদা, কিন্তু এই সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের মধ্যেই কিছু কিছু মিল থাকে। সেই মিলের মধ্য দিয়েই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট গড়ে ওঠে। ফলে সংস্কৃতির মৌল আশ্রয় বিন্দু যদি হয় মানব, তা হলে সারাবিশ্বে ধর্ম-বর্ণ চিহ্নিত প্রত্যেকটি মানুষকে একই মানবরূপেও তাদের সংস্কৃতিকে অভিন্নরূপে দেখা সমীচীন। সভ্যতায় ঊষালগ্ন থেকেই এই সংস্কৃতির বন্ধন বিচিত্র পথে গড়ে উঠেছিল। কোন একটি দেশ তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতিগত সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। অর্থনীতির বিচিত্র পথে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সূত্র ধরে বিভিন্নদেশের মধ্যে এক অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অতীত ইতিহাস ও মানব ঐতিহ্যের সারাৎসারে একথাই বারবার স্পষ্ট হয়ে উঠতে চেয়েছে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্যান্য দেশের মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব-সহস্রাব্দ বছর পূর্বে গড়ে ওঠার নজির প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। আর এই দৃষ্টিকোণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত ভারত ও আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক অভিন্নতার রূপ-রেখাটি আজকের আধুনিকোত্তর বিশ্ব-রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে নতুন করে মূল্যায়নের বিষয়টি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কেননা বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষিতে আমরা অনুভব করছি আমাদের সাংস্কৃতিক অন্বয় নেই। অন্বয় ভেঙ্গে অনন্বয়ী হয়ে গেছে। সাংস্কৃতিক অন্বয়ের মূল বক্তব্য হল একটি সংস্কৃতির সঙ্গে আর একটি সংস্কৃতির মেলবন্ধন নয়, একাত্ততা আবিষ্কার। একাত্ততা যা সমন্বয় মানে যোগ বা এক নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমন্বয় অর্থাৎ মূলে এক।

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বনাঞ্চলহীন বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি, বালুকাপূর্ণ মরুভূমি,

উর্বর প্রস্তর যুক্ত অনুর্বর বালুকাযুক্ত অনুর্বর বৈশিষ্ট সম্পূর্ণ মৃত্তিকা. চরম ভাবাপন্ন ও মহাদেশীয় প্রকৃতির জলবায়ু, শিল্পে অনুন্নত, কৃষিকাজ ও পশুপালন নির্ভর জীবিকা, নেই কোন নাম করা পণ্য, সম্মানহীন শিল্প কলা, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বিমুখ আফগানিস্তান অবস্থিত।[১] বর্তমান দুনিয়ায় আফগানিস্তান-এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। এর চারিদিকেই অন্যদেশ অবস্থিত। পূর্বে ভারত ও পাকিস্তান, পশ্চিমে ইরাণ, উত্তরে রাশিয়ান কমনওয়েলথের তাজাকিস্থান ও তুর্কমেনিস্তান। উত্তর-পূর্ব দিকে দন্ডায়মান সুউচ্চ হিন্দুকুশ পর্বতমালা দেশটাকে উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে থেকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।[২] তবে খাযাক, আখরোবাট এবং লুকসান গিরিপথ দিয়ে দুই অংশের মধ্যে চলাচল হয়। কাবুল, গজনী, কান্দাহার, মজার-ই-শরিফ, দৌলতাবাদ, হিরাট, জালালাবাদ, দৌলত-ইয়ার ইত্যাদি হল প্রধান শহর। আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তের দৈর্ঘ (ওয়াখান অঞ্চল) মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার। বর্তমানে এই অঞ্চল পাকিস্তানের দখলে থাকায় প্রকৃতপক্ষে ভারতের সঙ্গে কোন সাধারণ সীমান্ত নেই। দেশটির আয়তন ভারতের আয়তনের কুড়ি শতাংশ। অর্থাৎ ছয় লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশ বর্গ কিলোমিটার।[৩] জনসংখ্যা প্রায় দু'কোটি।[৪]

চোরা-চালান, দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ, উপজাতীয় কোন্দল, দুর্ভিক্ষ, উচ্চহারে মৃত্যু, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ, ইসলামী মৌলবাদ, তালিবান শাসনে নিষ্পেষিত ভারতের প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তান আজ কোন ভাল অর্থে আমাদের কাছে পরিচিত নয়।[৫] এটি একটি আজব দেশ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্যের লোকেদের কাছে)। যুদ্ধে এবং খিদেয় মানুষের মৃত্যু নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বেশিরভাগ মানুষ হয় শরণার্থী না হয় দেশত্যাগী।[৬] এর সঙ্গে আফগানিস্তানে যুক্ত হয়েছে মানবসভ্যতা রক্ষার অজুহাতে অর্থাৎ বিশ্বসন্ত্রাসবাদ দমনের লক্ষ্যে মুহুর্মুহু বোমাবর্ষণ। এই ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ। মৌলবাদীরা ধ্বংস করেছে বামিয়ানে ঐতিহ্যমন্ডিত বৌদ্ধমূর্তি। এখানে এখন আসে না কোন পর্যটক। আপাতত নেই কোন শান্তি, স্থিতি, ভবিষ্যৎ। বিনিয়োগ করে না কোন ব্যবসায়ী।[৭] এর শেষ কোথায় ? আজ আফগানিস্তান বিশ্বের সমস্ত দেশের খবরের শিরোনামে এই কারণে, গত ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১-এ নিউইয়র্ক শহরে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার গগনচুম্বী ১১০ তলা বাড়ি এবং মার্কিন প্রতিরক্ষার সদর দপ্তর পেন্টাগণ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের দ্বারা বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য।[৮]

ইতিহাসের বিশ্লেষণে এবার আমরা ফিরে যাব। ভারত-আফগানিস্তানের মধ্যে যে অন্বয়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল তার খোঁজে। অবশ্য একথা ঠিক যে.খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতাব্দীর আগে 'আফগানিস্তান' এই নামের কোন দেশের পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বরং ঐতিহাসিক নাম হিসাবে 'অ্যারাকোশিয়া', 'জাঙ্গিয়ানা', 'সবন্তিয়া', 'ব্যাকটিকো' ইত্যাদি নাম হিসাবে বর্তমান আফগানিস্তানের কিছু ভূ-খণ্ডের পরিচয় পাওয়া

যায়। কিন্তু 'ভারত' বা 'ইন্ডিয়া'-র পরিচয় গ্রিক, ল্যাটিন এবং বৈদিক সূত্র অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে পাওয়া যায়। আসলে আফগানিস্তান ভূখন্ডটি দীর্ঘকাল 'বাফার স্টেট' হিসাবে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ ভারত ও ইরাণের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ভূখন্ড হিসাবে দীর্ঘকাল এর অবস্থান ছিল। মধ্যস্থতার যুগ হিসাবে এই সময় আফগানিস্তানের ইতিহাস পরিচিত ছিল। ফলে আফগান ভূখন্ডে ইরাণ ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবেশ বা সংমিশ্রণ ঘটেছে।[৯]

আফগানিস্তানে বিভিন্ন উপজাতির বাস। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাস্তুন, তাজিক, হাজারা, উজবেকিস, চাহায় আইমক, তুর্কমান, বালুচ, ব্রাহুই ইত্যাদি।[১০] বর্তমানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিদেশী মদতে যুদ্ধবিগ্রহ লেগে আছেই। আলাদা আলাদা এই সব উপজাতিগুলির মধ্যে থেকে জন্ম নেয় আফগানিস্তানের গ্রামীণ 'কওম'। ভারত ইতিহাসের বিভিন্নযুগে আফগান উপজাতির মানুষরা হিন্দুকুশ পর্বতের সঙ্কীর্ণ খাইবার গিরিপথ এবং সুলেমান পর্বতের বোলান গিরিপথের মধ্যে দিয়ে ভারতে যাতায়াত করত।[১১] এমনকি এরা ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রভবিত করেছে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসকেও। গাঙ্গেয় উপত্যকার উর্বর সমতল ভূমি প্রাচীনকাল থেকেই আকৃষ্ট করেছিল মধ্যএশিয়ার ঊষর তৃণভূমির যাযাবর এবং বিভিন্ন উপজাতির হানাদারদের। ফলে আফগান উপজাতির যাযাবর মানুষরা এবং কুষাণ, গ্রিক, শক্, হুণ, পাঠান, মোঘল, প্রমুখরা সমুদ্রযাত্রা শুরু হবার অনেকপূর্ব থেকেই ভারতভূমিতে পদার্পণ বা যাতায়াত শুরু করেন। ফলস্বরূপ আমরা প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট সম্পন্ন সংস্কৃতি গড়ে উঠতে দেখি।

হরপ্পা সভ্যতার ভৌগলিক বিস্তার প্রমাণ করে যে আফগানিস্তান হরপ্পা সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক ছিল।[১২] প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারত এবং ইরাণেব মধ্যে যোগ সূত্রতা খুঁজতে গেলে আফগানিস্তানের প্রাচীন ভূ-খন্ডগুলির নাম উঠে আসে।[১৩] সম্প্রতি হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত কিছু নিদর্শন সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতায় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অনেক নতুন পথের সন্ধান দেয়। ভারত-ইরাণ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে (প্রাগৈতিহাসিক যুগে এবং প্রাচীন যুগে) প্রতিবেশী দেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[১৪] সেক্ষেত্রে বালুচিস্তান এবং ইরাণের মধ্যে আফগান ভূখন্ড ছিল 'কমন বর্ডার'। বর্তমানে প্রাপ্ত মেহের গড়ের সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ভারত-আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক যোগ সূত্রের ক্ষেত্রে নতুন আলোর সন্ধান দেয়।[১৫] হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টা কারা এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আধুনিক ইতিহাস চর্চায় একথা প্রমাণিত হতে চলেছে যে আফগানিস্তানের ব্রাহুই উপজাতি এই সভ্যতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[১৬] এই ব্রাহুই উপজাতিকে দ্রাবিড় জাতির উৎস বলা হয়। তাছাড়া হরপ্পা সভ্যতার ব্যাপকভাবে খনন কার্যের ফলে, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো ছাড়া তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতার বহু কেন্দ্র এখন খুঁজে বের করা সম্ভব হয়েছে। আলোচ্য অঞ্চলগুলির উপর গবেষণা করে

দেখা গেছে যে, প্রায় পনেরোলক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী এক বিস্তৃত এলাকায় অর্থৎ উত্তর-পশ্চিমে ইরাণের শেষ প্রান্ত থেকে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ এবং দক্ষিণে গুজরাটের কাম্বে উপত্যকার লোথাল বন্দর পর্যন্ত হরপ্পা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। এই সভ্যতার আর্থিক সমৃদ্ধির আর একটি দিক হল, ব্যবসা-বাণিজ্য। হরপ্পার 'পণি' বা বণিকদের সঙ্গে বেলুচিস্তান, আফগানিস্তানের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগের ফলে প্রাচীন বিশ্বের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিনিময় হয়নি। বরং বলা যায়, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতীয় শিল্প, সংস্কৃতিরও আদান-প্রদান হয়েছিল। প্রাচীন বিশ্বে হরপ্পার সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নিবিড় সম্পর্কের কারণে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এত বেশি হয়েছিল যে, বহু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যায়। বেলুচিস্তান, আফগানিস্তানের সঙ্গেও গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে হরপ্পা নগর সংস্কৃতি আফগান ভূ-খন্ডের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করেছিল।[১৭] হরপ্পার মানুষজন আফগানিস্তানে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং তুর্কমেনিস্তানে তাদের প্রভাব আলতেন-জোপের মৃৎপাত্র ও অন্যান্য ধাতুদ্রব্য থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।[১৮]

সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতা-সংস্কৃতির বিনাশের পর যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতে উদ্ভব হয় তার নাম বৈদিক সভ্যতা। বেদকে ভিত্তি করে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে বলে এর নাম হয় বৈদিক সভ্যতা। এর স্রষ্টাদের 'আর্য' বলা হয়। যারা ইন্দো-ইরাণীয় ভাষায় কথা বলতো। আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ? এই প্রশ্নটি হল বিতর্কিত। প্রচলিত মতবাদটি হল; হিন্দুকুশ ও উত্তর পশ্চিম গিরিপথ অতিক্রম করে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে। দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগতভাবে তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল। আগমনের প্রথম পর্বে 'সপ্তসিন্ধু' অঞ্চল অর্থাৎ আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, সিন্ধুর কিছু অঞ্চলে তারা আধিপত্য বিস্তার করে।[১৯] ব্যাকট্রিয়া-মারজিয়ানার প্রত্নতাত্ত্বিক চত্বর থেকে পশুচারণজীবী ইন্দো-আর্যগণ ভারতীয় সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। এই অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম ছিল উত্তর আফগানিস্তান।[২০] ব্যাকট্রিয়া-মারজিয়ানার অঞ্চল ছিল ঋক্ বেদের সংস্কৃতির সূচনা। এখানে অশ্বের উপস্থিতি, স্পোকযুক্তচাকা, সোমপানীয় উপাসনা, অগ্নি উপাসনা এবং অন্ত্যেষ্টি বা দাহ করার পদ্ধতি (খ্রি:পূ: ১৯০০ থেকে খ্রি:পূ: ১৫০০ অব্দ) দেখা যায়। উত্তর আফগানিস্তান, দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তান এবং উত্তর উজবেকিস্তান বা ব্যাকট্রিয়া-মারজিয়ানার প্রত্নতাত্ত্বিক চত্বর (বি.এম.এ.সি অঞ্চল) থেকে জনগণ যাত্রা করেছিল দক্ষিণ-পূর্ব ইরাণে, দক্ষিণ আফগানিস্তানে, গান্ধার অঞ্চলে এবং কোয়েটা এলাকায়।[২১] এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। হরপ্পা সভ্যতার বহির্ভাগে মানব গোষ্ঠীর আগমন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। যাহা ভারত-আফগানিস্তান এই দুই দেশের সাংস্কৃতিক অন্বয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। উত্তর আফগানিস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এক্ষেত্রে তাৎপর্য বহন করে [২২]

ঋক্ বেদের দ্বিতীয় মন্ডল স্পষ্টতই আফগানিস্তানের এবং সিন্ধুর পশ্চিমদিকের অঞ্চলগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তেমনি চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং অষ্টম মন্ডল সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিকের অঞ্চলের উপর অঞ্চলীভূত অথবা ওইসব অঞ্চলের উপর দৃষ্টি দেওয়া যায়। ভারতে আগত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর (ঋক্-বৈদিক যুগে) অনেকেরই পূর্বেকার বাসভূমি ছিল আফগানিস্তান।[২৩] আফগানিস্তানের পার্বত্য এলাকা স্পষ্টতই যদু-তুর্কদের এবং অনু-দ্রুহ্যদের পূর্বেকার বাসভূমি। একই স্থান থেকে শুরু এবং ভরতদের (পুরু জনগোষ্ঠীরই একটি উপাশাখা) ও ইক্ষাকুদের সিন্ধুনদী পার হওয়ার কথা জানা যায়।[২৪] তাছাড়া বলা যায় যে, সিন্ধু উপত্যকা, ইরাণ, আফগানিস্তান, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর এবং গাঙ্গেয় অঞ্চলের অংশ বিশেষের জনগণ ইন্দো-আর্য বাক্‌ধারা গ্রহণ করেছিল। এর কারণ হল বিরাট ব্যবসায়িক কর্মকান্ড। আবার এটাও লক্ষণীয় যে ব্যাকট্রিয়া এবং মারজিয়ানা অঞ্চলে আর্যদের সঙ্গে দাস এবং দস্যুদের ক্রমাগত সংঘর্ষ লেগে ছিল। ফলে এই সব অঞ্চলে ঋক্‌বেদে উল্লিখিত কাঠামোর ধরণ লক্ষ্য করা যায়। এই কারণের জন্য ইন্দো-আর্য আধিপত্যের ফলে তাদের ভাষার প্রসার ঘটেছিল উত্তর আফগানিস্তান এবং দক্ষিণ-পূর্ব তুর্কমেনিস্তানে।[২৫] ভাষার প্রসার সাংস্কৃতিক অন্বয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ভবিষ্যতে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটলে আজাদ কাশ্মীর হয়ত আমাদের অনেক নতুন তথ্য যোগান দেবে ভারত-আফগানিস্তানের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক অন্বয় খোঁজার ক্ষেত্রে।

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ বছর আগে ঋক্‌বেদে 'কুভ' শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমান কাবুল দেশটি হল অতীতের 'কুভ'। এটি হিন্দুকুশের দক্ষিণে কাবুল নদীর ধারে উর্বর উপত্যকায় অবস্থিত।[২৬] ভারত-আফগানিস্তানের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে যাতায়াত, আক্রমণ বা আগমণ বা স্থানান্তরের মধ্যে দিয়ে পথ-ঘাট, বিশ্রামের স্থান, প্রাচীন জনপথ এবং সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক আদান প্রদান গড়ে ওঠে।[২৭] বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও দেশগুলির ভূমিকা এক্ষেত্রে অপরিসীম।

ভারতে ইন্দো-আর্যভাষাভাষী মানুষরা ছড়িয়ে পড়ার পর ভারতের বৌদ্ধ-প্রচারকগণ মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানে গিয়েছিল এবং সেখানে ধর্মপ্রচার করেছিল। প্রাচিন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনা করতে গেলে আফগান ভূ-খন্ডকে বাদ দিলে চলবে না। কারণ বৈদিকোত্তর শতাব্দীগুলিতে ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার পূর্বের শাখার ভাষাভাষী মানুষজন আফগানিস্তানের উপর দিয়ে খাইবার, বোলান, গোমাল এবং অন্যান্য গিরিপথ দিয়ে আক্রমণকারী অথবা পরিযায়ী হিসেবে ভারতে আগমণ অব্যাহত রেখেছিলেন। খ্রি:পূ: ৫১৭ অব্দে আকামেনিদগণ উত্তর পশ্চিমে অঞ্চল দখল করেছিল। খ্রি:পূ: ৩২৬ অব্দে আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে ম্যাসিডোনীয় গ্রিকগণ ভারত আক্রমণ করেছিল। খ্রি:পূ: দ্বিতীয় এবং প্রথম শতকে শক, পহ্লব এবং কুষাণগণ ভারত আক্রমণ অব্যাহত

রেখেছিল। তাদের সঙ্গেই এসেছিল তোচরীয়গণ যারা আদিতে ছিলেন ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার পশ্চিমের শাখার ভাষাভাষী, কিন্তু পরে ইন্দো-ইরাণীয় ভাষাভাষীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে হূণদের আবির্ভাব ঘটেছিল।[২৮] এর পরে ছিল পাঠান, সুলতান ও মোঘলরা। ফলে ভারত-আফগান ইতিহাসকে সমৃদ্ধশালী করেছিল।

আফগানিস্তানে শুধু ব্রাহুই নয়, বহু উপজাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় যাহা পূর্বোল্লিখিত। আফগান ভূখণ্ডে শাসন ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ ভাবে উপজাতিগুলোর হাতে। দেশের কৃষি অর্থনীতি এবং প্রকৃতিগত সংস্কৃতির জন্য এখানে উপজাতীয়তা চিরস্থায়ী হয়ে রইল।[২৯] তথাপি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠশতক থেকে চতুর্থ শতক নাগাদ গ্রিক সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে এরাই গড়ে তুলেছিল প্রতিরোধ। শেষ পর্যন্ত খ্রি: পূ: ৩৩০ অব্দ পারসিকদের তাড়িয়ে গ্রিস থেকে আলেকজান্ডার এসে হেরাত, কাবুল, কান্দাহারে রাজ্য স্থাপন করেন।[৩০] আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাধক্ষ্য সেলুকাসের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩১] আলেকজান্ডার আফগানিস্তান জয় করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বেশ কিছু রাজ্য জয় করেন। শুরু হয় ইন্দো-গ্রিক সম্পর্কের ইতিহাস। অঞ্চলগুলিতে এরপর গ্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। সেলুকাসের সঙ্গে ভারতে মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের যুদ্ধ বাধে (খ্রি: পূ: ৩০০ অব্দ)। সেলুকাস পরাজিত হয়ে সন্ধিস্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধি ছিল এশিয়ায় প্রথম আন্তর্জাতিক সন্ধি।[৩২] সন্ধির শর্তানুসারে সেলুকাস কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বেলুচিস্তানের অন্তর্গত মাকরাণ প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে অর্পণ করেন। ফলে খ্রি:পূ: ৩০৫ অব্দে আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও কান্দাহারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসন কায়েম হয়। এর পর দেখা গেল বিন্দুসার ও সম্রাট অশোকের শাসনকাল।[৩৩] খ্রি: পূ: চতুর্থ থেকে খ্রি: পূ: তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি কালের মধ্যে মৌর্য সাম্রাজ্যবাদের শিকার যে আফগানিস্তান হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে অশোকের শিলালেখ থেকে।[৩৪] এই সময় আফগানিস্তান পরিচিত ছিল প্যালেপনিসিয়া, এ্যরাকোসিয়া ইত্যাদি নামে। আফগানিস্তান বৃহৎ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেখানে ভারতের ন্যায় সুষ্ঠু, কেন্দ্রীভূত ও প্রজাহিতৈষী শাসন ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। মৌর্যশিল্পকলা ও সংস্কৃতি ভারত ও আফগানিস্তান উভয়দেশেই বিস্তার লাভ ঘটে। এই শিল্পকলায় পারসিক, গ্রিক, আফগান, আর্য-অনার্যের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এই সময় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে আফগানিস্তান ও অন্যান্য দেশে ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে। কিন্তু অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একাধিক জাতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে বিভিন্ন অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এদের মধ্যে বাহ্লীক দেশীয় গ্রিক, শক, পহ্লব ও কুষাণরা ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এর পূর্বে ডায়াডোটাস, ডেমেট্রিয়স সুযোগ্য নেতৃত্বে আফগানিস্তানের একাংশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু উপত্যকা পরিচালিত হয়। আফগানিস্তানের কিছু অংশে ইন্দো-গ্রিক শাসন তখন বজায় ছিল। উল্লেখযোগ্য

রাজা ছিলেন মিনান্দার, ইউক্রেটাইডিস, হেলিওক্লিস প্রমুখ। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক মুদ্রা থেকে জানা যায় যে ইন্দোগ্রিক পরিবারগুলির রাজ্য ঐ অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ১৩৫ অব্দে মধ্যএশিয়ার ইউ-চি জাতির অন্তর্গত কুশান উপজাতির নেতৃত্বে আফগান অঞ্চল পরিচালিত হত। কুশান বংশের শ্রেষ্ঠরাজা কণিষ্কের রাজত্বকালে এই সাম্রাজ্য উত্তর-মধ্য-পূর্ব ভারতের ভাগলপুর, মথুরা থেকে বাক্তারিয়া, শাকেত, পেশোয়ায় ছাড়িয়ে সমগ্র আফগানিস্তানে বিস্তৃত হয়।[৩৫] এই সময় ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের সঙ্গে মধ্য-এশিয়া ও চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। চীন পর্যন্ত বিস্তৃত সংযোগকারী পথটি 'সিল্করুট' নামে পরিচিত ছিল। কুষাণ আমলে আফগান অঞ্চলে মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। বিশ্বখ্যাত গান্ধার শিল্পের বিকাশ ঘটে। আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমে তৌর্ক ও আরখান দায় নদীর মাঝে উর্বর সমতলভূমিতে গড়ে উঠেছিল বিখ্যাত 'গান্ধার' দেশ। প্রাচীন গান্ধার দেশেরই অংশ আজকের আফগানিস্তান। বর্তমান কান্দাহার প্রদেশেই গান্ধার সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। গান্ধার শিল্প ভারতীয়, গ্রিক, শক্ পার্থিয়ান সংস্কৃতির মিশ্রণে গড়ে ওঠে।[৩৬] এভাবেই বিভিন্ন সময়ে, আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনায় এই সম্পর্কের কথা জানা যায়। বৌদ্ধ স্থাপত্য ও সৌধগুলি দু দেশের সম্পর্কের নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে আফগানিস্তানের উত্তর ও দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলে আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলেও বামিয়ানে বৌদ্ধরাজারা রাজত্ব করত (খ্রিস্টাব্দ ৯০০-১০০০)। গজনীর মামুদ ক্ষমতায় আসার পর (১১০০ খ্রিস্টাব্দে) বৌদ্ধ রাজত্বের অবসান হয়। মঙ্গোল জাতি, তৈমুর এর শাসন, চেঙ্গিজখানের নৃশংস অভিযানের পর মোঘল রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে নাদিরশাহ্ মোঘলদের আফগানিস্তান ছাড়তে বাধ্য করে। নাদির শাহের আমলে আফগান অঞ্চল ছিল বৃহত্তর খোরাসান প্রদেশের অংশ। নাদির শাহের মৃত্যুর পর তার আফগান সেনাধ্যক্ষ আহ্মেদ আবদালি মূল বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কছেদ করে চার হাজার সৈন্যের বিশ্বস্ত দল নিয়ে ইরাণ-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে। আফগান ভূখন্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা করায় ইতিহাসে আফগানিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[৩৭] আদি মধ্যযুগে এবং মধ্যযুগে বিশেষত সুলতান ও মুঘল শাসনের সূচনা পর্বে ও তারও পরবর্তীকালে আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বিরাজ করেছিল। মহাভারতে যেমন গান্ধার অঞ্চলের কথা জানা যায় তেমনি ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে দুই দেশের অন্বয়ী ঐতিহ্যের কথা জানা যায়। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওলাতেও আফগান মানুষদের কথা উঠে আসে। কিন্তু আজ দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক অনন্বয় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যাহা কখনই কাম্য নয়।

আজকের আফগানিস্তান বলতে বুঝি তালিবানি শাসনে নিষ্পেষিত, সাম্রাজ্যবাদী

আক্রমণে বিধ্বস্ত একটি দেশ। অথচ এই আফগানরা ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে ও যুদ্ধ করেছিল। ব্রিটিশরা আফগান-স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তানের দেশভাগের সময় আফগানিস্তানে পুশ্‌তুনিস্তানের দাবি ওঠে। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ছাত্র সংঘর্ষও দেখা দিয়েছিল। খরা ও দুর্ভিক্ষের ফলে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। উপজাতি বিদ্রোহ চলেছিল। সোভিয়েত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক আফগান নিজের নিজের উপত্যকা রক্ষার জন্য 'মুজাহিদ'-এ পরিণত হয়। সোভিয়েত পিছু হটার সঙ্গে সঙ্গে আফগানরা পরস্পরের মধ্যে লড়াই শুরু করল। প্রতিবেশী দেশ এবং আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেদের ভাড়াটে বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সামরিক গোষ্ঠীগুলোকে কাজে লাগাল। গৃহযুদ্ধে হয়রান সাধারণ জন সাধারণকে নিরস্ত্র করে, শান্তির কথা বলে, শ্বেত কবুতর হাতে নিয়ে পাকিস্তান তালিবান বাহিনী পাঠালে আফগানরা তা গ্রহণ করল। ফল হল মারাত্মক। আফগান ভূ-খণ্ডের বেশিরভাগ অঞ্চল দখল করে তালিবানরা। তালিবান শাসকরা সন্ত্রাসবাদী নায়ককে ধরিয়ে দিতে অস্বীকার করায় মানব সভ্যতাকে রক্ষার জন্য আফগানিস্তান হল যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু। পরিবর্তন হল আফগান শাসন ব্যবস্থায়। তালিবানি শাসনের অবসানের পর নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। এখানে শেষ নয়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর তেলের রাজনীতি এক নতুন ঐতিহাসিক স্তরে প্রবেশ করে। মধ্য এশিয়া হল তেল ও ন্যাচারাল গ্যাসের অফুরন্ত ভান্ডার। নিরবচ্ছিন্ন তেল ও গ্যাসের শোষণ চালানোর জন্য চাই আফগানিস্তানের উপর নিয়ন্ত্রণ। সন্ত্রাসবাদ দমনের মোড়কে ফিরে এল আফগানিস্তানকে নিয়ে নতুন রাজনৈতিক সার্কাস। এর গুণাগার দিচ্ছে নিরীহ নিরপরাধ সাধারণ মানুষ। কিন্তু আর কতদিন ? এরা চায় সহজ, সরল সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশ। কিন্তু এই দেশের সংস্কৃতি যে যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছিল এবং তা যে ভারত ইতিহাসের সংস্কৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছিল তার খবর আমরা কমই রাখি। মধ্য এশিয়ার মানুষ চাইছে প্রাক্-ইসলাম ইন্ডিয়াতে ফিরে যেতে। যত ওরা চাইবে তত ইসলামের ধর্মান্ধতা কমবে। আগামীদিনে যাতে কোন অশনি সংকেত না দেখা দেয় তার জন্য ভারতবর্ষকে যে পথ বেছে নিতে হবে তাহল, অন্বয়ী ঐতিহ্যের পুন:উত্তরাধিকার। আফগানিস্তান বা মধ্যএশিয়ার মানুষ চাইছে বর্তমান সঙ্কটময় সময়ে ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়াক। তবে একথাও ঠিক যে, ভারতের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও ভারতের একক নেতৃত্ব কেউ মেনে নেবে না। কারণ বর্তমান বিশ্ব-রাজনীতির বাতাবরণ। যেখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া সহ অন্যান্য শক্তিশালী রাষ্ট্র রয়েছে। তবে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। আমাদের এটা বোঝার তাই এখন সময় এসেছে। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির প্রতি।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। প্রকাশিত ভালো ভূগোল বই থেকে আফগানিস্তানের ভৌগলিক পরিচয় বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

২। ঐ

৩। ঐ

৪। ১৯৯২ সালের গণনা অনুযায়ী।

৫। সম্প্রতি বিশ্বসন্ত্রাসবাদ দমনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীদের সাথে আফগানিস্তানের যে যুদ্ধ হয়েছিল তার সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সেই সকল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লেখা। আলাদাভাবে নাম উল্লেখ করা হল না।

মহ্সীন মখমলবফ, আফগানিস্তানের ট্রাজেডি, প্রবন্ধ, প্রকাশক মন্থন, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১-১৫।

৬। ঐ

৭। ঐ

৮। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন।

৯। হিস্টোরিকাল জিওগ্রাফি অফ্ এনসেন্ট আফগানিস্তান-এর উপর লেখা যে কোন বই থেকে বিষয় সংগ্রহ করা যেতে পারে।

১০। ইরফান হাবিব, ইভলুউসন অফ্ দ্য আফগান ট্রাইবাল সিস্টেম, প্রবন্ধ, আলিগড় হিস্ট্রোরিয়ান সোসাইটি, ২০০১, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস, ৬২ তম অধিবেশন, পৃ. ২৭-৩৫।

১১। মহ্সীন মখমলবফ, প্রবন্ধ, আফগানিস্তানের ট্রাজেডি, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪৩-৪৪।

১২। হরপ্পা সভ্যতা বিষয়ে বহুগ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। এদের মধ্যে, ডঃ মার্টিমার হুইলার, হরপ্পান সিভিলাইজেসন।

অধ্যাপক এ.এল. ব্যাসাম, দ্যা ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া।

ডি. এন. ঝা, এ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল আউটলাইন, নিউদিল্লী, জি.এল. পোসেল (সম্পা), হরপ্পান সিভিলাইজেশন, নতুন দিল্লী, ১৯৮২।

১৩। ব্রিজেৎ অলচিন এবং রেমন্ড অলচিন, দ্য রাইজ অফ্ সিভিলাইজেশন ইন ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান, কেমব্রিজ, ১৯৮২।

বি.কে. থাপার, রিসেন্ট আর্কিওলজিক্যাল ডিসকভারিজ ইন ইন্ডিয়া, প্যারিস ও টোকিও, ১৯৮৫।

শিরীন রত্নাগর, এনকাউন্টার্স : দ্য ওয়েস্টার্লি ট্রেড অফ্ দ্য হরপ্পান সিভিলাইজেশন, দিল্লী, ১৯৮১।

১৩। এম.কে. ধাবালিকার, ইন্ডিয়া-ইরাণ কনট্রাকস্ ইন্ প্রি-হিস্ট্রি, প্রবন্ধ, দ্য আলিগড় হিস্ট্রোরিয়ানস্ সোসাইটি, ২০০১, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস, ৬২তম অধিবেশন, পৃষ্ঠা ১-১০।

১৪। ঐ.

বি.বি.লাল, নিউ লাইট অন দ্য ইন্ডাস সিভিলাইজেসন, নিউদিল্লী, ১৯৯৪, আর.ই.এম. হুইলার, ইরাণ এ্যান্ড ইন্ডিয়া ইন প্রি-ইসলামিক টাইমস্, এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, ১৯৪৭-৪৮।

১৫। জে.এফ. ইয়ারিজ, এক্সক্যাভেশন অ্যাট মেহেরগড়: দেয়ার সিগনিফিকেন্স ফর আন্ডার স্ট্যান্ডিং দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ্ দ্য হরপ্পা সিভিলাইজেশন।

১৬। আর.এস. শর্মার বক্তব্য, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৬২তম অধিবেশন, প্যানেল বক্তব্য, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস, ৬২তম অধিবেশান, ভূপাল, ২০০১।

১৭। হরপ্পা সভ্যতা সম্বন্ধে পূর্ব উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ।

১৮। রামশরণ শর্মা, আর্যদের ভারতে আগমণ, অনুবাদ গৌতম নিয়োগী, কলকাতা, ২০০১, পৃ: - ৭০।

১৯। ঐ. পৃ: ৪১-৭২।

জিম জি শ্যাফার, দ্য ইন্দো-এরিয়ান ইনভেনশনস : কালচারাল মিথ অ্যান্ড আর্কিওলজিক্যাল রিয়েলিটি।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার (সম্পা), দ্য বেদিক এজ, বম্বে, ১৯৫১।

ঋগ্বেদ, বাংলা অনুবাদ, হরফ প্রকাশণী।

আর.এন.নন্দী, এরিয়ান সেটলমেন্টস অ্যান্ড ঋক্‌বেদ, ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল রিভিউ, ২১ বর্ষ, ১ ও ২ সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৪, জানুয়ারি ১৯৯৫।

২০। রামশরণ শর্মা, আর্যদের ভারতে আগমণ, অনুবাদ, গৌতম নিয়োগী, কলকাতা, ২০০১, পৃ: ৫৭-৬৯।

২১। ঐ

২২। ঐ

২৩। ঐ পৃ: ৬৩।

২৪। ঐ

২৫। ঋগ্বেদ, বাংলা অনুবাদ। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইতিহাসের আলোকে আর্য সমাজ, কলকাতা, রামশরণ শর্মা, আর্যদের ভারতে আগমণ, বাংলা অনুবাদ, কলকাতা।

২৬। ঋগ্বেদ

মহসীন মখমলবফ, প্রবন্ধ বামিয়ান ও আফগানিস্তান, বাংলা অনুবাদ, আফগানিস্তানের ট্রাজেডি, কলকাতা।

২৭। ঐ

২৮। রামশরণ শর্মা, আর্যদের ভারতে আগমণ, অনুবাদ, গৌতম নিয়োগী, কলকাতা, ২০০১, পৃ: ৬৯-৭০।

২৯। মহসীন মখমলবফ, প্রবন্ধ, বাংলা অনুবাদ, আফগানিস্তানের ট্রাজেডি, কলকাতা, পৃ: ৭-৯।

৩০। ঐ, পৃ: ৪৪-৪৫।

৩১। ঐ

৩২। বি.এন. মুখার্জী (সম্পা), হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ্ এ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড, কলকাতা।

৩৩। মহ্সীন মখমলবফ, প্রবন্ধ, আফগানিস্তানের ট্রাজেডি, কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী, কলকাতা, পৃ: ৪৪-৫৫।

এছাড়া মৌর্যবংশের ইতিহাসের উপর বিভিন্ন বই প্রকাশিত, তার থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

দ্য মৌর্যস্ এ্যান্ড ন্যাশনাল ইনটিগ্রেসন, আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি -১-৫, ১৯৯৭, উক্ত আলোচনাচক্র শোনার ভিত্তিতে কিছু তথ্য সংগ্রহ হয়। সেই নিরিখে লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৪। ই.হুল মাৎজ, কর্পাস ইনসক্রিপশনাম ইন্ডিকোরাম, প্রথম খন্ড, লন্ডন, ১৯২৫।

রাধাগোবিন্দ বসাক, অশোকান ইনস্ক্রিপশনস, কলকাতা, ১৯৫৯।

দীনেশচন্দ্র সরকার, ইন্সক্রিপশনস অফ্ অশোক, দিল্লী, ১৯৭৫।

দীনেশচন্দ্র সরকার, সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস।

৩৫। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাইজ অ্যান্ড ফল অফ্ দ্য কুষাণ এম্পায়ার, কলকাতা, ১৯৮৮।

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রেভিন্যু, ট্রেড এন্ড সোসাইটি ইন দ্য কুষাণ এম্পায়ার।

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইকনমিক ফ্যাক্টরস্ ইন কুষাণ হিস্ট্রী, কলকাতা, ১৯৭০।

৩৬। ঐ

৩৭। মহ্সীন মখমলবফ, প্রবন্ধ, আফগানিস্তানের ট্রাজেডি, কলকাতা, পৃ: ৪৪-৪৬, ৭।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম

রঞ্জিত সেন

ইসলামের দুরকম রূপ ইতিহাসে দেখা যায় — একটি হল ভবনিক (global), আরেকটি হল ভুবনায়িত (globalized)। পশ্চিম এশিয়ায়, উত্তর আফ্রিকায় এবং কিছুটা মধ্য এশিয়ায় ইসলাম ভুবনিক-প্রখর ও প্রসারশীল, বিজিত দেশ ও জাতির উপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ও নিয়ন্ত্রণ কায়েমে দুর্বার আত্মপ্রত্যয়শীল একটি শক্তি। দক্ষিণ এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম ভুবনায়িত — পরিবেশ ও পরিস্থিতির দ্বারা সংযত। প্রাক-ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে সহাবস্থানে আগ্রহী এবং নিজের সীমাকে বুঝে নিয়ে প্রসারের থেকে স্থিতির প্রশ্নে অভিনিবিষ্ট। ইসলাম ভুবনিক এ কথার অর্থ হল কোন নির্দিষ্টকালে, কোন নির্দিষ্ট দেশে রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে ইসলাম সেইস্থানে, সেই দেশে প্রকাশশীল বিশ্বশক্তিকে পরাভূত করেছে, নিজের বিশ্বাস, নিজের ধর্ম, নিজের দর্পণ ও জীবনচর্যাকে নিরঙ্কুশভবে চাপিয়ে দিয়েছে বিজিতের উপর। বিজিতকে ইসলাম আত্মসাৎ করে নিয়েছে নিজের ভেতর, তাকে সে দিয়েছে সম্পূর্ণ নতুন অস্তিত্ব, মুছে দিয়েছে তার অতীত, এনে দিয়েছে তার সামনে আরবীয় মরুসংস্কৃতির গরিমা। বিজিতের কাছ থেকে ইসলাম যে কিছু নেয়নি তা নয়, কিন্তু বিজিতকে ইসলাম আমূল পাল্টে দিয়েছে - আর এই আমূল পাল্টে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ইসলাম রচনা করেছে তার সাম্রাজ্য-চীন থেকে স্পেন পর্যন্ত-পৃথিবীর সীমা থেকে সীমা পর্যন্ত — প্রায় বিশ্বসাম্রাজ্য যেখানে ইসলাম চরম ও পরম, একক ও দুর্নিবার। এই হার না মানা ইসলাম হল ভুবনিক (Global)।

এই ভুবনিক ইসলামের পাশে আছে ইতিহাসের আরেক ইসলাম। সে ইসলাম চরম হতে পারেনি, নিরঙ্কুশ হতে শেখেনি, বিজিতের পূর্ব-ইতিহাস আর ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নিজের শাসনের নীচে ভূলুণ্ঠিত মানুষকে শেখাতে পারেনি যে ইসলামই শেষ কথা। সেখানে তাকে লড়াই করতে হয়েছে বিশ্বশক্তির অন্যধারার মাঝে আপোষ করতে হয়েছে চলমান জীবনধারার সঙ্গে, মিলিয়ে নিতে হয়েছে নিজের নিঃসীম একক প্রভুত্বকামী অস্তিত্বকে বহুধা বিভিক্ত মানবসমাজের বৈচিত্র্য আর ব্যঞ্জনার সঙ্গে। সেখানে ইসলাম বিশ্বশক্তির উপর প্রাধান্য স্থাপন করতে পারেনি, নানা মত, নানা ধর্ম আর নানা সংস্কৃতির বহুত্ব বিস্তারী নয়া ভুবনে এসে সে হয়ে পড়েছে ভুবনায়িত (Globalized)।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমরা এই ভুবনায়িত ইসলামকে দেখি। কেন ভুবনায়িত ? তার কারণ পশ্চিম এশিয়া আর উত্তর আফ্রিকার মত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম ভুবনিক হওয়ার সুযোগ পায়নি। ইসলামের জন্মকাল হল পশ্চিম-এশিয়া, উত্তর-আফ্রিকা আর

দক্ষিণ ইউরোপের এক ক্রান্তিকাল। রোমান সাম্রাজ্য তখন ভেঙে গেছে। তাই ভূমধ্যসাগরের পরিপার্শ্ব অঞ্চলে তখন শক্তিশূন্যতা চলছে। এদিকে অন্য দুটি বড় সাম্রাজ্য, পারস্য সাম্রাজ্য আর বাইজানটাইন সাম্রাজ্য যারা উত্তর রোমান-সাম্রাজ্য পটভূমিকায় দুটি মহা-শক্তির আধার ছিল, তারাও নিজেদের মধ্যে লড়াই করে পতনোন্মুখ হয়ে পড়েছে। ফলে ইসলামের উত্থান মুহূর্তে তাকে প্রতিরোধ দেওয়ার মত কোন শক্তি আর পশ্চিমে ছিল না। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ খ্রি:) ঠিক একশত বৎসর পরে (৭৩২ খ্রি:) পোয়াতুরের যুদ্ধে চার্লস মার্টেল পশ্চিম ইউরোপে ইসলামের গতিকে রুখে দেন।[১] কিন্তু এই একশত বছরের মধ্যে ইসলাম ভূমধ্যসাগরের আসপাশে নিজের নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্য গঠন করে ফেলেছে।[২]

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এ ঘটনা ঘটেনি। সেখানে ইসলাম সামনে পেছনে দুধরণের শক্তির সঙ্গে লড়াই করে অগ্রসর হয়েছে। ইসলামের পেছনে ছিল খ্রিস্ট ধর্মের চাপ।[৩] সামনে ছিল হিন্দু-বৌদ্ধ-কুনফুসীয়- তাও ধর্মের কঠিন বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে থাকা নানা সংস্কৃতির একক ও সম্মিলিত চাপ। তাছাড়া পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে ইসলামকে এনেছিল যুদ্ধবাজ, সাম্রাজ্যকামী অস্ত্রধারী মানুষ — রাজপুরুষ, ভাগ্যান্বেষী, সৈনিক, প্রাধান্যকামী কৌমনেতা, ধনলোলুপ লুঠেরা, রাজ্যলোলুপ সমরনেতা যারা প্রবর্তন করেছিল নয়া নয়া শাসকবংশ - New Regimes।[৪] দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে ইসলামকে নিয়ে গিয়েছিল বণিকরা, ধর্মপ্রচারকরা ও উদার প্রাণ সুফী মানুষরা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ইসলামের প্রসার সম্পর্কে দুটি মত আছে। একটি মত বলে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে মুসলমান ধর্মপ্রচারক ও আরব-বণিকরা সঙ্কিত হয়েছিল খ্রিস্টানদের তাড়া খেয়ে। তাদের পেছনে আসছিল পর্তুগিজ বণিক, জলদস্যু ও ধর্মযাজকরা। প্রতিবছর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা যখন মক্কায় হজ করতে যেত তখন সারা পৃথিবীর থেকে আগত মুসলমান তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে তারা খবর পেত যে খ্রিস্টানরা সারা পৃথিবীতে কি রকমভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। স্পেনের কাছে - আইবেরিয়ান পেনিনসুলায় - খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের কি ভীষণ লড়াই হচ্ছে এবং খ্রিস্টানরা যে প্রাচ্য দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে আসার পরিকল্পনা করছে তার খবর নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে পৌঁছাত আর সেখানে সাজ সাজ রব উঠে যেত। একেই ইতিহাসে বলা হয় 'ক্রুশ ও কাস্তে-চাঁদের লড়াই' Conflict betweeen the cross and the cresent, দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে খ্রিস্টান বণিক, ধর্মযাজক ও সৈন্যবাহিনী পৌঁছানোর অনেক আগেই মুসলমান বণিকরা পৌঁছে গিয়েছিল। তারা উপকূলের রাজ্যগুলিতে বসতি বিস্তার করেছিল। সেখানে ধনপতি ও সামন্তপ্রভুদের পরিবারের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। আরবদের সৌন্দর্য, তাদের দীর্ঘকাঠামো, তাদের দীব্যকান্তি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজপরিবারের লোকদের আকর্ষণ করত। ফলে সহজেই আরববণিক ও তাদের হাত ধরে ধর্মপ্রচারক ও সুফীসন্তরা পরিবারের ভেতর প্রবেশ করার সুযোগ পেত। ফলে

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার উপকূল অঞ্চলে ইসলাম প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে সে অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। তখন আরম্ভ হয় অভ্যন্তরের সঙ্গে উপকূলের লড়াই। অভ্যন্তরে তখন হিন্দু বৌদ্ধ কেন্দ্রীয় শক্তি বিরাজ করছিল। অনেক বছর ধরে তারা কায়েম হয়েছিল। তাদের প্রতিরোধকে ভাঙা ইসলামের পক্ষে সম্ভব ছিল না। একদিকে ইসলামকে পেছন থেকে তাড়া করে আসছিল খ্রিস্টান শক্তি ধর্মযাজক-বণিক-নাবিক-সৈনিকদের সম্মিলিত শক্তি যাদের পেছনে ছিল ইউরোপের রাষ্ট্রশক্তি ও পোপের আশীবাদপুষ্ট ধর্মশক্তি। আর তার সামনে ছিল হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রশক্তির প্রগাঢ় প্রতিরোধ। এই দুইয়ের মাঝখানে ইসলামকে সতর্ক হতে হয়েছে, নমনীয় হতে হয়েছে, নিজের ভুবনিক ঔদ্ধত্যকে পরিহার করে ভুবনায়িত হতে হয়েছে।

আসলে পশ্চিম এশিয়াতে ইসলাম যে অনুপ্রেরণা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সে অনুপ্রেরণা তার ছিল না। বার্নার্ড লুইস (Bernard Lewis) লিখেছেন* যে ইসলাম ধর্মের প্রচারক হজরত মহম্মদ মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে মদিনায় পলায়ন করেছিলেন বটে কিন্তু সেখানে তিনি নিজেকে শাসকরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন — একদিকে তিনি ছিলেন রাজনৈতিক সামাজিক এবং অন্যদিকে ছিলেন ধর্মীয় শাসক। সে অবস্থা থেকে তিনি মক্কা জয় করেছিলেন এবং মক্কাতেও তিনি তাঁর সামরিক প্রাধান্য ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও রাজনৈতিক শাসন স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সক্ষমতা আর সাফল্যের ইতিহাস আর অন্যধর্মে পাওয়া যায় না। মহম্মদের আগে যাঁরা ধর্মপ্রচার করেছিলেন — মোজেস ও যীশু খ্রিস্ট, তাঁরা জীবদ্দশায় এ সাফল্য পাননি। মোজেস তাঁর পবিত্রভূমিতে প্রবেশ করতে পারেননি এবং তাঁর শিষ্যরা যখন অগ্রসর হচ্ছিল তখন তিনি মারা যান। যীশুখ্রিস্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন খ্রিস্টান ধর্ম ছিল এক নির্যাতিত সংখ্যালঘু মানুষের ধর্ম। যতদিননা রোমান সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে তার প্রচারের ব্যবস্থা করলেন ততদিন পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম নির্যাতিত, আড়ষ্ট, অসহায় এক ধর্ম ছিল। একমাত্র মহম্মদই তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ভূখণ্ড জয় করে নিজের শক্তির দৈবী ব্যঞ্জনাকে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে ক্ষমতার আরব্ধ শীর্ষে স্থাপিত করতে পেরেছিলেন। এইভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা পশ্চিম এশিয়ার ইসলাম ধর্মীদের মধ্যে একটা ট্রাডিশন তৈরি করেছিল। এই ট্রাডিশন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইসলামে ছিল না। অতএব প্রাণিত মুহূর্তের উদ্যোগ, সাফল্যের উল্লাস, ইতিহাস সঞ্জাত দুর্বার হবার প্রবৃত্তি যা পশ্চিমে ইসলামকে উচ্চকিত করেছিল তা দক্ষিণের বা পূর্বের ইসলামকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি।

এই আলোচনা থেকে যে তথ্যটি উঠে আসে তা হল এই যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ইসলাম ততখানি সামরিক হতে পারেনি যতখানি হয়েছিল পশ্চিম এশিয়াতে। পশ্চিম এশিয়াতে ইসলাম ছিল আগ্রাসনের ভূমিকায় — নিরঙ্কুশভাবে আক্রমণাত্মক। দক্ষিণ পূর্ব

এশিয়াতে ইসলাম নির্নিমেষভাবে রক্ষণাত্মক। সেখানে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তার লক্ষ্য ছিল না। হয়ত খ্রিস্টান শক্তির তাড়া না খেলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম বেশিদূর অগ্রসর হত না। একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ফান লিয়র (Van Leur) বলেছেন যে ১৪৯৭ সালে ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজরা না আসলে ইন্দোনেশিয়াতে ইসলামের প্রসার হত না। ফান লিয়রের এ মত মেনে নিলে দুটি কথাকেও মেনে নিতে হয় — এক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে আত্ম-প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্গতি (dynamics) খ্রিস্টানরা আসার আগে ইসলামের ছিল না; দুই, সেখানে ইসলাম সংঘবদ্ধ হয়েছে বাইরের তাড়া খেয়ে, একটা নয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ কথাটা দাঁড়াল এইরকম — পশ্চিম এশিয়াতে ইসলাম কাজ করেছে নিজস্ব প্রেরণা থেকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সে কাজ করেছে আতঙ্ক আর আশঙ্কা থেকে। ইসলামের অগ্রগতির পেছনে খ্রিস্টানদের দেওয়া পশ্চাৎ তাড়নার যে তত্ত্ব ফান লিয়র খাড়া করেছিলেন তাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে একটা পরিপূর্ণ বিতর্কের উপযোগী ঐতিহাসিক ভাবনার রূপ দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক শ্রিক (Schrieke)। "The penetration of Islam in the Archipelago" নামক একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধে তিনি বললেন যে ইসলামের প্রসারের পেছনে সবচেয়ে বড় তাড়না হল প্রতিযোগিতার তাড়না, যাকে তিনি বলেছেন 'খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা' — "The race with christianity" শ্রিক (Schrieke) বলেছেন যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে সংঘবদ্ধ হবার প্রবণতা ইসলাম দেখাতে শুরু করেছিল ১৪৯৭ সালে ভারতসাগরে পর্তুগিজদের আসার অনেক আগে থেকেই। আরব বণিকরা দীর্ঘদিন আগে এসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে উপকূল অঞ্চলে — ঘাঁটি গেড়েছিল। তারাই বাৎসরিক মক্কাভ্রমণের সময়ে খবর নিয়ে আসত কেমন করে খ্রিস্টানরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বছরের পর বছর এই খবর যেমন আসছিল তারাও নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। এই অবস্থায় ঘটে গেল অঘটন। ১৫২২ সালে পর্তুগিজদের হাতে মালাক্কার পতন ঘটল। একটা স্ট্র্যাটেজিক অঞ্চল খ্রিস্টানদের হাতে চলে গেল — এমন অঞ্চল যেখান থেকে সমস্ত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যের উপর খবরদারি করা যায়। নজর রাখা যায় জলপথে যাতায়াতের, আক্রমণ জানা যায় ইসলামের উপর। এইবার আধিপত্যের দখল নিতে উৎসুক খ্রিস্টান শক্তির ছায়া পড়ল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্য আর উপকূলের প্রভুত্বকামী ইসলামের উপর। এ ছায়া যখন পড়ল তখন ইসলাম দুর্বল নয়, তার সংগঠন ও শক্তি ছড়িয়ে গেছে অনেক দূর - "the crescent was already a more or two ahead of the cross" — লিখেছেন একজন ঐতিহাসিক।

এই প্রতিযোগিতা তত্ত্বের পাশাপাশি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের প্রবেশের আরও একটি তত্ত্ব আছে — তা হল মন্দ মন্দ অগ্রগতির মধ্য দিয়ে আত্মীকরণের তত্ত্ব (Theory of slow and steady absorption of Islam)। এই তত্ত্বের মূলকথা হল, এই যে ইসলামের

আলোকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া একটু একটু করে গ্রহণ করেছে। ইসলামের অসি এখানে অনুপস্থিত। সেখানে বাণিজ্য বিস্ফারিত হয়েছিল আরব বণিকদের হাতে। তার ফলে অর্থনীতি উজ্জীবিত হয়েছিল। সেখানে ইসলামের প্রচারকবা সাম্যের বাণী বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নানা ধর্মের সহাবস্থানে যে সমাজ ইতিমধ্যেই উদার হয়েছিল সে সমাজের পক্ষে ইসলামকে গ্রহণ করতে অসুবিধা হয়নি। আর.এ. কার্ন (R.A. Kern) লিখেছেন যে জাভার ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল মালাক্কাতে ("Java was converted in Malacca")। ডি.জি.ই. হল বলেছেন যে ধর্মান্তরিত হওয়া বলতে যা বোঝায় জাভায় তা কখনোই হয়নি। তিনি লিখেছেন যে কার্ন-এর তত্ত্ব যে দিকের নির্দেশ দেয় তা হল ইসলামের প্রথম প্রভাব কিভাবে পড়েছিল তারই দিক। মালাক্কা ও জাভার উত্তর দিকের বন্দরগুলির মধ্যে যে সংযোগ ঘটেছিল, বিশেষ করে জাভার উত্তরের দুটি বন্দর তুবান (Tuban) ও গ্রেসিকের (Gresik) সাথে মালাক্কার যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল তার দিকেই কার্ন-এর অঙ্গুলি-নির্দেশ ঘটেছে। ইসলামীয় সংস্কৃতি জাভায় প্রসার লাভ করেছিল বাণিজ্যের মাধ্যমে। জাভার পূর্বদিকে বন্দরগুলি থেকে মালাক্কা যা পেত তা শুধু মশলা নয়, তার খাদ্যও। এই বাণিজ্য ছিল জাভানীদের হাতে এবং ষোড়শ শতাব্দীতে জাভানীরা মালাক্কার জনগণের অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসাবে বিরাজ করত। মালাক্কার সৈন্যবাহিনী তৈরি হয়েছিল জাভানীদের দ্বারা। তার জাহাজের বেশিরভাগ মালিক ছিল জাভানী। সবচেয়ে বিত্তশালী ও মর্যাদাপূর্ণ জাভানী অভিজাতদের পরিবারের মানুষ ও তাদের প্রতিনিধিরা সেখানে থাকত। তাদের হাতেই ছিল পূর্ব ইন্দোনেশিয় ও মালাক্কার মধ্যে চলমান বাণিজ্য। এই রকম বড় বড় অভিজাতরা একদিকে ছিল বণিক এবং অন্য দিকে ভূস্বামী সামন্তপ্রভু। এইরকম একজন বণিক প্রভুর নিয়ন্ত্রণে শুধু ক্রীতদাস-সৈন্যের সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। এই সামন্ত বণিকরা জাভার উপকূল জেলাগুলিতে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে। তারা ইসলাম ধর্মকে যখন একটু একটু করে গ্রহণ করল তখন ইসলাম কায়েম হল উপকূল অঞ্চলে। মাজাপাহিতের সাম্রাজ্য যখন ভেঙে যেতে লাগল তখন এই সশস্ত্র বণিক সামন্তরা (merchant princes) জাভার অভ্যন্তরে হিন্দু-বৌদ্ধ কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তোমে পিরে বলেছেন যে এই সামন্ত প্রভুরা জাভানী ছিল বহুদিনের বাসিন্দা হিসাবে নয়। সত্তর বছরের মত সময় ধরে তারা জাভায় বসবাস করছিল। তারা চীনা, পারসিক ও তামিলদের বংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

এখানে দুটি কথা লক্ষণীয়। এক, বণিক আগন্তুকদের (immigrants) মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিল এক বণিক সামন্ত শ্রেণী। দুই, এই শ্রেণীর হাতে অর্থ ও সৈন্য, রসদ ও সরঞ্জাম দুই ছিল। আর এই রসদ ও হাতিয়ার নিয়ে তারা কেন্দ্রীয় শক্তির মুখোমুখী হয়েছিল, ক্ষমতা দখলের লড়াইতে নেমেছিল। লড়াই তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল — উপকূল থেকে উঠে আসা নয়া দাবিদার আর হিন্দু-বৌদ্ধ কেন্দ্রীয় শক্তির মধ্যে। এই

লড়াইতে ইসলাম হয়েছিল নয়া দাবিদারদের হাতিয়ার, নতুন প্রেরণার উৎস, ক্ষমতা-দখলের এক লক্ষ্যে ধাবমান বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষী মানুষকে এক ঐক্যে গ্রথিত করার মন্ত্র। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার মত এখানকার ইসলাম সাম্রাজ্য সংগঠন প্রয়াসী ছিল না। ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম তরবারির উপর যতখানি আস্থা স্থাপন করেছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তা করেনি। ফলে সেখানে ইসলামের চরিত্র ততখানি রাজনৈতিক হতে পারেনি যতখানি হয়েছিল দক্ষিণ এশিয়ায়। ডঃ এইচ. জে.ডি. গ্রাফ (Dr. H.J.De Graff) লিখেছেন যে মাজাপাহিতের (Majapahit) সাম্রাজ্য একটু একটু করে ভাঙতে থাকল যখন তার অধস্তন রাজ্যগুলি (Vessel states) ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করতে শুরু করল। এতৎ সত্ত্বেও হিন্দু-বৌদ্ধ রাজ্যগুলি সমস্ত ষোড়শ শতাব্দী ধরেই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। পূর্ব জাভার একটি রাজ্য বালামবাঙ্গান (Balam bangan) আঠারো শতক পর্যন্ত ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে এই রাজ্যের বিরুদ্ধে মাতরণ-এর (Mataran) সুলতান জেহাদ ঘোষণা করেও কিছু করতে পারেনি। পূর্ব জাভার আরেকটি হিন্দু-বৌদ্ধ রাজ্য পানারুকান (Panarukan) ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত নিজের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল। পশ্চিম জাভায় আরেকটি রাজ্য পাজাজারাণ (Pajajaran) পঞ্চদশ শতাব্দীর সত্তরের দশকেও নিজের ধর্মকে বাঁচিয়ে কাফের রাজ্য বলে চিহ্নিত হয়েছিল। এর পঞ্চাশ বছর আগেই বান্তামের (Bantam) সুলতান পাজাজারানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর সুন্দা কলাপা (Sunda Kalapa) দখল করে নিয়ে এই রাজ্যটির সমুদ্রে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দু-বৌদ্ধ প্রতিরোধ খুব নরম ছিল না। শ্রিক (Schrieke) বলেছেন যে মাজাপাহিতের সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত হেনেছিলেন দেমক-এর (Demak) রাজা যখন ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে উপকূলের মুসলিম সামন্ত শক্তিগুলিকে একত্রিত করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই রাজ্যের উপর।

যেখানে হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রতিরোধ এত প্রবল ছিল সেখানে অকস্মাৎ ইসলাম দুর্দমনীয় হয়ে উঠবে এবং জাভার সংস্কৃতির মধ্যে বড় মাপের ফাটল ধরাবে তা বিশ্বাস করা যায় না। একথা বর্তমান কালের ঐতিহাসিকরা প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করে নিয়েছেন। পরবর্তীকালে যখন হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির উপর ইসলামের আবরণ বিছিয়ে দেওয়া হল তখনও সে অঞ্চলের মানুষের জীবনধারার অন্তর্পটে যে মৌল হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির কাঠামো ছিল তা প্রায় অক্ষতই রইল। জাভা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি স্থান যেখানে রাজনৈতিক ইসলাম জনজীবনে মৌল সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। আসলে যা হয়েছিল তা হল এই। জাভার একটা নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল। তা এক সময়ে হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির নির্যাসকে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। পরে যখন ইসলাম এল তখন ইসলামের রসকে তার অযুত বছরের মহীরুহ অস্তিত্বের মধ্যে একই রকম ভাবে সে শোষণ করে নিল। এইভাবে রাজনৈতিক ইসলামের অগ্রগতি যখন মন্থর তখন

ইসলামকে সাংস্কৃতিকভাবে শোষণের ধারা ছিল অব্যাহত। এইভাবে হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির ঢিলেঢালা পরিসরের মধ্যে ইসলামও ঢুকে পড়ল তার নিজের রং, নিজের বৈভব নিয়ে। এইভাবে তৈরি হল সংস্কৃতিগত বহুত্বের (cultural pluralism) পরিমণ্ডল।

এই কারণেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ইসলাম কখনো আক্রমণাত্মক হতে পারেনি। খ্রিস্টান আগমণের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে গিয়ে ইসলাম রক্ষণাত্মক হয়েছে। হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির বেড়া ভাঙতে গিয়ে ইসলাম হয়েছে মন্থর এবং অবসন্ন। ফলে তরবারির ধারে ইসলাম কখনোই ধর্মকে জনগণের উপর একটি রাজনৈতিক ম্যান্ডেট হিসাবে চাপিয়ে দিতে পারেনি। পশ্চিম এশিয়ার ইসলাম আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ফারাক থেকে গেছে এইখানে।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। সংক্ষেপে ইসলামের প্রসারের ইতিহাস পাওয়া যাবে নীচের গ্রন্থাদিতে

ক) R.H.C. Davis, *A History of Medical Europe from Constantine to St. Louis, Ch. V* [Revised 1970 edn; Eleventh Paper back impression 1985)

খ) Alfred J. Butler, *The Arab Conquest of Egypt*, London, 1902.

গ) Sir Thomas Arnold and Alfred Guilaumle ed. *The Legacy of Islam*, Oxford, 1931.

ঘ) Tor Andrae, *Mohammed, the Man and his Faith*, English Translation, London, 1936.

ঙ) Bernard Lewis, *The Arabs in History*, Hutchnson's University Library, London, 1950.

চ) Alfred Guillaume, *Isllam*, London, 1954.

ছ) Philip Hitti, History of the Arabs, Tenth Edn.

২) ইসলামের অগ্রগতির ছবিটি এই রকম। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ইসলামের আরবজয় শেষ হয়। সেই বছরেই ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের দ্বারা প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া আক্রান্ত হয়। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে দামাস্কাস ও এমেসা [Emessa] আক্রান্ত হয়। একটি বিরাট বাইজান্টাইন বাহিনী এই অঞ্চলগুলি উদ্ধারের চেষ্টা করলে ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়ারমকের [Yarmonk] যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। আক্রা [Acre], টায়ার [Tyre], সিডন [Sydon], বেইরুট [Beyrouth] এবং লাওডিসিয়ার [Laodicea] পতন হয় ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে। জেরুজালেম ও আন্টিওকের প্রতিরোধ ধূলিসাৎ হল ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে। এর দুবছর পরে ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে সিজারিয়া [Caesarea] আত্মসমর্পণ করে। এরই পাশাপাশি পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করা ও তার রাজ্যাংশ দখল করার কাজ চলতে থাকে। রাজধানী etesiphone ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে, রাক্কা [Rakka] ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে, মসুল [Mosul] ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে, কাজভিন [Kazvin] ও রাই [Rai] ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে, হামাদান ও ইসপাহান আত্মসমর্পণ করে ৬৪৪

খ্রিস্টাব্দে।

৩। এর জন্য পঠিতব্য বই :

ক) J.C. Van Leur, *Indonessian Trade and Society, Essays in Asian Social and Economic History*, The Hague, 1955.

খ) Harry J. Benda, *The Cresecent and the Rising Sun*, The Hague, 1958.

গ) S. Q. Fatimi, *Islam comes to Malaysia, Singapore*, Malaysian Sociological Research Institute, 1963.

ঘ) D.G.E. Hall, *A History of South East Assia* (1955), 1987 reprint of the fourth edn. 1981.

৪। Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* cambridge University Press, 1988, Chapters 18-19.

৫। Bernard Lewis, *The Middle East: 2000 years of History from the Rise of Christianity to the Present Day*, A phoenix Giant, paper back, 1966, pp. 327-28, pp. 327-328.

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে থাইল্যান্ডের মুসলমান জনগোষ্ঠী

দীপ্তেন্দু সরকার

সবাই মনে করেন থাইল্যান্ড মানেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দেশ কিন্তু আমরা যদি একজন সমাজবিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে থাইল্যান্ডের দেশটা ও তার সমাজকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো 'বৌদ্ধ' ধর্মটা এই দেশের প্রধান এবং রাজধর্ম হলেও তার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্ম ও বহুকাল আগের থেকেই সেখানে অবস্থান করছে। যেমন বৌদ্ধ ধর্মের পরই ইসলাম ধর্ম থাইল্যান্ডে প্রচলিত দ্বিতীয় স্থানাধিকারী (জনসংখ্যার ধর্মাচরণের নিরিখে) বহুল প্রচলিত ধর্ম। থাইল্যান্ডের জনসংখ্যার ৪ থেকে ৫ শতাংশই মুসলমান ধর্মাবলম্বী।[১] সুতরাং স্বভাবতই আমাদের মনে এই থাই-মুসলিমদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানার একটা আগ্রহ তৈরি হতে পারে। আমি আমার এই লেখাটির মধ্যে দিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে সেই ব্যাপারেই আলোচনা করার চেষ্টা করছি (যেটা হয়তো কিছুটা পরিমাণে আপনাদের অনুসন্ধিৎসার নিরসন করবে)। আমরা আমাদের আলোচনা কালে দেখতে পাবো যে থাইল্যান্ডের দক্ষিণ অংশে থাইমালয় সীমানার অন্তর্গত রাজ্যগুলোতেই প্রধানত মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা সব থেকে বেশি থাইল্যান্ডের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে, আর এই দক্ষিণাংশে ইসলামের আগমনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, কিছুটা পরিমাণে ভিন্ন থাইল্যান্ডের অন্যান্য অংশে ইসলামের আগমনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে।

থাইল্যান্ডে ইসলামের আবির্ভাবের সঠিক ও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বলা বোধ হয় সম্ভব হবে না আমার পক্ষে, কিন্তু ঐতিহাসিক বিভিন্ন তথ্য থেকে একথা প্রমাণিত যে আরব ও পার্সিয়ার মুসলমান বণিকরা চীন ও পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সমুদ্র পথে ব্যবসার কাজে যাওয়ার সময় বর্তমান থাইল্যান্ডের অন্তর্গত 'কারা' অঞ্চলের 'টেনাসেরিস' ও 'ইহিনাস্' অঞ্চলে আসা যাওয়া করতো, থাইল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম স্বাধীন সুখথাই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকাল ১২৩৮ খ্রিস্টাব্দের, বহু আগের থেকেই।[২] ঐ আরবীয় ও পার্সিয়ান বণিকদের মধ্যে অনেকেই থাইল্যান্ডের ঐ অঞ্চলগুলোয় পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে থাকে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর কিছুকাল পরেই ভারতীয় বণিকদেরও ঐ অঞ্চলে আনাগোনা বাড়তে থাকে এবং তাদের মধ্যেও অনেকেই আরবীয় ও পার্সিয়ানদের মতোই পাকাপাকি ভাবে ঐ অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। আবার ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারতের পশ্চিম-তটঅঞ্চলের বিশেষ করে গুজরাট অঞ্চল থেকে এবং পূর্ব উপকূলের করমণ্ডল উপকূলের বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। ঐতিহাসিক

সূত্রানুযায়ী এই ধর্মান্তরিত ভারতীয় মুসলমান বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগ রাখতো এবং ঐ ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে, এদের মাধ্যমেই থাইল্যান্ডে শান্তিপূর্ণভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি মুসলিম ধর্মেরও প্রসার ঘটেছিল।

আমরা যদি ভারতীয় (দক্ষিণপূর্ব-এশিয়ার বাণিজ্যকারী) বণিকদের কথা পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাবো, যে গুজরাট বণিকরা বিভিন্ন প্রকার মসলার জন্যই এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে, তথা বন্দরগুলোতে, আনাগোনা করতো এবং তাদের বাণিজ্যের স্বার্থেই ঐ অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল। বেশিরভাগ গুজরাটি মুসলমান বণিকরাই ছিল 'শিয়া' মুসলমান' এবং 'হানাফী-সুফী' গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ভারতের দক্ষিণে করোমন্ডল উপকূলে বসবাসকারী বণিকদের মধ্যে প্রায় বলতে গেলে প্রথমেই ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করণ প্রণালীর সূচনা ঘটে। আবার বেশকিছু ভারতীয় মুসলমান বণিকরা তাদের ধন-ঐশ্বর্য্য প্রাচুর্যের জোরে বহু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশের, যেমন মালয় ও দক্ষিণ-থাইল্যান্ডে বসবাসকারী বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্তআছে এমন শাসকদের কন্যাদের বিবাহ করে এবং ঐ অঞ্চলেই পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করে। যার ফলে তাদের পুত্র কন্যারা পিতার পরিচয়েই 'মুসলমান ধর্মাবলম্বী' হিসাবেই বড় হতে থাকে এবং ইসলাম ধর্মকে মেনে চলতে শুরু করে। আর ঐ অঞ্চলের মুসলমান ভারতীয় বণিকরা, মুসলমান ধর্ম প্রচারের ও প্রসারের স্বার্থে বিভিন্ন ধর্মান্তরিত (মুসলমান ধর্মে) স্থানীয় বণিকদের ব্যবসার সময়ও প্রচুর সুযোগ সুবিধা দিতে থাকে, অন্য ধর্মের বণিকদের থেকে। যার ফলে বহু মালয়, থাই বণিক আরো লাভ, রোজগারের ও সুযোগ সুবিধা পাবার আশায় ভারতীয় বণিকদের ধর্ম-তথা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। নিজেদের পুরানো ধর্ম পরিত্যাগ করে।[৩]

থাইল্যান্ডের দক্ষিণ অংশে ও উত্তর পশ্চিম মালোয়েশিয়ায় ইসলামের বিস্তার ঘটার পেছনে বিভিন্ন কারণ কাজ করেছিল, যেমন - দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হিন্দু রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে মুসলমানদের (বণিকদের) ব্যবসায়িক রেশারেশি, মালাক্কা অঞ্চলটি মুসলমান ধর্ম বিস্তারের প্রধান একটি কেন্দ্রে পরিণত হওয়া, পর্তুগিজদের ঐ অঞ্চলে আগমনের পর থেকেই খ্রিস্টান মিশনারীয়দের আনাগোনা বেড়ে যাওয়া এবং তাছাড়াও ভারতের পশ্চিম উপকূল ও উ: পশ্চিমাঞ্চল (বর্তমান পাকিস্তানের) থেকে আগত মুসলমান সুফী-সন্তদের ধৈর্য সহকারে, অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে মুসলমান ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা প্রভৃতি। থাইল্যান্ডে বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যে বেশির ভাগই আফগানিস্তানের নিকটবর্তী উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী পাঠান জন গোষ্ঠীর অংশ এবং নয়তো বা বর্তমান 'বাংলাদেশে'র বা পূর্বের পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত বার্মার সীমানা সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমান বাসিন্দা। আর থাইল্যান্ডে আগত ভারতীয় মুসলমানদের সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা

করেছি, যে তারা প্রধানত বম্বে, সুরাট এবং দক্ষিণ ভারতের গোলকুন্ডা অঞ্চল থেকে এসেছিল থাইল্যান্ডে এবং তারপর অনেকে এখানে পাকাপাকিভাবে বসবাসই করতে থাকে নিজেদের পূর্বেকার ধর্মাচরণ সম্পূর্ণভাবে বজায় রেখেই।[৫]

ভারতবর্ষ ও ইরান থেকে আসা মুসলমানদের মতোই পাঠান মুসলমানরাও তাদের পরিবারকে নিজেদের সঙ্গে করে এই অঞ্চলে আনতে পারেনি। আবার যেহেতু পাঠান মুসলমানরা প্রায় এক কথায় পায়ে হেঁটে বহু দুর্গম অঞ্চল অতিক্রম করে থাইল্যান্ড ও মালাক্কার বিভিন্ন অংশে পৌঁছেছিল তাই তাদের পক্ষে সঙ্গে স্ত্রী পুত্রকে আনা প্রায় অসম্ভবই ছিল। আর এর কারণ স্বরূপ ভারতীয়, ইরানী ও পাঠান মুসলমানরা ঐ অঞ্চলের আদি অ-মুসলীম বাসিন্দাদের সঙ্গেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হয়। আর এঁর ফলে ভারতীয় ও ইরানীয় মুসলমানদ্বারা, স্থানীয় মহিলারা ও তাদের আত্মীয় স্বজনরা প্রভাবিত হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে এবং এই ভাবেই ভারতীয়, ইরানীয় ও পাঠান মুসলিমদের থাইল্যান্ডে ও অন্যান্য দ:পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বসবাসের অঞ্চলগুলোতেই মুসলমান ধর্মের বিস্তার হতে থাকে। অথচ এই ইন্দো-ইরানীয় এবং পাঠান মুসলমানরা তাদের পুত্র কন্যাদের কিন্তু নিজেদের মাতৃভাষার বদলে থাই ভাষাতেই শিক্ষিত করেছিল ও কথা বলতে শিখিয়েছিল। যার ফলে অদ্ভুতভাবে ঐ পরবর্তী প্রজন্ম নিজেদের থাইল্যান্ডের নাগরিক ভাবতে পারলেও, তারা কিন্তু ধর্মাচরণের সময় বৌদ্ধ ধর্মাচরণের বদলে মুসলমান ধর্মাচরণই করতো।

চীন-উপকূলগামী আরব বাণিজ্য তরীগুলো, ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে যখন থাইল্যান্ডের রাজধানী সুখথাই থেকে আয়ুসিয়াতে স্থানান্তরিত হলো, তখনই থাই খাঁড়িতে প্রবেশ আরম্ভ করলো (এর আগে তারা সরাসরি মালাক্কা থেকে কোচিন-চীনে চলে যেতো) এরপরই এই দক্ষিণ থাইল্যান্ড অঞ্চলে আরব বণিকদের ব্যবসায়িক কেন্দ্র স্থাপিত হলো এবং ১৫শ শতকের একটি আরব নৌপথের বিবরণী থেকে, আমরা সিঙ্গাপুর থেকে সোংকলা ও চাও হয়ে আয়ুসিয়াতে (অযুধ্যায়) আসার সামুদ্রিক-বাণিজ্য পথের কথা জানতে পারি।[৫]

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা ও সূত্রগুলো থেকে আমরা আগেই জেনেছি যে, সরাসরি মুসলমান জগতের সঙ্গে থাইল্যান্ডের যোগাযোগ ঘটার পূর্বেই মধ্য থাইল্যান্ডে মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল স্থলপথে, টেনাসেরিম বন্দরে আগত ভারতীয় বণিক মুসলমানদের মাধ্যমে। (এই টেনাসেরিম আনুমানিক ১৩৭৫ খ্রি: থাই সীমার অন্তর্গত হয়)[৫] এই বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ভারতীয় মুসলিমরা কিন্তু কখনই থাইল্যান্ডের ক্ষমতার শীর্ষে যেতে পারেনি থাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শাসক ফারা-নারাই (১৬৫৭-৮৮) এর সময়ে। অথচ তিনিই সর্বপ্রথম ডাচদের অর্থনৈতিক আগ্রাসন এর হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে মুসলিম-অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং ভারতীয় মুসলমানদের দ্বারা গঠিত নিজস্ব প্রাসাদ বাহিনী গড়ে তোলেন। বিভিন্ন তথ্যানুযায়ী ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে থাইল্যান্ডের মধ্যে

কার-মার্কী থেকে আয়ুসিয়া (অযুধ্যা) যাওয়ার স্থলপথের উপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর ও রাজ্যগুলোতেও ভারতীয় মুসলমানদের রাজ্যপালের পদগুলো দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। তাদের মধ্যে একজন পরবর্তীকালে টেনাসেরিমের মত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের শাসকের পদ অধিগ্রহণ করে ছিলেন বলে ঐ তথ্য থেকে জানা যায়।[৭] এই তথ্য যদি সত্য হয় তবে বলা যায় ফারা-শারি ইসলাম ধর্মকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন করেছিলেন এবং তিনি মুসলিম দেশ ও জনগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ফলে গোলকুন্ডা, পার্সিয়া প্রভৃতি মুসলমান প্রধান দেশের দুতাবাসও থাইল্যান্ডে স্থাপিত হয়। গ্রিকরা আসার আগে পর্যন্ত একজন মুসলমান যিনি ছিলেন রাজা ফারা-শারির পরামর্শদাতা ও অর্থমন্ত্রী।

থাইল্যান্ডের উত্তর ও মধ্যবর্তী অঞ্চলের মুসলমানদের আগমনের বিভিন্নতা হেতু ঐ অঞ্চলের মুসলমান জনগোষ্ঠীকে প্রধানত ও পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় যেমন, ১) ভারতীয় মুসলমান ২) মুসলমান উদ্বাস্তু ৩) ইন্দোনেশীয় মুসলমান ৪) চীন দেশীয় মুসলমান ও ৫) চাম মুসলমান। আসলে এই অঞ্চলের মুসলমান জনগোষ্ঠী গুলির কেউই থাইল্যান্ডের আদি বাসিন্দা নয়, এরা প্রায় সকলেই বহিরাগত এবং থাইল্যান্ডের বিভিন্ন অংশে কেন্দ্রীভূত হয়ে এরা বসবাস শুরু করেছিল এবং আজও এরা এদের ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম "ধর্ম" অনুসরণ করে চলেছে। যেহেতু আমার প্রধান আলোচ্য দক্ষিণ অংশ তাই থাইল্যান্ডের দক্ষিণ অংশে মুসলমান ধর্মের বিস্তার নিয়ে আলোচনা করবো। নিম্নের এই অধ্যায়টিতে।

বর্তমান দক্ষিণ থাইল্যান্ডে কবে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল তার কোন সঠিক দিন ক্ষণ ও সময় বলা সম্ভব নয়, সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে। তবে কয়েকজন প্রাক্তন থাই পন্ডিতের লেখার মধ্যে পাওয়া যায় যে বর্তমান দক্ষিণ থাইল্যান্ডের অন্তর্গত প্রধান মুসলমান ধর্মের কেন্দ্র পাটানীতে মুসলমান ধর্মের আগমন ঘটেছিল, মালাক্কাতে মুসলমান ধর্মের আগমনের বহু পূর্বেই। তবে তাঁদের মতামতের সমর্থনে কোন সঠিক ঐতিহাসিক তত্ত্ব বা প্রমাণ তাঁরা পেশ করতে পারেননি।[৮] তবে একথা বলা যায় যে দক্ষিণ থাইল্যান্ডে ইসলামের বিস্তারের ঐতিহাসিক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অন্যান্য দেশের ইসলামের বিস্তারের প্রেক্ষাপটেই দেখা উচিত।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে খনন কার্য চালিয়ে প্রমাণ পেয়েছেন যে এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে চতুর্থ-শতাব্দী থেকেই যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং নবম শতাব্দী থেকে আরবীয় ও পারসিক বণিকরা এই অঞ্চলে আসতে শুরু করে ব্যবসার কাজে এবং বসতিও স্থাপন করতে থাকে। তবে অবশ্য মুসলমান ধর্মের জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে তেরশ শতক পর্যন্ত সময় লেগে গিয়েছিল।[৯] তবে, এ পারসিক ও আরবীয় বণিকরা কিন্তু ঐ অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম প্রসারের বিশেষ ভূমিকা নিতে পারেনি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মুসলমান ধর্ম প্রসারের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ কাজ করেছিল যেমন — ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে ও পশ্চিম

তটবর্তী অঞ্চলে মুসলমান ধর্মের প্রসার, মালাক্কার ও করোমন্ডল, উপকূল ভাগে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মুসলমান ধর্মের মধ্যে 'সুফী'বাদের প্রসার, এবং ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দের বাগদাদের সুলতানের পতন।[১০] মুসলমান ধর্মের বিস্তারের শুরুর পর থেকে বাগদাদের পতন এবং মোঘল আক্রমনের সময় থেকেই বিভিন্ন শিক্ষিত ও বিদ্যান মুসলমানরা এবং পীররা (মুসলমান সাধু) পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন, যার মধ্যে অন্যতম অঞ্চল হিসেবে ছিল দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলি। মুসলমানদের এই অভিবাসনেব ঘটমা আরো দ্রুত বেড়ে যায় সুফীবাদের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। আবার ভারতীয় মুসলমান বণিকরা (যারা সুফী বাদের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন) — উত্তর সুমাত্রা, সেলিবেস্ জাভায় এবং মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে তাদের ব্যবসায়িক বসতি গড়ে তোলে, ফলে ঐ ব্যবসায়িদের নিজস্ব ধর্ম, মুসলিম ধর্ম এর সংস্পর্শে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় জনগোষ্ঠী আসতে শুরু করে এবং কিছুটা প্রভাবিতও হয়। যেটা তাদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণের পেছনে অনেকটাই প্রেরণা যুগিয়েছিল বলে মনে করা হয়। তবে অবশ্য জনগণের ধর্ম হিসাবে ইসলাম ধর্ম ঐ অঞ্চলে স্বীকৃতি পেতে লাগলো, যখন ঐ অঞ্চলের শাসকরা নিজেদেরকে ইসলামীয় ধর্মে দীক্ষিত করতে লাগলেন।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত এই থাই উপদ্বীপ অঞ্চল ইসলামের প্রভাবে আরো বেশি পরিমাণে প্রভাবিত হতে লাগলো তের শতকের শেষের দিকে যখন এর উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত বন্দর শহর সুমাত্রাতে ভারতীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কেন্দ্র গড়ে উঠতে লাগলো। এই জায়গাটির গুরুত্ব ছিল, এর মুসলমান দেশগুলোর নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবেশ পথে সমুদ্রের ধারে ভৌগোলিক সীমারেখার সর্বশেষপ্রান্তে অবস্থিতির জন্য। এর পাশেই অবস্থিত ছিল উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত 'পাসাই' বলে একটি মুসলিম শাসিত দেশ (তেরোশো শতকে) এবং এখান থেকেই ইসলাম মালাক্কা অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে। পরবর্তী কালে পাসাই এবং মালাক্কা উভয়েই ইসলামীয় মিশনারী ও ধর্মবেত্তাদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। মালয় ইন্দোনেশীয় ভূভাগে ইসলাম ধর্মের ঐ অঞ্চল থেকে প্রসার ঘটার প্রমাণ স্বরূপ ঐতিহাসিকরা একটি মালয় ভাষায় হাতে লেখা বই আবিষ্কার করেছেন যার নাম 'হিক্কায়া পাট্টানি' সেখানে একটি গল্প লেখা আছে, সেটি একটি প্রচীন থাই উপকথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাতে বলা হয়েছে যে পাট্টানী অঞ্চলের প্রচীন শাসক অসুস্থ হয়েছিলেন এবং কিছুতেই তাঁর উপশম হচ্ছিল না। তিনি তখন ঘোষণা করেন যে তাঁকে সুস্থ করে দেবে, তার সঙ্গেই তিনি তাঁর মেয়েকে বিবাহ দেবেন। তখন এক পাসাই মুসলমান, তিনি (অর্থাৎ ঐ শাসক) আরোগ্যর পর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবেন এই মর্মে আশ্বাস নিয়ে, তাঁকে চিকিৎসা করেন এবং ভালো করে তোলেন। কিন্তু শাসকটি মুসলমান ধর্ম নিতে অস্বীকৃত হয়। তখন নাকি তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঐ পাসাই মুসলিমটি

পুনরায় চিকিৎসা করে ভালো করে তোলেন এবং পাট্টানীর শাসক সর্বশেষে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।[১১] এই গল্পটি থেকে সামাজিক ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পেরেছেন। যেমন প্রথমে পাট্টানি অঞ্চলের শাসকরা মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেছিলেন নিজেদের স্বার্থে ও রাজনৈতিক স্বার্থে। এই উপকথা থেকে আরো জানা যায় যে তৎকালীন সমাজে পিতার ইচ্ছার উপরই কন্যার বিবাহ হতো এবং মালয়েশীয়, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশীয়া অঞ্চলে অভিবাসিত মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা স্থানীয় শাসকদের পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রসাবের একটা প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন।[১২] কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা তাদের উদ্দেশ্যে সফল হয়েছিলেন। যার সব থেকে বড় উদাহরণ উপরের উপকথাটিই। তবে অবশ্য একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে, যে হঠাৎ করে বা রাতারাতি ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষরাও শাসকের ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে সারা মালয় ভূভাগ জুড়ে ইসলামের প্রসার ঘটেছিল। বরং বেশির ভাগ জনসাধারণ স্ব-ইচ্ছায় এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন একটি সর্বসমন্বয় ধরে চলা পদ্ধতির মাধ্যমে, যা বহুকাল ধরে চলেছিল ঐ অঞ্চলে।

থাইল্যান্ডের দক্ষিণ অংশেই সবথেকে বেশি পরিমাণে মুসলমানরা বাস করে, অন্যান্য অঞ্চলের থেকে, যারা আসলে মালয় বংশোদ্ভূত। তারা দক্ষিণের তিনটি অঞ্চলে বেশি বাস করে যথা- সাটুন, পাট্টানি, ইলা এবং নারিথিওয়াত। তবে অবশ্য সোংকলা, তারঙ্গ, কারাবি ও ফুকেতেও বেশ কিছু ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোক বাস করে। উত্তরের থাইল্যান্ডের মুসলমানরা যেমন থাইল্যান্ডের বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে, এই দক্ষিণের থাইল্যান্ডের মুসলমানরা কিন্তু তা নয়। তারা এই অঞ্চলেই বহুকাল আগের থেকেই বাস করতো, বরং থাইল্যান্ড তার সীমার মধ্যে এই মুসলমান প্রধান অঞ্চলকে আনতে পেরেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার-পরিপ্রেক্ষিতে, অনেক দিন বাদে। প্রায় চারশো বছর ধরে এই দক্ষিণাঞ্চলটির দখল নিয়ে থাইল্যান্ড ও বিভিন্ন মালয় রাজ্যগুলির মধ্যে যুদ্ধ লেগেই ছিলো। তবে বিশেষত দক্ষিণের মালাক্কা রাজ্যটির সঙ্গে বিবাদ বেশি বাধতো উত্তর থাইল্যান্ডের। এমনকি এই অঞ্চলের অধিকার যখন থাইল্যান্ডের হাতে চলে গেল তখনও দক্ষিণের বিভিন্ন জায়গার শাসকরা অনেক ক্ষেত্রেই, বেশিরভাগ অভ্যন্তরীণ শাসন নিজেদের হাতেই বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এই অঞ্চলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ করদ রাজ্য পাট্টানি যেটি ১৯০১ খ্রি: থাইল্যান্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত হয়, তার আগে পর্যন্ত কিন্তু প্রায় স্বাধীনই ছিল।[১৩] এবং বর্তমান যে থাই মালয়েশিয়ার সীমা রেখা সেটা কিন্তু ১৯০৯ খ্রি: পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট হয়নি, যতক্ষণ না থাইল্যান্ড, তার বর্তমান দক্ষিণ সীমানার পার্শ্ববর্তী, বর্তমান উত্তর মালয়েশীয় রাজ্য যেমন পারলিস, কেডাহ, ট্রেনগান এবং কেলানটান এর উপর থেকে তাদের নিজস্ব দাবি ছেড়ে দেয়। ব্রিটিশদের সঙ্গে এক চুক্তির ফলে। এর বিনিময়ে অবশ্য থাইল্যান্ড তার রাজনৈতিক সীমারেখা অন্য অঞ্চলে বৃদ্ধি করে।

থাইল্যান্ডের দক্ষিণ সীমার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাসিন্দারা যেহেতু মালয় অধিবাসীদের থেকেই উদ্ভূত তাই তারা এখনো ইসলামীয় ধর্মে বিশ্বাসী, মালয় ভাষাবলে এবং মালয় সংস্কৃতি ও রীতি মেনে চলে যেটা থাইল্যান্ডের অধিবাসীদের বৌদ্ধ ধর্ম এবং সংস্কৃতি ও রীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আমরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকেই জেনেছি যে ইসলাম এশিয়ার এই দক্ষিণ অংশে চোদ্দশো শতকে এসেছিল সমুদ্র পথে, আরব ও বঙ্গোপসাগরের খাঁড়ি অঞ্চল থেকে, ঠিক যেমন করে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম এই অঞ্চলে মুসলমানরা আসারও হাজার বছর আগে পৌঁছেছিল।

আয়ুসিয়ার (অযুধ্যার) সময় (১৪৫০-১৭৬৭ খ্রি:) এবং তার পরবর্তীকালে এমনকি থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্কক এ সরে আসার সময়ও যে সকল ইসলামি ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায় তারা কিন্তু আসলে মালয় উদ্বাস্তুদেরই বংশোধর।[১৪]

বর্তমানেও থাই জনগোষ্ঠীর চার (৪) শতাংশই থাই-মালয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিছু নগণ্য ব্যতিক্রম ছাড়া তারা সবাই প্রায় মুসলমান ধর্মাবলম্বী। এই মুসলমান সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী কিন্তু থাইল্যান্ডের সকল অংশে সমান সংখ্যায় বসবাস করে না। বেশির ভাগ জনগোষ্ঠী দেশের দক্ষিণ অংশেই থাকে। যার ফলে থাই দক্ষিণ সীমার পার্শ্ববর্তী অংশে বসবাসকারী জন সংখ্যার আশি (৮০) শতাংশই মুসলমান। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় দক্ষিণ অংশের মসজিদের সংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির একটি হিসাব দেখে। (১৯৭৩ সালে 'সেনসাস' এর রিপোর্ট অনুযায়ী) (যেটি পরের পাতায় দেখাবো) পাট্টানির চার লক্ষ জনসাধারণের মধ্যে তিনলক্ষ কুড়ি হাজারই (৩,২০,০০০) মুসলমান। যারা আসলে থাই-মালয় জনগোষ্ঠীরই একটা অংশ। তারা নিজেদের ধান ও গমের জমিচাষ করে, তারা মাছ ধরে এবং তারা খুব সক্রিয় ভাবেই পাট্টানি অঞ্চলের বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করে।[১৫]

১৯৭৬ খ্রি: থাইল্যান্ডে যে জনগণনা চালানো হয় তার মধ্যে অন্তর্গত একটি অনুসন্ধান অনুযায়ী থাইল্যান্ডের ৩৬টি রাজ্যে মুসলমান জনগোষ্ঠীর ধর্মাচরণের জন্য প্রায় ২০০০ সরকারি ভাবে পঞ্জীকৃত মসজিদের সংখ্যার সন্ধান পাওয়া গেছে তারই একটা রাজ্যভিত্তিক সাংখ্য-সারণী নিম্নে দেওয়া হলো:—

রাজ্যের নাম	মসজিদের সংখ্যা	রাজ্যের নাম	মসজিদের সংখ্যা
পাট্টানি	৩৫৮	ব্যাঙ্কক্	১৩৪
নারিথিয়াত	৩১৪	ক্রাবি	৯৩
সোঙক্লা	১৯৮	সাতুন	৯১
ইলা	১৫৫	ফানাঙ	৫৪

রাজ্যের নাম	মসজিদের সংখ্যা	রাজ্যের নাম	মসজিদের সংখ্যা
পাথালুঙ	৫১	চিয়াংমাই	৮
আয়ুসিয়া	৪৮	প্রাচুপ খিরিথান	৭
চাকোএঙ্সাও	৪৫	টারাট	৬
ট্রাঙ্	৪৩	সারাবুরি	৩
নাথান-সি-মারাট্	৪২	টাক্	২
ফুকেট্	২৫	চিয়াংরাই	২
পাঞ্চন-থানি	২৪	আঙ্থঙ্	১
নাখন-নায়োক	২১	সামুত সভ্ক্রাম	১
সুরট থানি	২০	নাখন সোয়ান	১
নমথাবুরি	১৯	লাম প্যাঙ	১
চনবুড়ি	১৮	মায়ে হুঙ্সন	১
রানাঙ	১১	নাখন রাতচাসিমা	১
পেচাবুড়ি	৮	সুফান বুড়ি	১
সামুত প্রাকান	৮	নাখন পাথম্	১

তেরোশো শতকের শেষে মহান সুখথাই বংশের রাজা রাম কানহায়েঙ দক্ষিণ অংশের

থাই রাজার শাসন ও আইন চলতো না, তার বদলে বিভিন্ন মালয় রাজকুমার শাসন করতো ও তাদের আইন চলতো এই অঞ্চল গুলোতে। এই শতকের প্রথমেই 'পঞ্চম রামা' নামে থাই শাসক, সরকারের গঠন প্রণালী যেমন বদলালেন তেমনই মুসলমানদের থাইল্যান্ডে অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটালেন বিভিন্ন প্রথার দমনমূলক আইন দ্বারা বিশেষ করে দক্ষিণে, দক্ষিণের মুসলমানরা যেমন থাই ভাষা জানতো না তেমনি আবার থাই শাসকবর্গের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগও ছিল না। যার ফলে নতুন ব্যবস্থা তাদেরকে আরো শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল করে দিল। যার ফলে তাদের মনে একটি বিচ্ছিন্নতাকামী মনোভাব জন্ম নিল যে হয় তারা মালয়েশিয়ার মতো ইসলাম ধর্মাবলম্বী দেশের সঙ্গে যুক্ত হবে নয়তো স্বাধীনতা অর্জন করবে। যার ফল স্বরূপ থাইল্যান্ডের দক্ষিণে বিভিন্ন প্রকার আন্দোলন ঘটতে লাগলো, যা থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমতার পরিপন্থী এবং এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আশির-দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বেশ সক্রিয় ভাবেই চলেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে থাই সরকার দক্ষিণের মুসলমানদের প্রতি কিছুটা পরিমাণে নমনীয় হয় এবং মুসলমানদের স্বার্থেই আরো কিছু আইনের প্রণয়ন ও পরিবর্তন সাধন করে, যার ফলে দক্ষিণের ঐ মুসলমানদের আন্দোলন কিছুটা পরিমাণে স্তিমিত হয়ে পড়ে, আজও

কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে অস্তমিত হয়ে পড়েনি।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। G.R. Tibbetts, Arab Navigation in the Indian Ocean before the comming of Portuguese (London Roayl Asiatic Society - 1971) P. 2.

২। S. Nagrajan — Islam in S.E Asia (Occational paper — Tamil University - Tiruvananthapuram 1981) p. 19.

৩। M. Piracha. Akrem — Muslim in South-East Asia (Chulalongeorn Univesity, Bangkok, 1962)

৪। G. R. Tibbetts - Ibid . P. 486-489.

৫। Andrew D.W. Forbes — Thailand Muslim Minorities : Assimilation secession or co-existence ? (in "The Muslims of Thailand" - General Edition S. Sahai, Gaya India, 1988) P. 168, vol-2.

৬। N. Gervaise, The Natural and Political History of the kingdom of Siam A.D. 1688 (in "The Muslims of Thailand" - General Edition S. Sahai, Gaya India, 1988) p. 150 (Vol-II).

৭। G.R. Tibbets, "Early Muslim Trade.s in S.E. Asia" (Journal of the Malaysian Branch of Royal Asiatic Society, Kualalampur, 1978) p 30.

৮। G. R. Tibbets - (ibid) - p 42.

৯। David Wyatt, "A Thai Verson of Newbold's Hikayat Pattani" (in Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Kualampur) Vol. 40, P. 16-37.

১০। Brain Harrison, Southeast Asia, A Short History, (London, Newyork, Macmillan, 1966) P. 201-202.

১১। A.D.W. Forbes - ibid.

১২। Astri Sukhre - "The Thai Muslims : Some Aspects of Minority Integration" in pacilic Affairs) P. 536-37.

১৩। Raimond Scupin - ibid.

১৪। Ruth-Ing Heinze - "Socio-Psychological Aspects of the work of Thai-Muslim BOMOHS in Pattani" (in the muslims in Thailand general editor, S.Sahai, Gaya, India, 1988) Vol-I, P. 125.

রাডেন আডজেঙ কার্টিনি - ইন্দোনেশীয় নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

করবী মিত্র

নারীর ক্ষমতায়ন আজকের যুগের অন্যতম প্রধান দাবি। এই দাবির সূচনা ঔপনিবেশিক এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ক্ষমতায়ন ও সমাজে নারীর স্থান নির্ধারণের বিষয়টি বারে বারে পরিবর্তিত মাত্রা লাভ করেছে।

এশিয়াস্থ ইউরোপীয় উপনিবেশ গুলিতে প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে এক ধরণের সচেতনতার উন্মেষ ঘটেছিল। মহিলারাও এর প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হননি। তবে তাঁদের ক্ষমতায়ন ও আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা খুব বেশি জনের কলম থেকে বেরিয়ে আসেনি। আলোচ্য প্রবন্ধে উনিশ শতকে ইন্দোনেশিয়াস্থ ডাচ উপনিবেশে নারীর সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। উৎস হিসাবে জাপারার এক অভিজাত মহিলা রাডেন আডজেঙ কার্টিনির (১৮৭৯-১৯০৪) লেখা কিছু চিঠি ব্যবহৃত হয়েছে।

যে কোনও সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রথম শর্ত শিক্ষার প্রসার। ইন্দোনেশিয়ার ডাচ সরকার সীমিত আকারে শিক্ষার প্রসার ঘটালেও নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশ শতকের আগে বিশেষ কোনও চেষ্টা করেনি।[১] তবে ইউরোপীয় স্কুলগুলিতে ডাচদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে দেশীয় অভিজাতদের সন্তানরাও লেখাপড়া শিখতে পরত।[২] দেশীয় মেয়েদের পড়াশোনা সাধারণত প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত কারণ বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথার জন্য উচ্চতর শিক্ষালাভের কোনও সুযোগ তাদের হত না। এই পরিস্থিতির স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় জাপারার এই প্রিযায়ী[৩] বা অভিজাত বংশীয়া মহিলা কার্টিনির লেখা থেকে। চিঠিগুলিতে তিনি ঔপনিবেশিক তথা দেশীয় সামাজিক কাঠামোয় নারীর অপরিবর্তিত অবস্থান ও তাদের শিক্ষিত ও স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেছিলেন।

কার্টিনি তাঁর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অজস্র চিঠি তাঁর ডাচ বন্ধুদের কাছে লিখেছিলেন যেগুলি বিশ্বের নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। সমসাময়িক অনেক ব্যক্তি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ডাচ সরকারের কাছে পেশ করা তাঁর রিপোর্ট 'এথিক্যাল পলিসি' প্রণয়নের উপর প্রভাব ফেলেছিল। তাছাড়া ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর সুগভীর চিন্তাধারা, ঔপনিবেশিক সমাজের মূল্যায়ন এতটাই প্রভাব বিস্তার

করেছিল যে, স্বাধীনতাত্তোর যুগে তাঁকে 'ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদের জননী' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল।

ইন্দোনেশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। ধরে নেওয়া যায় যে, অবরোধ প্রথা সহ মুসলিম সমাজে পালনীয় কিছু রীতিনীতি সেখানেও মানা হয়। কিন্তু সে যুগে কৃষিজীবী ইন্দোনেশীয় সমাজে সাধারণ মহিলাদের অনেক ধরণের স্বাধীনতা ছিল।[৪] এমনকি পর্দাপ্রথার কঠোরতাও তুলনামূলকভাবে কম ছিল।[৫]

কিন্তু অভিজাত-বংশীয়া মহিলাদের অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। কার্টিনির লেখায় একদিকে যেমন তিনি অভিজাত মহিলাদের গৃহবন্দী জীবনের কঠোর সমালোচনা করেছেন অন্যদিকে দারিদ্র্য নিপীড়িত বিদেশী অধিকৃত দেশের সাধারণ মানুষের অশিক্ষা, ভগ্নস্বাস্থ্য ও শোষিত জীবনযাত্রার প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন। নানাভাবে ঔপনিবেশিক সরকারের ব্যর্থতার চিত্র তিনি বিদেশী বন্ধুদের কাছে তুলে ধরেছিলেন।

তিনি পুরুষবিদ্বেষী ছিলেন না তবে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর যে প্রকৃত অর্থে কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নেই তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। মহিলাদের উপর নানা ধরণের অত্যাচারের তিনি তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, "ইন্দোনেশীয় পুরুষ তার স্ত্রীর উপর আমৃত্যু অত্যাচার করতে পারে, ইচ্ছামত তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে পারে... সে দেশের আইন ও প্রথা অনুযায়ী সমস্ত কিছুই পুরুষদের জন্য, নারীর জন্য নয়।"[৬] "ইন্দোনেশীয় নারী তার অশ্রুবিসর্জন ও পুরুষের অত্যাচারকে বিধি নির্দিষ্ট বলেই মেনে নেয়। কারুর কাছে অভিযোগ জানায় না।"[৭]

ছোটবেলা থেকে কার্টিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজে মহিলাদের জায়া ও জননীর ভূমিকার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বহুদিন পর্যন্ত অবিবাহিতা থেকে শিক্ষা প্রসার ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মে ব্রতী থেকেছিলেন। তাঁর কাছে মহিলাদের নিরাপদ বিবাহিত জীবনের চাইতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও জীবিকা বেছে নেওয়া অনেক বেশি জরুরি ছিল।[৮]

কার্টিনির কাছে বিবাহের তাৎপর্য ছিল ঈশ্বর সৃষ্ট পরস্পরের পরিপূরক মহিলা ও পুরুষের মিলন। কিন্তু এই সম্পর্কের মধ্যে মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ছিল তাঁর ক্ষোভের প্রধান কারণ। যদিও প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ একাধিক বিবাহ করত না কিন্তু প্রতিটি বিবাহিতা মহিলা জানতেন যে, কোনও সময়ে তাঁকে সপত্নীর সম্মুখীন হতে হবে।[৯] এই সমস্যা অভিজাতদের মধ্যে তীব্র ছিল কারণ সে যুগে তাঁরা কমবেশি ২৬টি বিবাহ করতে পারতেন।

কার্টিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিদেশী শাসন কোনভাবেই দেশীয় মহিলাদের পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারবে না। কারণ, আপাতদৃষ্টিতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা ভাবাদর্শকে প্রগতিবাদী বলে মনে হলেও লিঙ্গবৈষম্যের ক্ষেত্রে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের কোনও

ভেদ থাকে না। তাঁর লেখায় এই কারণে গভীর নৈরাশ্য বোধ ফুটে উঠেছে। কারণ, স্বয়ং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও পশ্চিমী নারীমুক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে জানার সুবাদে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে একমাত্র শিক্ষার প্রসার দেশীয় নারীর শৃঙ্খলমোচন করতে পারবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল যে, ডাচ সরকারের কাছে শিক্ষার প্রসারের চাইতে বাণিজ্যিক মুনাফার প্রশ্ন অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ।[১০] অনেক পরে ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষা অধিকর্তা অ্যাবেনডাননের লেখা থেকে এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছিল।[১১] এই প্রসঙ্গে কার্টিনি ঔপনিবেশিক স্বার্থে শিক্ষাব্যবস্থার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশেষ করে ডাচ মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার, জনশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার প্রতি অবহেলা এগুলির প্রতি নির্দেশ করেন।[১২] অথচ ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষার প্রচীন ঐতিহ্য ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষরা এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন।[১৩]

কার্টিনির চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য অদম্য মানসিক জোর যার বলে তিনি সমস্ত প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠে এক নূতন ধরণের সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিদেশী সহায়তার পরিবর্তে তিনি দেশীয় মানুষকে আত্মশক্তিতে আস্থাশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি মহিলাদের নিজস্ব সমস্যার সীমারেখা অতিক্রম করে লিঙ্গনির্বিশেষে এক জাতীয় সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে। কুসংস্কার, প্রাচীন অবান্তর প্রথা, অনুশাসন, স্বাস্থ্যহীনতা, অশিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত ধরণের পশ্চাদপরতা থেকে দেশের মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে তিনি অবিচল ছিলেন। তাঁর কাছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রথমশর্ত ছিল শিক্ষা বিশেষ করে মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসার। তাঁর ধারণা ছিল যে, দেশীয় অভিজাতমহলে শিক্ষার প্রসার হলে তার প্রভাব সাধারণের উপর পড়বে। এই ক্ষেত্রে তিনি "filtration" নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং শ্রেণীসচেতনতার গন্ডী অতিক্রম করতে পারেননি। তবে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি হস্তশিল্প, ভেষজবিদ্যা, এগুলির পুনর্জাগরণেয় উপর গুরুত্বদান অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল।

কার্টিনি মহিলাদের মানাবিক অধিকার দানকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, নারী শিক্ষার প্রসারের ফলে গোটা সমাজ উপকৃত হবে। কারণ, প্রতিটি পরিবারে মা হচ্ছেন শিশুর প্রথম শিক্ষক।[১৪]

দেশে সমাগত পরিবর্তনের জোয়ার সম্বন্ধে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল।[১৫] নারীবাদী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান এক মুক্তনারীর কল্পনা যাকে আমরা অনায়াসে শতাব্দীর সীমানা ছাড়িয়ে আধুনিক যুগে যে কোনও দেশের নারীবাদী আন্দোলনের আদর্শ হিসাবে স্থাপন করতে পারি। নিজের অনাগত শিশুকে তিনি নারী হিসাবে কল্পনা করেছিলেন এবং আন্তরিকভাবে তাকে মুক্তনারী হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন — তাঁর ভাষায় "যে কখনই আর আন্তরিক অনুভূতির বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে বাধ্য হবে না। স্বাধীন

ইচ্ছার দ্বারা সে পরিচালিত হবে। পিতা মাতা তার মঙ্গলের জন্য সদাব্যস্ত থাকবেন তবে তার ইচ্ছার উপর কোন প্রভাব জবরদস্তি করবেন না।"[১৩] বিবাহকে তিনি নারীজীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মনে করতেন না। বরঞ্চ শিক্ষিত, স্বনির্ভর ও স্বাধীন চিন্তাধারা সম্পন্ন নারী ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল।

বহু কাজের পরিকল্পনা থাকলেও অকালমৃত্যুর জন্য (১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৪) তাঁর পক্ষে আর কোনও প্রকল্পের রূপায়ণ সম্ভব হয়নি। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ ইন্দোনেশীয় সমাজে সচেতনতার সৃষ্টি করেছিল। অজস্র কার্টিনি স্কুল গড়ে উঠেছিল এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। ধীরে ধীরে সমাজে মহিলাদের অবস্থানের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা শুরু হল এবং নারী পুরুষের মিলিত প্রচেষ্টায় ইন্দোনেশীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হল।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। কোরা ভ্রিদে দি স্টুয়ার্স, 'দ্য ইন্দোনেশিয়ান উম্যান : স্ট্রাগল্‌স্ এণ্ড এ্যাচিভমেন্টস', দ্য হেগ : মুতোঁ এণ্ড কোং, ১৯৬০, পৃ: ৫৭।

২। রাডেন আডজেঙ কার্টিনি, 'লেটারস্ অফ এ জাভানিস প্রিন্সেস', অনুবাদ এ্যাগনেস লুইস সিমাবস্, ওন্ডন: ডাকওয়ার্থ এণ্ড কোং, ১৯২১, পৃ : ৩৬।

৩। ইন্দোনেশিয়ার দেশীয় অভিজাতদের 'প্রিয়াবী' বলা হত। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ভ্যান নিয়েল, 'দ্য ইমারজেন্স অব মডার্ণ ইন্দোনেশিয়ান এলিট', দ্য হেগ এণ্ড বান দুং: ডব্লিউ, ভ্যান হোভ লিঃ, ১৯৬০,পৃ: ১৫।

৪। ভ্রিদে, পৃ: ৪২-৪৪।

৫। ইন্দোনেশীয় সমাজে ইসলামীয় ও প্রাক্ ইসলামীয় আইনের সহাবস্থান এক বিশেষ ধরণের সামাজিক পরিস্থিতির সূচনা করেছিল। দ্রষ্টব্য ভ্রিদে, পৃ: ২১-২৪।

৬। কার্টিনি, পৃ: ১৭, বঙ্গানুবাদ লেখকের।

৭। তদেব, পৃ: ৫৪।

৮। তদেব, পৃ: ১৪৯।

৯। তদেব, পৃ: ৭২।

১০। ক্লাইভ ডে, 'দি পলিসি এ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব দ্য ডাচ ইন জাভা' কুয়ালালামপুর, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৫।

১১। ভ্রিদে, পৃ: ৫৭।

১২। কার্টিনি, পৃ: ৩৭-৩৮।

১৩। নাগাজুমি আকিরা, 'দ্য ডন অব ইন্দোনেশীয়ান ন্যাশনালিজম, দ্য আর্লি ইয়ার্স অব যুদি উতোমো, ১৯০৮-১৯১৮', টোকিও ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপিং, ইকোনমিস, ১৯৭২।

এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

১৪। কার্টিনি, পৃ. ৪৮।

১৫। তদেব, পৃ: ২০।

১৬। তদেব, পৃ: ৩০১।

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিশ্বায়ন ও মানবাধিকার

কুমকুম চট্টোপাধ্যায়

সাম্প্রতিককালে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তির সাথে সাথে মানবাধিকার ধারণাটির বাস্তবায়ণের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বিশ্বায়নের মূল ধারণাটি ব্যাখ্যা করলে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে পশ্চিমী গণতন্ত্রের প্রভাব অব্যাহত। ফলত মানবাধিকার যখন বিশ্বায়নের যুগে প্রাধান্যলাভ করছে তখন সেখানেও আমরা সেই প্রভাব লক্ষ্য করি। তাই পশ্চিমী মানবাধিকারের ধারণাই বিশ্বজনীন বলে স্বীকৃতি লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের 'মানবাধিকার' এই ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে মানবাধিকার হল সেই সমস্ত অধিকার যেগুলি জন্মসূত্রেই প্রকৃতিদত্ত এবং যেগুলি ছাড়া আমরা মানুষ হিসেবে জীবনধারণ করতে পারি না। মানবাধিকার মানুষের অর্জিত অধিকার নয়। এই অধিকার মানুষ জন্মসূত্রেই লাভ করে। এই অধিকার কেউ কাউকে অনুগ্রহ করে দেয় না। ফলে কেউ কাউকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই যে মানুষকে তার অধিকার থেকে বারবার বঞ্চিত করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রিস বা রোমের দাস ব্যবস্থা এই অধিকার হরণের সর্বপ্রাচীন প্রমাণ। তারপর সামন্ততন্ত্রের পথ বেয়ে আজকের ধনতন্ত্রে এসেও এই অধিকার হরণের ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। সমাজে সুবিধাবাদী শ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। ফলে এক শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আর এক শ্রেণীর অধিকার হরণ করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য প্রমাণ করার জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে নানা তত্ত্বের, মানুষই প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছে যে সব মানুষ সমান নয়। কেউ জন্মেছে প্রভুত্ব করার জন্য, কেউ জন্মেছে দাসত্ব করার জন্য। জাতির ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে যেমন পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক প্রভাব বা ক্ষমতা প্রয়োগ করে মানবাধিকারের মর্যাদা লুন্ঠন করা হয়েছে। তবে বর্তমানে প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতির ফলে পৃথিবী একটি বিশ্বায়িত একক অথবা Global Village[১]-এ পরিণত হয়েছে। ফলে মানবাধিকার ভঙ্গ অথবা মানবাধিকার অবমাননার ঘটনা আমরা প্রতিনিয়ত শুনতে পাচ্ছি।

বিশ্বায়নের সাথে সাথে মানবাধিকারের যে ধারণা সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে উঠে এসেছে, স্বভাবতই তার উৎস পাশ্চাত্ত্য চিন্তা অথবা পশ্চিমী সমাজকাঠামোর মধ্যে নিহিত। তাই পাশ্চাত্য শক্তি, মূল্যবোধ ও স্বার্থকে আমরা মানবাধিকারের উৎসরূপে

দেখি।

মানবাধিকার ধারণাটির উৎস

যদিও আমরা জানি যে অধিকার ও মর্যাদার দিক থেকে সব মানুষই সমান তবুও এই স্বীকৃত সত্যটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে এবং হচ্ছে। ১২১৫ সালের মহাসনদ (The Magna Carta), ১৬২৮ সালের 'দ্য পিটিসন অব্ রাইটস' এবং ১৬৮৯ সালের 'বিল্ অব্ রাইটস' নাগরিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে 'বাইবেল' নামে পরিচিত। মহাসনদ সামন্ততান্ত্রিক ব্রিটেনে নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতির সঙ্গে জড়িত। রাজা জনের রাজত্বকালে ব্যারণ ও যাজকরা রাজার কাছ থেকে নিজেদের সুবিধা এবং অধিকার অর্জনের জন্য এক দাবি পেশ করেছিল। ঐ দাবি সনদের মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির সম্পর্কই ব্যক্ত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের অধিকার স্বীকৃতি না পেলেও ইংরেজজাতির স্বাধীনতার ইতিহাসে মহাসনদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃত। মহাসনদের মাধ্যমে রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সামন্তদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের সংগ্রামের মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের উচ্ছেদ এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের প্রাধান্য বিস্তার শুরু হয়। নতুন উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অধিকারের জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী আন্দোলন শুরু করে। ১৬২৮ সালে ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের পক্ষ থেকে রাজা প্রথম চার্লস-এর কাছে অধিকার সংক্রান্ত এক আবেদনপত্র পেশ করা হয়। ঐ আবেদনপত্র অনুসারে পার্লামেন্টের অনুমতি ব্যতীত রাজা কর ধার্য করতে পারবেন না। রাজার বিশেষ আদেশে কোন ব্যক্তিকে বন্দী করা এবং শান্তির সময়ে সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধেও এখানে দাবি রাখা হয়েছিল। রাজা প্রথম চার্লস ঐ দাবি স্বীকারে বাধ্য হন।

১৬৮৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক বিল অব রাইট্‌স প্রণীত হয়। ঐ বিল অনুসারে রাজার স্বেচ্ছাধীন ও স্বৈরাচারী ক্ষমতা ব্যাপকভাবে সংকুচিত করা হয়। ঐ বিল অনুসারে আইন বাতিলের ক্ষেত্রে রাজকীয় অগ্রাধিকারের বিলোপ ঘটানো হয়। পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া করধার্যের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়।[২]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালে দেখা যায় যে মার্কিন সংবিধান রচয়িতাগণ বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাধীনতার ধারণার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁদের চিন্তাধারার উপর লক ও মঁতেস্কুর প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকারের প্রথম ঘোষণা হল ভার্জিনিয়ান অধিকারের ঘোষণা। এর মধ্যে সমকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে। ১৭৭৬ সালের এই ঘোষণাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক স্বাধীনতার ভিত্তি বলা যায়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল সংবিধান চালু হওয়ার সময় তাতে মৌলিক অধিকার ছিল না। এই কারণে অনেকগুলি অঙ্গরাজ্য তা

অনুমোদন করেনি। তাই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পরেই ১৭৯১ সালের প্রথম দশটি সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মার্কিন নাগরিকদের এই সমস্ত অধিকারকে অধিকারের সনদ (Bill of Rights) বলা হয়। ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, অভিযুক্ত হলে আইনের যথাবিহিত পদ্ধতিতে বিচার পাওয়ার অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রভৃতি মার্কিন নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

আরও অনেক পরে The Mexican Constitution of the Republic (1917), The Constitution of Germany (1919) এবং The Constitution of the Republic of Spain (1931) মোটামুটিভাবে সব পৌর অধিকারগুলিকে প্রকাশ করেছিল যেখানে মানবাধিকার অন্তত কাগজে কলমে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে বাস্তবে এই অধিকারগুলি বিমূর্ত ধারণাই থেকে গিয়েছিল।[৪]

চিন্তাবিদ্‌দের তত্ত্বে মানবাধিকার

ব্রিটিশ চিন্তাবিদ জন লক (১৬৩২-১৭০৪) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Two Treatises On Civil Government (1689) -এ তাঁর স্বাভাবিক অধিকার (Natural Rights)-এর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর এই স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তিনি জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারকে ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক জাঁ জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট নাম। সমকালীন ফ্রান্সে অপশাসন ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ফরাসী জনগণ প্রতিবাদে মুখর হন। এই প্রতিবাদের পিছনে রুশো তত্ত্বগত সমর্থন যুগিয়েছেন। তাঁর তত্ত্বে তিনি গণস্বাধীনতা ও অধিকারের ধারণাকে তুলে ধরেছেন। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের পিছনে রুশোর তাত্ত্বিক অবদান ছিল অপরিসীম। ফরাসী বিপ্লব শুধু স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ঘোষণাই করে নি, ফ্রান্সে পরবর্তী বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল। The French Declaration of the Rights of Man and of the citizen (1789) নতুন গঠিত জাতীয় রাষ্ট্রগুলির সংবিধানে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করার উৎসাহ সঞ্চার করেছিল। সেই সঙ্গে ফরাসী বিপ্লব অধিকারের ধারণাটিকে একটি ইউরোপীয় বা আরও বিস্তৃত অর্থে বিশ্বজনীন রূপ দান করে। কিন্তু অধিকারের এই ধারণা সর্বসাধারণের অধিকারকে তুলে ধরে নি। তাই এই ধারণাটি একটি বুর্জোয়া ধারণা বলে পরিগণিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক ও নারীবাদী ধারণা প্রসার লাভ করে। কার্লমার্ক্স তাঁর প্রথম জীবনে ১৮৪৩ সালে লিখিত 'ইহুদি প্রশ্নে' (On Jewish Question, 1843) নামে একটি প্রবন্ধে অধিকারের ধারণাটির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। মানুষের স্বাভাবিক

অধিকার এবং নাগরিকদের আইনগত অধিকার — অধিকারের এই দুটি ধারণারই সমালোচনা করে মার্ক্স দেখিয়েছিলেন যে এই অধিকারের দাবি বস্তুত অরাজনৈতিক সমাজ (Civil Society) থেকে উদ্ভূত। মূলত এ দাবি বুর্জোয়া ব্যক্তির দাবি। ফরাসী বিপ্লবের সময় রচিত অধিকারের ঘোষণা আসলে বিচ্ছিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে। এই অধিকার বুর্জোয়ার সম্পত্তি রক্ষার অধিকার। অতএব শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যে অধিকারের কথা বলা হয় তা মূলত শাসকশ্রেণীর অধিকার।[৫]

নারীবাদী চিন্তার মধ্যেও সমাজতন্ত্রী ও অ-সমাজতন্ত্রী বা উদারনৈতিক — এই দুই মতের মধ্যে তীব্র বিভাজন হয়। ফলে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে অধিকার মানে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সুযোগ সুবিধা এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগ ও মানবাধিকার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিগুলি সচেতন হয়। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ৫৮টি সদস্য দেশ প্যারিসে মিলিত হয়ে Universal Declaration of Human Rights ঘোষণা করে। একে বলা হয় মানবাধিকার সনদ। এই সনদের মর্মবস্তু হল, বিশ্বের সমস্ত মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, দাসত্ব ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার অধিকার, শিক্ষার ও জীবিকার অধিকার, ধর্মপালন, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার — নারীপুরুষ নির্বিশেষে বিশ্বের যে কোন মানুষের মৌলিক অধিকার। ১৯৯৮ সালে এই ঘোষণাপত্রের সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হয়েছে বেশ কিছু দেশে। প্রত্যেক বছর ১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। ১৯৬৮ সালকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই সময় মানবাধিকার সম্পর্কে এই সচেতনতা অবশ্যই লক্ষণীয়।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে ১৯৪২ সালে International League for Human Rights (ICHR) গঠিত হয়েছিল। এটি একটি বেসরকারি সংগঠন এবং এই সংগঠনটি মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব নেয়। ILO, UNESCO, Council of Europe প্রভৃতি সংগঠনগুলি ICHR-এব 'স্টাডি প্রোগ্রাম'-এ যোগ দেয় যেখানে অত্যাচার, কারাগারে আটক, বর্ণবৈষম্য, জেনোসাইড প্রভৃতি বিষয়কে গুরুত্ব নিয়ে তুলে ধরা হয়।৬

তার পরবর্তীকালে মানবাধিকার রক্ষার দীর্ঘ কর্মসূচীতে আমরা দেখতে পাই European convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950), Geneva convention on slavery and Slave Trade (1956), International convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965), International convenant on civil and Political Rights (1966), International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)।[৭]

তৃতীয় বিশ্ব ও মানবাধিকার

উত্তর ঠান্ডালড়াই পর্বে অর্থনৈতিক উদারীকরণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত রাষ্ট্রগুলি মানবাধিকারের বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষার একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। তার প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিও এই ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছে। তৃতীয় বিশ্বে কতকগুলি আঞ্চলিক সংগঠন ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন NAM (Nonalignment Movement), ASEAN (Association of South East Asian Nations), ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and Pacific), SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation)। এর মধ্যে অধিকাংশ সংগঠনই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিকাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তদুপরি এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে মানবাধিকার এখনও দরিদ্র জনগণের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে নি। তবুও বলা যায় যে ASEAN মানবাধিকার রক্ষার চেষ্টা করছে। SAARC সন্ত্রাসবাদ ও মানবাধিকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

আধিপত্যবাদ ও মানবাধিকার

মানবাধিকার নিয়ে বর্তমানে যে চর্চা ও প্রয়োগ চলছে তার পেছনে অতি সূক্ষ্মভাবে আধিপত্যবাদ কাজ করছে। এখন আধিপত্যবাদের কৌশল হল বিশ্বের দুর্বল দেশ-গুলির উপর অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করা। আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির স্বার্থে আই.এম.এফ্, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর তথাকথিত আর্থিক সংস্কারের নীতি চাপিয়ে দিয়ে ঐ সব দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিচ্ছে এবং তাদের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে ঐ সব দেশের মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করছে তাদের জীবন ও জীবিকার অধিকার থেকে। আফগানিস্তানের প্রগতিশীল নাজিবুল্লা সরকারকে হঠাতে সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেনকে মদত দেওয়া এবং বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কের 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' পেন্টাগণের উপর অজ্ঞাত সন্ত্রাসবাদীদের বিধ্বংসী বিমান হানার পর লাদেনের উপর তার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার নামে আফগানিস্তানের উপর বর্বর আক্রমণ করা বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিষ্ঠুরতম উদাহরণ।[৮]

জাতীয় রাষ্ট্র বনাম মানবাধিকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আব্রাহাম লিঙ্কন যখন দাস প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন তখন এশিয়া ও আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশই ছিল উপনিবেশ-এর শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আমেরিকার সেই প্রগতিশীল আন্দোলন কিন্তু নিজের রাষ্ট্রের গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তেমনই Magna Corta -র প্রচার ও প্রসার ব্রিটেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড পৃথিবীতে মানবাধিকারভঙ্গের নজির হলেও তা বিট্রেনকে দোষী সাব্যস্ত করে কোন শাস্তি দেয় নি।

জাতীয় স্বার্থ, বিনিয়োগ, শিল্পোন্নয়ণ উদারীকরণ, বিশ্বায়ন এই প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের অধিকারকে পদদলিত করে এবং সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক কাঠামো উন্নয়নের নামে প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্যকে ক্ষুণ্ণ করে। ফলে সমগ্র মানবসমাজের অস্তিত্বই সঙ্কটের সম্মুখীন হয়।

আবার একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে মানবাধিকার ভঙ্গ নানাবিধ হতে পারে। যেমন - পুলিসী অত্যাচার, আঞ্চলিক জনগণের উপর অত্যাচার, গ্রামীণ হিংসার ঘটনা ইত্যাদি। এইসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা কোন কোন সময় অস্পষ্ট, কোন কোন সময় অনুপস্থিত। এখানে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ব্যবস্থা দাবি করতে পারে যে রাষ্ট্র মানবাধিকার রক্ষার সঠিক দায়িত্ব নিক।

মানবাধিকার ও এন্.জি.ও (NGO)

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এন.জি.ও. গুলি মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এরা একটি শক্তিশালী মানবিক মূল্যবোধের জায়গা তৈরি করছে, একটি মিশ্রিত (cosmopolitan) নৈতিক সচেতনতা তৈরির প্রয়াস পাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক দুই স্তরেই রাষ্ট্র যেখানে ব্যর্থ হচ্ছে সেখানে দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে আসছে।

এই এন্.জি.ও.রা মূলত চারটি ভূমিকা পালন করছে- ১) তথ্য সংগ্রহ করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষা সংগঠনগুলিতে পাঠাচ্ছে। ফলে প্রত্যন্ত গ্রামের বহু মানবাধিকার ভঙ্গের খবর আসছে যা সরকারি সূত্রে সাধারণত পাওয়া যায় না।

২) নতুন অধিকার স্বীকার করার ব্যাপারে রাষ্ট্রকে সতর্ক করছে।

৩) সরকারি কাঠামো দায়িত্ব না নিলে মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছে।

৪) সামাজিক পরিবর্তনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।[৯]

বর্তমান আন্তর্জাতিক সমাজে মানবাধিকার একটি বহু আলোচিত ধারণা। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যে 'অধিকার'-এর ধারণার জন্ম ও বিকাশ, বিশ্বায়ন পর্বে এসে সেই ধারণাই শোষণের একটি জনপ্রিয় অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই ইতিহাসের ধারায় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ও মানবাধিকারের ধারণার বহুল প্রচার - এই দুয়ের মধ্যে আমরা অনায়াসে একটি যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারি। মানবাধিকার ধারণার কাঠামোকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানবাধিকার রক্ষার যে প্রচেষ্টা তা শুধু প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীরই স্বার্থরক্ষা করে।

তবে ইতিহাসের ধারায় ধনতন্ত্র বিকাশের যেমন একটি নেতিবাচক ও একটি ইতিবাচক দিক আছে তেমনই ধনতন্ত্রের আধুনিক প্রকাশ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যেও আমরা সেই দুটি দিকই দেখতে পাই। নেতিবাচক দিকে মানবাধিকার' ধারণার প্রসার বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থকে

রক্ষা করে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে এটি একটি সাম্রাজ্যবাদী ধারণা। তাই তাঁরা নবগঠিত আন্তর্জাতিক সমাজে মানবাধিকারের ধারণাকে প্রয়োগ করার বিরোধী। আবার ইতিবাচক দিকে এই মানবাধিকার ধারণার বহুল প্রচার পৃথিবীব্যাপী এক সচেতনতা গড়ে তুলেছে। তার ফলে অত্যাচারিত, শোষিত ও প্রান্তিক মানুষরাও আজ মানবাধিকারের দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠছেন। তাই মানবাধিকার আজ আন্তর্জাতিক দরবারে নতুন ন্যায়কাঠামো গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানাচ্ছে।

সূত্র-নির্দেশ ঃ—

১। Globalization, Culture and Nations State — Rakhahari Chatterjee Globalization and the South Asian States - B. Ramesh Babu (ed.) (NewDelhi, South Asian Publishers, 1995). p. 166.

২। তুলনামূলক আধুনিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি: সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৩, পৃ. ২১৪-২১৫।

৩। নির্বাচিত শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি পরিচয় — ডঃ অনাদিকুমার মহাপাত্র, সুহৃদ পাবলিকেশন, ১৯৯৮, পৃঐ ২১।

৪। Awakening of Human Rights - M. Sundara Raj, Human Rights in India : Historical, Social and Political Perspections - Chiranjibi J. Nirmal (ed.) Oxford University Press, Second Impression, 2000.

৫। রাষ্ট্রবিজ্ঞান - হিমাচল চক্রবর্তী, দে বুক কনসার্ন, ১৯৯৭, পৃ. ২০৩-২০৪।

৬। Organizational Basis of Human Rights K. S. Krishnaswamy - Human Rights in India - Historical, Social and Political Perspectives - Chiranjibi J. Nirmal (ed.), Oxford University Press, Second Impression, 2000. pp.187-208.

৭। The working of the National Human Rights Commission - V. Vijaykumar, Human Rights in India, Historical, Social and Political perspectives - Chiranjibi J. Nirmal, Oxford University Press, Second Impression, 2000, pp. 211-212.

৮। বিপন্ন মানবাধিকার - সুহাস চট্টোপাধ্যায় — ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে বক্তৃতা, ২৫/৩/২০০২।

৯। Power, principles and prudence : Protecting human rights in a deeply divided world — Andrew Hurrel - Human Rights in Global Politics - Tem Dunna and Nicholas J. wheeler (eds), Cambridge University Press, 1999. pp-288-289.

বিংশ শতাব্দীতে বহুমুখী সংস্কৃতিবাদ : তার সমস্যা ও সম্ভাবনা

খালেদা গণি

জর্জ ওয়াশিংটনের ভাষায় বলি— "আমেরিকার বিরাট হৃদয়ে সকলেরই স্থান সংকুলান হবে, শুধুমাত্র ধনী এবং সম্ভ্রান্ত বিদেশীরাই সেখানে স্বাগত নয়; যারা নির্যাতিত , যারা দেশে দেশ নিপীড়িত হচ্ছে, নানান জাতির, নানান ধর্মের মানুষেরাও আমাদের কাছে 'সুস্বাগতম'; আমাদের দেশের নাগরিকের সবটুকু অধিকার, সুযোগ সুবিধা তাদেরই কাছে অনায়াসলভ্য যারা ব্যবহারে এবং স্বভাবে সবদিক থেকে নিজেদের এই সুবিধালাভের যোগ্য করে তুলবে।"

উত্তর ইউরোপ এবং গেট ব্রিটেন থেকে যেসব শ্বেতাঙ্গ মানুষের দল আমেরিকায় এসেছিলেন বসবাস করতে, তাঁরাই রচনা করেছিলেন এদেশের সংবিধান; তাঁদের চারিত্র্য এবং স্বভাবের প্রসাদগুণে ইওরোপীয় মার্কিনী শ্বেতাঙ্গ মানুষের যে অপূর্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠল, তার মূলে বাসা বেঁধেছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা, আত্মনির্ভরতার বোধ, কর্মনীতি এবং আপন আপন সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ অধিকার বোধটুকু এই নতুন সংস্কৃতির পীঠস্থান। যারা বিদেশ থেকে আসবেন, তাঁদের শ্রমজীবী হিসেবে দেখা আর দু'হাত বাড়িয়ে স্বাগ্রহে তাদের নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করা, এ দুটি একেবারে ভিন্ন ধারণা। আমেরিকার বিপ্লব ঘটে যাওয়ার পরে টমাস জেফারসনের মত জননায়কও সবিস্ময়ে এই প্রশ্নই করেছিলেন যে এই নবাগত মানুষের ঢল কী আমেরিকা গ্রহণ করতে পারবে, তার 'রিপাব্লিক' আদর্শটুকু বজায় রেখে ?

যে সংস্কৃতি বন্ধন একসূত্রে সমগ্র মার্কিনজাতটাকে সংঘবদ্ধ করে রেখেছে, তা কিন্তু ধর্মীয় বা জাতিগত নয়, তার সত্তা রাজনৈতিক। সমাজগত জীবনে যে সংস্কৃতি কাজ করছে, তা'হল ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে রাখা, বাক-স্বাধীনতা, সম্মীলিত হবার স্বাধীনতা এরা মিলেমিশে সমাগত বিদেশী গোষ্ঠীপুঞ্জের আপন আপন প্রাচীন মূল্যবোধ এবং জীবনের সুখদুঃখের সংজ্ঞাগুলোকে অক্ষত রেখেছিল, যাকে আমরা স্বেচ্ছা আশ্রিত সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ বলি তার সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছিল এবং এতদসঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলোরও সংরক্ষণ ঘটেছিল।

যে সামাজিক সংস্কৃতির কথা আমরা বলছি, তার ভিত্তিভূমি হল 'রিপাব্লিকে'র সংবিধান রচনায়, তিনটি প্রধান ভাবনা; যাকে আমরা রিপাব্লিকান সংগঠন বলছি। তার মূলে প্রথম

সর্বজনগ্রাহ্য সত্যটি হল দেশের সমস্ত নরনারীকে তাদের 'স্বশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে হবে, তারা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এই স্বশাসন ব্যবস্থা চালু রাখবেন, এই প্রতিনিধির দল তাদের নির্বাচকদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন; দ্বিতীয়ত এই যে রাজনৈতিক দলবদ্ধ মানুষদের কথা বলছি সে যুগে অবশ্য শ্বেতাঙ্গ সাবালক পুরুষদেরই বোঝানো হচ্ছে, এরা সামাজিক জীবনে সমান রাজনৈতিক অধিকার লাভ করবে, এবং তৃতীয়ত, যারা সমাজের সুসভ্য নাগরিক বলে পরিগণিত হচ্ছেন, তাদের ধর্মীয় এবং ব্যক্তিগত জীবনের স্বাতন্ত্র রক্ষিত হবে।

যখনই বহিরাগত মানুষেরা দলে দলে এসেছেন তখনই দেশের স্থায়ী বাসিন্দারা তাদের সন্দেহের চোখে দেখেছেন, এবং সমগ্র মার্কিন জাতটা তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলবে কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। ১৯৬৫ সালের Immigration & Nationality Act এর যে সংশোধনগুলি এবং ১৯৮০ সালের Refugee Act এর যে ধারাগুলি পার্লামেন্টে স্বীকৃতি পেয়েছিল, তখনই নতুন করে আমেরিকার প্রবেশ দ্বারে অসংখ্য বহিরাগত মানুষের ঢল নেমেছিল, বছরে তাদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ছ'লক্ষের মত— এ বলছি ১৯৮০ সালের কথা। ১৯৮৬ সালের Immigration Act অনুসারে আরও বহু বহিরাগত এদের দলে ভিড়েছিল। এর ফলে মার্কিনী একতাবাদ সম্পর্কে নতুন করে সন্দেহ দেখা দেয়। এই টালমাটাল অবস্থার মূলে ছিল নবাগত মানুষদের জাতিগর্ব এবং ১৯৬০ এবং ১৯৭০ সালের জনমানসে যে শক্তিসঞ্চালিত হয়েছিল। তার ফলে উপজাত কার্যকরী রাজনীতির ধারণা।'

অতএব একথা বলা হল যে সব ধরণের জাতি-উপজাতিগত বিভেদের মিলনক্ষেত্র হল মার্কিনী জাতীয়তাবাদ। জাতিগত ধ্যানধারণার সচলতা একে Kabidoscopic আখ্যা দেওয়া হল, এর সর্বাত্মক বিস্তারের জন্য; মার্কিনী জাতীয়তাবাদকে এই ধরণের আখ্যা দেওয়া হল এর জটিল এবং বিচিত্র রূপের জন্য নিত্য পরিবর্তনশীল সংস্থান রঙ এবং রূপবৈচিত্রের জন্য। ইহুদি, আইরিশ, ক্যাথলিক এবং স্পর্শকাতর আফ্রো-মার্কিনী সম্প্রদায়ের সংবেদনশীলতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। এই সমগ্র শ্রেণীটিকে কর্মপটু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা হল। সে যুগ ছিল Protestantism এর যুগ। ১৯৯০ সালে এই জাতি উপজতিগত চালচিত্রটি আরও বিরাট আকার ধারণ করল, বৈচিত্র্যে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে জাতির কর্মপ্রবাহে তা প্রতিবিম্বিত হল।

১৮২০ সাল থেকে ১৯৬০ সাল, এই যুগে যারা ইওরোপ থেকে এসেছিলেন, তারা আইনত স্বীকৃতি পেলেন।১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত পনেরো শতক মানুষ এসেছিল ইউরোপ থেকে ৪১% মানুষ এসেছিল লাটিন আমেরিকা থেকে এবং ৩৫% এসেছিল এশিয়া থেকে। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি দেখা গেল এশিয়া থেকে আসা মানুষের সংখ্যাই সর্বাধিক। ১৯৮৭ সালে এশীয়রা ছিল বহিরাগত মানুষের মাত্র ৪৩%, লাতিন আমেরিকা

এবং কারিবীয় সাগর অঞ্চল থেকে আসা মানুষের সংখ্যা ৪১% এবং ইওরোপীয়দের সংখ্যা মাত্র ১০%।

বহিরাগত উপজাতির মানুষেরা তারা এদেশে এসে তাদের হারিয়ে যাওয়া পরিবারের লোকজনকে একত্রিত করার প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হয়ে উঠল, যখন ১৯৬৫ সালে নতুন করে নাগরিক অনুপ্রবেশের আইন পাশ করা হয়েছিল, তখন কিন্তু একথা কেউ ভাবেনি যে এশিয়া প্রমুখ দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষেরা ১৯৭০ এবং ১৯৮০ সালের বিস্তারের মধ্যে মার্কিন নাগরিকত্ব অর্জন করতে চাইবে। পূর্ব ইওরোপ, মধ্য আমেরিকা,প্রমুখ দেশ থেকে কম সংখ্যক শরণার্থী আসার ফলে এটি সম্ভব হয়েছিল, এবং মেক্সিকো, ফিলিপিন, ভারতবর্ষ, কোরিয়া এবং চীনের মূল ভূখন্ড থেকে যারা এসেছিল, তারা কিন্তু মার্কিনী অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রেখেছিল, অন্তত আগামী একদশকের জন্য; কারণস্বরূপ বলা হল বিদেশাগত ঐ নব্য নাগরিকের দল তারা কিন্তু তাদের পরিবারের প্রতিনিধিদের নির্বাচনে অংশভাগী করে তুলতে পারতেন।

বহুধা বিভক্ত জাতি সত্তায় মার্কিনীদের অনড় বিশ্বাস এক ধরণের পাগলামীতে পরিণত হতে চলেছিল। তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, অসমন্বিত অসমন্বয়ে যোগ্য যে দুস্তর ব্যবধান নবাগত জাতি-উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তারা এই মার্কিনী চিন্তা ভাবনাকে সঞ্জীবিত করেছিল। শ্বেতাঙ্গ, অশ্বেতাঙ্গ এবং হিস্‌পানিও গোষ্ঠীরা নিজেদের মধ্যেকার জাতিগত বিভেদটুকুকে মুছে ফেলতে চাইলেও, সারা দেশ জুড়ে এক সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের প্রসার ঘটেছিল। ইওরোপীয় গোষ্ঠীজাত শ্বেতাঙ্গ মানুষেরা সহজেই ইওরো- মার্কিনী সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারলেও, অশ্বেতাঙ্গ এবং হিস্‌পানীয় গোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদের এই মূল স্রোতের সঙ্গে মেশাতে পারেনি। তাদের সহজাত বংশপরম্পরাগত প্রবৃত্তিনিবৃত্তির ধারণা এবং সংস্কৃতিগত মতপার্থক্যই এর জন্য দায়ী। মার্কিন দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইয়ে সকলেই কোমর বেঁধে লেগে পড়ায় দেশ জুড়ে এক অশান্তির প্রবাহ প্রবহমান হল। যদি কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অশ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের বঞ্চিত হবার আশঙ্কা থাকত, তখনই Racism বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীবাদের ধুয়ো তুলে তারা শ্বেতাঙ্গ শাসকদের কাজের সমালোচনা করত। প্রত্যেকটি উপজাতি তাদের আপনজনের সমভিব্যহারে বাস করতে চেয়েছিল। শ্বেতাঙ্গরা শহরের যে সব অঞ্চল ছেড়ে চলে যেত সেখানে অশ্বেতাঙ্গ মানুষেরা দল বেঁধে গিয়ে বাসা বাঁধত এবং এই ভাবেই এক ধরণের Integration বা জাতীয় সাযুজ্যতা অর্জিত হয়েছিল।

মার্কিনী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে উপজাতিদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, আজ যা দেখা যাচ্ছে, তার মূলে রয়েছে মার্কিনী কেন্দ্রীয় সরকারের একচ্ছত্র আধিপত্যের ধারণা। যাঁরা কেন্দ্রে আইন প্রণেতা হয়েছিলেন, তাঁদের আইনের বজ্রমুঠির পেছনে এইসব মানুষেরা পীড়িত হয়ে উঠেছিল এবং মার্কিনী সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ এই পেষণ থেকে মুক্তি চেয়েছিল,

কিন্তু সে মুক্তি মেলেনি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার লৌহ নিগড় সারা দেশে, ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মজার কথা হল, এই ব্যবস্থার উপরে শাসকদেরও কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই বিস্তারকে রোধ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। মার্কিনী নবজাগরণের যে আন্দোলন শুরু হল, তার উদ্দেশ্য ছিল এই বহুধা বিস্তৃত সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে থামিয়ে দেওয়া; ইওরোপীয় শ্বেতাঙ্গ কেন্দ্রিক যে সংস্কৃতি তারই পুনরুজ্জীবন ঘটানো।

ইতিহাস মন্থন করলে আমরা এই সত্যটিকে বুঝব যে জাতিগঠন করা সেইসব নির্ভীক মানুষেরই কাজ যাঁরা অসম্ভবের স্বপ্ন দেখেন। মার্কিনী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তনের পূর্বে Loyalists বলে পরিচিত গোষ্ঠী সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। আজকের দিনেও টেক্সাস এবং কালির্ফোনিয়ার মত অঙ্গরাজ্য শান্তিপূর্ণ ভাবে তাদের মূল রাষ্ট্র থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারে, স্বশাসিত, সবশ্য, জাতি হিসেবে। ইওরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের থেকে মার্কিনী প্রদেশগুলো অনেকাংশে বড় এবং তাদের জাতীয় উৎপাদন ক্ষমতাও বৃহত্তর।

ঐতিহাসিক Arnold Toynbee এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সভ্যতার বিনাশ ঘটে আত্মহননের জন্য; বিদেশী শত্রুর সশস্ত্র আক্রমণ এর কারণ নয়। আজকের দিনের মার্কিনী সমাজে যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সংকট ঘনিয়ে উঠেছে, তাকে রোধ করা, তার নিরশন করা বর্তমান রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থায় সম্ভব নয়। জাতি-উপজাতির ধূমায়মান বিরোধ আস্তে আস্তে এক ধরণের মানসিক ব্যাধিতে সমগ্রজাতিকে আচ্ছন্ন করে চলেছে। বিদেশাগত শক্তির আক্রমণ ঝঞ্ঝায় মার্কিনী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতন না ঘটলেও জাতীয় আত্মহননের শনৈ শনৈ প্রাগ্রসরতা লক্ষণীয়। যারা সত্যকে অস্বীকার করে সরলভাবে মার্কিনী জাতি সত্তাকে নবজাত জাতি সত্তা রূপে দেখতে চান, তারা কিন্তু ভ্রান্ত। যে পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়াস করা হয়েছে, তা অতীব জটিল, নাগরিকের স্বচ্ছ থাকার সম্ভাবনার পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়াস ক্রমেই এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে, যেখানে প্রগতির গিরিশৃঙ্গ এবং উপত্যকা নিচয়ে ক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে নাগরিক জীবনে লাভালাভের অঙ্কটাকে ক্ষীণ করে তুলবে। এই বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে হলে পরের প্রজন্মের মানুষদের ঘর্মাক্ত পরিশ্রমের কোন শেষ থাকবে না।

সমকালীন সমাজে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ধ্যান ধারণা এবং বাণিজ্যের বিশ্বায়ন নানান ধরণের সংস্কৃতিকে একাসনে বসিয়েছে। সংস্কৃতির বহুধা বিস্তার ঘটেছে মার্কিনী অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির কল্যাণে। বিংশশতকের প্রথমার্ধ্ব থেকে শেষার্ধ্ব পর্যন্ত এই বিশ্বায়নের পর্ব চলেছে। আমরা যদি ইওরোপের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তা'হলে দেখব যে জাতীয় সীমানা পেরিয়ে, নানান দেশ সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়েছিল। খোদ আমেরিকায় এবং ইওরোপের কোন কোন অংশে এই ধরণের সাংস্কৃতিক মিশ্রণ এবং সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হয়েছিল, তাদের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ধ্যান ধারণার প্রেক্ষাপটে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আমরা দেখেছি পারস্পরিক অবিশ্বাস থেকে ভিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা।

তার ফলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার উদ্ভব ঘটল। এশীয় দেশগুলিতে এই সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিল আর্ন্তজাতিক সংগঠনগুলির কোন চেষ্টাই সুফল দিল না। বহুধা বিস্তৃত সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা মার্কিন সমাজের যে চিত্রটি পাই, তার মধ্যেই ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাটি এই কথাই বলে যে আমেরিকার জাতীয় ইতিহাসের সর্বস্তরে কিছু কিছু দূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছে। সারা বিশ্বে মার্কিনীদের যে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত, তার কোনো পরিবর্তন ঘটবে কিনা এই ঘটনার মাধ্যমে এ কথা ভবিষ্যতই বলে দেবে। বহুধা বিস্তৃত সংস্কৃতিবাদের সম্ভাবনা এদের উপরেই নির্ভর করছে।

আমেরিকার জনগণমন অধিনায়কেরা আজ যে সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন, তা'হল প্রথাগত পদ্ধতিতে জাতীয় সমস্যার সমাধান করা এবং নব নব পদ্ধতির উদ্ভাবন করা। নব সৃষ্ট নব্য জাতীয়তাবাদী দেশগুলির মধ্যে বিরোধ গজিয়ে উঠেছে বলেই আজ প্রয়োজন হয়েছে, তাদের সমন্বিত করার প্রচেষ্টা, সমাবেশ, সম্মেলন, শীর্ষ সম্মেলন, এই সব পদ্ধতিতে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলেছে।

সারাংশ

সভ্যতার জাতীয় পথ ঃ উত্তরপূর্ব ভারত ও প্রতিবেশী দেশ

হরপ্রসাদ রায়

এই প্রবন্ধে আমরা উত্তরপূর্ব ভারত অতিক্রম করে যে পথ ব্রহ্মদেশের (মায়ানমার) মধ্য দিয়ে চীনের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রবেশ করেছে সেই পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হব। এই পথকে চীনে দক্ষিণাপথের রেশম-পথ (Southern Silk Route) নামে অভিহিত করা হয়।

অসমের পশ্চিমোত্তর প্রান্তে ভুটানের দক্ষিণে ও বাংলাদেশের পূর্বপ্রান্তীয় রংপুর জনপদের প্রায় ৮০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, মেঘালয়, কোকড়াঝাড় ইত্যাদি অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকেই সমৃদ্ধ, এবং বহু পরিব্রাজক ও সার্থবাহ (Caravan) বণিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই পথ দিয়ে মহাভারত যুদ্ধের আনুমানিক দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পর চীনা পরিব্রাজক শোয়ান-চাং কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মার আতিথ্য গ্রহণোদ্দেশ্যে কামরূপে প্রবেশ করেছিলেন। এ প্রমাণ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তেই পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নেই; তারা ব্রাহ্মণ্য দেব দেবীদের পূজো করেন, যে কারণে এই অঞ্চলগুলিতে শতাধিক দেব-মন্দির রয়েছে, কিন্তু বৌদ্ধদের জন্য কোন সঙ্ঘারাম (বৌদ্ধবিহার) নেই।

এই কথনের সভ্যতার প্রমাণ অধুনা আবিষ্কৃত সূর্যপাহাড় আদি মন্দির, ভাস্কর্য শিল্প ও বহু সুদৃশ্য রককার্ট (প্রস্তরতক্ষিত) ও জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি ইত্যাদি নিদর্শনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এইরূপ সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষ এই পথে গোয়ালপাড়ার অনুরূপ মণিপুর, মেঘালয়, তেজপুর (হড়পেশ্বর), ডিমাপুর (নাগাল্যান্ড) ইত্যাদি স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

এই পথ প্রাচীন পূর্বোত্তর ভারতের বাণিজ্যপথ, এই পথ দিয়েই চীনের রেশম, মৃগনাভি আদি দ্রব্য ব্রহ্মদেশ হয়ে প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ (অধুনা গুয়াহাটি সন্নিকটস্থ দিসপুর) অতিক্রম করে ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা-ভাগীরথীর জলপথে তাম্রলিপ্ত পৌঁছানো হত। সেখান থেকে রোম ও অন্যত্র সমুদ্রপথে দূর দূরান্তরে রপ্তানি করা হত। ভারত থেকে সুতিবস্ত্র, দেবদেবীর মূর্তি, রত্নাদি ও কড়ি (cowrie) মায়ানামার ও চীনে পাঠানো হত।

মার্ক্স-এঙ্গেলস রচনা সমগ্রের আরও দুই খণ্ডের প্রকাশনা ঃ প্রকৃতি বিজ্ঞান সংক্রান্ত নোটবই (MEGA-IV/31) ও তাঁদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের পরিচিতি (MEGA-IV/32)

সোমনাথ ঘোষ ও প্রদীপ বক্সী

বিগত ১৯৯৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, বার্লিনের 'আকাদেমি ফেরলাক' প্রকাশনা সংস্থা, মার্ক্স-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র প্রকাশনার মার্ক্স (M) এঙ্গেলস (E) গেসাম্‌ট (G) আউসগাবে (A) - "MEGA" -র নবপর্যায়ে, MEGA(2) আরও দুটি খণ্ড প্রকাশ করেছে আর সেই প্রকাশনাদ্বয় সংক্রান্ত আলোচনাই এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু। এই দুটি গ্রন্থ সহ এই পর্যায়ে প্রকাশিত মোট খণ্ডের সংখ্যা দাঁড়াল ৫২ - এই দুটি মার্ক্স-এঙ্গেলস রচনাসমগ্রের চতুর্থ বিভাগের '৩১' ও '৩২' নম্বর খণ্ড (সংক্ষেপে "MEGAIV/31 ও /MEGA-IV/৩২")।

আলোচ্য নিবন্ধের গোড়াতেই রয়েছে মার্ক্স-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র প্রকাশনার (MEGA-র) একটি সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক ইতিহাস। এঙ্গেলসের মৃত্যুর প্রায় ১৫ বছর পর প্রথম, মার্ক্স ও এঙ্গেলসের রচনাবলীর এক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। প্রথমদিকে সেই উদ্যোগের কর্ণধার ছিল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও গণপ্রজাতন্ত্রী জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রাট পার্টি। তারপর বহু ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়েছে এই প্রকাশনার প্রয়াস — কখনো তা চলেছে অতি ধীর গতিতে, কখনো বা হয়েছে সম্পূর্ণ স্তব্ধ। অবশেষে, বিগত ১৯৯০ সালের পর থেকে শুরু হয়েছে এই নবতম প্রকাশনার (MEGA(2)-র) পর্যায়, 'আন্তর্জাতিক মার্ক্স-এঙ্গেলস নিধি' [International Marx-Engels Stiftung (IMES)] নামক, আমস্টারডামে প্রতিষ্ঠিত এক সংস্থার তত্ত্বাবধানে। আর তদবধি, একটি বিশুদ্ধ কেতাবী সংস্করণ হিসাবে এই রচনাসমগ্র প্রকাশনার কাজ এগিয়ে চলেছে এক প্রকৃত আন্তর্জাতিক বাতাবরণের মধ্যে।

এই নিবন্ধের পরবর্তী বিভাগের, প্রথম অংশের বিষয় হ'ল, মার্ক্স-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র প্রকাশনার, চতুর্থ বিভাগের (IV) এই '৩১ নম্বর খণ্ডটি' - যাতে আছে, ১৮৭৭ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৮৮৩ সালের গোড়ার দিক - এই সময়কালের মার্ক্স-এঙ্গেলসের প্রকৃতিবিজ্ঞান চর্চার খাতাপত্র। এইসব নোট খাতায় রয়েছে, রসায়ণ বিদ্যাবিষয়ক কয়েকটি বই থেকে নেওয়া মার্ক্স-এর নোট এবং পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত কিছু গ্রন্থ ও পরিবেশবিদ্যা বিষয়ক একটি বই থেকে নেওয়া এঙ্গেলসের নোট। এঙ্গেলসের নোটগুলি তাঁর 'প্রকৃতির দ্বন্দ্বসমন্বয়' (Dialectics of nature) শীর্ষক গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই খণ্ডটিতে, শুধু যে মার্ক্স-এর প্রকৃতিবিজ্ঞান চর্চার এক নতুন দিগন্তের রূপরেখা এবং এঙ্গেলসের 'প্রকৃতির

দ্বন্দ্বসমন্বয়' গ্রন্থের আকরভূমির এক চিত্র ফুটে উঠেছে তাই নয়। এখানে আমরা আরও পাই - উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃতিবিজ্ঞান সমূহের ইতিহাস ও তাদের দর্শন চর্চার জন্য অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য।

আলোচ্য নিবন্ধের দ্বিতীয় বিভাগের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে 'মেগা'-র চতুর্থ বিভাগের ৩২-তম খণ্ডে প্রকাশিত, মার্ক্স ও এঙ্গেলসের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের এ যাবৎ সন্ধানপ্রাপ্ত বইগুলির একটি তালিকা এবং ঐ সমস্ত বইয়ের মার্জিনে লিপিবদ্ধ মন্তব্য সংক্রান্ত কিছু আলোচনা। মার্ক্স ও এঙ্গেলসের এই যৌথ গ্রন্থাগারে রয়েছে অর্থনীতি, অর্থনীতির ইতিহাস, দর্শন, সমাজ ও প্রকৃতি বিজ্ঞান, সাধারণ ইতিহাস, সমাজতন্ত্রের ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, বিশ্বকোষ, অভিধান, বিভিন্ন ভাষার পাঠ্যপুস্তক, স্মৃতিকথা, জীবনী, সাহিত্য আলোচনা, ললিত সাহিত্য ও সমরবিদ্যার নানা গ্রন্থ। ১৮৯৫ সালে এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর এই গ্রন্থাগারে প্রায় ২১০০ গ্রন্থ ছিল বলে জানা যায়, যার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৪৫০টি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এই বইগুলি, জার্মান, ইংরেজি, ফরাসি, স্লাভোনিক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় রচিত।

মার্ক্স-এঙ্গেলসের এই যৌথ গ্রন্থসংগ্রহের বৈশিষ্ট্য হ'ল: যে যুগে তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রচার কার্য ও রাজনীতি পরিচালিত হয়েছিল সেই কালপর্ব এবং তাদের সেই গবেষণার পরিমণ্ডলে উঠে আসা যাবতীয় প্রশ্ন ও সমস্যাদি সংক্রান্ত তৎকালীন প্রায় সকল গ্রন্থই স্থান পেয়েছিল এই সংগ্রহে।

ডাকটিকিটের ইতিহাসে আফ্রিকান ঐক্য দেশগুলি

প্রবীর কুমার সাহা

আফ্রিকা মহাদেশভুক্ত রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধির জন্য ১৯৬৩ সালে ORGANISATION OF AFRICAN UNITY (OAU) নামে এক সংস্থা গঠন করেন। এর রাষ্ট্র সংখ্যা হল ৪৭ দেশগুলি হল, যথাক্রমে- আলজেরিয়া, আঙ্গোলা, BENIN, ক্যামেরুন, BATSWANA, BURKINAFASO, BURUNDI, CAPE VEDE, সেন্ট্রাল আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র (CARI), চাঁদ, কঙ্গো, ইজিপ্ট, ইথুনিয়া, ঘানা, মথি, The Comoras, সিরিয়া, কেনিয়া, সোমানিয়া, COSTEDE, IVORIT, DJIBOUTI, EQUATORIAC GUINEA, THE SAMBIA, LESOTHO, সেনগোল, GUINEA-BISSAU, MADASASCAR, MACAWI, MAURITANIA, MAURITIOUS, MOZAMBIQUIE, নাইজেরিয়া, RWANPA, SEYCHELLES, সুগন, SAOTOME and PRINCIPE SWAZILAND, TOSO, উগানডা, TAWZANIO, ZAIRE, ZAMBIA, ZIMBABWE।

এ প্রবন্ধে এই দেশগুলির ডাকটিকিট প্রকাশের ইতিহাস ধারা বর্ণিত হয়েছে।

BENIN ফরাসী উপনিবেশের জন্য ফ্রান্সের স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হত। বিভিন্ন দেশের ডাকটিকিট প্রকাশনায় প্রথম যুগে রাজা চিত্রিত থাকলেও, পরবর্তীকালে নানান বিষয় সহ দেশের সংস্কৃতি, শিক্ষা উন্নয়ন, প্রগতি ডাকটিকিট প্রকাশনার প্রাঙ্গনে এসেছে।

ডাকটিকিটে লিবির বিবর্তন ও ইংরাজী ভাষার প্রাধান্য। ডাকটিকিটের সাইজ, রঙের বাহার বৈচিত্র্য মুখ্য বৈশিষ্ট্য। অধুনা দেশগুলি প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কোন না কোন ঔপনিবেশিক দেশের অধিকারে অথবা উপনিবেশ ছিল।

বিভিন্ন সময়ে পোস্টেজ ডিউজ স্ট্যাম্প, রাজস্ব স্ট্যাম্প, সংবাদপত্র স্ট্যাম্পের প্রচলন পরিলক্ষিত হয়েছে।

আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার দেশগুলির ঐতিহাসিকতার পরিবর্তনের ছাপ ডাকটিকিটে বিমূর্ত হয়েছে।